বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(পঞ্চম খণ্ড)

শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

রাত্রি

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। এক।।

রাত্রির কথা লিখতে বসেছি।

এখন কিন্তু বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর, রোদের তাতে প্রকৃতি পুড়ে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, সকাল থেকে ক্রমাগত আত্মসম্বরণ করে করে প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর পারছে না, অন্তরের পুঞ্জীভূত উত্তাপ চতুর্দিক চৌচির করে দিয়ে এইবার ফেটে বেরোয় বুঝি। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্ঠুর উত্তাপ। একটা তৃষ্ণার্ত কাক অশ্বত্থ গাছের ডালে হাঁ করে বসে আছে, গলার কাছটা কাঁপছে তার। বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার সর্বাঙ্গে কচি পাতার সমারোহ, নীরবে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেন। ঠাকুরবাড়ির গেটটার পাশে সারি সারি গোটাতিনেক কলসী নিয়ে কইলু বসে আছে—ফতুয়া-পরা ন্যাড়া মাথা কইলু, কলসি থেকে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনা মূল্যে দান করছে দৈনিক চার আনা মজুরির পরিবর্তে। কার পুণ্য হচ্ছে, কে জানে! অদূরে বুড়ো মুচিটাও বসে আছে আশপাশে নানাজাতীয় ছিন্ন পাদুকা ও পাদুকা-সংস্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। বুড়োর লক্ষ্য পথিকদের পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে নিজের দিকে কারও কারও দৃষ্টিও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে—'জুতিঠো হুজুর!' কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না; এই রোদে দাঁড়িয়ে জুতো সারাবে কে! বুড়ো কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না, সুযোগ পেলেই অনুরোধ করছে। তার মানসপটে মুখে বসন্তের-দাগ জাঁদরেল মুচিনিটার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে বোধ হয়, বিকেলে সে আসবে, পাই-পয়সার হিসেব নেবে এবং উপার্জন কম হলে কারণে অকারণে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করবে। আর্তনাদ করতে করতে একটা মোটর ছুটে চলে গেল, ধুলো উড়ল। তার পেছনে একটা জীর্ণ টমটম, ঘোড়াটা জীর্ণতর, চারজন মোটা লোককে আর যেন বেচারা টানতে পারছে না, গাড়োয়ান ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন দিতে দিতে আর একটা মোটর বেরিয়ে গেল, আবার একরাশ ধুলো উড়ল। 'ঠাণ্ডা মালাই-বরো-ফ' —ভীষণদর্শন একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে একজন কুলি, তার মাথায় লাল শালু দিয়ে মোড়া মালাই-বরফের হাঁড়ি। পিচের রাস্তা গরম হয়ে নরম হয়ে এসেছে। কুলিটার পায়ের চামড়া শক্ত, ফাটা-ফাটা, হয়তো গরম লাগছে না। ঠাণ্ডা মালাই-বরফ বয়ে বেড়াবার জন্যে ক' পয়সা পাবে ও, কে জানে! অশ্বত্থ গাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বসে রাত্রির কথা লিখছি, মনে করে করে ভেবে ভেবে লিখছি। এই দারুণ দ্বিপ্রহরের পটভূমিকায় নিবিড় রাত্রির স্মৃতি অস্পষ্ট, রহস্যময়।

খট-খট-খট-খট-খট-খট।

মদগর্বিত পদবিক্ষেপে একদল পুলিশ-বাহিনী রাস্তা প্রকম্পিত করে চলে গেল। ওদের খাকি সাজ আর লাল পাগড়ি আশ্চর্য রকম মানিয়েছে উদ্ধত দ্বিপ্রহরের নিদারুণ এই—

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অশ্বত্থ গাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে। ওই পুলিশ-বাহিনীর একটি পুলিশকে চিনতে পেরে আমারও হাসি পাচ্ছে। কালই আভূমি নত হয়ে ও সেলাম করেছিল ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি এক গার্ড-সাহেবকে আকবর নগর স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে, আমি দেখেছিলাম। খট-খট-খট-খট-খট-খট— মদগর্বিত পদধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। বুড়ো মুচিটা সভয়ে চেয়ে রইল, জলসত্র পরিচালক কইলু একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের আঁজলায় জল ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতেই ঢেলে দিলে খানিকটা জল।

এই বিক্ষেপ-বিক্ষোভ-উত্তাপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে বসেই লিখতে হচ্ছে রাত্রির কথা। তিমিরময়ী নক্ষত্রখচিত রাত্রি। নক্ষত্র অগণিত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও উঠেছিল মধ্যরাত্রে। ঝড়ও উঠেছিল। আমি সবটা দেখিনি, দেখলেও হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। না, আমি সবটা দেখিনি, দেখতে পারিনি; অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম, প্রভাত হয়েছে।

।। দুই ।।

জীবনের যে অনিবার্য ঘটনাগুলিকে অপছন্দ করি আমি, আশ্চর্যের বিষয়, সেই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিরই সহায়তায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিন। সেদিন কি বার ছিল, কি মাস ছিল, কি তিথি ছিল, কিছুই মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে, দগদগে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ডোরা-কাটা শতরঞ্জিটা প্লাট্‌ফর্মে পেতে তার ওপর বেকুবের মতো বসেছিলাম আমি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অস্বস্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল, যখন একজন কুলি এসে মাথার ওপর একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। অস্পষ্ট আর কিছু রইল না। শতরঞ্জি শতকণ্ঠে আত্মপ্রচার করতে লাগল, আমার প্রকাণ্ড কালো তোরঙ্গটার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আমার নামটা অগোচর রইল না আর কারও।

স্ত্রীবিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়— সে-ই সখী, সচিব, গৃহিণী সব— বিশেষত আমার মতো কাছাখোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। সেই চাকর যদি আবার আমার গোকুলচন্দ্রের মতো যুগপৎ রসবোধলেশহীন, কর্মঠ, বিশ্বাসী, এবং স্নেহশীল হয়, তা হলে এই রঙচঙে শতরঞ্জির ওপর বেকুবের মতো বসে অস্বস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ট্রেন ছাড়বার মিনিট-দশেক আগে হন্তদন্ত গোকুল এই শতরঞ্জিটা কিনে স্টেশনে দিয়ে গেল আমাকে, সকাতরে অনুরোধ করে গেল, বিছানাটা যেন না খুলি, এই শতরঞ্জিটা পেতেই যেন চালিয়ে দিই ভ্রমণকালীন শোয়া-বসাটা! গোকুল জানে, বিছানায় টুকিটাকি নানা রকম জিনিস আছে, খুললেই একটা না একটা হারিয়ে যাবে। গোকুলকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ভগবান গোকুলকে আর একটু যদি—রসিক নয়, কম বেরসিক করে সৃষ্টি করতেন, কি ক্ষতি হত তাতে তাঁর? আশ্চর্য কাণ্ড, পয়সা দিয়ে শতরঞ্জিবেশী এই প্রলাপটা কিনে নিয়ে এসেছে ও সজ্ঞানে, স্বচ্ছন্দে। কিছুদিন পূর্বে এই বেখাপ্পা রকম বড়ো কালো রঙের তোরঙ্গটাও এই গোকুলই কিনেছিল, সাদা রঙ দিয়ে নাম গোকুলই লিখিয়েছে। শুধু তোরঙ্গে নয়, আমার সমস্ত জিনিসে—বাসন-কোসন, জামা-কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি, লুঙ্গি, সমস্ত জিনিসে আমার নাম লেখা

এবং সমস্তই আমার হিতৈষী গোকুলের কীর্তি। গোকুল আমাকে নিয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। আমি যেন সমস্ত জিনিস হারিয়ে ফেলতে উদ্যত, নাম-টাম লিখে গোকুল কোনোক্রমে সামলে-সুমলে রেখেছে সব যেন।

ওয়েটিং-রুমের পাশে অন্ধকার এক কোণে রঙিন শতরঞ্জিটার ওপর চুপ করে চোখ বুজে পড়েছিলাম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত করে বাঁধা বিছানার বাণ্ডিলটায় হেলান দিয়ে। অদূরে একটা এঞ্জিন শব্দ করছিল—শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌। চোখ বুজে শুয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম। একটু নমুনা দিই।—

—চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। অরণ্যসমাকুল উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য অমাবস্যার অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায়। নির্মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছায়াপথ প্রসারিত। সুবিশাল বৃশ্চিকরাশি বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো চিরন্তন প্রশ্নের রহস্য লইয়া অন্ধকার শূন্যে জ্বলিতেছে। দূরসন্নিবদ্ধ দেবদারুশীর্ষে অনুরাধা, তাহার ঈষৎ নিম্নে জ্যেষ্ঠা, এবং শূলপাণিপর্বতের অগ্রভাগে মূলা নক্ষত্র দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ, ঘনসন্নিবদ্ধ বনশ্রেণী পর্বতগাত্রে পুঞ্জীভূত মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শূলপাণি ও পার্বতীর মধ্যস্থিত বনসমাচ্ছন্ন এই উপত্যকায় বৌদ্ধ কাপালিক রক্তভিক্ষু সঙ্গোপনে বাস করেন। উপত্যকা শ্বাপদসঙ্কুল, গভীর নিবিড় রাত্রেও নীরব নহে। নিকটে দূরে বন্য পশুর সাবধান-সঞ্চরণ-শব্দ, অজগর নিষ্পিষ্ট অসহায় পশুর অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি, জটিল শাখা-প্রশাখাময় বৃক্ষশীর্ষে নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন—

ঘর্ঘর করে একটা শব্দ হল, চোখ খুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে যে বাতিটা টাঙানো ছিল, একটা কুলি হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা নাবাচ্ছে। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠল এবং আমাকে কেন্দ্র করে গোকুলের কীর্তি সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। রঙিন শতরঞ্জি, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে বসলাম, এবং টাইম্‌-টেবলটা নিয়ে আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতাটার ওপর অকারণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। ওতেই নিমগ্ন হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—স্টেশনের ভেতরে ঘণ্টা বাজল। কে একজন আপ-ডাউন ভাষায় আর এক স্টেশনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কথা শেষ হয়ে গেল। এঞ্জিনের শ্‌শ্‌ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন জানি না, আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতা থেকে চোখ তুলে হঠাৎ আমি ডান দিকে ফিরে চাইলাম, মনে হল কে যেন আমায় ঘাড় ধরে ফিরিয়ে দিলে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে একজোড়া চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। আর কিছু নয়, কেবল একজোড়া চোখ।

রাত্রি।

আমার রঙিন শতরঞ্জি এবং নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত হয়ে ওঠবার পূর্বেই, বেশ মনে পড়ছে, বংশী এসে ঢুকল ওয়েটিং-রুমে এক ঠোঙা খাবার এবং এক কুঁজো জল নিয়ে। তারপর কয়েক মিনিট কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এইটুকু শুধু মনে আছে, এঞ্জিনের শ্‌শ্‌ শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল, এবং আমি সহসা আবার প্রাণপণে সেই অন্ধকার উপত্যকায় নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অনুসরণ করে সেই বৌদ্ধ কাপালিকের অলৌকিক কাহিনীটা গড়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আপনিই কি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার?

প্রশ্ন করলে বংশী, কিন্তু ঈষদুন্মুক্ত দরজার অন্তরালে শাড়ির টকটকে লাল পাড়ের ঝলক চোখে পড়ল। বুঝলাম, বংশী প্রশ্নকারক নয়, প্রশ্নবাহক।

কি রকম যেন বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

'ঘনশ্যাম' নামটা এ যুগের সভ্য-সমাজে অচল, যে রগরগে শতরঞ্চিটার ওপর বসে আছি সেটা অচল, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা অচল, এবং সর্বাপেক্ষা অচল আমার রণ-লাঞ্ছিত-মুখ-সর্বস্ব এই রোগা লম্বা চেহারাটা। বাইরের এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের সুন্দর সাহিত্য-সাধনাকে বিজড়িত করতে বরাবরই আমি একটু সঙ্কুচিত হই। তবু সম্ভবত 'বিখ্যাত' শব্দটার মোহে অভিভূত হয়ে বংশীকে সত্য কথাই বললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনি ডাক্তারি করতে করতে কি করে লেখেন এত?

বুঝলাম, এ প্রশ্নটি বংশীর মস্তিষ্ক থেকে স্বতঃ উৎসারিত হল। একটু মুচকি হাসলাম। আমার মুচকি হাসির অন্তরালে কি পরিমাণ উষ্মা নিহিত ছিল, তা দেখতে পেলে বংশী একটু বিব্রত হত। অনেকেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কি মূর্খের মতো প্রশ্ন। এ যেন অনেকটা 'আপনি ডাক্তারি করতে করতে নিশ্বাস নেন কি করে' জাতীয় প্রশ্ন। অনেকেই দেখেছি আলাপ শুরু করেন প্রশ্ন দিয়ে। দু-চারটে সাধারণ প্রশ্নের পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকম ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন বর্ষিত হতে থাকে। 'মাসে কত টাকা উপায় করেন'—এ প্রশ্ন তো অনেকের মুখেই শুনেছি। 'প্র্যাক্‌টিস কেমন হচ্ছে', 'লেখা থেকে দু' পয়সা হচ্ছে কি না'—এত বার এত লোকের কাছে শুনেছি যে, গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এক জাতীয় সাহিত্যিক দ্রষ্টা আছেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো বেশ জটিল ধরনের। 'ছোটগল্প কি করে লিখতে হয়', 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাত কোথায়', 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি কি না', 'বাংলাসাহিত্যে কোন্ কবি ব্রাউনিঙের মতো', 'জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবিই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না'—দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়।

বংশী শতরঞ্চিতে উপবেশন করে তৃতীয় প্রশ্নটা করলে এবং আত্মপ্রকাশ করলে।

আচ্ছা, আজকাল চারিদিকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' খুব শুনি, লোকটা কে বলুন তো?

আমি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ডিটেক্‌টিভ।

শিস দেবার ভঙ্গীতে মুখটা কুঁচকে বিস্মিত বংশী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ভেতর থেকে ডাক এল।

বংশীদা, শুনুন।

মনে হল, অনেক দূর থেকে—যেন আকাশের ওপার থেকে—কথাগুলো ভেসে এল। রাত্রির সম্পর্কে বরাবরই, এমন কি শেষ পর্যন্ত, আমার এই দূরত্ববোধক অনুভূতিটা ঘোচেনি।

উঠে চলে গেল বংশী।

আমি বসে রইলাম চুপ করে। এঞ্জিনের শশ্ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছু একটা করবার জন্যেই সম্ভবত স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ঘড়ি চলছে না। সংস্কৃত ভাষায় গল্পের যে প্লটটা ভাবছিলাম, সেটাই আবার ভাববার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে আবার ঠেস দিয়ে শুলাম বিছানার বাণ্ডিলটায়। শূলপাণি এবং পার্বতী পর্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকার সে ছবিটা আর কিন্তু মনের মধ্যে তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল না। বংশী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, আর সেই কালো কুচকুচে চোখ

দুটো, সেই লাল পাড়ের ঝলকানি। তখন ভাবিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওই শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার উপত্যকার সঙ্গে কালো কুচকুচে চোখ দুটো, লাল পাড়ের ঝলকানি আর বংশীর অতি নিবিড় যোগ ছিল। না থাকলে ঠিক সেই সময় রক্তভিক্ষু নামে একটি কাপালিকের কথা আমার মনে হবে কেন? সেই অন্ধকার উপত্যকায় শূলপাণি-পর্বতের গুহায় রক্তভিক্ষু নামে যে বৌদ্ধ কাপালিককে আমি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করেছিলাম, সে যদিও আর কোনোদিন আমার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করবে না, সে যদিও হারিয়ে গেল, তবু কিন্তু ঠিক সেই সময় সে আমার কল্পনাতেই বা মূর্ত হয়েছিল কেন, যদি না—

স্বর্ণেন্দু বলে কাউকে চেনেন আপনি?

চোখ খুলে উঠে বসলাম।

বংশী আবার এসেছে।

স্বর্ণেন্দু?

হ্যাঁ, স্বর্ণেন্দু রায়, স্কটিশে আপনার সঙ্গে—

আর বলতে হল না, যবনিকা উঠে গেল, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্ণেন্দুর মুখখানা। কালো রোগা লাজুক স্বর্ণেন্দু। 'সোনার চাঁদ' বলে রাগাতাম তাকে আমরা।

খুব চিনি। কেউ হয় নাকি স্বর্ণেন্দু আপনার?

আমার পিসতুতো দাদা।

ও।

সোনাদা এসে পড়বেন এখুনি দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমরা সবাই মধুপুর যাচ্ছি।

বেড়াতে?

না, চেঞ্জে। পিসেমশায়ের অসুখ।

কি হয়েছে?

ডাক্তারী কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাতের শ্লীল অশ্লীল নানা রকম কারণ মাথার মধ্যে ভিড় করে এল।

আশ্চর্য আমাদের মন!

কতদিন থেকে?

এক বছর হবে। কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না একেবারে।

কোথায় রয়েছেন তিনি, ওয়েটিং-রুমে?

হ্যাঁ, আসুন না, দেখবেন।

খুব সম্ভবত একজন লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যেই [ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাঁধ-ঘষাঘষি'] বংশী আমাকে ভেতরে যেতে বললে।

না, থাক, হয়তো ঘুমুচ্ছেন এখন।

ঘুমুবেন কি, ঘুমই হয় না তাঁর, দিনরাত জেগে আছেন।

অচেতন নয়, সচেতন মনেরই প্রত্যক্ষলোকে কালো কুচকুচে চোখ দুটো নির্নিমেষে চেয়েছিল, আকর্ষণ করছিল, বিকর্ষণও করছিল। স্বর্ণেন্দুর কে হয় ও?—হয়তো দু'মিনিট কেটেছিল, হয়তো দু'ঘণ্টা ঘড়ির দিক থেকে ভেবে দেখবাব মতো মনের অবস্থা ছিল না

তখন। এইটুকু শুধু মনে আছে, অনেকক্ষণ লেগেছিল কুণ্ঠাটা কাটাতে—বেশ কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। চোখের দৃষ্টিতে সাজপোশাকবর্জিত আসল মানুষটিকে চেনা যায়—মনের গহনলোকে সঙ্গোপনে যে মানুষটি বাস করে তাকে, সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত আসল সত্তাটিকে! সাজে-পোশাকে আলাপে-ব্যবহারে সভ্যজগতের সব মানুষই প্রায় এক ছাঁদের। চোখের দৃষ্টিই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে এখনও। চোখের দৃষ্টিই মুখশ্রীর প্রাণ। অদ্ভুত ওই কালো চোখ দুটি! বিশিষ্ট! হয়তো ওর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না। আমার বর্ণবহুল শতরঞ্জি, ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার নামলেখা তোরঙ্গ, ডাক্তারি-সাহিত্যিকতার আপাত-অদ্ভুতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমি অপছন্দ করি, সেই জিনিসগুলিরই আকস্মিক সমন্বয় না ঘটলে সেদিন, কিংবা কোনোদিনই হয়তো, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত না আমার। তার কথাগুলো—প্রায় বছর দুয়েক আগে শোনা কথাগুলো, মনে পড়ছে আমার।

আপনার ওই শতরঞ্জিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার, তারপর দেখলাম নাম লেখা তোরঙ্গটা। নাম দেখেই মনে পড়ল, দাদার এই নামেরই তো একজন ডাক্তার লেখক-বন্ধু আছেন। বংশীদাকে বললাম—

আশ্চর্য রকম ছোকরা এই বংশী, অর্থাৎ আশ্চর্য রকম লোক-ঠকানো চেহারা ওর। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, চালাক-চতুর বেশ। চেহারাতে এমন একটা লালিত্য আছে, অর্থাৎ সেই ধরনের লালিত্য আছে, যা আজকালকার মেয়েদের পছন্দ। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক নয়, বেশ রোগা-রোগা, পাঞ্জাবি-পরলে-বেশ-মানায়-গোছ চেহারা। মুখে যে হাসিটা সর্বদাই চিকমিক করছে, আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ সেটা বুদ্ধির দীপ্তি বলে ভুল হবার সম্ভাবনা। প্রতি কথাতেই সমঝদার-মার্কা হাসি। সেই হাসির অন্তঃসারশূন্যতা কিন্তু নিমেষে বোঝা যায় চোখ দুটোর পানে চাইলে। সর্বদা চঞ্চল চোখ দুটোর দৃষ্টি ছটফট করছে—যেন নিজেকে ঢাকবার জন্যে, ধরা পড়ার ভয়ে, কিন্তু পারছে না। নির্বোধ, ভীরু, লোলুপ, চঞ্চল দৃষ্টি।

আসুন না, দেখবেন?

আবার অনুরোধ করলে বংশী।

চলুন।

।। তিন ।।

আলোটা উস্‌কে দাও, ঘনশ্যামবাবু এসেছেন।

আলোটা উজ্জ্বলতর হতেই অনিবার্যভাবে তাকেই প্রথমে দেখলাম, যদিও সে কোণের দিকে বসেছিল। আলোটা উস্‌কে দিলে চাকরটা।

বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। অক্ষমতা নয়। রঙচঙে কথার আতসবাজি ছুটিয়ে, শব্দের ঝঙ্কারে সকলকে দিশাহারা করে দিয়ে পরিশেষে 'অবর্ণনীয়া' বলে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবার কৌশল আমার খুব আয়ত্ত আছে। এক্ষেত্রে সে কৌশল প্রয়োগ করতে বিরত হলাম, কারণ আমি কিছুই অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ঔপন্যাসিকী কায়দায় বর্ণনা করতে বসলে অতিরঞ্জন

অবশ্যম্ভাবী। অতি সংক্ষেপে কেবল কিছু বলছি, যদিও তাও, খুব সম্ভব, 'অতি' না হলেও ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে যাবেই।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে এ কালো রঙের বর্ণনা করা যাবে না। কারণ তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল—মখমলের মতো অদ্ভুত একটা কোমলতা। অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য একটা শ্রী ওই কালো রঙের নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত—চঞ্চল নয়, নিষ্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করছে তত মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে—মনে হয়, তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমেই তাকে দেখে আমার এত কথা মনে হয়নি, এই বর্ণনাটুকু আমি আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কলন করে দিলাম। প্রথমেই তাকে দেখে আমার মনে যে ধারণা হয়েছিল, প্রথম দৃষ্টিতেই সে রকম ধারণা করতে পারে কেবল বাঙালী সন্তান। যদিও সে একটিও কথা বলেনি, তবু সহসা আমার মনে হল, মেয়েটা জ্যাঠা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রিকোশাস'। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাকে বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়েছিল। বয়সের আন্দাজে! তার বয়স কত—সে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কি? আঠারো কি আটাশ—সে প্রশ্নই তো মনে জাগেনি তখন? কার জাগে? অনেকদিন পরে বংশী যখন নিমোনিয়ার ঘোরে প্রলাপ বকছিল—"তোমার বয়স কত তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধেও সব কিছু জানতে চাই না আমি"—মনে পড়ছে, এই প্রলাপের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল। বংশীর প্রলাপের চিকিৎসা অবশ্য করেছিলাম ডাক্তার আমি, কিন্তু কবি আমি সায় দিয়েছিলাম ওই প্রলাপের সঙ্গে। পুরুষের মনকে যে নারী প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার নারীত্বের বেশি আর কিছু জানবার আগ্রহ থাকে না মনের। তার বয়স কত, তার ওজন কত—নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এসব; অনভিভূত মনের বস্তুতান্ত্রিক কৌতূহল। প্রথম দর্শনেই তাকে জ্যাঠা বলে কেন মনে হয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ অবশ্য একটা ছিল। চলচ্চিত্রে যেমন একটা ছবিকে অবলুপ্ত করে মুহূর্তের মধ্যে আর একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাকে দেখে তেমনই তার নিষ্পলক চাহনিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নির্নিমেষ নীরব চাহনিকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—''তুমিও এলে! অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছ?'—একটু হাসি, তারপর—'তোমাদের সব্বাইকে ভাল করে চিনি আমি।'

যথাসম্ভব আত্মসম্বরণসহকারে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানটাকে অনাবশ্যক রকম বর্মাবৃত করে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বংশীকে বললাম, কই, স্বর্ণেন্দুর বাবা কোথায়? আমি তো কিছুই শুনিনি। এই অনুযোগটার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তা আমারও কানে বাজল। বংশী আলোটা এগিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম স্বর্ণেন্দুর বাবাকে। মেঝেতে বিছানা পাতা, তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন তিনি, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখটুকু খোলা আছে শুধু। মুখের আধখানা মরা, আধখানা জীবন্ত। মরা অংশটা ভাবলেশহীন, চোখের পাতাটা যেন শ্রান্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে জল, ঠোঁটের কোণটা নেমে এসেছে, সমস্তটা মিলে কেমন যেন একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদিও তা মরা নয়, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা মৃত্যুর বাড়া; বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবন্ত অংশটা কিন্তু অতিরিক্ত রকম জীবন্ত।

চোখের দৃষ্টি প্রখর, অধর-প্রান্তে উদ্ধত অবজ্ঞা, রগের ওপর কুটিল গোটা-দুই শিরা স্পন্দিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

অভ্যাসমত নাড়ীটা টিপে দেখলাম। ব্লাড-প্রেসার খুব বেশি বলে মনে হল না। হার্টের খবর নেবার জন্যে সংস্কার-অনুযায়ী স্টেথোস্‌কোপের অভাব অনুভব করলাম। রগের শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করছে কেন? বৈজ্ঞানিকভাবে ভাববার চেষ্টা করলাম একটু। রোগের ইতিহাস, রক্ত-পরীক্ষা—ডাক্তারী চিন্তা-পরম্পরাকে স্তব্ধ করে দিয়ে জীবন্ত চোখের দৃষ্টিটা যেন চিৎকার করে উঠল, চোপরও। জীবন্ত অধরপ্রান্ত উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মরা চোখটা, দেখলাম, মিনতি করছে; অবদমিত মৃত অধর নীরবে বলছে, ক্ষমা করুন। অদ্ভুত ঐকতান!

ঠিক এর পর আমি কি করেছিলাম, কি বলেছিলাম, এর পরও কি করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ওয়েটিং-রুমের ইজিচেয়ারে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে করে তার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে, ভদ্রতার হাসিটুকু মুখে ফুটিয়ে রেখে নমস্কার করে আমি উঠে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ সম্ভবত উঠে বাইরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঠিক যে কি কারণে আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—হয়তো অকারণেই, হয়তো কাপড়টা আটকে গিয়েছিল চেয়ারটার হাতলে, ঠিক মনে নেই এখন। কিন্তু ফিরে তাকালাম বলেই ব্যাপারটা ঘটতে পারল। ঠিক পর পর ঘটনাগুলো মনে নেই। যে ছবিটা এই সূত্রে মনের মধ্যে ফুটে উঠছে, সেটা এই—বংশী শশব্যস্ত হয়ে বার্নারটা ভাল করে গরম হবার আগেই জোরে জোরে কয়েকবার পাম্প করে স্টোভে তেল উঠিয়ে ফেলেছিল, জ্বলন্ত কেরোসিন তেলের হলদে আলোয় সহসা তার চরিত্রের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে, অন্তত আমার তাই মনে হল। তেল উঠিয়ে ফেলে বংশী শশব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হল না, কেবল ওষ্ঠের চাপে অধর যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হল, চোখের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-করুণাদীপ্ত এক ঝলক দৃষ্টি যেন মূর্ত হয়েই অবলুপ্ত হয়ে গেল, আর কিছু নয়। তারপর—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই আমার—ছোট্ট দুটি কথা, সরো তুমি। বংশী সরে গেল, সে বসল গিয়ে স্টোভের কাছে। একটু পরেই স্টোভ-সাইলেন্সারের শতছিদ্রপথে মূর্ত হয়ে উঠল আগুনের নীল-কমল, রূপান্তরিত কেরোসিন-শিখা আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

এর পরেই যে ঘটনাটা মনে আছে, সেটা মর্মান্তিক বলেই মনে আছে, এবং সেটা ঘটেছিল দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেতে খেতে। এত বড় মর্মান্তিক আঘাত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাব—অর্থাৎ ঈশপের একচক্ষু হরিণের দুর্দশা যে আমার কপালেও লেখা ছিল, তা কল্পনা করিনি। চায়ের পেয়ালাটা ছোট ছিল, অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল।

আর একটু নেবেন?

দিন।

প্রথম-পেয়ালা-পর্বের হালকা কথাবার্তায় আড়ষ্টতাটা কমে এসেছিল নিশ্চয়ই, যদিও প্রথম-পেয়ালা-পর্বের সে হালকা কথাবার্তাগুলো যে কি ছিল, তা মনে নেই। খুব সম্ভবত পক্ষাঘাত বিষয়েই দু'চারটে টুকরো আলোচনা, স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে দু-একটা কথা, বংশী অবনীশের উল্লেখ করে বংশী-সুলভ রসিকতার চেষ্টাও করেছিল যেন—অর্থাৎ সেই সব আলোচনা, যার কোনো উদ্দেশ্য নেই, মাথামুণ্ড নেই, অর্থও সব সময়ে নেই, যার একমাত্র সার্থকতা, অপরিচয়ের অথবা অতিপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য আড়ষ্টতাকে সুলঙ্ঘ্য করে তোলা।

দ্বিতীয়বার আমার পেয়ালাটায় চা ঢালতে ঢালতে, চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বললে, আপনি বিদেশী বই অনেক পড়েছেন, নয়?

কিছু কিছু পড়েছি।

আপনার লেখা পড়লে সেটা বোঝা যায়।

এটা নিন্দা, না, প্রশংসা—সেটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই চিনি মেশাতে মেশাতে এবং পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মৃদুকণ্ঠে সে আবার বললে, একটা জিনিস বুঝতে পারি না আমি, স্বীকার করেন না কেন আপনারা?

কি?

ইব্‌সনের পিয়র গিন্ট থেকে আপনি আপনার নাটকে হুবহু খানিকটা নিয়েছেন. কীট্‌সের একটা বিখ্যাত কবিতার সঙ্গেও আপনার একটা কবিতার আশ্চর্য রকম মিল আছে, কিন্তু আপনি ঋণ স্বীকার করেননি কোথাও। আজকালকার অনেক লেখকই করে না; আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এত বড় শক্তিশালী লেখকদের এ সামান্য দুর্বলতা কেন?

আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। বংশী বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক; কিন্তু 'গ্রেট মেন' পর্যন্ত বলেই সে হেসে ফেললে এবং চলকে-পড়া চায়ের প্রবাহে 'থিঙ্ক অ্যালাইক'টা ভেসে গেল।

গুলি খেয়ে একচক্ষু হরিণটা মারা গিয়েছিল।

আমারও মৃত্যু হল।

নির্বাক হয়ে রইলাম আমি।

আপনার লেখা কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার।

মনে হল অনেক দূর থেকে ফোনে যেন সে কথা বলছে। ভাল লাগে। নিহত হরিণটার মাংসও নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল সেই শিকারীর।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

শুনলাম, আমি বলছি, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে, বুঝলেন কিনা, অনেক জিনিস—

—ও, তাই নাকি?

ঠিক এর পরের মুহূর্তেই আমার সমস্ত সত্তা আমার দৃষ্টিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার আনমিত মুখের দক্ষিণ অংশটুকুতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মখমল-কোমল কালো রঙের নিবিড় অন্ধকারে। কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্ত।

তারপর যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, একটা অজুহাত পেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে প্লাট্‌ফর্মের দিকে ছুটছি। প্লাট্‌ফর্মে একটা শোরগোল উঠেছে, ট্রেন এসেছে একটা।

লোকে লোকারণ্য। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্' চিৎকারের উপলক্ষ্য খদ্দর-পরিহিত মাল্যভূষিত ব্যক্তিটি ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামলেন। মক্কেলহীন এই উকিলটি সকলেরই পরিচিত। ডেমোক্রেসি-যন্ত্রের নানা চাকায় নানা তৈল, যেখানে যেটির প্রয়োজন, নিপুণভাবে নিষেক করতে পারলে ভাগ্যচক্র যে উন্নতিপথে ঘর্ঘরশব্দে ছুটে চলবার যোগ্যতা লাভ করে, ইনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম প্রথম ইনি দেশসেবার খুচরো কারবার করতেন, এখন পাইকারী ব্যবসা খুলেছেন—বচন, বুদ্ধি আর খদ্দর এই মূলধন নিয়ে। ভিড় চলে গেল, ট্রেন চলে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও, তাই নাকি?

কানের পাশে আবার গুঞ্জন করে উঠল কথাগুলো। সহসা নিজেকে ওই মাল্যভূষিত চোরটার সগোত্র বলে মনে হল। বসে পড়লাম। রঙিন শতরঞ্জিখানা প্রসারিতই ছিল, শিয়রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বিছানা, পাশে নামলেখা কালো তরঙ্গ। চোখ বুজে বিছানাটায় ঠেস দিলাম, ভারি নিঃস্ব মনে হতে লাগল নিজেকে। চুরি ধরা পড়েছে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর কাছে! তখন কে জানত যে, চোরাই মাল-সমেত ওকেও ধরা পড়তে হবে একদিন আমার কাছে! কিন্তু না, জিনিসটা ঠিক তা নয়, ও ধরা পড়েনি, ধরা দিয়েছিল। আকাশ-পাতাল তফাত যে! আমি হয়তো সারারাত তেমনি ভাবেই বসে থাকতাম, যদি না টেলিগ্রাফ-পিওনটা এসে বংশীর খোঁজ করত। বংশীর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। ওয়েটিং-রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে ডাকলাম বংশীকে। বংশী বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাম খুলে দেখলে, তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়দা টেলিগ্রাম করেছেন—Missed train, Following in a taxi. Inform Ratri, Wait for me.

দরজার পাশে দেখলাম, রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

।। চার ।।

দিল্লী এক্সপ্রেসে যখন স্বর্ণেন্দু এল, তখন আমার একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। বংশীর ডাকে উঠে বসে সামনে দেখলাম, একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ রুক্ষ গোঁফ-দাড়ি, আর ময়লা-জামা-কাপড়-ক্যাম্বিসের-জুতো পরা এক ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কক্খনও এ স্বর্ণেন্দু নয়। আমাদের সঙ্গে যে রোগা লাজুক ছেলেটি পড়ত, সে এই! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ঘনশ্যাম, তুই! আর কিছু বলতে পারলে না সে।

স্বর্ণেন্দু ঘণ্টা দুই ছিল বোধহয়। কিন্তু এই দু'ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই সে আমার কাছে ছিল। এসেই মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর বরাবর আমার কাছেই ছিল। শুনলাম, মাকে আনতে সে মথুরা গিয়েছিল, কিন্তু মা এলেন না। সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসতেই চান না নাকি তিনি। একটু ম্লান হেসে স্বর্ণেন্দু বললে, মায়ের মাঝে মাঝে ওই রকম ধর্মবাই চাগে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সরে পড়েন তিনি, আবার কিছুকাল পরে ফিরে আসেন, আবার চলে যান। বাবার পক্ষাঘাত হয়ে আরও সুবিধে হয়েছে তাঁর। আসল কথা কি জানিস? ওয়েটিং-রুমের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, রাতুই আসল কারণ। ওর বিয়ে নিয়েই ভাই যত গোলমাল। মা একটু—মানে, আজকালকার স্বাধীন মতামতগুলো পছন্দ করেন না। তাই বা বলি কি করে? একটু থেমে, ছোট একটু হেসে বললে, মানে, আমাদের সঙ্গে তর্কে না পেরে রাগারাগি করে শেষকালে পালিয়ে যান।

কোথা যান?

কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ—যখন যেখানে তাঁর গুরুদেব থাকেন। তাঁকে খবর দিলেই গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন।

একটু খটকা লাগল।

গুরুদেব গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন?

হ্যাঁ। মাকে তুই দেখিসনি কখনও, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মা। মাঝে মাঝে দেবতার ভর হয় তাঁর ওপর।

দেবতার ভর হয়?

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারি অদ্ভুত কিন্তু।

মায়ের গল্প শেষ করে স্বর্ণেন্দু নিজের বেকার জীবনের ইতিহাস শুরু করলে। কত রকম ভাবে চেষ্টা করে সে কত রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারই বর্ণনা। দু'ঘণ্টা ধরে নানা ছন্দে একই কাহিনী শুনলাম। তার সব কথা মনে নেই; কিন্তু এটা বেশ মনে আছে, স্বর্ণেন্দুকে সেদিন যেন নূতন রূপে দেখলাম। লাজুক রোগা স্বর্ণেন্দু আমাদের সঙ্গে পড়ত, এ যেন সে নয়,—এ যেন তার থেকেই উদ্ভূত অন্য আর একজন।

প্রায় বছর দশেক আগে একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মামার বাড়ির চেহারা ছিল—তকতকে ঝকঝকে উঠোন, উঠোনের এক কোণে বাঁশের মাচায় কচি শশা ঝুলছে, দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়াল বেয়ে ঝিঙেলতা উঠেছে—তাতে অজস্র ঝিঙেফুল, দাঁড়ে টিয়াপাখি চোখ পাকিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছে সবাইকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মামীমা তাঁর নিজস্ব ছোট উনুনটার ধারে বসে কখনও পাটিসাপটা, কখনও সন্দেশ, কখনও ক্ষীরপুলি তৈরী করছেন। মামারা এখন শহরে, বাড়িতে কেউ নেই। মাস-দুয়েক আগে একটা কার্যোপলক্ষ্যে আবার সেখানে গিয়েছিলাম আমি। বাড়িটার আর এক রকম চেহারা দেখে এলাম। উঠোনে একহাঁটু জঙ্গল—কচু, ঘেঁটু, মনসা, আপাং, শেয়ালকাঁটা আরও কত রকম গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে উঠোনটাকে। গিরগিটি, ছাতারে পাখি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রী যে নেই তা নয়, কিন্তু নূতন রকম শ্রী।

স্বর্ণেন্দুকে দেখে মামার বাড়ির ছবি দুটো পর পর চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল সেদিন। আগে যে কথাই বলত না, সে বাক্যবাগীশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত বকে চলেছে—

বুঝলি ভাই, দরখাস্ত নিয়ে তো গেলাম লোকটার কাছে, সে আমাকে মুখে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিলে, বুঝলি ভাই, বললে ফার্স্ট ক্লাস এম.এ যখন তুমি, তখন তোমার আর ভাবনা কি, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি প্রাণপণে রেকমেন্ড করব তোমাকে। ও হরি! শেষকালে শুনলাম, সবাইকেই ওই কথা বলেছে লোকটা, আসলে ঘুষ না দিলে কিছু করবে না।

এমন অদ্ভুত একটা ছোট্ট হাসি হেসে স্বর্ণেন্দু আমার মুখের পানে চাইলে, যার অর্থ—সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়ে তো আর চাকরি নেওয়া যায় না, সুতরাং সরে পড়তে হল।

ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—

যে এঞ্জিনটা এতক্ষণ শ্‌শ্‌ করছিল, সেটা মাল-গাড়ি শান্ট করছে। খানিকক্ষণ বোধহয় ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই, আপ-ডাউন-ভাষী বাবুটি কার্বন-পেপারের ওপর পেন্সিল পিষে চলেছেন। কুলিগুলো সার সার শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বুঝলি, চাকরির চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে একটা দোকান করলাম। প্রথম প্রথম বেশ চলল কিছুদিন, বাঙালীরা সব্বাই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনতে লাগল, কিন্তু ক্যাপিটাল বেশি ছিল না, শেষ পর্যন্ত চালাতে পারলাম না, ভয়ানক কম্‌পিটিশন ভাই, বুঝলি?

আবার সেই ছোট্ট ধরনের হাসি হেসে ভয়ানক কম্‌পিটিশনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সে

নিরস্ত হচ্ছিল। আমি বললাম, বাঙালীরা সবাই কিনতে লাগল, অথচ দোকান চলল না—তার মানে?

স্বর্ণেন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ আসল কথাটা ব্যক্ত করতে তার নিজেরই যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে সাবেক কালের লাজুক স্বর্ণেন্দু যেন ক্ষণিকের জন্য আত্মপ্রকাশ করলে।

মানে, বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো, সবাই প্রায় ধারে কিনত, সব সময়ে ক্রেডিটমেমোতে সইও করত না, আর ক্রেডিট-মেমোতে সই করলেও কি আর আমি নালিশ করতে পারতাম? অনেকে বাবার বন্ধু অনেকে আমার বন্ধু সবাই প্রায় আপনা-আপনি, কিনতে এলে চক্ষুলজ্জার জন্যে 'না' বলতে পারতাম না, মানে, আমাদের বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো? একটু হেসে সে এমনভাবে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলে, যেন সে সমস্ত বাঙালী জাতির হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আমি ওর কথা শুনছিলাম না যে তা নয়, কিন্তু শোনার চেয়ে বেশি দেখছিলাম আমি ওকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর ছোট ছোট হাসির টুকরো, ওর রুক্ষ চুল দাড়ি গোঁফ, ওর আদর্শবাদ, ওর সত্যনিষ্ঠা, ওর অসহায় ভঙ্গি—সবটা মিশিয়ে নতুন ধরনের স্বর্ণেন্দু। এখন বুঝতে পারছি, বেকার-জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও হাসিমুখে টিকেছিল সত্যনিষ্ঠার জোরে। সম্ভবত একবার মাত্র মিথ্যে তথ্য ও জীবনে বলেছিল এবং বলবার পর আর বেঁচে থাকেনি।

ইন্সিওরেন্সের দালাল হয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, কিন্তু ও আমার পোষাল না ভাই, বড্ড বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া খোশামোদও করতে হয় ভয়ানক—কম্পানির খোশামোদ কর, পাব্‌লিকের খোশামোদ কর, ডাক্তারের খোশামোদ কর—দেশের অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, তাদের সুস্থ বলে চালাতে হবে তো! তুই তো নিজে ডাক্তার, তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে হয় এই নিয়ে মাঝে মাঝে, বুঝতেই পারছিস।

আবার সেই অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি, যার অর্থ—মিথ্যে কথা বলে বলে তো আর টাকা রোজগার করা যায় না, সুতরাং সরে পড়তে হল। স্বর্ণেন্দু চুপ করলে।

একটার পর একটা—অনেক কাহিনী শুনলাম, প্রত্যেক কাহিনীর শেষেই 'সুতরাং সরে পড়তে হল'—ব্যঞ্জক হাসি।

তোদের চলছে কি করে তাহলে?

অভদ্র এই প্রশ্নটা আমার জিভ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবার পেন্‌শন। বাবার মৃত্যু হলেই আমাদের মৃত্যু। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। কলকাতায় অবশ্য ছোটখাট বাড়ি আছে আমাদের একটা, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যে, তার ভাড়াটেই জোটে না।

আবার হাসলে স্বর্ণেন্দু এবং আমার মনে যে অভদ্রতার প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছিল, অজ্ঞাতসারেই তার জবাবও দিয়ে দিলে।

ভাগ্যে অবনীশ কিছু টাকা দিয়েছে, আর জ্যোতির্ময়ের একটা বাড়ি আছে মধুপুরে, তাই বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে পারছি, তা না হলে বাবার পেন্‌শনে এত সব কুলোয় কি?

অবনীশই বা কে, জ্যোতির্ময়ই বা কে?

দুজনেই আমার বন্ধু। অবনীশ বোম্বেতে বিজনেস করে, বেশ দু-পয়সা করেছে। জ্যোতির্ময় একজন আর্টিস্ট।

ও।

বংশী চা দিয়ে গেল। বংশী ঠিক চাকরের মতো খাটছে দেখলাম। বংশী চলে যেতে স্বর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, বংশী তোদের সঙ্গেই থাকে বুঝি বরাবর?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে। ওর বাপ মা কেউ নেই, আমার বাবাই মানুষ করেছেন, ওকে বি. এ পাশ করাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছেন বাবা! কিন্তু কিছুতেই ও পাশ করতে পারলে না।

বংশীর সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর উক্তিটা করে স্বর্ণেন্দুর মনে বোধহয় ঈষৎ ক্ষোভ হল, একটু হেসে বলল, এক-একজনের পরীক্ষা পাশ করবার 'ন্যাক' থাকে না, বংশী এদিকে বেশ ইয়ে আছে।

নীরবেই দুজনে চা-পান শেষ করলাম।

স্বর্ণেন্দু নিজের প্রসঙ্গ শেষ করে আমাকে নিয়ে পড়ল।

তুই কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করিস কোন্‌খানটায়?

বেনেটোলায়।

বেনেটোলার ধরণীবাবুকে চিনিস? বেনেটোলায় আমার দূর-সম্পর্কের একজন ভগ্নীপতিও থাকেন—নিখিল চৌধুরী, উকিল।

কাউকেই চিনি না আমি।

এবার গিয়ে আলাপ করিস।

ঠিকানা দিয়ে দিলে স্বর্ণেন্দু।

বেনেটোলায় কি ওঁদের নিজেদের বাড়ি?

ধরণীবাবুর নিজের বাড়ি, নিখিলদা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, অনেক দিন ধরে আছেন ওই বাড়িতে। বেশ লোক।

আচ্ছা, এবার গিয়ে আলাপ করা যাবে।

নম্বর দুটো টুকে নিলাম।

চমৎকার লিখছিস আজকাল ভাই তুই কিন্তু। রাতু তো তোর লেখার ভয়ানক 'অ্যাডমায়ারার'।

লক্ষ্য করলাম, 'ভয়ানক' কথাটা ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে স্বর্ণেন্দু। রাতু আমার লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার শুনেই বোধহয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ফেললাম, ওর বিয়ের একটা কিছু ঠিক করে ফেল্‌ এবার। আমিও চেষ্টায় থাকব। মেয়ের বিয়ে আজকাল একটা সমস্যা।

রাতুর বেলায় সমস্যা হত না, মা যদি না অবুঝ হতেন। মায়ের মাথায় যে কি ঢুকেছে, তা বলতে পারি না। জ্যোতির্ময় মানে, আমার আর্টিস্ট বন্ধুটি, ওকে এখুনি বিয়ে করতে রাজি, কিন্তু মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না; আর মায়ের মত না পেলে জ্যোতির্ময় বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। মায়ের পছন্দ অবনীশকে।

কেন?

অবনীশ দু-পয়সা রোজগারও করে, তা ছাড়া একটু ধার্মিক-গোছের, মায়ের আরও পছন্দ সেইজন্যেই বোধহয়।

অবনীশ রাজি নয় বুঝি?

অবনীশ রাজি আছে। আমরা, মানে, আমি মত দিইনি।

কেন?

ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও লাজুক স্বর্ণেন্দু পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলে, তারপর তৎক্ষণাৎ ছোট্ট

একটু হেসে সামলে নিলে লজ্জাটা। তারপর উকিলরা যেমন আসামীর পক্ষ নিয়ে বলে, তেমনই ভাবে বলতে লাগল, রাতু বেচারা মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে বলে কি তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই? নিজে সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বললে না বলে সব জেনে শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? আমি জানি—

এইটেই স্বর্ণেন্দুর লজ্জার কারণ সম্ভবত, কিন্তু সেটা খুলে বললে না সেদিন। একটু থেমে শুধু বললে, অবনীশটা নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক করে আর বার বার টাকা পাঠিয়ে মাকে হাত করেছে। মা এক রকম কথাই দিয়েছেন তাকে। অথচ আসল কথাটা জেনে কি করে আমি—

মুচকি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

একটু পরে আর একটু মুচকি হেসে বললে, এই যে রাতদুপুরে জ্যোতির্ময় ট্যাকসি হাঁকিয়ে ছুটে আসছে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল স্বর্ণেন্দু হঠাৎ খুব যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, হঠাৎ যেন লাজুক স্বর্ণেন্দুকে আড়াল করে আদর্শবাদী ভাবুক স্বর্ণেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করে ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নালের লাল আলোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সেই অদ্ভুত ছোট্ট হাসিটা হেসে কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল, থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হল একটু।

তোর মা জ্যোতির্ময়ের ওপর চটা কেন?

ঠিক উলটো। ভয়ানক ভালবাসে মা ওকে, অবনীশের চেয়ে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নয় কিছুতেই।

কেন, গরিব বলে?

জ্যোতির্ময় খুব গরিব নয়, মধুপুরে বাড়ি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে, ছবি এঁকে রোজগারও করে কিছু। কিন্তু হলে কি হবে, ভয়ানক উড়ুনচণ্ডে, বেপরোয়া, খামখেয়ালী।

তোর সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

মা-ই ওকে আবিষ্কার করেন প্রথমে কাশীতে। মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা নাকি মায়ের গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতির্ময় হবার পর ওর মা মারা যান, কিছুদিন পরে বাবাও। মায়ের গুরুদেবই জ্যোতির্ময়কে মানুষ করেছেন। জ্যোতির্ময়ের যে সম্পত্তি গুরুদেবের কাছে গচ্ছিত ছিল, সে সব জ্যোতির্ময় বড় হবার পর জ্যোতির্ময়কে দিয়েছেন তিনি।

ঢননং ঢননং ঢননং—

আমার ট্রেন এসে পড়ল, কুলিটা এসে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি শতরঞ্জি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। 'চিঠি দিস মাঝে মাঝে'—কলরবের মাঝে স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজায় নীরবে রাত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পাখাটা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গরম। একটা দমকা হাওয়ায় তপ্ত ধুলোগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। বুড়ো মুচী আর কইলু ইতর ভাষায় কলহ শুরু করে দিয়েছে। লোম-ওঠা কুকুরটা ধুঁকছে রাস্তার এক ধারে বসে। একটা টমটমের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লেগে গেল। ছিটকে পড়ল সাইকেলের ছোকরা, তারই দোষ, সে হাত ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরি করতে করতে যাচ্ছিল। টমটমওয়ালা ছুট দিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে কতকগুলো লোক ছুটল তাকে ধরতে। ঝগড়া ভুলে বুড়ো মুচী আর কইলুও ছুটল। কি অদ্ভুত আবেষ্টনী! আজ আর লিখব না। সুর কেটে গেছে। আর একদিন শুরু করা যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পৃথিবী সামান্য একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয়নি। ছানা কেটে গেলে দুধ যেমন দেখতে হয়, খোবা খোবা ছানার ফাঁকে ফাঁকে সবুজাভ ছানার জল যেমন দেখা যায়, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশের অবস্থা অনেকটা তেমনই হয়েছে। ফাটা মেঘের মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেদুর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আবিষ্ট। মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাত্রির শোভা নয়, আবছা অর্ধস্ফুট মাধুরী। দেওয়ালের ওপাশে সদ্যস্নাত হাসনুহানার ঝাড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে, টের পাচ্ছি। খোলা আকাশের নীচে বসে আছি, কিন্তু মশারির ভেতর। ভয়ানক মশা। এমন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কোনো সঙ্গিনী থাকে তো ভালই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত সশরীরে না থাকাটাই বোধহয় বেশি বাঞ্ছনীয়, অনায়াসে কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে, নীলাম্বরী তন্বী একজন বসে আছে পাশে। সেই কল্পনাসঙ্গিনী আর যা-ই করুক, কথা বলে রসভঙ্গ করবে না।

কিন্তু এসব কিছু না করে লণ্ঠন জ্বেলে আমি লিখতে বসলাম। স্বর্ণেন্দু এসে ভর করেছে। এই মেঘমেদুর জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বর্ণেন্দু প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কি-না কে জানে।

কলুটোলার মোড়ে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখাটার কথা মনে পড়ছে।

মশারির বাইরে রক্তপিপাসু অসংখ্য মশা চিৎকার করে তাই করছে, প্রচলিত ভাষায় যাকে গুঞ্জন বলে। এই রক্তলোভী মশার দল কোনো মন্ত্রবলে হঠাৎ যদি মালপোলোভী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে সবিনয়ে আমাকে বলে, আপনাকে একটা কীর্তন শোনাতে এসেছি আমরা, দয়া করে মশারিটা তুলে বসুন, তা হলে আমি যত আশ্চর্য হয়ে যাই তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন স্বর্ণেন্দুর হাতে টকটকে লাল খাপে ঢাকা চকচকে ছোরাখানা দেখে। অথচ ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। মানুষের হাতেই তো ছোরা থাকে। আসলে সেদিন শেষরাত্রে প্লাট্‌ফর্মের ওপর বসে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার মধ্যে ছোরার সম্ভাবনা ছিল না। রজ্জু সহসা সর্পে রূপান্তরিত হলেই আমরা চমকাই। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে, রজ্জু ঠিক রজ্জুই আছে। কিন্তু ওই ভ্রমের মধ্যেও যে একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিন তা বুঝিনি।

ধরণীবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছে—ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, আলাদা জাতের লোক। ধরণীবাবু লোকটি অবশ্য নিখাদ বাঙালী। চাকরি করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, পরনিন্দা করেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে 'লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ' ছাপান, লৌকিকতা গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও, দেনও; বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বাইরে সশব্দে উদগার তুলে মুখবিকৃতি করে বলেন, রিচ ফুড আর হজম হয় না মশাই। ভুঁড়ি আছে, টাকা আছে, অষ্টধাতুর আংটি আছে, হুঁকো আছে; বাড়িতে ন'হাতি কাপড় পরে মিতব্যয়িতা এবং সকালবেলা টুকটুক করে হেঁটে স্বাস্থ্যচর্চা করেন। আলাপ হবার পর থেকে এই প্রাত-ভ্রমণের মুখে মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় এসে চা-পান করতেন, এবং সেই

সময়ই স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে আলোচনা চলত। স্বর্ণেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই কারণে, যে কারণে নাকি, তাঁর ভাষায়, 'দুটো কুকুরের মধ্যেও বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব'—অর্থাৎ দায়ে পড়ে। চাকরির ঘূর্ণাবর্তের টানে দুজনেই এমন স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তৃতীয় কোনো বাঙালী ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্ব হয়েছিল, ধরণীবাবু এটাকে বন্ধুত্বই বলতেন, যদিও তাঁর কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যেত যে, এ বন্ধুত্বের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তা আত্মার নয়—স্বার্থের। ধরণীবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর পাল্লায় পড়েই নাকি তামাক খেতে শিখেছিলেন, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি, কারণ পূর্ণেন্দুবাবু বন্ধু হলেও তাঁর ওপরওলা অফিসার ছিলেন।

বাঙালী বলেই যেতে হত—ধরণীবাবু বলতেন,—সায়েবী ধাতেরই হোক আর যা-ই হোক, বাঙালী তো, নাড়ীর যোগ আছে একটা। নাড়ীর টানে যেতাম, কিন্তু আলাপ জমত না। পূর্ণেন্দুবাবু ঢিলে পাজামা পরে আর পাইপ কামড়ে যে-সব গল্প জুড়তেন, তা এমন বিদ্‌ঘুটে যে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। এই ধর না, একদিন সাফ্রাজেট্‌স্‌দের নিয়েই খুব বক্তৃতা শুরু করলেন। কি করব! সায় দিয়ে যেতাম। একদিন বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে। তারপর বললেন, তামাক ধর তুমি।

ধরণীবাবুর কথায় আমিও মুচকি হেসে সায় দিতাম। আমি ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরেই আমাকে মুচকি হেসে সায় দেওয়াটা শিখতে হয়েছিল। মুচকি হাসির সায় পেয়ে ধরণীবাবুর মনের দরজাটা আরও খুলে যেত, অনর্গল বলে যেতেন তিনি এদের কথা। তবে সমস্ত কথা যে তিনি বলেননি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে।

কলুটোলা স্ট্রীট যেখানে এসে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে, সেইখানেই হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ছে, ঠিক সেই সময় মেডিকেল কলেজের গেট থেকে একটা মড়াকে কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি করতে করতে জনকয়েক লোক কলুটোলার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক ওই মোড়ের কাছাকাছি আপাদমস্তক পেতলের বালা-পরা যে উড়েনীটা ফুটপাথে শুয়ে থাকত, তার কাছে মোটা-গোছের একজন বাবু উবু হয়ে বসে কিছু খাবার নিয়ে তাকে খাওয়াবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করছিলেন (উড়েনীর সম্বন্ধে নানা রকম গুজব প্রচলিত ছিল—কেউ বলত, ও নাকি তন্ত্রসিদ্ধ যোগিনী; কেউ বলত, স্পাই; কেউ বলত, পাগল)। হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ওপরতলা থেকে কে যেন গাইছিল—'কে যাবি পারে'। আমি এসপ্লানেডের ট্রাম থেকে নেবে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের দিকেই যাচ্ছিলাম আমার মামাতো ভাই হারাধনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য; তখনও ঠিক সন্ধে হয়নি, এজরা হসপিটালের পেছন দিকের গাছগুলোতে অসংখ্য কাকের ডাকাডাকি শুনে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, স্বর্ণেন্দু চলেছে ওপারের ফুটপাথ দিয়ে। মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমনভাবে চলেছে—যেন তার আশেপাশে আর কেউ নেই, যেন সে আর তার সমস্যা ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, এত অনাবশ্যক যে—তাদের দিকে ফিরে চেয়ে তাদের অস্তিত্বটুকু স্বীকার করবার মতোও বাড়তি সময় যেন নেই তার।

স্বর্ণেন্দু।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখতে পেল না, সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কলুটোলার ফুটপাথে কাক-কলরব-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায় তার চোখের বিস্মিত সেই দৃষ্টি এখনও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম।

ও, তুই ঘনশ্যাম!

একটু ছোট্ট হাসি, তারপর কলুটোলার ফুটপাথে তার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সলজ্জ একটু জবাবদিহি—একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম ভাই, সিটি কলেজে একটা লেক্‌চারারের পোস্ট খালি ছিল—একটু থেমে বললে, হল না, লোক ঠিক হয়ে গেছে। তারপর এমন হাসি-ভরা চোখে সে চেয়ে রইল, যেন স্বর্ণেন্দু নামক বেকার যুবকের চাকরির জন্যে এই হাস্যকর ছুটফটানিটা সে নিজে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

তোর হাতে ওটা কি?

খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল খাপে ঢাকা বাঁকা ছোরাটা।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি।

কিনলি নাকি?

না। এটা ফার্নান্‌ডিজ রাতুকে জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছে। আমাদের এখানকার ঠিকানায় পড়ে ছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

ফার্নান্‌ডিজ কে আবার?

বাবা যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, ফার্নান্‌ডিজ তখন আমাদের ড্রাইভার ছিল। প্রতি বছর রাতুর জন্যে একটা না একটা কিছু পাঠায়।

স্বর্ণেন্দুর চোখ দুটো সহসা যেন স্বপ্নাতুর হয়ে এল। বলতে লাগল, তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু তার চেহারাটা একটু একটু মনে আছে এখনও: লম্বা-চওড়া কালো-কুচকুচে চেহারা। একটু থেমে বললে,—হাবসী ক্রিশ্চান। খুব ভালবাসে রাতুকে, ও বাহাল হবার বছর দেড়েক পরে রাতুর জন্ম হয়, মানে রাতুকে জন্মাতে দেখেছে বলেই বোধহয়—' ছোট্ট হাসিটি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

খুলে দেখলাম। খাপ থেকে খুলতেই চকমক করে উঠল। স্বর্ণেন্দুর মুখখানা ছোরাটার শাণিত ফলকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল একবার: মোড়ের ঘড়িটার দিয়ে চেয়ে স্বর্ণেন্দু বললে, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই, চললাম ভাই।

মধুপুরেই ফিরে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়বাবু এসেছেন?

সেই দিনই তো ট্যাক্সি করে এসে পড়ল; তুই চলে যাবার একটু পরেই।

বাবা কেমন আছেন?

তেমনিই।

ঘাড় নেড়ে হেসে স্বর্ণেন্দু চলে গেল।

।। দুই ।।

তাড়াতাড়িতে স্বর্ণেন্দুকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, তার দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, বেশ একটু মাখামাখি হয়েছে আমার। মাখামাখি হবার

একটা স্থূল আধিভৌতিক কারণও ঘটেছিল। বিপত্নীক নিখিল চৌধুরীর কম্বাইন্ড হ্যান্ড কাহার চাকর চামেলির রন্ধন-পটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার গোকুলচন্দ্র যে মাংস রাঁধতে পারে না তা নয়, কিন্তু খুব ভাল করবার আগ্রহাতিশয্যে ধনে-হলুদ-আদা-জিরে-দই-পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কার সম্মিলনে যে বস্তু সে প্রস্তুত করে, তা শুধু যকৃতের নয়, রসিকের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ ওই চামেলির রান্নার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তা মসলার নয়—ওর নিজের বৈশিষ্ট্য। সুস্বাদটারই প্রাধান্য, উপকরণের নয়। একটা কথা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগে, এই চামেলি না থাকলে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপটা হৃদ্যতায় পরিণত হত না এবং এই উপাখ্যানের অনেকখানিই হয়তো আমার অগোচরে থেকে যেত।

সেদিন সকালে গোটা-চারেক বুনো হাঁস কিনেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট গোটাচারেক 'লালসর'। খাবার জন্যেই যখন কিনেছিলাম, তখন তাদের মৃত্যু অনিবার্য। সহসা মনে হল, গোকুল রান্না করলে এ মৃত্যু শোচনীয়ও হয়ে উঠবে। দিলাম পাঠিয়ে সেগুলো নিখিল চৌধুরীকে। সদগতি হবে।

হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে হারাধনের সঙ্গে দেখা সেরে ফিরে এসেই নিখিলবাবুর চিঠি পেলাম—

ঘনশ্যামবাবু,

লালসর শুধু বন্য হংস নহে, পরম হংস। এই কলিকাতা শহরে মহাভাগ্যবলে দৈবাৎ ইহাদের দর্শনলাভ ঘটে। আপনার উদারতার জন্য গদগদকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন, চামেলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

নিখিল চৌধুরী

না উড়লে নীলকণ্ঠ পাখির নীল-বর্ণসম্পদ যেমন সম্যকরূপে নয়নগোচর হয় না, একটু উত্তেজিত না হলে তেমনই আসল নিখিল চৌধুরীকে চেনা যায় না। সেদিন সন্ধ্যায় আহারাদির পূর্বেই খোলা ছাদে ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বর্ণেন্দুর কথা আলোচনা করতে করতে নিখিল চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক নজর আমার পানে চেয়ে হাতির দাঁতের নস্যদানিটা থেকে বড় এক টিপ র-ম্যাড্রাসী নস্যি বার করে একটু হেঁট হয়ে ঘন ঘন নাকের ছিদ্র দুটো বোঝাই করে নিলেন।

তারপর নাকের আশেপাশে-লাগা নস্যিটা না ঝেড়েই ঈষৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিছুই জানেন না আপনি।

বুঝলাম, নিখিল উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ আমি যে কিছু জানি—এ দাবি আমি মোটেই করিনি। স্বর্ণেন্দুকে উপলক্ষ্য করে যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণেন্দুতেই নিবদ্ধ ছিল না, রাত্রিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল এবং সেই আবর্তের মুখে আমি কেবল আমার সরল বিশ্বাসটুকুই ব্যক্ত করেছিলাম—কালো হলে কি হয়, চমৎকার দেখতে মেয়েটি! এ কথা শুনে প্রথমটা কিছু বলেননি নিখিলবাবু, কিন্তু দ্বিতীয়বার এ কথা বলতেই নস্যি নিয়ে উক্তিটি করলেন।

আমি পুনরায় বললাম, চমৎকার নয়?

আবার এক টিপ নস্যি তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করে কটমট করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার পানে, তারপর সশব্দে সেটা নাসারন্ধ্রে টেনে নিয়ে নাকের আশেপাশের নস্যিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হল যেন অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর! তারপর আমি কিছু বলবার আগেই স্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলেন চেকভ না শেকভ—উচ্চারণ ঠিক জানি না, তাঁর লেখা 'ডার্লিং' আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেয়া' না 'থেস' উচ্চারণ ঠিক জানি না, পড়েছেন?

পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'?

পড়েছি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কুচকুচে কালো লম্বা একটা বাঘিনী আছে, দেখেছেন?

দেখেছি।

অমাবস্যার অন্ধকার দেখেছেন একা মাঠে দাঁড়িয়ে কখনও?

দেখেছি।

চকচকে তলোয়ার দেখেছেন?

দেখেছি।

চুম্বক?

দেখেছি।

তাহলে এই সমস্তগুলির আত্মাকে আকাশের মতো বিরাট একটা কটাহে একত্রিত করে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর চাপিয়ে ডিস্‌টিল করতে থাকুন কল্পনায়। তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, করছেন?

চেষ্টা করছি।

করুন। যা হবে, দেখবেন, তা ওই ড্রয়িং-রুম-মার্কা ছোট্ট চিকমিকে 'চমৎকার' কথাটা দিয়ে বর্ণনীয় নয়।

আবার একটু থেমে বললেন 'সাংঘাতিক' বললে কিছু আভাস পাওয়া যায় হয়তো, তাও যৎসামান্য।

এর পর কি বলব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারণ নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রির একটা ঘোরতর রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে ঘটেছে, তা অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম; কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি আলোড়নযোগ্য কি না, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সাবধানতা অবলম্বন করে বললাম, আপনার আত্মীয় যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাল করে চেনেন। আমার তো সে সুযোগ—

বিরক্তিকর! আবার আপনি একটা ভুল কথা ব্যবহার করলেন অজ্ঞাতসারে। রাত্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। আমার স্ত্রী ওর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

এরপর চুপ করে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইল না। দুজনেই নির্বাক হয়ে রইলাম। চারটে বুনো হাঁসের মধ্যস্থতায় এত বড় একটা সত্যের সম্মুখীন হতে পারব, তা আমি কল্পনাই করিনি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিখিলবাবু বললেন, এখনও কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি, ঘৃণাও করি। বিরক্তিকর।

বললাম অর্থাৎ না বলে পারলাম না, আপনার সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক তাকে অনায়াসেই তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন আপনি।

দুটো বাধা ছিল। প্রথমত—পূর্ণেন্দুবাবু, পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, রাত্রি এরা ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে, অন্তত আমার তাই

ধারণা। আর দ্বিতীয়ত—আমিও ঠিক সেই ধরনের উদার লোক নই, যে সব জেনেশুনে একটা প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

একটু ইতস্তত করে একটু হেসে বললাম, কিন্তু প্রেম তো আপনার সঙ্গেই হয়েছিল।

নিখিল সশব্দে আর এক টিপ নস্য টেনে নিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, রাত্রির আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আবার একটু থেমে বললেন, দিনের আকাশেও অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু দেখা যায় না। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে 'বিরক্তকর' কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেছিলেন নিখিল চৌধুরী, কিন্তু গোলমালে আমি শুনতে পাইনি, একটা দ্রুতগামী লরির ঘড়ঘড় শব্দের তলায় শেষের দিকের কয়েকটা কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

নিখিলবাবুর মুখে সেদিন যা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতির সঙ্গে আর একটা শ্রুতিস্মৃতি মিলিয়ে দেখছি। একদিন লুকিয়ে তার কান্না শুনেছিলাম। নিখিল চৌধুরী-বর্ণিত অগণ্য নক্ষত্রময়ী রাত্রির পাশে মেঘভারাক্রান্ত বর্ষণমুখর রাত্রির ছবিটি রেখে বিস্মিত হয়ে দেখছি। এই বাড়িতেই গভীর রাত্রের নির্জন অন্ধকারে ওই পাশের ঘরটায় সে লুকিয়ে কাঁদছিল। এই ছাতেরই এক প্রান্তে আধখোলা জানলাটার পাশে অন্ধকারে আমি যে সবিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা সে জানত না। মাঝে মাঝে ভাবি, জানলে সে কি করত ? হয়তো হেসে উঠত। তার কলকণ্ঠের অট্টহাস্য ভীরু অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের মতো ঝকমক করে উঠত হয়তো। কিন্তু সে দেখতে পায়নি। আমি কিন্তু দেখেছি, শুনেছি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে।

আমি জানতাম না, (এখনও অবশ্য কতটুকুই বা জানি!) তাই একটু সসঙ্কোচে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবনীশ জ্যোতির্ময় কি তখনও ছিল?

না, এদের নাম তখন শুনিনি, অন্তত মনে পড়ছে না। তখন ছিল খগেন, সৌমেন্দ্র, তপেশ, জমীর বলে এক মুসলমান ছোকরা, হারুবাবু নামে এক বুড়ো ডেপুটি, আর নিখিল চৌধুরী। অর্থাৎ এদের কথা আমি জানতাম, আরও অনেকে ছিল নিশ্চয়। একটু থেমে আবার বললেন, ওদের বাড়িটায় পুরুষদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল যে তখন।

আড্ডা ছিল?

রীতিমতো। হবে না? যে বাড়িতে অমন চমৎকার চা তৈরি হয় এবং তা যখন খুশি গেলে পাওয়া যায়, যে বাড়িতে বাজি রেখে ব্রিজ খেলা হয় এবং খেলার সঙ্গিনী হিসেবে রাত্রির মতো মেয়েকে পাওয়া যায়, যে বাড়ির গিন্নি—গড নোজ হোয়াই—সংসার ছেড়ে তীর্থে তীর্থে গুরুদেবের সেবা করে বেড়ান, যে বাড়ির কর্তা সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে তা বলশেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সে বাড়িতে পুরুষমানুষের—মানে আমাদের মতো পুরুষমানুষের আড্ডা হবে না তো কি হবে?

কোথায় ছিলেন আপনারা তখন?

এই কলকাতা শহরেই! পূর্ণেন্দুবাবু তখন ছ'মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তখনও পক্ষাঘাত হয়নি তাঁর?

আরে না না, তখনও তিনি রকেটের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। বছর তিনেক আগে আর কি।

নিখিল চৌধুরী আবার একবার নস্যি নিলেন।

আমি তখনও সিগারেট ধরিনি, অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ডগাটা পাকাতে লাগলাম।

বিরক্তিকর!

নিখিলবাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্বর্ণেন্দুও কি আপনাদের আড্ডায় যোগ দিত?

না। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়, এম. এ. পড়ছিল!

ও তো স্কটিশে আমার সঙ্গে পড়ত!

পরে লক্ষ্ণৌ চলে যায়।

স্বর্ণেন্দু আমার সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিল বলে তাকে যতটা আপন বলে মনে হচ্ছিল, এই সামান্য সংবাদটায় সেই আত্মীয়ভাবটা কেমন যেন খানিকটা কমে গেল। আমি ভাবছিলাম—

হঠাৎ ছ'ফুট লম্বা নিখিল চৌধুরী আমার দুই কাঁধে থাবার মতো দুটো হাত রেখে বললেন, সাবধান হোন।

এ অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে—ভাষায় সাহায্যে আত্মগোপন—আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না, চামেলি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

দু'জনে নীচে নেমে গেলাম।

এমন চমৎকার 'ডাক-রোস্ট' আমি আর কখনও খাইনি। নিখিলবাবু কিন্তু দেখলাম খুব খুশি হননি। কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগলেন এবং অতি সব তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার করে চামেলিকে ধমকাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলাম, এইটেই তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরন। তিনি তাঁর এই ছিপছিপে কালো কাহার ভৃত্যটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই তুচ্ছ অলীক কারণে তাকে ধমকান। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো নিখিল চৌধুরীও অবশ্য নিজেকে লুকোতে পারেননি, চামেলি সব বুঝত। নিখিলবাবু যখন তাকে ধমকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে যদিও সে শুষ্কমুখে অপরাধীর মতো ভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল।

যেন ছাতে কোনো আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে আমরা নেবে এসেছিলাম, এমনই একটা মনোভাব নিয়ে খাওয়া শেষ হতেই যন্ত্রচালিতবৎ আবার আমরা দু'জনে ছাতে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম—যদিও দু'জনেই একই কথা ভাবছিলাম, এবং আশ্চর্যের বিষয়, দু'জনেই তা বুঝতে পারছিলাম। নিখিলবাবুর একটা কথা ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল—এরা কেউ ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে। কথাগুলোর নানা রকম অর্থ করা যায়। আমার সহসা কৌতূহল হল, নিখিলবাবু কি অর্থে কথাগুলো ব্যবহার করলেন, কে জানে? কৌতূহলটাকে বাঙ্ময় করলাম যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আকার দিয়ে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠে।

মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে, আজকালকার দিনে, যাকে-তাকে বিয়ে করতে চায় না। স্বর্ণেন্দুর কথাটারই পুনরুক্তি করলাম, তাদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো!

বড় মানে কি, কত বয়সের মেয়েকে আপনি বড় বলেন?

শুধু নিখিল চৌধুরীই নয়, অনেকেই দেখেছি, কোনো একটা জিনিস বুঝেও যখন না বুঝতে চান, তখন তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন। পৃথিবীতে প্রায় সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে—এই সত্যটার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করবার প্রয়াস পান। হলও তাই।

আমি যেই বললাম—এই ধরুন ষোল-সতেরো, শিকারের ওপর ঝম্পোন্মুখ শিকারী পশুর

চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, নিখিল চৌধুরীর চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল। এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, তার ঢের আগে আপনার ওই রাত্রি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের চোটে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একদিন। তখন ওর বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে।

সশব্দে নস্যিটা টেনে নিলেন।

হয়েছিল কি?

বিয়ের কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়েছিল, বরের কানে একটু খুঁত ছিল বলে।

কানে?

হ্যাঁ, কানে। ঠিক কাটা নয়, কানটা একটু মোড়া-গোছের ছিল।

কি রকম?

পূর্ণেন্দুবাবু আশীর্বাদ করতে যান, তখন সেটা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিল বলে দেখা যায়নি।

আশীর্বাদ করবার সময় বর পাগড়ি পরে ছিল নাকি?

হ্যাঁ। ছেলেটি পশ্চিমেই মানুষ, পশ্চিমেই থাকত, তাই পাগড়ি পরাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল তখন সকলের। আসল কারণটা বোঝা গেল বিয়ের ঠিক আগে, টোপর পরবার সময়।

নিখিল চুপ করলেন।

আমি বলতে গেলাম, জোচ্চোরকে বিয়ে না করে তো ঠিকই—

বিরক্তিকর! আমি কি বলছি, বেঠিক করেছিল? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, অন্য কোনো মেয়ে ঠিক এমনটা করত না ওই বয়সে।

আমি মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম ছবিটা। টোপর-পরা বরের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর উঠে গেল সে। পরনে লাল চেলী, কপালে কনে চন্দন।

পূর্ণেন্দুবাবু সেই একটিবার মাত্র সম্বন্ধ করে ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, আর করেননি। একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বললেন, ওর মায়ের জন্যে আর সম্ভবও হয়নি।

মায়ের বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল নাকি খুব।

নিখিল চৌধুরী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন কি না এবং জানলেও দিতেন কি না জানি না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে টং-টং করে বারোটা বেজে উঠতেই দু'জনে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হতে বাধ্য হলাম। নিখিলবাবু বললেন, বিরক্তিকর! কাল আবার সকালেই কোর্ট আছে আমার।

আমারও একটি রোগীকে ভোরেই ইনজেক্শন দেবার কথা ছিল। সুতরাং উঠতে হল। কিন্তু বেশ মনে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই উঠেছিলাম সেদিন। নিখিলবাবুকে এতক্ষণ ধরে একা পাবার সুযোগ আর একদিন মাত্র ঘটেছিল আমার। সেদিনও প্রসঙ্গ এই, কিন্তু 'পরিস্থিতি' বিভিন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

আমি গোড়াতেই বলেছি, রাত্রির সবটা আমি দেখিনি। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি এবং অনেকখানি কল্পনা করেছি। যদিও সকলের সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান এই তিনটি জিনিসের যোগ-বিয়োগের ফল, তবু রাত্রির সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশি করে মনে রাখা উচিত এই কারণে যে, এ ক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণাটা আমাদের মনে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা, যে ধারণাটার স্বরূপ সমাজ-স্বার্থের দিক থেকে, কিন্তু—না থাক্। বাক্যের আবর্তে আপনাদের সহজ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলতে চাই না। আমি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনা করে যাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বকীয়তা অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। কেবল সত্যনিষ্ঠার খাতিরে এইটুকু শুধু আমি বলছি যে, ঘটনাগুলির মধ্যে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। 'যথাযথ' শব্দটাকেও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিলে চলবে না। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের বর্ণনা কখনও যথাযথ হতে পেরেছে? 'পারম্পর্য নেই'--এ কথাটা যে তুচ্ছ করবার মতো নয়, একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বিছুটি-লতার সুনাম নেই। মনে করা যাক, আপনি এই বিছুটির পাতা দেখেছেন, শিকড় দেখেছেন, বীজ দেখেছেন, অখ্যাতি শুনেছেন এবং সংস্পর্শও লাভ করেছেন; কিন্তু বিছুটির জীবনের সেই কটা দিন হয়তো আপনি দেখেননি, যখন সে ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি পুষ্পালঙ্কৃতা রূপান্তরিতা বিছুটিকে একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে কোনোদিন দেখতেন, তা হলে হয়তো বিছুটির সম্বন্ধে আপনার ভূতপূর্ব তিক্ত ধারণায় হঠাৎ খানিকটা মাধুর্য সঞ্চার হত। আপনার অজ্ঞাতসারেই বিছুটির বিজ্ঞানসম্মত বদনাম সত্ত্বেও আপনার মন অনেক রকম দার্শনিক তথ্য, সত্য-অসত্যের অভিন্নতা, স্বপ্নের বাস্তবতা, আপাতদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা—নানা রকম উদ্ভট আলো-আঁধারির মোহ সৃজন করে অসহায় আত্মহারা ভাবে বিছুটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যুক্তি আহরণ করতে ব্যস্ত হত। অর্থাৎ বিছুটি নামক বিষাক্ত-উদ্ভিদটির জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পর পর দেখবার সুযোগ যদি কারও ঘটে, তা হলে বিছুটির ওপর চটে থাকা অসম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিছুটির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি বিছুটির জীবনে স্বল্পকাল থাকে এবং অধিকাংশ লোকের তা নয়নপথবর্তী হয় না।

আমি যে রাত্রির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম তা নয়; কিন্তু কল্পনা করতে ক্ষতি কি, বিশেষত সে কল্পনার যখন অতি স্বাভাবিক একটা ভিত্তি আছে। নিখাদ বাঙালী ধরণীবাবুও কল্পনা করেন, 'ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, ওরা আলাদা জাতের লোক।' আমারই বা কল্পনা করতে বাধা কি যে, রাত্রির জীবনেও একদিন অতিশয় স্বাভাবিক নিয়মে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল, যে ফুলের সৌরভ শুধু অলিকুলকেই নয়, রাত্রিকেও আবিষ্ট করেছিল, যে আবেশের মোহে সে ভেবেছিল--অলিদের নয়; বসন্তকেই সে বন্দী করে রাখতে পারবে তার পুষ্পিত কারাগারে!

আমার বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু তার এই প্রস্ফুটিত রূপটি দেখেছিল,—শুধু দেখেনি, মিলিয়ে

দেখেছিল তার নিজের অপুষ্পিত ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে। তা না হলে—কিংবা হয়তো তার মায়ের কথা—না, কারণটা এখনও ঠিক জানি না আমি। কিন্তু স্বর্ণেন্দুর, সেই আদর্শবাদী স্বর্ণেন্দুর নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা ভুলতে পারি না আমি কিছুতে। অতিশয় শান্তভাবে কেবল সে বলেছিল, আমি করেছি। কোনো উত্তেজনা, কোনো বাহাদুরি, কোনো উত্তাপ ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। তাই আমার মনে হয়, রাত্রির পুষ্পিত জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যর্থ জীবন সে মিলিয়ে দেখেছিল এবং—। কিন্তু এ সব আমার কল্পনা। ঘটনাটা শুনুন।

নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রিদের সম্বন্ধে আলোচনা হবার প্রায় ছ'মাস পরে ঘটনাটি ঘটেছিল। এই ছ'মাস আমি এদের কারও কোনো খবর পাইনি, রাখিওনি। সেদিন রাত্রে নিখিলবাবুর সাবধান-বাণী অনুসরণ করেই যে আমি এদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম তা নয়, ধরণীবাবুর আলোচনা শুনেও আমার মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হয়নি, রাত্রির সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছিল; তবু এদের সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করিনি—সম্ভবত মজ্জাগত সেই স্বভাবের প্রভাবে, যার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়ে কোনো কিছুই করি না, যা চোখে পড়ে তাই দেখি, যা কানে ঢোকে তাই শুনি। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ছ'মাসের খবর যদি আমি রাখতাম, অন্তত চিঠি-পত্রেরও আদান-প্রদান যদি চলত, তা হলে হয়তো খবরের কাগজে কাহিনীটা যত বীভৎসভাবে বেরিয়েছিল আমি তার প্রতিবাদ করতে পারতাম; এবং এই কাহিনীতে কল্পনায় যে সত্যটা অনুভব করছি, প্রত্যক্ষদর্শনের জোর পেলে—কিংবা হয়তো ভুল বলছি—প্রত্যক্ষদর্শনের উগ্রতাটা এত বেশি যে তার দাপটে সূক্ষ্ম সত্য অনেক সময় মারা পড়ে। কল্পনার সূক্ষ্ম জালেই সূক্ষ্ম সত্য ধরা যায়। সবটা প্রত্যক্ষদর্শন করলে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তিই থাকত না হয়তো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিস্পেন্সারি থেকে ফিরলাম প্রায় সাতটার পর। নানা কারণে মনটা ভাল ছিল না। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো রুগী মরেছিল, আরও দুটো মর-মর হয়েছিল, একজন বড়লোক ভাটিয়ার বাড়িতে দুটো সঙিন-গোছের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। অল্পদিন মাত্র ঘরটায় ঢুকেছিলাম, দু'দুটো মৃত্যু ঘটে গেল, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির সঙিনতার নয়, আমারই বদনাম হবে। ঘোষদের বাড়ির টাইফয়েডটাকে পথ্য দিয়েছিলাম, বিকেলের দিকে শোনা গেল, তার একটু জ্বর হয়েছে। সকালবেলা শুভবিবাহ-মার্কা যে নেমন্তন্নের চিঠিখানা পকেটে পুরেছিলাম সেটার কথা মনেই ছিল না। বাড়ি ফিরে পকেট থেকে স্টেথস্‌কোপ বার করতে গিয়ে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিতে সারা মনটা ভরে গেল। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু যেতে হবে তা নয়, একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতে হবে। এড়াবার উপায় নেই, কারণ ধনী জমিদার রায় মশাই একজন মস্ত বড় পেট্রন আমার। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে কোমরে গামছা বেঁধে দই পরিবেশন করতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত টাকা পাঁচেকের মত দিশী বিলিতী জাপানী জার্মানী যাই হোক কিছু একটা শৌখিন দ্রব্য কিনে ঠোঁটে ভদ্রতার হাসিটি ঝুলিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করতেই হবে গিয়ে। অভিনয় করা শক্ত হবে না, কিন্তু কি জিনিস কেনা যায় তাই একটা সমস্যা। কারণ জিনিসটা তো আর অভিনয় করবে না। ফুলদানি, টয়লেট-সেট, টি-সেট, নিটিং-সেট, রাইটিং-সেট—নানা রকম সেটের কথা মনে হল, কিন্তু একটাও মনঃপূত হল না। শাড়ির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। পাঁচ টাকা দামের শাড়ি রায় মশায়ের মেয়ে ক্বচিৎ কখনও পরলেও পরতে পারে হয়তো, কিন্তু সে শাড়ি উপহারের ভিড়ে

কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই তো উপহার দেওয়া। মনে হল, তেমন কিছু পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ধড়াচূড়া ছেড়ে স্নান করলাম। স্নানান্তে এক কাপ চা খেয়ে একটু প্রফুল্লিত হলাম। মনে হল, দুলাল সাধুর শরণাপন্ন হলে সে পাঁচ টাকার মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, গোকুল এসে পথরোধ করলে।

আজ রায়দের বাড়ি নেমন্তন্ন না তোমার?

সেইখানেই তো যাচ্ছি।

কাপড়-চোপড়গুলো বদলে যাও, ও-রকম ময়লা জামা-কাপড় পরে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি কেউ?

জানি, প্রতিবাদ করা বৃথা।

বললাম, শিগগির দে তা হলে।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বাবুধাক্কা-পাড় কাপড়, ফিতে-বসানো পেটেন্ট লেদারের কালো পাম্প-শু, মায় রূপো দিয়ে বাঁধানো শৌখিন ছড়িটি পর্যন্ত এনে হাজির করলে গোকুল। আলমারি খুলে এসেন্সের শিশি বার করে পাট-করা রুমালে এসেন্সও ঢালতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোকেরই যখন মন রেখে চলেছি, বস্তুত সমাজ-জীবন মানেই যখন একনাগাড়ে সকলের মন রেখে চলা, তখন গোকুলকেই বা মনঃক্ষুণ্ণ করি কেন? কোনও আপত্তি করলাম না।

বেশি রাত করো না যেন।

আচ্ছা।

তখন কি জানি, রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!

আমার সচেতন সত্তা জানত না যদিও, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, অবচেতন মনের কোনো স্তরে সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল বোধহয়, এবং সেইজন্যেই আমি বোধহয় আমার কিছুক্ষণ আগেকার উপহার-বিরোধী মনোবৃত্তি সত্ত্বেও—না, ভুল বলছি—আসলে সেটা দুলাল সাধুর কীর্তি—আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা সেই মনিহারী দোকানটির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হলাম, যার একচ্ছত্র মালিক শ্রীদুলালচন্দ্র সাধু। একাধিক কারণে দুলাল সাধুর অসাধুতার নানা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আমি সব জিনিস তার দোকান থেকেই কিনি। প্রথমেই বলেছি, চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। দুলাল সাধুর চোখ দেখেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। বড় ট্যারা চোখ। যখন মনে হবে, দুলাল সাধু রাস্তার ষাঁড়টার দিকে চেয়ে আছে, তখন কিন্তু সে নিরীক্ষণ করছে আপনাকে। তখন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকস্মিক ভর্ৎসনা ঘনিয়ে উঠতে দেখে আপনার মনে আতঙ্ক সঞ্চার হচ্ছে, তখন তার 'মাপ কর বাবা, এখানে হবে না' শুনে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীটিকে দেখে আশ্বস্ত হবেন। ওর অদ্ভুত ট্যারা চোখই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে প্রথমে। পরিচয় পেয়ে আরও আকৃষ্ট হলাম। অতি অমায়িক লোক। যখন গলা কাটছে, তখনও অমায়িক। পৃথিবীতে গলা তো সকলেই কাটে, অমায়িক কজন হয়? আমার বিশ্বাস, এটা ওর নিছক ভণ্ডামির আবরণ নয়, এটা ওর বিশেষ একটা গুণ। 'আপনি হলেন ঘরের লোক'—এটা শুধু ওর মুখের কথা নয়, আচরণেও সেটা ফুটিয়ে তোলার শক্তি আছে ওর, কেবল মুখের কথায় মানুষ বরাবর ভোলে না, খানিকটা আন্তরিকতাও থাকা চাই।

তৃতীয়ত, ধার দেয়। সকলকে দেয় না, লোক বুঝে দেয়। দুলাল সাধুর এইটে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা। ট্যারা চোখের এক চাউনিতেই ও বুঝে নেয়, লোকটা কোন্ জাতের, একে ধার দেওয়া চলে কি না।

.আমি যখন দুলাল সাধুর দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেচারা ভারি ব্যস্ত। নানা-রঙের শাড়ি-পরা এক ঝাঁক কলেজের মেয়ে তাকে ঘিরে ছিল। দুলাল যে কখন কার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তা বোঝবার উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক, ফরসা লম্বা মেয়েটি যখন মনে মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে মুখে একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করছিল, তখন দুলাল তাকে দেখছিল না, তখন দুলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খুব সম্ভব বাঁ ধারের শ্যামবর্ণাটির ওপর। শ্যামবর্ণা মেয়েটি নিজেকে যখন বিব্রত মনে করতে লাগল, তখন দুলালের দৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর—

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু আসুন, বসুন।

বসব না আর, আমাকে টাকা পাঁচেকের মতো কিছু একটা দিন তো—বিয়ের উপহার।

এক মিনিট, এক্ষুনি দিচ্ছি। ওরে ভোঁদড়, পান দে ডাক্তারবাবুকে।

বলা বাহুল্য, একাধিক মিনিট বসতে হল।

বসে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম মেয়েগুলিকেই। মুগ্ধ নয়, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। নানা রকম লোভনীয় মনিহারী জিনিসের দিকে সঞ্চরমান ওদের দৃষ্টিতে সে দিন যে লুব্ধতা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা ভুলব না কোনোদিন। চোখ দিয়ে ওরা জিনিসগুলোকে গিলছিল যেন। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আমার যথাসর্বস্ব খরচ করে কিনে দিই ওদের জিনিসগুলো। ট্যারা দুলাল সাধুর সামনে ওদের ওই লুব্ধতা আমারই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করছিল যেন। কিন্তু আমার যথাসর্বস্ব আর কতটুকু! খুব বেশিও যদি থাকত, তা হলেও ওদের তৃপ্ত করতে পারতাম না। হুতাশনকে ঘি খাইয়ে তৃপ্ত করবে কে? অনেক দর কষাকষি করে (সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এ বিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু) একখানি মাত্র শাড়ি কিনে চলে গেল ওরা। শাড়ির দরকার ছিল একজনের, বাকি ক'জন বোধহয় পছন্দ করতে এসেছিল।

এইবার ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি দোব বলুন? ওহে জগু, ফ্যানটা খুলে দাও ওদিকের।

টাকা পাঁচেকের মতো যা হোক একটা কিছু দিন শৌখিন-গোছের—বিয়েতে উপহার।

সসম্ভ্রমে দুলাল বললে, রায়েদের বাড়ির জন্যে বুঝি?

হ্যাঁ।

সামনের তাকে রক্ষিত গণেশের দিকে চেয়ে দুলাল হুকুম করলে, ওহে চণ্ডী, ওপর থেকে নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আন তো, সাবধানে এনো।

একটু পরে চণ্ডী নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আনলে, এবং দুলাল সাধু সসম্ভ্রমে সেটা খুলে দেখাতে লাগল।

এর পাঁচ টাকা দাম?

দাম কিছু বেশি। কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে জিনিস যাবে, দামের দিকে লক্ষ্য রাখলে তো চলবে না আমার।

শাড়ি-ব্লাউজ পরা ডামিটার দিকে চেয়ে দুলাল সাধু মুচকি হেসে এমন ভাব প্রকাশ করলে, যা সত্যিই অবর্ণনীয়। তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম, আমার সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি নেই যে!

দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, নাও যদি দেন তাও সহ্য হবে আমার. কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে চার-পাঁচ টাকা দামের খেলো জাপানী জিনিস পাঠাতে পারব না আমি।

ডামিটার দিকে এমন মর্মাহতভাবে চাইলে সাধু যে, আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

সকলেই প্রশংসা করেছিল আইসক্রীম-সেটটার। রাত্রি প্রশংসা করেছিল আমার রুচির। বছর-খানেক পরে দুলাল বিল পাঠিয়েছিল—চল্লিশ টাকা পনেরো আনা।

রায় মশায় আমাদের পাড়ার বর্ধিষ্ণু লোক। সুতরাং এ পাড়ার অতিপরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাইরের লোকও অনেক ছিল। শামিয়ানার তলায়, টিনের চেয়ারে, বৈঠকখানা ঘরের বিস্তৃত ফরাশে, বারান্দায়, সামনের একটা তাঁবুতে—চতুর্দিকে গিজগিজ করছিল নিমন্ত্রিতের দল। কুলির মাথার নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেট সহ আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ভাগ্যে গেটে কেউ আটকায়নি, কারণ, যে কার্ডখানা গেটে প্রদর্শন করবার কথা সেটা আমি আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, কন্‌সার্ট, লাল নীল হলুদ সবুজ ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকরা-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নজনিত চেঁচামেচি—সমস্তটা মিলে একটা প্রলাপ যেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একটা প্রলাপ যে আমাকে শুনতে হবে—বংশীর প্রলাপ—তা তখন কে জানত!

।। দুই ।।

বংশী যে প্রলাপ বকবে, তা বোধহয় রাত্রিও জানত না, জানলে সে আমাকে নিয়ে যেত না সঙ্গে করে। অবশ্য রাত্রি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, এটা ঠিক সত্য কথা নয়; আমিই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিছুই সম্ভব হত না, যদি কান্তি পালের সঙ্গে দেখা না হত।

অগ্রগামী কুলির মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেট নিয়ে রায় মশায়ের বিরাট চৌহদ্দিতে যেই আমি ঢুকলাম, অমনিই দেখা হয়ে গেল কান্তি পালের সঙ্গে। সেদিন কান্তি পালের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আমি এখন আর আকস্মিক বলে মনে করি না। আমার মনে হয়, নিয়তির এই চক্রান্তের মধ্যে কান্তি পালের স্থান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

কান্তি পাল লোকটি কান্তিমান লোক নন। রোগা বকের মতো চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো—কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়, প্রত্যহ তো নয়ই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নগ্নগাত্রে একখানা ভিজে লাল গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে বিজন করছিলেন তিনি ম্যাগ্‌নোলিয়া-গ্রান্ডিফ্লোরা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি তাঁকে দেখতে পাইনি। তিনিই এগিয়ে বললেন, ডাক্তার যে, এস এস, কুলির মাথায় ও কী!

উপহার একটা।

ও নিতু, ডাক্তারবাবুর এই জিনিসটা মাঝের হল-ঘরে রাখিয়ে দাও—বেশ সামনের দিকে রাখিয়ে দিও।

নিতু এসে কুলিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। হল-ঘরে উপহারের একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

কান্তি পাল বললেন, উঃ, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে আমার। আবার বনবন করে গামছা ঘোরাতে লাগলেন এবং আমি কিছু বলবার আগেই বললেন, সকাল থেকে ক'ব্যাটা উড়েকে নিয়ে প্রকাণ্ড উনুনের সামনে—উঃ!

কান্তি পালকে আমি চিনি, তিনি আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছিলেন, তাও আমার অবিদিত ছিল না। বললাম, আপনি বলেই পারেন এ সব, আমরা হলে মরে যেতাম।

আর পারি না ভাই, বয়স তো হচ্ছে। চল, তোমাকে বসিয়ে দিই গে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না, ও ধারের বারান্দার কোণে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানেই চল। একটা ফ্যানও আছে সেখানে, আরামে বসতে পারবে।

তারপর যেতে যেতে বললেন, উঃ, মনে হচ্ছে, দুটো রগে দুটো ইস্কুরুপ কে যেন প্যাঁচকষ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে!

কান্তি পালের এই বৈশিষ্ট্য। শিবহীন যজ্ঞ বরং সম্ভব, কিন্তু এ পাড়ায় কান্তি-পাল-হীন 'যগ্যি' অসম্ভব। সকাল থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রান্না-বান্নার তদারকের ভার নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকবে, কান্তি পাল তত গম্ভীর হতে থাকবেন এবং ক্রমশ চেনা-শোনা য'র সঙ্গে দেখা হতে থাকবে, তার কাছেই চুপি চুপি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে নিজের একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করে 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা'-মার্কা এমন একটা নিদারুণ রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন (গোপনে গোপনে কিন্তু) যে, শ্রোতাকে সহানুভূতি-মিশ্রিত দু'চারটে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতেই হবে। কান্তি পাল এর বেশি আর কিছু চানও না। অসুখের প্রতিকারকল্পে কেউ যদি কোনো ব্যবস্থা করতে যায়, কান্তি পাল বলবেন, না থাক্। সমস্ত দিন রান্নাঘরে ঘোরা-ফেরা করবেন, কিন্তু খাবেন না এবং রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এক গ্লাস শরবত কিংবা বড় জোর একটা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যাবেন।

কান্তি পাল আমাকে নিয়ে গিয়ে যে স্থানটিতে বসিয়ে দিলেন, সে স্থানটি আমি এই ভিড়ের মধ্যে নিজে খুঁজে বার করতে পারতাম না এবং তা না পারলে পরবর্তী ঘটনাপরম্পরা আমার জীবনে ঘটত কি না সন্দেহ। আমার সহানুভূতিসূচক কথায় বিগলিত হয়ে কান্তি পাল যেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেটা অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা নয়। সেটা পেছন দিকে অন্দর-মহলের কাছাকাছি একটা স্থান। খুব পরদানশীনও নয়, খুব প্রকাশ্যেও নয়। মেয়েরাও বসতে পারে, পুরুষেরাও বসতে পারে। সেখানে ছিল একটা গোল টেবিলের চারপাশে খান কয়েক চেয়ার, মাথার ওপর একটা পাখা। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল বটে, কিন্তু সেখানে থামছিল না কেউ। এই ভিড়ের বাড়িতে এমন একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ফ্যানটি খুলে দিয়ে কান্তি পাল মুচকি হেসে বলে গেলেন, ওদিক পানে চেয়ো না যেন।

তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে চেয়ে দেখলাম, একটু দূরে একটি বিস্তৃত ঘরে নিমন্ত্রিতা ভদ্রমহিলারা সমবেত হয়েছেন। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। তাঁরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনে হল, বুনো রামনাথের স্ত্রী এঁদের মধ্যে নেই। হাতে শাঁখা (এমন কি অভাবে লাল সুতো), সীমন্তে সিঁদুর, আর সাধারণ সাদাসিধে সুতোর কাপড় পরে যে মহিলা সগৌরবে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, এই মেকী প্রজাপতির দলে তিনি নিশ্চয়ই নেই। বুনো রামনাথের স্ত্রীর আত্মমর্যাদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কেবল তাঁর স্বামীর ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর, আর এই মেকী প্রজাপতিদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কেবল তাদের স্বামীর উপার্জন কিংবা ধার করবার ক্ষমতার ওপরই নয়, সৎ-অসৎ ভদ্র-অভদ্র নানা উপায়ে সেটা জাহির করবার প্রচেষ্টার ওপর। এদের আত্মসম্মান পরিপুষ্ট হয় সোফা-সেটি-মোটর-বসন-ভূষণ কিনেই নয়, তা অধনী-অধন্যদের চোখের সামনে নানাভাবে আস্ফালন করে। অন্তরের ঐশ্বর্যের কথা কেউ আজকাল ভাবেই না, বাইরের ঐশ্বর্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। তাই নানা রঙের কাপড় নানা ঢঙের গয়না পরে মুখে পাউডার ক্রীম ঘষে আন্তরিকতাবর্জিত হাসি হেসে প্রাণপণে সবাই অভিনয় করে চলেছে। সবাই সবাইকে সমালোচনাও করছে মনে মনে, মুখের ভদ্র হাসিটুকু বজায় রেখে। কার স্বামী কেরানি এবং কার স্বামী সেই কেরানির প্রভু, তা বোঝবার উপায় নেই তাঁদের স্ত্রীদের দেখে। গয়না-কাপড়ের দৌলতে সবাই রাজরানি। পেট ভরে খায় না, মনুষ্যত্বের চর্চা করে না, কিছু রোজগার করে তা দিয়ে ঠুনকো ঐশ্বর্যের সস্তা চাকচিক্য কিনে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। বুনো রামনাথের স্ত্রীর নিরলঙ্কৃত মর্যাদাবোধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়তো একরকম কম্‌প্লেক্স; কিন্তু এই দরিদ্র পরাধীন দেশে গয়না-কাপড়-সর্বস্ব কুটো-আভিজাত্য-কম্‌প্লেক্সের চেয়ে দারিদ্র-কম্‌প্লেক্স ঢের বেশি শ্রেয় এবং সম্মানার্হ। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে ঢের কম রোজগার করে ঢের বেশি সুখে ছিলেন, কারণ তাঁদের মর্যাদাবোধ আর্থিক ছিল না, আত্মিক ছিল। সুখে জীবনযাপন করবার জন্যেই অর্থ, অর্থের জন্য জীবনযাপন নয়--একথা আমরা ভুলে গেছি বলেই যে কোনো ধনী দুরাত্মার কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাথা নোয়াতে পেলে ধন্য হয়ে যাই।

পলাশির যুদ্ধ—রামমোহন রায়—বিদ্যাসাগর—বঙ্কিম—বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ একশো তিরাশি বছর মনের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল।

দিস ইজ ক্যালকাটা কলিং--

চাল-ডালের দর থেকে আরম্ভ করে বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের সংবাদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সেতারে কানাড়ার আলাপ, মধ্যযুগের সাধনা, আবৃত্তি, নাটক, ফুটবল খেলার ফলাফল তারস্বরে একের পর এক শূন্যে চিৎকার করে মরছে—পান-বিড়ির দোকানেও, মহারাজার প্রাসাদেও। আর এই গান! বাংলা ভাষা যারা বোঝে না, তারা হয়ত ভাবে, বাংলা দেশ জুড়ে মড়াকান্না উঠেছে। কিন্তু কাঁদবে কে? একটা মড়া কি আর একটা মড়ার শোকে কাঁদে কখনও? কান্না নয়, গানই হচ্ছে, ভাষা বুঝলে গানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত—কেউ মরেনি, সবাই বেঁচে আছে এবং এত আনন্দে আছে যে, অষ্টপ্রহর গান গাইছে সবাই।

টর্চের আলো নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেয় যেমন করে, আমার মনের তমিস্রাকে বিচ্ছিন্ন করে পাশের ঘরে তেমনই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, কে আপনি, সবিতা দেবীর বাড়িতে স্বর্ণেন্দুবাবু খবর পাঠিয়েছেন? রাত্রিকে ডাকছেন? কি বলব তাঁকে? একা রুগী সামলাতে পারছেন না? আচ্ছা, আমি দেখছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি ওদিকের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে আমি দেখতেই পেলাম

না। আমার মনে পর পর দুটো অসংলগ্ন চিন্তা জাগল—রায় মশায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি—রাত্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ উঠে বারান্দার সিঁড়িটা দিয়ে হনহন করে আমি লনে নেমে গেলাম, সম্ভবত সিঁড়িগুলো সামনে ছিল বলেই। লনের ওধার দিয়ে এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে শরবত নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, রায় মশায় কোথায় বলতে পারেন?

তিনি গেস্ট-হাউসে রয়েছেন। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার আছেন কিনা সেখানে।

ছোকরা চলে গেল।

যদিও রায় মশায়ের নিমন্ত্রণেই এসেছিলাম, তবু—কিন্তু না, দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার থাকতে রায় মশায় আমাদের মতো নগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সময় নষ্ট করবেন—এ কথা চিন্তা করাও অন্যায়, হলামই বা আমরা নিমন্ত্রিত। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোকের অভাব নেই তো। এত বড় একটা রাজসূয় ব্যাপারে জনে জনে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করা রায় মশায়ের পক্ষে সম্ভব কি? আর, তা ছাড়া, আর একটা কথাও কি সত্য নয় যে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করলে কিংবা আমি না এলে, এ উৎসব এতটুকু অসম্পূর্ণ থাকত না? আমাকে অনুগ্রহ করেন বলেই নিমন্ত্রণ করেছেন, না করলেও পারতেন।

সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে মাধুর্যে রূপান্তরিত হল।

নমস্কার। আপনিও এসেছেন দেখছি।

চেয়ে দেখি, রাত্রি নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা। তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির রঙ এত অদ্ভুত রকম ফরসা যে, হঠাৎ দেখলে ইহুদী বলে সন্দেহ হয়। তখন আমি জানতাম না, রাত্রি বিনা-নিমন্ত্রণেই এ বাড়িতে এসেছিল এই সবিতাকে দেখবে বলে। সবিতার বাড়ি গিয়ে দেখা পায়নি, সবিতা এখানে চলে এসেছিল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করবার জন্য, রাত্রিও খোঁজ নিয়ে এসেছিল। সবিতা ও রাত্রি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল--হ্যাঁ, সেই পুরাতন উপমাটাই ব্যবহার করছি—ঠিক যেন আলো আর অন্ধকার। রাত্রির মুখভাবে সেদিন অতি-ভদ্র অতি-মোলায়েম শিষ্টাচারমসৃণ যে স্নিগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা যে অন্তরোৎসারিত নয়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। দেশলাই-কাঠির কালো মাথাটার ভেতর আগুন যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রাত্রির মধ্যেও সেদিন তেমনই আগুন লুকনো ছিল, আমি বুঝিনি। সবিতার সঙ্গে রাত্রির যে সেদিন প্রথম আলাপ, রাত্রি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, তাও আমি জানতাম না। কাল সকালে জ্যোতির্ময় এসে রাত্রিদের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা করে এই সবিতাদের বাড়িতেই উঠবে—এ কথাও তখন আমার অজ্ঞাত ছিল। রাত্রি দেখতে এসেছিল সবিতা মেয়েটি কেমন, একটা চুম্বক আর একটা চুম্বকের শক্তি নির্ধারণ করতে এসেছিল।

আপনারা মধুপুর থেকে কবে এলেন?

দিন চারেক আগে।

রাত্রি না হয়ে যদি অপর কেউ হত, তা হলে এই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরও বলত। আমার প্রশ্নটির উত্তরটুকু মাত্র দিয়ে রাত্রি চুপ করে রইল। আমি চেয়ে দেখলাম, সে সবিতার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে, এবং সবিতা মেয়েটি অস্বস্তি ভোগ করছে সেজন্য। আমিও কম অস্বস্তি

ভোগ করছিলাম না। এর পর কি করব, কি কথা বলে আলাপটাকে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, তাই ভাবছিলাম (রাত্রির সামনে বরাবরই আমার এমনই বাক্‌সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে), এমন সময় নিতু একটা কার্ড আর লাল পেন্সিল নিয়ে হাজির হল।

আপনার নামটা কাইন্‌ডলি বলুন না!

কেন?

আপনার দেওয়া আইস্‌ক্রীম-সেটটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দেবো।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন, উপহারগুলো কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা একবার দেখতে পাই না?

ওই যে, বাঁ দিকের ওই হলটায়। আসুন না।

সকলে নিতুর অনুসরণ করলাম।

উপহার-প্রদর্শনীর বর্ণনা করে সময় নষ্ট করতে চাই না, মনিহারী দোকানে যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, সবই ছিল সেখানে। রাত্রি নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা দেখে (নিতু আমার নাম-লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছিল তখন) দু'টি কথা মাত্র বলেছিল—বেশ জিনিসটা। তারপর হঠাৎ সবিতার দিকে ফিরে বলেছিল, ইনি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মামুলি প্রথায় দু'চারটে শিষ্টবাণীর আদান-প্রদানও চলত, কিন্তু হঠাৎ পাশের দুয়ারের পর্দা ঠেলে ব্যস্তবাগীশ-গোছের মালকোঁচা-মারা ঘর্মসিক্ত ঢিলে গেঞ্জি গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পড়লেন এবং সবিতা দেবীকে সামনে পেয়ে বললেন, ও, সবিতা, তুমি এদিকে চলে এসেছ, সুবর্ণপ্রভাকে আমি আবার ভেতরের দিকে পাঠালাম তোমার খোঁজে। এখনই তোমাদের বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, রাত্রি বলে একজন মেয়েকে, আই মীন—মহিলাকে, স্বর্ণেন্দুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বললেন, তিনি রুগীকে একা সামলাতে পারছেন না। আমি তো রাত্রি বলে কাউকে খুঁজেই পাচ্ছি না।

ইনিই রাত্রি দেবী।

ও, নমস্কার।

ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রাত্রি বললে, এখুনি যাচ্ছি আমি।

আমি কর্তব্যের অনুরোধেই সম্ভবত প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

বংশীদার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়বার ভান করলাম।

ও, বলেন তো আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

বেশ তো, আসুন।

বেশ মনে পড়ছে, সবিতার দিকে ফিরে রাত্রি বলেছিল, কাল ভোরেই জ্যোতির্ময়বাবু আসছেন, বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাবেন। আপনি যে আগেই চিঠি পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না, তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম।

হাস্যদীপ্ত চক্ষে সবিতা বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

উপহার-প্রদর্শনী-হল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দু'জনে।

।। তিন ।।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, শামিয়ানার তলায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের দল, পরিবেশনের গোলমাল, রেডিওর নিনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল যেন আমার চোখের সামনে থেকে; মনে হল, কেউ কোথাও নেই, রাত্রি আর আমি পাশাপাশি চলেছি। মুহূর্তগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। মনে হচ্ছিল, যেন একটা সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রজনীতে পাশাপাশি চলেছি দু'জনে, রাত্রির অঞ্চলতলে শঙ্কিত ভীরু দীপশিখা,—বাতাস উঠেছে—। সহসা রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়াগাড়ির গাড়োয়ানদের চিৎকার, পরিবেশনের কলরব, রেডিওর নিনাদ সব আবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন আমার সচেতন মনের ওপর। দেখলাম, রাত্রি ঝুঁকে তার স্যান্ডালের স্থানচ্যুত স্ট্র্যাপটাকে বাঁধছে। রায় মশায়ের বাড়ির হাতা থেকে বেরিয়ে গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ দুলাল সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, টাকা পাঁচটা পকেটে আছে, ট্যাক্সি ডাকলাম।

ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে আমার দু'টি কথা হয়েছিল।

নতুন কোনো বই শুরু করেছেন নাকি আর?

না।

যে বংশীর অসুখের সংবাদে চিন্তিত হয়ে হিতৈষীর ছদ্মবেশে বিনা আহ্বানেই যাচ্ছিলাম, সেই বংশীর অসুখের সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গই উঠল না কোনো দিক থেকে। নীরবেই বসে রইলাম দু'জনে। আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি পেছনে ফেলে চলেছিলাম। ফুটপাথের জনতা থেকে একটি মেয়ের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেয়েছিলাম মনে আছে; কোণের অন্ধ ভিখারীটা তখনও হাত পেতে বসে ছিল; ট্রামের ঘণ্টা, রিক্‌শা, হকারের চিৎকার, রাস্তার বিচিত্র জনতা রোজ যেমন থাকে সেদিনও তেমনিই ছিল। আমিও ঠিক তেমনই ছিলাম না। রাত্রিকে পাশে বসিয়ে ট্যাক্সি করে ছুটছিলাম আমি।....একটু পরে রাত্রির নির্দেশ অনুসারে থামল ট্যাক্সিটা। ভাগ্যে থামল! আর কিছুক্ষণ চললে আমি বোধ হয়—মানে, ট্যাক্সি থেকে যখন নাবলাম, মনে হল নক্ষত্রলোক থেকে নাবলাম।

এক পাশে একটা ডাস্টবিন আর এক পাশে একটা ল্যাম্প-পোস্ট, মাঝখানে গলিটা। অন্ধকার সরু একটা অন্ধ গলি। সেই গলির অপর প্রান্তে ছোট দ্বিতল বাড়িখানা, দেখতেই পাওয়া যায় না গলির এ প্রান্ত থেকে।

আসুন।

কপাট খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ, তারপর একটি তরুণীর মুখ, তারপর তার গৈরিক বসন। হ্যাঁ, প্রথমে তরুণীই মনে হয়েছিল তাঁকে আমার। তখনও ভাবতেই পারিনি যে, ইনি স্বর্ণেন্দুর মা, রাত্রির মা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, রাত্রির সমবয়সী। আমাকে দেখেই তাঁর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অতিশয় কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বাবা তুমি?

আমি স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যাম। শুনলাম, বংশীর অসুখ--

এস বাবা, এস। এখুনি তোমার কথা বলছিল স্বর্ণেন্দু।

রাত্রি কোনো কথা না বলে কারও দিকে না চেয়ে ভেতরে চলে গেল। স্বর্ণেন্দুর মা খানিকক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আমি স্বর্ণেন্দুর মা।

প্রণাম করলাম আমি।

হয়তো আমার সদ্য-লব্ধ জ্ঞানের ফলেই আমার দৃষ্টির তারতম্য ঘটল। প্রণামান্তে চোখ তুলে যখন চাইলাম, তখন মনে হল, তাঁর মুখের তরুণী-ভাবটা যেন তিরোহিত হয়েছে। অন্তরালবর্তিনী বৃদ্ধাকে যেন দেখা যাচ্ছে। নিটোল মুখখানি জরালেশহীন (পদ্মপত্রে জলের দাগ পড়ে না, আকাশের গায়ে মেঘের মলিনতা লেপটে থাকতে পায় না), তবু কিন্তু কোথায় যেন, খুব সম্ভবত চোখের দৃষ্টিতেই, তাঁর আসল বয়সের পরিচয় পেলাম। পরে এই মহিলার জীবন-রহস্যের যতটুকু আবিষ্কার করেছি, যদিও তার অধিকাংশই হয়তো আমার কল্পনা কারণ মাত্র একখানা চিঠির টুকরো টুকরো কথা থেকে নিঃসংশয়ে কতটুকুই বা জানা যায়, ডি. কে.-র কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানে। তা ছাড়া তার মুখ থেকে সব ঘটনাটা আমি শুনিওনি। রাখালবাবু পূর্ণেন্দুবাবু জ্যোতির্ময় নামে অন্য লোক থাকাও যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব নয়—যাই হোক, যতটুকু আবিষ্কার করেছি বলে আমার বিশ্বাস, এবং যে বিশ্বাসের জোরে রাত্রির সমস্ত দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে—সেদিন সে রহস্যের আভাস স্বর্ণেন্দুর মায়ের চোখে দেখেছিলাম যেন। সেই চির-পুরাতন চির-নূতন রহস্য, সর্বযুগের সর্বস্তরের নারীর দৃষ্টিতে যার কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত প্রকাশ সর্বযুগের সর্বস্তরের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানা ভাবে।

এই সামনের ঘরটাতেই আছে স্বর্ণেন্দু। যাও ভেতরে যাও তুমি।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। এমন নির্বিকারভাবে গেলেন, যেন এ বাড়ির তিনি কেউ নন, কিংবা যেন সমস্তই তাঁর এত জানা, এমন নখদর্পণে যে, এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁর অবশিষ্ট নেই, এমন কি এই সব কেন্দ্র করে শিষ্টাচার করাও যেন তাঁর পক্ষে ক্লান্তিজনক।

দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই স্বর্ণেন্দুর বাবার মুখখানা চোখে পড়ল, আধখানা মরা আধখানা জীবন্ত মুখ। দ্বার খোলার শব্দে জীবন্ত চোখটা খুলে গেল, সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর আবার বুজে গেল চোখটা, নীরবে যেন তিনি বললেন, ও, বুঝেছি। ঘরে আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। রকেটের মতো ছুটে বেড়াতেন যিনি, যাঁর সুনীতি-দুর্নীতি-পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে, তা বলশেভিক রাশিয়াতেও চলবে কিনা সন্দেহ, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে আছেন--নির্বাক, নিঃসঙ্গ, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ কাছে নেই। এ রকম করুণ দৃশ্য আমার ডাক্তারী জীবনে আরও দেখেছি: বাড়ির কর্তা হঠাৎ যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নেন, তখন তাঁকে ঘিরে কিছুকাল চিকিৎসার সমারোহ হয়, যার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে। তারপর ক্রমশ সব থেমে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য দুর্ঘটনাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে আসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নায়ু-কেন্দ্রে

উত্তেজনা সঞ্চার করবার মতো তীব্রতা আর তাতে থাকে না। তখন অসহায় চলচ্ছক্তিহীন শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সেবা করাটা ক্রমশ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর মতো নিয়ম-রক্ষাগোছ কর্তব্যে পরিণত হয়। ঠাকুরের সঙ্গে শয্যাশায়ী কর্তার কিন্তু অনেক তফাত। সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে বিলম্ব হলে মাটির ঠাকুর প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেবার ত্রুটি ঘটলে (এবং অনেক সময় সেবার ত্রুটি ঘটেছে কল্পনা করে নিয়ে) পক্ষাঘাতগ্রস্ত কর্তা অসন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেবক-সেবিকারাও—হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলে মেয়েরাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন দেখেছি। কতদিন আর একটানা রাত্রি জাগা যায়, বার বার কতবার বিছানা বদলাতে পারে মানুষে—হলই বা স্বামী, হলই বা বাবা—মানুষের, রক্তমাংসের মানুষের, সহ্যের সীমা আছে তো। পুত্রও তখন পিতাকে রূঢ়ভাষণ করে, সতী রমণীর মুখ দিয়েও যে বাক্য নির্গত হয় তা রমণীর নয়। আমার মনে একটা কথা জাগছিল, মধুপুর ছেড়ে কলকাতা শহরের এই এঁদো গলিতে চলে এলেন কেন এঁরা? পরে জেনেছি, আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণেন্দু যখন তার মাকে মথুরা থেকে আনতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বলেনি যে, মধুপুরে জ্যোতির্ময়ের বাড়িতেই যাচ্ছে তারা; এবং তিনি পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে এত নির্বিকার ছিলেন যে, কৌতূহলও তেমন প্রকাশ করেননি তখন,—পূর্ণেন্দুবাবু সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহলই যেন অবসান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্বর্ণেন্দুর মা জানতেন, জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে ভাড়াটে আছে এবং জ্যোতির্ময় মেতে আছে তার চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায়। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে—জ্যোতির্ময় ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়েছে, চিত্র-প্রদর্শনীর দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলে এসেছে, এসব কিছুই জানতেন না তিনি। যেদিন জানতে পারলেন, সেই দিনই তিনি মথুরা থেকে চলে এলেন এবং এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন ঘন ঘন ভর হতে লাগল তাঁর যে, স্বর্ণেন্দু বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এল কলকাতায়। আমার মনে হয়, স্বর্ণেন্দু যদি সমস্ত ব্যাপারটা মথুরাতেই মাকে খুলে বলত, এত কাণ্ড হত না, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আর রাত্রি এতদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেত না। এ কথা শোনা মাত্র প্রবল আপত্তি করতেন তিনি এবং তাঁর প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু, জ্যোতির্ময়, রাত্রি কেউ দাঁড়াতে পারত না। স্বর্ণেন্দু ভেবেছিল, মাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনো রকমে এনে ফেলতে পারলে হয়তো তিনি বুঝবেন সব, হয়তো তিনি রাত্রি আর জ্যোতির্ময়ের মেলামেশা দেখে বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভুল ভেবেছিল স্বর্ণেন্দু, নিজের মাকে সে চিনত না। ক'জনই বা চেনে? গাছ কি মাটিকে ভাল করে চেনে? মাটির সব দৈন্য-ঐশ্বর্যের খবর রাখে? সে শুধু মাটির রস চেনে, যা শোষণ করে সে বড় হয়।

পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা আবার খুলে গেল। শুধু খুলে গেল নয়, ক্রমশ বড় হতে লাগল, মনে হল ছুটে এসে, বুলেটের মতো আঘাত করবে আমাকে এখুনি। যদিও মৃত চোখটা সঙ্গে সঙ্গে মিনতি করছিল, তবু আমি সামনের দেওয়ালে পরদা-ঢাকা যে দরজাটা ছিল, সেইটে দিয়ে দ্রুতপদে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরটাতে।

খুব লম্বা সরু গোছের ঘরটা, কমানো টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঈষৎ আলোকিত। ঘরের অপর প্রান্তে একটা খাটে বংশী শুয়ে ছিল, তার মাথার শিয়রে বসে ছিল স্বর্ণেন্দু, তার গোঁফ-দাড়ি-সমাকীর্ণ আনত মুখখানাতে সস্নেহ সেবা-পরায়ণতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

স্বপ্নালোক সত্ত্বেও আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ভুল হয়নি। ভুল হয়নি বলেই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি জানি, স্বর্ণেন্দু নির্দোষ। আমি এগিয়ে যেতেই স্বর্ণেন্দু চোখ তুলে চাইলে, তারপর একটু হাসলে—ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার—তারপর বললে, আয়, বস্।

বসলাম।

কি হয়েছে বংশীর, কে দেখছে?

কোনো ডাক্তার ডাকিনি এখনও। এসেই কম্প দিয়ে জ্বর এল, ভাবলাম, ম্যালেরিয়া, একদিনে সেরে যাবে, কিন্তু আজ বিকেল থেকে কেমন যেন—

কম্প দিয়ে জ্বর, নিঃশ্বাসের দ্রুত-গতি এবং প্রলাপ দেখে সন্দেহ হল লোবার নিউমোনিয়া। বংশী বিড় বিড় করে বকছিল, হঠাৎ জোরে জোরে বলে উঠল, তোমার বয়স কত, তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, আমি তোমাকে চাই। কোথায় রাতু! রাতু! আবার খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কি খানিকটা বলে গেল! তারপর আবার জোরে—হ্যাঁ, দিয়েছিলে, একদিন তো দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিলে, কেন?—উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠতে গেল, স্বর্ণেন্দু শুইয়ে দিলে জোর করে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ চোখে পড়ল, অন্ধকারে রাত্রিও বসে আছে বিছানার ও-পাশটায়, বংশীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম তিনজনেই। বংশী কখনও বিড়বিড় করে, কখনও জোরে জোরে প্রলাপ বকতে লাগল। ঠিক কতক্ষণ যে বসে ছিলাম, এসব শুনে ঠিক সেই সময়ে মনে কি কি ভাবোদয় হয়েছিল, তা এখন ভাল করে মনে নেই। এর পর যে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তা এই—স্বর্ণেন্দু রাত্রিকে বলছিল, ভোরে জ্যোতির্ময়কে তুই কি স্টেশন থেকে আনতে যাবি? সে তো এ বাসা চেনে না।

যাব।

স্বর্ণেন্দু স্নেহভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাত্রির দিকে। শুধু স্নেহ নয়, একটা মুগ্ধ ভাবও যেন লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে। বিছুটির পূর্ণপুষ্পিত রূপটি হয়তো দেখেছিল সে তখন।

হঠাৎ বংশী বলে উঠল, ইজিপ্টে ভাই-বোনে বিয়ে হত—

রাত্রির নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

বংশী প্রলাপ বকছে।

জ্যোতির্ময় কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পড়বে।

এর পর সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা যদিও এই অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু, পর পর ঘটেছিল, সুতরাং একসঙ্গেই বর্ণনীয়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এত বেশি, এবং শুধু লেখক হিসাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাহিনীর সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিম দিকে বারান্দায় বসে আছি। সার্শির লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা রঙের কাচের ভেতর দিয়ে একই সূর্যালোক নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে আমার খাতার ওপর। একই সূর্যালোক! সবিস্ময়ে এই কথাটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে বার বার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি পরবর্তী একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেই কারণে করতে চাই, যে কারণে মহাভারতের সম্ভব-পর্বে অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন অযুত-নাগেন্দ্র-সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য, মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েছিলেন, মহাভারতকার বলেছেন, মায়ের দোষে। সত্যবতী যদিও পুত্রবধূ অম্বিকাকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন—তোমার এক দেবর আছেন, আজ রাত্রে তিনি তোমার নিকট আসবেন, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করো; কিন্তু অম্বিকা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। দীপশিখায় প্রদীপ্ত আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু দুটি নিমীলিত করে ফেলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ হতে হয়েছিল। অন্ধতা-প্রযুক্ত তিনি যা করেছিলেন, তার জন্যে দায়ী তাঁর মা—অম্বিকা।

সেদিন শেষরাত্রে জ্যোতির্ময়কে স্টেশন থেকে আনতে যাবার মুখে রাত্রি আমার বাসায় এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্যে। স্টেথোস্‌কোপ প্রভৃতি নিয়ে রীতিমত চিকিৎসক-বেশে আমি দ্বিতীয়বার যখন বংশীর চিকিৎসা-উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন আমার ঠিকানা আর ফোন-নম্বর দিয়ে বলে এসেছিলাম, একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, প্রলাপটা যদি না কমে, খবর দিও। সেই ঠিকানার সহায়তায় রাত্রি এসেছিল ভোরবেলা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল, মোহ ছিল, পেটে ক্ষুধাও ছিল প্রচুর (কারণ রায় মশায়ের বাড়িতে খাওয়া হয়নি এবং সে কথাটা গোকুলকে অত রাত্রে বলবার সাহস হয়নি), তবু এসে শোওয়া মাত্র আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখেছিলাম একটা। যেন প্রকাণ্ড একটা দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়, কিন্তু তাতে জল নেই, আছে খালি কাদা—কাদা যে আছে তাও দূর থেকে বোঝা যায় না; মনে হয়, শক্ত জমি; স্থানে স্থানে সবুজের আভাস আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলতে গেলেই হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যায়। সেই নির্জলা জলাশয়ের ওপর দিয়ে আমি আর রাত্রি যেন চলেছি, বার বার হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। রাত্রি আমার ওপর ভর দিয়ে পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে নেই, নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে শূন্য দিগন্তের পানে।

হঠাৎ কড়কড় করে দুয়ারের কড়াটা নড়ে উঠতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। নেবে গেলাম। কপাট খুলেই দেখি, রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সুটকেস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আমিও চেয়ে রইলাম।

বংশী কি এখনও প্রলাপ বকছে?

থেমে গেছে।

অতি সাধারণ ব্রোমাইডে এত তাড়াতাড়ি এমন ফল পাওয়া যাবে, তা যদিও আমি প্রত্যাশা করিনি; তবু আত্মপ্রসাদে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আপনি কি জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে হাওড়া যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। এই সুটকেসটা আপনার এখানে রেখে যেতে চাই। আপনার কি কোনো অসুবিধে হবে?

না, কিছুমাত্র না।

একটা সুটকেস হাতে করে জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে যাবার হেতু কি এবং হেতু থাকলেও মধ্যপথে সে সুটকেস আমার বাসায় রেখে যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন—এই সব অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি তখন। আমি সেদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, বাস্তব জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোনো অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন জেনেছি, পাছে পুলিশের হাতে চিঠিখানা পড়ে, এই ভয়েই সে সুটকেসে চিঠিখানা ভরে নিয়ে এসেছিল, তারপর মাঝরাস্তায় তার মনে হয়েছিল, জ্যোতির্ময় যদি চিঠিখানা দেখে ফেলে! চিঠিখানা সে নষ্ট করে ফেলেনি কেন, তা এখনও আমি ভেবে পাই না। বোধ হয় চিঠিখানা রেখেছিল নিজের ধর্মপরায়ণা মায়ের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল-স্বরূপ, অবশ্য এ সব আমার কল্পনা।

রাত্রি চলে গেল। স্টেশন থেকে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে আর ফেরেনি সে। সবিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হবার সুযোগই সে দেয়নি। ফিরেছিল মাস চারেক পরে। জ্যোতির্ময় সঙ্গে ছিল না, সঙ্গে ছিল অবনীশ। অবনীশও বেশিক্ষণ থাকেনি, রাত্রিকে রেখে সে পরের ট্রেনেই ফিরে গিয়েছিল বম্বেতে। ব্যবসায়ী লোক সে, নষ্ট করবার মতো সময় তার হাতে ছিল না।

যে সুটকেস রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল....হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মুখটা মনের মধ্যে জেগে উঠছে আমার। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পারেন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে আর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, একটা ছবিকে আড়াল করে আর একটি ছবি জাহির করতে চায়? জ্যোতির্ময়কে আমি দেখিনি কখনও, কিন্তু তার কথা শুনেছি অনেক। যখনই আমি তাকে কল্পনা করি তখনই দেখি, সে যেন খুব দামী বিরাট একখানা মোটর 'ফুল স্পীডে' হাঁকিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড ভারী ফরসা মুখে টানা টানা চোখ, কালো সরু লম্বা একটা সিগারেট-হোল্ডার মুখের এক কোণে কামড়ে ধরে আছে, হু হু শব্দে হাওয়া বইছে, হু হু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলো উড়ছে, স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে জ্যোতির্ময়। সে আশেপাশের কাউকে দেখছে না, গাড়ির ভালো-মন্দর দিকেও তার লক্ষ্য নেই, পাশে কে বসে আছে তাও তার খেয়াল নেই—সে ফুল-স্পীডে খালি ছুটে চলেছে।

সেদিন যে সুটকেসটা রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল তা আমি প্রায় তিন মাস পরে খুলেছিলাম, মানে—খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতে রাত্রিরই দু-একখানা কাপড় শেমিজ ব্লাউজ ছিল, আর ছিল একখানা চিঠি। রাত্রির মায়ের চিঠি, পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি চিঠিখানার কথা বলতে চাই। অবশ্য চিঠিখানা যে পূর্ণেন্দুবাবুকেই লেখা, চিঠিতে তার কোনো প্রমাণ নেই, চিঠিতে 'শ্রীচরণেষু' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনই ছিল না। তবু কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ, তাতে ফার্নানডিজের উল্লেখ, অনুতাপ মিশ্রিত একটা ক্ষুব্ধ আকুতি, আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি—অবশ্য কল্পনায়—যে চিঠিখানা পূর্ণেন্দুবাবুকেই রাত্রির মা লিখেছিলেন—আদালতে হয়তো এ কথা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অন্তর্যামী এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

আমার গোকুলচন্দ্র ছুটি না নিলে এ আবিষ্কার সম্ভবপর হত না। শুধু তাই নয়, গোকুল যদি নীলুর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান আর কাউকে দিয়ে যেত, তা হলেও হয়তো হত না। তৃতীয় এবং

সর্বপ্রধান যে কারণে এই 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গয়াতে হঠাৎ আমার বাল্যবন্ধু ডি.কে-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অদ্ভুত রকম যোগাযোগ সেটা। আমার কলকাতারই এক বড়লোক মক্কেল গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। গয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং গয়ার চিকিৎসকদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পেরে (অদ্ভুত জিনিস এই আস্থা!) আমাকে টেলিগ্রাম করলেন। আমি এলাম চিকিৎসা করলাম, নিজের জীবনীশক্তির জোরেই বোধ হয় তিনি সেরে উঠলেন। আমি কিছু সুনাম এবং অর্থ নিয়ে সানন্দে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় ব্যায়ামবীর ধীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা। ধীরেনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার আরও দু'একবার দেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে সে দু'একবার আমার বাসায় এসেছে গেছে, সুতরাং এক নজরেই দু'জনে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সাধারণ কাপড়-জামা পরে থাকলে ধীরেনকে ব্যায়ামবীর বলে চেনবার যেমন উপায় নেই, তার নেপালী-ধরনের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলের মৃদু হাসি দেখেও তেমনই বোঝবার উপায় নেই যে, ছোকরা ভীষণ রকম একগুঁয়ে। মাথায় একবার একটা ধারণা বসে গেলে আর নড়তে চায় না। গয়ার ধূলিধূসর রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডি. কে. থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ক্ষণকাল কি চিন্তা করল এবং পরমুহূর্তেই উল্লসিত হয়ে উঠল— আমার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ করে নয়, অন্য কারণে। গয়ায় আমার আগমনের কারণ খুলে বলতেই, 'অদ্ভুত যোগাযোগ তো' এই কথা কটি উচ্চারণ করে ডি. কে. আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করলে। অর্থাৎ সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতনিশ্চয় হয়ে গেল যে, আমি নির্ঘাত ওর সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রা যাচ্ছি, আকস্মিক যোগাযোগটাই ওর বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করছিল। আমি যে ওর সঙ্গে যাবই,—অর্থাৎ নিজের শক্তি সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'খপ্পর' নামক ছোট্ট কথাটি যে কত প্রবল এবং কিরূপ জটিলতাবোধক, ধীরেনের খপ্পরে না পড়লে তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শিকারের গায়ে এক পাক কোনক্রমে জড়াতে পারলে পাইথন যেমন শিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, আমার নাগাল পাওয়া মাত্র ধীরেনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, যাক, একজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া গেল। বাঙালী সঙ্গী না হলে যে ওর ভ্রমণ আটকে ছিল তা নয়; কিন্তু ধীরেনের ওই স্বভাব,—একটা ধারণা মাথায় একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরুতে চায় না। সাধারণত বাঙালীরা যেমন ফোটো তোলায় একবার বিয়ের সময় আর একবার মৃত্যুর পর, তেমনই ভ্রমণও করে—হয় চাকরি কিংবা ব্যবসায় ব্যপদেশে, অথবা ধর্মকামনায় বৃদ্ধবয়সে, যদি সঙ্গতি থাকে। শুধু শুধু তাজমহল দেখতে পয়সা খরচ করে আগ্রা যাব—এ চিন্তাও বাঙালী-সন্তানের কাছে হাস্যকর। সত্য মিথ্যা নানা ওজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করলাম। কিন্তু ডি.কে-র মাথায় ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ছাড়া সে ভাল করে জানত, কি করলে বাঙালী-সন্তান কাবু হয়। কিছু না বলে সে এগিয়ে এল এবং আমার গলাটি জড়িয়ে আমার টিকিট এবং সদ্য-লব্ধ 'চেক' সমেত 'মনিব্যাগ'টি বুক-পকেট থেকে বার করে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডি. কে. পালোয়ান লোক, কপাল দিয়ে লোহার ডাণ্ডা বেঁকাতে পারে, বুকের ওপর মোটরকার চড়ায়, তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে যাওয়া বৃথা। সকাতরে বললাম, আমি প্রায় এক কাপড়ে চলে এসেছি ভাই, যদি নিতান্তই যেতে হয়, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি তা হলে।

ডি. কে. আর একবার মৃদু হেসে চাইলে আমার দিকে।

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দু'জনে খানিকক্ষণ।

পোস্ট-অফিসের সামনে এসে ধীরেন বললে, দাঁড়াও একটু।

দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাবার উপায় নেই, ব্যাগ ওর কাছে। মিনিট দশেক পরে পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চল।

কোথায়?

ধর্মশালায়, ওইখানেই উঠেছি আমি।

ধীরেনকে ভ্রমণের নেশায় পেয়েছিল। বললে, দু'মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মশালায় পৌঁছে বললে, তোকে আগ্রা থেকেই ছেড়ে দেব। আমার কেদারবদরি পর্যন্ত ধাওয়া করবার ইচ্ছে আছে। একা একা ভাল লাগছিল না, এমন সময় তোর সঙ্গে দেখা।

আমার যে কাপড়-চোপড় কিচ্ছু সঙ্গে নেই।

রাত এগারোটা নাগাদ সব এসে পড়বে। আমার চেনাশোনা একটি লোক আসছে আজ, তাকেই টেলিগ্রাম করলাম তোর বাসা থেকে তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন, না এসে পড়ে, কিনে নিলেই হবে। আমি দাম দেব।

পাইথনের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

আমার বাসায় গোকুল ছিল না, নীলু ছিল। গোকুল থাকলে আমার নামলেখা কালো তোরঙ্গটা এসে পড়ত, কিন্তু নীলু থাকাতে এসে পড়ল সেই সুটকেসটা, যা একদা তিন মাস আগে রাত্রি রেখে গিয়েছিল আমার কাছে প্রদোষের গোপনতায়।

।। দুই ।।

ধীরেনকে মিছে কথা বলেছিলাম। একেবারে যে আমার কাছে কাপড়-চোপড় ছিল না তা নয়, অল্প-সল্প ছিল। আগ্রার ধুলোয় দু'দিনেই সে সব ময়লা হয়ে গেল। ধীরেনের সেদিন যাবার কথা, ট্রেনের বেশি দেরি ছিল না। নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ সে বললে, আচ্ছা, তুই এ সুটকেসটা আনালি, অথচ একদিনও খুললি না কেন বুঝতে পারছি না।

ওর চাবি আমার কাছে নেই।

চাবি নেই বলে ময়লা কাপড়-জামা পরে ঘুরবি।

ঘরের কোণে সুটকেসটা ছিল, ডি. কে. উবু হয়ে গিয়ে বসল তার সামনে এবং আমি কিছু বলবার আগেই তালাটা ধরে এমন একটা মোচড় দিলে যে, সবসুদ্ধ উপড়ে উঠে এল। অপর কেউ হলে বাক্সের ডালাটা তুলে দেখত এরপর, কিন্তু ডি. কে.-র তা স্বভাব নয়। সে স্থানচ্যুত কলসুদ্ধ তালাটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে একবার চাইলে এবং তারপর বেসুরে একটা গান গুনগুন করতে করতে আবার নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সেই দিনই ও মথুরা হয়ে হরিদ্বার যাচ্ছিল, সেখান থেকে হৃষিকেশ-কনখল সেরে লছমনঝোলা যাবে। লছমনঝোলা থেকে কেদারবদরি। ও তখন মনে মনে মশগুল হয়েছিল, একটা ছোট সুটকেসের ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহলই হল না ওর। তালা ভাঙা সত্ত্বেও আমিও যে তখুনি উঠে বাক্সটা খুললাম না, সেটাও ওর নজরে পড়ল না। ওর স্বভাবই ওই রকম। একটু পরেই টাঙা ডেকে

আমি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলুম ধীরেনকে। ধীরেন বলে গেল, কেদরবদরি থেকে যদি ফিরতে পারে, তাহলে আবার কলকাতায় দেখা করবে এসে। আমি আগ্রায় আরও দু'একদিন থেকে গেলাম, কাছাকাছি আরও দু'একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে যাবার লোভ হল।

এই সূত্রে এক সিগারেটখোর সায়েবের গল্প মনে পড়ছে এবং তার সঙ্গে নিজের আচরণের তুলনা করে মনে যে অনুভূতি জাগছে, চলতি ভাষায় তাকে লজ্জাই বলতে হয়; কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমার নির্লজ্জতা। এক ডাকবাংলোয় এক সিগারেটখোর সায়েবের দেশলাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি সব দোকানে খোঁজ করলেন, কিন্তু 'মেড-ইন-ইংল্যান্ড' দেশলাই পাওয়া গেল না, সব 'মেড-ইন-জাপান'। দু'ক্রোশের মধ্যে ইংল্যান্ডের তৈরি দেশলাই পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যাবেলা স্টিমার এল, তাতে 'মেড-ইন-ইংল্যান্ড' দেশলাই পাওয়া গেল, তারপর সায়েব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত দিন তিনি সিগারেট খাননি।

আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অতিশয় ঠুনকো। সামান্য একটু চাপ পড়লেইভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ডি. কে. চলে যাবার পর রাত্রির সুটকেস খুলে দেখেছিলাম। তাতে দু'একখানা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়া একখানা চিঠি ছিল। কারও চিঠি তার বিনা অনুমতিতে পড়া যে অনুচিত— এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পড়েছিলাম আমি। পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা রাত্রির মায়ের চিঠি।

।। তিন।।

তার পরদিন ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে তাজমহলেস্থ একটা মিনারেটের ওপর একা বসেছিলাম। গ্রীষ্মকাল দেখছিলাম, প্রায়-নির্জলা যমুনা পূর্বমহিমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কোনোক্রমে। কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম, আলমগীর-কল্পিত কালো তাজমহল যদি যমুনার ওপারে সত্যিই নির্মিত হত, কেমন দেখতে হত সেটা। তাজমহলের অভ্যন্তরে বৃদ্ধ পরিচারকের মুখনিঃসৃত 'আল্লা' শব্দটার করুণ প্রতিধ্বনি আবার যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল আগ্রা ফোর্টের সেই অংশটা, যেখানে শাহজাহান এসে বসতেন—দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সবুজ গোল পাথর আর তার প্রত্যেকটিতে তাজমহলের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।—সহসা সমস্ত অবলুপ্ত করে মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা পকেটেই ছিল, আবার খুলে পড়লাম, বার বার করে সেই অংশটাই পড়লাম, যার অর্থ বুঝতে পেরেও না পারার ভান করছিলাম।—

"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার অনুমতি না নিয়ে কেবল মাত্র ফার্নানডিজকে সঙ্গে করে আমি শিবসমুদ্রম্ দেখতে কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কেনই বা আমার দু'দিন দেরি হল—এ সবের জবাবদিহি তোমার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জান। জেনেশুনেও তুমি তবু জবাবদিহি তলব করেছ, কারণ তুমি পুরুষ, উচ্ছ্বাসের মুখে যে সব প্রতিশ্রুতি দাও, উচ্ছ্বাস কমে গেলে তা পালন করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাও না। এখন তুমি অনায়াসে ভুলে গেছ যে, শান্তনুর মতো তুমিও একদিন আমার কাছে গদগদ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কোনো আচরণের প্রতিবাদ তুমি করবে না। অথচ আজ তুমি কড়া ভাষায় জবাবদিহি চেয়েছ। ন্যায়ত ধর্মত যার জবাবদিহি দাবি করবার অধিকার, তিনি ভুলেও কখনও তা করেননি, করবেনও না। তুমি কি জান না, তুমিই এর মূর্তিমান জবাবদিহি!—"

এ ক'টি কথার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। রাত্রির অন্ধকারে গাছকে ভূত এবং মেঘকে পর্বত বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তবু আমি জানি, আমি ভুল করিনি। রাত্রিকে এ বিষয়ে কোনোদিন—হ্যাঁ, অধিকার পেয়েও—প্রশ্ন করিনি। সুটকেসটি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিরুৎসুকভাবেই ফেরত দিয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ছে, চিঠিখানা পড়বার পর আবার আমার কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল যমুনার অপর পারে কালো তাজমহলের নিকষকৃষ্ণ নিবিড় কান্তি,—তার কোথাও একবিন্দু সাদা নেই, আগাগোড়া সমস্ত কালো।

তারপর সহসা অনুভব করলাম, আমি শুভ্র তাজমহলের সু-উচ্চ মিনারেটে বসে সূর্যোদয় দেখছি—কালো তাজমহলটা নিছক কল্পনামাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সেদিন ভোরে সুটকেসটা আমার কাছে রেখে রাত্রি যখন চলে গেল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। রাত্রির অপ্রত্যাশিত অভ্যাগম ও অন্তর্ধান, তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্শ্চারের কার্যকরী শক্তি এবং তজ্জন্য নিজের ঈষৎ গর্ব, আমার বৈঠকখানা-ঘরের নতুন-কেনা নীল-ডোম-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির নীলাভ আলো, কয়েকটা কলের সমবেত বংশীধ্বনি—সব কটা মিলিয়ে সেটা যেন একটা নূতন রকম ভোর।

এই গলিতে যত দিন থেকে বাস করছি, ততদিন ভোরের সঙ্গে যে কটা জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে আমার ধারণা, সেদিন ভোরে এক ওই কলের বাঁশি ছাড়া, কি করে জানি না, বাকি কটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোজ হড়হড় শব্দ করে ময়লাফেলা গাড়ি যায়, কড় কড় শব্দ করে পাশের বাড়ির ঝি এসে কড়া নাড়ে, ঘড় ঘড় শব্দে গলার কফ তুলতে তুলতে সামনের বাড়ির দ্বারিকবাবু তামাক খান, বড়বড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে একদল লোক গঙ্গাস্নান করতে যায়, ছড়ছড় করে কলে জল আসে। সেদিন ভোরেও এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনায় দাগ কাটতে পারেনি। সেদিনকার ভোরটা গগন ঠাকুরের ছবির মতো একটা বিশিষ্ট অপরূপতায় আঁকা আছে আমার মানসপটে এখনও। নীলাভ আলোতে রাত্রি এসে দাঁড়াল, বংশীর প্রলাপ থেমে গেছে শুনে আমার মন আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাত্রির স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রশংসার আভাস মাত্র না দেখে একটু ক্ষোভ জাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রাত্রির গম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক মনে হওয়াতে সান্ত্বনা এল, নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কলের বাঁশিগুলো বেজে উঠল, রাত্রি চলে গেল।

বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে মাটি আকাশ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের কোনো অর্থ নেই, যেখানে ফুলের স্থান গাছে নয়—বাজারে, যেখানে পাখি নীড় বাঁধে না খাঁচায় থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলেই যেখানে নেশার ঘোরে উন্মত্ত, সুস্থ মনোবৃত্তি যেখানে উপহাসের খোরাক, নারীর নারীত্ব, কবির কবিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পণ্যদ্রব্যের সামিল, যেখানে ট্রামে বাসে সিনেমার বড় রাস্তায় গলিতে সর্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিস্তেজ আক্ষেপকে আনন্দ বলে মনে করে কৃত্রিম উল্লাসের ভান করছে, সেই কলকাতা শহরের বুকে এমন একটা ভোর সম্ভব হল কি করে! বিস্ময় জেগেছিল মনে, একটা স্বপ্নসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, বর্তমান যুগের উন্মাদ জনতার আমিও একজন, যে আনন্দে অভিভূত হয়েছি তা বর্তমান-যুগ-সুলভ স্বাপ্নিক আনন্দই, বলিষ্ঠ কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম তখন দেখলাম, সেই নীলাভ আলোতে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে 'লোবার নিউমোনিয়া' সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছি। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা একাগ্র হয়ে উঠেছে—বংশীকে বাঁচাতে হবে। হোক রাত্রির প্রকৃতি সুগভীর, বংশীকে যদি সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, এতটুকু কৃতজ্ঞতার ঢেউ কি জাগবে না তার রহস্যময় অন্তর-সমুদ্রে, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে

সামান্যতম কোমলতাও কি আভাসিত হবে না? কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই। আরও অনেকক্ষণ হয়তো পড়তাম, যদি না একটা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় উঠে বসতে হত। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। সমস্ত রাত খাওয়া হয়নি! সহসা পুঞ্জীভূত বিরক্তি সহকারে ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ফেলে অনাবশ্যক রকম উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম গোকুলকে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা দিয়ে কুণ্ঠিত ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করল, ইলেক্‌ট্রিক আলোর ভয়ে সে যেন এতক্ষণ বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল।

আদেশ শুনে গোকুল খুশি হল, মনে মনে একটু বিস্মিতও হল বোধ হয়। 'ভয়ানক খিদে পেয়েছে' বলে খাবার দাবি করছি, এর চেয়ে আনন্দজনক বিস্ময়কর ঘটনা গোকুলের জীবনে বেশি ঘটে না। ওকে প্রত্যহ অনুযোগ, মিনতি, বকুনি, অভিমান—নানা উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে পেট ভরে খাওয়াবার জন্যে। ওর ধারণা, ছোট ছেলেরা যেমন মাকে ফাঁকি দিয়ে নানা ছুতোয় খায় না, আমিও তেমনই নানা ছুতোয় গোকুলকে ফাঁকি দিই। মহানন্দে গোকুল একটা বড় পাউরুটি কাটতে বসে গেল। একটু পরে শব্দ শুনে বুঝলাম, ডিমও ফ্যানাচ্ছে—গোকুল জানে আমি কি ভালবাসি, ও পুরুষমানুষ নয়, ও মা।

এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন এই দেরিটা যদি না হত অর্থাৎ রাত্রির আসা, সুটকেস রাখা, চলে যাওয়া—এই সামান্য ঘটনা যদি আমাকে সেদিন অতটা স্বপ্নাচ্ছন্ন না করত, বড় বড় ডাক্তারী বই ঘেঁটে অতখানি সময় যদি আমি অনর্থক নষ্ট না করতাম, অমন অসময়ে যদি অত খিদে আমার না পেত, রায় মশায়ের বাড়িতে রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেই যদি আহারটা সমাধা করতে পারতাম—অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যে যে ঘটনা ঘটাতে স্বর্ণেন্দুর ওখানে যেতে আমার দেরি হয়ে গেল,—সেগুলো যদি না ঘটত, তা হলে হয়তো জিনিসটা অন্য রকম হতে পারত। দেরি হল বলেই প্রাতর্ভ্রমণ-ফিরতি ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, তিনি গল্পের অবতারণা করে আরও দেরি করে তো দিলেনই, আমার মুখে সমস্ত শুনে পূর্ব-বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং নিজের চোখে সমস্ত দেখে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

আমি স্নান সেরে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে দ্বারের কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রঙ-চটা-গাঁট-গাঁট লাঠিটি বগলে করে ঈষৎ ঝুঁকে রুমালের ঝাঁটা দিয়ে প্যানেলা জুতো থেকে ধুলো ঝাড়ছেন ধরণীবাবু। আমাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন, তারপর যেন আমার একটা জুয়াচুরি ধরে ফেলেছেন এইভাবে প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যেই চা তৈরি যে দেখছি আজ, ব্রাহ্মণকে সকালবেলার চা খাইয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবার মতলব নাকি হে?

বললাম, আসুন বসুন।

খুটখুট করে প্রবেশ করলেন ধরণীবাবু।

।। দুই ।।

যদিও আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনের যে অংশটা ধরণীবাবুর সঙ্গে লৌকিকতা করতে ব্যস্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বড় একটা অংশ যদিও নীরব নেপথ্যে ব্যস্ত ছিল

রাত্রিকে নিয়ে, তবু ধরণীবাবুর অংশটায়। এক চুমুক চা পান করে ভারি একটা হৃদয়রোচক প্রসঙ্গ তুললেন ধরণীবাবু।

শুধু ধরণীবাবুই নয়, আমাদের অনেকেরই জীবনদর্শন এবং জীবনযাপন এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্য অথবা মিথ্যা দার্শনিকতার পাখায় ভর করে মনোলোকের যে আকাশে আমরা অহরহ উড্ডীয়মান হই, সত্যি সত্যি উড়তে গিয়ে দেখা যায়, সে আকাশ-বিলাস বাস্তব-জগতে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমাদের পাখা এবং আকাশ দুই-ই কাল্পনিক, আসলে একটা পঙ্ককুণ্ডে কৃমির মতো কিলবিল করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্পনাবান কৃমির যা দুর্দশা, আমাদেরও সেই দুর্দশা। ধরণীবাবু সাহেবদের ওপর চটা, স্ত্রী-শিক্ষার ওপর চটা, ব্রাহ্মদের ওপর চটা, সিনেমার ওপর চটা, টর্চের ওপর চটা, ট্যাক্সির ওপর চটা, আধুনিক অনেক জিনিসেরই ওপর হাড়ে-চটা তিনি। তাঁর মন কল্পনার পাখায় ভর করে যে যুগের আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেটা—ধরণীবাবু যদিও বলেন বৈদিক যুগ—আসলে বোধ হয় শায়েস্তা খাঁর আমল। সে যুগে টাকায় আট মণ চাল ছিল, প্রচুর টাটকা দুধ ঘি মাছ সস্তায় পাওয়া যেত, স্ত্রীলোকদের আব্রু ছিল, এক-ব্যক্তিক নয়—একান্নবর্তী পরিবারে লোক সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবী হয়ে গ্রামে বাস করত। এই যুগের স্বপ্ন দেখতে বাস্তব জীবনে কিন্তু ধরণীবাবুকে সাহেবদের ঝুঁকে সেলাম করে তাদের অধীনে চাকরি করতে হয়েছে, শহরে এসে বাস করতে হয়েছে, একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে, নিজের ছোট মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে হয়েছে, সিনেমা দেখতে হয়েছে, টর্চ কিনতে হয়েছে, গত যুগের ব্রাহ্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়েছে, ট্যাক্সি চড়তে হয়েছে, কলের চাল পচা মাছ জলো দুধ দুর্মূল্যে কিনতে হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা শায়েস্তা খাঁর আমলে কেউ করত না। এর ফলে যা হয়েছে, তাকে যদিও আমরা শুদ্ধ ভাষায় দার্শনিকের আকুতি বলি না, চলিত ভাষায় কুৎসা-প্রবণতা নামে অভিহিত করে থাকি; কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, কয়লাই অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে হীরকে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস, অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে পড়লে ধরণীবাবুর পরনিন্দাপ্রবণ মনোভাব দার্শনিক মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত, তিনি আর কিছু না হোন, জনপ্রিয় সম্পাদক হতে পারতেন, সকালে বিকেলে অপরের বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বর্তমান-যুগে-বাধা-হয়ে-বাস-করা-জনিত দার্শনিক ক্ষোভ উদাহরণ সম্বলিত করে প্রকাশ করে বেড়াতে হত না তাঁকে, লোকে সভা করে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে সভাপতিরূপে এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর দার্শনিক বাণী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধরণীবাবু বললেন, ওহে, মেঘনাদ এতদিন মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, এইবার সশরীরে দেখা দিয়েছেন। ইয়া পাকানো গোঁফ। মেঘনাদপ্রসঙ্গ ধরণীবাবু ইতিপূর্বে আরও দু'একবার আলোচনা করেছেন; সুতরাং বুঝতে দেরি হল না যে, তিনি সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির অদৃশ্য-অথচ-বর্তমান প্রণয়ীটির চাক্ষুষ দর্শন লাভ করেছেন, যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর বাড়ির সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম, তাই নাকি?

কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেবার জন্যে কাপটি তুলছিলেন ধরণীবাবু, কিন্তু ওষ্ঠ পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে শূন্যেই সেটাকে ধরে রাখলেন এবং সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

তোমরা নাড়ী টিপে তবে লোকের ভেতরের খবর বলতে পার, তাও সব সময় পার না, কিন্তু আমরা এক নজরেই পারি।

দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে সেই জাতীয় আনন্দ ক্ষরিত হতে লাগল, যা কোনো আবিষ্কারকের দৃষ্টি থেকে উপচে পড়ে স্বাভাবিক আবিষ্কারের পর।

যখনই দেখলাম, ঘন ঘন সিডান-বডি-ট্যাকসি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জানলায় ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলছে—

তৃতীয় চুমুক দিয়ে খানিকটা চা ডিশে ঢাললেন।

বাধ্য হয়েই, মানে ভদ্রতার খাতিরেই, বলতে হল আমাকে, আজকালকার কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকমের।

আমার এই উক্তিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন তিনি। উত্তেজনাভরে ডিশে ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে মুখটা মুছে হাত ধুয়ে বহুবার-শ্রুত সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগলেন, আমি স্মিতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলাম। তারপর একটু পরেই আমার যা স্বভাব, বাইরে হুঁ হুঁ করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস মহিলা কলকাতা শহরে চাকরি করেন। কলকাতা শহরের বিশাল জনসমুদ্রে এত অসংখ্য কুৎসা-বুদ্বুদ উঠছে এবং লয় পাচ্ছে যে, তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসর নেই কারও, তা ছাড়া এখানে কেউ কারও তোয়াক্কাই করে না। কিন্তু এই মহিলা যদি কোনো মফস্বল শহরের ডোবায় গিয়ে বুদ্বুদ কাটতেন, সেখানে যদি ঘন ঘন সমাগত সিডান বডি ট্যাকসি এবং টর্চ দিয়ে আলো ফেলার সঙ্গে ইয়াপাকানো গোঁফকে জড়িয়ে ফেলবার সুযোগ দিতেন সেখানকার ধরণীবাবুদের, তা হলে কি বিপর্যস্ত কাণ্ডই না ঘটত: মফস্বলের ছোট শহরে সকলেই সকলের হিতৈষী, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কতকগুলো বেকার বুড়ো আর ছোঁড়া সকলের সব খবরের জন্যে সর্বদা উৎকর্ণ। মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারনীদের দেখেছি, তাদের কথা ভাবলে ভারি দুঃখ হয় আমার। শহরসুদ্ধ সবাই তাদের গার্জেন। তাদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে হেসে কথা কইবার উপায় নেই, রাত নটার পর কোথাও থাকবার উপায় নেই (যেন রাত্রি নটার আগে কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব!), বেচারীদের কিছু করবার উপায় নেই। বহু গার্জেন কটমট করে সর্বদাই তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, এবং তারাও লেখা-পড়া শিখে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে হাস্যকর নিয়মের বোরখা পরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দিনীর মতো।

সহসা সচেতন হয়ে উঠলাম ধরণীবাবুর একটা কথায়।

আরে, ওই যে তোমার পূর্ণেন্দুবাবুর মেয়ে—ওইটুকু বয়সে ও না করেছে কি?

তখন আমি জানতাম না, পরে জেনেছি, এই ধরণীবাবুই তাকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন একটা। হ্যাঁ, এই ধরণীবাবুই—তার পিতৃবন্ধু।

উঠে পড়লাম।

আমাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়িতে এখুনি। বংশীর খুব অসুখ।

ওঁরা এসেছেন নাকি এখানে?

হ্যাঁ।

রাত্রিও এসেছে?

এসেছে।

কবে?

কবে ঠিক জানি না।

জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে যখন হাতঘড়িটা বাঁধছি, ধরণীবাবু বললেন, চল, আমিও দেখে আসি। হাজার হোক বন্ধুলোক।

আপত্তি করতে পারলাম না।

ধরণীবাবু সঙ্গী হলেন।

।। তিন ।।

সেদিন সকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে। বেরিয়েই হাতঘড়িটা দেখলাম—ছটা বেজে পনেরো মিনিট। যে ঘটনা-পরম্পরার জন্যে অনিবার্যভাবে আমার দেরি হল, সেগুলো না ঘটলে আমি অন্তত আরও দু'ঘণ্টা আগে যেতে পারতাম বংশীর কাছে এবং ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হত না। আমার এখনও ধারণা, ব্যাপারটা যদি ধরণীবাবুর জ্ঞানগোচর না হত তা হলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব জানাজানি হয়ে যেত না, হয়তো অন্য রকমও হতে পারত। কারণ বাড়িতে কেউ ছিল না। যে ঠিকে ঝিটা ওঁরা বহাল করেছিল এসেই, সেই ঝিটা তখনও আসেনি। স্বর্ণেন্দুর মা-ও ও-বাসায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। বস্তুত, পরে শুনেছিলাম, তিনি এ বাড়িতে এসে ওঠেনইনি। তিনি গুরুদেবকে নিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় উঠেছিলেন। রায় মশায়ের বাড়ি থেকে রাত্রির সঙ্গে এসে গত রাত্রে যখন তাঁকে আমি দেখেছিলাম, তার একটু আগে তিনিও এদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য—বংশী অথবা পূর্ণেন্দুবাবু নয়, জ্যোতির্ময় এবং রাত্রি। তিনি দেখতে এসেছিলেন, জ্যোতির্ময় এসেছে কি না! আমি চলে আসবার একটু পরেই তিনিও ফিরে গিয়েছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে।

ঘড়িটা থেকে চোখ তুলেই দেখতে পেলাম, ঘোর-নীল-লুঙ্গি-পরা সেই রোগা ফরসা ছোকরাটিকে, যে রোজ রাস্তার ধারের জানলায় ছোট হাত-আয়নাটি রেখে তন্ময়চিত্তে মুখ-বিকৃতি সহকারে দাড়ি কামায়। সেদিনও সে তাই করছিল। জানলার নীচেই সরু ফুটপাথে একটা কালো বেড়াল দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে পীতাভ সবুজ চোখ দুটো ক্ষণকাল নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ সে ত্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটায়। তার পরের বাড়ির কাকাতুয়াটা তারস্বরে চিৎকার করছিল সমস্ত পাড়াটা সচকিত করে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেই বাঁকের মুখে একটা কল আছে, সেই কলকে কেন্দ্র করে কলতলার কাব্যকলরব উঠছিল দগ্ধ-কটাহ-মার্জন-নিরতা আঁট-সাঁট কাপড়-পরা একটি তরুণী পরিচারিকার নবোন্মেষিত যৌবনের ঈষন্মাদক আবহাওয়ায়; আর একটু দূরে একজন ফেরিওয়ালা এসে এ-পাড়ার সবজান্তা গোষ্ঠবাবুর অহমিকাকে তোয়াজ করে কতকগুলো দাগী আম বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল, তাঁর কাছে বলছিল, আপনি হলেন সমঝদার লোক বাবু, তাই আপনার কাছেই আগে নিয়ে এলুম। বুলবুলভোগ আম, এ কলকাতা শহরে কটা লোক চেনে, বলুন? এই আমগুলো দেখে

ধরণীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হল সম্ভবত, বললেন, তোমার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা হবে হে ডাক্তার? পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দেখলাম, কাল রাত্রে ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার পর পাঁচ টাকা থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তাই রয়েছে। ড্রাইভারকে আমি পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিলাম, সে কত ফেরত দিয়েছিল তা গুনে নেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তখন আমার। দেখলাম, একটা আধুলি রয়েছে, বার করে দিলাম ধরণীবাবুকে। ধরণীবাবু বললেন, ও নিয়ে আমি কি করব, কিছু কমলালেবু-টেবু কিনিগে চল। রুগীর বাড়ি যাচ্ছি, তা বললে কি চলে, হাজার হোক বন্ধুলোক, লোক তো ধর্মত একটা—। ধরণীবাবু কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন, যেন আমি কমলালেবু কেনার বিরোধী। আমি কিছু না বলে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মোড়ের চায়ের দোকানটায় দেখলাম, বাঁধা খদ্দেরগুলি যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করতে করতে বহুবার-মোছা অয়েলক্লথমোড়া টেবিলের ধারে বসে রোজ যেমন চা খান, সেদিনও তেমনই খাচ্ছেন। ঠোঁটে ধবল, আঙুলে ধবল, চোখের কোলে ধবল জ্যোতিষীটি নিজের আসনটি পাতছেন ফুটপাথের ওপর এদিক চাইতে ওদিক চাইতে। শ্যামবাজারমুখী ট্রামটার শিরোনামায় এস্প্লানেড লেখা রয়েছে,—হয় ড্রাইভার অন্যমনস্ক; না হয় ঘোরাবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। ডানহাতি গলির মোড়টায় শ্বশুরের সহায়তায় সদ্য-বিবাহিত যে যুবকটি মনিহারী দোকানটি সম্প্রতি খুলেছেন; তাঁকে সঙ্গসুখ দান করবার জন্যে যে কজন ছোকরা ওই সঙ্কীর্ণ দোকানের সঙ্কীর্ণতর বেঞ্চিটায় বসে রোজ হাসাহাসি করেন; তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন এসে জুটেছেন দেখলাম, যেটির নেউলের মতো মুখ সেইটি এবং নাদুসনুদুসটি। কার বাড়ি থেকে জানি না, বড় বড় লোমওয়ালা ছোট্ট একটা কুকুর ফুটপাথে বেরিয়ে ছুটোছুটি করছিল—চ্যাপ্টা-গোছের ছোট, লোমে পরিপূর্ণ চোখ দেখা যায় না....

চলে যেও না হে, দাঁড়াও।

ও-ধারের ফুটপাথে কমলালেবু দেখতে পেয়েছিলেন ধরণীবাবু। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করলাম। পশ্চিমদেশীয় দোকানদারটির সঙ্গে হাস্যকর হিন্দীতে অনেক দর-কষাকষি করলেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক ধস্তাধস্তির পর টাকায় বত্রিশটা থেকে টাকায় চল্লিশটা দিতে সে যখন রাজি হল তখন আট আনার লেবু কিনলেন ধরণীবাবু। পাশের একটা মুদীর দোকান থেকে একটা বড় ঠোঙা ভিক্ষে করে আনলেন।

ওই সমস্তই এবং আরও নানা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল সেদিন সকালে। সমস্তই আমি ধৈর্যভরে সহ্য করেছিলাম সেই শক্তিবলে, যে শক্তি মানুষ লাভ করে আনন্দের প্রেরণায়। আমার দেওয়া তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্শ্চার পান করে বংশীর প্রলাপ থেমেছে এবং রাত্রি নিজে এসে সে কথা আমায় বলে গেছে, এতেই আমার মন এমন একটা

উত্তুঙ্গলোকে আরোহণ করেছিল যে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার সাধ্য ছিল না আমাকে বিচলিত করে।

মনুমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে সমতলবর্তী লোকজন গাড়ি বাড়ি এবং তাদের সমন্বয়-বৈচিত্র্য লোকে যেমন নিরুৎসুক অনুকম্পাভরে দেখে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আমিও সেই রকম উদাসীন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম অনেক ঊর্ধ্বলোক থেকে। যদিও রাত্রির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয়নি, তার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হর্ষের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখতে পাইনি, তবু সেদিন

কলকাতা শহরের কলরবের মধ্যেও দুটি কথা আমার কানে যেন গান গেয়ে ফিরছিল--"থেমে গেছে"।

।। চার ।।

স্বর্ণেন্দুর বাসায় যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু তখনও সেই অন্ধ গলিটা থেকে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়নি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। সরু লম্বা ঈষৎ অন্ধকার গলিটা, তবু তার ভেতর থেকে ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল, কল থেকে চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটা একটানা শব্দও ভেসে আসছিল কোথা থেকে যেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে পাশের বাড়ির বারান্দার খোপ থেকে পায়রাটা ডাকছিল তার সঙ্গিনীকে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে, ঠুনঠুন শব্দ করে একটা রিক্‌শওয়ালা অলস মন্থর গতিতে চলেছিল।

প্রথম রসভঙ্গ হল গলিতে ঢোকবার মুখেই, ধরণীবাবুর কমলালেবুর ঠোঙাটা ফেটে গেল, পড়ে গেল দু-চারটে লেবু এবং সেগুলোকে সামলাতে গিয়ে আরও দু-চারটে পড়ল। বিরক্ত ধরণীবাবু হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলেন সে সব। আমার লোকটাকে ঘোর মিথ্যুক বলে সন্দেহ হল। গত তিন মাস যাবৎ ইনি কোমরের বাতের ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে; দেখা হলেই বলেন, ওষুধে কোনো ফল হল না হে, মোটে হেঁট হতে পারি না। স্বচক্ষে দেখলাম বেশ হেঁট হতে পারছেন তিনি। অথচ সে কথা স্বীকার করেন না কখনও ভুলেও, চিকিৎসা করাচ্ছেন যেন আমাকে বাধিত করবার জন্যই। মানব-চরিত্রের একটা দিক যেন পরিস্ফুট হল আমার কাছে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

গলির ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল, স্বর্ণেন্দুদের বাসার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশেই একটা শ্যাওলা-পড়া ছোট চৌবাচ্চা, একটা ভাঙা কলের মুখ থেকে অবিরাম জল পড়ছে তাতে, কাছেই হাতলহীন টিনের একটা মগ পড়ে আছে কাত হয়ে।

ধরণীবাবু কমলালেবুগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিলেন। আমি একাগ্রদৃষ্টিতে খোলা দরজাটার পানে চেয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, হঠাৎ হয়তো রাত্রি এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে; অপরিচিত জ্যোতির্ময়বাবুও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে। বেশ মনে আছে; এদের দু'জনকেই আমি প্রত্যাশা করছিলাম। ওই খোলা দরজায় স্বর্ণেন্দুর আবির্ভাব যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, আমি সেটা প্রত্যাশা করিনি।

কেউ এল না। এটাও বেশ মনে পড়ছে, তাদের না আসার একটা সঙ্গত কারণও আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম ওই অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, সারারাত জেগে এসে ক্লান্ত জ্যোতির্ময়বাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত্রি হয়তো স্নান করছে। কিংবা হয়তো নিদ্রিত বংশীর মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে আস্তে আস্তে। সমস্ত রাত জেগে স্বর্ণেন্দু হয়তো শুয়েছে একটু--

খোলা দরজাটা দিয়ে আমি ঢুকলাম।

আমার পিছু পিছু ধরণীবাবু।

ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা। যদিও তিনি উত্থান-শক্তিরহিত,

পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানবার যদিও কোনো উপায় ছিল না তাঁর, তবু আমার মনে হয়, কোনো অতীন্দ্রিয় উপায়ে কিছু আভাস যেন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন্ত চোখটা যেন তারস্বরে প্রশ্ন করছিল, কি হয়েছে, ও-ঘরে কি হয়েছে, জান তোমরা?

তাঁর বিছানার পাশেই খালি একটা চেয়ার ছিল। ধরণীবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখে প্রাগ্‌জীবনের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ-জনিত দাস্য-ভাবটা প্রকট হয়ে উঠল, আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সবিনয় নমস্কারান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করলেন তিনি চেয়ারটাতে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্বর্ণেন্দু যেন দোল খেলেছে। তার জামা, কাপড়, বংশীর বিছানা সব লালে লাল। চাপ চাপ রক্ত চতুর্দিকে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা হাঁ করে আছে। পাশেই পড়ে আছে রক্তাক্ত বাঁকা ছোরাটা, যেটা ফার্নান্ডিজ রাত্রিকে উপহার পাঠিয়েছিল তার জন্মদিনে। লাল খাপখানাও পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি!

স্বর্ণেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তার ছোট্ট হাসিটি হেসে বললে, আমি করেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

ঠিক এর অব্যবহিত পরে যা যা ঘটেছিল, তার স্মৃতি আমার মনে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করব না। গ্লানিজনক বলে নয়, এ কাহিনীর পক্ষেও অবান্তর বলে। তা ছাড়া লিপিবদ্ধ করবার মতো সুসম্বন্ধভাবে সব কথা আমার মনে নেই। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর তাকে লোমহর্ষণ অথবা ওই-জাতীয় কোনো একটা বিশেষণে ভূষিত করে আমরা সাড়ম্বরে সাধারণত যা যা করে থাকি, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুলিশ এসেছিল, খবরের কাগজে সত্যমিথ্যা-কল্পনা- প্রণোদিত সংবাদ বেরিয়েছিল, মকদ্দমা হয়েছিল, তদ্বির হয়েছিল। এমনই যে কিছু একটা নিয়তি ঘটবেই, একদিন ধরণীবাবু মাথা নেড়ে বার বার সে কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অদূরদর্শিতাপ্রযুক্ত এত বড় একটা কাণ্ড চাপা দেবার কল্পনাও করেছিলাম এবং ধরণীবাবু না মানা করলে তা করতে গিয়ে আমি সুদ্ধ যে জড়িয়ে পড়তাম—এ কথা নিজেদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে জাহির করে আমার কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। অনেক ফুসফুস, অনেক গুজগুজ, উক্ত-অনুক্ত অনেক চিন্তা, উদ্বেগ-অনুদ্বেগের অভিনয়—কোনো কিছুরই ত্রুটি হয়নি। আইনের রথচক্রের আবর্তনে যে পরিমাণ শব্দ ও ধূলি উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সবই হয়েছিল। সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা এ কাহিনীর পক্ষে ক্লান্তিকর। আমি রাত্রির কথা লিখতে বসেছি, স্বর্ণেন্দুর নয়। রাত্রিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে স্বর্ণেন্দুকে আনতে হয়েছে, অন্ধকারকে ভাল করে জানবার জন্যে যেমন আলো জ্বালতে হয়।

ইতিপূর্বে একবার বলেছি, আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ কাহিনীতে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সেই ফাঁকগুলো আমি আমার কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি। আমার এ কল্পনা-বিলাসের হেতু কি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, সত্যের অনুরোধে আমাকে বলতেই হবে, মোহ। এই মোহের বশেই সব জেনে-শুনেও রাত্রির সম্পর্কে আমার মন তিক্ত হয়ে ওঠেনি; এর পরও প্রভাতকে নিষ্কলঙ্ক করবার প্রয়াস আমি করেছিলাম।

এই সময় একটি আশ্চর্য চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস আমি পেয়েছিলাম, আগে সেই কথাই বলব; চরিত্রটি অসাধারণ। অর্থাৎ এত অসাধারণ যে, সব কথা জানবার পরও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না; মনে হয়, এমন নিগূঢ় কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, এবং যা দেখতে পেলে, বুঝতে পারলে ওই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে অনায়াসে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে। অসাধারণকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত করবার কি দুর্দমনীয় আগ্রহ আমাদের! কোনো কিছুর অসাধারণত্ব আমরা যেন সইতে পারি না। মনে হয়, লোকটা সুদক্ষ অভিনেতা; মনে হয়, মুখোশ পরে আছে; কিছুতেই মনে হয় না, লোকটা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এই ব্যক্তিটির কোনো মুখোশ নয়নগোচর অথবা বুদ্ধিগোচর যখন হয়নি, তখন তাঁকে আমি অসাধারণ বলতে বাধ্য। বস্তুত, আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তাঁকে মোটে অসাধারণ বলে মনেই হয়নি। সমস্ত ইতিহাস জানবার পর তবে তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়েছি। রাত্রির কাহিনীতে এই চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, রাত্রির মায়ের জীবনের বিভিন্ন

যুগকে এ চরিত্রটি, শুধু গভীরভাবে নয়, নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং মুখ্যভাবে না হলেও গৌণভাবে রাত্রির সঙ্গে এর যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

বিশ্লেষণ করলে এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কারণ আবিষ্কার করা যায়, যা আমি এ প্রসঙ্গের অবতরণিকায় এইমাত্র বললাম। আমরা সহসা অসাধারণকে অসাধারণ বলে চিনতে পারি না, চিনলেও মানতে পারি না,—অহঙ্কারবশে মানতে চাই না। রাত্রির মা পরবর্তী জীবনে যাঁকে গুরুদেব বলে সকলের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী জীবনে যদি তাঁর অসাধারণত্বকে মেনে নিতে পারতেন, তা হলে এ সব হয়তো কিছুই হত না। রাত্রির জন্ম হত না হয়তো।

গুরুদেব-শ্রেণির লোকের সঙ্গে দাড়ি-জটা-গেরুয়া-রুদ্রাক্ষজাতীয় যে সব জিনিস সাধারণত জড়িত থাকে, রাত্রির মায়ের গুরুদেব রাখালবাবুর সে সব কিছুই ছিল না। নামের পূর্বে স্বামী এবং পরে আনন্দ যোগ করে ধ্বনি-ঝঙ্কার দ্বারা নিজের নামমাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টাও তিনি করেননি, বস্তুত ধর্ম নিয়ে কোনো ভড়ংই ছিল না তাঁর। রাখালবাবু এত বেশি রকম সাদাসিধে ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে হঠাৎ নির্বোধ বলে সন্দেহ হত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড় ছিল তাঁর, চোখ দুটো খুব শান্ত ধরনের ছিল, কিন্তু চোখে অদ্ভুত ধরনের বিস্মিত দৃষ্টি ছিল একটা। মনে হত, সর্বদাই অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে যেন তিনি চেয়ে আছেন জগতের পানে। ভাল করে লক্ষ্য না করলেও বোঝা যেত যে, সে বিস্ময় এত গভীর, এত সর্বগ্রাসী যে, অন্য কোনো দিকে মন দেবার অবসর নেই তাঁর। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে কোনো কোনো দর্শক যেমন আত্মহারা হয়ে যান, পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না, রাখালবাবুও ঠিক তেমনই যেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চের সামনে সবিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেও যে একজন অভিনেতা, সে খেয়াল নেই তাঁর। অন্যান্য অভিনেতারা আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর এই বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও যেন তাঁকে সচেতন করতে পারছেন না, বাধ্য হয়ে অন্য একজন অভিনেতা এসে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এবং রাখালবাবু একটু সরে দাঁড়িয়ে সে অভিনয়ও সমান বিস্ময়ে উপভোগ করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোবৃত্তি অসাধারণ। কিন্তু অসাধারণ কেউ তাঁকে বলেনি। নির্বোধ, কাপুরুষ, পাগল, এমন কি নপুংসকও কেউ কেউ বলেছে তাঁকে শুনেছি। কিন্তু তিনি এ সব গ্রাহ্য করেননি, কারণ গ্রাহ্য করবার মতো মনোবৃত্তি থাকলে তিনি আত্মহারা অভিনয়-রসিক না হয়ে আত্মপরায়ণ কলাকুশল অভিনেতা হতেন। এই আত্মবিস্মৃত মনোবৃত্তি ছাড়া আর একটা ধর্ম ছিল তাঁর, যাতে প্রতিহত হয়ে সমালোচক বীরপুরুষদের বাক্যবাণ সব ভোঁতা হয়ে যেত শুনেছি!—তাঁর সরল হাসিটি। যে যাই বলুক, বিরুদ্ধ সমালোচনা যত বিষাক্ত, যত অসম্মানজনকই হোক না কেন, সরল হাসিটি হেসে তিনি তার নিষ্পত্তি করে ফেলতেন, মনে কোনো দাগ পড়ত না। তিনি বোধ হয় ভাবতেন, সমস্তটাই তো অভিনয়, রেগে কি আর হবে! এ সব অবশ্য আমার কল্পনা, কারণ আমি তাঁর বিরুদ্ধ-সমলোচকদের দেখিনি এবং তাঁকেও মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিলাম। শুনেছি, আর একটা সুবিধে ছিল রাখালবাবুর, এক জায়গায় তিনি বেশিদিন থাকতেন না, ভারতের নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, প্রধানত তীর্থে তীর্থে। লোকটির পরনে আড়ময়লা কাপড়, হাত কাটা ফতুয়া, মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি অযত্নরক্ষিত, অর্থাৎ যদিও তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র বলে মনে হত, কিন্তু ব্যাঙ্কে তাঁর অনেক টাকা ছিল এবং অধিকাংশই তার ব্যয় করতেন তিনি দেশভ্রমণে। তাঁর সম্বন্ধে এত সব তথ্য আমি পরে সংগ্রহ করেছিলাম—কিছু রাত্রির কাছে, কিছু ধরণীবাবুর কাছে, কিছু নিখিল চৌধুরীর কাছে। কল্পনাও

খানিকটা রঙ ফলিয়েছে। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে। স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে মির্জাপুর স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে প্রথমেই যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তিনিই রাখালবাবু। তিনি ফতুয়া পরে বারান্দার এক ধারে বসে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিলেন ফুটপাথের ওপর ক্রীড়ানিরত একটি শিশুকে। শিশুটির মাথায় চুল চুড়ো করে বাঁধা, চোখে কাজল, পরনে রঙচঙে পোশাক। পাশের বাড়িতে বোধহয় বিয়ে ছিল। কাছেই সার সার বাজনদার বসে ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন—তাঁর সেই শান্ত অথচ কৌতূহলী দৃষ্টি। তিনিই যে রাত্রির মায়ের গুরুদেব, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। গুরুদেবের অঙ্গে অন্তত একটা গৈরিক বসনও থাকবে—এ প্রত্যাশা করেছিলাম। তাঁকে গোমস্তা-জাতীয় একটা কিছু ভেবে একটু আদেশের ভঙ্গিতেই বলেছিলাম মনে পড়ছে, বাড়ির ভেতরে একবার খবর দাও তো, বল গিয়ে—স্বর্ণেন্দুবাবু বাসা থেকে ঘনশ্যামবাবু এসেছেন, বড় জরুরি দরকার। তাঁর সেই সরল হাসিটি হাসলেন তিনি, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গেলেন। আমি বারান্দাতেই অপেক্ষা করে রইলাম। একটু পরে তিনি ফিরে এসে বললেন স্বর্ণেন্দুর মা পুজো করতে বসেছেন, আপনি যদি অপেক্ষা করতে পারেন অপেক্ষা করুন, কিংবা যদি ইচ্ছে করেন আমাকেও বলে যেতে পারেন—কি দরকার!

এত বড় একটা নিদারুণ সংবাদ ভৃত্য-জাতীয় একটা লোকের কাছে দেওয়া অসমীচীন বোধ করেই যে আমি অপেক্ষা করা স্থির করলাম তা নয়, কারণ কোনো কিছু স্থির করবার মতো মাথার ঠিক ছিল না আমার। আমি যন্ত্রচালিতবৎ ঢুকে পড়লাম সামনের ঘরটাতে। রাখালবাবু আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার বাইরে গিয়ে বসলেন। শিশুটি তখনও ফুটপাথে খেলা করছিল।

আমার মনটা তখন এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিল যে, স্বর্ণেন্দুর মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুনেই আমি যেন বেঁচে গেলাম, অন্য কোনো কারণে নয়, কিছু একটা করতে পেয়ে। বংশীর গলায় প্রকাণ্ড ক্ষতটা, রক্তাক্ত স্বর্ণেন্দু, ধরণীবাবুর অন্তর্ধান ও প্রতিবেশীদের নিয়ে আগমন—এ সমস্তকে ছাপিয়ে আমার মনে একটি কথা শিখার মতো জ্বলছিল, জ্যোতির্ময়কে নিয়ে রাত্রি স্টেশন থেকে ফেরেনি। বাইরের বারান্দায় যিনি ক্রীড়ানিরত শিশুটিকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দিকে মন দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না আমার। আমার অন্যমনস্কতা এবং তাঁর অন্যমনস্কতার অবকাশে তাঁর সঙ্গে সেদিন যতটুকু পরিচয় হয়েছিল তা স্বল্প বলেই স্মৃতি সেটি কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রেখেছে। তাঁকে সেই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। আর একটু পরিচয় অবশ্য পেয়েছিলাম স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর, অর্থাৎ যখন আবিষ্কার করেছিলাম—ওই আড়ময়লা-কাপড়-পরা আপাতনগণ্য ব্যক্তিটিই রাত্রির মায়ের গুরুদেব, যাঁর সঙ্গে রাত্রির মা ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ান সর্বত্র।

।। দুই ।।

কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই।

কিন্তু এটা এখনও বেশ মনে আছে যে, সীমন্তে চওড়া সিঁদুর এবং টকটকে লালপেড়ে গরদ

পরে স্বর্ণেন্দুর মা এসে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও আমি অসাড়ভাবে বসেই ছিলাম কিছুক্ষণ, তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন ভাষায় আবোল-তাবোল কি যে বলেছিলাম, তা মনে নেই; নিদারুণ দুঃসংবাদটাই জ্ঞাপন করেছিলাম নিশ্চয়।

সমস্ত শুনে স্বর্ণেন্দুর মা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখচ্ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধী যেমন ভাবে দণ্ডাজ্ঞা শোনে, ঠিক যেন তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সব শুনলেন। সব শোনবার পর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও খানিকক্ষণ। তারপর সহসা যেন ভেঙে পড়লেন, বসে পড়লেন ঘরের মেঝের ওপর, কাঁদলেন না, একটি কথা বললেন না। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, যদিও তিনি বরাবর আমার দৃষ্টির সামনেই বসে ছিলেন, তবু খুব সম্ভব বরাবর আমি তাঁকে দেখছিলাম না। শব্দটা শোনবার পর আবার যেন তাঁকে নূতন ভঙ্গিতে নূতন রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। মাথায় অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে, মুখের ওপর ঘাড়ের ওপর পিঠের ওপর বিস্রস্ত হয়ে নেমে এসেছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশভার, বিস্ফারিত চোখ দুটো সামনের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, মেঝের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে দুলছেন তিনি, আর সমস্ত অন্তর মথিত করে যে আর্ত শব্দটা উঠছে তার অনুরূপ শব্দ আমি শুনেছি প্রসব-বেদনাতুরা জননীর মুখে। খানিকক্ষণ পরে সহসা শব্দটা থেমে গেল। বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি আরও বিস্ফারিত হয়ে স্থির হয়ে গেল, স্থির দৃষ্টিতে কি একটা দেখতে লাগলেন যেন তিনি। তারপর সহসা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, গৌতমের আশ্রম, এক চাপ কালো কলঙ্কের মতো কালো পাথরটা এখনও পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি; বৃষ্টিতে গলে যায়নি, রোদে ফেটে যায়নি, একটুও ক্ষয়ে যায়নি, যুগযুগান্ত ধরে ঠিক তেমনই ভাবে পড়ে আছে।—এইটুকু বলে আবার থেমে গেলেন তিনি, আবার দুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ক্রমশ তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হতে লাগল, আবার কি যেন একটা দেখতে লাগলেন তিনি, আবার দোলা বন্ধ হয়ে গেল, বক্তৃতার ভঙ্গিতে আবার শুরু করলেন, পাষাণী অহল্যা আজও পাষাণস্তূপ হয়ে পড়ে আছে, আজও মুক্তি হয়নি তার, অনেক শাস্তি বাকি আছে, অনেক রোদ-বৃষ্টি-বজ্রপাত সহ্য করতে হবে এখনও। তারপর দু'হাত মেঝের ওপর প্রসারিত করে লুটিয়ে পড়লেন, কোথায় তুমি নবজলধরশ্যাম রামচন্দ্র, এস, দয়া কর, অভয় চরণের স্পর্শ দিয়ে পাষাণী অহল্যাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—

নিস্পন্দ দেহটা পড়ে রইল মেঝের ওপর। স্বর্ণেন্দুর মুখে শুনেছিলাম, তার মায়ের মাঝে মাঝে 'ভর' হয়—এই কি? হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রাখালবাবু উঠে এসেছেন কখন বারান্দা থেকে এবং সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। তাঁর সে নির্বিকার অথচ বিস্মিত দৃষ্টি কোনো দিন ভুলব না আমি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি রাত্রির মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন। অতিশয় স্নেহভরে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হতে লাগল, তিনি ঠিক সান্ত্বনা দিচ্ছেন না, তিনি যেন কোনো অভিনেত্রীকে অভিনয়-কুশলতার জন্যে নীরবে বাহবা দিচ্ছেন।

চল, ও-ঘরে চল।

রাত্রির মা বেশবাস সম্বৃত করে উঠলেন এবং তাঁর অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলাম—রাখালবাবু বলছেন, তুমি যদি স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার জন্যে থাকতে চাও, থাক, আমি কাল হরিদ্বারে চলে যাই, টাকা-কড়ির সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি।

তুমি আমাকে থাকতে বল?

আমি কিছুই বলি না—একটু থেমে—কোনো দিনই তো কিছু বলিনি।

তারপর খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর সহসা পাশের বাড়িতে বিয়ের বাজনা বেজে উঠল একসঙ্গে। আর শুনতে পেলাম না কিছু। একটু পরে বেরিয়ে এলেন রাখালবাবু, শান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড, তারপর বললেন, আপনার পুরো নামটা কি?

ঘনশ্যাম সরকার।

সরকার? 'আই' দিয়ে বানান করেন, 'এ' দিয়ে? 'কে' না 'সি', সেটাও বলবেন দয়া করে।

বললাম। তিনি একটা ড্রয়ার টেনে একটা চেক-বুক আর কলম বার করলেন, তারপর একটা চেক কেটে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, হাজার টাকার একখানা চেক। চেক থেকে চোখ তুলতেই তিনি বললেন, আমরা কাল হরিদ্বার যাচ্ছি। স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার তদ্বির যাতে হয়, দেখবেন দয়া করে।

বলেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তাঁকে প্রণাম করতে ভুলে গেলাম।

এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

গোটা পাঁচেক অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় লোক গোটা তিনেক ঢোল আর গোটা দুই সানাই নিয়ে কি ভীষণ শব্দ-প্রভঞ্জন সৃষ্টি করতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ওদের শীর্ণ দেহের পেশীতে যতটা শক্তি আছে সমস্তটা প্রাণপণে প্রয়োগ করে সুর সৃষ্টি করে চলেছে ওরা, রঙিন-কাপড়-পরা নানা বয়সের এক দল মুগ্ধ শ্রোতাও দাঁড়িয়ে রয়েছে আশে-পাশে, আড়ময়লা কয়েকটা রাজহাঁস তাদের বাচ্চাগুলিকে আগলে খুব নির্বিকার ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের কাছে-পিঠেই, বাচ্চাগুলি যেন পাঁশুটে রঙের তুলো দিয়ে তৈরি, ভবিষ্যৎ রাজহাঁস যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বোঝা যায় না সহসা; ঢোল আর সানাই সম্বন্ধে ওরা উদাসীন, রাস্তার নালা থেকে আহার সংগ্রহের দিকেই ওদের বেশি আগ্রহ।....নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গাম্ভীর্যকে বিচলিত করে একটা খামখেয়ালী দুরন্ত হাওয়া হুড়োমুড়ি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে. লুটোপুটি করছে গাছের পাতায়, ছুটোছুটি করছে রাস্তার ধুলোয়. ছেঁড়া কাগজ শুকনো পাতাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশিতে। ঢোল আর সানাই সমানে বেজে চলেছে, তাদের উচ্চনিনাদকে বিক্ষত করে একটা কাঠবেড়ালী অশ্বত্থগাছের ডালে পুচ্ছোৎক্ষেপসহকারে ডাকছে—চিক-চিক-চিক। মুচীটা নেই; কইলুর বদলে আর একজন লোক এসেছে, কণ্ঠিপরা ভক্ত-গোছের। ময়দা-কলের আকাশচুম্বী চিমনিটা থেকে খুব ঘন কালো রঙের ধোঁয়া খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কুণ্ডলাকারে বেরুচ্ছে। ঈশান-কোণে পুঞ্জীভূত ঘোমটার মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে, একটু পরে কালবৈশাখীর যে তাণ্ডব শুরু হবে, তারই মহড়া চলছে বোধ হয় ওখানে। "সীত্তারাম, সীত্তারাম বোলো ভাই"—গর্জন করতে করতে সামনের গলি থেকে ষণ্ডাগোছের একটি লোক বেরুল, তার হাতে চকচকে একটা ঘটি, কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, এদিক ওদিক চেয়ে সশব্দে একবার উদগার তুললে, তারপর আবার "সীত্তারাম বোলো, সীত্তারাম বোলো ভাই" বলতে বলতে চলে গেল; একপাল নধরকান্তি গাভী প্রকাণ্ড একটা ষণ্ড-সমভিব্যাহারে হেলতে দুলতে মন্থরগমনে পার হয়ে গেল রাস্তাটা; এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসল সামনের বাড়ির ছাতে; একটা ছুটন্ত গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে কমলা-রঙের ওড়না গায়ে পরদানশীন একটি মেয়ে পরদাটি একটু ফাঁক করে কৌতূহলভরে দেখতে দেখতে চলে গেল।....ভাবছি, বাংলার বাইরে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এই পরিবেষ্টনীর মাঝখানে কলকাতা শহরের সেই সন্ধ্যাটি আমি মূর্ত করে তুলতে পারব কি না, যে সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সেদিন একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, গুমট গরমটা আরও যেন বেড়ে উঠেছিল তাতে। নিখিল চৌধুরী ট্রাম থেকে নামলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, ভালই হল, চলুন যাওয়া যাক। আমি প্রায় পনের দিন কলকাতায় ছিলাম না। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশে গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে কটা বই নিয়েছিলাম, শেষ হয়ে গিয়েছিল। বই কিনতেই বেরিয়েছিলাম। একটা পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কতকগুলো উপন্যাস বেছে রেখে দরদস্তুর করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হল চলুন যাওয়া যাক। —এই কথাগুলো নিখিল যদিও খুব

স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হল, তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের একটা স্বস্তির নিশ্বাসও যেন নির্গত হল, যে ধরনের স্বস্তির নিশ্বাস কোনো মজ্জমান ব্যক্তির বক্ষ ভেদ করে নির্গত হওয়া স্বাভাবিক—সামনে একটা নৌকা বা ভেলা দেখলে। আমি বইগুলোর দাম দিয়ে বগলে করে নিলাম, দরদস্তুর করবার সময় হল না। নিখিল চৌধুরীর পানে তির্যক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে বললাম, কেন, ব্যাপার কি?

বিরক্তিকর, চলুন না।

মজ্জমান ব্যক্তির নিশ্বাসের আভাস আর পেলাম না, নিখিল তখন সামলে নিয়েছেন। নীরবে অনুসরণ করলাম নিখিল চৌধুরীকে।

কলেজ স্ট্রিটের মোড় তখন চতুর্মুখী জনস্রোতের সংঘর্ষে তুমুল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সারি সারি ট্রাম, সারি সারি মোটর, রিক্‌শ, ফিটনগাড়ি, গরুর গাড়ি, ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, খবরের কাগজের হকার, প্যাচপেচে কাদা, অসংখ্য মানুষ, নানা রকমের চিৎকার। আমরা একটু সরে গিয়ে দেলখোশ কেবিনের সামনা-সামনি হ্যারিসন রোডটা পেরিয়ে যাব ঠিক করলাম ট্রামগুলো বেরিয়ে গেলেই। সারি সারি অনেকগুলো ট্রাম দাঁড়িয়েছিল, একটা গরুর গাড়ি উল্টে ছিল ট্রাম-লাইনে। পিছু ফিরে দেখলাম, দেলখোশ কেবিন উপচে পড়ছে, একটুও স্থান নেই, এক কাপ চা খেয়ে সময়টা অতিবাহিত করবার ইচ্ছাটিকে বিসর্জন দিতে হল; সামনে নবীন ফার্মেসির দোকানে লাল নীল রঙের জল-পোরা বড় বড় কাচের জালাগুলো ইলেক্‌ট্রিক আলোর দৌলতে বিস্ময়জনক হয়ে উঠেছে, কেষ্টদাস পালের প্রতিমূর্তির নীচে বেলফুলের মালা, নানা রকম ছবি, টুকিটাকি জিনিস, লাল রঙের চীনে ফানুস বিক্রি হচ্ছে: ওভারটুন হলে কোনো বক্তৃতা হচ্ছিল বোধ হয়, শেষ হয়ে গেল, গলগল করে লোক বেরুতে লাগল ওয়াই. এম. সি. এ-র দরজা দিয়ে। নিখিল চৌধুরী যে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ক্ষণিকের জন্যে সে কথাও ভুলে গেলাম অন্যমনস্ক হয়ে। কলকাতা শহরে প্রতি মুহূ[illegible]ত বিচিত্র উত্তেজনা যে, কোনো উত্তেজনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, ছায়াবাজির [illegible]া হয় আর মিলিয়ে যায়। সচেতন মনের ওপর দিয়ে প্রতিক্ষণেই নতুন একটা মিছিল চলছে যেন। মানুষ কতক্ষণ মনে রাখবে, কাকে মনে রাখবে? চলমান মিছিলের প্রতি অংশটাই সচল, বিস্ময়কর, উত্তেজনাজনক। মন দিশাহারা হয়ে আত্মরক্ষার্থেই বোধ হয় উদাসীন হয়ে পড়ে শেষটা। না, ঠিক সেই মুহূর্তে দু'মাস আগের ঘটনা আমার মনে ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সক্ষোভে ভাবছিলাম, এম্পায়ারে আজ ভাল একটা নাচ ছিল, নিখিল চৌধুরীর পাল্লায় পড়ে যাওয়া হল না। হঠাৎ ট্রাম-লাইন পরিষ্কার হয়ে গেল, ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে ট্রামগুলো চলতে লাগল, আমরা দু'জনে ট্যাক্সি রিক্‌শ জনতার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হ্যারিসন রোড পার হয়ে গেলাম।

নিখিলবাবু আর একটিও কথা বলেননি। গলিতে ঢুকে আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি বলুন তো, চামেলি আজ ভাল কিছু রেঁধেছে নাকি? নিখিল চৌধুরী গলিতে ঢুকেই পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করেছিলেন, আমার কথা শুনেই ঢাকনি খুলে এক টিপ তুলে নিলেন এবং আমার দিকে চকিতে এক নজর চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে নস্যিটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে রুমাল নিয়ে নাকের আশপাশ ঝেড়ে পুনরায় ভাল করে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি আমাকে যেন কশাঘাত করলে। আমি বিস্মিত হয়ে পুনরায় বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

নিখিলবাবু স্ফুটকণ্ঠে একটু ধমকের সুরে বললেন, চলুন।
তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর!
নীরবেই পথ অতিবাহিত করতে লাগলাম দু'জনে।

।। দুই ।।

নিখিলবাবুর বাসার ছাতে দু'জনে নীরবে বসেছিলাম। কাছে কোনো আলো ছিল না। পাড়াতেই কাদের বাড়িতে যেন গ্রামোফোন বাজছিল। হু হু করে একটা দক্ষিণে বাতাস উঠল। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বসেছিলাম। স্বর্ণেন্দুর বিচারের শেষ নিষ্পত্তি যে হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানতাম না। আমি যে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে ইচ্ছে করে নির্বিকার হয়েছিলাম তা নয়, হাজার টাকার চেক দিয়ে রাখালবাবু আমাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, দু'মাস আগে, আমি যে তার মর্যাদা রক্ষা করিনি তাও নয়। আমি সেই দিনই চেকটা নিখিলবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে বলে এসেছিলাম, আইনত বে-আইনত যে কোনো উপায়ে হোক স্বর্ণেন্দুকে বাঁচাতে হবে। নিখিলবাবু রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু চেকটি তিনি ভাঙাতে চাননি, পরে ভাঙিয়েছিলেন কি না, তা আমি জানি না। নিখিলবাবু ভাল উকিল, স্বর্ণেন্দুর আত্মীয়। যতটা করা সম্ভব ততটা তিনি নিশ্চয় করবেন—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম—এটা ওজুহাতস্বরূপ খাড়া করতে পারি, কিন্তু কারণটা আসলে তা নয়। তা ছাড়া আমি স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে সত্যিই নির্বিকার ছিলাম না, সত্যিই তার কথা উদ্বিগ্নভাবে আমি ভাবতাম মাঝে মাঝে। সে যে নির্দোষ, সে সম্বন্ধেও আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু এটা ঠিক, স্বর্ণেন্দুর চেয়ে রাত্রির কথাই আমি বেশি ভেবেছি, যদিও তার মধ্যেও যে বিস্মৃতি ছিল না, তা নয়। এদের সম্বন্ধে আমার মন সর্বদাভাবে সর্বদা উন্মুখ ছিল না, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, আমার চিত্তবৃত্তি মানবীয়, কোনো উত্তেজনার প্রভাবেই উৎসাহের উচ্চশীর্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না, নেমে পড়ে। স্বর্ণেন্দুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পরদিন থেকেই তা নামতে শুরু করেছিল এবং সাত দিনের মধ্যেই কলকাতা শহরের এবং আমার ডাক্তারী-জীবনের নব নব উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পূর্ণেন্দুবাবুর ভার যখন তাঁর এক মামাতো ভাই এসে নিলেন এবং তাঁর দূরসম্পর্কের জামাই নিখিলবাবু যখন তাঁর তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব স্বীকার করলেন, তখন আমার আর কিছুই করবার রইল না। বস্তুত সামাজিক কোন বন্ধন না থাকাতে আমি আরও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এদের সঙ্গে আমার বন্ধনটা সত্যই আকস্মিক। সেদিন স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে রাত্রি যদি আমাকে অভিভূত না করত, তা হলে আমি এদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না, স্বর্ণেন্দুকে ভাল করে লক্ষ্য করবার সুযোগ, এমন কি প্রেরণাও পেতাম না সম্ভবত। কর্তব্যবোধে আমি স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে একবার দেখা করতেও চেয়েছিলাম, স্বর্ণেন্দুই দেখা করেনি। আইনের কবলে পড়ে বংশীর চিকিৎসক হিসাবে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছিল। আমি যা জানতাম, (যা সন্দেহ করতাম, তা নয়) যথাযথ বলেছিলাম সত্যনিষ্ঠার জন্যে নয়, বাধ্য হয়ে। বানিয়ে দু'চারটে মিছে কথা বললে, স্বর্ণেন্দুর যদি কোনো সুবিধে হত, আমি নিশ্চয়ই বলতাম; কিন্তু সে সুযোগই পাওয়া যায়নি। সেদিন সকালে সেই যে ক্ষণকাল আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছোট্ট হাসিটি হেসে স্বর্ণেন্দু আমাকে বলেছিল—আমি করেছি, সে কথা আর সে প্রত্যাহার করেনি। যে নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করে, তাকে আইনের কবল থেকে বাঁচাবে কে?

শুধু নিজের মুখে নয়, নিজের হাতে লিখে সে দোষ স্বীকার করেছিল। সে লিখে দিয়েছিল যে, সেদিন সন্ধ্যা বেলা তার মা মির্জাপুর স্ট্রিটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে চলে গিয়েছিলেন, তার বোন রাত্রিও মধুপুরে যাবার জন্যে চলে গিয়েছিল ভোরবেলা, পাশের ঘরে বাবা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উত্থানশক্তিরহিত—এই সুযোগে সে স্বহস্তে ছোরা দিয়ে বংশীকে খুন করেছিল কোন বিশেষ কারণে। কারণটা কি, তা সে বলবে না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুর মা, স্বর্ণেন্দুর বাবা এবং রাত্রিকেও তলব করেছিল সাক্ষী হিসেবে। স্বর্ণেন্দুর বাবা কিছুই শোনেননি। পুলিস আসবার সময় তাঁকে একটু আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তারপর সেই দিন তাঁকে তাঁর মামাতো ভায়ের বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়। তিনি নাকি বাঁ হাতে লিখে লিখে স্বর্ণেন্দু, রাত্রি এবং বংশীর কথা জিজ্ঞেস করতেন নিখিলবাবুকে—কোথায় গেল এরা সব? নিখিলবাবু নানা রকম মিছে কথা বলে স্তোক দিতেন। স্বর্ণেন্দুর বাবাকে সাক্ষী দিতে হয়নি, নিখিলবাবু পুলিসকে বলে সে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। স্বর্ণেন্দুর মা সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কারণ ঠিক সেই দিনটি আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর মা স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, স্বর্ণেন্দু দেখা করেনি। রাত্রিকে মধুপুরে পাওয়া যায়নি। তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বম্বেতে একটা হোটেলে, সেখানে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সে ছিল। তার অসুখ করেছিল বলেই সে নাকি আসতে পারেনি, তার বদলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট এসেছিল। তবু কমিশনে সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল তার। সে বলেছিল, সে বংশীকে অসুস্থ দেখে এসেছিল, এর বেশী আর কিছু সে জানে না। স্বর্ণেন্দু তার স্বীকারোক্তির এক বর্ণও প্রত্যাহার করেনি। নিখিলবাবু যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন, তাও সফল হয়নি। কিছুতেই তাকে পাগল বলে প্রমাণ করা গেল না। ডাক্তারেরা পর্যবেক্ষণ করে মত দিলেন যে, তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। সে রীতিমত খায়, ঘুমায়, সুস্থ লোকের মত আলাপ করে—সব শেষ হয়ে যাবার পর নিখিল চৌধুরীর মুখে আমাকে এই সব বিবরণ শুনতে হচ্ছিল। আমি নিজে সাগ্রহে ঔৎসুক্যভরে স্বয়ং এগুলো সংগ্রহ করিনি বলে নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। দূরে গ্রামোফোন বাজছিল, হু হু করে দক্ষিণে হাওয়াটা বইছিল, নিখিলবাবুর ছাতে অন্ধকারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বসেছিলাম আমি।

এসব সত্ত্বেও ওর হয়তো ফাঁসি হত না, যদি না অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাঁকড়াটা উঠত।—এই বলে নিখিল চৌধুরী সশব্দে নস্যি টেনে নিলেন।

অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাঁকড়া মানে?

আপনি শোনেননি কিছু?

মনে মনে আর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না।

পুলিশ স্বর্ণেন্দুকে একজন ফেরারী অ্যানার্কিস্ট বলে সনাক্ত করেছিল, একটা নয়, দু'তিনটে পলিটিক্যাল খুনের সঙ্গে ওর নাকি যোগ ছিল, ওকেই ওরা নাকি খুঁজছিল, বংশীর অ্যাপ্রুভার হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই নাকি বংশীকে ও খুন করেছে—এই ওদের থিওরি।

নিখিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন এবং ছাতে পায়চারি করতে লাগলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

বিরক্তিকর!

আবার এসে বসলেন নিখিল চৌধুরী।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে নিষ্ফল আক্রোশে যেন চাপা গর্জন করে বললেন, আর জানেন, স্বর্ণেন্দু হাসিমুখে তাও মেনে নিল! ড্যাম হিজ হাসি!

আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু ইতস্তত করে এবং রূঢ় সত্যটা শোনবার জন্যে মনকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার ফাঁসির দিন কবে?

ফাঁসি কাল হয়ে গেছে।

হাওয়াটা থেমে গেল না, দূরের বাড়ির গ্রামোফোনও সমানে বাজতে লাগল। চামেলি এসে খবর দিলে, খাবার দেওয়া হয়েছে। নীরবে নীচে নেমে গেলাম। ফাউলের ফ্রেঞ্চ কাট্‌লেট, সুগন্ধি রুদনি চালের ভাত, চমৎকার মুগের ডাল—সবই উপাদেয় হয়েছিল। তবু কি একটা তুচ্ছ কারণে চামেলিকে ধমকালেন নিখিলবাবু। চামেলি নীরবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে। অর্থাৎ সবই যেমন হয়, হতে থাকল। স্বর্ণেন্দুর ফাঁসি হয়ে গেছে বলে কিছুই আটকাল না, কিছুই বদলাল না। স্বর্ণেন্দু যে নির্দোষ, এ কথা নিঃসংশয়ে জেনেও আমার আহারে রুচি কিছুমাত্র কমল না, আমি বেশ খেতে লাগলাম। স্বর্ণেন্দু আদালতে যে মিছে কথা বলেছিল, তার একটা প্রমাণ তো এখনই স্বকর্ণে শুনলাম। রাত্রির যে সেদিন ভোরে মধুপুর চলে যাওয়ার কথা ছিল না, স্বর্ণেন্দু তা জানত। রাত্রি স্টেশনে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়কে আনতে কিন্তু ফেরেনি।

নিখিলবাবু তৃতীয় কাট্‌লেটটি নিঃশেষ করে চতুর্থটি আক্রমণ করতে করতে সহসা বললেন, কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেবার জন্যেই আপনাকে টেনে আনিনি। অধিকতর দুঃসংবাদ একটা আছে।

আবার কি?

রাত্রি পরশুদিন আসছে অবনীশের সঙ্গে বম্বে থেকে।

এই সংবাদে আমার মুখভাব কি রকম হয়েছিল, তা বলতে পারি না; কিন্তু তা লক্ষ্য করেই নিখিলবাবু সম্ভবত বললেন, এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে চলবে না. আপনাকেই ধাক্কাটা সামলাতে হবে। তারা আমার বাসাতেই এসে উঠবে লিখেছে। অবনীশবাবু লিখেছেন, কি একটা জরুরি কাজ আছে তাঁর। কিন্তু আমি থাকব না, আপনিই জরুরি দরকারটা সামলে দেবেন আমার হয়ে।

আপনি কোথা যাচ্ছেন?

অপ্রত্যাশিত একটা সংবাদ দিলেন নিখিল চৌধুরী।

বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে! এতদিন পরে হঠাৎ এ খেয়াল?

খেয়াল নয় প্রয়োজন। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই সুখে থাকতে পারে, আমরা পারি না।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ছাড়া চামেলিটাকে শায়েস্তা করবার লোক দরকার একজন। ইদানিং ও বড্ড বেড়েছে।

ঠিক উৎসুক হয়েছিলাম বলে নয়, এই প্রসঙ্গে একটা কিছু বলতে হয় বলে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বিয়ে করছেন?

ঘোর পাড়াগাঁয়ে, কালো কুচ্ছিত একটা হাঁদা মেয়েকে, তার একমাত্র গুণ, সে স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী স্নিগ্ধ বুদ্ধিমতী দেখে দেখে অরুচি জন্মে গেছে।

নিরর্থক জেনেও বললাম, আপনার মতো লোকের এ রকম বিয়ে করার—

আমার কথা শেষ হতে না দিয়েই নিখিলবাবু বললেন, বংশরক্ষার্থে। এবং তারপর একটু থেমে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর।

উভয়ে নীরবেই আহার করতে লাগলাম।

আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা মেঘের মতো নানা ভাবে নিজেকে প্রসারিত করছিল, —রাত্রি আসছে। জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে নয়, অবনীশের সঙ্গে। স্বর্ণেন্দু নেই, নিখিলবাবুও থাকবেন না।

সহসা প্রভঞ্জন থেমে গেল।

সানাই ঢোল একসঙ্গে নীরব হল। নিবিড় স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। স্তব্ধতাকে বিক্ষত করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাঠবিড়ালীটা ডাকছে কেবল, চিক-চিক-চিক-চিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

কার্যকারণের সম্বন্ধে অবিচ্ছেদ্য। এর পরে যা ঘটেছিল, তারও একাধিক কারণ ছিল, যদিও সে কারণগুলো তখন আমার মনে তত স্পষ্ট ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা পর্যালোচনা করে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। (যদিও সেটা মাসির গোঁফ গজালে মামা হত গোছ হাস্যকর সিদ্ধান্ত) যাই হোক, এই কথাটাই এখন আমার মনে হয় যে, অবনীশের ব্যবসায় এবং সামাজিক বুদ্ধি যদি আর একটু কম প্রকট হত, সেদিন গভীর নিশীথে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে রাত্রির কান্না যদি না দেখতাম এবং মোহের প্ররোচনায় পড়ে নিজেকে কুসংস্কারহীন অতি-আধুনিক আত্মত্যাগী বলে শুধু প্রচার নয়—প্রমাণ করবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে না পেয়ে বসত, তা হলে হয়তো এমন হত না। শেষোক্ত কারণটাকেই মুখ্য বলতে আমি রাজী নই—যদিও ধরণীবাবু এবং নিখিল চৌধুরীর তাই মত, কারণ আগের দুটোর অস্তিত্ব না থাকলে আমার মোহ নিজেকে জাহির করবার সুযোগ এবং সম্ভবত প্রেরণাও পেত না। গাছের উদ্ভবের জন্যে মাটি এবং বীজ উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

অবনীশের কথা চিন্তা করলেই আমার খুব ছেলেবেলায় দেখা এক স্টেশন-মাস্টারের কথা মনে পড়ে। স্টেশনের নাম মনে নেই, কোন্ রেলওয়ে তাও মনে নেই, তবে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। স্টেশনটা খুব ছোট, এক মিনিটের বেশি কোনো গাড়িই সেখানে বোধ হয় থামে না। স্টেশনেরই এক অংশে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার। চারিদিকে ধূ-ধূ করছে মাঠ। আমাদের ট্রেন যখন সেখানে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশনের পাশেই একটি নধরকান্তি গাই বাঁধা রয়েছে, আর নিকটেই একটি বলিষ্ঠগঠন প্রৌঢ় ব্যক্তি হেঁট মুখে, খালি গায়ে উর্ধ্বশ্বাসে জাব মেখে চলেছেন। দু'হাতের কনুই পর্যন্ত খোল-খড় মাখা। ট্রেন এসে দাঁড়াতেই তিনি জাবের ডাবা থেকে মুখ তুলে ডাকলেন, কই রে ফাগুয়া? ফাগুয়া স্টেশনের ভিতর থেকে একটা টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে। টুপিতে লেখা রয়েছে—এস. এম.। তিনি খোল-খড়-মাখা ডান হাতটা তুলে বললেন, অল রাইট অল রাইট। ফাগুয়া ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালে লাইন ক্লিয়ার দিলে, গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেন চলতে লাগল। অবনীশের সঙ্গে এই স্টেশন-মাস্টারের বাহ্যিক কোনো সাদৃশ্য নেই, কিন্তু মূলত মিল আছে। দু'জনেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর স্বার্থপর, দু'জনেই শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখতে অশোভনভাবে ব্যস্ত। অবনীশের চেহারাটা দেখে হঠাৎ তাকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় না। খুব বেঁটে সাহেবী পোশাক-পরা শ্যামবর্ণ লোকটি, পুরু ঠোঁট, ভুঁড়ো নাক, কিন্তু সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা সদা-সপ্রতিভ ভাব আছে যে, তাতেই মুখখানা কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। দেখলেই, অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার আগে, মনে হয়, লোকটি নির্ভরযোগ্য, ভেতরে শক্তি আছে। পরিচয় পেলে মনে হয়, শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তির এক বিন্দু তিনি অপচয় অর্থাৎ অপরের জন্যে ব্যয় করতে রাজি নন। মাথায় হ্যাট আছে, ছোট একটি টিকিও আছে। দুটোই তিনি শিরোধার্য করেছেন, আমার মনে হয়, ব্যবসার খাতিরে; নিরামিষ আহার করাটাও বোধ হয় ব্যবসার অঙ্গ। এ দেশে বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসা করতে হলে এ সব চাই।

চামেলির মুখে যখন খবর পেলাম যে রাত্রিকে নিয়ে অবনীশবাবু এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মনে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন আগে শোনা স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো মনে হয়েছিল—সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না বলে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? ভয় হয়েছিল, প্রবল-পরাক্রান্ত অবনীশের কবল থেকে রাত্রিকে উদ্ধার করবার মতো সামর্থ্য হয়তো আমার নেই। রাত্রির ওপর আমার কি জোর আছে, কোন অধিকারে আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করব?

নিখিলবাবুর বাসায় এসেই অবনীশের সঙ্গে দেখা হল। নীচের বসবার ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি, হাতে একটা পেন্সিল ছিল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সপ্রতিভভাবে বললেন, আসুন, আপনিই আশা করি ডক্টর সরকার। আমি অবনীশ।

নমস্কারান্তে বসলাম।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি বড়বাজারের ঘিয়ের আড়তদার কাউকে চেনেন?

না।

কোনও ব্রোকার?

না।

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে পেন্সিল দিয়ে সামনের একটা দাঁতে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন চিন্তিত মুখে। তারপর হঠাৎ টেলিফোন-গাইডটা খুলে একটা নম্বর খুঁজে বার করে ফোন করলেন কাকে, ফোনে ঘি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল হিন্দিতে।

এতদিন অবনীশ আর রাত্রিকে কেন্দ্র করে পূর্বরাগরঞ্জিত যে কুয়াশাটা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছিল, একটা আচমকা দমকা হাওয়ায় সেটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ফুটকি দিয়ে আঁকা এক রকম ছবি আছে, দু'দিক থেকে দু'রকম দেখায়। একই ছবি এক দিক থেকে দেখলে হয়তো রমণীর মুখ, উল্টো দিক থেকে দেখলে ওরাংওটাং। ছবিটাকে উল্টো দিক থেকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

হাঁ হাঁ, আমি তুরন্ত।

রিসিভারটা নামিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। মাথার সামনের কেশবিরল অংশটায় হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন ডক্টর সরকার, ট্যাক্সিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। নিখিলবাবু যখন নেই, তখন আপনাকেই বলে যাই, নেক্স্ট বেস্ট ম্যান।

কোথা যাবেন আপনি?

বেশি দূর নয়, বড়বাজার। তারপর একটা হোটেল ঠিক করতে হবে আমাকে আজ রাত্রের মতন। কালই আমি ফিরে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে।

দুহাত দিয়ে টেনে তিনি প্যান্টলুনটা ঠিক করে নিলেন।

হোটেল কেন?

একটু হেসে অবনীশ বললেন, আমি থাকব।

রাত্রি আসেনি? সে কোথায়?

সে ওপরে আছে, সে এখানেই থাকবে। চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে চড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে অবনীশ কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে বললেন, দেখুন, আপনার কথা শুনেছি আমি অনেক, আপনার লেখাও পড়েছি, সেই জন্যেই ভরসা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

অবনীশ আবার বললেন, এ বাড়িতে আমি রাত কাটাতে চাই না। গাড়িতেও আমরা একসঙ্গে আসিনি, দুটো আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টে ছিলাম।

এতে আমার বিস্ময় বাড়ল দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আলাদা আলাদা যে ছিলুম, তার ডকুমেন্টারি প্রমাণ রাখবার জন্যে পয়সা খরচ করে ভিন্ন দুটো কম্পার্টমেন্টে বার্থ রিজার্ভ করিয়ে এসেছি। এখানেও হোটেলে থাকতে চাই, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স একটা থাকবে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। বললাম, এর মানে কি?

মানে কি, আপনারা ডাক্তার মানুষ দু'দিনেই বুঝতে পারবেন। স্বর্ণেন্দুর বন্ধু হিসেবে যেটুকু কর্তব্য ছিল করলাম, তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা খুঁজে সেইখানেই পৌঁছে দেবেন আপনারা—যদি দরকার মনে করেন। আমি হাত ধুয়ে ফিরে যেতে চাই।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায়?

একটা অদ্ভুত রকম হাসি হাসলেন অবনীশ।

আহ্ আহ্ আহ্ আহ্—ঈষৎ মুখ ফাঁক করে খুব আস্তে আস্তে এই শব্দটা করলেন। তারপর বললেন, আপনি জ্যোতির্ময়বাবুর কথা জানেন তা হলে?

শুনেছি কিছু?

আরও শুনবেন ক্রমশ।

তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভুঁড়ো নাকের নীচে পুরু ঠোঁট দুটো কি যেন বলি বলি করে চেপে গেল।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় এখন?

প্যারিসে। কিছু টাকা যোগাড় করে তিনি প্যারিসে চলে গেছেন আর্ট-চর্চা করবার জন্যে। আর্টিস্ট লোক।

চুপ করে বসে রইলাম আমি।

অবনীশ বড়বাজারে ট্যাক্সি থামিয়ে নানা দোকানে ঘুরলেন। একটা গলির ভেতর ঢুকে গেলেন শেষে। আমি ট্যাক্সিতেই চুপ করে বসে রইলাম। স্টেশন-মাস্টারের ছবিটা ফুটে উঠল মনে। মনে হল, চাকরির সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে গরুর জাব-দেওয়ার মধ্যে খাঁটি-দুগ্ধ-লোলুপ যে মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, আমাদের অধিকাংশের মনোবৃত্তি হয়তো ওই। জীবনের আনন্দ গৃহস্থালিতে—চাকরিতে নয়, চাকরিটা বজায় রাখতে চাই গৃহস্থালির সুবিধে হবে বলে। গৃহস্থালির সঙ্গে চাকরির বিরোধ যদি কোনোদিন দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন স্টেশন-মাস্টারকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে, গৃহস্থালিটা নয়। সব রকম বাঁচিয়ে যদি প্রেম করা চলত, অবনীশ রাজি ছিলেন। কিন্তু

নিজের সুনাম ক্ষত-বিক্ষত করে? এই রকম মেয়ের সঙ্গে? অবনীশ মোটেই তাতে রাজি নন। প্রয়োজন হলে শুধু টিকি আর নিরামিষ আহারের নজিরেই নয়, দলিলের জোরে তিনি প্রমাণ করবেন যে, রাত্রির সঙ্গে কলঙ্কজনক কোনো ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয়নি। তিনি নিজের ব্যবসার খাতিরে কলকাতা এসেছিলেন, বন্ধুর বোন হিসাবে ভিন্ন কম্পার্টমেন্ট ভিন্ন বার্থে অধিষ্ঠিতা রাত্রির একটু-আধটু খোঁজ-খবর মাত্র করেছিলেন তিনি, আর কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে অবনীশ ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বললেন, যাক, হাজার টাকার বিজ্‌নেস হল। ট্রিপটা নেহাত বৃথায় গেল না।

আমি ভদ্রতার খাতিরে সায় দিয়ে মুচকি হাসলাম।

অবনীশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং ট্যাক্সিওয়ালটাকে বলে দিলেন, আমাকে যেন বেনেটোলায় পৌঁছে দেয় সে, তার জন্যে ভাড়াটাও দিলেন তাকে অগ্রিম।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

জনতা ভেদ করে ট্যাক্সি ছুটতে লাগল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

।। দুই ।।

"আপনারা কি আশা করেন, বংশীর সেই কুৎসিত প্রলাপ জ্যোতির্ময় এসে শুনবে, এ-সম্ভাবনা জেনেও আমি চুপ করে বসে থাকব? আমি? কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতির্ময়ের আসা চলবে না, সবিতার স্বপ্নে তার দু'টি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে ভাবছে সবিতাকে। এ দেখবার পরও কি আমি তাকে সবিতার বাড়ি যেতে দেবার সুযোগ দিতে পারি? তা ছাড়া সে এসেই হয়তো পুলিশের হাতে পড়ত। সবিতা, পুলিশ।—কিছুতেই তাকে আসতে দিলাম না। কেমন করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম? আলেয়া যেমন করে পথিকের পথ ভোলায়, বাঘিনী যেমন করে অসহায় হরিণের ঘাড় মটকে তাকে অনায়াসে পিঠে করে তুলে নিয়ে যায়, তেমনই করে। কিন্তু তবু সে রইল না। যে হরিণটাকে মরা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটা আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তড়াক করে উঠে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।" না, রাত্রি এ সব কথা বলেনি। আমি কল্পনা করেছিলাম, যেন রাত্রি বলছে। রাত্রিকে আমি এ সব বিষয়ে প্রশ্নই করিনি কোনোদিন। অবকাশ হয়নি বলে নয়, সাহস হয়নি ভদ্রতায় বেধেছিল। তা'ছাড়া লোকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসনের জন্যে, আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। আর একদল অভদ্র লোক সব জেনে-শুনে প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবার জন্যে। এ সব প্রশ্ন করে রাত্রিকে আমি অপ্রস্তুত করতে পারতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করবার বাসনাই আমার মনে হয়নি কোনোদিন।

আমি কল্পনা করেছিলাম। সেদিন রাত্রে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বিছানায় রোরুদ্যমানা রাত্রিকে দেখে অনেক রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। মেঘ-

ভারাক্রান্ত নিবিড় রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি সে কান্না দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। জলে বরফ যেমন গলে যায়, তেমনই আমার মনের জমাট সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছিল। শ্রাবণশর্বরীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বর্ষণ অন্তরলোকে যে নিবিড় রহস্যালোক সৃজন করে, সে রহস্যালোকের নিগূঢ় অস্পষ্টতায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির কোনো যুক্তি চলে না, একটা সশঙ্ক উৎকীর্ণ অনুভূতি অবুঝের মতো রুদ্ধশ্বাসে অনির্দিষ্ট একটা কিছুর প্রত্যাশা করে যেমন প্রতি মুহূর্তে, তেমনই আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে উঠবে, হয়তো রাত্রি এখনই উঠে বসে চিৎকার করে বলবে, আমি তোমাদের আইন মানি না, ধর্ম মানি না, কিছু মানি না, আমি কেবল আমাকেই মানি; আমি আছি বলেই তোমরা আছ, জগৎ-সংসার আছে,—আমার আমিত্বটাকে চেপে পিষে দলে মেরে ফেলতে দেব না, দেব না, দেব না; পারবে না তোমরা, কিছুতেই আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না, তোমাদের সমস্ত আইন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আমি নিজেকে জাহির করবই।

কিন্তু কিছুই সে বলেনি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি যে দেখছিলাম, তা সে জানত না। তার দুর্বল মুহূর্তে তাকে যে একদিন দেখেছিলাম, সে কথা তাকে কোনোদিন বলিনি। তার ধারণা, সম্রাজ্ঞীর মতো অনুকম্পাভরেই সে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি যেন আমার নিজের গরজেই তার কৃপা ভিক্ষা করেছিলাম, এবং উদারতা-চর্চা করবার সুযোগটা দিয়ে সে যেন আমাকে কৃতার্থ করেছিল। তার ভূলুণ্ঠিত সত্তার আকুল ক্রন্দন যে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে কথা তাকে জানিয়ে কি লাভ হত আমার? তাকে শুধু ছোট করা হত, সঙ্কুচিত করা হত, তার পরাজিত বিধ্বস্ত অহমিকাকে নীচের মতো উপহাস করা হত। রাত্রিকে অপমান করবার মতো কাপুরুষতা অথবা নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। জ্যোতির্ময়ের কথা আলাদা। সে বিশুদ্ধ শিল্পী, তাই সে স্বভাবতই নিষ্ঠুর। শিল্পীরা আলোকতীর্থের যাত্রী। যুগে যুগে তিমিরময়ী রাত্রিকে অতিক্রম করে চলে যায় তারা। জ্যোতির্ময়কে দোষ দিই না আমি।

অবনীশের সঙ্গে রাত্রি কলকাতায় এসেছিল কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। তখন তার কোনো উত্তর পাইনি, পরে পেয়েছিলাম। রাত্রি এসেছিল দেখতে, সবিতা কলকাতায় আছে কি না! সবিতা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

কলকাতা শহরের ট্রাম ট্যাক্সি জনতা কোলাহল, ধরণীবাবুর ছদ্ম উৎকণ্ঠা, নিখিল চৌধুরীর নির্জলা ক্রোধ, রাখালবাবুর উইল, ডি কে-র বর্ণনা, ডাক্তারী-জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা, লেখক-জীবনের প্রেরণা-অবসাদ—এ সমস্ত সত্ত্বেও পাঁচটি ছবি আমার মনে আঁকা আছে, চিরকাল থাকবে বোধ হয়।

অন্ধকার। গড়ের মাঠের একটা নির্জন অংশে রাত্রি শুয়ে ছিল, আমি পাশে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা দু'জন ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, কলকাতা শহরটা তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ক্ষণিকের জন্য যেন আবির্ভূত হয়েছে, বুদ্‌বুদের মতো এখনই মিলিয়ে যাবে। রাত্রির মনের মধ্যে ঢুকে আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অন্ধকার গুহার ভেতরে লোকে যেমন পথ হারিয়ে ফেলে, তেমনই। মোটরের চিৎকার মশকের গুঞ্জনের মতো মনে হচ্ছিল, ক্রমশ তাও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চারদিকের আলো ক্রমশ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্রমশ যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত বিশ্বে যেন কিছু নেই, আছে কেবল একটা অনুভূতিময় স্পন্দন. ভেসে চলেছি যেন আমরা দু'জনে—মন্থর গতিতে, সেই স্পন্দনের তালে তালে সময়ের স্রোতে। সময়ের গতিও যেন থেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছিল।—হঠাৎ তার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দে চমকে উঠলাম। হঠাৎ কলকাতা শহর তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবার মূর্ত হয়ে উঠল চতুর্দিকে। আলো অন্ধকার সব ফিরে এল। চেয়ে দেখলাম, রাত্রি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

।। দুই ।।

দিনটা মেঘলা ছিল।

নিছক বেড়াবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। দ্রুতগামী একটি ট্রেনের খালি কম্পার্টমেন্টে বসেছিলাম দু'জনে। মেঘের স্তর ভেদ করে যে সূর্যালোক সেদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, তা যেন আগত নয়, আসন্ন—যেন একটা অলৌকিক কিছুর পূর্বাভাস। এলোমেলো হাওয়াটা সেদিন বইছিল যেন তার অলক আর বসনকে উতলা করবার জন্যেই। তার পরনে ছিল জবাফুলের মতো লাল রঙের একটি রেশমী শাড়ি। শাড়ির কোনো পাড় ছিল না। মাথায় কোনো অবগুণ্ঠন ছিল না। জানলার বাইরে চেয়ে চুপ করে বসেছিল সে। লাল শাড়িতে তার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখটি শুধু খোলা। মনে হচ্ছিল, মহাকাশচারী কোনো জ্বলন্ত নক্ষত্রের একটা টুকরো মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে এসেছে যেন পৃথিবীতে, তার খানিকটা নিভে কালো হয়ে গেছে, বাকিটা জ্বলছে এখন।—দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত ডানকুনির মাঠ। নিউ কর্ডের নূতন লাইন। দ্রুতগামী ট্রেন। গাড়িটা দুলছিল। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে চাইলে আমার দিকে, তার

নির্নিমেষ চোখে একবার যেন নিমেষপাত হল, কৌতুকদীপ্ত এককণা হাসি চিকমিক করে উঠল কুচকচে কালো চোখে, ক্ষণপরেই সে হাসি সংক্রমিত হল অধরে।

আপনার খুব অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

বিস্ময়ের ভান করে বললাম, না, আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

ক্ষণকালমাত্র কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। এলোমেলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠল তার অলকগুচ্ছে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কেন আনন্দ হচ্ছে—এ কথা সে জানতে চায়নি; কিন্তু যেহেতু আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছিল না, অনুশোচনাই হচ্ছিল, তাই আনন্দিত হবার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিবৃত না করে পারলাম না আমি।

আইনকে আইন দিয়ে জব্দ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে বইকি।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

আপনার আত্মীয়স্বজন? তাঁরাও কি আনন্দিত হবে এ কথা শুনলে?

সম্ভবত হবেন না। কিন্তু তাঁদের জানাবার দরকার কি? জীবনের অধিকাংশ আনন্দজনক কার্যই অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে করতে হয় সকলকে।

আধুনিকতার সুরা পান করেছিলাম বটে, কিন্তু এক চুমুক মাত্র। নেশার চেয়ে ক্ষোভই বেশি হয়েছিল, কিন্তু ভান করতে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি নেশা হয়েছে। নেশা যে একেবারে হয়নি, তা নয়; কিন্তু তা আধুনিকতার সুরা পান করে নয়, সনাতন সুরা পান করে। তার সঙ্গে আধুনিকতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তা যুবতীর সম্পর্কে যুবকের আদিম নেশা। কিন্তু সে উন্মাদনাকে আধুনিকতার ছদ্মবেশে নিস্পৃহ ঔদার্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হচ্ছিল মিথ্যা আনন্দের আতিশয্য-সহকারে।

দ্রুতগামী ট্রেন দুলছিল। দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ মেঘলা দিনের স্নিগ্ধ আলোকে প্রতীক্ষা করছিল যেন কার। এলোমেলো হাওয়া পাগল হয়ে উঠেছিল তার অলকে আর লাল শাড়িতে, আমি চুপ করে বসে দেখছিলাম,, তার মখমল-কোমল কালো মুখে অনুদ্ভাসিত অপরূপ একটা অরুণিমা উদ্ভাসিত হবার সাধনা করছে।

।। তিন ।।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ আর একদিন।

রাত্রি তার বাবার কাছে যায়নি, যেতে চায়নি। তাকে আলাদা একটা বাসা করে দিয়েছিলাম। বাসাটার সামনে ছোট একটুখানি ফাঁকা জায়গা ছিল। জায়গাটার ওপারে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা যাঁর, এই ফাঁকা জায়গাটুকুরও তিনিই মালিক। রাত্রিকে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম—বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। শোবার জন্যেই কেবল বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছিল রাত্রির অভিপ্রায় অনুসারে। সেদিন

বিকেলে রাত্রির আসবার কথা ছিল আমার ডিস্‌পেনসারিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম, তবু সে এল না। যে 'কল' দু'টি বাকি ছিল, তা সেরে রাত্রির বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, সামনের মাঠটায় অসম্ভব ভিড়। তিনতলা-বাড়ির মালিকের পিতৃশ্রাদ্ধ, কাঙালী-বিদায় হচ্ছে। অন্ধ, খঞ্জ, নানা ভাবে বিকৃত নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ ছেঁড়া কাপড়ে রুখু চুলে কিলবিল করছে মাঠটায়। সমস্ত স্থানটা দুঃশব্দে ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দেখলাম, রাত্রি মাঠের দিকের কপাট জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছে। সম্ভবত ভিড়ের জন্যে বেরোতেও পারেনি।

কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে কপাট খুলে দিয়ে গেল। ওপরে উঠে দেখলাম, রাত্রি পড়ছে। আমার কাছে নানা রকম মাসিকপত্র জমে ছিল, তারই এক বোঝা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

আজকাল সাহিত্য-সমাজেও খুব দলাদলি, নয়?

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তবু একটা উত্তর দিলাম।

হবে না কেন? মানুষ, বিশেষত সাহিত্যিকেরা স্বাধীন-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আছে এবং তা প্রকাশ করবার অধিকার আছে। সুতরাং দলাদলি তো হবেই।

আপনি কি বলতে চান, স্বাধীন মতের প্রতি নিষ্ঠার জন্যেই এত দলাদলি? আমার তো নানা কাগজের নানা প্রবন্ধ পড়ে মনে হল যে, সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কারও নেই, সকলেই মতলববাজ ব্যবসাদার।

এ রকম মনে হওয়ার মানে?

মানে, যিনি লিখছেন—দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে যতক্ষণ না সাহিত্য গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ তা খাঁটি সাহিত্য নয়, তিনি নিজে হয় প্রকাশক কিংবা কোনো প্রকাশকের বন্ধু, এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে লেখা কোনো পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। আবার এই দেখুন, আর একটা কাগজে দেখছি, একটা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—গণসাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয়নি এ দেশে। এঁর সঙ্গে বোধ হয় প্রথম প্রবন্ধ-লেখকের শত্রুতা আছে। আর একটা কাগজ প্রগতিসাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছেন, এঁরও উদ্দেশ্য—

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, আহা, এরা সবাই যে মতলববাজ, এ সন্দেহ হল কি করে তোমার? ও-সব প্রবন্ধে যে যুক্তি আছে, সেগুলো কি অর্থহীন?

একটু হেসে রাত্রি বললে, বুদ্ধিমান লোকে যে কোনো জিনিসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনায়াসে একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, ভাল উকিল দোষীকে মাঝে মাঝে বেকসুর খালাস করিয়ে আনে, তাই বলে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। যারা মানুষকে ভালবাসে, তারা যেমন মানুষের জাতবিচার করতে বসে না, তেমনই যারা সত্যিকার সাহিত্য-রসিক, তারা সাহিত্যের জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের সুখ-দুঃখ প্রেম-ঘৃণা আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। সে মানুষ ধনী কি গরীব, রাজরানী কি মেথরানী—এ নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করে তারা জানবেন, চণ্ডীমণ্ডপবাসী ঘোঁটপাকানো মতলববাজ চাঁইদের সগোত্র। তারা ব্যবসাদার, সাহিত্যিক নয়।

ওয়েটিং-রুমে রাত্রির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা হবার পর আর সাহিত্য-প্রসঙ্গ তার কাছে তোলবার সাহস ছিল না আমার। মাসিক পত্রগুলো তার কাছে এনে দিয়েছিলাম অবশ্য ক্ষীণ

একটা আশা নিয়ে। সাহিত্যবিষয়ক দু'চারটে প্রবন্ধ ইদানীং লিখেছিলাম এবং প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য নিয়েই লিখেছিলাম। রাত্রির মুখে এই মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আমার ওই লোক-ভোলানো সস্তা উচ্ছ্বাসগুলো ওর চোখে যেন না পড়ে। কোন অজুহাতে মাসিকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।

জ্যোতির্ময়ের যে ছবিখানা এন্‌লার্জ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়েছে?

কবে দেবার কথা ছিল?

আজই।

চল, তবে বেরোনো যাক।

ওই নোংরা ভিড় ঠেলে আমার আজ বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনিই গিয়ে নিয়ে আসুন।

তার আদেশ—হ্যাঁ, আদেশই—অগ্রাহ্য করবার মতো মানসিক শক্তি আমার ছিল না। সে আদেশ করবে না কেন, কিছুই যে লুকোয়নি, জ্যোতির্ময়ের সম্বন্ধে কোনো কথাই সে আমার কাছে গোপন করেনি। সমস্ত জেনে-শুনেই আমি তাকে—না, ভুল বলছি—আমি তাকে প্রশ্রয় দিইনি, সেই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি সব জেনে শুনেও অর্ঘ নিবেদন করেছিলাম, সে তা গ্রহণ করে কৃতার্থ করেছিল আমাকে। আদেশ করবে না কেন?

বেরিয়ে এলাম। ভিড় ঠেলে রাস্তায় গিয়ে পড়লাম অনেক কষ্টে। গলির বাঁকে অদৃশ্য হবার পূর্বে ঘাড় ফিরিয়ে যে ছবিটা দেখলাম, তা আমার মনে স্পষ্ট ভাবে আঁকা আছে এখনও। দোতলার বারান্দায় নির্বিকারভাবে রেলিঙে ভর দিয়ে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পায়ের নিচে অসংখ্য ভিখারী।

।। চার ।।

টেলিফোনের ঝনৎকারে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম তখন রাত দুটো। কলকাতা শহরও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে সহসা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলাম। সোঁ-সোঁ করে একটা হাওয়া উঠল। সে দিন সমস্ত দিন রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়নি। বিকেলে গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি—একাই সে কোথায় বেরিয়েছিল। মনে হল, রাত্রিই হয়তো ফোন করছে কোথাও থেকে। গোকুল এসে বললে, নবীনবাবু—

নবীনবাবু লোকটি কে, ভাববার চেষ্টা করলাম। রোগীদের নাম আর পেটেন্ট ওষুধের নাম মনে রাখা এমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ এই দুটি জিনিসই আমাদের পেশার পক্ষে অপরিহার্য। সহসা মনে পড়ল, নবীনবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর মামাতো ভাইয়ের নাম। নেমে এলাম বিছানা থেকে। টিপটিপ করে বৃষ্টিও নামল, হাওয়ার বেগ বাড়ল।

ফোনে নবীনবাবু বললেন, দাদা কেমন যেন করছেন, আপনি দয়া করে শিগগির আসুন একবার।

রাত দুটোর সময় যে সব রোগী 'কেমন যেন করে', তাদের অনেকের কথা জানি, কারও বেলাতেই দয়া করতে ত্রুটি করিনি, কিন্তু---। মনের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ সুরটা সহসা ভোঁতা হয়ে গেল, যখনই ভাল করে মনে পড়ল, পূর্ণেন্দুবাবু স্বর্ণেন্দুর বাবা।

তাড়াতাড়ি জামা-জুতো পরে স্টেথস্কোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম—হঠাৎ যদি কোনো ট্যাক্সি পাওয়া যায় এই ভরসায়। কলকাতা শহরেও অত রাতে যানবাহন সুলভ নয়। ফুটপাথ দিয়ে জোরেই হাঁটতে লাগলাম। বিরাট কর্নওয়ালিস স্ট্রিট জনশূন্য। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল বেশ জোরে। রাত্রির কথা মনে পড়ল। বিশেষভাবে আরও এইজন্যে মনে পড়ল যে, এসে থেকে রাত্রি পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে যায়নি। কেন যায়নি, এ প্রশ্ন তাকে করেছিলাম। উত্তরে সে যা বলেছিল, তা নিখিল চৌধুরীর কাছে হয়তো সন্তোষজনক বলে মনে হতে পারত, কিন্তু আমার কাছে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। বলেছিল, গেলে উনি হয়তো দাদার কথা জানতে চাইবেন; কিন্তু বলার ধরনে কেমন যেন একটা কপটতা ছিল। এ কপটতার কারণ যে কি তার আভাস আমার অজ্ঞাত ছিল না; অবশ্য তা আভাস মাত্র। রাত্রি এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন যে দেয়নি, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কতক্ষণ যে চলেছিলাম, তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ফাঁকা ফুট্‌পাথ দিয়ে রাত্রির কথা ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে চলেছিলাম।

শাঁখারিটোলায় নবীনবাবুর বাসায় যখন পৌঁছিলাম, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছেন। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, জীবন্ত চোখটাও মিনতি করছে; যাঁর ঘুম হত না, মহানিদ্রা নেমেছে তাঁর চোখে, সমস্ত মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেছেন।

ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। মনে হল রাত্রিকে খবরটা দিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। রাত্রির বাসায় পৌঁছে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রাত্রি তখনও জেগে আছে। জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, জোরে হাওয়া বইছিল, গলির মোড়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার হেড-লাইটের আলো নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল, আমি রাত্রির জানলার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত্রি এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছে কেন? মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণ মনের মধ্যে ভিড় করে এল, চলে গেল। কড়া নাড়লাম।

রাত্রি জানালায় উঠে এল।

কে?

আমি।

আপনি এত রাত্রে?

চাকরটাকে না জাগিয়ে নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত রাত্রে হঠাৎ যে?

ওপরে চল, বলছি। তুমি এখনও জেগে আছ কেন?

চিঠি লিখছিলাম।

কাকে?

ফার্নানডিজকে।

এমন সহজভাবে বললে, যেন ফার্নান্‌ডিজকে আমি চিনি আর সে কথা ও জানে। নিমেষের মধ্যে মানসপটে অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল—কলুটোলার মোড়ে স্বর্ণেন্দু, তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া টকটকে লাল খাপে ঢাকা ছোরা, রাত্রির জন্মদিনে ফার্নান্‌ডিজের উপহার।

যেন কিছুই জানি না, এমনই ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফার্নান্‌ডিজ কে?

ফার্নান্‌ডিজ আমাদের ড্রাইভার ছিল। আমাদের পুরোনো বাসাটার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম আজ বিকেলে, সেখানে দেখলাম, আমার নামে ফার্নান্‌ডিজের একটা চিঠি রয়েছে, আর এই ফটোখানা।

টেবিলের ওপরেই ফোটোখানা রাখা ছিল। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ গঠন একজন হাবসী। ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে।

হঠাৎ জানালা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া ঢোকাতে চিঠি লেখবার প্যাডের পাতাগুলো ফরফর করে উড়তে লাগলে। দেখলাম, রাত্রি ফার্নান্‌ডিজকে দীর্ঘ পত্র লিখেছে। কি লিখেছিল, আমি দেখিনি। রাত্রি একটা বই নিয়ে প্যাডটার ওপর চাপা দিলে।

বললাম, পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেলেন এখুনি।

রাত্রি শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে, শান্তি পেলেন এতদিনে।

একটুও কাঁদলে না।

তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা সুট্‌কেস আপনার বাসায় রেখে গিয়েছিলাম সেবার, সেটা আছে তো?

আছে।

কাল নিয়ে আসতে হবে সেটা।

আচ্ছা।

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল, জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, প্রকাণ্ড ট্যাক্সিখানা নীরবে অপেক্ষা করে রইল নীচের গলিটাতে খানিকটা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো।

।। পাঁচ ।।

সিনেমায় ভাল একখানা বই ছিল।

সকাল থেকেই কাজকর্ম এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম, যাতে সন্ধ্যাবেলায় অবসর থাকে। পাশাপাশি দু'খানা সীট আগে 'বুক' করে রেখেছিলাম। যথাসময়ে রাত্রির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়া পেলাম না। হাতঘড়িটা দেখলাম, আর মাত্র আধ ঘন্টা দেরি আছে। ট্যাক্সি করে না গেলে সময়ে পৌঁছনো যাবে না। আবার কড়া নাড়লাম, এবার একটু জোরে। ছোকরা চাকরটা নেমে এল। কপাট খুলে দিয়ে বললে, মায়ের অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে? তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেখানেও কেউ নেই। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। এদিক ওদিক খুঁজে শেষে বাথ-রুমের পাশে অন্ধকার ছোট যে ঘরটা ছিল, সেই ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরটার কোণে রাত্রি উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। প্রসব-বেদনাতুরা রাত্রি। কাঁদছিল না, কাঁপছিল না, নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিল। আমিও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি আমার পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। বেশবাস সম্বৃত করে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ করে সহজ কণ্ঠে বললে, আজ হবে। আমি আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমাকে ডাক্তারী বিবেকের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে হল। যে ধাত্রীটিকে ঠিক করে রেখেছিলাম, তারই উদ্দেশে ছুটতে হল ট্যাক্সি নিয়ে । রাত্রি বারোটার পর নির্বিঘ্নে রাত্রির সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। আমি তার নামকরণ করলাম, প্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ

এর পর যে-সব বর্ণনা গল্প লেখকের লেখনীতে অনর্গলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী, সে সব বর্ণনা আমি করব না। বসন্তের যাদুস্পর্শে শুষ্ক তরু যেমন মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, অদৃশ্য শক্তির লীলায় পাথর বিদীর্ণ করে যেমন নির্ঝর নিঃসৃত হয়, বর্ষা সমাগমে শীর্ণ স্রোতস্বতী যেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে দু'কূল প্লাবিত করে ছোটে, সন্তান লাভ করে রাত্রিরও মাতৃহৃদয় তেমনই—এই জাতীয় বর্ণনা রাত্রির সম্পর্কে আমি করতে পারব না, কারণ তা মিথ্যা হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব করে রাত্রি মুঞ্জরিত হয়ে ওঠেনি, নির্ঝরের চপলতা লাভ করেনি, নদীর মতো দু'কূলপ্লাবিনী হয়নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা আকাশচারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি করে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল, তাতে মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল শরাহত ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ। তার সারাদিন শান্তি ছিল না, সারারাত ঘুম ছিল না। ওই মাংসপিণ্ডটার প্রতি মুহূর্তের অসংখ্য দাবি মেটাবার জন্যে অহরহ তাকে যে প্রাণপাত করতে হত, তার মধ্যে মহনীয় কিছু আমি দেখতে পাইনি। আমার মনে হত, অমোঘ আইনের কবলে পড়ে সে যেন সশ্রম-কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার মলিন মুখ, শঙ্কিত দৃষ্টি, শীর্ণায়মান দেহ, অন্তরের নিদারুণ গ্লানি সত্ত্বেও বাইরের ছদ্ম-সপ্রতিভতা— না, মহনীয় কিছুই ছিল না।

প্রভাত কি তার মায়ের বন্দীত্বের ব্যথা অনুভব করেছিল। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, করেছিল। শিশুকে আমরা যত অবোধ ভাবি, হয়তো সে সত্যিই তত অবোধ নয়। আমার মনে হয়, প্রভাত তার মায়ের ব্যথা বুঝেছিল, কোনো নিগূঢ় উপায়ে বুঝেছিল, তাই সে তার মাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেল। তা না হলে অমন সুন্দর সুস্থ শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হল কেন?

অসুস্থ হয়ে পশ্চিমের এই শহরটায় বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এসে স্মৃতি মন্থন করে যে কাহিনি আমি লিপিবদ্ধ করছি, এখন মনে হচ্ছে, তার কতটুকু আমি জানি! সবই তো

অস্পষ্ট! কল্পনায়-বাস্তবে, আলোয়-আঁধারে মিলিয়ে যে ছবি আমি আঁকলুম, তার কতটুকু কল্পনা, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু আলো, কতটুকু আঁধার, কিছুই তো জানি না—সমস্তটাই আমার মনের বিকার কি না, কে জানে! সবই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু একটা অবিসংবাদিত সত্যকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, আমি মোহগ্রস্ত। মোহের মায়াময় অঞ্জন চোখে লাগিয়ে হয়তো আমি কুৎসিতকে সুন্দর, পাপকে পুণ্য, অসত্যকে সত্য রূপে দেখেছি এবং অপরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি হয়তো আমাকেও পেয়ে বসেছে। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও, নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত না হয়ে তাকে সুন্দর করে আঁকবার চেষ্টা করেছি কেবল আমার লেখার শক্তি আছে বলে। বুঝেছি, কিন্তু নিরস্ত হতে পারছি না।

তেতলার একটা ঘরে বসে লিখছি। দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ও-পাশের সাদা স্তূপ-মেঘটার সর্বাঙ্গে অভ্র আবীর। সারি সারি পাখি উড়ে চলেছে, দলে দলে গরু ফিরে আসছে মাঠ থেকে, নদীপারের তালবানে সোনার স্বপ্ন নেমেছে যেন, তালবনের ও-পারে ঘন-নীল মেঘটার গায়ে আলোর জরি জ্বলছে।

ডি.কে-র কথাগুলি মনে পড়ছে।

"তাঁরা দু'জনে পাপ-পুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

হিমালয়ের পথে রাখালবাবু আর স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে ডি. কে-র নাকি দেখা হয়েছিল। আলাপও হয়েছিল। ডি. কে জানত না যে, আমার সঙ্গেও তাঁদের আলাপ ছিল। তাই সেই কলকাতায় ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের গল্প করছিল আমার কাছে।—

আশ্চর্য লোক ভাই রাখালবাবু, নিজের ভ্রষ্টা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা জেনেও একদিনের জন্যে ত্যাগ করেননি।

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলিনি, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে বোধ হয়ে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তুই ভাবছিস্, আমি কেমন করে জানলাম? রাখালবাবুর স্ত্রীই নিজে আমাকে বলেছিলেন একদিন। কেদার-বদরির পথে একটা চটিতে ছিলুম আমরা। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। হঠাৎ রাখালবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন। চুল এলো করে, চোখ বড় বড় করে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাই! হঠাৎ আমাকে বললেন, না, আমি পাপের বোঝা বুকে নিয়ে কেদারনাথে যেতে পারব না, ফেটে মরে যাব; তুমি শোন, তোমার কাছে বলে হালকা হই আমি। এই বলে বলতে লাগলেন, আমার জ্যোতির্ময় যখন এক বছরের সেই সময় পূর্ণেন্দুবাবু বলে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের। আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। ঘনিষ্ঠতা শেষটায় এমন দাঁড়াল যে, নিজের পেটের ছেলেকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, অনেকে আমাকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী বলেই জানে—

এই সময় ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠেছিল, ধীরেনকেই কে যেন ডাকছিল ফোনে—জরুরি দরকারে। ধীরেন গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই চলে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল, আর একদিন এসে বাকিটা বলবে। এখনও ফেরেনি। শুনেছি, সঙ্গী পেয়ে সে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গেছে।

মানস-সরোবরে যেতে পারেনি বলে সক্ষোভে গোড়াতেই রাখালবাবুদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো সে বলেছিল, সে কথাগুলোই বার বার মনে পড়ছে আমার—তাঁরা দুজনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তর দিকের পালক-মেঘগুলোতেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, দেখতে দেখতে সব গোলাপী হয়ে গেল। তালবনের ও-পারে ঘন-নীল বেগুনী হয়ে আসছে, আলোর জরিতে আগুন জ্বলছে। একটা পাঁশুটে রঙের মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর ফিনিক ছুটছে তার চারদিক দিয়ে।

নিখিল চৌধুরী যেদিন রাখালবাবুর উইলটা আমাকে এনে দেখিয়েছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়ছে আমার আজ। রাখালবাবু মহাপ্রস্থানে যাবার আগে একটা উইল করে নিখিল চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্যোতির্ময় আর রাত্রিকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুর জন্যেও ব্যবস্থা ছিল—তিনি যতদিন বাঁচবেন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন খরচ পাবেন। পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুসংবাদ তিনি পাননি বোধ হয়। নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন, রাত্রির ঠিকানা আমি জানি কি না। ঠিকানা আমি জানতাম না, তাই বলতে পারিনি। প্রভাতের মৃত্যুর দু'দিন পরেই চলে গিয়েছিল। কোথায়, তা আমি জানি না।

আজও কিন্তু আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং হয়তো আমার প্রবল আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল। আমাকে সে কোনোদিনই ভালবাসেনি।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।

দূর দিগন্তরেখায় তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তপন ধীরে ধীরে নামছে। অস্তরাগরঞ্জিত মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকারের আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

রাত্রি আসন্ন।

ডাবা
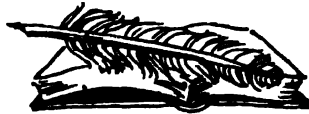
।। এক ।।

কবি এবং বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন পরিভ্রমণ করতে। সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ কবিও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, অথচ উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিঞ্চিৎ। উভয় জগতেরই রূপ রস গন্ধ তাঁকে আকুল করে। কিন্তু মাত্রা হারিয়ে ফেলেন না তিনি কখনও। বিদগ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাল-বোধ আছে। অর্থাৎ আত্মহারা হন, কিন্তু ঠিক সময়ে আপিস যেতে ভুল হয় না। সেদিন তিন বন্ধু বেরিয়েছিলেন পক্ষী পর্যবেক্ষণে। শুধু তাই নয়, মনস্থ করেছেন, বরাবরই বেরুবেন যতদিন না পক্ষী-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। বাতুল বৈজ্ঞানিক প্রলুব্ধ করেছেন কবিকে, এবং এই দুই উন্মাদকে সামলাবার জন্যে বেরিয়েছেন রূপচাঁদ। তিনজনেই পকেটে দূরবীন। কবির মনশ্ছন্দবীণ অবিরাম-গুঞ্জরিতভাব, বৈজ্ঞানিক সর্বদা চকিতদৃষ্টি একাগ্র, রূপচাঁদ স্থির-মস্তিষ্ক বস্তুতান্ত্রিক।

কবির মনে কবিতা জাগছিল।

নির্মল নীল শীতের আকাশ, ঝলমল করে সোনালি আলো,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল—
মরকত মণি কি আবেগে দেখ চুম্বিছে নীলকান্তরে।
যব-গম-ছোলা-মটর-মহিমা
ছাড়ায়ে যেতেছে উপমার সীমা
ধরার ধূসর ধূলি উজলিয়া
সবুজের শিখা উঠেছে জ্বলিয়া
প্রাণের দীপালী জ্বলে জ্বলজ্বল কি চঞ্চল অশান্ত রে।
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
নির্মল নীল শীতের আকাশে ঝলমল করে সোনালী আলো।

"শুনুন"

কবি বৈজ্ঞানিকের দিকে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, তিনি একটা ঝোপের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে আছেন। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আবার। ডেকেই দূরবীন লাগালেন চোখে। তারপর চুপি-চুপি বললেন, "বারবেট একটা, আস্তে আস্তে আসুন। ওই যে, এই দিকটায় ঘুরে আসুন, ওই দেখুন।"

তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করে কবিও লাগালেন দূরবীন। পাখি দেখা গেল না, কিন্তু বটের পাতাগুলি কি অপরূপ। এমন করে আর কোনোও দিন দেখা হয়নি তো।

"উড়ে গিয়ে ওই নিমগাছটায় বসল গিয়ে। আসুন, এই দিক দিয়ে যাওয়া যাক।"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে প্রায় দৌড়ে ছুটলেন বৈজ্ঞানিক নিমগাছটার দিকে। কবিও ছুটলেন।

'কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

ডেকে উঠল পাখিটা।

"ওইটেই ডাকছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার ডাক তো। নাম কি ওর?"

বৈজ্ঞানিক আস্তে আস্তে আর একটু এগিয়ে একটা ঝোপের ধারে গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন। কবিও এগুলেন সেদিকে।

"ওর নামটা কি?"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস করে তর্জন করে উঠলেন, "চুপ, কথা বলবেন না।"

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ কবির দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বললেন, "নীচের দিকের ওই ছোট্ট ডালটা বেঁকে আছে, ওর ওপরে দেখুন।"

কবি দূরবীন লাগালেন, কিন্তু পাখি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন রুক্ষমাথা ময়লা-কাপড়-পরা একটা বুড়ি, হেঁট হয়ে কাঠ কুড়োচ্ছে।

"উড়ে গেল আবার। দেখতে পেলেন?"

"না।"

"ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, যাওয়া যাক।"

"কি নাম পাখিটার?"

"ইংরেজীতে বলে বারবেট। অনেক রকম বারবেট আছে। এ অঞ্চলে আর এক বারবেট আছে, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কপারস্মিথ। বৈজ্ঞানিক নাম Xantholaema Haemucephala। বাংলা নাম বসন্তবউরি। সবুজ রঙ, তার ওপর হালকা সাদার ডোরা কাটা বুকের কাছটায়। ছোট পাখিটার মাথায় আর বুকে লাল। বড়টার মাথার রঙ তামাটে। ছোট পাখিটার অনেকগুলো দেশী নাম আছে—গয়লাবুড়ি, ভগীরথ, কলাপাখি, ভোকারে পাখি। ওই শুনুন, ছোট পাখিটা মানে, গয়লাবুড়ি ডাকছে।"

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্—'

"কাঁসারিরা বাসন তৈরি করবার সময় যেমন শব্দ করে অনেকটা সেইরকম, নয়?"

'কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্।'

বন-বাদাড় ভেঙে হনহন করে এগিয়ে চলেছেন বৈজ্ঞানিক। কবি চলেছেন পিছু পিছু। তাঁর মনে কবিতা জাগছে।

গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে
গয়লাবুড়ি থাকে।
পরনে তার সবুজ ডুরে
গান করে সে মিষ্টি সুরে
আকাশ জুড়ে গানের ছবি আঁকে।
প্রবীণ বুড়ি নয় সে মোটে
ছোট্ট পাখি কি ছটফটে
সহজ চোখে যায় না দেখা তাকে,
ফুড়ুৎ করে পালায় উড়ে

সুর ঢালে সে আকাশ জুড়ে
পালিয়ে বেড়ায় বনের আঁকে বাঁকে।
মাথায় বুকে লালের টিকা
জ্বলছে যেন অগ্নি-শিখা
স্বপ্ন যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
ও ভগীরথ, কি সুর হেনে
কোন্ গঙ্গা আনবে টেনে
সারাটা দিন ডাকছ তুমি কাকে!

চলতে চলতে কবি আর একবার দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখি দেখা গেল না, দেখা গেল সেই বুড়িটাকে। নোংরা বুড়ি। দারিদ্র্যজীর্ণ। দেখে মায়া হয়, কিন্তু বড় বেমানান। এখানে ও কেন? মহত্ত্ব যেখানে বিগলিত হয়ে পড়ছে শত ধারায়, সেইখানে গিয়ে ও স্নান করে আসুক। রূপের আসরে ওকে মানাচ্ছে না একটুও।

নিমডালে ঝরিতেছে সবুজের ঝরনা
বলে যেন, সর্ না, ওড়ে বুড়ি সর্ না।
না যদি সরিস্ তবে
চল্ সেই উৎসবে
ছুটে চল্ সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

ফুল যেথা ফুটে আছে
থরে থরে কাননে
হাসি করে ঝিকি-মিকি
নয়নে ও আননে
যেথা জোনাকির ঝাঁকে
পরীরা লুকিয়ে থাকে
দারিদ্র্যে করে যারা
বিচিত্র-বর্ণা
ছুটে চল সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

বুড়ি মিলিয়ে গেল, নিমগাছ মিলিয়ে গেল, সহসা কবির অন্তর জুড়ে বেজে উঠল নতুন একটা সুর। সেই চিরন্তন না-পাওয়ার সুর, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারণে অকারণে যা উৎসারিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ওগো,
ওগো আগুন, ওগো আমার শিখা,
অন্তরালে লুকিয়ে আছ কোথা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

আবছায়াতে লুকিয়ে থেকে থেকে
সবার চোখে বেড়াও দেখে দেখে
সবার সুরে আমায় ডেকে ডেকে
ভোলাও শুধু নিপুণ চতুরিকা।
ভুলছি আমি দুলছি নানা দোলায়
বাসছি ভাল নতুন করে রোজই
কিন্তু সখি এরই মধ্যে জেনো
মনে মনে চলছে তোমার খোঁজই
ভুলিনি তো সেই কত কাল আগে
রাঙিয়েছিলে আমায় রাঙা ফাগে
যদিও আজ স্বপন সম লাগে
রক্ত-রঙে মর্মে আছে লিখা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা

একটা আমগাছের ডালে পরগাছা হয়েছিল। লাল লাল তার পাতা। সেইটে কবির চোখে পড়ল হঠাৎ। উৎসুক উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে, মনে হল, আকাঙ্ক্ষিতাকে পাওয়া যাবে বুঝি ওই বর্ণোৎসবের মাঝখানে।

"ওদিকে কি দেখছেন, এই দিকে আসুন। পাখিটা উড়ে গিয়ে আবার কাঁঠালগাছটায় বসেছে। এইবার দেখা যাবে বোধ হয়।...দেখুন দেখুন দেখুন, দেখতে পেলেন?"

এক ঝাঁক ছোট্ট পাখি উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল দূরের আমগাছটায়।

"মিনিভেট।"—উদ্ভাসিত মুখে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। তারপর ঘাসের উপরেই বসে পড়লেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। কবির দিকে আবার ফিরে চাইলেন। দৃষ্টি উৎফুল্ল।

"মিনিভেট। বাংলা নাম সয়ালী, এগুলো ছোট সয়ালী। অনেকগুলো এসে বসেছে, দেখতে পাবেন এখনই। ওই গাছটার ওপরই ফোকাস করুন। উড়লেই দেখবেন পেটের নীচে ডানার নীচে টুকটুকে লাল। পিঠের ওপরটা কালচে গোছের, মানে—গ্রেইশ ব্রাউন, দেখুন ভাল করে।"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমগাছের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"দেখেছি। বাঃ, চমৎকার তো! কি নাম বললেন?"

"সাত সয়ালী।"

"পছন্দ হল না, আমি ওর নাম দিচ্ছি আলতা-পরী—"

কবি আবার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চলুন, এবার বারবেটটাকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।"

দুজনে এগুলেন আবার কাঁঠালগাছের দিকে।

কবি গুনগুন করছিলেন মনে মনে—

শীতের মাসে গোপন পথে
আসলো কি ফাগুন
ডালিম-ফুলী আলতা-পরী
ছাই-চাপা আগুন।

"বসে পড়ুন ওইখানে। ওই তালগাছটার দিকে কাঁটালগাছের যে ডালটা বেঁকে রয়েছে, ওইখানে বসে আছে বসন্ত-বউরি। ভারি অস্থির পাখি—ওই জায়গাটায় ফোকাস করে থাকুন, দেখতে পাবেন।"

বসবার স্থানটা অবশ্য ভাল ছিল না। বড্ড ঢালু। বাঁ দিকে খেজুরগাছের ঝোপ একটা, বৈজ্ঞানিক নির্বিকারচিত্তে তার পাশেই বসে পড়েছিলেন। দামী প্যান্টটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। কবিরও মনে বিকার নেই, কিন্তু বসবার সুবিধা পেলেন না বলেই দাঁড়িয়ে দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখিটা উড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক চটে উঠলেন।

"বলছি, বসে পড়ুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভয়ানক চালাক পাখি, কেউ দেখছে ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে তক্ষুনি উড়ে পালাবে। আবার গিয়ে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, আবার যেতে হবে অনেকটা।"

চলতে লাগলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিকের মনে হল, এই ফাঁকে কবিকে মিনিভেট সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করলে সময় কাটবে।

বললেন, "দেখুন, ওই যে মিনিভেটগুলো দেখলেন, ওগুলোর মেয়ে আর পুরুষ কিন্তু একরকম নয়। পুরুষদের যেমন ডানা আর পেটের নীচে লাল, মেয়েদের তেমনই আবার হলদে।"

কবি উত্তর দিলেন, "আমার কারবার পাখির রূপ নিয়ে, মেয়ে-পুরুষ নিয়ে নয়। ব্যাকরণ নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাই না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি বলব—

আলতা-পরী আলতা-পরী
রঙ্গনিপুণ রঙ্গিণী
সঙ্গে করে বেড়াও নিয়ে
বাসন্তী-রঙ সঙ্গিনী।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন, কবিও হাসলেন। ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা।

"চমৎকার দেখা যাচ্ছে এইবার। লাগান, লাগান, দূরবীন লাগান, বাঃ!"

কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পেলেন এইবার।

"দেখেছি। বারবেট? উঁহু, ভাল নাম তো নয়। তবে একে পরীও ঠিক বলা চলে না। অনেকটা চক্রবর্তী-চক্রবর্তী ভাব। ওর উচ্ছ্বসিত স্বর শুনলে মনে হয়, কোনও কলস্বরা কিশোরী বুঝি। তবে রঙ আছে গায়ে। পিঠটা সবুজ, মাথাটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—হ্যাঁ, দেখেছি এইবার, তামাটে। আবার ঘুরে বসল, বুকটা দেখা যাচ্ছে, মাথারই মত প্রায়। চোখে হলুদ চশমা, ঠোঁটও হলদে... উড়ে পালাল...."

বাহিরে প্রবীণ চক্রবর্তী
অন্তরে তুমি কিশোরী কলস্বরা
গানের তুবড়ি আকাশে ছোটাও
সুরের ফুলকি ওড়ে গিটকিরি-ভরা

উৎসের মতো শূন্যে ছড়ায়ে পড়ে
সবুজ পুচ্ছ পাতার আড়ালে নড়ে।
হলুদ রঙের চশমা দেখিয়া চোখে
কে বুঝিবে তুমি চঞ্চলা চতুরিকা
মর্ত্যে থাকিয়া বিহর স্বর্গলোকে
অন্তর ভরি সুর-স্বপনের শিখা
অতি অপরূপ ছদ্মবেশের তলে
উর্ধ্বমুখেতে রঙিন আলোতে জ্বলে।

কবি কবিতা ভাঁজছিলেন মনে মনে, আর বৈজ্ঞানিক বলে চলেছিলেন, "এই বারবেটগুলো কোথায় বাসা বাঁধে জানেন তো? গাছের ডালে গর্ত করে। ওদের গায়ে অত রঙ, ডিমগুলো কিন্তু সাদা হয়...ওই দেখুন দেখুন দেখুন—"

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক হলুদ রঙের পাখি উড়ে গেল।

"বান্‌টিং—"

"বাংলা নাম কি?"—কবি জিজ্ঞেস করলেন।

"জানা নেই। শীতকালে এরা এ দেশে আসে দলে দলে। ধানক্ষেতে জোয়ারিক্ষেতে বাজরাক্ষেতে দলে দলে নামে। খুব ফসল নষ্ট করে এরা। কিন্তু চমৎকার দেখতে। গাছপালার ওপর যখন দল বেঁধে বসে, তখন সবুজের মাঝখানে হলুদের সে যে কি অদ্ভুত শোভা হয়। এদের দুটো জাত সাধারণত দেখা যায়, এক জাতের মাথাটা কালো আর এক জাতের মাথাটা লাল, বুঝলেন, কিন্তু এদের সোনার মতো হলুদ রঙটাই এদের বৈশিষ্ট্য। ছোট পাখি, আমাদের চড়ুইপাখির মতো।"

কবি বললেন, "এরাই সোনাপাখি নয় তো? ঠাকুরমার কাছে ছড়া শুনতাম—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এল দেশে
সোনাপাখিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"

"ঠিক বলেছেন, এরা সোনাপাখিই।"

বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন একবার কবির মুখের দিকে।

"তা হতে পারে, ঠিক বলেছেন। ওই দেখুন, আর একদল উড়ে যাচ্ছে, সেই দলটাই বোধ হয়।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সোনার মেঘ উড়ে যাচ্ছে যেন একটা।

সোনার স্বপন নামছে নাকি
মর্ত্যভূমে
তাই কি ধরা অর্ঘ্য সাজায়
সবুজ ধানে যব-গোধুমে
নীল আকাশে আত্মহারা তাই কি রবি

তাই কি জাগে কবির চোখে রূপের ছবি
গাছের ডগায় নদীর চড়ায়
মায়ের মুখের মধুর ছড়ায়
শিশুর ঘুমে?

"চমৎকার, না?"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

কবি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সোনার মেঘ উড়ে চলে গেল দৃষ্টির ওপারে। বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওদের ডিমও খুব সুন্দর শুনেছি। ফিকে সবুজ রঙের, মিউজিয়মে দেখেছি একবার।"—এই পর্যন্ত বলে বৈজ্ঞানিকের খেয়াল হল, "রূপচাঁদকে তো দেখছি না! কোথা গেল সে?"

এদিক ওদিক চেয়ে কবি বললেন, "তাই তো কোথা গেল?"

"চলুন দেখি।"

দুজনে বেরুলেন রূপচাঁদের খোঁজে।

"ওগুলোকে চেনেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, ছাতারে।"

"হিন্দী নাম কাচবাচিয়া, কেউ কেউ সাতভাইও বলে, কিন্তু যেরকম কচবচ করে সর্বদা, ইংরেজী সেভেন সিস্টার্স নামটাই বেশি লাগসই বলে মনে হয়, কি বলেন? কিন্তু ভারি মিল আছে ওদের নিজেদের মধ্যে, বাজে ছোঁ মেরে যদি নিয়ে যায় একটাকে, বাকিগুলো পালিয়ে যায় না, বাজের পিছু পিছু ছোটে, অনেক সময় ছাড়িয়েও আনে। এমনও দেখা গেছে যে, ওদের দলকে যখন খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা যায়, তখন একটাকে ছেড়ে দিলে সেটা আবার ফিরে আসে খাঁচার মধ্যে। পরস্পর খুব ভাব, দুপুরে গাছতলায় দেখবেন, এ ওর মাথা খুঁটে দিচ্ছে। এদের নিয়ে আপনারা কবিতা লেখেন না, কিন্তু যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের সঙ্গে এদের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, চাতক আর বউ-কথা-কও তেমনিই ডিম পাড়ে এদের বাসায়। এদের ডিম দেখলে কিন্তু কবিত্ব জাগবে আপনার মনে। পাখির ডিম নিয়ে আমি যে প্রবন্ধটা ফেঁদেছি, তাতে—দেখুন দেখুন, একটা ফড়িং ধরেছে। পোকা খুব খায়, ফল পেলেও ছাড়ে না—"

বৈজ্ঞানিক ছাতারে প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেছিলেন। কবির মনে কিন্তু একটি কথাই কেবল আটকে গিয়েছিল, ওদের মধ্যে ভারি ভাব এবং এইটেকেই কেন্দ্র করে মনের মধ্যে গুনগুন করছিল দুটো লাইন—

নিজেদের মাঝে এত স্নেহ আছে নাকি
ধরার ধুলার ধূসরবরণ পাখি?

হঠাৎ রূপচাঁদকে দূরে দেখা গেল।

একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়েও রয়েছে। আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, মেয়েটি তরুণী। আরও একটু কাছে গিয়ে নজরে পড়ল, একটা ঘড়া বসানো রয়েছে মাটিতে।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি?"

স্মিতমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রূপচাঁদ উত্তর দিলেন, "রস।"

"কি রস?"

"মধুর।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে বললেন, "জিরেন কাটের খেজুর-রস। সব যোগাড় করে তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পেয়ালা তিনটে গেল কোথায়?"

দেখা গেল, এই বনের মধ্যে রূপচাঁদ তিনটে কাচের পেয়ালাও যোগাড় করেছেন।

মেয়েটির দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আপনিই পরিবেশন করুন তা হলে।"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে ঘড়া থেকে রস ঢালতে লাগল পেয়ালায়। বৈজ্ঞানিক চোখে দুরবীন লাগিয়ে কি যেন একটা দেখছিলেন, এসব দিকে লক্ষ্যই ছিল না তাঁর। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অপরিচিতা মেয়েটির দিকে। লাবণ্যময়ী তরুণী।

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
রঙিন স্বপনলোকে মন যেন ঘুরে মরে
ঘুরে ঘুরে বারে বারে কারে চায়!

রঙ জাগে ফুলে ফুলে প্রভাতের আলোকে
রঙ জাগে পাখিদের পালকে
আকাশের নীলে আর মাঠ ভরা সবুজে
রঙের তুফান জাগে,—তবু যে

কিছুতে ভরে না মন, আরও চাই আরও চাই—
বাকি যেন আছে কিছু কি যেন কি মেলে নাই
তাই কি উঠিল ফুটি রূপসীর আঁখি দুটি
শ্যামল বনের পটভূমিকায়!

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
কি যেন কি পাই নাই কি যেন কি বাকি আছে
ঘুরে ফিরে বারে বারে মন গায়!

"নিন।"

কবি আত্মস্থ হলেন। দেখলেন ফেনায়িত রসের পেয়ালা তুলে ধরেছে সে। কবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "খুঁজতে বেরিয়েছিলাম পাখি, পেয়ে গেলাম সাকী।"

মেয়েটি হাসলে একটু—ম্লান বিষণ্ণ হাসি, কবির মনে হল।

বৈজ্ঞানিক চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, "বাঃ, সাদা-পেট ফিঙে দেখেছি একটা। দেখবেন ওই দূরের আমগাছটায় নিচু ডালে বসে আছে, ওদিকে নয়, এই দিকে, চলুন, আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক বরং, এখান থেকে দেখতে পাবেন না আপনি, চলুন।"

"রসটা খেয়ে যান।"

"ও ধন্যবাদ—দিন।"

এক নিশ্বাসে ঢকঢক করে রসটা খেয়ে ফেললেন বৈজ্ঞানিক। পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে কবির দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন, সাদাপেট ফিঙে চট করে দেখা যায় না। রূপচাঁদ, যাবে নাকি?"

রূপচাঁদ একটি গাছের গুঁড়ির উপরে বসে তারিয়ে তারিয়ে চুমুকে চুমুকে রস খাচ্ছিলেন। বললেন, "তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।"

।। দুই ।।

বৈজ্ঞানিকের নাম অমরেশ সেনগুপ্ত। বৈজ্ঞানিক হবার যোগ্যতা আছে। সুযোগও ঘটেছে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, ধনী শ্বশুরের একমাত্র জামাই। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীও আছে একটা—জীব-বিদ্যা বিষয়ে। সাধারণ লোক হলে চাকরি করতেন। অমরেশের পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্তও হত না খুব। অমরেশ কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তি। চাকরির ঘানিতে ঘুরে বাঁধা-মাপের বরাদ্দ জ্ঞান-তৈলটুকু নিষ্কাশন করে তৃপ্ত থাকবার মতো মন তাঁর নয়। প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। জ্ঞান আহরণ করতে চান। উৎসুক উৎকর্ণ আছেন সর্বদা। থাকা সম্ভব হয়েছে, কারণ অর্থাভাব নেই। পিতৃকুল শ্বশুরকুল—উভয়কুল থেকেই তাঁর তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ এসে জুটেছে, তা অনায়াসেই অনর্থ সৃষ্টি করতে পারত, যদি অমরেশ সাধারণ লোক হতেন। তিনি যা করতে চাইছেন, তা-ও অবশ্য সনাতন মল্লিকের মতে অনর্থক। তিনি মফস্বলে নিজেদের জমিদারিতে একটি চিড়িয়াখানা বানাতে চান। তাতে জীবিত এবং মৃত নানারকম পাখি থাকবে। তাঁর ধারণা, এ দেশে পক্ষীবিষয়ে সম্যক গবেষণা এখনও হয়নি। বিদেশি সাহেবেরা চাকরি করবার ফাঁকে ফাঁকে যিনি যতটুকু পেরেছেন করে গেছেন। উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করা দরকার। এমন অনেক ছোট পাখি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যাদের শ্রেণী ঠিকমত নির্দিষ্ট হয়নি এখনও। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি সম্বন্ধেও সব তথ্য পুরো জানা যায়নি বলে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এই সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন। পাখিদের নতুন নতুন শ্রেণী আবিষ্কার করবেন—তাঁদের ঠোঁট, পালকসংখ্যা, পায়ের গড়ন প্রভৃতি থেকে। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এসে পারিপার্শ্বিকতা কেবল পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি আজকাল। ঠিক কোন্ রাস্তাটা ধরবেন ঠিক হয়নি এখনও, মাথার মধ্যে নব নব প্রেরণা ভিড় করছে কেবল। আর একটা সুবিধা হয়েছে—ছেলেপিলে হয়নি। তৃতীয় সুবিধে—স্ত্রী রত্নপ্রভাও অসাধারণ মহিলা। অত্যন্ত কুৎসিত। কালো রঙ, বলিষ্ঠ গঠন। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ফজলি আম। খুব কম কথা বলে। চোখ দুটি বেশ বড় বড়। সেই চোখ দুটি কখনও কুঞ্চিত কখনও বিস্ফারিত করে মনোভাব প্রকাশ করে সে। কথা ক্বচিৎ বলে। যখন বলে, তখনও শোনা যায় না ভাল করে। কণ্ঠস্বর ধরা, ভাঙা ভাঙা। মনে হয়, সর্দি হয়েছে। লেখাপড়া জানে না বিশেষ। অমরেশের কার্যকলাপ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সে। খামখেয়ালী দামাল ছেলের দুরন্তপনা উপভোগ করেন যেমন স্নেহময়ী জননী, রত্নপ্রভাও তেমনই উপভোগ করে উদ্দামপ্রকৃতি স্বামীর শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু নীরবে। কথার কলরবে বা কচকচিতে অমরেশের শান্তি বিঘ্নিত করে না কখনও। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন।

অমরেশের মতো বিদ্বান রূপবান স্বামীর সহধর্মিণী হবার মতো কি-ই বা তার আছে। সে কেবল প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে, অমরেশের যাতে কোনও রকম কষ্ট না হয়। খাবার, বিছানা, বই, যন্ত্রপাতি, পাখিগুলি, এই সবের সুনিপুণ তদারক করে অমরেশের খামখেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনকে কথঞ্চিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রয়াস পায় সে। ক্রীতদাসীর মতো সেবা করে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেয় না যে, সে ক্রীতদাসী। তার কালো কালো মাংসল মুখখানি দেখলে মনে হয়, খুব গম্ভীর রাশভারী লোক সে। সে যে মনে মনে অত কুণ্ঠিত ভীরু, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। অমরেশও মনে মনে তাকে ভয় করেন। শুধু তাই নয়, রত্নপ্রভার বুদ্ধি যে তাঁর চেয়ে অনেক কম, এ কথা অমরেশ যেন মানেনই না মনে হয়। পক্ষীতত্ত্ববিষয়ক নানা বক্তৃতা অসঙ্কোচে তিনি করে যান রত্নপ্রভার কাছে। রত্নপ্রভাও গম্ভীরমুখে শোনে বসে বসে। সেদিন যেমন হচ্ছিল। রত্নপ্রভা গম্ভীরমুখে বসে সুপুরি কুচিয়ে যাচ্ছিল, আর অমরেশ বলে চলেছিলেন অনর্গল।

"দেখ, ভাবছি, আরও কতকগুলো রেডস্টার্ট ধরব। ধরে তাদের পায়ে ছোট ছোট লোহার রিঙ পরিয়ে দেব। ওদেশে আজকাল অ্যালুমিনিয়মের রিঙ পরায়, কিন্তু এখানে তো তা পাওয়া যাবে না। লোহার রিঙই পরাব। দোয়েলগুলোর পায়ে যেমন পরিয়েছিলাম। রেডস্টার্টগুলোর পায়েও পরাতে হবে। কেন বুঝতে পেরেছ?"

রত্নপ্রভা বললে, "তুমি যে দোয়েল পাখির জীবনচরিত লিখবে বলেছিলে, তার কি হল?"

অমরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। আমাদের দেশি পাখিদের জীবনের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। দোয়েল নিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাধনাটাকে কিছুতেই একাগ্র রাখতে পারছেন না এবং এজন্য নিজেই তিনি মনে মনে সচেতন হয়ে আছেন। রত্নপ্রভাও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। স্কুলের ছেলেরা পড়ায় অবহেলা করে শিক্ষকের কাছে যেমন নানা ছুতো দেখায়, অমরেশের উত্তরটা অনেকটা সেইরকম শোনাল।

"শীতকালে দোয়েল পাখির দেখাই পাচ্ছি না যে। ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই এক-আধ বার। যখন যতটুকু দেখছি, টুকে রাখছি। শীতকালে উইন্‌টার ভিজিটারদের নিয়ে আলোচনা করলে ক্ষতি কি। কি বল?"

ধরাগলায় রত্নপ্রভা বললে, "তা বেশ তো"—বলে গম্ভীরভাবে সুপুরি কুচিয়ে যেতে লাগল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আবার বৈজ্ঞানিক,—"ওই রেডস্টার্টগুলো থাকে হিমালয় অঞ্চলে। শীতকালে এই দিকে চলে আসে। এখানে ওদের ধরে যদি পায়ে রিঙ পরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ওরা যখন আবার হিমালয়ে ফিরে যাবে, তখন চেনা যাবে ওদের। তখন যদি আমরা ও অঞ্চলে যাই, কিংবা কোনো লোক রাখি ওদের লক্ষ্য করবার জন্যে, তা হলে বোঝা যাবে, ওরা ঠিক কখন ফেরে, এ দেশে থেকে ও দেশে যেতে ওদের কত সময় লাগে। এই টাইম ফ্যাক্‌টারটা খুব দরকারি বুঝলে? তারপর জানতে হবে, কেন ওরা ফেরে? হিমালয় থেকে অবশ্য পালিয়ে আসে শীতের চোটে। শীতকালে খাদ্যাভাবও ঘটে। কিন্তু ডিম পাড়বার জন্যে সেখানে আবার ফেরে কেন? এ হতে পারে, গরম দেশে ওদের ডিম ফোটে না ভাল করে। আমাদের দীঘিচকের কাছে যে বিঘে দশেক বাগানটা আছে, হরিশবাবু সেটা বন্দোবস্ত নিতে

চাইছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, দেব না। ওটা সমস্তটা জাল দিয়ে ঘিরে ওর মধ্যে শতখানেক রেডস্টার্ট আটকে রাখতে চাই। দেখি, ওরা এ দেশে ডিম পাড়ে কি না! বুঝলে, করব কি, খানিকটা ছকে রেখেছি, এই দেখ।"—প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বার করে রত্নপ্রভাকে বোঝাতে লাগলেন তিনি, কি ভাবে বাগানটাকে ঘিরতে হবে। রত্নপ্রভাও এমন গম্ভীরভাবে ঝুঁকে দেখতে লাগল, যেন সে বড় ইঞ্জিনীয়ার একজন।

বাইরে ডাক শোনা গেল, "অমরবাবু বাড়ি আছেন?"

কবির কণ্ঠস্বর।

"কে, আনন্দবাবু নাকি? আসুন, ভেতরে আসুন।"

সুপুরির সরঞ্জাম নিয়ে রত্নপ্রভা অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল।

কবি ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বারান্দায়।

"আরে মশাই, এ কি রক্তরক্তি কাণ্ড! ছি ছি, করেছেন কি!"

বেরিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"ও, ওটা একটা রেডস্টার্ট ডিসেক্ট করেছি—"

"কেন?"

"দেখতে চাই, ওর সেক্স অর্গ্যানস্ ঠিক পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা!"

"তা দেখবারই বা দরকার কি?"

"তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। ভেতরে আসুন।"

"আহা, অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে কি করেছেন বলুন দেখি? কি নাম বললেন?"

"রেডস্টার্ট—হিন্দী নাম থিরথিরা। ল্যাজটা ওর থরথর করে কাঁপে সাইড টু সাইড। সাধারণত পাখিরা ল্যাজ ওপরের দিকে খাড়া করে তোলে, যেমন দোয়েল—এদের ল্যাজ পাশাপাশি কাঁপে। তাছাড়া এরা বুক-ডন দেয় এমন সুন্দর—"

"কিন্তু ওর লিঙ্গ নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি?"

"বলছি, বসুন না।"

দুজনে ঘরের মধ্যে এসে বসলেন।

শুরু করলেন অমরবাবু।

"পাখিরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়, জানেন তো! হিমালয় থেকে এ দেশে অনেক পাখি চলে আসে শীতকালে। আবার শীত শেষ হলে তারা ফিরে যায় হিমালয়ে, সেইখানেই তাদের জন্মভূমি। সেইখানে গিয়েই তারা বাসা করে, ডিম পাড়ে বাচ্চা হয়। শীতের দেশের পাখি এ দেশে কক্‌খনও ডিম পাড়ে না, এই একটা মজা। ডিম পাড়বার সময় হলে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে আবার স্বদেশে ফিরে যায় সব। কেন ফিরে যায়, কি করে ফিরে যায়, এটা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা মস্ত গবেষণার বিষয়। গড্‌উইন বলে এক পাগলা বিশপের অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, পাখিরা চাঁদে যায়। গিল্‌বার্ট হোয়াইটের মতো বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করতেন যে, শীতকালে সোয়ালোরা পুকুরে কাদার নীচে চলে যায়। এসব কথা কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ আজকাল। আজকালকার থিয়োরি হচ্ছে যে পাখিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়, তার কারণ, পাখির ভিতরে এবং বাইরে দুজায়গাতেই আলো আছে। দিন যত বড় হতে থাকে পাখিদের গায়ে আলো তত বেশি লাগে। সেই আলোর প্রভাবে তাদের

সেক্স অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তারা স্বদেশে ফিরে যায়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে স্টেরাইল পাখিদের ফিরে যাবার তাগিদ থাকে না। এ-ও দেখা গেছে যে, যখন তারা শীতের দেশ থেকে এ দেশে আসে তখন তাদের সেক্স অর্গ্যান্‌স খুবই অপরিপুষ্ট, তারপর কিছুদিন তাদের এভিয়ারিতে কৃত্রিম আলোতে রেখে এবং আলোর পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রমাণ করেছেন একজন যে, তাদের সেক্স্‌ অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। এরও অবশ্য নানা ব্যতিক্রম দেখা গেছে পরে, আমি তাই দেখছিলাম যে, এই রেডস্টার্টটার সেক্স অর্গ্যান্‌স কি রকম। কয়েকটা রেডস্টার্ট ধরেওছি। তাদের আল্‌ট্রাভায়োলেটে এক্‌স্‌পোজ করে দেখব কি দাঁড়ায়।"

"কি দাঁড়ায় তা তো একজন বৈজ্ঞানিক দেখেছেন বললেন, আবার কেন?"

"বিজ্ঞানে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। প্রত্যেক জিনিসটি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হয়—"

বৈজ্ঞানিক স্মিতমুখে চাইলেন কবির দিকে।

"পরীক্ষা করে জানতে চান, এক-জাতের পাখি শীতকালে আর এক দেশে যায় কেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেইজন্যে অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে একাক্কার করেছেন?"

"নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি কি?"

"আমি জানি, কেন যায়।"

"জানেন?"

কৌতূহলভরে জ্বলজ্বল করে উঠল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।

"কেন, বলুন তো?"

"টানে।"

"টানে? হোয়াট ডু ইউ মীন? কিসের টানে?"

"প্রাণের টানে। অনবরত টানাটানি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন না? শুধু পাখি কেন, যখন যেদিকে বেশি টান পড়ে, তখন সেই দিকে সবাই চলে যাই আমরা। চেয়ে দেখুন, বিশ্ব জুড়ে অবিরাম এই টানাটানি চলেছে। দিন।"

"কি?"

"কাগজ পেন্সিল।"

"কি হবে?"

"দিন না।"

কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন কবি। বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে গেলেন তাঁর ব্যবচ্ছেদিত রেডস্টার্টটার তদারক করতে। অনেক কিছু করতে হবে তাঁকে এখন। ওভারি দুটোকে ফ্রিজ্‌ করে মাইক্রোটোম দিয়ে কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে। সেগুলোর ফোটো তুলে রাখতে হবে। তা ছাড়া দুটো ছোট ছোট ঘরে দু দল রেডস্টার্ট রেখেছেন, এক দলকে রেখেছেন অন্ধকারে, আর এক দলকে আল্‌ট্রাভায়োলেট আলোর মধ্যে। সেগুলোর খবর নিতে হবে একবার। পাখিগুলোকে খেতে দিয়েছে কি না, কে জানে! চাকরগুলো মাইনে নেয় একগাদা কিন্তু কাজ কিছু করে না প্রথমত জানে না, দ্বিতীয়ত জানতে চায় না। ভারি ফাঁকিবাজ সব।

মুন্সিটা পাখির খাবার এনেছে কি না তারও ঠিক নেই। বীট্‌ল্ সেদিন চিনিয়ে দিয়েছেন তাকে। রেডস্টার্টগুলো বীট্‌ল্ খেতে খুব ভালবাসে। গুটিপোকাও খুব খায়, ফড়িং হলেও চলে, নিদেনপক্ষে পিঁপড়ে। কিন্তু খুঁজে আনে তবে তো.....। এই দেশে পাখি পোষার এই এক মহাঝঞ্ঝাট, বাজারে পয়সা ফেললে তাদের খাবার কিনতে পাওয়া যায় না। ও দেশে যায়। এ দেশে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে, ছাতু খাওয়ান। আশ্চর্য এদের বুদ্ধি! পাখি কি মানুষ যে, ছাতু খাবে!

হনহন করে গেলেন তিনি বাগানের পিছন দিকটায়। সেখানে তক্তা, কাচ, লোহার জাল, সুতোর জাল, তাঁবু প্রভৃতি নানা সরঞ্জামের সহায়তায় বাগানের দুটো অংশ গাছপালা সমেত ঢেকে বিরাট দুটো খাঁচায় পরিণত করেছেন। অন্ধকারের ভিতর যে রেডস্টার্টগুলোকে রেখেছেন, সেখানটা সম্পূর্ণ ঢাকা আছে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুতে। তার ভিতর কম-পাওয়ারের একটা ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, খাবার দেওয়ার সময় সেটা জ্বালা হয় কেবল। সেইখানটায় গেলেন তিনি আগে। কান পেতে রইলেন তাঁবুর বাইরে। অতি সন্তর্পণে। বাসর-ঘরেও অত সন্তর্পণে লোকে আড়ি পাতে না। 'হুইট...হুইট...হুইট' ওই যে ডাকছে! বড় করুণ বলে মনে হল। খেতে পায়নি নাকি? আহা, কোন্ সুদূর থেকে এসেছে বেচারারা, কাশ্মীরঅঞ্চলে হিমালয়ের কাছে বাড়ি ওদের...বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠুর কৌতূহল করুণার্দ্র হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তেই মনে হল, পাখির ডাক জিনিসটা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত! আমাদের কথা দিয়ে কিছুতে প্রকাশ করা যায় না তা। 'কুহু' বললেই কি কোকিলের কলকণ্ঠের সবটা বোঝানো যায়? রেডস্টার্টের দুটো 'হুইট'-এর মাঝখানে ওই যে কেমন একটু শব্দ আছে. যা তৈলহীন সাইকেলের চাকার শব্দের মতো অনেকটা, তা ভাষায় কিছুতেই লেখা যায় না। একই পাখির একই ডাককে আমরা বলছি 'চোখ গেল', সাহেবেরা বলছে 'ব্রেন ফিভার', বেহারীরা বলে 'পিউ কাঁহা', মারহাট্টারা 'পাওসালা'। অথচ ডাক একই। আচ্ছা, এদের গলার স্বরের গ্রাফ রাখলে কেমন হয়?....অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাফের কথাই ভাবতে লাগলেন। পাখিগুলোকে ধরে ধরে ফোনোগ্রাফের মতো কোনো যন্ত্রের সামনে যদি রাখা যায়. কিন্তু তা হলে তারা ডাকবে কি? মনের আনন্দে ওরা ডাকে, ধর-পাকড় করলে ডাকবে না বোধ হয়, অবশ্য চেষ্টা করলে ক্ষতি নেই। খুট করে শব্দ হতেই বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মুন্সি দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, পাখিদের খাইয়েছিস?"

"হাঁ বাবু, কিন্তু কাল থেকে আমি আর পারব না হুজুর। মল্লিকবাবু আজ আমাকে মারবার জন্যে তেড়ে এসেছিলেন। তাঁর বাগানে আমি আর ঢুকব না।"

"তাঁর বাগানে যাস কেন? আমাদের নিজেদের কত বড় বাগান রয়েছে—"

"আমাদের বাগানে ছোট ছোট ফড়িং কই?"

"নেই?"

"না।"

হঠাৎ সমস্যাটা খুব জটিল বলে মনে হল তাঁর কাছে। তাঁর বাগানে ফড়িং নেই, অথচ মল্লিকবাবু ফড়িং ধরতে দেবেন না, পয়সা দিলে বাজারে ফড়িং পাওয়া যাবে না... মহা মুশকিল তো। পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি শেষকালে? না, তাই বা কি করে হয়?.....

"আমাদের বাগানে ফড়িং নেই?"

"দুটো চারটে—"

"খুঁজে দেখেছিস ভাল করে?"

"খুব খুঁজেছি হুজুর।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন বৈজ্ঞানিক। আড়চোখে চেয়ে সরে পড়ল মুন্সি। খামখেয়ালী পাগল লোকে হঠাৎ কখন কি করে বসেন বলা যায় না। অমরবাবু আর একবার কান পেতে শুনলেন। হুইট—হুইট—হুইট—ঠিক ডাকছে। মল্লিক লোকটাকে এখন কি করে বাগানো যায়? লোকটার কেন যে এমন অকারণ রাগ বোঝা শক্ত। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে তাস-পাশার যে আড্ডা বসে, তাতে যোগ দেবার জন্যে দু-একদিন আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু অমরবাবু যাননি। অন্য কোনো কারণে নয়, খেলতে পারেন না বলে যাননি। একটা কীর্তনের দল এসেছিল একদিন তাঁর বাড়িতে, শুনতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেবারও যাননি। কীর্তন-টির্তন ভালই লাগে না মোটে। মনে হয় মৃদঙ্গ বাজিয়ে অকারণে কতকগুলো লোক হুল্লোড় করছে গানের নাম করে। এই সব কারণেই চটলেন নাকি ভদ্রলোক? হয়তো। অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত অন্যায়। তিনি কি চান, আমি পড়াশোনা পরিত্যাগ করে ভাল না লাগলেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাস খেলব আর কীর্তন শুনব? তা না হলে আমার পাখির ফড়িং খাওয়া বন্ধ করে দেবেন? অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে হনহন করে ফিরছিলেন তিনি। আবার এবং ক্রমাগত ভাবছিলেন, মল্লিক লোকটাকে কি করে বাগানো যায়। নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু যে মোক্ষম উপায়টি অবলম্বন করলে অবিলম্বে সব ঠিক হয়ে যায়, সেটি ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক তাঁরই কর্মচারী। তাঁদের হরিপুরা জমিদারির ম্যানেজার তিনি। মুন্সি যে বাগানটায় ঢুকতে পায়নি, সেটা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তিনি—মানে অমরবাবু নিজে যদি একটি চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করতেন, তা হলে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা লেখবার কল্পনাও করলেন না। মনিবত্বের সুযোগ নিয়ে মল্লিকের বাগানে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোক ঢুকিয়ে ফড়িং সংগ্রহ করবেন, এ তাঁর কল্পনাতীত। মল্লিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কেবলই ভাবছিলেন, এ রকম করার অর্থটা কি। আমার এই গবেষণাটা যে ঠিক কি জাতীয়, তাই বোধ হয় ধারণা নেই ওঁর। উনি বোধ হয় ভাবছেন, ছেলেখেলা হচ্ছে একটা। পাখিদের এই বার্ষিক গতি-বিধি যে কত রহস্যময়, তা একদিন বুঝিয়ে বললে বোধ হয় আপত্তি করবেন না আর। পাখিরা যে কিসের টানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায়, তা ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারলে বিজ্ঞান-জগতে হৈচৈ পড়ে যাবে একটা। এই নিয়ে পৃথিবীর কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন, কত লোক গবেষণা করার সুযোগই পাচ্ছেন না, আর তিনি তাঁর বাগানে ফড়িং ধরতে দেবেন না, এ কি কথা হল। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোঝেননি ভদ্রলোক। কিংবা মুন্সি হয়তো তাঁর বাগানের গাছে-টাছে হাত দিয়েছে। কিছুই বিচিত্র নয়....। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মল্লিক-প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন একেবারে। একটু দূরে ঘাসের উপর পালক পড়ে রয়েছে একটা। প্রায় ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন সেটাকে। দোয়েলের পালক। সাদায় কালোয়—এই তো। অনেক রকম পাখির পালক সংগ্রহ করা আছে তাঁর, দোয়েলের পালক পাননি ইতিপূর্বে। তাঁর এই পালক-সংগ্রহটি একটু বিশেষ ধরনের সংগ্রহ। এতে যে সব পালক তিনি রেখেছেন, তা কুড়িয়ে-পাওয়া পালক। পাখি মেরে তার গা থেকে ছিঁড়ে আর এক ধরনের সংগ্রহ আছে তাঁর—প্রাইমারি

সেকেন্ডারি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ করে। কিন্তু এই কুড়িয়ে-পাওয়া পালকের আকর্ষণ অন্য রকম, বিস্ময় আলাদা। নানা পাখির ডিমও সংগ্রহ করেছেন তিনি, কিন্তু এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া পালক তাঁকে যত আনন্দ দিয়েছে, তত আর কিছুতে পাননি তিনি। দোয়েলের পালক কুড়িয়ে পাননি তিনি ইতিপূর্বে! মনের আনন্দে ছুটলেন তিনি বাড়ির দিকে। রত্নাকে দেখাতে হবে। ফিরেই কিন্তু কবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি যে বৈঠকখানায় বসে আছেন, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

"শুনুন।"

"কি?"

"কবিতা। এক দেশ থেকে আর এক দেশে কেন চিরন্তন চলেছে এই যাওয়া-আসা, তারই কবিতা।"

"পড়ুন।"

১

ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।
তৃষিত ধরণী লক্ষ মুখেতে পান করে সেই আলোক-ধারা
লক্ষ ছন্দে গাহে আনন্দে আপনার মনে পাগলপারা
পাখির পালকে গাছের পাতায়
ঝলকে চমকে পুলকে ব্যথায়
আত্মহারা
অন্ধকারেতে জ্বালায় তারা

কণায় কণায় তাহার তনুর
সপ্ত বরণ ইন্দ্রধনুর
বর্ণমালা
উজাড় করিয়া হয় যে ঢালা
কেন কে জানে,
ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।

২

জানি না আবার সূর্য পানে
লক্ষ যোজন দূরের পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে!

শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া ভঙ্গিমা তার কত যে ওঠে
বন-বনান্ত হয় মুখরিত নব নব কত সুরের চোটে
মাটির কালোয় পড়ে যায় সাড়া
বন্দী রঙেরা পেয়ে যায় ছাড়া
সবাই ছোটে
লক্ষ বরণ ফুলেতে ফোটে;
মাটির মানুষ আকাশের দিকে
দু বাহু তুলিয়া রহে অনিমিখে
কি গান গাহে
কিসের আশায় কাহারে চাহে
কেন কে জানে
জ্বলন্ত-শিখা সূর্য পানে
স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে।

কবিতা পাঠ করে কবি চেয়ে রইলেন স্মিতমুখে।

বৈজ্ঞানিক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে তিনি বললেন, "আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে কিন্তু।"

"কি?"

"রবি ঠাকুরের টানে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর 'লিপি' কবিতাটার ভাব চুরি করে ফেলেছি।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওকে ঠিক চুরি বলে না। কবিতা খুব ভাল হয়েছে আপনার। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, কবিতা বিজ্ঞান নয়। আপনি যে টানের গানে উচ্ছ্বসিত, বৈজ্ঞানিকের কাজই সেই টানের কারণ নির্ণয় করা যুক্তি-সহ উপায়ে। সূর্য কেন পৃথিবীর দিকে আলো পাঠায় আর পৃথিবী থেকে আকাশে এত গান গন্ধ গুঞ্জন কেন ওঠে, তার অনেক কারণ বিজ্ঞান বার করেছে, অনেকগুলোর পারেও নি। কিন্তু পারবে একদিন।"

বৈজ্ঞানিকের এই বালক-সুলভ আত্মপ্রত্যয়ে কবির মুখে একটা অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল। প্রতিবাদ করলেন না। কি হবে প্রতিবাদ করে! তাঁর মনে শুধু গুনগুন করে উঠল কবিতার দুটো লাইন।—

কোন্ চতুরিকা কোন্ পথে আসি
করে যায় কত ছলনা
তার কতটুকু জান বল না!

হয়তো ব্যঙ্গোক্তি করতেন একটা। কিন্তু বাধা পড়ে গেল তাতে। দ্বারপ্রান্তে গোটা তিনেক চাকরের আবির্ভাব হল। দুজনের হাতে খাবারের সরঞ্জাম আর একজনের হাতে চায়ের। পিছনে রত্নপ্রভা। তিনি গম্ভীরভাবে দুজনের সামনে খাবার সাজিয়ে দিয়ে পাশের টেবিলেটায় দাঁড়িয়ে চা ছাঁকতে লাগলেন, মুখে একটি কথা নেই। ক্ষুধিত বালকের মতো খেতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। দুটো রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে সেগুলি গিলতে না গিলতেই একটা কচুরিতে

লাগালেন কামড়। কবি এ সময়ে খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এ সময়ে খাওয়া অভ্যাসও নয় তাঁর! কিন্তু এতগুলি রসবস্তুকে অবহেলা করলে রসবোধেরই যেন অপমান করা হবে—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়ে অথচ শিল্পী-জনোচিত সাবধানতার সহিত তিনি অগ্রসর হলেন। রত্নপ্রভা দুজনের সামনে চায়ের পেয়ালা রাখতেই বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল সহসা। চায়ের সঙ্গে স্টোভের এবং স্টোভের সঙ্গে কেরোসিন তেলের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগই সম্ভবত বিস্মৃত-অপনোদনের কারণ হল।

"যাঃ—ছি—ছি! কটা বেজেছে?"

চেয়ার ঠেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রত্নপ্রভার দিকে চাইতে লাগলেন অপরাধী বালকের মতো। বর্ধমানের বাইরে এমন সীতাভোগ কি করে হওয়া সম্ভব—কবি চিন্তা করছিলেন, তাঁর চিন্তাধারা ছিন্ন হল এতে।

"কি হল আপনার আবার?" —একটু বিরক্তকণ্ঠেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেরোসিনের পার্‌মিটের জন্যে একটা লোক পাঠাবার কথা ছিল, ছি ছি, একদম ভুলে গেছি।"

"লোক পাঠিয়ে পার্‌মিট আনিয়ে নিয়েছি আমি।"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভা বললেন।

"তাই নাকি? বাঃ, গোটাচারেক সিঙাড়া দাও তা হলে?"

কবিও বলে উঠলেন, "ওহো, আমিও বা করছি কি! আমার বাড়িতে কয়লা একেবারেই নেই। আজ উনুন ধরবে না, আপনার কাছে যদি পাওয়া যায় কিছু এই আশায় বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে।"

বৈজ্ঞানিক রত্নপ্রভার দিকে চাইতেই রত্নপ্রভা বললেন, "আমাদের কিছু বেশি কয়লা আছে, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা করে।"—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আনন্দ আছ নাকি?"

"আছি, এস।"

রূপচাঁদ মৌলিক প্রবেশ করলেন। গলায় পাকানো চাদর, বগলে একটি প্যাকেট। এসেই তিনি কবির দিকে এক নজর চেয়ে একটি চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, পাশের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই এক কাপ চা ছেঁকে নিলেন। চায়ে একটা বড়গোছের চুমুক লাগিয়ে কবির দিকে আর এক নজর চেয়ে বললেন, "এরকম ভাবে কতদিন চালাবে বল দিকি আনন্দ?"

"কি রকম ভাবে?"

"পরিবারকে উনুন-গোড়ায় বসিয়ে রেখে কয়লা আনতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ প্রায় ঘণ্টা দুই আগে, আর এখানে বসে দিব্যি রসগোল্লা ওড়াচ্ছ। তোমার জ্বালায় আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারিনি এখনও। পথেই তোমার ঝিয়ের সঙ্গে দেখা, সে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তার মুখেই শুনলুম সব।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! গেলাম বৈজুমলের কাছে। মণ চারেক কয়লা পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। কয়লা নিয়ে ফিরে দেখি, তখনও তুমি ফেরোনি। তখন মনে হল, নিশ্চয়ই পাখির খপ্পরে

পড়েছ। বৈজ্ঞানিক মশায়ের সঙ্গে আমারও একটু দরকার আছে, তাই সোজা এখানেই চলে এলাম, এখনও বাড়ি ঢুকিনি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল শুধু। বস্তুত, কথা বলবার মতো অবস্থা তখন তাঁর নয়। শেষ সিঙাড়াটি মুখে পুরে চর্বণ করছিলেন তিনি তখন। কবি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ— তোমার কর্তব্য তুমি করেছ, এতে আর বলবার কি আছে!

"ছ'টাকা বারো আনা লেগেছে। ছ'টাকা কয়লার দাম আর বারো আনা কুলি। টাকাটা দিতে ভুলে যেও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা, আমিই আনিয়ে নেব এখন তোমার গিন্নীর কাছ থেকে।"

খানিকটা চা দিয়ে মুখবিবরটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক হাঁকলেন, "ওরে, কে আছিস?"

একটা ছোঁড়া চাকর এসে দাঁড়াল।

"আর এক ডিশ খাবার নিয়ে আয়। বল্, রূপচাঁদবাবু এসেছেন।"

"কাজের কথাটা বলে নিই আগে"—শুরু করলেন রূপচাঁদ।

"কি কথা?"

"সবজিবাগে নদীর ধারে তোমার যে বাড়িটা পড়ে আছে, সেটা দেবে আমাকে?"

"সেটা তো পড়ো বাড়ি।"

"একখানা ঘর হলেই চলবে। সেই মেয়েটির জন্যে—"

"সে মেয়েটি আছে নাকি এখনও, কে বল তো মেয়েটি?"—কবি বলে উঠলেন। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"তা থাকতে পারেন তিনি আপত্তি নেই! তবে—"

একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"তবে আবার কি, খোলসা করেই বল না। শহরের বাইরে তোমার ওই পড়ো বাড়িতে কারও পক্ষে থাকা এমনিতেই শক্ত, তবে মেয়েটি নেহাত নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে—ধর্মশালায় দু' দিনের বেশি তো থাকতে দেবে না।"

"পড়ো বাড়ি বলেই ওটা বেশি দরকারী আমার কাছে। ওর পাশেই যে বাঁশঝাড়টা আছে। তাতেই কেটুপা (Ketupa) দেখেছিলাম একদিন...ওখানে মাঝে মাঝে যাই আমি রাত্রিবেলা।"

"কেটুপা কি আবার?"

"হুতুম প্যাঁচা।"

রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বৈজ্ঞানিকের দিকে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক চিকমিক করতে লাগল কেবল!

তারপর বললেন, "বেশ তো, সে যখন দরকার তোমার, যেও।"

"উনি আপত্তি করবেন না তো তাতে?"

"কিছুমাত্র না।"

"মেয়েটি কে, কোথা থেকে এল?"—কবি প্রশ্ন করলেন আবার।

রূপচাঁদ রহস্যময় দৃষ্টি মেলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "বার্মা রেফিউজি।"

বৈজ্ঞানিক উঠে গিয়ে দোয়েলের পালকটি তুলে রাখছিলেন তাঁর পালক-সংগ্রহের মধ্যে। রাখতে গিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীলকণ্ঠের পালকটি নূতন করে বিস্মিত করছিল যেন তাঁকে। প্যারাডাইস ফ্লাই-ক্যাচারের ল্যাজের লম্বা পালকটিও ছিল তাঁর সংগ্রহের মধ্যে, সেটির দিকেও স্নেহভরে চাইছিলেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই অদ্ভুত সুন্দর পক্ষী-দম্পতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যেন চোখের সামনে—হিন্দী নামটিও চমৎকার—দুধরাজ, সত্যিই যেন রাজারাণি, বাদশা-বেগম বললে আরও ভাল হয়। আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক পালক দেখে যেতে লাগলেন তিনি......ঘুঘু, শকুনি, শিকরে, টিয়া, বটের, তিত্তির...কত রকম পালক......

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "বার্মা রেফিউজি মানে? খুলেই বল না।"

"মানে, জাপানীর ভয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তায় বাপ মা ভাই বোন মরে গেছে সব, ডাকাতের হাতে পড়েছিল আসামের জঙ্গলে। এই মেয়েটি পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে কেবল! গায়ের গয়না বিক্রি করতে করতে এতদূরে এসে পৌঁছেছে। রাত্রে জাহাজঘাটে এসে নেবেছিল, তারপর ধর্মশালা খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তা ধরে শহরের বাইরে গিয়ে পড়ে। তোমরা সকালে যখন পাখি দেখছিলে, তখন আমি খেজুর-রসের চেষ্টায় এগিয়ে দেখি, বাগানের ধারে পুলটার ওপর মেয়েটি বসে আছে ম্লানমুখে। বাগানের ও-পাশে শিবু মিত্তির থাকে, তার কাছ থেকে পেয়ালা আনতে যাচ্ছিলাম। ফেরবার মুখে দেখি, তখনও বসে আছে মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় নিলাম। তারপর তো জানই সব—"

কবি বললেন, "আহা, ভারি বিপদে পড়েছে তো মেয়েটি।"

কবির মনটা সত্যই ভারাক্রান্ত হয়ে এল। রূপচাঁদ নিবিষ্টচিত্তে চা খেতে লাগলেন। আর এক ডিশ খাবারও এসে পড়ল।

কবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কি এখানেও থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না প্রথমটা। মনে হল, এ বিষয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন তিনি ততটা। কবি কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক।

"মেয়েটি কি এখানেই থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব না দিয়ে আর পারলেন না।

"কি করে বলব বল?"

"এ দেশে ওর আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ?"

"জানি না তো। আমাকে কেঁদে কেটে ধরেছে একটা আশ্রয় যোগাড় করে দেবার জন্যে। চেষ্টা করছি, তারপর কি হয় কে জানে!"

"ওই পড়ো বাড়িতে ও একলা থাকতে পারবে?"

"তা কি পারে কখনও!"

"কে থাকবে তা হলে ওর সঙ্গে?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না, একমনে কচুরি চিবোতে লাগলেন। কথাটা আরও চাপা পড়ে গেল, বৈজ্ঞানিক ফিরে এসে যখন রূপচাঁদের প্যাকেটটা তুলে বললেন, "এটাতে কি?"

"ওটা একখানা শাড়ি।"

"শাড়ি? ও—"

বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল এর বেশি আর অগ্রসর হল না। তিনি প্যাকেটটা টেবিলে রেখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কবি প্রশ্ন করলেন, "শাড়ি? কার জন্যে শাড়ি কিনলে?"

"শাড়ি আবার কার জন্যে কেনে লোকে। পরিবারের জন্যে। রমেনদের দোকানে দেখলাম টাঙানো রয়েছে, দামটা শস্তা মনে হল, নিয়ে যাচ্ছি, গিন্নীর যদি পছন্দ হয়, রেখে দেওয়া যাবে।"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠলেন, চুপ চুপ, একটা চোরপাখি এসেছে—চেস্টনাট-বেলিড্ নুটহ্যাচ্। দেখবেন? ওই আমগাছে রয়েছে। গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগালেন। কবিও গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। রূপচাঁদ আর একটি কচুরি মুখে পুরলেন।

।। তিন ।।

কবি-গৃহিণী মন্দাকিনী অতিশয় চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির লোক। কবিত্ব-টবিত্বর ধার ধারে না বিশেষ। অতিশয় স্বাভাবিক নারী-জীবন যাপন করে থাকেন ভদ্রমহিলা। অনেকগুলি সন্তানের জননী, নানারকম রান্নায় সিদ্ধহস্ত। উলবোনা, সেলাই করাও শিখেছিলেন এককালে; কিন্তু আজকাল ওসব নিয়ে বসবার সময়ও নেই, পয়সাতেও কুলোয় না। সংসারের ন্যায্য খরচই কুলোতে পারে না, ওসব শৌখিন খরচ করবেন কোথা থেকে! কর্তা 'রিটায়ার' করার পর থেকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ওসব। কবি ছিলেন অধ্যাপক। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শহরে বাড়িখানা আছে, জমি-জমাও আছে কিছু। যা পেন্‌শন পান তাতে কুলিয়ে যায়। কিন্তু কোনোক্রমে। সংসারের সমস্ত ভার মন্দাকিনীর উপর। আজকাল ঝি-চাকর পাওয়া যায় না, একা হাতে মন্দাকিনীকেই সব করতে হচ্ছিল এতদিন। বাসন-মাজা, ঘর-নিকানো, রান্না, সাবান-কাচা সমস্তই করছিলেন। সম্প্রতি রূপচাঁদ একটি ঠিকে ঝি যোগাড় করে দিয়েছেন। এত কাজ একা করা সম্ভব হচ্ছিল তার কারণ বাড়িতে এখন লোকজন কম। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠটি ব্যতীত আর সবই কন্যা। তাদের বিয়েও হয়ে গেছে। সবাই এখন শ্বশুরবাড়িতে। ছেলে মন্টুর বয়স বছর দশেক, মামার বাড়িতে থেকে সে স্কুলে পড়ে। মামীর সে খুব প্রিয়, মামী তাকে ছাড়তে চায় না। উপস্থিত স্বামীকে নিয়েই মন্দাকিনীর সংসার। তবু কিন্তু মন্দাকিনীর অবসর নেই। তিনি সংসারের কাজ নিয়েই থাকেন, ও ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। সংসারকে কেন্দ্র করেই তাঁর যত ঘোরা-ফেরা। রান্নার অবসরে কখনও ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন, কখনও বড়ি দিচ্ছেন, কখনও আচার করছেন, কখনও আমসত্ত্ব। চিনি আজকাল দুর্লভ হয়েছে, চিনি পেলে জ্যাম জেলি করার শখও আছে, তা ছাড়া আছে হাড়-পাঁজরা বের-করা একটি গাই। মন্দাকিনী শখ করে তার নাম রেখেছেন সুন্দরী। দু'বেলায় মেরে-কেটে গরুটি সের খানেক দুধ দেয় কি না সন্দেহ, কিন্তু তাতেই মন্দাকিনী গদগদ। দিবারাত্রি গরুটির সেবা করে চলেছেন। কখনও তাকে ফ্যান খাওয়াচ্ছেন, কখনও নাদা পরিষ্কার করছেন, কখনও জাব মেখে দিচ্ছেন, কখনও গোবর পরিষ্কার

করছেন। সুতরাং 'ড্রইং-রুম' বলে যদিও তাঁদের একটি ঘর আলাদা করা আছে এবং সেখানে যদিও মাঝে মাঝে অধ্যাপক মশায়ের বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যাগম ঘটে, কিন্তু মন্দাকিনীর সেখানে গিয়ে বসবার অবসর নেই। তাঁকে সেখানে মানায়ও না ঠিক। তাঁর বেশবাস কথাবার্তা, হাব-ভাব সমস্তই সেকালে ধরনের। কিছুকাল আগে পর্যন্ত রীতিমত অন্তঃপুরিকাই ছিলেন, অচেনা লোকের সামনে বেরুতেন না। ইদানীং অবশ্য বেরোন, কিন্তু স্বস্তি পান না। কোনও মহিলার সমাগম হলে আনন্দবাবুর ডাকাডাকিতে মাঝে মাঝে তাঁকে 'ড্রইং-রুমে' এসে বসতে হয়, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারেন না তিনি সেখানে। রান্নাঘরে ডালটা চড়িয়ে এসেছেন, না নাড়লে ধরে যাবে, কিংবা গোয়ালঘরে সুন্দরীর নাদায় হয়তো জল নেই—এই ধরনের একটা কিছু তাঁর মনে পড়ে যায়, আর তখনই তিনি উঠে আসেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দিকে ঘটা করে মন দিতে পারেননা তিনি। আনন্দবাবুর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাও খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তিনি স্বামী আছেন আছেন, তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না মন্দাকিনী। তিনি যা রাঁধবেন স্বামীকে তাই খেতে হবে, স্বামী কি খেতে পছন্দ করেন, তা বিচার করবার সময় নেই তার। গেরস্থ ঘরে অত পছন্দ-অপছন্দর বায়নাক্কা তুললে সংসার চালানো যায় না—মন্দাকিনীর এই ধারণা। আনন্দবাবুও এই নিয়ে বকাবকি করেন না আর। যা পান মুখ বুজে খেয়ে নেন। স্ত্রী সম্বন্ধে আনন্দবাবুর ধারণা সংস্কৃত-যুগ-ঘেঁষা। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' পত্নী একটা সামাজিক প্রয়োজন। শৌখিন আসবাবের মতো কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার বস্তুও যেমন নয়, অনাদরে আবর্জনার মতো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিসও নয়। অতিশয় পবিত্র এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দবাবু বকাবকি করেন না আর। পেন্‌শনটি পাওয়ামাত্র মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে দেন। মন্দাকিনীর ফরমাশ অনুসারেই বাজারের জিনিসপত্র কিনে আনতে হয় তাঁকে। তাঁর যে একটা আলাদা সত্তা আছে, আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আলাদা জগৎ আছে, তা মন্দাকিনী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন বলে মনে হয় না। স্বামী তাঁর জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং তাঁর জীবন অনুসারেই স্বামীকে চলতে হবে। অন্য রকম যে কিছু হওয়া সম্ভব, তা মন্দাকিনীর কল্পনাতীত। তাঁর সুন্দরী গাই এবং স্বামী আনন্দমোহনকে ঠিক যদিও এক দৃষ্টিতে দেখেন না তিনি, কিন্তু হাবভাব থেকে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা এক রকমই। তা বলে স্বামীকে তিনি যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাও নয়। তাঁর মঙ্গলের জন্য ব্রত-উপবাস করেন, তাঁর শরীর কিসে ভাল থাকবে সেজন্য তাঁর সশঙ্ক চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর সম্বন্ধে গৌরববোধও আছে যথেষ্ট। তিনি যে কত বড় বিদ্বান অধ্যাপক, কত বড় কবি—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনী খুবই সচেতন। তাঁর প্রতিবেশিনী হালদার-গিন্নীর কাছে অত্যুক্তিপূর্ণ অনেক গল্প করেন তিনি এ নিয়ে। না, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা নেই মন্দাকিনীর মোটেই। তিনি যেমন মা-ষষ্ঠী মানেন, বারবেলা মানেন, ভূত-প্রেত কবচ-মাদুলি মানেন, স্বামীকেও তেমনি দেবতা বলেই মানেন। পায়ে পা ঠেকে গেলে প্রণাম করেন, পাদোদকও খান দরকার হলে। যে ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেই আনন্দমোহন তরফদার যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরেই আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জন্মজন্মান্তরের জের টেনে এ জন্মেও আবির্ভূত হয়ে তাঁর কপালে সিন্দুর দান করেছেন—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনীর কোনও সন্দেহ নেই। আকাশ নীল, বরফ ঠান্ডা—এসব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আনন্দমোহন তরফদারও তেমনই একমাত্র মন্দাকিনী দেবীর প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত—এই তাঁর ধারণা! মন্দাকিনীকে অতিক্রম করে আনন্দমোহনের আর একটা সত্তা থাকা সম্ভব কি না

এবং সেটা কি রকম তা নিয়ে তিনি কোনও দিন মাথা ঘামাননি, তাঁর ঘরের চৌকিটা চতুষ্পদ না হয়ে অষ্টপদ হলে কি রকম হত তা নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামান না কখনও।

বলা বাহুল্য, মন্দাকিনী মাথা না ঘামালেও আনন্দমোহনের আর একটা বিশিষ্ট সত্তা ছিল। সেই বিশিষ্ট সত্তার প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য-বোধ, এবং প্রধান আকাঙ্ক্ষা রূপ-পিপাসা। এইজন্যেই তিনি কাব্যচর্চা করেন, এইজন্যেই তিনি পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে মেতেছেন এবং ঠিক এইজন্যেই বার্মা-ফেরত যুবতীটির কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে তাঁর মনের আকাশে যে বর্ণসম্ভার ফুটে উঠল তা সৌন্দর্যে ইন্দ্রধনুকেও ছাড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

তাঁর মানসলোকের এই সব খবর মন্দাকিনী কখনও রাখেননি, রাখবার দরকারই হয়নি তাঁর। স্বামী সম্বন্ধে যে খবরগুলি তিনি জানেন, সেইগুলিই পর্যাপ্ত তাঁর পক্ষে। তিনি জানেন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা প্রকৃতির লোক, কিন্তু সর্ববিষয়ে সর্দারি করতে যাওয়া চাই। তিনি জানেন, আনন্দমোহনের ধাতটা কোফো, কিন্তু রাত্রে মাথার দিকে জানালা খুলে শোবার লোভটা প্রচুর। তিনি জানেন, তরকারিতে বেশি মসলা দিলে আনন্দমোহনের পেট খারাপ হয়, কিন্তু আনন্দমোহনের ইচ্ছেটা বাড়িতে রোজই তেল-ঘি-মসলা-ওলা গরগরে তরকারি হোক। তিনি জানেন, আনন্দমোহন বাইরের লোকের কথায় নাচবার জন্যে পা-টি সর্বদা বাড়িয়ে আছেন, অথচ নাচের 'ন' পর্যন্ত জানেন না তিনি। এই 'রিটায়ার' করবার পর সেদিন যেমন হল। নিতাইবাবুর কথায় নেচে পোস্ট-অফিস থেকে টাকা বের করে শেয়ারে মনোহারী দোকান খুললেন। মন্দাকিনী পইপই করে বারণ করেছিলেন, কিছুতেই শুনলেন না। ফলে টাকাগুলি গেছে। তিনি জানেন যে, আনন্দমোহন যেটি দরকারী কাজ সেটি কিছুতে করবেন না। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে ছাইভস্ম কত কি যে রোজ লিখে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা, অথচ সেজো মেয়েটার জ্বর হয়েছে খবর পেয়েও একটি চিঠি লেখেননি সেখানে। আনন্দমোহন-চরিত্রের এই সব কথা মন্দাকিনী জানেন। রঘুবংশ বিষয়ে তাঁর থীসিস যে বিদ্বৎ-সমাজে কতটা সুখ্যাতি লাভ করেছে, অধ্যাপক হিসাবে তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর অধ্যাপনা কৌশল, তাঁর চরিত্রমাধুর্য যে ছাত্র-সমাজকে কত মুগ্ধ করে রেখেছে, তাঁর সৌন্দর্যবোধ, রসোচ্ছলতা, সাবলীল কবিত্বশক্তি যে যে-কোনও কবিযশোপ্রার্থীর ঈর্ষার বিষয়—এসব খবর মন্দাকিনী জানতেন না, জানবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এই বুড়ো বয়সে তাঁর স্বামী যে তাঁর মেয়ের বয়সী কোনও মেয়েকে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন—এ কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল মন্দাকিনীর পক্ষে। ইদানীং অমরবাবুর পাল্লায় পড়ে পাখির হুজুকে মেতেছেন এবং দূরবীন কিনেছেন—এই তিনি জানতেন। এই দুঃসময়ে অত টাকা খরচ করে দূরবীন কেনাতে আপত্তি ছিল তাঁর। জামাইষষ্ঠীতে ছোট জামাইকে ভাল করে তত্ত্ব দেওয়া হয়নি গেল বছর, এ বছরও যদি না দেওয়া হয়, তা হলে কুটুমবাড়িতে আর মান থাকবে না। কিন্তু হুজুকে মাতলে তো ওঁর জ্ঞান থাকে না—দুম করে অত টাকা খরচ করে দূরবীন কিনে বসলেন একটা! দূরবীন দিয়ে কাক আর শালিখ দেখে কার কি হবে? আনন্দমোহন-চরিত্রের যতটুকু তিনি জানতেন, তাতে তাঁর এ আচরণ বেমানান হয়নি কিছু। কিন্তু তিনি দূরবীন দিয়ে পাখি ছাড়া অন্য কিছুও যে দেখছেন, এ তিনি ভাবতেও পারেননি, কারণ আনন্দমোহন চরিত্রের এ অংশটুকু অজ্ঞাত ছিল তাঁর কাছে। তাই সেদিন যখন বেলা একটা পর্যন্ত আনন্দমোহন বাড়ি ফিরলেন না, তখন এ কথা ভাবা মন্দাকিনীর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, তিনি ওই বার্মা-ফেরত মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুপুর রোদে টো-টো করে।

আনন্দমোহন সত্যিই কিন্তু চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের বাড়ির জন্যে হলে খুঁজতেন না, কিন্তু এর জন্যে খুঁজছিলেন। ওই আশ্রয়হীনা মেয়েটির হিতার্থে কিছু একটা করার জন্যে তাঁর সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। তাঁর মনে হচ্ছিল, করিৎকর্মা রূপচাঁদ নিপুণ দক্ষতা-সহকারে সব করে ফেলছে, তিনি কিছুই পারছেন না, তিনি হেরে যাচ্ছেন। মেয়েটির চোখে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। রূপচাঁদ তার বাড়ি যোগাড় করে দিয়েছে, চৌকি যোগাড় করে দিয়েছে, একটা হোটেল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। দাই কিংবা চাকর যোগাড় করতে পারেনি এখনও। সকালবেলা অমরেশের সঙ্গে পক্ষী-পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে, আগরপুরে তাঁর এক ছাত্র মহেশলাল আছে। মহেশলাল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে তার বিয়ের সময় তিনি গেছেনও একবার। মনে হল, মহেশলাল ইচ্ছে করলে অনায়াসে একটা চাকর যোগাড় করে দিতে পারে। কথাটা যখন মনে হল, তখন অমরবাবু সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন নীলকণ্ঠ পাখির বিষয়ে। বক্তৃতার মাঝখানেই আগরপুর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটা অশোভন হবে বিবেচনা করে আনন্দবাবু বক্তৃতা শুনছিলেন। বক্তৃতার দু-চারটে কথা তাঁর মনে আটকেও ছিল। নীলকণ্ঠ পাখি যে ব্যাঙ খেতে খুব ভালোবাসে, সাপ পেলেও ছাড়ে না, এ খবর দুটো অদ্ভুত মনে হয়েছিল তাঁর। অমরেশবাবু বলছিলেন, শীতকালে ওর সৌন্দর্য ঠিক বুঝতে পারবেন না। মার্চ মাস পড়লে তখন দেখবেন ওর বাহার। চতুর্দিকে শোরগোল তুলে সঙ্গিনীকে ঘিরে ঘিরে কত রকম কসরৎই যে ও দেখাবে তখন দেখবেন। সোঁ করে আকাশে উড়ে যাবে অনেক দূর পর্যন্ত, তারপর 'ডাইভ' (Dive) করার মতো করে সঙ্গিনীর দিকে সোজা নেবে আসবে আবার, উচ্ছ্বসিত কলরবে নীল রঙের বাহার ছড়িয়ে। অমরবাবু আর একটা পাখি দেখিয়েছিলেন শ্রাইক (Shrike), বাংলা নাম ক্যারকাটা। অদ্ভুত ধরনের পাখিটা। ছাই-ছাই রঙ, টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে। শুধু চতুর নয়, পাখিটার ভাবভঙ্গিতে কুটিল ভাবও ফুটে উঠেছিল একটা। কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডাকছিল। কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল, ক্যারকাটা পাখিটা যেন ঘাড় বেঁকিয়ে মনে মনে বলছে—

ডাকছ ডাকো—কুহু কুহু কুহু
শুনছে সবাই হুঁ হুঁ—

অমরবাবু পাখির বাসা নিয়েও কি দু-চার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার সব কথায় মন দিতে পারছিলেন না তিনি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপচাঁদের চোখ এড়িয়ে আগরপুরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি। রূপচাঁদের চোখ-এড়ানো দুঃসাধ্য হয়নি, কারণ আপিসের সময় হতেই রূপচাঁদ চলে গেলেন। বেগ পেতে হয়েছিল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে। তাঁর বক্তৃতা আর কিছুতেই থামে না। তাঁর বক্তৃতা যে খারাপ লাগছিল তা নয়; খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু ভাল করে মন দিয়ে শুনতে পারছিলেন না কিছুতে। অদ্ভুত একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। শীতকালের রোদে আমবাগানটা আশ্চর্যরকম ভাল লাগছিল, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের আড়ালে-আবডালে নতুন চেনা পাখিদের আবার দেখতে পেয়ে সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল বার বার, অমরবাবুর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে বিহঙ্গ জগতের নানা রহস্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়েও উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্তরের নেপথ্যলোকে ওই মেয়েটি কি যে মায়ার প্রভাব বিস্তার করছিল, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

....কবি ফিরলেন যখন, তখন একটা বেজে গেছে। মন্দাকিনী তাঁর পথ চেয়ে অনাহারে চিন্তিত

মুখে বসে ছিলেন। নানারকম দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তাঁর। সম্ভব অসম্ভব নানারকম। মনে হচ্ছিল, কোথায় কোন্ বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শুয়োর বাঘ সাপ-খোপ কত কি আছে, কামড়ে দিলেই হল। ছেলেবেলায় বুনো শুয়োর-চেরা একটা লোক দেখেছিলেন, তার রক্তাক্ত ছবিটা বার বার মনে জাগছিল। বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের বাড়িতেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাড়িতে ছিলেন না। পথ চেয়ে শঙ্কিত চিত্তে বসে ছিলেন মন্দাকিনী। স্বামীকে সশরীরে ফিরতে দেখে শঙ্কা অন্তর্হিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

"কি আক্কেল তোমার। কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

"একটা পাখির পেছনে পেছনে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম—"

"পাখির পেছনে? গরুর পেছনে পেছনে যাওয়া যায়, পাখির পেছনে পেছনে গেলে কি করে? উড়ছিলে নাকি?"

কবি স্ত্রীকে চিনতেন, প্রত্যুত্তর করলেন না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

মন্দাকিনী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি?"

"একটা নতুন ধরনের পাখি। এর আগে দেখিনি কখনও। শ্রাইক একটা।"

"কি?"

"শ্রাইক, বাংলা নাম কুরকুটি।"

ক্যারকাটা নামটা ঠিক মনে পড়ল না কবির।

"কুরকুটি?"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মন্দাকিনী স্বামীর দিকে। দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। কবি তাঁর দিকে পিছন ফিরে নীরবে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলেন। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "আমি চান করব না।"

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুলোয় ভরতি, চান না করেই খাবে? গরম জল তো উনুনে বসানোই রয়েছে, চান করতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"বেশ, দাও তা হলে।"

নিজের তেতলার ঘরটাতে একা শুয়ে ছিলেন কবি চুপ করে। খেয়ে এসে লেপটি গায়ে ঢাকা দিতেই তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কিসের একটা শব্দে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চোখ পড়ল, দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়েছে একটা জায়গা থেকে। পৈতৃক পুরনো বাড়ি। বহুদিন মেরামত করানো হয়নি। এই চিন্তার সূত্র ধরে গুটি গুটি আরও যেসব চিন্তা মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে উঁকি দিতে লাগল, তা ভয়াবহ। চুন, বালি, সিমেন্ট, পারমিট, রাজমিস্ত্রি, ভারা...। তাড়াতাড়ি লেপ ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। উঠেই জানালাটা খুলে দিলেন: জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল নীলাকাশ এবং সেই নীলাকাশের পটভূমিকায় একটা ন্যাড়া আমড়াগাছ। আমড়াগাছের উঁচু ডালে বসে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আকাশের দিকে মুখটা ঈষৎ তুলে পড়ন্ত রোদটা উপভোগ করছে যেন প্রাণ ভরে। জানালাটির ধারেই কবির লেখার জায়গা, তার নীচেই লেখবার সরঞ্জাম ছিল সব। চেয়ারটি টেনে কবি বসে পড়লেন। বাড়ির জীর্ণ সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে বসে রইলেন তিনি পাখিটার দিকে চেয়ে। ঠিক পাখিটার দিকেও চেয়ে নয়, পাখিটাকে কেন্দ্র করে তাঁর মন কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল অনন্ত আকাশে। একটু পর আর একটা নীলকণ্ঠ এসে বসল। প্রথম নীলকণ্ঠটা যেখানে বসে ছিল,

তার নীচের ডালটায়। অতিশয় নির্বিকারভাবে, যেন সে প্রথম নীলকণ্ঠটাকে দেখতেই পায়নি। প্রথম নীলকণ্ঠটা কিন্তু উচ্ছ্বসিত কলরবে ডেকে উঠল। এত উচ্ছ্বসিত যে, তা কর্কশ কি মধুর, তা বিচার করবার আর অবসর রইল না, উচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে গেল কবির মন। তারপরই সে উড়ল ডানা মেলে। বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করে দিলেন হঠাৎ—

বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে
ও নীলকণ্ঠ, রঙ যে তোমার
উপছে পড়েছে ডানার নীচে
আ মরি মরি
পাশে বসে আছে সোহাগী সখীও নীলাম্বরী!
সয় না তর
খুলে যায় মন খুলে যায় ডানা
কণ্ঠে জাগে যে কলস্বর.......
দেখি তখন
এ কি স্বপন...
ঘন-নীল আর ফিকে-নীল আর আবছা-নীল
সাগরের নীল, আকাশের নীল, নীল-নিখিল
ফোয়ারার মতো অনন্ত নীলে ছড়িয়ে পড়ে
চমক-লাগানো নীলের ঝড়ে,
ঊর্ধ্বে নিম্নে আগে ও পিছে,
বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে।

কবিতাটা লিখে কবি চোখ তুলে দেখলেন, পাখি দুটো চলে গেছে· চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। মেয়েটির মুখটা মনে পড়ে গেল। কি অদ্ভুত শ্যামল স্নিগ্ধতা ওতপ্রোত হয়ে আছে তন্বী দেহটিতে। যখন চাকরটাকে নিয়ে গেলেন, তখন তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দ। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কবি অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। কাগজ কলম নিয়ে আবার শুরু করলেন লিখতে।—

বল না বোঝাব সখি কি করে
তোমার অঙ্গ ভরি কি মাধুরি মরি, মরি
তোমার নয়ন কোণে কি আলো যে ঠিকরে!
সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে
অরূপ-লোকের মায়া রূপলোকে এসে যেন
অতিশয় দ্বিধা-ভরে থেমেছে।
থমথমে চারিদিক,—চুপ চুপ চুপালি
মেঘেতে লেগেছে রঙ সোনালি ও রূপালি

ভূপালী না ভৈরবী চোখে ওর কি ভাষা
তৃপ্তি না পিপাসা
কল্পনা-বীণা বাজে আকুল ছন্দা যে
মুজরি উঠিয়াছে রজনী-গন্ধা যে
শ্যামল তন্বী তনু-শিখরে
বল না বোঝাব সখি কি করে!

লেখা শেষ করে কবি বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। অন্ধকার নামতে লাগল চতুর্দিকে। তার সঙ্গে স্বপ্নও।

।। চার ।।

"বসে পড়ুন, ওইখানেই বসে পড়ুন—"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস করে গর্জন করে উঠতেই বসে পড়লেন কবি। শহরের বাইরে অনেক দূরে এসে পড়েছিলেন তাঁরা, নদীর ধারে ধারে বক আর বাটানের দল দেখতে দেখতে। উদ্দেশ্য—নদীটা পেরিয়ে কিছু দূরে যে বিলটা আছে, সেইখানে গিয়ে শীতের অতিথি কাদা-খোঁচার দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কবির।

কবি বসে পড়তেই বৈজ্ঞানিক হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলেন তার কাছে।

"ওই দেখুন হলদে খঞ্জন একটা—Yellow Wagtail—এরা উইন্টার ভিজিটার—"

"কোথা থেকে আসে?"

"রাশিয়া থেকে। গ্রীষ্মকালে এরা Ural Mountains থেকে কামস্কাট্কা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে. আফগানিস্থানের উত্তরেও কিছু কিছু দেখা যায়। অতদূর থেকে ওরা উড়ে আসে এ দেশে।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ছোট্ট পাখিটিকে। ল্যাজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামস্কাট্কার পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির খবর ও রাখে নাকি? সোভিয়েট বিপ্লবের আঁচ লেগেছে নাকি ও গায়ে? দেখলে তো মনে হয়, এ দেশের শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "খঞ্জন কিন্তু আরও চার রকম আছে, White Wagtail, Large Pied Wagtail, Grey Wagtail, Yellow Headed Wagtail. এর মধ্যে Large Pied Wagtail এ দেশেরই বাসিন্দা, সব সময়ে থাকে। শুনুন, ডাকছে, শুনতে পেলেন?"

কবি ধমকে উঠলেন, "পেয়েছি। আপনি একটু চুপ করুন তো।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, কবি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন খঞ্জন পাখিটার দিকে তন্ময় হয়ে। মনে হচ্ছে, একটা অপরূপ কিছু দেখছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিক সহসা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"ওই দেখুন।"

"কি?"

"দোয়েল। শীতকালে বড় দেখা যায় না। ওই ঝোপটার ধারে টপ করে নামল। পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধ হয়। চলুন, ওঠা যাক।"

আবার দুজনে চলতে শুরু করলেন। ঝোপটার কাছাকাছি এসে বৈজ্ঞানিক বললেন, "দাঁড়ান একটু, আমি দোয়েলটাকে দেখে আসি ভাল করে। ও বোধ হয় ওই ঝোপটাতেই থাকে।"

কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে পড়ল, একটা ফিঙে বসে আছে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর। চমৎকার মিষ্টি সুরে ডাকছে। আর একটা ফিঙে উত্তর দিচ্ছে তেমনই মিষ্টি সুরে। কবির মনে হল, বিশ্ব জুড়ে এই চলেছে অহোরাত্র। অন্তরতমকে ডাকছে সবাই। নিরন্তর চলেছে এই ডাকাডাকি—গানে গন্ধে বর্ণে। ডানার কথা মনে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ। দূরের শিমুলগাছটায় প্রকাণ্ড একটা শকুনি এসে বসল। বিরাট পাখি। শকুনি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে হল। ঘাড় ফিরিয়ে বৈজ্ঞানিককে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? হঠাৎ দেখতে পেলেন, প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি ঝোপটার পাশে, এবং উদগ্রীব হয়ে কি দেখছেন। কবি এগিয়ে গেলেন।

"কি দেখছেন?"

"দেখতে পেলাম না ঠিক। পালাল। চলুন।"

"শিমুলগাছটায় শকুনি বসেছে একটা—"

"ও, কই?"

"ওই যে—!!"

বৈজ্ঞানিক দুরবীন লাগিয়ে দেখলেন একবার।

তারপর বললেন, "এটা হচ্ছে White-Bengal Vulture. পিঠের ওপর সাদা আর গলায় কলারের মতো সাদা আছে, দেখুন। এইটেই সাধারণত দেখা যায়, আর এক রকমও দেখা যায়, Long-Billed Vulture–Gyps Indicus–এদের ঠোঁট আর একটু লম্বা হয়, পিঠের কাছে সাদা নেই। লাল-গলা শকুনিও আছে এক রকম, দেখেছেন নিশ্চয়, সেগুলোর নাম King Vulture. পণ্ডিচেরি ভাল্চারও বলে কেউ। বামুন শকুনিও বলে।"

কবি কিন্তু ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। তাঁর মনে হচ্ছিল, শকুনির ছদ্মবেশে এ যেন আর কেউ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। মনে হল, সেকালে রোমে কার্নিভালের সময় সকলে যেমন ছদ্মবেশ পরে বেরুত, এ বোধ হয় তেমনই একটা ঘটনা। শকুনির ওই জবড়জঙ পোশাকের অন্তরালে হয়তো লুকিয়ে আছে কোনও রাজপুত্র বা রাজকন্যা। যে খঞ্জনটা এখনই দেখলেন, তার ওই চটুল চঞ্চল গতি, মিষ্টি মিহি সুর, ওই স্বর্ণাভ কান্তি—এ কি শুধু পাখির?

বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। গত বার শকুনির ডিম সংগ্রহ করতে পারেননি তিনি। এবার করতে হবে। শীতের গোড়ার দিকে অনেক সময় ডিম পাড়ে ওরা। হনহন করে এগিয়ে চললেন শিমুলগাছটার দিকে।

"ওদিকে কোথা চললেন আবার? বিলের রাস্তা তো এই দিকে—"

"শকুনির কোনও বাসা আছে কি না, দেখে আসি চলুন না। ওদের বাসা চিনতে দেরি হয় না। আর একটা মজা কি জানেন। ওরা অনেক সময় চার পাঁচটা বাসা করে, হয় একই গাছে কিংবা পাশাপাশি গাছে, কিন্তু ডিম পাড়ে মাত্র একটি। বাসা করেছে কি না দেখে আসি চলুন।"

কবির মনে হল, তড়বড়ে লোকটার পাল্লায় পড়ে প্রাণ যাবে দেখছি। নিজের চিন্তাধারা ছিন্ন হওয়াতে বিরক্তও হয়েছিলেন তিনি একটু!

"আপনি যান মশাই, আমি এইখানেই বসছি—"

বৈজ্ঞানিক চলে গেলেন। কবি একটা উঁচু ঢিপির উপর গিয়ে বসলেন। তিন-চারটে হলদে খঞ্জন উড়ে এসে বসল আবার একটু দূরে! কি অদ্ভুত সুন্দর পাখি। চঞ্চলা চপলা নৃত্যপরা অথচ পলাতকা। ওই মেয়েটির সঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাছাকাছি আছে অথচ কত দূরে, মনে হয়, নাগালের বাইরে। মনে হয়, বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, ও তা নয়, ও যেন অন্য কিছু। সেই অন্য-কিছুর আভাস ধরা পড়েছে কবির মনে। মনের অবর্ণনীয় অনুভূতিটা ছন্দে গাঁথবার চেষ্টা করতে লাগলেন।—

ও খঞ্জন, ও খঞ্জন
কবির চোখে পড়ল ধরা
মূর্তি তোমার নিরঞ্জন।

অগ্নি-গিরির তপ্ত খবর
মিষ্টি সুরে আঁকছ যে
নীল্‌চে ধূসর ওড়না দিয়ে
হলদে শাড়ি ঢাকছে যে
নৃত্যপরা চলছ ছুটে
চলচ্ছবি উঠছে ফুটে
পুচ্ছ-দোলায় কোন্ সে গানের
তালটিকে ঠিক রাখছ যে,
ও খঞ্জন!

প্রিয়ার চোখে তোমার চলার
দোল দোলানো
হঠাৎ-পাওয়ার পুলক তুমি
মন-ভোলানো
নয়কো খাঁচায় নয়কো নীড়ে
মনের বীণার মধুর মীড়ে
লুকিয়ে বেড়াও দৃষ্টি এড়াও
কিন্তু আবার ডাকছ যে
ও খঞ্জন!

ঝরনাতলায় নদীর ধারে
তীর বনেতে
তোমার নাচের আসর জমে
নির্‌জনেতে
একটু সাড়া পেলেই পালাও

হাওয়ার বুকে ঢেউ তুলে দাও
কবির মনে কিন্তু তুমি
পালিয়ে গিয়েও থাকছ যে
ও খঞ্জন !

নিজের কবিতায় নিজেই তন্ময় হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে কে বলে উঠল, 'ক্যেউ'। চমকে উঠলেন কবি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছু দেখতে পেলেন না। অদ্ভুত মিষ্টি স্বর। মনে হল, মানুষের কণ্ঠে যেন কয়ে উঠল কেউ। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন। সামনের আমগাছে বসে আছে হলদে পাখিটা। মাথাটি কালো, ডানার ধারে ধারে কালো, ঠোঁটটি লাল, বাকি সবটা হলদে। চমৎকার হলদে, স্বর্ণসন্নিভ। মনে পড়ল বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, ইংরেজী নাম Oriole, বাংলা নাম বেনেবউ। আর এক রকম আছে, তার মাথাটাও নাকি হলদে। বেনেবউ? নামটা অবশ্য খুবই লাগসই। ধনী বণিকগৃহিণীর সর্বাঙ্গ সোনায় মোড়া, কালো মুখটি ঢাকতে পারেননি কেবল সোনা দিয়ে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে টকটকে লাল। লাগসই হলেও নামটা বেশি বস্তুতান্ত্রিক। ওর মধ্যে পরশ্রীকাতরতারও ছোঁয়াচ রয়েছে যেন একটু, কবির মনে হল। তার চেয়ে সোজাসুজি 'হলদে পাখি' নামটা মন্দ নয়। কিন্তু অমন চমৎকার স্বর্ণকান্তির, অমন চঞ্চল সজীবতার কোনও মর্যাদাই ফুটছে না ও নামে। 'কনক সখি' নাম দিলে কেমন হয়? বেনেবউ উড়ে এসে বসল কাছের একটা ডালে। কবির মনে গুঞ্জন করে উঠল কবিতা।—

কনক সখি, কনক সখি,
সবাই তোমায় বলছে ও কি!
শালিক চড়াই কাক ছাতারে
সক্কলকে হকচকিয়ে
বণিক বধূ কেবল তুমি
গয়না বেড়াও চকমকিয়ে?

মিথ্যা কথা, তুমি কেবল
ভ্রমরকেশী কাজল-চোখী
সবুজ পাতায় লুকিয়ে বেড়াও
কনক সখি, কনক সখি।

কবি সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, খঞ্জনগুলো উড়ে গেছে। কনক সখিও উড়ে গেল। আর একজন এসে বসলেন সামনের সরু ডালটায়। বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজের কাছটায় পিঠের দিকে যেন আগুনের ঝলক।

একটু উড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা। গলার কাছে মাথার উপর কালো। রেডস্টার্ট একটা। থরথর করে ল্যাজটা কাঁপিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেন অভিবাদন জানাল কবিকে। তারপর পিঠটা ফিরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, আমাকেও ভাল করে দেখ, তোমার কনক সখির চেয়ে দেখতে নেহাৎ খারাপ নই আমিও। বৈজ্ঞানিক সেদিন বলেছিলেন, মনে পড়ল, এরা কাশ্মীর অঞ্চল থেকে শীতকালে এ দেশে আসে। কবির মনে আবার জাগল কবিতা—

যে দেশেই থাক নাকো তুমি মোর মিতা গো
অঙ্গকে ঢেকে রাখ বাদামী বা সবুজে
কাব্যলোকেতে তুমি চির-পরিচিতা গো
কবিকে ঠকাতে সখি পারবে না কভু যে।
কাশ্মীরী রাশিয়ান ইরানী বা তুরানী
পেশোয়াজ ওড়না বা অঞ্চল-ঘুরানী
ওগো মন-চুরানী
ওগো মঞ্জুরাণী,
যে বেশেই আস-নাকো চিনি তোরে তবু যে।

হঠাৎ বন বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় করে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হলেন।

"শকুনির বাসা দেখেছি একটা। শকুনির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের বাচ্চাকে ওরা কেমন করে খাওয়ায় জানেন? ওরা নিজেরা যে মাংস খেয়ে আসে তাই উগরে দেয় বাচ্চার মুখে ছোট ছোট গুলির মতো আকারে। অদ্ভুত নয়?"

কবির কাব্যলোকে বজ্রপাত হল যেন।

"চলুন, ওঠা যাক।"

বিলের উদ্দেশ্যে আবার বেরুলেন দুজনে। দুজনে নীরবেই যাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিক হঠাৎ বললেন, "পাখির বাসা আর তাদের সন্তান-পালন দুটো ব্যাপারই অদ্ভুত। পাখির বাসা অনেকেরই নজরে পড়ে সন্তান-পালনটা লক্ষ্য করে না অনেকে। বাবুই পাখির বাসা দেখেছেন নিশ্চয়, দর্জি পাখিদের বাসাও চমৎকার! সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ধনেশ পাখির বাসা। গাছের গুঁড়ির গর্তে ওরা বাসা করে। সেই গর্তে স্ত্রী-ধনেশ ঢুকে নিজের মল ঠোঁটে করে নিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে ফেলে—"

"মল? তার মানে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

"জিনিসটা ঠিক কি বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, নিজের droppings নিয়েই ওরা গর্তের মুখটা বোজায়, আবার কারও মতে সে সময় ওদের গা থেকে চটচটে একরকম রস বেরোয় আঠার মতো, তাই দিয়ে বন্ধ করে মুখটা। সে যাই হোক, স্ত্রী-ধনেশ গর্তের মুখটা বুঝিয়ে বন্দিনী করে ফেলে নিজেকে। নিজের মুখটা বার করবার মতো ছোট্ট একটু ফাঁক থাকে শুধু। যতদিন সে ডিমে তা দেয়, ততদিন বাসা ছেড়ে বেরোয় না। পুরুষ-ধনেশ তখন সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে যায়। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা হলে স্ত্রী-ধনেশ দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। ভাঙা দেওয়াল আবার জুড়ে দেয়। যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, ততদিন তারা বন্দী অবস্থায় থাকে। স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলে তখন খাওয়ায় তাদের সেই ছোট ফাঁক দিয়ে। অনেকটা আমাদের আঁতুর-ঘরের মতো, নয়? ফটিক জল, বেনেবউ এদের বাসাও চমৎকার—"

কবির কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। অন্যমনস্ক কবি ঘাড় হেঁট করে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক আড়চোখে কবির মুখের দিকে আর একবার চেয়ে চুপ করে গেলেন। কবিকে মনে মনে একটু ভয় করেন তিনি। অদ্ভুত লোক! তুচ্ছ একটা জিনিস নিয়ে বিরাট একটা কিছু গড়ছেন হয়তো। এই ধরনের লোককে বোঝা শক্ত। প্রকৃতির

সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল খুব, কিন্তু যা দেখবেন তা মানবেন না, তাকে ঘিরে কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু করা চাই। না করতে পারলে তৃপ্তি হয় না কিছুতে। পাখিকে পরী করবার জন্যে ব্যস্ত। স্ত্রী-ধনেশকে বন্দিনী রাজকন্য-টন্যা ভাবছেন হয়তো, কে জানে! আড়চোখে আর একবার চাইলেন তিনি কবির দিকে। কবি ঘাড় হেঁট করে চলেছিলেন আপন মনে। আবার একটা রেডস্টার্ট এসে বসল সামনের গাছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "একটা রেডস্টার্ট এসেছে, দেখুন।"

কবি বললেন, "ওর একটা বাংলা নাম দিন।"

"কবিতায় ঢোকাতে পারছেন না বুঝি? কবিতা লিখেছেন ওকে নিয়ে?"

"লিখিনি, তবে—ওই পালাল! কবিতা চাই নাকি?"

মুখে মুখেই একটা ছড়া বানিয়ে ফেললেন তৎক্ষণাৎ—

তড়িৎসম ত্বরিত গতি
নয়কো তবু তুরঙ্গিনী
ভঙ্গীভরে পালায় ছুটে
পক্ষী না এ কুরঙ্গিনী?
ছন্দভরে অঙ্গ দোলায়
এক নিমেষে মনকে ভোলায়
আগুন জ্বলে ডানার তলে
উড়ন্তিকা সুরঙ্গিনী।

বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার! অদ্ভুত শক্তি আপনার!"

কবি বললেন, "আপনার প্রশংসা করবার শক্তিও তো কম নয় দেখছি। পাখিটার নাম ফুলকি রাখলে কেমন হয়?"

"বেশ তো।"

"ছোট পাখি বড় নাম মানাবে না। আগুনের আভাও আছে—গায়ে। ওড়া মাত্রই ল্যাজের কাছটায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। কি চমৎকার!"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ইংরেজীতে ওর আর একটা নাম আছে—ফায়ার টেল। রেডস্টার্ট কথাটার মানেও তাই।"

বৈজ্ঞানিকের কেবলই চেষ্টা কবির মনকে কি করে বিজ্ঞান-মুখী করা যায়। করতে পারলে—তাঁর বিশ্বাস—বিস্ময়কর একটা কিছু করে ফেলতে পারে লোকটা। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বললেন, "এইটুকু ছোট পাখি কতদুর থেকে এসেছে! আশ্চর্য নয়? মাইগ্রেশন ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। ভারি রহস্যময়। যে কাদাখোঁচাদের আমরা দেখতে যাচ্ছি, সেগুলো সবই প্রায় শীতের অতিথি, এ দেশে থাকে না। অথচ কেন আসে বোঝা যায় না ঠিক। অনেকে বলেন, শীতকালে ওদের বাসভূমিতে খাবার পাওয়া যায় না, রোদ থাকে না, তাই ওরা চলে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঠিক একই জাতের পাখি ওদেশে আবার থেকেও যায় কতকগুলো, তাই—"

কবি হেসে বললেন, "বললাম তো সেদিন, ওরা প্রাণের টানে আসে।"

"প্রাণের টানটাই বা কেন হয়?—বিজ্ঞানের তাই প্রশ্ন। বিজ্ঞান মনে করে, নিশ্চয়ই কোনো

অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্যে একদল পাখি তাদের আবাসভূমি থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে যেমন ধরুন না, ওই ভদ্রমহিলা যেমন বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছেন। ওটাকে আপনি যদি টান বলেন, তা হলে কি ঠিক হবে? জাপানী বোমা না পড়লে কি উনি আসতেন? পাখিদের সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই মনে করেন যে, ওদের চলে আসবারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে—কোনও অদৃশ্য বোমা আছে—সেইটে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ।"

বৈজ্ঞানিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে। তাঁর মনে হল, ওই মেয়েটির উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোধ হয় স্পষ্ট করতে পেরেছেন তিনি কবির কাছে। কবির মনে কিন্তু যা ঘটল, তা একটু অন্যরকম। মেয়েটির কথা উত্থাপিত হওয়াতে কবির কল্পনা-কাননে একটা নতুন ফুল ফুটে উঠল যেন।

তিনি বললেন, 'টানটা কি সব সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যায়? মেয়েটি বিশেষ করে এই অঞ্চলেই এল কেন, এর কারণ ও নিজেও হয়তো জানে না ভাল করে। আপনি বলেছেন, জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু অন্য জায়গাতেও যেতে পারত। এখানে আসবার মানে কি?"

বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি যদি বলি অ্যাক্সিডেন্ট?"

কবি ফিরে চাইলেন বৈজ্ঞানিকের দিকে। হাসি উপচে পড়তে লাগল তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে।

"এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট আবির্ভাবটাই তো আপনারা অ্যাক্সিডেন্টের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা এখন বাদ দিন, আপনার মতে তা হলে ও মেয়েটির এখানে আসার কারণ কি?"

"প্রারব্ধ। তার মানেই অদৃশ্য টান।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন এবার।

"ওটা কি একটা যুক্তি হল, আপনিই বলুন।"

যুক্তির তো প্রয়োজন নেই আমার। নিজের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্যেই যুক্তির দরকার। আমি মেনে নিতে চাই, ওতেই আমার তৃপ্তি। একটা অদৃশ্য টানে মেয়েটি এখানে এসেছে—এইটে ভেবেই আমার সুখ। বাজে যুক্তির কচকচিতে দরকার কি আমার?"

বৈজ্ঞানিকের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

"আপনার দরকার না থাকতে পারে, বিজ্ঞানের দরকার আছে।"

"কবি আর একটু হেসে বললেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কে জানেন?"

"আপনিই বলুন কে।"

"কবি। যে কবি বলতে পারে—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
ভবতু ভবতীহময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

অনবদ্য সৌন্দর্যের পায়ে লীলাময়ী প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হয় যে, সে-ই কবি, সে-ই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সৃষ্টিরহস্যের সারমর্ম সে-ই বুঝেছে।"

তর্কটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হত কিন্তু তারা বিলের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আচ্ছা লোক তো তোমরা হে, নৌকো নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে, তোমাদের পাত্তাই নেই! আশ্চর্য কাণ্ড!"

কবি বললেন, "দেরি অমরবাবুর জন্যে। উনি খানিকক্ষণ দোয়েলের পিছু পিছু ঘুরলেন, তারপর শকুনির বাসা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।"

"চি-হুইট্ চি-হুউট্ চিহু চিহু চিহু—"

একটি পাখি ডেকে উঠল।

"কি বলুন তো?"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চাইলেন। মিনিট খানেক আগে তর্ক করে মনে যে তিক্ততা এসেছিল, সেটা মধুর হয়ে উঠল পাখির ডাকে।

কবির উত্তর দেওয়ার আগেই বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন "দুর্গা টুনটুনি। পুরুষটা ডাকছে। ব্রিডিং প্লুমেজ (Breeding Plumage) দেখুন কেমন সুন্দর। ব্রিডিং সিজ্‌নে ওদের এই রকম রঙ হয় গায়ে, অন্য সময়ে থাকে না। দেখুন, ওই যে—"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, কুচকুচে কালো ছোট একটি পাখি আকাশের দিকে মুখ তুলে ডেকে চলেছে চি-হুইট্ চি-হুইট্ চিহু-চিহু। আগাগোড়া সব কালোও নয়। ডানা দুটো কালো, ঘন-নীলও আছে খানিকটা, টকটকে লালও আছে গলার পাশে। মুগ্ধ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "মধু খেয়ে থাকে ওরা। তাই ওদের মৌ-চোষাও বলে কেউ কেউ। এ দেশে তিন রকম দেখা যায়—নর্থওয়েস্টার্ন-ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান-সিলোনিজ আর আসাম-বার্মা রেস। আমার বিশ্বাস, আরও আছে দু-এক রকম। রঙের ঈষৎ তারতম্য শুধু। ওদের ওয়ার্বলার (Warbler) বলে ভুল করবেন না যেন। ঠোঁটটা লক্ষ্য করুন, একটু বাঁকা, মধু খায় কিনা।"

রূপচাঁদ বললেন, "বক্তৃতাটা নৌকোয় যেতে যেতে করলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।"

নৌকায় আরোহণ করলেন তিনজন। নৌকা ছেড়ে দিল। রূপচাঁদ বললেন, "ফ্লাস্কে করে চা এনেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়। ওরে বান্‌ছা ঢাল কাপে কাপে।" বালক-ভৃত্যটি কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল। রূপচাঁদ একটি টিফিন-কেরিয়ার থেকে টোস্ট, ওম্‌লেট আর কেক বার করলেন।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "এত কাণ্ড করেছেন আপনি!"

কবি বললেন, "রূপচাঁদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকম।"

রূপচাঁদ একবার বৈজ্ঞানিকের এবং একবার কবির মুখের দিকে চাইলেন শুধু। চোখের পাতাগুলো মিটমিট করল দু-চার বার। কোনও কথা বললেন না।

টোস্টে কামড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কবি—"বাঃ, চমৎকার রুটি তো! নলিনী এ রকম রুটি করছে নাকি আজকাল? আমাদের যা দিচ্ছে, তা—"

রূপচাঁদ বললেন, "নলিনী নয়, ফিরপো।"

"ফির্‌পো? ফির্‌পোর রুটি পেলে কোথা?"

"পুলিশ সাহেবের জন্য আসে। আমি একখানা করে নিই।"

"আমরা পাই না?"

কবি বললেন বটে, কিন্তু তিনি এ কথা ভাল করেই জানেন যে এই মফস্বলে রোজ ফির্‌পোর রুটি খাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর নয়। রূপচাঁদেরও সে কথা অবিদিত নেই। তবু তিনি বললেন, "বেশ চাও তো পাবে।"

বৈজ্ঞানিক দু-টুকরো টোস্টের মাঝখানে খানিকটা ওম্‌লেট পুরে বাঁ হাতে ধরে সেটা কামড়াচ্ছিলেন আর বিলটার চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর কোটের উপর পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়েছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

রূপচাঁদ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনারও চাই না কি?"

"কি?"

"ফির্‌পোর রুটি!"

"রুটি? ও, আচ্ছা জিজ্ঞেস করব রত্নাকে।"

সমস্ত পাঁউরুটিটা মুখে পুরে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন চারদিকে।

কবি প্রশ্ন করলেন রূপচাঁদকে, "বার্মা-রেফিউজি সেই ভদ্রমহিলাটির খবর কি?"

"কার? ডানার? খবর ভালই। তুমি একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছ শুনলাম।"

"হ্যা। ওর নাম ডানা নাকি?"

"তাই তো শুনেছি। ছেলেবেলায় এক মেম নার্স ওর নাকি নামকরণ করেছিলেন Diana। বাংলায় সেটা ক্রমশ ডানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চমৎকার নাম তো! ডায়না ডানা—দুটোই চমৎকার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গ্রীক দেবী ডায়েনার শবরী-রূপ। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চঞ্চলা ডায়েনা ধনুর্বাণ হস্তে শিকারের পিছু পিছু ছুটে বেড়াত বনে বনে, যার কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়েছিল এন্ডিমিয়নের প্রেমে, কবিকল্পনায় যার রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল নিত্য নবীন বনশ্রীতে, উন্মুখ মাতৃত্বের জগদ্ধাত্রীরূপে, সৃষ্টির আবেগ-মহিমায়, জীবনের দুর্জয় প্রকাশে, চরাচরব্যাপী বিকশিত প্রাণ-সম্পদে...মনে হল, এই ডায়েনাই বোধ হয় আমাদের দেশের অনন্তযৌবনা উর্বশী, মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বারবার প্রাণ-লক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীক রূপে; এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে অনন্ত কাল ধরে মৃত্যু-পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে, সঞ্জীবিত করছে তাকে নবীন প্রাণধারায়, উজ্জীবিত করছে নব নব প্রেরণায়....

"বাঃ, চমৎকার! আশাই করিনি এটা।"

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"অস্‌প্রে (Osprey) একটা। দেখুন, দেখুন কত বড় মাছ ধরেছে দেখুন।"

কবি দেখলেন, চিলের মতো প্রকাণ্ড একটি পাখি আকাশে উড়ছে। দু'পায়ে করে একটা মাছ ধরে আছে। সূর্যের আলো লেগে মাছটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে রৌপ্যদ্যুতি, ফুলঝুড়ি-উৎসব হচ্ছে যেন শূন্যে। পাখির বুকটা সাদা, তার উপর একটা কালো দাগ।

বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, "এর সংস্কৃত নাম উৎক্রোশ। ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কুররীও বলেছেন, কালিদাসে এর উল্লেখ আছে নাকি।"

একটা করুণ আর্তস্বর ফুটে উঠল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে পড়ে গেল, কালিদাসের সেই শ্লোকটা।

তথেতি তস্যা প্রতিগৃহ্যবাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ।

সীতাকে নির্বাসন দিতে যাচ্ছিলেন যখন লক্ষ্মণ, তখন কুররীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করেছিলেন সীতা। কবি সবিস্ময়ে শুনছিলেন। সত্যিই বড় করুণ ডাক। অমন বিশাল বলিষ্ঠ পাখি, আকাশে ডানা মেলে উড়ছে, তার অমন করুণসুরে ডাকবার কারণ কি?। কবির মনে হল, ওই আকাশচারী বিহঙ্গকে নিতান্ত আধিভৌতিক প্রয়োজনে বার বার মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছে বলেই সম্ভবত, ওর কণ্ঠ থেকে বিলাপধ্বনি নির্গত হচ্ছে।

রূপচাঁদও দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "প্রচুর হাঁস এসেছে দেখছি। একদিন ডাক্-রোস্টের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন একটু। বললেন, "আমারও এবার ইচ্ছে আছে কতকগুলো হাঁসকে stuff করানো। ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে পাঠাতে হবে।"

হঠাৎ কয়েকটা কয়েকটা পাখি অপ্রত্যাশিতভাবে উড়ল এক জায়গা থেকে। গতিটা সরল রেখায় নয়, এঁকেবেঁকে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "স্নাইপ। হিন্দিতে চাহা বলে। এরা শীতকালে আসে। এরা থাকে ইউরোপে আফ্রিকায় কাশ্মীরে। সাইবিরিয়াতেও।" তারপর তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন স্নাইপ কত রকমের আছে।

"সত্যিকার স্নাইপ অনেকে চেনে না, বুঝলেন। Sandpiper বা Snippetগুলোকে স্নাইপ বলে মনে করে অনেকে, এরাই প্রচুর ঘুরে বেড়ায় কি না, এ দেশের নদীর ধারে, বিলে, ঝিলে। প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়। আসল স্নাইপের গায়ের রঙ অদ্ভুত সুন্দর। পাণ্ডুর পিঙ্গল মেটে সাদা বাদামীর অদ্ভুত সমন্বয়। মনে হয়, চমৎকার ছিটের পট্টির কোট গায়ে দিয়ে আছে যেন। ল্যাজের দিকে পাণ্ডুরের সঙ্গে কমলা রঙের আভাস বিশেষ লক্ষণীয়। ঠোঁটটা বেশ লম্বা। কাদা খোঁচাতে হয় কিনা। যে সব পাখিদের খুঁচিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, তাদের ঠোঁট লম্বা। হুপো দেখেছেন? হুপোর মুখটা যেন একটা গাঁইতি। Sandpiper-দের পায়ের পাতা ঈষৎ জোড়া, এদের তা নয়, বুঝলেন, শুনছেন?"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "কাদাখোঁচা নামটা শুনে দমে গেলেন বুঝি? কবিতা লেখা যাবে না বোধ হয় এদের নিয়ে।"

"তা যাবে না কেন? রূপচাঁদ, তোমার পকেটে কাগজ পেনসিল আছে কি?"

"পকেট-বুক আছে, তাতে পেনসিলও আছে একটা।"

"দাও তো!"

"ওতে কবিতা লিখবে?"

"ক্ষতি কি।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কবির দিকে। তারপর পকেট-বুকটা বার করে দিলেন। কবি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা শুরু করে দিলেন দেখে বৈজ্ঞানিক রূপচাঁদের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

"বুঝলেন রূপচাঁদবাবু, স্নাইপদের ল্যাজের আকৃতি অনুসারে এদের আবার ফ্যান-টেল, পিন-টেল এই দু-রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—"

রূপচাঁদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "রোস্ট করলে কি স্বাদের কোনও তফাত হয়?"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন, "না, তা হয় না—"

"তবে শ্রেণীবিভাগ জেনে আর লাভ কি বলুন! আচ্ছা, ওই দূরে ওগুলো কি বলুন তো?"

"বক। বকও তিন রকম দেখা যায়, সাধারণত এ অঞ্চলে ইগরেট—"

"ওগুলো চখা বোধ হয়, দেখুন তো।"

রূপচাঁদ বিলের অন্য আর একটা দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখালেন।

"হ্যাঁ, ওগুলো চখা। ব্রাহমিনি ডাক্স্।"

"একদিন আসতে হবে বুঝলেন।"

"বেশ তো, ব্যবস্থা করুন না একদিন।"

রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, নৌকা বাঁধবার মতো সুবিধাজনক কোনও স্থান আছে কি না। বৈজ্ঞানিকও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন যে, জলচর পাখিদের নিজের চোখে যদি পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা হলে এখানে একটা মাচা বাঁধা দরকার হবে জলের উপর, মাছ ধরবার জন্যে অনেকে যেমন করে। ছোট ডিঙ্গিও রাখতে হবে একটা। দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন আবার। মনে হল, টিলও (Teal) আছে—ছোট বড় দু-রকমেই আছে কি? রত্নার সঙ্গে আজ গিয়েই পরামর্শ করতে হবে—এখানে কাছাকাছি একটা ছোট ঘর বেঁধে দুজনেই থাকি যদি—

কবি বলে উঠলেন, "হয়েছে, শুনুন—

কাদাখোঁচা কাদাখোঁচা
কিসে তুমি কম বা
অঙ্গে আছে তো রঙ
পুচ্ছেতে আছে ঢঙ
নও মোটে খাঁদা বোঁচা
ঠোঁটটি তো লম্বা।
বাইরেতে ধোয়া-মোছা
মেনকা ও রম্ভা
কাদা ঘাঁটে চুপি চুপি
বহু সতী বহু-রূপী;
—কুন্তী ও অম্বা
না হয় যদি বা ওঁচা
তবে তোর কাদাখোঁচা
কিসের শরম বা!"

বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "বাঃ! বেশ হয়েছে।"

কবি বললেন, "কবিতা লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল। উইন্টার ভিজিটার যে কটি দেখলাম—ফুলকি, খঞ্জন, কাদাখোঁচা প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়—কেন বলুন তো?

আমাদের ছোকরা বাবুরা যেমন বেড়াতে গিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বা ছড়ি দুলিয়ে বেড়ায়, এরাও তেমনি বিদেশে বেড়াতে এসেছে কিনা, তাই বোধ হয় ল্যাজ দোলাচ্ছে—"

"না, ঠিক তা নয়।"

ঈষৎ হেসে বৈজ্ঞানিক ভাবতে লাগলেন, এর কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদ চুপ করে বসে ছিলেন। কবিও চুপ করে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। শীতের সোনালী রোদ বিলের কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে যেন, আত্মহারা হয়ে উজাড় করে দিচ্ছে যেন নিজের সমস্ত সৌন্দর্য। এক ঝাঁক পাখি—চার পাঁচটা—জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওগুলো Tern' বাংলায় গাংচিল বলে। আর ওই যে ওপরে শূন্যে পাখা দুটো বিস্তার করে জলের দিকে মাথা নিচু করে আছে ওটা হল মাছরাঙা—Pied King Fisher, White-breasted King Fisherও দেখতে পাবেন এখনই, চমৎকার নীল—বুকে চকোলেটের মাঝখানে সাদা—"

কবি কোনও উত্তর দিলেন না দেখে বৈজ্ঞানিকও চুপ করে গেলেন। একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সহসা। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সহসা উৎক্রোশের আক্ষেপধ্বনিটা ভেসে এল আবার। কবি চোখ তুলে দেখলেন, পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে বিরাট পাখিটা। কবির মনে হল, ও যেন বলছে—

শুনেছি তাহার স্বর
চিত্ত মোর হয়েছে উধাও
পাখায় করেছি ভর
ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও—

।। পাঁচ ।।

রূপচাঁদ মৌলিক সেদিন স্ত্রীকে একটি রঙিন শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, আবার এক জোড়া দুল নিয়ে এলেন। আপিস থেকে ফিরে পাকানো চাদরটি গলা থেকে নামিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন একবার। তারপর আপন মনে হাসলেন, আর একবার রহস্যময় দৃষ্টিতে চাইলেন স্ত্রীর দিকে, তারপর বললেন, "ভারি দাঁওয়ে একটা জিনিস পেয়ে গেছি আজ—"

স্ত্রী বকুলবালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, "কি?"

"তোমার পছন্দ হবে কি, দেখ তো।"

দুল জোড়া বার করলেন। পছন্দ যে হবেই, তাতে রূপচাঁদ মৌলিকের সন্দেহ ছিল না। স্ত্রীকে চিনতেন তিনি। বকুলবালার দৃষ্টিতে একটা বিস্মিত আনন্দ ফুটে উঠলেও অনুযোগ-মিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, "আমার দুলের অভাব কি, সেদিনই তো কানপাশা কিনে দিলে এক জোড়া, আবার দুল কিনতে যাওয়া কেন? তোমার যত সব--"

বকুলবালা ঈষৎ নাচের ভঙ্গীতে আয়নার দিকে ফিরে পুনরায় বেণী-রচনায় মন দিলেন। প্রতিবারই এই ধরনের মেকি ভর্ৎসনা করে থাকেন বকুলবালা। রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হাসিটা গোপন করে কণ্ঠস্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বললেন, "ওসব বাজে কথা রাখ দিকি, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না, তাই বল।"

"পছন্দ না হবার কি আছে। কিন্তু কি দরকার ছিল এখন ওসব বাজে খরচ করবার? সেদিন অত দাম দিয়ে শাড়ি কেনারই বা কি দরকার ছিল?"

"আমার খুশি আমি বাজে খরচ করব। আমার বাজে খরচ করতে ভাল লাগে।"

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "তোমাকে কিনে দেব না তো কাকে কিনে দেব বল তো?"

ছোট খুকীর মতো আবদার-তরল কণ্ঠে বকুলবালা বললেন, "আমার চকোলেট এনেছ?"

"নিশ্চয়। মর্টনের লজেন্‌জও এনেছি এক শিশি।"

"কই দাও—"

রূপচাঁদ কোটের পকেট থেকে লজেন্‌জ এবং চকোলেটের শিশি বার করে দিলেন। পঁয়ত্রিশ-বর্ষ বয়স্কা স্থূলাঙ্গিনী বকুলবালা লজেন্‌জ এবং চকোলেট মুখে পুরে ছোট খুকীর মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বেণী দুলিয়ে।

রূপচাঁদ আর একটু হেসে কোটের বোতামগুলি খুলতে লাগলেন নীরবে। এই খুকী-প্রকৃতির স্ত্রীটিকে রূপচাঁদ মৌলিক বুদ্ধিবলে প্রায় খাঁচার মধ্যে বন্দিনী করে রেখেছেন বললেই হয়। খাঁচা অবশ্য দেখতে সাধারণ খাঁচার মতো নয়। কিন্তু শাড়ি, গহনা, লজেন্‌জ, চকোলেট, মিছে কথা, রাগ-অনুরাগের অভিনয় প্রভৃতি দিয়ে যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তিনি, তা বকুলবালার পক্ষে দুরতিক্রম্য। এই পরিবেশের ওপরে কি আছে তা জানবার পর্যন্ত কৌতূহল নেই তাঁর। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার ইচ্ছে হয়, এবং সে ইচ্ছে প্রকাশ করবামাত্র রূপচাঁদ মৌলিক নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশে বসিয়ে তাঁকে সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। শহরের এমন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যেখানে আশেপাশে বাঙালী প্রতিবেশী কেউ নেই। বাঙালী প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে প্রতিবেশিনীদের, বড় ভয় করেন রূপচাঁদ। তাঁর ধারণা, হিতৈষীর ছদ্মবেশে এঁরা বাড়ির ভেতর ঢুকে হাঁড়ির খবর নেন, তারপর কথায়-বার্তায় ঠারে-ঠোরে আচারে-ব্যবহারে এমন একটা জটিল কুৎসিত ব্যাপার করে তোলেন যে, পারিবারিক শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্ত্রীকে তিনি কখনও কারও বাড়ি যেতে দেন না, কারও স্ত্রী তাঁর বাড়িতে আসে এ-ও তিনি পছন্দ করেন না। বকুলবালাও করেন না, স্বামীর মতে সায় দিতেই তিনি ভালবাসেন। এইটে রূপচাঁদ মৌলিকের একটা অসাধারণ কৃতিত্ব। বিবাহিত স্ত্রীকে এমনভাবে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্য কাজ তিনি করতে পেরেছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বকুলবালার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো যোগ নেই, তিন কুলে কেউ নেই তাঁর, ছেলেপিলে হয়নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। বিয়ের বছর তিনেক পরে একবার তিনি সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানটির স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটল। জরায়ুতে না এসে ভ্রূণটি থেকে গেল টিউবে। নিপুণ অস্ত্রোপচারের ফলে প্রাণে বেঁচে গেলেন বকুলবালা কোনোক্রমে। কিন্তু তাঁর জরায়ু এবং টিউব কেটে ফেলতে হল। ভবিষ্যতে সন্তান হবার কোনও সম্ভাবনাও রইল না আর। দ্বিতীয় কারণ, বকুলবালা লেখাপড়া জানেন না। সুতরাং রূপচাঁদকে

সত্যিসত্যিই বকুলবালার জীবন-সর্বস্ব হয়ে পড়তে হল। বকুলবালার জীবনে রূপচাঁদই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পুরুষ। আর একটি পুরুষ এ বাড়িতে আসে অবশ্য মাঝে মাঝে। রূপচাঁদের সহকারী উমেশবাবুর ছেলে চণ্ডি। স্কুলে পড়ে ছেলেটি। বকুলবালার পাখি দেখতে সে আসে। তারও পাখি পোষার খুব শখ। পাখি দেখবার জন্যে স্কুল থেকেও পালিয়ে আসে সে মাঝে মাঝে। রূপচাঁদ যদিও ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না, কিন্তু আপত্তিও করেন না তেমন।

রূপচাঁপ কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবি-রুমাল-সর্বস্ব ভদ্রলোক নন, শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষ তিনি। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পেলে তিনি জীবনে ঠিক কি যে হতেন, তা আন্দাজ করে লাভ নেই। উপস্থিত তিনি হয়েছেন বকুলবালার স্বামী এবং পুলিশ সাহেবের আপিসের বড়বাবু। এবং এই উভয়বিধ প্যাঁচোয়া 'পরিস্থিতি'র মধ্যেও স্বকীয় বুদ্ধিবলে নিজের পৌরুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গৃহে স্ত্রী এবং আপিসে সাহেব দুই-ই তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। জীবনের এই দুটি অনিবার্য বাধাকে নিজের আয়ত্তাধীন করে রূপচাঁদ গোপন পথে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকেন—এইটেই বর্তমানে তার বিশেষত্ব।

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে রূপচাঁদ মৌলিকের ধারণাটা কি ধরনের, তা তিনি একবার বহুদিন আগে তাঁর বন্ধু আনন্দমোহনকে লিখেছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই আনন্দমোহনের সঙ্গে রূপচাঁদের বন্ধুত্ব। মাঝে অনেকদিন দেখাশোনা হয়নি। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার দুজনের দেখা হয়েছে এখানে অনেক দিন পরে। চিঠিপত্র অবশ্য চলত মাঝে মাঝে। একটি চিঠিতে স্ত্রীলোকপ্রসঙ্গে একবার তিনি লিখেছিলেন, দেখ ভাই আনন্দমোহন, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হল। আমার মতবাদ (দর্শনও বলতে পার) ও বিষয়ে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। চুনি, পান্না, হীরা, মুক্তো প্রভৃতি মণিমাণিক্যের সঙ্গে নারীর নামও করা উচিত। রমণী সত্যিই রত্ন-বিশেষ, রত্ন-শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকে নিয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পার, আপত্তি করব না; কিন্তু একটি কথা ভুলো না যে, রত্নের মতোই তাকে আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই আহরণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের নানা পদ্ধতি মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে। কখনও তাকে প্রহার করেছে, কখনও হারামে পুরেছে, কখনও দাসী বানিয়েছে, কখনও দেবী বলেছে, কখনও তার স্বাধীন সত্তার গুণগান করে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে শত সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, কখনও ছিনিয়ে এনেছে, কখনও বিবাহ করেছে, কখনও কবিতা লিখেছে—কত রকম করেছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। প্রেমের কবিতার জন্মও হয়েছিল বোধহয় ওই একই কারণে। ভারি মনোরম ফাঁদ ওটি, সকলে যদিও ফাঁদ পাততে জানে না। তোমার ও কৌশলটা জানা আছে, কিন্তু ওটি ফাঁদ মাত্র—এই কথাটি মনে রেখো। ওটা নিয়েই দিশাহারা হয়ে পড়ো না, কারণ ওটা মীনস্ (means), এন্ড (end) নয়। যখন তখন আত্মহারা হয়ে তুমি বেসামাল হয়ে পড়, তাই তোমার বন্ধুভাবে কথাটা বললাম। যদি অবধান কর, অনেক বাজে বখেড়ার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বলা বাহুল্য, আনন্দমোহন অবধান করেননি, কারণ তিনি ভিন্ন জাতের লোক।

প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে স্ত্রী-রত্নবিষয়ক এবম্বিধ জহুরীর কোষাগারে বকুলবালারূপে অমূল্য রত্ন এসে যখন কায়েমী আসন গেড়েছিল, তখন রূপচাঁদ প্রথমটা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন বটে; কিন্তু একটানা ঘাবড়ে থাকবার লোক তিনি নন। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্যকরূপে খাপ খাইয়ে

নিজের তরী নানা ঘাটে ভিড়িয়ে এসেছেন তিনি এতকাল অসামান্য দক্ষতাসহকারে। বকুলবালা একা যে তাঁর পারুষ্যের ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম, এই সত্যটি বকুলবালার কাছ থেকে গোপন করতে না পারলে তাঁর ক্ষুধা যে অতৃপ্তই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত—এ কথা বিবাহের কিছুদিন পরেই বুঝেছিলেন তিনি । বিবাহিত স্ত্রীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই নিখুঁত ছিল যে, বিদ্রোহ করার কল্পনাও তিনি করেননি। বরং ঠিক উলটো পথ ধরেছিলেন। বকুলবালা এবং নিজের ক্ষুধার মাঝখানে যে গোপনতার জাল তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার প্রায় পনেরো আনাই বকুলবালা-আরতি। বকুলবলার অজস্র প্রশংসা করে, তাঁকে অযাচিত উপহার কিনে দিয়ে রূপচাঁদ তাঁর সচেতন মানসের চতুর্দিকে যে রঙিন কুয়াশা সৃজন করেছিলেন, তা ভেদ করে সত্যের সন্ধান করবার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি বকুলবালার ছিল না। বকুলবালার নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্বামী তাঁর এবং একান্তই তাঁর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও বায়ুবাহিত বীজের মতো দু-একটা উড়ো খবর কুয়াশাজাল ছিন্ন করে মাঝে মাঝে বকুলবালার কর্ণকুহরে যে না ঢুকত তা নয়; কিন্তু রূপচাঁদ এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, সেই উড়ো খবরের বীজ বকুলবালার মনে বিষবৃক্ষে পরিণত না হয়ে অমৃতবৃক্ষেই রূপান্তরিত হত। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে না জানি কি রহস্যময় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে তাঁকে দেখামাত্রই অধিকাংশ স্ত্রীলোক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করে তাঁকেও আকৃষ্ট করতে। কিন্তু বকুলবালার মতো স্ত্রী ঘরে থাকতে—হুঁঃ! বকুলবালা গদ্গদ হয়ে পড়তেন। তিনি কল্পনা করতেন, অদৃশ্য একটা যুদ্ধক্ষেত্রে রূপচাঁদ অহরহ যেন যুদ্ধ করছেন এবং প্রতিবারেই জয়ী হচ্ছেন। সবাই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করছেন না। বকুলবালা-প্রেমবর্মে আচ্ছাদিত থাকতে কেউ কিছু করতে পারছে না তাঁর। নিজের স্বর্গ-সুখেই ছিলেন বকুলবালা।

জলযোগান্তে মৃদু হেসে রূপচাঁদ বললেন, "আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে, বুঝলে?"

"কি ফ্যাসাদ?"

"বার্মা-ফেরৎ একটা মেয়ে এসে জুটেছে। শুধু জোটেনি, ঘাড়ে পড়েছে।"

"বার্মা-ফেরৎ মেয়ে? বার্মা কোথায়, কতদূর এখান থেকে?"

স্মিতমুখে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ। সহধর্মিণীর বিরাট অজ্ঞতায় চমকে গেলেন একটু মনে মনে। খুশিও হলেন পরমুহূর্তে।

"বার্মা অনেক দূর। মগের মুলুক। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে আজকাল। জাপানীরা বোমা ফেলছে।"

"ও!"—চোখ দুটো বড় হয়ে গেল বকুলবালার।

"সেই বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটি। পথে বাপ ভাই মা বোন—সব মরে গেছে। জুটেছে এখানে এসে। অমরেশের বাসায় আছে। অমরেশ কেন যে এসব জোটায়! এখন আমাকে বলছে—তুমি ভাই, সব ঠিক করে দাও ওর।"

"তুমি কি ঠিক করে দেবে?"

"বাসা-টাসা, দাই-চাকর—এই সব আর কি। আমি অমরেশকে বললাম, 'তুমি নিজের বাসায় ঠাঁই দিয়েছ, বাকিটুকু তুমিই কর না। কিন্তু ও তা শুনবে! না-ছোড় লোক। আমাকে বলছে—তুমি পুলিশের লোক, তুমি সহজে ব্যবস্থা করতে পারবে। দেখ দিকি কি আপদ!"

স্বামী-গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বকুলবালার মুখে।

"আহা, করেই দাও না। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে কষ্টে পড়েছে বেচারী। বাপ-মা মরে গেছে?"

"সব।"

"বিয়ে হয়নি?"

"না।"

"আহা! দাও একটা ব্যবস্থা করে।"

"মেয়েমানুষ কিনা! এখনই চট করে কে কি বলে বসবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আনন্দকে দিয়ে তোমার মুনিয়া পাখির বিষয়ে ছোট্ট একটা ছড়া লিখিয়ে এনেছি।"

"সত্যি?"

নতুন খেলনার লোভ দেখালে শিশুর চোখ দুটো যেমন আনন্দে আগ্রহে জ্বলজ্বল করে ওঠে, বকুলবালারও তেমনই উঠল।

"কই, পড় না শুনি।"

বকুলবালার সময় কাটাবার জন্যে নানারকম পাখি কিনে দিয়েছেন তাঁকে রূপচাঁদ। টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না, শ্যামা, মুনিয়া। এই সূত্রেই অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তারপর আলাপ অবশ্য গাঢ়তর হয়েছে। পাখির সম্বন্ধে যতটা না হোক, অমরেশবাবু লোকটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। প্রাক্তন বন্ধু আনন্দও এসে জুটে যাওয়াতে জমে উঠেছে ব্যাপারটা। কবিকে দিয়ে কবিতাটা অনেকদিন আগেই লিখিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এখন তাক মাফিক কাজে লাগালেন।

"কই, পড়—"

"দাঁড়াও সিগারেটটা ধরাই আগে।"

ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা বার করলেন। ধীর-সুস্থে ঠুকলেন সেটাকে টেবিলের উপর, ধীরে-সুস্থে দেশলাই কাঠিটা বার করে ধরাতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বকুলবালার তর সইল না আর। হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা কেড়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বললেন, "না তুমি পড় আগে।"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন রূপচাঁদ। এই-ই তিনি চাইছিলেন। বকুলবালার মনটা যেদিকে যখন ঝোঁকে, সেই দিকেই তখন ছোটে অবিলম্বে। অন্য দিকে তখন ফিরে চায় না, ফেরবার সামর্থ্য থাকে না। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটি ছবি মনে পড়ল রূপচাঁদের। এই ছবিটা প্রায়ই মনে পড়ে তাঁর। বকুলবালা-চরিত্রের একটা ভয়ঙ্কর দিক আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন তিনি। ঈর্ষার প্ররোচনায় বকুলবালা যে খুন পর্যন্ত করতে পারে, এ কথা তার আগে কল্পনাতীত ছিল রূপচাঁদের। বকুলবালা সত্যিই খুন করেছিলেন। অবশ্য মানুষকে নয়, একটা রামছাগলকে। অনেকদিন আগে একটা রামছাগলের ছানা কিনে দিয়েছিলেন তিনি বকুলবালাকে। কিন্তু রামছাগলটা তাঁরই বেশী ন্যাওটা হয়ে পড়ল কোনও অজ্ঞাত কারণে— সম্ভবত, তার পরমায়ু ফুরিয়েছিল বলে। তিনি যখন আপিস থেকে আসতেন, তখন সেটা তাঁরই আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত। বকুলবালা ডাকলেও তাঁর কাছে যেত না। তখন শীতকাল। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি, রামছাগলটা তড়াক করে এসে বিছানায় উঠল এবং যে জায়গাটায় বকুলবালা শোন, সেই জায়গাটায় বসল এসে বাগিয়ে। লম্বা লম্বা কান দুটি নেড়ে

সরল চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাষা ফুটিয়ে তুলল, যার অর্থ—রূপচাঁদের মনে হল—লেপটা জড়িয়ে দাও না আমার গায়ে। রূপচাঁদ লেপটা জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে। সে আরও গুটিসুটি হয়ে ঘেঁষে এসে বসল। কিছুক্ষণ পরেই এলেন বকুলবালা—এবং যেমন তাঁর প্রাত্যহিক রীতি—ছেলেমানুষের মতো হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—

"এ কি, লেপের তলায় এ কে?"

"ছাগলটা এসে ঢুকেছে।"

"বেরো, বেরো, বেরো, পোড়ারমুখো"—হিড়হিড় করে টেনে সেটাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। রূপচাঁদ প্রত্যাশা করছিলেন, ছাগলটাকে বার করে দিয়ে বকুলবালা তখনই আবার ঢুকবেন লেপের তলায় এসে। কিন্তু বকুলবালা ফিরলেন না। কয়েক মিনিট পরে আর্তকণ্ঠের একটা 'ব্যা' শব্দ শুনে উঠতে হল রূপচাঁদকে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন, বকুলবালা মাছ-কাটা বড় বঁটিটা দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে কাটছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন, মাথার কাপড় সরে গেছে, কুন্তল আলুলায়িত। সে ভয়াবহ মূর্তি। ঈর্ষাপীড়িত হলে বকুলবালা যে কতদুর পর্যন্ত যেতে পারেন, সেই দিন চকিতের মধ্যে বুঝেছিলেন তিনি, আর সেই দিন থেকে মনে মনে ভয়ও করেন তিনি তাঁকে।

"পড় না ছড়াটা!"

রূপচাঁদ মানিব্যাগের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটি বার করে পড়ে শোনালেন—

মুনিয়া রে মুনিয়া
কথা যা রে শুনিয়া
গায় কটা ফোঁটা আছে
আয় দেখি গুণিয়া।
পতঙ্গ ধরিয়াছে লক্ষীর বেশ কি
ছটফটানির তোর নেই আর শেষ কি
সারা গায়ে অপরূপ রেশমের গালচে
কখনও সবুজ রঙ কখনও বা লালচে
কখনও পান্না তুই
কখনও বা চুনিয়া
মুনিয়া রে মুনিয়া।

কবিতা শুনে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো! ভাল করে লিখে দাও তুমি একটা কাগজে, খাঁচাটার গায়ে সেঁটে রাখব।"

"আচ্ছা, সিগারেটটা খেয়ে নিই, দাঁড়াও।"

"না, আগে লেখ তুমি।"

রূপচাঁদ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। অবুঝ শিশুর দৃষ্টি চোখের চাহনিতে।

"তুমি আনন্দবাবুকে বলে আমার মদনলাল, যমুনা আর সোহাগীর নামেও ছড়া লিখিয়ে এনো, কেমন? প্রত্যেকের খাঁচার গায়ে সেঁটে দেব, বেশ?"

রূপচাঁদ স্ত্রীকে চিনতেন। বাগ্‌বিতণ্ডায় আর সময় নষ্ট না করে লিখতে শুরু ছড়াটা। বকুলবালা উন্মুখ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

।। ছয় ।।

কবি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন আপন মনে। অমরবাবু রূপচাঁদ কেউ সঙ্গে ছিলেন না। ভোরে উঠেই দুজনে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, তা বলতে পারলে না কেউ। রত্নপ্রভা বললেন, "পাশের গ্রামে কোনও পাখিওলার কাছে গেছেন সম্ভবত—"

কবি একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল, সজনে গাছে ফুল ধরেছে। গোছা গোছা সাদা সাদা ফুল। আর একটু এগিয়ে গেলেন—পাতাগুলোও কি চমৎকার! আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, চাকুন্দা গাছে লম্বা লম্বা শুঁটির মতো ফল ধরেছে। কিছুদিন আগেই হলদে হলদে ফুলের গোছায় ভরতি ছিল সব। এখনও ফুল আছে দু-চারটে, কিন্তু ফলের সংখ্যাই বেশি। শুভ্র সুন্দর ধুতরো ফুলগুলোও আর নেই, কন্টকিত ফল দেখা দিয়েছে। একটা কথা মনে পড়তেই এগিয়ে গেলেন তিনি। একটু দ্রুতপদেই গেলেন। কিছুদিন আগে একটা ঝোপের মধ্যে ঘন বেগুনী রঙের ফুলের ছড়া দেখেছিলেন। বড় বড় দুলের মতো দুলছিল যেন বনলক্ষ্মীর অলকগুচ্ছ। গিয়ে দেখলেন, একটিও নেই, তার জায়গায় সিম ঝুলছে গোছা গোছা। মনে হল, শীতের সময় যে সব ফুলের দল এসেছিল চলে গেছে তারা। মনে পড়ল, বাগানে রঙ্গন কুন্দর গাছে যে মহোৎসব পড়েছিল কিছুদিন আগে, তাও আর নেই। ফুটছে বটে দু-চারটে ফুল, কিন্তু জোয়ার নেবে গেছে। স্থলপদ্মও ফুটছে না আর। জবাও খুব কম। গাঁদা আর বিদেশী মরশুমী ফুলেদেরই ভিড় এখন। শীতকালে যেমন এক দল বিদেশী পাখি আসে আবার চলে যায়, তেমনিই এক দল ফুলও আসে আবার চলে যায়। বিদেশী পাখিরা চলে যায়। কিন্তু রেখে যায় কি কিছু? যায় কি না জানা নেই। শীতের ফুলেরা ফল রেখে যায়, কিন্তু কোথায় যায় ওরা? তাও জানা নেই। ফুলই ফলে পরিণত হয়—এ বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে মন যেন মানতে চায় না। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে, দু জাতের জিনিস ওরা। এক দল আসে আর এক দল চলে যায়। এক দলের কর্তব্য শেষ হয়, শুরু হয় আর এক দলের। প্রথম দলই দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়—চুল-চেরা হিসেব করে ঠিক করেছে যারা, তারা বেনে। হিসেবটাও নিখুঁত নয় সব সময়ে। তবু ছাড়বে না, তর্ক করবে। হিসাবের খুঁটিনাটিতে মত্ত হয়ে কি করে যে দিন কাটায় ওরা! না, হিসাব নিয়ে মাথা-ঘামানো কবির কাজ নয়। প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না। যে আবির্ভাব সমস্ত সত্তাকে উতলা করে তোলে, তার সত্য রূপ হিসাব করে দেখা যায় না, দেখা যায় কবির দৃষ্টি দিয়ে....এই ধরনের খাপছাড়া ভাবনা ভাবতে ভাবতে আপন মনে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

....হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, শহরের বাইরে অনেক দূর এসে পড়েছেন। খাতা পেন্সিল সঙ্গে এনেছিলেন। অনেক কবিতার লাইন মনে আসে, কিন্তু হারিয়ে যায়। এবার থেকে টুকে রাখবেন ঠিক করেছেন। ওরা যখন কেউ সঙ্গে নেই আজ, আপন মনে কবিতাই লেখা যাবে কোথাও বসে। একটা আমবাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেখলেন, একটা গাছের তলায় রোদ

এসে পড়েছে বেশ। নিজের র‍্যাপারটা বিছিয়ে তার উপর বসলেন। মনে হল, মন্দাকিনী দেখলে কুরুক্ষেত্র করতেন। মুচকি হাসলেন একটু।

....দূরে নদীর চর দেখা যাচ্ছে। সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন। মাঝে মাঝে সরষে ফুল। বিরাট একটা সবুজ মখমলের গালিচায় সোনার চুমকি জ্বলছে অজস্র। এক ঝাঁক পাখি এসে বসল সামনের গাছটায়। বসেই আবার উড়ল। আবার বসল আর একটা গাছে। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। দেখে চিনতে পারলেন। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছেন সেদিন। এই দেশে 'পাওয়াই' বলে। ময়না এক জাতের। ইংরেজী নাম Grey headed Myna। মাথা পিঠ ধূসর রঙের, পেটের তলা বাদামী, ঠোঁটটি কালচে গোছের। শীতকালে আসে। কবির মনে হল, মানুষদের মধ্যেও এক জাত আছে, যারা ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে—সন্ন্যাসীর দল, বেদুইনের দল। তারা মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দেয়, হয় ভিক্ষা করতে, না হয় রাহাজানি করতে। এ পাখিগুলোও তেমনই বোধ হয়। পাওয়াই নাম না দিয়ে বেদুইন নাম দিলে বোধ হয় বেশি মানায়। আর একবার তাঁর মনে হল, আমাদের ভাষায় সব পাখির নাম সুন্দর নয়। নতুন নামকরণ করা উচিত। আবার উড়ল ময়নার দল। উড়ে চলে গেল দৃষ্টির ওপারে। কোনও চিহ্ন আর রইল না তাদের। কবির মনে জাগল কবিতা—

আকাশেতে ওড়ে নিশি
ওড়ে কত দিন
ওড়ে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
শকুনি সারস কাক,
অদৃশ্য ঘোড়া চড়ে
ওড়ে বেদুইন
কিন্তু আকাশে কোনও
থাকে না তো চিন্।
উড়ে সব চলে যায়
চিহ্ন থাকে না হায়
চেয়ে থাকে মহাকাল
শান্ত প্রবীণ
নির্মল মহাকাশ
নাই কোন চিন্।

চুপ করে বসে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। স্বপ্নালোক মূর্ত হয়ে উঠল যেন চারিদিকে। অনামা শব্দ, অজানা-গন্ধ, চকিত স্পর্শ...তার ওপার থেকে পরিচিত জগতের টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসছে। দূরে ঘুঘু ডাকছে করুণ সুরে। কুটুর কুটুর করে বুলবুলিরা ডাকছে মাঝে মাঝে পাশের ঝোপটায়। আবার নীরব হয়ে গেল সব। আবার চোখে ভেসে উঠল দূর দিগন্তের মায়া-মরীচিকা—হ্যাঁ, যদিও সবুজ, তবু মরীচিকাই—কাছে গেলে থাকে না। দূর থেকে প্রলুব্ধ করে শুধু...হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনের কলকে ফুলের গাছে কোকিল বসে আছে একটা। এতক্ষণ দেখতে পাননি। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। কুচকুচে কালো পালক। কালো গরদ যেন। সবুজ ঠোঁট। লাল চোখ। চুপ করে বসে আছে গুটিসুটি হয়ে। কবির মনে হল, ধ্যান-মগ্ন। মনে

হল, ও কোকিল নয়—আলোক-পিপাসী অন্ধকার। অমানিশার টুকরো একটা। পালিয়ে এসেছে আলোর দেশে।

পিক-রূপে অন্ধকার আলোর তপস্যা করে
আলো চায় কালো,
চঞ্চুতে সবুজ-স্বপ্ন, নয়নে অনল-ভাতি
বলে—আলো জ্বালো,
হে দেবতা, জ্বালো আলো—সপ্তবর্ণ-সম্মিলন-ভাতি—
দূর হোক অন্ধকার দুর্বিষহ ভয়ঙ্করী রাতি
অবারিত হোক দৃষ্টি জীবনেতে জাগুক প্রভাতী
আলো দাও আলো—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ সুরে ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক করে উঠল কে যেন। কবি চেয়ে দেখলেন, পাশের গাছটা থেকে উড়ে গেল জংলা-শাড়ি পরা কোকিলা। ওর সঙ্গিনী বোধ হয়। পরমুহূর্তেই কোকিলও উড়ে গেল। তপোভঙ্গ হল তার। দূরে কোমল মধুর কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল তার মিনতি—কুক্, কুক্, কুক্, কু—

খাতা পেন্সিল পড়ে রইল ঘাসের উপর। সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন কবি। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া বসল সামনের বকুল গাছটায়। দূরদিগন্তের সবুজ মরীচিকাই নবরূপে ভোলাতে এল নাকি তাঁকে? নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। হ্যাঁ, সমস্ত মরীচিকাই! ডানার কথা মনে পড়ল সহসা। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণ। কল্পনালোকে ঘন অরণ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন যেন। সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই বাজতে লাগল কেবল—হোক মায়া, হোক মরীচিকা, তবু সুন্দর। কালই যে কবিতার দুটো লাইন এসেছিল তাঁর মনে কিন্তু যা তিনি শেষ করেননি, সেই দুটো লাইনই গুনগুন করে এল আবার—

ভ্রমর আসিয়া কানে কানে কহে কুন্দর
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর

এল, আবার চলে গেল। শেষ করতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, অসমাপ্ত জিনিসেরও না-বলা বাণী আছে একটা। তা অব্যক্তরূপেই বিকশিত। চুপ করে বসে রইলেন। যে রোদের ফালিটা পিঠের উপর ছিল এতক্ষণ কোলের উপর পড়ল সেটা এসে। দুষ্টু ছেলে যেন একটা। এতক্ষণ, পিঠের উপর ঝুলছিল, কোলে এসে বসল এবার। আলোক-শিশু। কোথা থেকে এল এ? গাছের কোন ফাঁকটা দিয়ে এল দেখতে গিয়ে আর একটা জিনিস চোখে পড়ে গেল। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। চোর-পাখি। দূরবীন তুলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। পেটের তলাটা বাদামী, অনেকটা আরশোলার মতো রঙ। পিঠের রঙটা ইঁদুরের মতো। ছোট্ট চৌকোণা ল্যাজটি। ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ডালটা ঠোকরাচ্ছেও কাঠঠোকরার মতো। বাঃ হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল ডালের নীচের দিকে! খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি খাতা পেন্সিল তুলে নিলেন।

আরশোলা-রঙ পেটের তলায়
ইঁদুরের রঙ পিঠে
তবু গাই তার জয়

নামটা তাহারে বঙ্গবাসীরা
দেয়নি যদিও মিঠে
তবু সে তুচ্ছ নয়।

আকাশের সাথে মিতালি যে তার
মেলতে জানে সে ডানা
করে না সে চাক্‌রি তো
পাশাপাশি বসে কাঠঠোক্‌রার
খায় সে পোকার খানা
সরল স্বোপার্জিত।

চোরা-বাজারের সঙ্গেতে তার
নেই কোনও পরিচয়
চেনে না কালো-বাজার
ডালে ডালে শুধু হামাগুড়ি দেয়
পাতায় পাতায় নয়
আমি জয় গাই তার।

আমার কাব্যে চোরা-পাখি তুমি
চতুরিকা চঞ্চরী
গোপন-সঞ্চারিণী
অদৃশ্য পথে আনাগোনা কর
অন্তর মন ভরি'
আমি যে তোমারে চিনি।

কবিতাটা শেষ করে কবি আবার চেয়ে দেখলেন উপরের দিকে। চলে গেছে চতুরিকা পাখি। ওরা থাকে না, চলে যায়। আসা আর যাওয়া দুটোই সত্য। পাওয়া আর হারানো, মিলন আর বিরহ, অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে বিশ্বকবির ছন্দে! আমরা একটাকে আঁকড়ে ধরি, অন্যটাকে মানতে চাই না। তাই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাই বার বার। হাহাকার ওঠে জগৎ জুড়ে।

'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক' আর্তস্বরে হাহাকার করে উঠল কে যেন। কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, আর একটা পাখি। অচেনা পাখি। উঠে পড়লেন। দূরের উঁচু ডালটায় বসল। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, ভাল বোঝা গেল না। এগিয়ে গেলেন একটু। এবার দেখা গেল। নতুন ধরনের শ্রইক (Shrike) নিশ্চয়, কারণ চোখের উপর কালো টানা রয়েছে। 'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক'— চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল আবার পাখিটা। দূরের একটা গাছে গিয়ে বসল। সেখান থেকে উড়ল দুটো পাখি। সঙ্গী পেয়ে গেল বোধ হয় প্রথমটা।

কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক—বসন্ত-বউরি ডাকছে। টংক টংক টংক—ডেকে চলেছে ভগীরথ। তার সঙ্গে জাল বুনে চলেছে ঘুঘুর করুণ সুর। কয়েকটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার

উপর মন্থরগতিতে। অদ্ভুত পরিবেশ! বিহ্বল কবি বসে পড়লেন একটা ঝোপের ধারে। বাঁশপাতি পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশের পাতা। ছিপছিপে দেহ, আর পাতলা সবুজ রং। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, শুধু সবুজ নয়, ঈষৎ হলুদেরও আমেজ আছে। নীলেরও আভাস আছে মুখের কাছটায়, বিশেষত গলায়। ঘাড়ের কাছে সোনালি। চোখের কাছে কালো, গলায় কালো কণ্ঠি, চোখ লাল, ঠোঁট কালো। ল্যাজের থেকে লম্বা সরু পালক বেরিয়ে এসেছে একটি। রূপসী। হঠাৎ মনে হল দুটো লাইন—

ফলের মধ্যে নাসপাতি
পাখির মধ্যে বাঁশ-পাতি।

তখনই মনে হল, মিলের জন্যেই লাইন দুটো মনে এল নাকি? নাসপাতির সঙ্গে সত্যি সত্যি কিছু কি মিল নেই ওর কোনখানে? আছে বইকি। রঙের মিল তো অনেক আছে। স্বভাবেরও মিল আছে হয়তো। ছিপছিপে চটুলা কিশোরীর মতো দেখতে, স্বভাবও হয়তো অম্লমধুর। কবিতাটা আর একটু বাড়াবেন কি না ভাবছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আর একজন। সামনে ছোট্ট একটা ডাল হাওয়ায় দুলছে। ডালের উপর ওটা কি? নাচছে নাকি? বাঃ, চমৎকার তো! মনে পড়ল বইয়ে ছবি দেখেছিলেন। অমরবাবু বলেওছিলেন এর কথা। কুলো পাখি নিশ্চয়। না হয়ে যায় না। ছোট্ট পাখিটি, চড়ুই পাখির মতন। দূরবীনে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে বসে রইলেন মুগ্ধ হয়ে। বাঃ, নাচের কি বাহার! উড়ে গেল। খাতা খুলে বসে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

হাওয়ার দোলে বাহা বাহা
ছোট্ট শাখী
ফুরফুরিয়ে
উঠছে দুলে,
তার উপরে নাচছে আহা
ছোট্ট পাখি
ল্যাজ ঘুরিয়ে
প্যাখম তুলে।
আলোয় মাখা সবুজ ডালে
আপন মনে নাচছে তালে
পালকগুলি যাচ্ছে ঘুরে
প্রাণের সুরে গানের সুরে
সকল ভুলে।
চোখের উপর কি সুন্দরই
মরি মরি
চন্দনেরি
তিলক শোভে,
ওড়নাখানা তার পোশাকী
পরল নাকি
চড়াই পাখি
নাচের লোভে!

কালচে রঙে সাদার ছিটে
মানিয়েছে বেশ লাগছে মিঠে
পুচ্ছ-পাখার বাহার দিয়ে
হচ্ছে মনে লাফিয়ে গিয়ে
আকাশ ছোঁবে।
বুঝবে না তো আকাশ-ছোঁবার অর্থ কি, ও
কুলো পাখি? মিথ্যা কথা, নর্তকী ও।

কবিতা শেষ হতে না হতেই আর একটা তীক্ষ্ণ-মধুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। ঢেউ-খেলানো তীক্ষ্ণ মধুর একটানা ডাক একটা। সুরের 'গ্রাফ' (graph) যেন এঁকে-বেঁকে মূর্ত হচ্ছে শ্রুতিলোকে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ঘাড় তুলে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন নীল রঙের পাখিটাকে। চিনতে পারলেন। মাছরাঙা। White-breasted King Fisher। তখনই মনে হল—পক্ষীবিদ্‌রা এর সাদা বুকটাকেই এত প্রাধান্য দিয়েছেন কেন? গায়ে তো ওর রঙের অভাব নেই? খাতা খুলে আবার শুরু করলেন কবিতা।

বাজাই তোমার রূপের ডঙ্ক
হে বর্ণাঢ্য মৎস্য-রঙ্ক
ধন্য হয়েছে তোমারে পাইয়া
খাল বিল নদ নদীরা,
পক্ষীবিদেরা করেছে লক্ষ্য
কেবল তোমার শুভ্র বক্ষ
জানি না কেন যে দেখে নি চাহিয়া
তব লাল-নদী খদিরা।
কবির চক্ষু বর্ণ মগ্ন
স্বপ্ন, স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন—
মাতায়ে তুলেছে উন্মুখ হিয়া
বর্ণ-বহুল মদিরা,
ভেসেছে মনের ময়ূরপঙ্খী
কার সন্ধানে সে নিঃশঙ্কী
অজানা নদীতে উজান বাহিয়া
চলেছে উতলা অধীরা।

পাখিটা উড়ে চলে গেল। কবি ভাবতে লাগলেন ওর 'হোয়াইট-ব্রেস্টেড্' নাম হল কেন? অমরবাবু কাছে থাকলে হয়তো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কবির মনে হল, সেকালে পক্ষীবিদেরা পাখি মেরে মেরে পক্ষী-বিজ্ঞান চর্চা করতেন। ওর ধপধপে সাদা বুকটায় বন্দুকের তাক করবার সুবিধে হত বলেই বোধ হয় ওই নাম দিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। শিস দিলে কে? পাখি? একটা পাখি নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে চলতে লাগলেন নদীর দিকে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, কি একটা হাতছাড়া হয়ে গেল যেন। নাগালের বাইরে চলে গেল চিরদিনের মতো। কিছুদূর গিয়ে

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিন্তু। মাঠে ছোট ছোট মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু পড়ে ছোট ছোট মুক্তোর জালের মতো হয়েছে, চারিদিকে ছড়ান রয়েছে অজস্র। প্রখর দিবালোকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত একটা কথা মনে হল তাঁর। এই নির্জন প্রান্তরে কাল রাত্রে দেবকন্যারা আসেনি তো? লাস্যলীলা-অবসানে চলে গেছে হয়তো ভোরবেলা। ফেলে গেছে তাদের কবরীর জালাবরণ! যে পাখিটার অনুসরণ করে একটু আগে চলছিলেন, তার কথা ভুলেই গেলেন। সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট করে চললেন নদীর দিকে। মিষ্টি মিহি আর একটা সুর শুনে একটু পরেই কিন্তু উপরের দিকে চাইতে হল আবার। একদল কালো কালো ছোট ছোট পাখি উড়ছে। দূরবীন দিয়ে দেখেই চিনলেন। কমন সোয়ালো (Common Swallow)। এর সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন অমরবাবু। এদেরই সম্বন্ধে বোধ হয় সেই পাদরি বৈজ্ঞানিক গিল্‌বার্ট হোয়াইট বলেছিলেন যে, এরা শীতকালে কাদার নীচে চলে যায়। আসলে কিন্তু শীতকালে এরা এ দেশে আসে। ও দেশে থেকে গ্রীষ্মকালে। ইংরেজী প্রবাদটাও মনে পড়ল—One swallow does not make a summer। দূরবীন দিয়ে দেখলেন আবার। ল্যাজটা অনেকটা ফিঙের মতো, পেটের কাছে সাদাটে, গলার নীচেটা বাদামী, পিঠটা কুচকুচে কালো, ছোট্ট ঠোঁট, মুখটি সুন্দর। দেশী নাম আবাবিল। কি চঞ্চল! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আবার একটা কবিতা জাগল মনে। অন্তরলোকে কবিতার প্রস্রবণ বইছে আজ। খাতা আর বার করলেন না। মনে মনেই চলল রচনা।

শীতের অতিথি আবাবিল,
নূতন আকাশে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুরে ঘুরে দেখে খাল বিল,
গ্রাহ্য করে না আশে পাশে ওড়ে
শকুনি গৃধিনী কাক চিল,
কি চায় কি চায় ঠিকানা না পায়
বিশ্রাম নেই এক তিল,
শীতের অতিথি আবাবিল।

ডানার কথা মনে পড়ল। ও মেয়েটিও তো অতিথি এ দেশে। ওর মনও কি চঞ্চল হয়ে উঠেনি এই আবাবিলদের মতো? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। খঞ্জন, ফুলকি, কাদাখোঁচা, আবাবিল, উৎক্রোশ সকলেই কেমন যেন উন্মনা অস্থির, কি যেন খুঁজছে সবাই। ডানা কি চুপ করে আছে? কি খুঁজছে ও? কাকে খুঁজছে? কি ভাবে খুঁজছে? ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে আলোর ঝলক দেখেছিলেন সেদিন, তা ভাষা-ভরা কিন্তু তার অর্থ কি? কবির সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল ছন্দভরে। পরমুহূর্তেই নতুন একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল কিন্তু। সামনে সাঁকো একটা। অত্যন্ত পল্‌কা বলে মনে হল। কয়েকটা বাঁশ আর তক্তা দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে পার হলেন। পার হয়েই সবুজের রাজ্য। গম যব ছোলার ক্ষেত। ও কিসের শব্দ? ভারি মিষ্টি তো! উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার শব্দ হল। কোন্ পাখি এ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। একজন চাষাকে দেখা গেল দূরে। কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি ডাকছে বলতে পার?"

"ভরত।"

ভরত! ভরদ্বাজ! সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছোট্ট একটি পাখি উড়ল গমের ক্ষেত থেকে। সোজা উঠল খানিক দূর আকাশে, তারপর থেমে গেল শূন্যে, ডানা দুটো কাঁপতে লাগল, দেখা যেতে লাগল দোদুল্যমান পা দুটো, গানের ঝরনা ঝরতে লাগল চতুর্দিকে।

ভরত—স্কাইলার্ক—শেলী-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক!

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। সোঁ করে পাখিটা নেবে এল আবার। অদৃশ্য হয়ে গেল গমের ক্ষেতে। সুর শোনা যেতে লাগল সবুজের আড়াল থেকে, মনে হল, গম ক্ষেতই গান গাইছে বুঝি। ভরত! ভারতবর্ষের সঙ্গে যার নাম গাঁথা? ভারতের কাব্যে পুরাণে ধর্মে রূপকথায় অমর হয়ে আছে যে নাম! সুরের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

চাষাটি ঘাস কাটতে আরম্ভ করেছিল। কবি তার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে বসবার মতো জায়গা হবে একটু কোথাও?"

"আমার ওই মাচায় গিয়ে বসতে চান তো বসতে পারেন।"

কাছেই ছোট মাচাটি। কবি তার উপর উঠে বসলেন। আবার উড়ল একটা ভরত পাখি। বাদামী রঙের ছোট্ট পাখিটি। দূরবীন দিয়ে দেখলেন কবি। বাদামী রঙ, তার উপরে ঘন-বাদামীর পোঁচ চারিদিকে, অনেকটা বাঘের গায়ের মতো। তাই বোধ হয় সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট। অপরূপ গানে আবার পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কবির মন। মূর্ত হয়ে উঠল যেন অতীতের মাধুরী সুরের অপ্সরা-রূপে। ইতিহাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশতে লাগল ছন্দের চটুল গিটকিরি। কবি দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন এই অদ্ভুত সুরস্রষ্টাকে। তারপর খাতা বার করে লিখতে লাগলেন—

প্রণাম জানা প্রণাম জানা মহৎ-ও ক্ষুদ্রে
জলতরঙ্গ বাজায় ও যে সবুজ সমুদ্রে,
বিষ্ণুশর্মা চিনত ওকে, চিনত বাল্মীকি
রাম-সীতা ওর আত্মীয় যে—তোরাই ভুলবি কি?
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

শকুন্তলার পুত্র ভরত—ভারতবর্ষ যার,
হরিণ-পাগল ভরত ঋষির গল্প চমৎকার,
নাট্য শাস্ত্র লিখল ভরত,—ভরত বিহঙ্গ
সবুজ ক্ষেতে ছন্দে মেতে করছে কি রঙ্গ
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

সবুজ করে সবুজতর গিটকিরি ছন্দে
উড়ছে সোজা আকাশপানে মনের আনন্দে
থামিয়ে ডানা মাতিয়ে দিয়ে শূন্য-উষরকে
তখ্‌খুনি ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ ভূস্বর্গে
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

বৃহস্পতির পুত্র যিনি মুনি ভরদ্বাজ
অঙ্গিরা যাঁর ঠাকুরদাদা—তিনিই বুঝি আজ
সুরের ধারায় শুষ্ক ধরায় করেন নিষিক্ত
নতুন করে করেন প্রমাণ আপন ঋষিত্ব
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

অরূপ দোলা দুলছে এ কি মর্ত্যে নন্দনে
আকাশ মাটি পড়ল বাঁধা সুরের বন্ধনে
স্বপ্ন এবং বাস্তবেতে প্রভেদ ঘুচে যায়
রোদের সোনায় সবুজ দোলে সুরের ব্যঞ্জনায়
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন কবি। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চলে গেছে। ভারি দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। চোখ বুজে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মুদিত চোখের সামনেও মূর্ত হতে লাগল অপরূপ কি যেন একটা, যা অবর্ণনীয় কিন্তু অনুভূতি-গোচর। যখন চোখ চাইলেন, তখন সেই চাষা চলে গেছে। কত বেলা হয়েছে, কে জানে! চারিদিকে চেয়ে দেখলেন আবার। সবুজ, সবুজ কেবল সবুজ। সরষে ফুলে স্বর্ণকান্তি ঠিকরে পড়ছে দূরে। আরও দূরে নির্মল নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে। দিগন্তরেখায়—সবুজ আর নীল মিশেছে যেখানে—সেখানে শিখিকণ্ঠকান্তি কোন্ ময়ূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ওখানে! ভরদ্বাজ ডাকছে। মনে হচ্ছে, মিষ্টি-কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক পড়ছে যেন কে। সহসা তাঁর মনে হল একটা বিরাট কিছুর সামনে বসে আছেন তিনি। যা ঐশ্বর্যময় কিন্তু অনাড়ম্বর, দিগন্তপ্রসারী কিন্তু নিকটতম, যা সমৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। আবার কবিতা জাগল মনে—

বহমান নদীতীরে উন্মুক্ত আকাশতলে
বসে আছ কোন্ মহারাজ,
নাহি কোনও তূর্যনাদ উচ্চ বাদ-প্রতিবাদ
তুচ্ছ 'সাজ্ সাজ্'।
ঘনশ্যাম সিংহাসনে বসে আছ আপনা পাশরি
রূপে রসে পরিপূর্ণ নানা ছন্দে বাজিয়ে বাঁশরী
শুভ মাঙ্গলিক-মন্ত্র উচ্চারিছে শতকণ্ঠ ভরি'
শত ভরদ্বজ
হে জনক নির্বিকার, হে রাজর্ষি আসক্তি-বিহীন,
তোমারে প্রণাম করি আজ।

কবিতাটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হত, কিন্তু বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

"আরে, আপনিও এখানে?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন কবি। মাঠের সরু পথ বেয়ে গমক্ষেতের ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক আসছেন। তাঁর পিছনে রূপচাঁদ আর একজন লোক। কাছে আসতে

দেখা গেল, রূপচাঁদের এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে থলি। অচেনা লোকটির হাতে ঢাকা-দেওয়া খাঁচা একটি। কবি খাতাটি পকেটে পুরে মাচা থেকে নেমে পড়লেন।

"আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি একা একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ। রূপচাঁদ, তুমি আপিস যাওনি? কটা বেজেছে?"

রূপচাঁদ নিজের হাত-ঘড়িটি দেখে বললেন, "বারোটা। আজ রবিবার।"

"ও। কোথা গিয়েছিলে তোমরা?"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন।

"আমি বেরিয়েছিলাম লিয়াকতের উদ্দেশে। কোয়েলের সন্ধানে।"

"কোয়েল? কোকিল?"

"না, সে কোয়েল নয়। এ হচ্ছে কিউ ইউ এ আই এল—Quail! বটের। ওরাও উইন্‌টার ভিজিটার কিনা। আপনাকে দেখাবার জন্যেই বিশেষ করে বেরিয়েছিলাম। লিয়াকৎ বটের পোষে আমি জানতাম, তার কাছ থেকেই আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদিকের ধান-ক্ষেতেও কিছু পেয়ে গেলাম আসবার সময়। রূপচাঁদবাবুর বন্দুকও ছিল। দেখবেন? দেখাও তো লিয়াকৎ।"

লিয়াকৎ সাবধানে বটের পাখিটিকে বার করলে খাঁচা থেকে। এত সাবধানে, এত সন্তর্পণে, যেন পাখি নয়, অপরূপ নিধি।

"এটা পুরুষ। তার চিহ্ন হচ্ছে গলায় এই কালো দাগ। অনেকটা নোঙরের মতো, নয়? মেয়েদের গলা সাদা। মেয়েগুলো আকারেও একটু বড়। মেয়েদের গলার সাদাটা বুশ কোয়েল (Bush Quail), রেন কোয়েল (Rain Quail), পেন্টেড বুশ কোয়েল (Painted Bush Quail), এগুলোতে আরও স্পষ্ট। বাটন কোয়েল (Button Quail) বলে আর এক রকম পাখি আছে, তারা আসলে অবশ্য কোয়েল নয় মোটেই, তাদের ল্যাজ নেই। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, গোড়াতেই সেটা বলা উচিত ছিল, কোয়েলদের বিশেষত্ব হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন, ল্যাজ নেই, তা ছাড়া এই দেখুন চারটে করে আঙুল। বাটন কোয়েলদের ল্যাজ নেই কিন্তু আঙুল তিনটে, তাই তারা আসল কোয়েল নয়। এটার নাম হচ্ছে কমন গ্রে কোয়েল (Common Grey Quail),এরাই শীতকালে এ দেশে বেশি আসে। এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ডানায়। এই দেখুন এগুলোকে পিনিয়ন কুইল (Pinnion Quill) বলে, এর রঙটা লক্ষ্য করুন, ড্র্যাবের (Drab) ওপর বাফের (Buff) দাঁড়ি দাঁড়ি। ড্র্যাবকে কি বলবেন বাংলায়? কটা? বাফ বোধ হয় মানুষের চামড়ার রং, না? এই বিশেষত্বটা অন্য কোয়েলদের তেমন নেই। কোয়েল আছে অনেক রকমের। বুশ কোয়েলই কয়েক রকমের আছে। বাস্টার্ড কোয়েল (Bustard Quail), রেন কোয়েল, জাপানীজ কোয়েল (Japanese Quail) আছে অনেক রকম।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। ছোট্ট জীবন্ত ফানুস যেন একটা।

"বিদেশ থেকে আসে এরা? কতদূর থেকে?"

"বহুদূর। আফ্রিকা, সেন্ট্রাল এশিয়া, ওয়েস্ট এশিয়াও। এদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে গুড ফ্লায়ার্স (Good-fliers)—ওড়ন্দাজ বললে বাংলাটা ভুল হবে কি?"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হেসে চাইলেন কবির দিকে।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "এইটুকু পাখি অত উড়তে পারে?"

"নিশ্চয়। লোহিত সাগর, ভূমধ্য-মহাসাগর পার হয়ে চলে আসছে। ভেবেই দেখুন না। সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যেগুলো আসে, আর বেশির ভাগ সেখান থেকেই আসছে। তাদের আবার হিমালয় পার হতে হয়। পথে অবশ্য মারা পড়ে অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত, নয়?"

বৈজ্ঞানিক চাইলেন রূপচাঁদের দিকে।

রূপচাঁদ বললেন, "খেতেও অদ্ভুত?"

"তা ঠিক মানুষের কবলে এরাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পড়ে পাখিদের মধ্যে। আপনি কটা পেয়েছেন ?"

"বেশি নয়, গোটা-বিশেক হবে। চাখা চলবে। আপনার বাড়িতেই সন্ধেবেলা জমা যাবে সকলে, কি বলেন, আপনার বাইরের দিকের ওই বাবুর্চিখানাটায় সব ব্যবস্থা করবেন। আমিই রাঁধব। আনন্দ, তুমি আসছ তো?"

"আসব। কিন্তু বেশি ঝাল দিও না।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে একবার, কোনো জবাব দিলেন না।

বৈজ্ঞানিক মনে মনে বিব্রত হলেন একটু। সন্ধ্যার সময় একটা প্রবন্ধ ফাঁদবেন ভেবেছিলেন ডিম সম্বন্ধে। মুখে তবু বললেন, "বেশ তো, আসবেন। রত্না সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

চলতে শুরু করলেন আবার সবাই।

লিয়াকৎ অমরবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "আমাকে এবার ছুটি দিন তবে। এঁর দেখা তো হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, এবার তুমি যাও। তিতিরের কথা মনে থাকে যেন।"

"হ্যাঁ, সে আমি যোগাড় করে দেব। যোগীন্দরের আছে এক জোড়া।"

কবি লিয়াকতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বটের পুষেছেন কেন? খাবার জন্যে?"

উত্তর দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"না না লড়াই করবার জন্যে। মুরগীর লড়াই যেমন হয়, আগে বুলবুলির লড়াই যেমন হত, তেমনই বটেরেরও লড়াই হয়। পুরুষগুলো ভারী ঝগড়াটে। তিতিরও খুব লড়ে। লিয়াকতের বটের চ্যাম্পিয়ন এ অঞ্চলে।"

লিয়াকৎ সগর্বে নিজের বটেরটির দিকে তাকিয়ে চুমকুড়ি দিলে একবার। সঙ্গে সঙ্গে বটেরটা যেন বলে উঠল, "ঠিক তো ঠিক।"

লিয়াকৎ বটেরকে খাঁচায় পুরে সেলাম করে চলে গেল।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে।

"অদ্ভুত শিখিয়েছে তো লিয়াকৎ! শুনলেন ডাকটা? ইংরেজরা এ ডাককে কেউ বলে ওয়েট মি লিপ (Wet me lip), কেউ বলে ডিক-বি কুইক (Dick-be-quick)। ফাঁকা মাঠে জঙ্গলের কাছাকাছি এই ডাক শুনে শিকারীরা বুঝতে পারে যে, বটের আছে। ওদের ওড়বার সময় একটা বিশেষ ধরনের শব্দও হয়, হুররররর গোছের। ধান-ক্ষেতে সেই শব্দ শুনেই আমরা টের পেলাম, বটেরা আছে। অনেক পাখিরই ওড়বার সময় একটা শব্দ হয়। ঘুঘুদের হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—"

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতায় বাধা পড়ল! ভরত-পাখি ডেকে উঠল একটা। বিস্মিত আনন্দে থেমে গেলেন হঠাৎ তিনি ব্যায়ত আননে।

"ভরত! দেখেছেন?"

"দেখেছি। কবিতাও লিখেছি একটা"—বিস্মিতমুখে উত্তর দিলেন কবি।

"ও, দ্যাট্‌স অল রাইট—এবার বটেরকে নিয়েও লিখুন।"

"সেটা কাবাব খাওয়ার পর হবে"—কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "কাবাবে আর কাব্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।"

কবি হাসলেন একটু। তারপর বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শীতকালের পর ওরা এ দেশ থেকে চলে যায় সব?"

"কিছু কিছু থেকেও যায়। ডিমও পাড়ে এ দেশে। ওদের ডিমও দেখতে চমৎকার। বাদামীর ওপর চকোলেটের ছিট-ছিট। তাই তো মনে হয় যে, ফুল্‌কি, মানে রেডস্টার্ট, হয়তো ডিম পাড়তে পারে এ দেশে, যদি ধরে রাখা যায়। রেডস্টার্ট তিন রকম আছে বলেছি কি আপনাকে? ব্ল্যাক, হোয়াইট ক্যাপ্‌ড্‌ (White capped), প্লাম্‌বিয়াস (plumbeous)–আমরা ব্ল্যাকটাকেই দেখতে পাই।"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার তাঁর দিকে। মাথা হেঁট করে চলেছেন ভদ্রলোক। নীরবে পথ অতিবাহন করতে লাগলেন তিনিও। কবির মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ বেশ ছিলেন তিনি স্বপ্নের হাট ভেঙে গেল হঠাৎ। অমরেশবাবুর বিজ্ঞান আর রূপচাঁদের বন্দুক সব লণ্ডভণ্ড করে দিলে যেন। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর রূপচাঁদের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, "শুনবে নাকি কবিতা?"

"কি বিষয়ে?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"বটের।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর মধ্যেই হয়ে গেল নাকি?"

কবি আবৃত্তি করলেন--

পার হয়ে হিমালয় সাগর করিয়া জয়
উড়ে আসে ছোট ছোট পক্ষী-ফানুস
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে সোজা গতি
বটের তো নয় ওরা,—পালকের প্রজাপতি
শীতের অতিথি সব,—আহা, কি চমৎকার!
আমরাও করে থাকি যথোচিত সৎকার
ঝোপে ঝাড়ে উৎসুক
বসে থাকি উন্মুখ
হাতে লয়ে বন্দুক
সভ্য মানুষ
কাবাব কোপ্তা কারি করে ফেলি রকমারি
ছিল যা একটু আগে রঙিন ফানুস।

বৈজ্ঞানিক সোল্লাসে বলে উঠলেন, "বাঃ!"

কবির দিকে মিটমিট করে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আমাকে ঝাল দিতে মানা করলে, নিজে কিন্তু বেশ ঝাল দিয়েছ তো!"

।। সাত।।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি। সবজিবাগের পড়ো বাড়িটাতে রাত্রির রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে যেন। ডানা বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে। শুয়ে জেগে আছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। ভয় করছে না। যে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্যয় অতি-দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হেনে তার আত্মীয়-স্বজন সহায়-সম্পদকে অবলুপ্ত করেছে, ভয়কেও অবলুপ্ত করেছে সে-ই। আর ভয় করে না। স্বয়ং মৃত্যুকে সামনে মূর্ত দেখলেও চমকে ওঠবার মতো মানসিক সজীবতা তার আর নেই। অন্তত মনে হচ্ছে, নেই। সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে গেছে। যে অদৃষ্ট-দেবতা এক নিমেষে তার সমস্ত অতীত জীবনটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিয়ে গেছেন, তার এই বিধ্বস্ত বর্তমানের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না, তিনিই তা জানেন। এ জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ থাকা উচিত কি না, তিনিই তা ঠিক করবেন। ডানার যেন কোনও দায়িত্ব নেই, দায়িত্ব বহন করবার শক্তিও নেই। খরস্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করেছে সে, যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেইখানেই তার স্থান। সে আপত্তি করবে না উল্লসিত হবে না, মেনে নেবে।

সবজিবাগের পড়ো বাড়িটা ঠিক নদীর ধারে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র সৈকত দেখা যাচ্ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হচ্ছে মাঝে মাঝে অতিক্ষীণ দূরাগত হংস-কাকলীতে। দূর নদীর চরে হাঁসের মেলা বসেছে বোধ হয়। চিত্রটা কল্পনায় পরিস্ফুট হওয়ামাত্র মনটা হাঁসের পাখায় ভর করে উড়ল যেন মহাশূন্যে। মনে হল, সেও যেন সত্যি উড়ে চলেছে আলোক আঁধারে সূর্যকিরণে ঝড়ের মেঘে। জন্ম-জন্মান্তরের মাঠ পাহাড় সমুদ্র বনানী পেরিয়ে কোথায় চলেছে সে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল খানিকক্ষণ। 'ওয়াক্' করে শব্দ করে উঠল রাতের বক। নড়ে চড়ে শুল সে আবার। রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! আনন্দবাবু যে চাকরটাকে দিয়ে গেছেন সে বাইরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে অঘোরে। রূপচাঁদবাবু, আনন্দবাবু দুজনেই লোক ভাল—হঠাৎ মনে হল ডানার। রূপচাঁদবাবু সাহায্য না করলে তাকে আরও কত জায়গায় যে ভেসে ভেসে বেড়াতে হত অনিশ্চিতভাবে! দুপুরের রোদ মাথায় করে আনন্দবাবু তার জন্যে চাকর খুঁজে নিয়ে এলেন দূরের এক গ্রাম থেকে। অত বড় অধ্যাপক একজন। ভাল লোক দুজনেই। কিন্তু তখনই তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। যেন তার সদাজাগ্রত অন্তরাত্মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে—সত্যিই ভাল লোক কি, সত্যিই কি নিঃস্বার্থপর? মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। সে যখন বি. এ. পরীক্ষা দেয়, প্রফেসার চৌধুরী দু বেলা তার বাড়িতে আসতেন তাকে সাহায্য করবার জন্য। একান্তভাবে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে সে কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস অর্নাস পেত না কিন্তু তবু প্রফেসার চৌধুরীর সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা আছে, তা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়। মনে পড়ল রিসার্চ স্কলার ভাস্কর বসুর কথা শান্ত সৌম্য বলিষ্ঠ মূর্তিটা স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের উপর...তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। ভাস্করের সম্বন্ধে তার মনে কোনো গ্লানি নেই, কোনো মোহও নেই। কোথায় সে এখন? এই ভীষণ আবর্তে কোথায়

তলিয়ে গেছে কে জানে! ঠিকানাও জানা নেই যে খোঁজ করবে। খোঁজ করবার প্রেরণাও নেই মনে। তার মুদিত নয়নের সামনে এলোমেলো নানা স্মৃতির টুকরো, অসম্বদ্ধ বহু প্রশ্নের আভাস ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল জলস্রোতের খড়কুটোর মতো। তার মনে হচ্ছিল, সবই বৃথা, সবই অর্থহীন। কোনো কিছুই তার মনে বিশেষ কোনো সাড়া তুলছে না। তার মনে হচ্ছিল বটে, তুলছে না, কিন্তু তুলছিল। অতি সঙ্গোপনে অবচেতন-লোকে তুলছিল। তার বিধ্বস্ত চেতনার নেপথ্যালোকে অগোচরে জাগছিল নতুন আশার অঙ্কুর, নতুন কৌতূহলের ঔৎসুক্য। সে বুঝতে পারছিল না। সমস্ত শোক, সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঝঞ্ঝার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি ক্ষতে প্রলেপ দেয়, ক্ষতিকে পূর্ণ করে, শোকের তীক্ষ্ণতাকে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনার প্রশান্তিতে, সে প্রাণশক্তি তার অন্তরেও কাজ করে চলেছিল অগোচরে।

...নদীর দিক থেকে দুম দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল কয়েকটা, সচকিত হয়ে উঠে বসল সে। তার আপাত ঔদাসীন্যের পরদাটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ যেন। সেই ফাঁক দিয়ে তার মন নিমেষে নীত হল আসামের জঙ্গলে, যে জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েছিল তারা। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল। সেই বন্দুকের গুলিতেও তার বাবা, সৎ-মা আর ছোট সৎভাইটি মারা যায়।...নিবিড় জঙ্গল, অদ্ভুত একটা লতার ঝোপ, তীব্র গন্ধ একটা, সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ পাথর প্রকাণ্ড তার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে সে। কেমন করে পালিয়ে কি ভাবে যে ঝোপটায় ঢুকেছে, তা বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ বসে রইল।....তারপর মনে হল, এমন ভাবে বসে থাকাটা অনুচিত হচ্ছে, ওদের কি হল দেখি....আমাদের দলটাই বা কত দূরে! পরের গ্রামে গরুর গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় এবং আগে থাকতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সহজে পাওয়া যাবে—এই আশায় বাবা দলের কাউকে কিছু না বলে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন রাত্রে। যে লোকটা গোপনে খবর দিয়েছিল,--সেই হয়েছিল পথপ্রদর্শক। ওই অঞ্চলেরই একজন লোক। সে-ই এই জঙ্গলে এনে ঢুকিয়েছিল। সে যে ডাকাতদের গুপ্তচর তা পরে বোঝা গেল। অতীতের সেই ভীষণ কয়েকটা ঘণ্টা আবার ফিরে এল যেন, ডানার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল বার বার। জঙ্গলের তীব্র গন্ধটা আবার অনুভব করতে লাগল সে যেন প্রত্যক্ষ চেতনায়.....সেই রুক্ষ পাথরটা সে যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পেলে। পাথরটার আড়ালে অনেকক্ষণ বসে ছিল সে। কোনও হিংস্র জন্তু কিন্তু আসেনি। কেবল সাপের মতো কি যেন একটা চলে গিয়েছিল পাশ দিয়ে, সাপ হোক, যাই হোক, কিছু বলেনি। দংশন করল বিবেক। বিবেকের দংশনে অধীর হয়েই সে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ডাকাতদের দল চলে গেছে নাকি? সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে মেরে এগুতে লাগল সে। চারিদিকে অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোনো শব্দ নেই। একটু এগিয়ে হতাশ হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ বুজে এল আবার, সজাগ হয়ে থাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ যখন চোখ খুলল তখন সকাল হয়ে গেছে, পাখির ডাকে সারা বন মুখরিত। সে একটু বিস্মিত হল লজ্জিত হল। এত দুঃখে এমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও ঘুম আসে! কিন্তু এসেছিল। আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, উঠে একটু এগিয়েই দেখতে পেলে, তিনটি মৃতদেহ পড়ে আছে সারি-সারি। তার বাবার মায়ের আর ভাইটির। তিনজনেই উলঙ্গ। ডাকাতেরা কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ সে যে দাঁড়িয়ে ছিল, তা তার মনে নেই...তারপর কেন যে তাদের ছেড়ে এসেছিল, তাও ভাল মনে পড়ছে না,—হ্যাঁ, পড়েছে, তাদের সৎকারের

ব্যবস্থা করবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে বন থেকে। ভেবেছিল, কাছাকাছি কোনও লোকালয় যদি পাওয়া যায়, তা হলে হয়তো কোনও ব্যবস্থা হতে পারবে। কিছুদূর গিয়ে পথ পেয়েছিল একটা। সেই পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পর একটা মিলিটারি লরি দেখা গেল। হাত তুলতে থামলও সেটা। নির্বিচারে বিনা দ্বিধায় সেইটেতেই উঠে পড়ল সে। 'টমি'তে ভর্তি ছিল। একটু দূরে গিয়ে একটা গ্রামে ঢুকেই নেবে পড়তে হয়েছিল। 'টমি'দের ন্যক্কারজনক অতি আপ্যায়ন সহ্য করতে পারছিল না সে। মনে হয়েছিল, এরাই সভ্যতার বড়াই করে? এদের দেশের মিস মেয়ো নাক তুলে কথা বলে? গ্রামে দেখা হল কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে শবদেহগুলির সন্ধান করে সৎকার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাকে সাহায্য করলেন অনেক এবং একটা ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, এই ট্রেনটায় না গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়াই হবে না সম্ভবত। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না কে জানে!

দুম দুম দুম দুম—আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। হাঁসের কলরব বেড়ে উঠল যেন। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল ডানা। এখানেও ডাকাত পড়বে নাকি? নির্জন নদীতীরের পড়ো বাড়িতে অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু কি লোভে আসবে এখানে ডাকাত! বাড়িটা পড়ো—সেও তো নিঃস্ব। পরমুহূর্তেই মনে হল সে যে নিজেই একটা লোভনীয় বস্তু। সোনা-রুপো, মণি-মাণিক্য, জরি-জহরতের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান। তার অঙ্গ অলঙ্কৃত করবার সুযোগ পায় বলে তো মূল্য ওসবের। তাকে কেন্দ্র করেই তো উতলা হয়েছে মানুষের বাসনা যুগে যুগে...রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড—মহাকাব্য মহাযুদ্ধ—সবই তো তাকে কেন্দ্র করেই। দানব-মানব-দেব সবাই লোলুপ আগ্রহে চেয়ে আছে তারই দিকে। 'টমি'গুলোর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল ইরানী সেই ভদ্রলোকের দৃষ্টি....ভয় নয়, একটা সূক্ষ্ম গর্ব তার সারা মনে সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসেছিল সে। হাত দুটি কোলের উপর ছিল। হঠাৎ সে হাত দুটি তুলে এলায়িত কুন্তলটা ঠিক করে নিলে..... ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করলে আয়নার অভাব...তারপর উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল দ্বারের দিকে! অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে একটা। তার গণ্ডে অলকে গ্রীবাভঙ্গীতে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠল বিজয়িনীর মাধুরী-মহিমা!...মানুষের গলার শব্দ—হ্যাঁ, একাধিক মানুষের।

"আমাদের ভাগ্য ভাল। অনেক রকম পাওয়া গেছে। গীজ যে পাওয়া যাবে তা আশাই করিনি।"

ডানা উঠে এসে জানালাটা খুলে দিলে। জানালার নীচেই খানিকটা বাগানের মতো ছিল এক কালে। সেখান থেকে সিঁড়ি নেবে গেছে নদীর তীরের দিকে। সেখানে বাঁধানো চাতাল আছে একটা, লোহার বেঞ্চিও আছে খান কয়েক। সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, ডানা দেখতে পেলে। একজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা পেট্রোম্যাক্স্-জাতীয় আলো। টর্চও প্রত্যেকের হাতে। তাদের মুখ দেখা না গেলেও কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল!

"কটা কি পাওয়া গেল গুনে দেখবে না?"—গলার আওয়াজে ডানা বুঝলে রূপচাঁদবাবু।

বৈজ্ঞানিক সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো।"

নিজেই গুনতে শুরু করলেন।

"নাকি হাঁস পাঁচটা, লালশর গোটা তিনেক, বারহেডেড গীজ চারটে।"

"গীজের দেশী নাম নেই কোনও?"—কবি প্রশ্ন করলেন।

"রাজহাঁস বলে অনেকে। ও, আপনাকে সব দেশী নাম বলতে হবে বুঝি? গড! এই পাঁচটা হচ্ছে লেসার হুইস্‌লিং টীল, মানে শরাল হাঁস বলা হয় যাকে।"

কবির দিকে চেয়ে হাসলেন বৈজ্ঞানিক।

মুন্সি পাশে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "এখানে সিল্‌হি বলে।"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে আরও কয়েকটা হাঁস আলাদা করতে করতে বললেন, "এগুলো হচ্ছে ব্রাহমিনি ডাক্‌স—মানে চখা। এ পাঁচটা হচ্ছে আর এক জাতের লালশর, আর এগুলো সব টীল—কয়েক রকমই আছে দেখছি। বাইজোভ—পীনটেলও পাওয়া গেছে দেখছি। এটা কী? স্মিউ—বাঃ, চমৎকার! এটাকে স্টাফ করাতে হবে।"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন জানলার দিকে।

"উনি উঠেছেন দেখছি।"

বৈজ্ঞানিক জিব কাটলেন অপ্রস্তুত মুখে।

"ছি ছি, অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ছি খুব অন্যায় হয়েছে ।"

রূপচাঁদের অধরে এমন অদ্ভুত একটা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল যার সম্যক অর্থ করা একটু কঠিন। চতুরতা, ব্যঙ্গ, লোভ, আঘাত-ঔদাসীন্য এবং আরও অনেক কিছুর সমন্বয় তা।

কবি বললেন, "উঠেই পড়েছেন যখন, তখন চলুন না, যাওয়া যাক বারান্দার ওপর। এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কী?"

"কোনও অর্থ হয় না"—বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন।

"না না, সেটা কি ঠিক হবে?"—বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ করলেন তাড়াতাড়ি। "এত রাত্রে একজন ভদ্রমহিলাকে এমনভাবে বিব্রত করা, বিশেষত তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ নেই মোটে। হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমরা তাঁর দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে—"

"আপনারা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন বুঝি!"—কপাট খুলে বেরিয়ে এল ডানা।

"অনেক পাখি মেরেছেন তো? কি ওগুলো—সব হাঁস নাকি?"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি। ডানার এই অতিসাধারণ প্রশ্নের অন্তরালে তিনি যেন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করলেন।

"শুনবেন ওদের পরিচয়?"

"বেশ তো।"

"এই মুন্সি, নিয়ে আয় ওগুলোকে বারান্দার ওপর।"

সবাই এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। মুন্সি হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাজাতে লাগল। এক ধারে একটা ভাঙা টুল ছিল, তার ওপরে রাখা হল পেট্রোম্যাক্‌স লণ্ঠনটা।

"যে বেঞ্চিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন ডানাকে।

"ভিতরে আছে! বার করব?"

"আপনি করবেন কেন? আমরা করছি"—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন কবি। রূপচাঁদও গেলেন। দুজনে মিলে বার করে নিয়ে এলেন বেঞ্চিটাকে। কবি যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের একটা রজনী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তিনি যেন হারুন-অল-রসিদ। অনেকক্ষণ থেকেই একটা অস্পষ্ট ভাব তাঁর মনে সঞ্চরণ করছিল। হঠাৎ সেটা কবিতার রূপে মূর্ত হল।

উতলা রজনী কিসের গন্ধে,
গভীর রাতের গোপন ব্যথায়
অতনু শিল্পী অশোনা ছন্দে
কি রাগিণী গাহে অরূপ গাথায়।
এ কি অশ্রুত মোহন ছন্দ
এ কি অস্ফুট গোপন গন্ধ
কোন্ কাননের এ অচেনা ফুল
এ কবিতা লেখা কাহার খাতায়।
মদির হয়েছে নিবিড় রজনী
অধীর হয়েছে কবির চিত্ত
অসম্ভব কি হবে সম্ভব?
চির-অনিত্য হবে কি নিত্য?
হয়তো খুলিবে দুয়ার বন্ধ
হয়তো দৃষ্টি লভিবে অন্ধ
প্রত্যাশা-ভরা আকুল 'হয়তো'
অন্ধকারকে ছন্দে মাতায়।

ডানা কবির দিকে চেয়ে বললে, "বসুন।"

"আপনি বসুন আগে"—সম্ভ্রমসহকারে উত্তর দিলেন কবি।

ডানা বসল গিয়ে। ডানা বসতেই রূপচাঁদও বসে পড়লেন তাঁর পাশে। ঈষৎ ইতস্তত করে সসঙ্কোচে কবিও বসলেন আর এক পাশে।

বৈজ্ঞানিক হাঁসগুলোকে আবার শ্রেণীবিভাগ করে সাজিয়ে ফেলছিলেন। সাজানো হয়ে যাবার পর উপবিষ্ট শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাতে হাত ঘষে বললেন তিনি, "সত্যিই কি হাঁসের বিষয় কিছু শুনবেন আপনারা? ভাগ্যক্রমে এক সোয়ান (Swan) ছাড়া আর সব রকমই পাওয়া গেছে দেখছি, এমন কি ড্যাবচিক (Dabchick) মানে পানডুবি পর্যন্ত, যা অনেকে টীল বলে ভুল করে।"

"বেশ তো, বলুন না"—ডানা বললে।

"বলবার আগে হাঁসের সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা দরকার। জলচর পাখিমাত্রেই হাঁস নয়। হাঁসের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ঠোঁট সোজা, ঠোঁটে দাঁতের মতো খাঁজ-খাঁজ আছে ওপরে নীচে দু জায়গাতেই, পায়ের গোছ খুব লম্বা নয়, পায়ের সামনের তিনটে আঙুল জোড়া, আর একটা ছোট্ট আঙুল পেছনের দিকে আছে। এই দেখুন পানকৌড়ির পায়ের আঙুল জোড়া নয়; যদিও সাঁতার কাটবার জন্যে প্রত্যেক আঙুলে (web) আছে। হাঁসের শ্রেণীবিভাগ নানা রকম আছে। কিন্তু ফিন (Finn) সাহেব মোটামুটি চেনবার জন্যে যে ভাগটা করেছেন সেটা মন্দ নয়।"

রূপচাঁদ ডানার কানে ফিসফিস করে বললেন, "লম্বা লেক্‌চার ঝাড়বেন বলে মনে হচ্ছে।'

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার হাঁসগুলোকে দেখছিলেন। রূপচাঁদের কথা শুনতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ ফিরে শুরু করলেন বক্তৃতা।

"ফিন সাহেব হাঁসদের চারটে ভাগ করেছেন—Swan, Goose, Mergansers, Ducks,

Swan এ দেশে প্রায় দেখা যায় না। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকারে বড়, গলাটা খুব লম্বা। Goose-এর গলাও লম্বা, কিন্তু এদের নাকের ছ্যাঁদাটা ওপর-ঠোঁটের ঠিক মাঝামাঝি আছে। বার-হেডেড গুজের এই দেখুন। দেহের এবং গলার তুলনায় মাথাটা ছোট। ঠোঁটও ছোট এবং একটু কম চওড়া। হাঁসদের ঠোঁটের মাঝখানে একটা নখের মতো থাকে, এই দেখুন। এদেরটা একটু বড় হয়। ঠোঁটের খাঁজও দাঁতের মতো, ঘাস কাটবার উপযোগী। এরা সাধারণত নদীর ধারে চরে বেড়ায় কিনা। এদের গায়ের রঙেরও বিশেষত্ব আছে। হয় বাদামী গোছের, না হয় পাঁশুটে, আর প্রত্যেক পালকের ধারটা একটু ফিকে রঙের, সেই জন্যে সর্বাঙ্গে একটা ডুরে-ডুরে ভাব। এরা সাধারণত উত্তর-মেরুতে থাকে। শীতকালেও বড় একটা দক্ষিণ অঞ্চলে আসে না। তবে আমাদের দেশে এই Bar-headed Goose ছাড়া আর এক রকম Grey Goose দেখা যায় শীতকালে। গীজ আরও আছে কয়েক রকম। Red-breasted Dwarf, White-fronted, Pink footed তবে এ দেশে দেখা যায় না বড়। এদের সকলেরই পা হয় হলদে, আর একটু লম্বা গোছেরই, কারণ ডাঙায় হেঁটে বেড়াতে হয় কিনা। হাঁসদের তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে Mergansers। এদের বিশেষত্ব সরু ছুঁচলো ঠোঁট, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়, wind-pipe-এর নীচের দিকে ফাঁকা একটা কৌটোর মতো জিনিস থাকে, Bulla Ossea। এরা খুব সাঁতার কাটে, ভাল ডাইভারও। মাংসে আঁশটে গন্ধ। এরা সাধারণত আমিষ-ভোজী। এদের জাতের আমরা একটা পেয়েছি—স্মিউ (Smew)। এরাও সাধারণত আসে না এ দেশে। তারপর আসুন, চতুর্থ শ্রেণীর হাঁস—Ducks। এদের বিশেষত্ব গলা লম্বা নয়, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়—except in golden eye–ঠোঁটও ছুঁচলো নয়। এরা অনেক রকম species-এর হয়—উনত্রিশ রকম। এইগুলোই সাধারণত দেখি আমরা। ফিন সাহেব এদের আবার তিন ভাগ করেছেন। এক ভাগ ডাইভিং—এরা প্রায় জলেই থাকে, দ্বিতীয় ভাগ Pedestrian and Perching–অর্থাৎ ডাঙাতেও আসে মাঝে মাঝে, গাছেও দেখা যায়। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে Surface feeders। এরা সাধারণত জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ করে না, কিংবা গাছেও চড়ে না।"

"সংক্ষেপ করুন"—রূপচাঁদ বললেন। তারপর তিনি ডানার কানে কানে কি বলতেই ডানা উঠে পড়ল এবং বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে বললে, "এক মিনিট। আসছি এক্ষুণি"— বলেই চলে গেল ভিতরে।

"কেন, কি হল?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম। চায়ের সব সরঞ্জাম কিনে দিয়ে গেছি। চা হলে আরও জমবে।"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হাসলেন একটু। যদিও ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে, তবু শেষরাত্রে বেশ শীত এখনও। একটু গরম চা পেলে যে ভালই হয়, এ কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বাধা পড়াতে তিনি যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তা তাঁর হাসি থেকেই বোঝা গেল। হেঁট হয়ে আবার পাখিগুলোই সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি।

কবি একদৃষ্টে মৃত হাঁসগুলির দিকে চেয়েছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ পাখির দল। কি সুন্দর! উন্মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়াত নীল আকাশের নীচে। আর উড়বে না। বৈজ্ঞানিকের সত্যসন্ধানের এই পথটাই কি ঠিক পথ? কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কতটা খবর পাওয়া যায়! তা ছাড়া সত্য কি কেবল চোখে দেখবার জিনিস? অমরবাবুর বিজ্ঞানচর্চার এই সব নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে

আগে আগে খুব কষ্ট হত তাঁর। এখন আর হয় না। সহ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এখন শুধু যে কষ্ট হচ্ছে না তা নয়, আনন্দ হচ্ছে। এই মৃত মরাল-মরালীর স্তূপের উপর পা রেখেই তো তিনি উঠতে পেরেছেন মানসীর মন্দিরে এই নিবিড় নিশীথে। এই হাঁসগুলো না মরলে কি সম্ভব হত এই নৈশ অভিযান? দেবী-পূজায় এরা বলি। নতুন দৃষ্টিতে স-সম্ভ্রমে চেয়ে রইলেন তিনি মরা হাঁসগুলোর দিকে। রাজহংসটার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল, ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনই তো আদি কবিতার উৎসব। সেই ক্রৌঞ্চমিথুন কি মরেছে? ওই রাজহংসটাকে মৃতের দলে ফেলে দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল। ও মরেনি, চিরকাল ও প্রেরণা যোগাবে কবির মনে। কবিতা জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। তন্ময় হয়ে ছন্দের মালা গাঁথতে লাগলেন তিনি।

রাজহংস আকাশচারী
　　নীল আকাশের বার্তা যাচে
নীল আকাশের খবর কি চাও?
　　তাও তো পাবে তাহার কাছে।
স্বচ্ছ নদীর সবুজ মাঠের
মানস-সরের অচিন ঘাটের
গোপন কথা সেই তো জানে
　　ফল যে খোঁজে কল্প-গাছে।
হিমালয়ের তুঙ্গ চূড়ায়
　　মহাদেবের জটায় পাকে
কলস্বরা গঙ্গা যেমন
　　সোহাগ ভরে জড়িয়ে থাকে
সন্ধ্যা-ঊষায়, তড়িৎ জ্বালায়
ইন্দ্রধনুর বর্ণমালায়
চন্দ্রতারার স্বপ্নলোকে
　　রূপ ঢালা হয় কিসের ছাঁচে
সেই তো জানে সরস্বতীর
　　পায়ের তলায় কি রঙ আছে।

রূপচাঁদ একটি সিগারেট ধরিয়ে চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন করে কি যে ভাবছিলেন, তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন না স্পষ্ট করে। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অজানা পথের প্রান্তে সংশয়াকুলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি যেন। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আশা করছিলেন পাবেন!

।। আট।।

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

"এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই যে পাঁচটা দেখছেন এগুলো হল Lesser Whistling Teal–বাংলায় শরাল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্‌হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং Perching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে Goose–এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান হয়। স্ত্রী পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ রঙ আছে। Whistler চার রকম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal, Large Whistlerও আছে এক রকম। আরও দু' রকম আছে—Wandering Whistler এবং Spotted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies—এ থাকে। হুইস্‌লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস আছে, যেমন চখা—আমরা পেয়েছি; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common Sheldrake—শাহ্ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, বাংলায় এদের বলে ঘাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। শীতকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের শ্রেণীতে আরও দু' রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin Ducks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি Ducks পাওয়া গেছে দেখা যাক—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal."

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন।

কবি বললেন, "Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় খটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Goose-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—"

"হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)।"

"চমৎকার দেখতে তো!"

"চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে, Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয় আর দুজনেই দেখতে সুন্দর।"

কবি বললেন, "তা হলে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Duck-দের শুধু হংস।"

"বাঃ তা হলে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks."

কবি বললেন, "Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?"

"তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের ওপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়।"

"তা হলে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়।"

"হ্যাঁ, বেশ হবে।"

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, "ওইগুলো টীল বললেন না?"

"হ্যাঁ ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন— Lesser Whistling Teal, এই দেখুন এদের ল্যাজের ওপর দিকে মেরুন রঙের ছোপ রয়েছে। Large Whistling Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়াও এ দুটোও দেখুন Teal কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখভোজী, কমন টীল (Common Teal) যাকে বেলে হাঁস বলে। সম্মুখভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচরকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে—Wood-Duck, Pink Head, Marbled Teal, Shoveller, Pintail। আমরা Pintail পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রী পুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal আর Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমন টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি?—বাঃ চমৎকার! একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব—দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দুপাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের—সুন্দর, নয়?"

"ওগুলো কি বললেন?"—ডানা প্রশ্ন করলেন।

"নাকি হাঁস—Comb-Duck। এরা হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু?"

"ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়।"

"মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাকটা' বলে। এদের পুরুষদের নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মতো থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে।"

কবি বাধা দিলেন।

"ডিমের কথা যাক্ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে।"

"আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিযে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা।"

ডানা আর একটা হংস-স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এগুলো কি?"

"এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে, সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks, মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় দুমার বা ডুমার বলে। এদের পাও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard-এর এই Wing-Bar নেই।"

"Wing-Bar কি আবার?"

"এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লালশর। এদের বাংলায় ভূতিহাঁসও

বলে, ইংরেজী White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানায় এক-আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাত্তাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানেই থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর-মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে! আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink-headed Duck। গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এদেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক—আর একটা কথা বলে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর—সবুজশরও আছে। ডুবুরি হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিনবিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজীদের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।"

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হল, বিষয়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে বললেন, "আচ্ছা, ওটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?"

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন, কোনও উত্তর বা উত্তরের আভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে বসে ছিলেন তাঁর ধূমাচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। উন্মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল রঘুবংশ। ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত করেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন-মালাটি ঠিক করেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত করে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি আন্দোলন করে রত্নাঙ্গুরীচ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নিজের রত্নশোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত করে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ অধীরচিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল স্বয়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছেন, কিন্তু কি করে তাঁকে মনোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধরে আছেন। চকোলেট রঙের মাথাটা ঝুলে পড়েছে একধারে। ডানাটা বিচিত্র! অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, "ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে।"

"ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম

হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলঞ্চও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টিলকে অনেকে দীঘৌচ বলেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীঘৌচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green, Wing-Barও নেই।"

একটু হেসে তারপর বললেন, "পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি অলঙ্কৃত।"

বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

"সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Mergansers বললাম, আনন্দবাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী, কালো নয় এর মতো। Goosander-ও তাই। শাহ্ চখার স্ত্রী-পাখিটাই বোধ হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কিন্তু আর সবই এক। মানে—"

অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে পক্ষী-সমাজে পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে জোর গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

"ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীদের মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ ডগমগে নয়, দেখেছেন? বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তাদের Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মালা উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আবার V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশপথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং।"

"তার চেয়ে ঢের ভাল করে বলেছিলেন কালিদাস।"

কবি বলে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল করে রেখেছেন, এ যেন সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

"কি বলেছেন?"

"কামঞ্চ হংসবচনংমণি-নূপুরেষু, মণি-নূপুরের নিক্বণের সঙ্গে তিনি উপমিত করেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে চোখে সাহেবরা, দেখতে পারবে না ওকে। আর ওর সঙ্গে জড়িত করেছি দময়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে! শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই বলা হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার কেবলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু বলে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে না। কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।"

"কে বললে নেই? কাব্যও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই করবার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।"

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

"ওগুলো চখা বুঝি? চমৎকার রঙ তো!"

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার আর কোনো উপায় নেই।

"হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্‌স্।"

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সংস্কৃতে চক্রবাক।"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা। নয়?"

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

"আপনি সংস্কৃত জানেন?"

"হ্যাঁ। বি. এ-তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে এখনও।"

বলেই সে আবৃত্তি করে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহ মীক্ষিতানি।

আবৃত্তি করেও কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার মতো শোনাল যেন। কিন্তু এদের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হল, কেন দেবে না?

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই পড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেননি। রূপচাঁদও করেননি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে।

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন একসঙ্গে থাকে কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দুপারে চলে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি?"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "না! বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়া থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।"

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যান্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়ে গেল তাঁর—I strove with none, because none was worth my strife।

তাঁর মনে হল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায় না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হলে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েননি? কিন্তু তখনই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন করে উঠল—

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলনা নয় ও
আকাশ নেমেছে উহারই কাছে
নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
চাহনীতে ওর বিজলী নাচে
গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘের মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটি কথা বলেননি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ নড়ে চড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না।

কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল কেশর খায়, তা সত্যি নাকি?"

"জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। গুগলি শামুক পোকা-মাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত।"

"মড়া খায়?"

"আমি নিজের চোখে খেতে দেখিনি। বইয়ে পড়েছি।"

কবি হেসে বললেন, "ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েননি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী বয়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংশ্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায়নি কখনও, শিকারীর গুলিতে মারা পড়েনি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।"

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কিন্তু এক জায়গায় তারা ধরা পড়েছে শুনেছি।"

"কোথায়?"

"কবির কল্পনাজালে।"

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন।

ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, "নিশ্চয়।"

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

"কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্ মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা পড়ে যায় বারংবার।"

ডানা বলে উঠল, "বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?"

চুপ করে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে লাগল হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে বসে রইলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন উনি। পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন।"

"তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার।"

কবির মনে হল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ পরে যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে ধূম উদ্‌গীরণ করে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন করে বসে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে! সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।

চমকে উঠলেন সবাই।

রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "এখানে আর কেউ আছে নাকি?"

"আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে।"

চাকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।

"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?"

"না তো।"

"ও তবে কে?"

"জানি না।"

"মুন্সি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার দিক থেকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে।"

মুন্সি আলোটা নিয়ে চলে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত অনুভূতিময় অন্ধকার। মনে হল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু ডানার মনে হচ্ছে, তার চারদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অনুক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও

ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, তার পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে সকলকে। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। খালি পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

"আমি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মতো আশ্রয় নিয়েছি ওই পড়ো ঘরটাতে।"

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেননি। আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর কপাল।

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সংগ্রামপুর থেকে।"

"সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই।"

"আমি হেঁটে এসেছি।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। ত্রিশ মাইল হেঁটে আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন সেখান থেকে।

"কোথায় যাবেন আপনি?"—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"তা ঠিক করিনি এখনও।" তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ওই পড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ।"

ওই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বাড়ি কোথায় আপনার?"

"কোথাও নেই।"

"কি করেন?"

"কিছুই করি না।"

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ করে রইলেন।

রূপচাঁদ বলেন, "চলে কি করে আপনার?"

"কি চলবার কথা বলছেন?"

"পেট।"

"পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে।"

কথাটা বলে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

"আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চলে যাব।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি অসুবিধা না হয়।"

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা। কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বামচক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নেড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম ডানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, "না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বরং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো।"

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক।

তারপর বলল, "এবার আমি যেতে পারি কি?"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

প্রতি-নমস্কার করে আগন্তুক চলে গেলেন। তারপরই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিরা কলরব করে উঠল একযোগে । ঐকতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হতে লাগল, নাটকের নতুন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবির দিকে ফিরে বললেন, "শুনছেন?"

"কি?"

"ওই যে, ওই যে।"

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হল, প্রভাতে আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। নূপুরের নিক্কণ, বাঁশির সুর, তার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে যেন কেউ, সেতারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা অবর্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ সঙ্গীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যে কৃতিত্বটা তাঁরই, সুরের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের দিকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা করেছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন বুঝি এইবার। ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, "দোয়েল।"

"ও।"

"দেখেছেন কখনও?"

"না।"

"চলুন, দেখিয়ে দিই।"

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন।"

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "চলুন।"

সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে।

মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে।

মুন্সিও যখন চলে গেল তখন রূপচাদ কথা কইলেন।

"আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু।"

"কেন?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি. এ. পাস করেছেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে?"

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

"সত্যিই নেই?"

রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু।

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে বসে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই বসে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক বলে চলেছিলেন ফিসফিস করে—

"আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল বলে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel। হিন্দিতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo— বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'। একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আমবাগানে।"

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
          নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
          অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
                    কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।
শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
          আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি

হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
গিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ কমে গেছে যেন। কনকনে পুবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠছে অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন...

"এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।"

কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক বলে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে বলে চলেছেন কে জানে!

"এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পেছনের দিকের কার্নিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—"

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ করে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হলেন মল্লিক, সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জাবির পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "কাল সন্ধে থেকে আপনাকে খুঁজছি।"

"আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি?"

"আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, সত্যি বলছি, জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছিমিছি লাগিয়েছে আমার নামে মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আশ্চর্য, সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা কি, আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো মিছিমিছি কি কাণ্ড।"

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক।

বললেন, "কি চিঠি, কে দিয়েছে?"

"এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!"

একটি ছোট চিঠি বার করে দিলেন তিনি।

রত্নপ্রভার চিঠি। রত্নপ্রভা গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় করে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে। যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।

ইতি রত্নপ্রভা

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর আড়চোখে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মল্লিক বলে চলেছিলেন, "সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকাটা কি ছিল মুন্সির।"

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না; তবে এটা ঠিক, আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে মরে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক মরে গেছে।"

"আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

"ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছু জানতাম না।"

তাঁর একবার ইচ্ছে হল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু রত্নপ্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ করে গেলেন। মল্লিক দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা।

তারপর বললেন, "উনি মনিব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু সামান্য ফড়িং, দেখুন দিকি।"

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ করে রইলেন।

"এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা নয়, প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। মুন্সিকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি এবার তবে।"

নমস্কার করে মল্লিক চলে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, "হ্যাঁ, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম চমৎকার দেখতে, বুঝলেন?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

"সে কথাটি কি?

"বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
সুখাং প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।"

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "ও, সার্টেনলি।"

।। নয় ।।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমরবাবু। সত্যি সত্যি পাখির গান রেকর্ড করা যাবে তা হলে এইবার।... বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টার নিকল্‌সন্, মিস্টার কক আর তিনি। শহর থেকে অনেক দূরে, সমস্ত কোলাহলের বাইরে। সঙ্গে আছে পার্লোফোন কোম্পানির সাউন্ড-ভ্যানটা, তার ভিতরে আছে গান রেকর্ড করবার সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম। খুব ভাল মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবার তারও আছে প্রচুর। ভ্যানের ভিতরে বসে সুইচ লাগিয়ে দিলেই লাউড-স্পিকার বেজে উঠবে। বনের ভিতর মাইক্রোফোনের সামনে যত

রকম শব্দ হচ্ছে, শোনা যাবে সব। পাখির গানও। অনায়াসেই রেকর্ড করা যাবে। অনেকগুলো অ্যাকুমুলেটারে (Accumulator) ইলেকট্রিসিটি পুরো চার্জ করে আনা হয়েছে। মোমের তৈরি রেকর্ডও আছে প্রচুর। রেকর্ড অনেক আনতে হয়েছে, নষ্ট হবে অনেকগুলো। পাখি কখন গাইবে ঠিক নেই, রেকর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। বসন্ত-বউরির গানটাই আগে তুলতে হবে। দোয়েলের তুললেই ভাল হত, কিন্তু দোয়েল আজকাল ডাকছে না বেশি। বসন্ত-বউরির ডাকটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। কোকিলও অবশ্য আছে। যে রেডস্টার্টগুলো ধরে রেখেছেন, তাদের গান তুললে কেমন হয়? ও জায়গাটা কিন্তু বড় অসমতল। কক সাহেব বলেছেন, সাউন্ড-ভ্যানটাকে সমতল জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। শহরের বাইরের মাঠটাতেই ঠিক হবে। বসন্ত-বউরি পাওয়াও যাবে সেখানে প্রচুর।

...মাঠ। ইউক্যালিপ্টাস গাছের উঁচু ডালে অনেক বসন্ত-বউরি এসে জোটে ভোরবেলায়। গাড়িটাকে একটু দূরে সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে মাইক্রোফোনটাকে ফিট করে রাখা হয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। পাখিটা যাতে হঠাৎ মাইক্রোফোন দেখে ভড়কে না যায়। না, যায়নি। রোজ যেমন ডাকে, ঠিক ডাকছে।

...ভোরবেলা। রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কই বসন্ত-বউরি আজ এল না তো গাছটায়! অথচ রোজ আসে। আজ কাক ডাকছে কতকগুলো। ওটা কিসের শব্দ? পাখির হতে পারে না। কুকুরের। ছি, ছি!

...কক সাহেব হেসে বলছেন, ব্যস্ত হলে চলবে না। আমরা একটা ব্ল্যাক বার্ডের গান রেকর্ড করবার জন্যে চেষ্টা করেছি দিনের পর দিন, রোজ রাত দুটো থেকে উঠে। অপেক্ষা করতে হবে।

...ওই এসেছে। ওটা কি হল? শর্ট সারকিট (Short Circuit) হয়ে গেল। মাটি ভিজে যে।

...আবার ঠিকঠাক করে বসা হল। রেকর্ডের পর রেকর্ড ঘুরে চলেছে।

...মোটর চলে গেল একটা দূরের রাস্তা দিয়ে। বাতাস উঠল জোরে। ডাল-পালায় হুড়মুড় শব্দে পাখির গান চাপা পড়ে যাচ্ছে।

...এইবার হয়েছে। বাঃ ঠিক হয়ে গেছে—

"শুনছ, ওগো, ওঠ ওঠ।"

চোখ খুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন রত্নপ্রভা সামনে দাঁড়িয়ে, কক সাহেব নয়।

"স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?"

বৈজ্ঞানিকের বুকের উপর একখানা বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ স্বপ্নই। অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন একটা।"

"রূপচাঁদবাবু এসেছেন বাইরে।"

"ও।"

উঠে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

"চা খেয়ে বেরুবে, না, বাইরেই পাঠিয়ে দেব দুজনের একসঙ্গে?"

"তাই দাও।"

রত্নপ্রভা চলে গেলেন। বৈজ্ঞানিক বইটার দিকে চেয়ে দেখলেন আর একবার। Songs of

Wild Birds। ওদের দেশে পাখির গান সত্যিই রেকর্ড করেছে ওরা। আমাদের দেশে এসব এখন সুদূরপরাহত। স্বপ্নই। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ দেশের অধিকাংশ লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না।

...বেরিয়ে গেলেন।

বৈঠকখানায় যাওয়ামাত্রই রূপচাঁদ বললেন, "দু-একটা বাড়তি ফার্নিচার আছে তোমার চেয়ার, বেঞ্চি, ছোট টেবিল, এক-আধটা আলনা?"

"কেন, কি হবে?"

"ওই মেয়েটির দরকার, আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, কপর্দকহীন—দরকার তো সব জিনিসই।"

"গুদোমে আছে বোধ হয়। রত্না জানে ঠিক।"

"এখানেই যদি পেয়ে যাই তা হলে বেশি ঘুরতে হয় না আর।"

"আছে আমার।"

"বাচা গেল তা হলে।"

"রূপচাঁদের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় ডানার কৃতজ্ঞতাস্নিগ্ধ মুখচ্ছবিটা ফুটে উঠল একবার।

"আনন্দবাবুর খবর কি?"

"সেখান থেকেই তো আসছি। সে দেখলাম একটা প্রকান্ড সবুজ বই নিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছে। তুমিই দিয়েছ বোধহয় বইটা।"

"ওয়াইল্‌ড্‌ কোরাস (Wild Chorus) খানা দেখছেন বোধ হয়। আপনি দেখলেন বইটা?"

"একটু উঁকি মেরে দেখেছি। হাঁসের ছবি।"

"হ্যাঁ। অদ্ভুত বই।"

চা এসে পড়াতে বইয়ের কথা চাপা পড়ে গেল।

কবি তন্ময় হয়ে নিজের তেতলার ঘরটায় চৌকির উপর চিত হয়ে শুয়ে Wild Chorus বইখানা দেখছিলেন। শুধু বইখানাই দেখছিলেন না, তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখছিলেন হংসরসিক পিটার স্কটকে, আর চেষ্টা করছিলেন তাঁর মানসলোকে ঢুকে তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেতে। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন—কবিও। অদ্ভুত চিত্রকর। কি চমৎকার ছবিই না এঁকেছেন। থাকেন সমুদ্রের ধারে। হাঁসের সঙ্গলোভেই শহর ছেড়ে গেছেন সেখানে। নদী যেখানে এসে মিশেছে সমুদ্রে, সেই মোহনার কাছেই এক প্রকাণ্ড 'লাইট হাউসে' (Light House) আস্তানা ওর। শীতকালে অজস্র হাঁস আসে সেখানে। অনেক বুনো হাঁস ধরে পুষেওছেন নিজে। বাড়ির তিন দিকে নোনা বালির চড়া, তারপর খানিকটা জল, খানিকটা কাদা, তারপর সমুদ্র-সৈকত। জোয়ারের সময় সবটা সমুদ্রের জলে ভরে যায়, বাড়িটা শুধু জেগে থাকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন কবি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাগরের ঢেউ। আরপর আকাশ। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও কালো। আবীর ছড়িয়ে পড়ছে কখনও, কখনও স্বর্ণরেণু। কখনও অরুণ, কখনও গৈরিক। কত অজস্র রঙের লীলা চলেছে। আর তার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে খামখেয়ালী

মেঘের দল ভেসে ভেসে আসছে আর চলে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে আসছে হাঁসের দল তুষারের দেশ থেকে। হাঁস দেখবার জন্যে কতরকম আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। কত দেশে ঘুরেছেন। অস্ট্রিয়া-হাংগেরি-রুমানিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে, দানিয়ুব নদীর তীরে, ক্যাস্‌পিয়ন সাগরের সৈকতে।...কবিতা জাগল মনে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। লিখে না ফেললে থাকে না। চলে যায়, পালিয়ে যায়।

পাখা মেলে উড়ে চলে হাঁসেদের সারি
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।
রোদ-ঝড়-আলো-ছায়া-চন্দ্র-তপন
শূন্যবিহারী
অন্ধকারের বুকে তারা অগণন
সারি সারি সারি;
মায়া বিস্তারি'
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রঙিন স্বপন
সন্ধ্যা-উষার মেঘে আলোকের অলঙ্করণ;
দিগন্তে ধরার নেত্রে কজ্জলিত স্বপ্ন মনোহারী ঃ
অকস্মাৎ তার মাঝে উড়ে আসে কল-কণ্ঠ হাঁসেদের সারি
সচকিয়া সমুদ্র-গিরি-মরু-বন
সাদা-মাথা, লাল-বুক, গোলাপী-চরণ,
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।

লিখে বসে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ করে। বইখানা আবার ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল, এ ভদ্রলোক হাঁস দেখতে বেরোননি, হাঁস ধরতে বেরিয়েছেন। হাতে আছে জাল---Clap net। হাঁস ধরে তার পাখা ছেঁটে বা বেঁধে তাকে বন্দী করে রাখবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুষ্ট মন যে। উপভোগের অন্তরালে তাই উঁকি মারছে ভবিষ্যতের ভাবনা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। প্রকৃতির আনন্দলীলা যে অফুরন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য যে অবারিত রয়েছে সহস্র দিকে—এ বোধ বোধহয় জাগেনি এখনও ভদ্রলোকের। সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন তাই প্রাণপণে। ভাবছেন, ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে তুমি, ওরা থাকবে।

মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন এসে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড।

"ওগো, শুনছ বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চিঠি পেলাম এখুনি, এই দেখ।"

বিনয় মন্দাকিনীর ছোট ভাই। কবি বইটা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

তাঁর কাব্যলোক অন্তর্হিত হল এবং পরমুহূর্তেই তাঁকে পানসে কালি দিয়ে লেখা বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ অর্ধমলিন পোস্টকার্ডটিতে মনোনিবেশ করতে হল। "শ্রীচরণেষু"তে 'শ' এই প্রথম দেখলেন।

মন্দাকিনী বলে চলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত ওইখানেই হল, দেখলে তো! কত ফরকটই তুলেছিল। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে—। হলই বা আই. সি. এস.। তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকলে তার সঙ্গেই বিয়ে হত। কিন্তু ও মেয়ে দিয়েছে আমার ভাইয়ের হাঁড়িতে চাল, হবে কি করে অন্য জায়গায় বিয়ে? তারিখের কথা লেখেনি। অথচ বাজে কথা লিখেছে একটি গাদা।

হরেন সিঙ্গির বিধবা বোনের কালাজ্বর হয়েছে, মানিক চাকরি পায়নি, বিপিনবাবুদের গাই বিইয়েছে। কাজের কথা শেষ করে জায়গা থাকলে লিখতিস এসব। তা নয় রাজ্যের বাজে কথা লিখে ভরে দিয়েছে পোস্টকার্ডটা।"

"বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয়নি হয়তো।"—সন্তর্পণে কবি বললেন।

"দেনা-পাওনাও কি ঠিক হয়নি এখনও? সেইটেই তো আসল। বিনয়ের পছন্দ হয়েছে মেয়েকে খুব তা মানি, কিন্তু তা বলে একেবারে ফাঁকি দেবে নাকি? আমাদের নমস্কারী টমস্কারীগুলো তো নিশ্চয়ই দেবে। আই. সি. এস. না হতে পারে, কিন্তু বিনয়ও আমাদের ফেলনা ছেলে নয়। কি রূপ, কি গুণ! ওভারসিয়ারি করে মাসে চার-পাঁচশো টাকা রোজগার করে। অসময়ে বাবা মারা গেলেন তাই, তা না হলে ও ছেলেও আই. সি. এস. হত।"

বকবক করে ক্রমাগত বলে যেতে লাগলেন মন্দাকিনী। কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে শুনে যেতে লাগলেন। বিনয়ের কথা থেকে এল মাসীমার কথা, তারপর যোগেনের বিয়ের কথা, তারপর বরযাত্রীর কথা, তারপর আজকালকার অগ্নি-মূল্য জিনিসপত্রের কথা, মাছ-তরকারির কথা, ধোপার কথা, সুন্দরী গরুর কথা....

কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এও একরকম হাঁস। নারী-বেশিনী হাঁস। মন্দাকিনীর অজস্র কথার মাঝখানে তিনি যে শুনতে পেলেন,

আংগাংক্, আংগাংক্, আংগাংক্.....সেই চিরন্তন ডাক চিরপথিক হংসযাত্রীর—যে।

স্থির-লক্ষ্য চলিয়াছে বেগবান নিজ পক্ষ-রথে
ঝড়ে জলে অন্ধকারে অরণ্যে পর্বতে।

।। দশ ।।

ডানা চুপ করে বসেছিল বারান্দায়। কিছুক্ষণ আগেই চেয়ার টেবিল আলনা আলমারি পৌঁছে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদবাবু। অনেক আশ্বাসও দিয়ে গেছেন। কিন্তু ঠিক যে ধরনের আশ্বাসকে মানুষ নির্ভরযোগ্য মনে করে, সে আশ্বাস পায়নি এখনও ডানা। বাইরের কোনও লোক সে আশ্বাস দিতে পারে না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তা উৎসারিত হয়। তার মনে হচ্ছিল যে, তার চারিদিকে পুঞ্জিভূত হয়েছে যে কুয়াশা, তা খানিকক্ষণ পরে অপসারিত হবে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—তবু কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকবে। কোনও বাইরের লোকের বাচনিক আশ্বাসে তা ঘোচবার নয়। নিজের চোখে যাচাই করে নির্ভয় হতে হবে। কুয়াশার ভিতর যেটাকে দৈত্য মনে হচ্ছে, সেটা আসলে যে মানুষ তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না সে; নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক করছিল। তার মনের মধ্যে আর একটা সত্তা যেন গোপনে গোপনে কামনাও করছিল—আহা, ওটা সত্যিই যদি দৈত্য হয়। হলে যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবে শিহরন জাগছিল তার সর্বাঙ্গে। কৌতূহলে উন্মুখ এবং ভয়ে কণ্টকিত হয়ে বসে ছিল সে চুপ করে। অতীতের দিনগুলোও কেমন যেন ঝাপসা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। নিজের মায়ের কথা মনে নেই তার। বিমাতার সঙ্গে কলহ হয়নি, ভাবও হয়নি। তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা করে এসেছে সে এতকাল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে যাওয়াতে

যেন আরামই বোধ করছে। পায়ের টাইট জুতোটা খুলে গেল যেন চিরদিনের মতো, আর পরতে হবে না। বিমাতার সঙ্গে ভাব না থাকলেও ছোট বৈমাত্র ভাইটিকে ভালবাসত খুব। টুলটুলে মুখখানি। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকত। যখন হাসত, তখনও। ওইটেই ছিল যেন তার দৃষ্টিভঙ্গী। পৃথিবীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে যেন সে বলত, যা দেখছি তা সত্যিই ভাল না কি! চলে গেল কোথায় চিরদিনের মতো। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার। মনে পড়ে—এইটে ভাবতেই অবাক লাগে। বাবা যে থাকবেন না, তাঁকে যে মাঝে মাঝে মনে পড়বে, এই বিস্ময়কর সত্যটার বিস্ময় কিছুতেই যেন আর কাটছে না। ট্রেনের সহযাত্রীর মতো বাবাও এক জায়গায় নেবে গেলেন হঠাৎ নাম-না-জানা একটা স্টেশনে। দেখা হবে না আর কখনও। সে অথচ চলেছে। প্রতি-মুহূর্তে অতিক্রম করছে নিত্য নতুন পথ। অপ্রত্যাশিতভাবে পারিপার্শ্বিক বদলাচ্ছে। নতুন দৃশ্য আসছে আর চলে যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমেছে মনে হচ্ছে একটা নতুন স্টেশনে। অনেকক্ষণ থেমে আছে। নতুন যাত্রীরা উঠছে তার কামরায়। জিনিসপত্র নাবাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। কুয়াশা চারদিকে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মানুষ ওরা? এতকাল যে ধরনের মানুষ সে দেখে এসেছে, তাদেরই মতো, না, নতুন রকম কিছু? বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতূহল-ভয়, লোভ-আত্মসম্মান, পরস্পরবিরোধী আলোছায়ার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে একটা। দূরে কোথায় যেন কাঁসরঘণ্টা বাজছে, তার অতীতে জীবনটাই যেন উৎসব শুরু করেছে আর কোথাও। সে কেবল সরে এসেছে সেখান থেকে। ওরা কেউ কোথাও যায়নি, সে-ই কেবল সরে এসেছে। কথাটা মনে হতেই অদ্ভুত ধরনের ঠেকল। সে-ই কি একলা কেবল আসতে পারে? একটা জটিল জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের ভিতর। এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর কিন্তু সে আর পেলে না। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলে, বৈজ্ঞানিক আর কবি নদীর ধার থেকে এগিয়ে আসছেন তার দিকেই।

একটু এসেই বৈজ্ঞানিক বসে পড়লেন ভাঙা সিঁড়িটার উপর তার দিকে পিছন ফিরে, তারপর দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "পাখিটাকে আগে দেখে নিন ভাল করে।"

কবি দেখতে লাগলেন।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। ওই পাখিটাই ডাকছিল অমন করে? উকু কুক্ উকু কুক্ উকু কুক্—এই ধরনের ডাকটা, নয়?"

"ক-য়ের স্থানে প-ও দিতে পারেন : হুপো, হুপোপো—এ বললেও অন্যায় হয় না। ইংরেজী নাম ওর হুপো, হিন্দীতে বলে হুদ্‌হুদ্। Upupa Epops হল কেতাবী নাম।"

"ওর বাংলা নাম মোহনচূড়া দেওয়া যাক—মাথায় অমন চূড়া আছে যখন। হঠাৎ মনে হয়, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান যেন পাখির বেশ ধরেছে। নয়? ফর্‌র্ করে মাথার চূড়াটা আবার খুলে যাচ্ছে জাপানী পাখার মতো। চমৎকার তো!"

ডানা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছে হল একটু আলাপ করে গিয়ে, কিন্তু সঙ্কোচ হতে লাগল। তার মনের কথা টের পেয়েই কবি যেন ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন তার দিকে।

"নমস্কার। আসুন। পাখি দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কি চমৎকার একটা পাখি দেখুন!"

"কি নাম ওর?"

"ইংরেজী নাম হুপো, আমি নামকরণ করলাম মোহনচূড়া। বাংলা নাম আছে হয়তো কোনও, জানি না।"

"তিনটে রয়েছে দেখছি।"—ডানা বললে।

"আরও বেশি থাকে"—বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন—"ওরা একটু নির্জন জায়গায় চরতে ভালবাসে, অনেকটা ঘুঘুর মতন স্বভাব। ঠোঁটটা দেখুন ভাল করে, মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তাই অনেকটা পিক-অ্যাক্সের (Pickaxe) মতো। ওদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের বাসা। গাছের গুঁড়িতে বা পুরনো বাড়ির দেওয়ালের গর্তে ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখিটা গর্ত থেকে কদাচিৎ বেরোয়। পুরুষ-পাখি তখন খাওয়ায় স্ত্রীকে। এ বিষয়ে ধনেশ পাখির সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। ধনেশের ঠোঁটের সঙ্গেও এর ঠোঁটের মিল আছে একটু। স্ত্রী-পাখিটা বাসা ছেড়ে বেরোয় না বলে বাসার ভেতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সাদা ডিমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়। অদ্ভুত স্বভাব, নয়? এই পাখিদেরই মধ্যে আবার কোকিল দেখুন ডিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের বাসায় ডিম পেড়ে চলে আসছে।"

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হল, ডানা তাঁর কথা শুনছে না।

"চমৎকার দেখতে, নয়?"—বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করে আবার শুরু করলেন—"ওর বুকে যে রঙটা রয়েছে, সেটা ঠিক বাদামী নয়, ফন (fawn)। অনেকটা হরিণশিশুর গায়ের রঙের মতো। আবার পিঠের ডোরা ডোরা দেখলে মনে হয় জেব্রার গায়ের রঙ।"

তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কিছু বলছেন না যে?"

"আমিও মিল খুঁজছি"—হেসে উত্তর দিলেন কবি।

তারপর বললেন, "আমার বক্তব্য এখনই বলা যাবে না। লিখতে হবে।"

"পাখিগুলো উড়ে গেল"—ডানা বললে।

"চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। লিখে ফেলি কবিতাটা।"

সকলে পড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলেন।

কবি গিয়েই চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন টেবিলের পাশে। পকেট থেকে বেরুল ফাউন্টেন পেন আর খাতা। শুরু করে দিলেন লিখতে।

বৈজ্ঞানিকও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন, কিন্তু 'কির্‌র্ কির্‌র্' গোছের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে উঠে পড়লেন টপ করে এবং ছুটে নেবে গেলেন মাঠে, তারপর ঊর্ধ্ব মুখ হয়ে চোখে লাগালেন দূরবীন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। দুই বিপরীতমুখী স্রোতের কোনোটাতে গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারছিল না। তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। কোথায় কোন্ একটা অদৃশ্য নোঙর যেন আটকে রাখছিল তাকে।

"শুনুন।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন হঠাৎ।

ডানা নেবে গেল।

"নতুন ধরনের একটা পাখি দেখুন। ওই যে।"

ডানা দেখলে, পায়রার মতো একটা পাখিকে কয়েকটা কাক তাড়া করেছে।

"বাজ ওটা একটা। লাল-মাথা বাজ—Redheaded Merlin। এদের স্ত্রী-পাখিটাকে তুরমতী বলে অনেক জায়গায়। পাখি ধরার জন্যে পোষে অনেকে। কুনকী হাতীরা যেমন বুনো হাতী ধরে, এরা তেমনই নীলকণ্ঠ, হুপো, তিতির প্রভৃতি পাখি ধরে। ধরাটা যদিও একজাতীয় না। কুনকী ভুলিয়ে আনে, এরা ছোঁ মেরে ধরে। চেহারাটা সুন্দর। মাথা লাল, পিঠটা নীলচে, বুকে-পিঠে সাদার ওপর ছিটছিট। দেখুন।"

দূরবীনটা ডানার হাতে দিলেন।

"ওই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিন নিজের চোখের সঙ্গে।"

ডানা দেখতে লাগল।

সহসা বৈজ্ঞানিকের মনে হল, মেয়েটিকে বাজপাখির সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বোধ হয়।

"বাজের ঠোঁট আর পায়ের নখ লক্ষ্য করবার জিনিস। ওদের চেনবার আর একটা উপায় হচ্ছে ল্যাজের পালকের তলায় বেশ চওড়া ডোরা—Barred—দেখতে পেয়েছেন?"

ঘাড় নেড়ে ডানা জানালে, পেয়েছে।

"ঠিক এই রকম সাইজের আর এক রকম বাজ আছে। তাকে কেস্‌ট্রেল (Kestrel) বলে। তার মাথাটা কিন্তু নীলচে, পিঠটা লাল। এর ঠিক উল্টো।"

ডানা দূরবীনটা বৈজ্ঞানিকের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসল একটা, "একটু চা খাবেন?"

"বেশ তো"—বলেই বৈজ্ঞানিকের মনে হল, পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে মেয়েটির কৌতূহল ঠিক উদ্রিক্ত করতে পারলেন না তিনি। ভ্রূকুঞ্চিত করে অপস্রিয়মান ডানার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। গোড়ালির উপর শাড়ির পাড়টা চোখে পড়ল। মনে হল, ঠিক যেন শিকরা পাখির ল্যাজের তলার মতো। ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনুসরণ করলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "কই, কি লিখলেন, পড়ুন।"

ডানার দিকে কবি চাইলেন। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন উৎসুক।

"পড়ব? আশ্রমপীড়া হবে না তো?"

"না না। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। আপনি পড়ুন। কি নিয়ে লিখলেন?"

"যে পাখিটা দেখলাম এখুনি—মোহনচূড়া।"

"ও, পড়ুন।"

কবি পড়তে লাগলেন।

কি করিয়া মিল হল ঘুঘু আর ধনেশে
জেব্রা ও হরিণে
সে কথা ভাবিয়া আমি মরি নে।
আমি শুধু বার বার ডেকে বলি নিজেকে
কেবা কালো কেবা সাদা কেবা উঁচু নীচে কে
সত্য কে মিছে কে
তাহার হিসাব নিক যাহারা বৈজ্ঞানিক
তুই শুধু অঞ্জলি ভরি নে।

তুই শুধু দেখ্ রে পেখম মেলেছে মন
ও মোহন চূড়াতে
গরীব সখীর হিয়া জুড়াতে, না পুড়াতে!
চঞ্চল ও চলন শুধু চলাটুকু কি
উকু কুক্ উকু কুক্ শুধু উক্ কুকু কি
ওর সুখ দুখু কি
পেয়েছে কোথাও বাণী? কোন্‌খানে? কতখানি?
ছন্দেতে পারিস কি কুড়োতে?

"সুন্দর"—অস্ফুট কণ্ঠে বললে ডানা।

"বাঃ"—সোল্লাসে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

।। এগারো ।।

শীত শেষ হল। বসন্ত এসেছে। ঝরে পড়ছে অনেকে গাছের পাতা। ঝরতে না ঝরতেই দেখা দিচ্ছে নব মুকুলের আভাস, পাওয়া যাচ্ছে কিশলয়দের সাড়া। বাতাসে শীতের আমেজটুকু আছে, তীক্ষ্ণতা নেই। ভোরের দিকের কুয়াশায় নিবিড়তা নেই, স্বচ্ছতা এসেছে। মসলিনের টুকরোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। তিসির ফুল, যবের শীষ, গমের শীষ, মটর ফুল, অড়র ফুল ছেয়ে ফেলেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘেঁটু ফুল ফুটেছে চারিদিকে। শিমুলের কুঁড়ি ধরেছে। সজনে ফুলের শ্বেতগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে দু-এক জায়গায়। শিয়ালকাঁটার বনেও ফুল ফোটবার সাড়া পড়েছে, সোনালি ফানুস দুলছে গাছে গাছে। বটগাছে ফল ধরেছে অজস্র। আখ কাটা হচ্ছে। পেয়ারা পেকেছে। টুনটুনি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে। পুরুষ টুনটুনি পরেছে চকচকে কালো রেশমের বর-বেশ। উচ্চ রোল তুলে নীলকণ্ঠ প্রণয় নিবেদন করছে প্রেয়সীকে। বাঁশপাতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে মাটিতে। কাঠঠোকর'র ক্রেংকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেনেবউ ডাকছে নানা সুরে। টিউ—কৃষ্ণ গোকুলে—ও বউ হলুদ তোল—নানা রকম কথা বলছে সে। বুলবুলিরাও টুরু টুরু শুরু করছে ঝোপে ঝাড়ে। বসন্ত-বউরির আনন্দ-সঙ্গীত উৎসের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। টংক্ টং ক্ টংক্—ডেকে চলেছে ভগীরথ। চন্দুল আর ভরতের গানে লেগেছে নতুন সুর। খঞ্জনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে গরুদের কাছে কাছে। শকুনি, বাজ, মুনিয়াদের বাচ্চা হয়েছে, তাই নিয়ে ব্যস্ত তারা।

...অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরাট একটা পার্সেল নিয়ে। মালয় থেকে তাঁর একজন বন্ধু স্টাফ্‌ড় (stuffed) পাখি পাঠিয়েছিলেন কয়েক রকম তাঁর জন্মদিনের উপহার-স্বরূপ যুদ্ধের আগে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পার্সেলটা পৌঁছেছে এতদিন পরে। সর্প-ঈগলটা (Serpent Eagle) অতি অদ্ভুত রকম সুন্দর। ভীষণ অথচ সুন্দর, মাথায় পালক-গোঁজা সম্রাট যেন। কি দৃপ্ত ভঙ্গী, এর সঙ্গে এদেশী সর্প-ঈগলের মিল-অমিল কোন্‌খানে কতটুকু আছে তা তিনি বুঝিয়ে চলেছেন রত্নপ্রভাকে। রত্নপ্রভা গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। অনেক কিছুই বুঝছেন না, কিন্তু তাতে রস-ভঙ্গ হচ্ছে না। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এবং নীরব গাম্ভীর্য জমিয়ে রেখেছে

প্রসঙ্গটাকে। সাদা-কলার-ওলা চমৎকার মাছরাঙাটাও মন দিয়ে শুনছে যেন অমরবাবুর বক্তৃতা। ওটা যে মরাপাখি তা মনেই হচ্ছে না। বহুবর্ণ-বিশিষ্ট পিট্টা (Pitta) পড়ে আছে কাত হয়ে এক ধারে। পিঠে-চুল হলদে-বুক বুলবুলিটার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। লাল-ঘাড় নীল-পিঠ টিয়া বসে আছে গ্রীবাভঙ্গী করে। মৃত্যুও তার গর্ব অপহরণ করতে পারেনি যেন। ক্রমাগত বকে চলেছেন অমরবাবু। যে পক্ষীনিবাস তিনি তৈরি করতে চান, তার কল্পনায় মেতে উঠেছে তাঁর মন। রত্নপ্রভারও।

.....চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মন্দাকিনী। চৈত্র মাস এসে গেল, অথচ চাল কেনা হল না এখনও। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। মাঘের মধ্যেই সারা বছরের মতন চাল কিনে ফেলেন তিনি। এবারও ফেলতেন, কিন্তু রূপচাঁদবাবু দাঁও মাফিক কিনে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে অপেক্ষা করছেন। রূপচাঁদবাবুর কিন্তু পাত্তা নেই। একটি বিষয়ে মন খুশি আছে তাঁর। মনের মতো করে দুটি লেপ করাতে পেরেছেন এবার। চমৎকার ছিটটি। ধনুকর ডাকিয়ে সামনে বসে বার বার করে ধুনিয়ে, চক্রাকার সেলাই দিয়ে মনোমত করে করেছেন লেপ দুটি। রূপচাঁদবাবুর দৌলতেই হয়েছে। তাই আশা করছেন যে, চালের ব্যবস্থাটাও করে দেবেন উনি।

....উদ্গ্রীব আগ্রহে বকুলবালা দিন গুনছেন, কবে পাখি-ওলা হলদে পাখি বেনেবউ এনে দেবে তাঁকে। পাখি-ওলাটা রোজই বলে, এখনও পায়নি। অথচ সামনের আমগাছে প্রায়ই তো দেখা যায়। কি সুন্দর রঙ, সোনা ঠিকরে পড়ছে যেন গা থেকে। ওই রঙের শাড়ি আছে একখানা তাঁর। পাখিটা যখন আসবে, তখন তিনি যে কি করবেন, তারই কল্পনায় তন্ময় হয়ে আছেন তিনি। বেনেবউ এলে মদনলাল, সোহাগী হিংসেয় ফেটে পড়বে নিশ্চয়। তা পড়ুক, ওরা হিংসুটে বলে নতুন পাখি পুষবেন না তিনি বুঝি! আচ্ছা আবদার তো!

হলদে পাখির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বকুলবালার শিশুমন।

...সবজিবাগের পড়ো বাড়িটার কাছে যে নদীটা আছে, বর্ষার সময় তার কূল ছাপিয়ে যায়, আশেপাশের ডোবাগুলোতে জল ঢোকে এসে। মাছও ঢোকে। এইরকম একটা ডোবার ধারে ছিপ ফেলে বসে আছেন রূপচাঁদ। বকও বসে আছে কয়েকটি। মাথার উপর দিয়ে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। টেলিগ্রাফ-পোস্টের উপর বসে একটা ফিঙে পাখি ঝনৎকার দিয়ে ধমকাচ্ছে যেন কাকে। তীরের একটা গাছের পাতায় আত্মগোপন করে হাঁড়ি-চাঁচা মাঝে মাঝে 'কক্‌রিং কক্‌রিং' শব্দ করে প্রিয়াকে ডাকছে। রূপচাঁদের কিন্তু লক্ষ্য নেই এসব দিকে। ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন তিনি।

...ডানা বসে আছে চুপ করে বারান্দার উপর। আসন্ন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে তার মনেও, কিন্তু সজ্ঞানে সে অনুভব করছে না কিছুই। উতলা হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। অতীতের তীরভূমির দিকে চেয়ে আছে সে, দূরে সরে যাচ্ছে সেটা ক্রমশ। বর্তমানের নানা চিত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের স্বীকার করতে বাধছে, অস্বীকার করতেও পারছে না। অদৃশ্য ভবিষ্যতের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কোন্ অদৃশ্য কবি। অস্পষ্ট সুরটা শোনা যাচ্ছে কেবল, তাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তার সঙ্গে মিশছে এসে কোকিলের কুহু, পাপিয়ার 'পিউকাঁহা', বায়সের চিৎকার, বসন্তের সুরোচ্ছ্বাস। অনিবার্য বর্তমানের অকুণ্ঠিত অসংখ্য দাবি।

...নিজের তেতলার ঘরটিতে বসে কবি কবিতা লিখছিলেন।

আজ বিকেলে হঠাৎ যেন
দেখতে পেলাম পাঞ্চালীকে
ইচ্ছামতীর উচ্চ পাড়ে
খুঁজছে বাসা গাংশালিকে।

কঠিন গাছে কোমল গুটি
রঙিন হয়ে উঠছে ফুটি
ব্যাসের মুখে ফুটছে ভাষা
কোথায় তুমি অম্বালিকে।

জাগছে জীবন ভুবন-ভরা
সকল দ্বিধা শঙ্কা ঘোচে
শবের বোঝা সরিয়ে নে' যায়
মৃত্যু যেন সসঙ্কোচে।

জীবন-যাগের আগুন ফুঁড়ে
কৃষ্ণা জাগে বিশ্ব জুড়ে
স্বয়ম্বরের বিরাট সভায়
গান ধরেছে বৈতালিকে।

কৃষ্ণা আজও পার্থে মাগে
বহ্নি জ্বলে তন্বী-চোখে
শিক্‌রে বাজের পুলক জাগে
সমুদ্যত চঞ্চু-নখে।

সবুজ-লালে স্বর্ণ-পীতে
আগুন-মাখা বর্ণ-গীতে
কোন শবরী অর্ঘ্য সাজায়
বসন্তের এ বৈকালিকে।

ঝনাৎ করে কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। কবিতার খাতাটা তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেললেন কবি।

মন্দাকিনী খাতাটার দিকে এক নজর চেয়ে অসঙ্কোচে বললেন, "কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ তুমি সারাদিন বসে বসে! চালের ব্যবস্থা কর। রূপচাঁদবাবুর তো পাত্তাই নেই।"

অপ্রতিভ মুখে চেয়ে রইলেন কবি। কিছু একটা বলতেন হয়তো, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলেন। অঘটন ঘটে গেল একটা যেন। সুরের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ তুবড়ির মতো আকাশে উঠে

ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বাতায়নপথে শুনতে পেলেন এ বছরের প্রথম পাপিয়ার ডাক—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—। চোখের অপ্রতিভ দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর, মন উড়ে গেল আকাশে, গুনগুনিয়ে উঠল কবিতার দুটো লাইন—

চোখ গেলে কি গান ধরে কেউ
অমন ধারা তান তুলে?
চোখ যায় নি মন গিয়েছে
বল্ না সেটা প্রাণ খুলে।

মন্দাকিনী বিরক্ত মুখে চেয়ে ছিলেন স্বামীর দিকে। তাঁর বিরক্তির কারণ, তিনি নিজের আকাশে উড়তে পারছিলেন না। সবাই নিজের নিজের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

নদীর ধারের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটায় পাতা নেই। অসংখ্য লাল ফলে ভরে উঠেছে সেটা, আর তাকে কেন্দ্র করে সাড়া পড়ে গেছে পাখিদের মহলে! জোয়ারি, হাঁড়িচাঁচা, টুনটুনি, শালিক, গোশালিক, টিয়া, ছাতারে, কাক, বুলবুল—একটা হাট বসে গেছে যেন! কাকলী-কলরবে নদীতীর পরিপূর্ণ, আকাশটাও হুমুড়ি খেয়ে পড়েছে যেন কৌতূহলভরে। নদীর স্বচ্ছ শীর্ণ ধারাতেও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, অসংখ্য ঊর্মির শিহরন জেগেছে যেন তার স্রোতোধারায়। নদীর ওপারে শুভ্র সৈকত। তার ওপারে মাঠে, গম যব মটর ছোলার ক্ষেত। শ্যামাকান্তি নেই আর তাতে। শিশু-প্রাণের সবুজ অবুঝ উচ্ছলতা আর দেখা যাচ্ছে না, যৌবনের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছে চারিদিকে, ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে সফল সৌন্দর্যের সার্থক মহিমা। লুটিয়ে পড়েছে।

...মুগ্ধনেত্রে দেখছিলেন আগন্তুক পথিক! পদ্মাসনে ঋজু-মেরুদণ্ড হয়ে বসে ছিলেন তিনি সেই পড়ো ঘরটির সামনের চাতালে। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে। আরও কাটবে বোধ হয় কিছু কাল। এঁরা যতদিন না আপত্তি করেন, থাকবেন তিনি এখানে। থাকবার যে বিশেষ একটা আগ্রহ আছে তা নয়! আগ্রহের সঙ্গত কারণ যদিও আছে একটা, কিন্তু সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। থাকবেন, কারণ কোথাও তো থাকতে হবে! এ জায়গাটা ভাল লাগছে। নদীতীর বেশ নির্জন। যে মেয়েটি ওই বাড়িতে থাকে আশঙ্কা ছিল, সে হয়তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না, ও-বাড়িতে কোনো লোক আছে বলেই মনে হয় না। সামনের বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারে বসে থাকে চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে। কখনও পড়ে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও আসে, খোঁজখবর নেয়। প্রশ্নও করে দু-একটা এমন বিষয়ে যাতে মনে হয়, মেয়েটি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। আগন্তুক হাসেন মনে মনে। ভাবেন, সবাই হাতড়াচ্ছে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না। ....ভাল লাগে মেয়েটিকে! হয়তো পিপাসা জেগেছে। মনে পড়ে যায় পুণার মুসলমানী সন্ন্যাসিনী হজরৎ বাবাজানের কথা। মুখময় বলিরেখা, মাথায় শুভ্র কেশভার। চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল, যেন পাখা মেলে উড়তে চাইছে অজানার উদ্দেশে। ডানাকে দেখে শঙ্কা হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রথম। এখন আর ভয় নেই। যে অনর্থ আশঙ্কা করে মহাজনরা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন, সে অনর্থের সম্ভাবনা ডানার মধ্যে লক্ষ্য করেননি তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে। তার তূণে অসংখ্য মোহিনী বাণ আছে তা সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে যখন আসে, তখন তূণটা ঢেকে রাখে। তখন তার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, তাতে কুহকিনীর ইন্দ্রজালের আভাসমাত্র দেখতে পাননি তিনি একদিনও। বরং পথহারার অনিশ্চিত ব্যাকুলতাই লক্ষ্য করেছেন মাঝে মাঝে।

পুষ্পিত শিমুলগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অসংখ্য লাল ফুল, বিচিত্র-বর্ণ অসংখ্য পাখি, অসংখ্য রকম কাকলী। ....ডানাও আছে ওর মধ্যে, তিনি নিজেও। অনন্তমুখী অনন্ত লীলার স্রোতে ভেসে চলেছেন স্বয়ং ভগবান, দেহ এবং দেহাতীত একসঙ্গে।

এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

।। দুই ।।

রূপচাঁদ যখন ডানার কাছে এলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সূর্যাস্তের রক্তিমাভা যদিও লেগে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, কিন্তু অন্ধকার আসন্ন। রূপচাঁদ আপিস-ফেরত প্রায়ই আসেন আজকাল ডানার কাছে। অজুহাতের অভাব হয় না। শুধু তাই নয়, অজুহাতটা যে দরকার তাও মনে হয় না সব সময়ে। নানা প্রয়োজনে প্রত্যহ আসেন। কোনোদিন না এলেই বরং ডানা বিস্মিত হয়।

সেদিন এসেই রূপচাঁদ যে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন তাও নতুন নয়, কয়েক দিন থেকেই কথাটা বলছেন তিনি। ডানা মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি এখনও। রূপচাঁদ এসে গলার পাকানো চাদরটি খুলে রোজ যেমন রাখেন আজও তেমনই রাখতে যাচ্ছিলেন কপাটের উপর।

ডানা বললে, "আলনা থাকতে ওখানে রাখা কেন? দিন।"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে এবং ঘাড়টা একটু নামিয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে, যার অর্থ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তুমি নেবে? এই ঘামেভেজা চাদরটা তোমার হাতে দেওয়া ঠিক হবে কি? কিন্তু এর গভীরতর যে অর্থ রূপচাঁদের মনের অন্তরালে ছিল, তা ডানা টের পাচ্ছিল না। সেটা হচ্ছে—তাই নাকি? আমার চাদরের সম্বন্ধে মমত্ব-বোধ জেগেছে নাকি তোমার? এইটেই তো প্রত্যাশা করছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে চাদরটা তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট নিয়ে সন্তর্পণে ঠুকতে লাগলেন সেটা সিগারেট-কেসের উপরে।

ডানাই আবার প্রশ্ন করলে, "দেশলাই আছে তো?"

"আছে।"

পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরালেন, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? আমি আজ ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ অব্‌ স্কুলসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন—হয়ে যাবে। তুমি দরখাস্তটা করে দাও।"

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেসের পদটি খালি আছে। রূপচাঁদের ইচ্ছা, ডানা সেটির জন্য দরখাস্ত করুক। ডানার কিন্তু ইচ্ছা নয় তেমন। অথচ আর্থিক পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে ক্রমশ যে, অর্থাগমের কোনও একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। সেটা যে কি করে সম্ভব হবে তা তার জানা নেই—রূপচাঁদবাবুর এই প্রস্তাবে তার অবিলম্বে রাজি হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই সে মনঃস্থির করে উঠতে পারছিল না। সে বিদ্যা অর্জন করেছিল মানসিক সংস্কৃতির জন্য, চাকরি করবার জন্যে নয়! তাকে যে কোনও দিন চাকরি করতে হবে—এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করেনি কখনও সে।

রূপচাঁদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "মুদির দোকান থেকে চাল ডাল তেল ঘি দিয়ে গেছে সব?"

"হ্যাঁ, গেছে।"

"আনন্দ তোমাকে যে চাকরটা এনে দিয়েছে, সেটা কাজ করছে তো ভাল করে? না হলে বল, আমার হাতে একটা ভাল চাকর এসেছে, রাঁধতেও পারে।"

"না, এ বেশ কাজ করছে।"

"মাইনে কত ঠিক হয়েছে?"

"আমি কিছু ঠিক করিনি। আনন্দবাবু কিছু বলেননি আমাকে।"

"আগে থাকতে ঠিক করে নেওয়া ভাল। পরে গোলমাল না হয়। আনন্দ কি এসেছিল এর মধ্যে?"

"কাল এসেছিলেন।"

"ও।"

চুপ করে গেলেন রূপচাঁদ। ডানাও চুপ করে রইল। একটা অদৃশ্য রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল দুজনাকে ঘিরে। সিগারেটে টান দিয়ে রূপচাঁদ হঠাৎ বলে উঠলেন, "দু-চার দিনের মধ্যে জন মজুর এসে পড়বে। কালই আসত, আজকাল যা পায়া-ভারী ব্যাটাদের। কনস্টেবল পাঠিয়ে তবে ঠিক করতে হয়েছে। আসবে ঠিক।"

"জনমজুর কেন?"

"সামনেই বর্ষা। এই প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি, না সারিয়ে দিলে থাকাই যাবে না।"

"কিন্তু সারাতে গেলে অনেক খরচ পড়ে যাবে যে।"

"তা পড়বে বইকি। বাঁশ দড়ি খাপরা সবই অগ্নিমূল্য আজকাল। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অমরেশের টাকার অভাব নেই।"

রূপচাঁদের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"তার বাড়ি সে-ই সারাবে। আমি শুধু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, মানে—ঝঞ্ঝাটটা পোয়াচ্ছি।"

এই শেষ উক্তিটি করে রূপচাঁদ ডানার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার অর্থ—তোমার জন্যেই পোয়াচ্ছি।

ডানা লজ্জিত হয়ে পড়ল। শুধু লজ্জিত নয়, শঙ্কিতও হল। তার মনে হতে লাগল, একটা বেড়াজাল ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে তার চারিদিক ঘিরে। একটি মাত্র ফাঁক আছে—স্কুলের চাকরি নেওয়া। পরের দাক্ষিণ্যের উপর কতদিন থাকবে সে এমন করে? দাক্ষিণ্যের কি প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে এরা?

"আচ্ছা, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের কি কোয়ার্টার্স আছে?"

"না। যতদিন কোয়ার্টার্স না হচ্ছে, ততদিন তারা মাসে পঁচিশ টাকা করে ভাড়া দেবে। এই বাড়িটাই নিতে পার তুমি, এইটে নেওয়াই সুবিধে, কারণ অমরেশকে যে ভাড়া আমি বলব তাতেই রাজি হয়ে যাবে সে। পঁচিশ টাকা দিয়ে শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি তুমি পাবে না। খালি বাড়িই নেই। তোমার জন্যে খুঁজতে কসুর করিনি তো।"

এই কথায় ডানা আবার মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সহসা আর একটা কথা মনে পড়ল তার। রূপচাঁদবাবু কেমন সহজে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন। যদিও এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নেই, আমাদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠকে তুমিই বলে থাকে সাধারণত; তবু কিন্তু প্রথম যেদিন শুনেছিল, সেদিন কেমন একটু খটকা লেগেছিল। অমরেশবাবু, আনন্দবাবু—এঁরাও তো আসেন কিন্তু এঁরা কখনও 'তুমি' বলেন না তো! অবান্তরভাবে হঠাৎ সে ঠিক করলে, ওঁদেরও আর সে 'আপনি' বলতে দেবে না। ওঁদেরও অনুরোধ করবে 'তুমি' বলবার জন্যে। রূপচাঁদবাবু একাই ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার দাবি করবেন কেন? কিন্তু তখনই আবার মনে হল, রূপচাঁদবাবু দাবি করতে পারেন বইকি। একা এই বিদেশে

রূপচাঁদবাবু না থাকলে কি করত সে? রূপচাঁদবাবুই তো তাকে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন এবং এখনও প্রতিদিন কিসে তার সুবিধা হয় তারই চেষ্টা করছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই সে লক্ষ্য করেনি, যা সন্দেহজনক।.....সে অন্যদিকে চেয়ে ভাবছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রূপচাঁদবাবু নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সে চাহনি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা আতঙ্কজনক নয়, অথচ ঠিক আশ্বাসজনকও নয়।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ডানার দিকে চেয়ে থেকে রূপচাঁদ বললেন, "তুমি দরখাস্তটা করে দাও আজই। কারণ পরশু দরখাস্ত দেবার শেষ দিন।"

"ভাবছি—"

রূপচাঁদ ভাবনাটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন মনে মনে। কিন্তু ওই একটি কথা বলেই ডানা থেমে গেল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলে, তার মনের নিগূঢ় কথাটা কি সে নিজেই জানে না ভাল করে।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে?"

"অচেনা জায়গা চেনা হতে কদিন লাগে?"

"আমার বেশ একটু দেরি লাগে।"

"রেঙ্গুন ছাড়া আর কোনও চেনা জায়গা আছে কি তোমার?"

"না, তাও নেই।"

"তবে?"

এই ধরনের 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত, সহসা কিছু বলা যায় না। ডানা চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা করে মুখটা লাল হয়ে উঠল তার, দুঃসহ একটা বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে বলে ফেললে, "তবে এটা ঠিক যে, এখান থেকে যাবার আগে সকলকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে তবে যাব। আমার দু-একখানা গয়না আছে এখনও।"

একটা স্নিগ্ধ হাস্যে রূপচাঁদের মুখভাবের তীক্ষ্ণতাটা কোমল হয়ে এল। বিদেশিনী বিদুষী এই তরুণীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি যেন। ধরবার ছোঁবার মতো কিছু যেন পেলেন একটা। এতদিন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেতাদুরস্ত মৌখিক ভদ্র আলাপের মুখোশ বিভ্রান্ত ব্যাহত করছিল তাঁকে এতদিন। আজ তাঁর কণ্ঠস্বরে-অভিমানের সুর ধ্বনিত হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি।

হেসে বললেন, "দেখ, সস্তা কবিত্ব করবার ভারি সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছ তুমি। এখনই তুমি যা বললে, তার উত্তরে অনায়াসেই বলতে পারতাম, গয়না-বিক্রি করা টাকা দিয়ে সবরকম প্রাপ্য শোধ করা যায় না এবং সেটা মিথ্যা কথাও হত না। কিন্তু আমি ওসব বলব না। আমি বরং বলব—হ্যাঁ, নিশ্চয়, সকলের ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করতে হবে বইকি। তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। আর তোমার মতো মেয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—এর চেয়ে শোচনীয় ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না। গয়না বিক্রি না করেও যাতে সেটা হয়, সেই চেষ্টাই করছি আমি তাই গোড়া থেকে। আর একটা কথাও তোমার মতো মেয়ের বোঝা উচিত যে, গয়না বিক্রি করে ধার শোধ করাটাও এক হিসাবে আত্মসম্মানহানিকর। উপহারের মর্যাদাকে প্রয়োজনের তাগিদে বিসর্জন দেওয়াটা কি ভাল?"

একটানা এতগুলো কথা ডানাকে তিনি বলেননি ইতিপূর্বে। তাঁর নিজের কানেই কথাগুলোর অতি-নাটকীয়তার ঢঙটা বিশ্রী ঠেকল। মনে হল, রাশটা বোধ হয় বেশি আলগা করে ফেলেছেন! অপ্রতিভ হলেন নিজের অক্ষমতায় এবং পরমুহূর্তেই এমন ভাবে সংযত করলেন নিজেকে যে, মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে সিগারেটে টান দিলেন আর একটা, এবং নাক মুখ দিয়ে যে ধূম উদ্‌গিরণ করলেন তা দেখে ডানার হঠাৎ মনে হল, ও সিগারেটের ধোঁয়া নয়—আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "আত্মসম্মানের চুলচেরা বিচারই যদি করতে হয়, তা হলে আর একটা কথাও ভাবা উচিত।"

ডানার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "কি সেটা?"

"ঠকানোটা কি আত্মসম্মানজনক?"

"তার মানে?"

"যা আমি জানি না, তা করবার ভান করে বেতন নেওয়াটা কি ঠকানো নয়? ইতিপূর্বে কখনও আমি মাস্টারি করিনি। আমার বিশ্বাস, ও বিষয়ে আমার তেমন কোনও যোগ্যতাও নেই; একটা ডিগ্রী থাকলেই যোগ্যতা হয় না।"

"সত্যি সত্যি তোমার যাতে যোগ্যতা আছে বলে আমি মনে করি, তদনুসারে চলতেও তোমার বিবেকে বাধবে"—বলেই রূপচাঁদ থেমে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবার বললেন, "সেটা কি, তাও বলতে আমার বাধবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনিই বিচিত্র এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদ এতই প্রবল যে, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবার সুযোগ আমরা প্রায়ই পাই না। জীবনে সকলকেই আপোস করে চলতে হয় সব দিকে বাঁচিয়ে। আমি এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিলাম, কেমিষ্ট্রিতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল. কিন্তু সারা জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে পুলিশ-সায়েবের কেরানিগিরি করে। কেরানি হবার যোগ্যতা আমার ছিল না—" ...হঠাৎ আবার থেমে গেলেন রূপচাঁদ। মনে হল, সস্তা হৃদয়াবেগের আবর্তে খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচম্বিতে এসে অবাক করে দিল তাঁকে। মনে হল এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বললে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে তাঁর। নিগূঢ় বেদনার উৎসমুখে যে কঠিন পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল, সেটা নড়ে উঠল সহসা যেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতার শ্মশানভূমি থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া হাহাকার করে চলে গেল যেন তাঁর অন্তরতম সত্তার ভিতর দিয়ে। মনের এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেন তিনি। রাগও হল। এমনভাবে বিচলিত হওয়ার মানে কি? সিগারেটটার দিকে এক নজর চেয়ে টান দিলেন তাতে দু-একটা, তারপর ফেলে দিলেন সেটা।

ডানা হেসে জবাব দিলে, "আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। কিন্তু অযোগ্য কেরানী দেশের তত অনিষ্ট করে না, যত করে অযোগ্য মাস্টার বা অযোগ্য ডাক্তার। এদের হাতে দেশের প্রাণশক্তির ভার আছে। অত বড় ভার নেবার সাহস আমার নেই।"

"কি করবে তা হলে ঠিক করেছ?"

"আমি ভাবছি চলে যাব এখান থেকে। কলকাতা কিম্বা বম্বে।" রূপচাঁদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"সেখানে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব একটা। ধরুন, টেলিফোনে

কাজ পেয়ে যেতে পারি, কেরানীগিরিও পেতে পারি কোথাও, শর্টহ্যান্ড টাইপ রাইটিং জানা আছে আমার। তা ছাড়া গানবাজনা শিখেছিলাম ভাল করে—তাও শেখাতে পারি। বড় বড় শহরে অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় মাস্টারি ছাড়া অন্য গতি নেই।"

"তা ঠিক।"

যুক্তিযুক্ত কথার প্রতিবাদ করা রূপচাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখে আশঙ্কার ছায়ার সঙ্গে তিক্ত বিদ্রূপের এমন একটা সম্মিলিত রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠল, যা প্রতিবাদের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "তুমি যদি আমার নিজের লোক হতে, তা হলে তোমাকে এর আর একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই।"

শশব্যস্ত হয়ে ডানা বলে উঠল, "না না, ও কথা বলছেন কেন? পৃথিবীতে আপনারাই এখন আমার একমাত্র আত্মীয়। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমার যে কি হত, তা জানি না। আপনাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না। আমি ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে অন্যভাবে উপার্জনের পথ একটা পেতাম হয়তো। মাস্টারি আমি করতে পারব না।"

ঘাড়টা একটু নীচু করে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়েছিলেন রূপচাঁদ অর্ধনিমীলিত নেত্রে। মনে হচ্ছিল, ডানার কথাগুলো উপভোগ করবেন কি না প্রণিধান করছেন। শুনে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "সত্যিই যদি তুমি আমাকে নিজের আত্মীয় বলে মনে কর, তা হলে বলছি শোন—তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।"

"এমন ভাবে থাকা যায় নাকি?"

"কেমন ভাবে থাকতে চাও বল, তারই ব্যবস্থা করছি।"

"ব্যবস্থা তো করছেন, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছে।"

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলেন রূপচাঁদ, "তোমার এ অস্বস্তি কেন জান?"

"কেন বলুন?"

"তুমি সত্যি আমাকে আত্মীয় বলে ভাবতে পারছ না। পারলে তোমার এ অস্বস্তি হত না। তুমি মুখে আমাকে আত্মীয় বলছ, অথচ তোমার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি তোমার জন্যে সামান্য যা করছি, তার বদলে তুমি কি করবে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে মনে, অথচ ভেবে পাচ্ছ না কি করে সেটা করবে।"

অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি হেসে ডানা জবাব দিলে, "ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনাদের আত্মীয় বলে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যবহারে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছে।"

"কেন?"

আবার একটু হেসে ডানা জবাব দিলে, "কি জানি।"

রূপচাঁদও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "জটিল মনস্তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। ঋণ পরিশোধ যদি করতে চাও করো। কিন্তু তার জন্যে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রতীক্ষা করবার মতো ধৈর্য আমার আছে...।"

ধৈর্যভরে কেউ ঋণ-শোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে—এ চিত্রটা আরও অস্বস্তিকর বলে মনে হল ডানার। কিন্তু সে চুপ করে রইল।

"দরখাস্ত তা হলে করবে না, এই ঠিক হল তো?"

"হ্যাঁ। ওসব থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তা হলে চাদরটা দাও, এবার উঠি।"

"এখনই যাবেন? চা করতে বলেছি।"

"তা হলে চা-টা খেয়েই যাই।"

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নতুন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব বলে মনে হল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, "দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি যখন তোমার ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হলে আমার পক্ষে সেটা সহজ হত। টাকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মতো একটা জবাবদিহি থাকত।"

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা বলে উঠল, "কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—"

বলেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ করেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

"তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে।"

"আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হলে অপরের মতামতের তোয়াক্কা তত করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না।"

"ও।"

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না করে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

"চাদরটা দাও, এবার যাই।"

ডানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলে সেটার দিকে।

ডানা ফিরে আসতেই বললেন, "একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস করে পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস-করাই ভাল বোধ হয়।"

"কি কথা?"

"আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এতে আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোনোরকম সন্দেহ হয় না তো আমার সম্বন্ধে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন ডানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সত্যি কথাটা সোজা করে বলতে পারলে না ডানা।

একটু হেসে বললে, "সে রকম কোনও কারণ ঘটেনি তো এখনও।" ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, 'যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় বলে মেনে নিতে আপত্তি নেই তা হলে?"

"এত ভূমিকা কিসের বলুন তো—"

"তা হলে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে।"

খামটা দেখালেন।

"কি ওটা?"

"আমি চলে যাবার পর খুলে দেখো।"

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ডানা। তারপর মনঃস্থির করে ফেললে।

"আচ্ছা দিন।"

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ডানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সঙ্গে ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা। চিঠির মর্ম ঃ—অতিশয় সসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, ঋণস্বরূপই নিও। যখন সুবিধে হবে, শোধ দিও। বলাবাহুল্য, আমার দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না—নীচে কোনও নাম নেই।

ডানা নোটখানা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদবাবুর উপর রাগ হল না। সঙ্কোচও হল না তেমন কিছু। তবে তার অজ্ঞাতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করছে, তারই করাল ছায়া মুখের উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা যখন বর্মা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, পালিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে! ভীত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের উপর আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিল একটি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা ডাল-চালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘণ্ট, সারি সারি পাতা পেতে দিচ্ছিল সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন দিন কোনও খাবার পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে না। খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে বসে আছে চুপ করে। লোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে বসে আছে চুপ করে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি খাচ্ছেন না

কেন?" লোকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, "হ্যাঁ খাব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন।" কর্মকর্তা বললেন, "কি বলুন?" একটু ইতস্তত করে লোকটি বললে, "আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা আলাদা জায়গায় দেন!" কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই খেতে দিলেন তাকে। ডানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি পংক্তি থেকে আলাদা জায়গায় বসে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বোকার মতো হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াইশো কাঙালী ভোজন করাতাম। এখন আমি সর্বস্বান্ত তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতে পারছি না।"—আবার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ করে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্মায়, একটি জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেননি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হল রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন। নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

"আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোনো দুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে।'

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হল দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, "কাগজ আছে?"

"চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা।"

তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।

ডানা টেবিলের কাছে সরে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
    মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
    গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি?

তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
    হয়তো নয় তা সাবেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
    আপনার সুরে আপনি আত্মহারা
তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
    আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

দুই অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি।

ডানার সহসা মনে হল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো টাকার নোট একই জিনিসের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে মনে হল, প্রেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

।। তিন।।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির পেছন দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় বসে। এটা তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পাননি তিনি। এটাকেও এতদিন খুঁজে পাননি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক তার নোটবুক বার করে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটাকে কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা মনে জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় এদেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। সিন্ধু, করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চলে আসে—এ কথা লাহা মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই

অঞ্চলেই চলে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে একটু খোঁজ করতে হবে! দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর। গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলেন না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া করে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর একটা দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খেয়ে অপরাধীর মতো পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল। তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হল না! একথা বইয়ে পড়েছেন এর আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকায় কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিকটা 'এজমালি' এলাকা সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতীয় দোয়েলটিই প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী কাজ করেছে তা বেশ জানে, তাই অপরধীর মতো সরে পড়ল তাড়া খেয়েই! কিন্তু এজমালি এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করতে রাজি নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গেলে তার দিকে, দ্বিতীয়টা তুড়ুক করে সরে বসল আর একটা ছোট ডালে আর তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হল, এটা গান তো নয়ই, হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি বলছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হঠার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হল বেচারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, টিকে থাকা অসম্ভব হল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ দিয়ে। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না, ফিরে এসে বসল নিমগাছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের নোট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ আর আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে নিমগাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর দক্ষিণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে এই দোয়েলটির স্বরাজ্য।......এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল গাছটাতে, আমগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু তার ওপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনটুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে ছোট্ট একটু লাল জ্বলছে আগুনের মতো। চি হুইট্ চি হুইট্, চি হুইট্.....মুখ উঁচু করে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখি উড়ছে একদল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পাপিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

....ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হল, তিনি যেন কোন অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, সেখানে সুর আর রঙ ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন যে, দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, অন্যমনস্ক হলে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন করে একমুখী করে রাখা সম্ভব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। দোয়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিমগাছের উঁচু ডালে বসে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন অদৃশ্য পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর

করে। একটু আগে যে পাখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, টিয়ার ঝাঁক বসেছে পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি দোয়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়প্রীতি মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্ররকম মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, তবু তারা সুখী হবে না। হিংসায় জ্বলে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যেই পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিতজ্ঞ যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমনই জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান—থিয়োরিটা খাড়া করে ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই প্রেম হয়। যার সঙ্গে কোনোদিন চেনাশোনা ছিল না, সে-ই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ। আগে সভ্য সমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হল তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হল, পরের মেয়েকে গৃহিণী করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হয় অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন। চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যেন কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র করেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, ওরই উদ্দেশে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল। যদিও গায়ের রঙ পুরুষ পাখিটার মতোই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, একটু পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু এই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর শ্রী আছে একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখিটা উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন। পিছনে একজন চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, "কোথায় রাখব?"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মতো।

"ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘিরে দিতে হবে কিন্তু। আর আমার কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি! কাছাকাছি আমাদেরও বসবাস একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা!"

"আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়।"

"বেশ তো, তা হলে চমৎকার হবে।"

"ওই উঁচু জায়গাটায় দিই?

"তা হলে তো গ্র্যান্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু। মানে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—"

"বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি।"

"ও চল।"

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

"ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করব ভাবছি।"

"কি?"

"দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক্, চলুন।

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে কবি আর বৈজ্ঞানিক বসে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে বসে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর বসে ঘাড় নেড়ে কত কথাই বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ বলে মনেই হয় না। উৎক্রোশ বা শিক্‌রে-জাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলকণ্ঠেরও একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম, অতিপরিচিতা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললেন, "আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে থাকতে হবে ঠিক নেই।"

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরিগিটির মতো মাথা তুলে নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক করে বেড়াচ্ছিল, সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অতি দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়
আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নী।
ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে বসে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়।

সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেড়ার নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

"এসেছে এইবার।"

ফিসফিস করে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ করে শালিকটাও উড়ে গেল। তুড়ুক করে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। নেমেই ছোট্ট একটা ফড়িং ধরে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ করে ফেললে! তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে পড়ে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে দেখতে পেলে আয়নায়।

পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। চিকচিক করে গলা থেকে শব্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন দুটো। তারপর ঘাড় ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক করে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার দিকে। ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক করে শব্দ হল। বৈজ্ঞানিক ফোটো নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু আয়নায় প্রতিহত হয়ে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের পেয়ারাগাছের ডালে, আর সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন করে সুরের শায়ক বর্ষণ করতে লাগলে সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল.

বৈজ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপছে পড়ছিল।

"দেখলেন?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বইকি।"

"পাখিটার চোখ দুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি?"

"লক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু?"

"বাঃ, ছিল বইকি! চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ওইটেই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক তুড়ুক করে নাচে, গানও গায়।"

"মানে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম?"—হেসে বললেন কবি।

"না, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়।"

"অন্যরকম মানে?"

"মোলায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের।"

বৈজ্ঞানিক নিজের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

তারপর বললেন, "দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে অন্য দেশে চলে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেনে কি করে? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চারিং' (Posturing)। ওদের তাড়া করে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধরনটা প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষপাখিটা ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে।

অচেনা পাখিটি যদি চুপ করে থাকে কিংবা গুটিসুটি মেরে বসে পড়ে, তা হলে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-পাখি। কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিংবা তেড়ে আসে, তা হলে বোঝা যায়, সেটা পুরুষ পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না। কারণ স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে দেখে ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠিক সে রকম করে কি না। একটু আগেই যা দেখলাম—দেখুন দেখুন, দেখলেন? একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাঁচার পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই দিক দিয়ে গেল।"

"দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?"

"হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে।"

"বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?"

"খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কাকের নিকট-আত্মীয় কিনা, সেজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত।"

"কি বললেন নাম?"

"হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি পাই (Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—"

"বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচাঁচা নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। হিন্দি নাম নেই?"

"আছে। কোট্রি মহোখা।"

"সেদিন যে মহোখা বলে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম 'কুকো'?"

"হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinesis।"

'কুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। হাঁড়িচাঁচাকেও নতুন নাম দিতে হবে একটা।"

"চুপ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে।"

দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে বসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরে দিলে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'চমৎকার। নয়?"

কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ,
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

ধরা-গলায় বললেন, "সবজিবাগের বাড়িতে ডানা বলে যে মেয়েটি থাকেন, তিনি এসেছেন।"

"তাই নাকি?"

শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।

কবি কেবল বললেন, "ও!"

তাঁর চোখের দৃষ্টি অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

ডানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে বসে ছিল বাইরের ঘরটাতে মনে মনে কিন্তু তার কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে, কিন্তু কামনা করছিল, আহা যদি অন্যরকম হয়ে যায়! গম্ভীর প্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে খাবারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধরে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই অভ্যর্থনার প্রয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না বিদুষী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন না। কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-গলায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কালো মুখখানিতে তাই একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর অক্ষমতাজনিত লজ্জা অভিজাতসুলভ ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটি ভাব হয়েছিল, স্বল্প পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাসবার চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত করে দু-চারটি কথা বলে সহসা আবার এত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যক্তিটি কি রকম। রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী বলেই মনে হয়নি। ভেবেছিল, মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোশাক পরে আছে। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মার্জিত মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন এক মেয়েকে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেননি। ভারী ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাললাগাটাকে কিছুতেই তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক কি ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও যে তাঁর নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জটিল মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখে মুখে আলাপ জমছিল না কিছুতেই।

ডানা স্মিতমুখে চুপ করে বসে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদশব্দ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নিয়ে বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছেন। টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবেন, পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা কেন গান গায়, সেই গানের মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—"

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ও, আপনি এসেছেন! নমস্কার নমস্কার! ভারী আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়েল দেখছিলাম।"

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হল যদিও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হত যে দোয়েলের গান আর ওই ডানার রূপ আসলে এক জিনিস। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা চোখ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আসলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ডানা বললে, "আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"কি বলুন তো?"

"আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব।" ডানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন একটু প্রত্যাশা করে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ও, তাই নাকি? বেশ তো।"

ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হলে মনের যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা সেই রকম হল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি।

ডানা বললে, "কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো। আপনার যদি কেউ চেনাশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা চিঠি দিয়ে দেন তা হলে আমার একটু সুবিধে হয়।"

"বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে পারেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয়?"

"না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন"—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা। তাঁর চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব।"

ডানা বললে, "আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হল আপনার বাড়িতে আছি। তার ভাড়াটা কত?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

"বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিইনি"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন, "আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম।"

ডানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "আবার অত খরচ করে—"

"আপনি না থাকলেও সারাতে হত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়।"

কথা কটি বলে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে সরে গিয়ে হেঁট হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি মধুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়! কিন্তু একটি কথা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

ডানা বললে, "আমার আর কিছু বলবার নেই তা হলে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি করে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সবই মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,
তোমারি তরে বিজন ঘরে,
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।

কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধূলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো।

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা! ডানার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি হল?"

"সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করিনি, ও আমি পারব না।"

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, "ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য ঠিক, কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম।"

"ও আমার ভালও লাগে না।"

"চলুন, আমরা ভিতরে যাই"—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয়?"

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "চা নয়, কফি।"

"আচ্ছা।"

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চলে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ্‌ থেকে বার করে সেটার ধুলো ঝাড়লেন।

"টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়, তার কারণ। নির্ণয় করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবার একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা —মানে, Nuptial Display।"

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalary—মানে, প্রতিযোগিতা, Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে, নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and high spirits—মানে, আনন্দ স্ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলাম, এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান।"

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে।"

"কি?"

"পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলের মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গান, শুনেছি; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি; Phrases—মানে, এমনই ডাক শুনেছি; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনিনি; Call Notes—আহ্বান, শুনিনি; Flight Notes—মানে, ওড়বার ডাক শুনিনি; Alarm Notes—ভয়ের ডাক শুনিনি, Love Notes—প্রণয়সম্ভাষণ, শুনেছি; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি; Cradle Notes—বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনিনি; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ভাবে ডাকে, বোধহয় শুনিনি। Drumming of Woodpecker—এ অবশ্য আলাদা জিনিস।"

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, "এত রকম ডাক আছে? একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হল?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রথমটা হল Song Proper—মানে পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দোয়েল যে গানটা কোনও উঁচু ডালে বসে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সবাই এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirrups হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করছে। দোয়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করিনি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে বকবক করতে শুনিনি। Phrases—মানে এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন কা-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের বলতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিকে ডাকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে Call Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা দুটো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Noteও বলা যেতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও Call Note শুনেছি বলে তো মনে হয় না। Flight Notes হচ্ছে ঠিক ওড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং করে একটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু করে উড়ে যায়। দোয়েল নিঃশব্দে ওড়ে, ওর Flight Note শুনিনি, Alarm Noteও শুনিনি। ভয় পেলে কিংবা উত্তেজিত হলে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল দেখলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love Notes মানে ভালবাসার ডাক; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। শোনাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ফিঙেদের মুখে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কের্‌র্‌র গোছের শব্দ করে। Cradle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের খাওয়ায়। দোয়েলের শুনিনি, এবার শুনতে হবে, বুঝলেন। আমার গোয়াল আর আস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধহয় বাসা করে, তখন শোনা যাবে। Grief Notes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক ডাকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—"

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে।"

"তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?

"হাঁ হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ অনেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন।"

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ পাখিগুলো?"

"সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধহয়। চলুন দেখি গিয়ে।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন চাকর এসে হাজির হল।

"কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হলে কি বলেন? মুন্সি, তুই এগো, আমরা আসছি।"

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চেয়ে দুষ্টু ছেলের মতো একটু হেসে বললেন, "আজ কিন্তু আবার এমন একটা কাজ করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক।"

"কি?"

"আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্ট্ করতে হবে। দেখতে হবে, ওদের ওভারি (ovary) আর টেস্টিস্ (testes) গুলোর অবস্থা কি এখন।"

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, যা অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টাইপ করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি.এ.পাশ, শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের কাজ খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন।"

"বেশ তো! উনি যদি থাকতে রাজি হন, আমার কিছু আপত্তি নেই।"

"উনি রাজি আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়িতে থাকতে একটু ইতস্তত করছেন।"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

"যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পেলেই হল।"

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি বলে উঠলেন, "সে তো চমৎকার হবে!"

"চলুন, রেডস্টার্টগুলো দেখি গিয়ে, ডাকছে কেন!"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। কবি সোৎসাহে বললেন, "দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেক্‌শন ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ওরকম খারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্তব্য তা করতে হবে।"

"খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে।"

"ঠিক।"

দুজনে হন হন করে অগ্রসর হতে লাগলেন।

।। চার ।।

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গেলেন ঘুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘুঁটেগুলো ভিজে গোবর হয়ে গেল বোধ হয়। গিয়ে দেখেন, ঘুঁটেগুলো ভিজে তো গেছেই, একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা। নিরুপায় ক্ষোভে

তাঁর চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া যায় না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোনো রকমে বাসনটা মেজে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল ঘুঁটে দিয়েছিলেন! সমস্ত ভিজে গেছে। গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপরে বসে কলরব করছিল, সেদিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও যা দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল করে, সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দরীর পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হল তার; উৎসাহের উৎসমুখ অবারিত হল সহসা; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি! খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেমনিই আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরিয়ে বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার করে দিলেন। আমগাছটার দিকে একবার চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-পরাগ মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, পাপে ভরে রয়েছে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ নেই, অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটু উনুন পরিষ্কার করে নিকিয়ে কাঠের জ্বালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে, উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান করতে যাবেন তিনি। ততক্ষণে ঠিকা ঝিটা এসে যাবে, বাজার করে আনবে, তারপর বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদোর পরিষ্কার করবে। ততক্ষণে মন্দাকিনীর স্নান সারা হয়ে যাবে, পুজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাশে করে একটি পুরো গ্লাশ চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন। ঝি চলে যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার হাতে করে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই সময়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজ করেন। সুন্দরীর তদারক করেন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে মাঝে দু-একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র পেলে! গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে ক্ষীর করে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে আছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার করে কাঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল পড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন তিনি, পুরনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে ধরালেন সেগুলো। একটু ধরেই নিবে গেল আবার! বেশি কেরোসিন দিলে ধরে যেত। কিন্তু উনুন ধরবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা চলে না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব বদ অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর কাছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি একা ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে বসে যান। অদ্ভুত মানুষ! না, কোরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গজগজ করে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নয়, নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই

করে মাঝে মাঝে গোলমাল করে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে মনোভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তার কাছে, বিধাতাকেও তেমনি হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চলে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টুমি করে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু দুষ্টুমি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি করে শুকনো কাঠগুলো ভিজিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বলিয়ে দেওয়ার মানে হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছিল। অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটোকে কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দোয়েল পাখিটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডালে বসে ডেকে চলেছে অবিরাম। ফিঙে একটা বসে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একটা। কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্তরদিকে ক্ষান্ত-বর্ষণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, মনে হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরষ্করিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল হিমালয়ের গৃহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণের জন্য মেঘ যবনিকার মতো ঢেকে সেদিকে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে গিটকিরিভরা এক ঝাঁক সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হল, নেমে পড়তে হল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন সজনে গাছের উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলার ঘরটিতে। দূরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানলার ভিতর দিয়ে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে। গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! যে গোশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারাই জাগাল কবির মনের কবিতা—

রূপ যে তোমার নতুন করে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ তো নও, রূপান্বিতা!
দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই।

অতি-চেনার বোরখা পরে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থটা তার বলবে কি তা?
রূপ যে তোমার নতুন করে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। করেই বললেন, "তোমার কি ভীমরতী ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় অত?"

"রাঁধুনী বামুন!"

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেবে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

"একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে বলেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার বামুন কেন?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছে যে!"

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, "খাটলে আবার মানুষে মরে নাকি? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি?"

"কাজের ভাবনা কি? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত যে—"

"হয়েছে"—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। "নাও, চা-টা খেয়ে নাও, পেয়ালাটা নিয়েই যাই।"

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা পড়ে গেল কাপড়ে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, "আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! সমস্ত কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে! চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায়?"

কবি হেসে বললেন, "ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না।"

"ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না।"

দুজনেই চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আবার উদ্দাম হয়ে উঠল নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত চা-টা ডিসে ঢেলে এক নিমেষেই পান করে ফেললেন সবটা।

"বামুনটাকে রাখ, বুঝলে? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, তা হলে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা ছিল আমার কাছে।"

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর

প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যেও হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার করে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু তাঁর সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ বিচিত্র খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হতে হল তাঁকে।

"ঝাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত ঘুঁটেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, নখ নিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে।"

"ও বেচারাদের চরে খেতে হবে তো! ওদের তো আর পেনশন নেই আমার মতো।"

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। ঘরের কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শেল্‌ফগুলো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভরে উঠল সহসা। বারো বছর বয়সের যে কিশোরীটিকে বিয়ে করে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাকে যেন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা করে চলেছে। কিছুতেই থামবে না। মন্দাকিনীর মতো স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মতো মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হত? সংসারের কোনো আঁচটি তাঁর গায়ে লাগতে দেয়নি। তখনই কিন্তু মনে হল, তা দেয়নি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে কি, যার জন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমাময় মুহূর্ত মন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত করে তুলেতে পেরেছে কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ করে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি কবি, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধসম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছে মন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। না ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা—বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ মাত্রেই যৌন আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? এক একটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম একদিন, তা সে নারী পুরুষ যে-ই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি জাগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, দুরারোহ পর্বতের, সীমাহীনা সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে চিত্ত ভরে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ সঞ্চারিত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না, মনে হয়, সব পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের নয়। মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নয়, ললিতকলাবিধির কোনও ধার ধারে না ও।

আশ্চর্য, ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মন্দকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোনো দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, কবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, তবু কেমন যে আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি হতে পারেননি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উপর। বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে করে তীর্থে নিয়ে যেতে চাও রাজি আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখন? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধুলোগুলো পরিষ্কার করে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলি নিপুণভাবে

তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

"কি দেখছ অত তুমি?"

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা ফিঙে। ফিঙে দেখেছ ভাল করে কখনও? ওয়ান্ডারফুল!"

"টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার বসে আছে তখন থেকে! কুচকুচে কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন। সূর্য যেন শত ধারায় সোনা ঢালছে ওর গায়ে, আর ও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তোমার সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নেই, থ্যাঙ্কস!"

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমানুষ এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

"দেখবে?"

"ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন।"

মুখে যদিও একথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিল না তা নয়।

"একটুখানি দেখ না।"

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন মন্দাকিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন দ্বারের দিকে—"ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর তুমি!" পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে আবার। একটা কথা মনে পড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডাকছিল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোনো পাখি নয়, ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও বসে আছে বলে মনে হল। কি রে মেকি কি মে কি কি মে কি কি—ক্রমাগত ডেকে চলেছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে হল, যা কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের সোনা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর মতো, ভারতবর্ষের কালাআদমির মতো কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরাবান্বিত, আর সেটাকে প্রচারও করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর অত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় প্রিয়াকে সম্বোধন করবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে সুরে বার বার প্রশ্ন করছে তাই কি রে, মেকি কি মেকি কি মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনেনি তোমায় আজও যাহারা
কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্যত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কখনও বসিয়া আছ সু উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ভ্রমিতেছ গোষ্ঠে
ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষ্যি'!
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু ঢিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি?
জ্বলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' ভঙ্গী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুম বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী
তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে! হঠাৎ মনে হল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলের কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি, অশোক-গুচ্ছের কি রূপ!

কু-কুক্-কুক্-কুক্—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে করে প্রবেশ করলেন।

"বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া থেকে নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধরে যাবে।"

"ডালটা পুড়ে গেল?"

"না। খুব বেঁচে গেছে।"

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালার চুমুক দিয়ে বললেন, "বামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?"

"তুমি বোঝ না, রাখব কি করে, মাইনে দিতে হবে তো এক কাঁড়ি?"

'কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে।"

"কোথা থেকে?"

"আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম, গেল বছর, সে দুটি একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা করে দেবে বলছে।"

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী ও সংবাদে।

"তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু?"

"না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে।"

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর মুন্সি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও লিখেছেন—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক খবর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চোখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাইনি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

।। পাঁচ ।।

রূপচাঁদ মৌলিক আপিসে বেরিয়ে গেছেন। বকুলবালা নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে বসে আছেন তাঁর নতুন খেলনাটি নিয়ে। কাল রূপচাঁদ হলদে পাখিটি এনে দিয়েছেন তাঁকে। আনন্দবাবু যে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন সেটা বড় বড় করে লিখে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদ একটা কাগজে। কিন্তু কবিতাটা বড়—অত বড় কাগজ খাঁচায় ঠিক সাঁটা যাচ্ছে না। বকুলবালা শেষে ঠিক করলেন, কাগজটা দেওয়ালে ছবির মতো করে টাঙিয়ে দেবেন। টাঙিয়ে তার পাশে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে পেরেক বার করলেন চারটে। তারপর রান্নাঘর থেকে নোড়া নিয়ে এলেন। নোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে লাগল দু-একবার। কিন্তু বকুলবালার তাতে গ্রাহ্য নেই। অনেক কষ্টে হেঁট হয়ে হয়ে চারটে পেরেকই ঠুকে ফেললেন তিনি। কিন্তু ঘরের দেওয়াল পাকা! ভাল করে ঠোকা গেল না, ঠোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেরেক পড়ে গেল, কবিতার কাগজটা বেঁকে গেল। রাগ চড়ে উঠল বকুলবালার। খানিকটা ময়দা বার করে গুললেন প্রকাণ্ড এক অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে, তারপর ঘুঁটে জ্বেলে উনুনটা

ধরিয়ে ফেললেন। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু এসবে নিরস্ত হবার পাত্রী বকুলবালা নন। একবার যখন ঝোঁক উঠেছে কাগজটাকে সাঁটতে হবে, তখন না সেঁটে কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। আঠা হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ানক গরম। বাটিটাকে সাঁড়াশি দিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের উপর ধরে রইলেন। সমস্ত চৌবাচ্চার জলটা যে কালো ভুসোতে ভরে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। একটু ঠান্ডা হতেই তুলে নিয়ে এলেন সেটাকে, হাত দিয়ে দেখলেন, বাটিটা ঠান্ডা হয়েছে বটে কিন্তু আঠা এখনও বেশ গরম। কতক্ষণ চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখলেন তিনি? উঠে গিয়ে মশারির চাল থেকে পাখাটা নিয়ে এলেন—পাখার বাঁট দিয়ে আঠা মাখাতে লাগলেন কাগজটায়। খুব বেশি করে করে লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিলেন কাগজটা তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে দেখলেন। বাঃ চমৎকার হয়েছে, আনন্দে হাততালি দিয়ে আপনার মনেই নেচে উঠলেন একবার। কিন্তু ওখানে খাঁচাটাকে টাঙাবেন কি করে? এখানে খাঁচা টাঙানো যাবে না। কি করা যায়? ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। ঘরের ভিতর রূপচাঁদের রিভলভিং বুক-শেল্ফ্ ছিল একটা। বেশ উঁচু। সমস্ত বইগুলো বার করে স্তূপীকৃত করলেন মেঝের উপর। তারপর হিড় হিড় করে বুক-শেল্ফটাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাইরে, দেওয়ালে যেখানটায় কবিতা লেখা কাগজটা সাঁটা ছিল সেইখানে। উঃ, ভারী কি কম! জগদ্দল পাথর যেন একটা! হাঁপাতে লাগলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। কিন্তু খাঁচাটা তার উপর রাখতেই আনন্দে হেসে উঠল আবার চোখ দুটি। কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে! বা! রিভল্ভিং শেল্ফটা ঘোরালে কিন্তু ভয় পাচ্ছে পাখিটা।

"ভয় লাগছে বুঝি? আচ্ছা, আর ঘোরাব না।"

খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে সান্ত্বনা দিলেন তাকে বকুলবালা।

"কই, কথা বল একটা, শুনি!"

পাখির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

"কথা বলবে না?"

তবু কোনো উচ্চবাচ্য করে না বেনে-বউ।

"ও বাবা, রাঙামুলো নাকি তুমি?"

পাখি নীরব।

"ভাব করবে না আমার সঙ্গে?"

বেনে-বউ ভাব করবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না।

"এমনই গোমড়া মুখ করে বসে থাকবে নাকি রাতদিন? তবেই তো হয়েছে! আমার মদনলাল খুব লক্ষ্মী—মদনলাল, তোমার কথা শুনিয়ে দাও তো ওকে।"

বারান্দার কোণে লোহার খাঁচায় মদনলাল বসে ছিল লোম ফুলিয়ে চোখ বুজে। প্রবীণ একটা চন্দনা। ডাক শুনে চোখ খুললে।

"কথা শুনিয়ে দাও ওকে। বল—"

মদনলাল চোখ মিটমিট করতে লাগল, তারপর বলে উঠল হঠাৎ, "শিউজি, গোটি পী যাও, গোটি পী যাও, শিউজি গোটি পী যাও।"

পশ্চিমের একজন কনস্টেবল চন্দনাটিকে এই বুলি শিখিয়েছিল।

"শুনলে তো? তুমিও কথা বল একটি, শুনি।"

বেনে-বউ গম্ভীর হয়ে রইল, একটি কথা বললে না।

"খিদে পেয়েছে নাকি? খাবে? দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভাল পেঁপে আছে। পেঁপে খেয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু।"

একটা পেঁপে বার করে কাটতে বসে গেলেন বকুলবালা।

পেঁপে কাটতে দেখে তাঁর সব পাখিগুলোই চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়ের উপর দুলতে লাগল টিয়াটা। ময়নাটা বলে উঠল, 'ওগো শুনছ!' বুলবুলির কণ্ঠে ফুটে উঠল কুটুর কুটুর আওয়াজ। শ্যামা শিস দিয়ে উঠল। 'শিউজি গোটি পী যাও'—মদনলাল নিজের কৃতিত্ব জাহির করলে আবার। তাদের দিকে একটা রোষদৃষ্টি হেনে বকুলবালা বললেন, "এখুনি তো খেয়েছ সব, আগে ওকে দিই, তারপর তোমাদের দিচ্ছি।"

পেঁপে পেয়ে বেনে-বউ কিন্তু উল্লসিত হল না তেমন। একবার ঠুকরে দেখলে, তারপর বসে রইল চুপ করে। বকুলবালা তাঁর প্রত্যেক পাখিকে এক টুকরো করে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন বেনে-বউয়ের খাঁচার সামনে।

"কই, খাচ্ছ না যে তুমি? পেঁপে ভাল লাগে না বুঝি? আমার মতন অবস্থা বুঝি তোমার? আমার ভাল লাগে না পেঁপে। লজেন্স খাবে? চকোলেট?"

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লজেন্স আর চকোলেট নিয়ে এলেন।

"এই নাও।"

একটা লজেন্স আর একটা চকোলেট খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন। বেনে-বউ নির্বিকার।

"এও খাবে না? ও বাবা! বুঝেছি, আসলে তোমার দুষ্টুমি। কিছু শুনছি না আর। কথা বল এবার। বল না একটা কথা। বল, লক্ষ্মীটি।"

বহুবার অনুরোধ করেও বেনে-বউয়ের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না বকুলবালা। হঠাৎ রাগ হল।

"তবে রে মুখপোড়া, আমাকে চিনিস না?"

পাখাটা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন খাঁচার উপর। পাখিটা ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু একটি শব্দ করলে না। পাখাটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ বকুলবালা। তারপর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল হঠাৎ আবার। অমন সুন্দর পাখিটাকে কি বেশি নির্যাতন করা যায়? কিন্তু কি মুশকিল, কথা যদি না বলে, তা হলে ও পাখি নিয়ে কি হবে। পাখিটা বোবা নয় তো? মানুষের মধ্যে যেমন বোবা আছে, পাখিদের মধ্যেও হয়তো থাকে। হয়তো পাখিওলা ঠকিয়ে একটা বোবা পাখি বিক্রি করে গেছে। আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন পাখিটার দিকে। কি চমৎকার গায়ের রঙ! হঠাৎ হিংসে হল। বলে উঠলেন, "আমার হলদে রঙের শাড়ি আছে, দামি রেশমী শাড়ি, তোর মতো আমিও সাজতে পারি, দেখবি?" তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বকুলবালা এবং হলদে শাড়িখানা বার করে সত্যি সত্যি সাজতে বসে গেলেন। শাড়ি পরে মাথার চুল আঁচড়ে এমনভাবে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন যে, খানিকটা চুল গলায় এবং পিঠের উপর পড়ল গিয়ে। বেনে-বউয়ের মাথা আর গলার কাছটা যেমন কালো, অনেকটা তেমনই দেখাতে লাগল। তারপর ঠোঁটে রঙ দিলেন বেশ ভাল করে। টুকটুকে হল ঠোঁট দুটি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর রূপচাঁদের কালো মাফলারটা বার করে সেটা কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে

দিলেন দুপাশ দিয়ে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে চৌকিটার উপর উপুড় হয়ে পাখির মতো বসে বেনে-বউকে সম্বোধন করে বললেন, "এই দেখ, তোমার চেয়ে কিছু কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে? এস, এইবার ভাব কর আমার সঙ্গে। কথা বল একটি।"

বেনে-বউ তবু কথা বলে না।

এইবার কবিতাটার দিকে নজর পড়ল বকুলবালার। তাঁর মনে হল, ওর সম্বন্ধে যে কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেটা তো শোনানো হয়নি ওকে! তাই অভিমান করে বসে আছে নাকি? কিন্তু কবিতা কি করে পড়ে শোনাবেন এখন? তিনি তো পড়তে জানেন না! হঠাৎ একটা গভীর বেদনায় টনটন করে উঠল সমস্ত মনটা। কবিতাটা রূপচাঁদ পড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে—মনে করবার চেষ্টা করলেন লাইনগুলো। "কও না কথা হলদে পাখি'—এই লাইনটা মনে পড়ল শুধু। আর কিছু মনে পড়ল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগল, উঠে পড়লেন তিনি। মনের ভিতর কি যে হচ্ছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। নির্মল নীল আকাশ। রাস্তার ওধারে বটগাছটায় পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, শিশুগাছটা ভরে উঠেছে কচি কচি শ্যাম কিশলয়ে, উঠোনের আমগাছটায় অজস্র মুকুল ধরেছে, যেন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে কারা—মুখ দেখা যাচ্ছে না, সোনালি চুলগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, বোলতা উড়ছে, চিল উড়ছে উঁচুতে,....সবাই উড়ছে। বসন্তের হাওয়া বইছে। বকুলবালার সমস্ত অন্তঃকরণ ছটফট করতে লাগল একটা কারাগারের মধ্যে। কবিতাটা পড়তে না পারার বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, হয়তো ছুটে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে। গাড়ি ডাকিয়ে চলে যেতেন রূপচাঁদের আপিসে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু তার আর দরকার হল না—চণ্ডী এসে পড়ল। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে চণ্ডী। পাখিওয়ালার কাছ থেকে পরশু সে শুনেছে যে, হলদে পাখিটা রূপচাঁদবাবু কিনেছেন। পাখিওলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত, প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে অনেকদিন দেখেছে সে এই হলদে পাখিটাকে।

"মাসীমা, আপনারা আর একটা পাখি কিনেছেন নাকি?"

"কে চণ্ডী এসেছিস? ভালই হয়েছে!"

বকুলবালার বেশ দেখে চণ্ডী বললে, "আপনি কোথায় বেরুচ্ছেন নাকি?"

"না। এমনই পরেছি! পোড়ারমুখো পাখিকে দেখাচ্ছিলাম যে, হলদে শাড়ি আমারও আছে।"

"সন্দুর পাখিটা, নয়?"—চণ্ডী সাগ্রহে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"একটি কথা কইছে না কিন্তু। কবিতাটা পড়্‌তো।"

"কোন্ কবিতা?"

"ওই যে দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ওর বিষয়েই কবিতা, আনন্দবাবু লিখে দিয়েছেন।"

"ও।"

চণ্ডী সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কবিতাটা।

"চেঁচিয়ে পড়্‌না!"

চণ্ডী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন বকুলবালা।

কও না কথা কও না কথা
কও না কথা হলদে পাখি
সোনার বরণ সুরের সাকী
চলবে না তো আর চালাকি
ধরা যখন পড়েই গেছ
নামটি তোমার বলবে না কি
কও না কথা হলদে পাখি।

যে কথাটি ঢাকছ কেবল
নানান ছলে নানান সুরে
সেই কথাটি শুনতে যে চাই
আজকে তোমায় খাঁচায় পুরে।

রঙটি গায়ে কলকে ফুলের
কুচকুচে রঙ মাথার চুলের
মনের কথাও রূপকথা কি?
চুপটি করে ছলবে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

সর্ষে ফুলের স্বপ্ন ওগো
পদ্মফুলের বুকের রতন
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
রঙ হল কি সোনার মতন।

তোমার তরেই চাঁদ সদাগর
পার হল কি সাতটা সাগর
বিশ্ব উজল যে দীপ-শিখায়
তুমিই কি তার সলতে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি!

দুজনে মিলে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন কবিতাটা। আম্রমুকুলগন্ধ-মদির বসন্তদ্বিপ্রহর ছন্দভরে কাঁপতে লাগল যেন।

"ট্যিউ।"

হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল বেনে-বউ।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন বকুলবালা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রূপচাঁদ যখন আপিস থেকে ফিরছিলেন, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। তাঁর

বাঁ হাতে একটি পুঁটলি। পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টার রহমান মিঞা একটি দুর্লভ জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। কেপন—খাসি মুরগি। আপিসেরই চাপরাসীকে দিয়ে মুরগিটি জবাই করিয়ে কুটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি নিপুণভাবে কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, নিজেই রাঁধবেন। বাজার থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মসলাও কিনে এনেছিলেন। বাড়িতে ঢুকতেই বকুলবালা ছুটে এলেন। তখনও তাঁর পরনে সেই হলদে কাপড়। ঠোঁটের লাল রঙ ঠোঁটেই নিবদ্ধ নেই, গালে এবং চিবুকেও লেগেছে। পরিবারের অসাধারণ প্রসাধন দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। বরং চোখমুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যার অর্থ—কি অদ্ভুত রূপসী তুমি, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! বকুলবালা কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ভাবের ধার দিয়েও গেলেন না। অন্য জগতেই ছিলেন তখন। রূপচাঁদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"কি শয়তান তোমার ওই বেনে-বউ! উঃ, কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় সমস্ত দিন!"

"কেন, কি হল?"

"প্রথমে তো মুখ গোমড়া করে বসে রইল। একটি কথা কইবে না, কত সাধ্য-সাধন—কিছুতে না।"

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বই মেঝের উপর স্তূপীকৃত।

"এ কি করেছ?"

খিলখিল করে হেসে উঠলেন বকুলবালা, তারপর রূপচাঁদের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বললেন, "বাইরে দেখবে চল না, কি করেছি! কম খোশামোদ করেছি তোমার পাখির?"

রূপচাঁদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠছিল, কিন্তু হেসে বললেন, "এইটে রাখি দাঁড়াও আগে।"

"কি ওতে?"

"মাংস।"

পুঁটলিটা কোণে রেখে দিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রূপচাঁদ দেখলেন, তাঁর বুকশেল্ফের উপর পাখির খাঁচা রাখা হয়েছে। দেওয়ালে কবিতা সাঁটা রয়েছে তাও দেখলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করছ তো! আমার মাথায় এত আসত না। সুন্দর হয়েছে।"

"তবু কি মন পেয়েছি তোমার পাখির! ওর মন ভোলাবার জন্যেই শেষে এই শাড়িটা পড়লাম, তবু না। শেষকালে চণ্ডী এল, দুজনে মিলে ওই কবিতাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম, তবে বাবুর মুখে কথা ফুটল, তাও একটি বার।"

চণ্ডীর আগমনবার্তায় মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হলেন পুলিশ কর্মচারী রূপচাঁদ। বাইরের কোনও লোক বাড়িতে আসে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

"চণ্ডী এসেছিল নাকি? বেশি আমল দিও না ওকে।"

"কেন?"

"ছোঁড়াটা চোর শুনেছি।"

অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাটা বললেন রূপচাঁদ।

"তাই নাকি?"

বকুলবালা চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হবার জন্যে রূপচাঁদ বললেন, "তোলা-উনুনটাতে আঁচ দাও। আমিই মাংস রাঁধব আজ।"

"তোলা-উনুনে কেন?"

"মুরগির মাংস যে।"

"ও!"

বকুলবালা মুরগির মাংস খান, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেন না।

বকুলবালা তোলা-উনুনটা বার করলেন কোণ থেকে।

"উঃ, এর মধ্যেই কি রকম গরম পড়ে গেছে দেখেছ? পাখাটা এখানে পড়ে কেন?" পাখাটা তুলে হাওয়া করতে যেতে ময়দার আঠা লেগে গেল হাতময়।

"এ কি, এতে লেগে আছে কি।"

"ও! আঠা লাগিয়েছিলাম ওটা দিয়ে। কবিতাটা দেওয়ালে লাগাবার জন্যে আঠা করেছিলাম যে। তোমার পাখির জন্যে কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আজ!"

ক্রোধে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল রূপচাঁদের। মুখে কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে বললেন, "করতেও পার এত!"

উত্তরে বকুলবালাও হাসলেন। রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে জামা জুতো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার। বকুলবালা তোলা-উনুনে ঘুঁটে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

"কম দুষ্টু তোমার বেনে-বউ। কবিতা শোনবার পর 'টিউ' করে ছোট্ট একটি শব্দ করেছিল খালি। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, না রাম না গঙ্গা, কিছু বললে না। এই একটু আগে পরোটা বেলছি, হঠাৎ বলে উঠল, 'ওকি ওকি ও'! কি দুষ্টু বল তো—তার মানে পেঁপে খেয়েছি, ছাতু খেয়েছি, পরোটাও চাই একটু। পরোটা দিলাম, খেলে না, ওর মন পাওয়া ভার।"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

একটু মুচকি হেসে সংযতবাণী রূপচাঁদ বললেন, "আস্তে আস্তে ভাল হবে। তোমার মন পেতে আমাকেও কম বেগ পেতে হয়নি।"

"আহা!"

কোপকটাক্ষে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ঘুঁটেয় কেরোসিন ঢালতে লাগলেন বকুলবালা। মাথায় জবাকুসুম মেখে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হলেন রূপচাঁদ। স্নান করে চা জলখাবার খেয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন।

"এ কি, চৌবাচ্চার জলে কালো কালো এসব ভাসছে কি?"

"কই? ও, অ্যালুমিনিয়ামের গরম বাটিটা ঠান্ডা করবার জন্যে চৌবাচ্চায় বসিয়েছিলাম। দাঁড়াও, ঠিক করে দিই।"

তাড়াতাড়ি এসে বকুলবালা হাত দিয়ে ভাসমান ভুসোগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে উঠল তাতে। রূপচাঁদের মনে ক্রোধাগ্নি দাউদাউ করে জ্বলছিল।

কিন্তু খুব শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "থাক্, আমি জল তুলেই স্নান করছি।"

কেবল ব্রহ্মচারীর নয়, চার্বাকপন্থীরও সংযম দরকার সিদ্ধিলাভের জন্য।

স্বহস্তে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান সেরে যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুঁটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গেছে, তার মধ্যে দগদগে হলদে কাপড়-পরা বকুলবালা বসে চা ছাঁকছেন। রূপচাঁদের মনে হঠাৎ একটা গানের একটা লাইন ভেসে এল, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। যে স্বর্গলোকে সে ডানা মেলে উড়তে চায়, সেখানে পৌঁছতে হলে অনেক নালা নর্দমা আঁস্তাকুড় পার হতে হবে, দমে গেলে চলবে না।

"দেখ, মাংসটা আজ ভাল করে রাঁধব। অমরেশকে দিয়ে আসব একটু। সে আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে। ঘি আছে তো?"

"আছে। মসলা কি কি চাই?"

"বলছি।"

টিফিন-কেরিয়ারটি হাত করে খাওয়া-দাওয়া সেরে রূপচাঁদ যখন বেরুলেন, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। পূর্ববন্দোবস্তমতো কনস্টেব্‌ল্ রামখেলাওন মিশির এসে বারান্দায় শুয়েছে বকুলবালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বলেছেন যে, অমরেশবাবুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে রাত হবে তাঁর।

অন্ধকার গলি জনবিরল হয়ে এসেছে। রূপচাঁদের পায়ে কেড্‌স্। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাব জাগছে একটা। দুঃসাহসী হিমালয়-আরোহীর মনে যে ধরনের ভাব জাগে, অনেকটা সেই রকম। হিমালয়-আরোহী জানে যে, হয়তো তার অভিযান ব্যর্থ হবে, হয়তো সে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি পেরে যায়! ওই 'যদি'টা আলেয়ার মতো প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায় তাকে দুর্গম পথে। তা ছাড়া, সাফল্য যদি না-ও হয়, অভিযান করার মধ্যেই কি আনন্দ নেই? ভয় জিনিসটার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে একটা। অনিশ্চয়তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তার আহ্বানে ছুটে যেতে চায় মন। কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না তার, বরং বাধা যত দুরতিক্রম্য হয়, সে তত যেন আকুল হয়ে ওঠে, শক্তি তত যেন সংহত হয়, জেদ তত যেন চড়ে ওঠে। অজানার আহ্বান নতুনের প্রলোভন সুরার মতো সঞ্চরণ করে বেড়ায় তার দেহে মনে স্বপ্নে কল্পনায়। বাইরের নানা বাধা অতিক্রম করে কাম্যলোকে পৌঁছবার ঢের আগেই তার সমস্ত সত্তা কল্পনায় পৌঁছে যায় সেখানে, এবং পৌঁছে গিয়ে যে আনন্দ পায়, তারই আবেগে সে হাসিমুখে অতিক্রম করে সমস্ত বাধা। তার কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মালোলুপ তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তার লক্ষ্য আলাদা, পথও তাই আলাদা। নিজের স্বর্গলোকে সেও মুক্তি পেয়ে চায়। তার মনও ডানা মেলেছে—বহুবর্ণবিচিত্র রূপ-রস-রঙের লীলাতীর্থে, মৃন্ময়ী ধরণীর মহিমালোকে—সূক্ষ্ম অবাস্তবে নয়, স্থূল বাস্তবে; পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে। পথ পিচ্ছল, পর্বত দুরারোহ, সমুদ্র-দুস্তর, কণ্টক কঙ্কণ কর্দম—বাধার অন্ত নেই। কামনারও অন্ত নেই!

অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেলেন রূপচাঁদ। পায়ের বুড়ো আঙুলটায় খুব জোরে লাগল—জুতো থাকা সত্ত্বেও। সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। বলা বাহুল্য অমরেশের কাছে যাচ্ছিলেন না তিনি, যাচ্ছিলেন ডানার কাছে।

।। ছয় ।।

অন্ধকার চতুর্দিকে। নদীতীরের বন-জঙ্গল থেকে অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি হিল্লোলিত করে তুলছে অন্ধকারকে। অন্ধকার সমুদ্রে অসংখ্য সুরের ঊর্মি ছন্দিত হয়ে উঠছে যেন, স্পন্দিত করছে নক্ষত্রকুলকেও। সন্ন্যাসী স্থির হয়ে বসে ছিলেন এতক্ষণ আনন্দময় স্তব্ধতার মধ্যে। চরাচরব্যাপী সঙ্গীতের স্পর্শ তাঁকেও আত্মহারা করে তুলল ক্রমশ। হঠাৎ তিনি গান গেয়ে উঠলেন। মীরার একটা ভজন রূপায়িত হয়ে উঠল তাঁর মনে।

চিতনন্দন আগে নাচুংগী
নাচ নাচ পিয়তম হিঁ রিঝাউ
প্রেমী জনকো জাচুংগী।।
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা
সুরতকী কছনী কাছুংগী।
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
য়া মৈঁ এক ন রাখুংগী
পিয়াকে পলংগা জা পৌঢ়ংগী
মীরা হরিংবংগ রাচুংগী।।

তাঁর উদাত্ত অনুপম কণ্ঠে ভরে উঠল চারিদিক। পাগলিনী মীরাই যেন অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার চিতনন্দন প্রিয়তমকে। অন্ধকারের স্তরে স্তরে, গঙ্গার কূলে কূলে বনস্পতির শাখায় শাখায়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সেই সন্ধানের সূক্ষ্ম তীব্র আকূতি সঞ্চারিত হল যেন। ঘুরে বেড়াতে লাগল নামহীন সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে। সন্ন্যাসীর গান থেমে গেল কিছুক্ষণ পরে, কিন্তু আকূতি থামল না। তার অবাঙ্‌ময় আবেদন সূক্ষ্মতর হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হল বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল নিবিড়তায়, তীব্রতর হয়ে উঠল অনুভূতিলোকে। চোখ বুজে বসে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। যখন চোখ খুললেন, তখন দেখতে পেলেন, ভাঙা সিঁড়িটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

"কে?"

"আমি। আপনার গান শুনছিলাম।"

ডানা এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীকে। তার হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, এ ব্যক্তিটি প্রণম্য।

"থাক্ থাক্"—সঙ্কুচিতভাবে সরে গেলেন সন্ন্যাসী। উঠে দাঁড়ালেন। বিব্রত বোধ করলেন একটু।

"যে গানটা গাইছিলেন, সেটা ভজন, নয়?"

"হ্যাঁ, মীরার ভজন।"

"গানের কথাগুলো খুব মিষ্টি, কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না ভাল।"

সন্ন্যাসী নীরব হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "এই যে ঝিল্লীর সঙ্গীত, এর কি মানে বুঝতে পার?"

"আমি বুঝতে না পারলেও ঝিল্লিরা বুঝতে পারে নিশ্চয়।"

"কিন্তু তুমি তো ঝিল্লী নও, তুমি মানুষ। তোমার বোঝায় আর ঝিল্লীর বোঝায় তফাৎ থাকবে না? ঝিল্লী ওর এক রকম মানেই জানে, কিন্তু তুমি ওর হাজার রকম মানে বার করতে পার, সে শক্তি সে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমাকে ভগবান।"

হঠাৎ একটা নতুন জগতে প্রবেশ করে ডানা যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সন্ন্যাসীও চুপ করে রইলেন। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসছিল, এমন সময়ে ডানার চাকরটা এসে বললে যে সে গোয়াল-বাড়ি থেকে দুধ আনতে যাচ্ছে। ঘর খোলা রইল। চাকরের আবির্ভাবে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল উভয়েরই।

ডানা সপ্রতিভ ভাবে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না, একদিনও তো যাননি।"

"আমি? আচ্ছা, চল।"

ডানার পিছু পিছু সন্ন্যাসী চলতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে গোড়া থেকেই কেমন একটা কৌতূহল জেগেছে—কেমন যেন অস্পষ্ট শ্রদ্ধা একটা। এতদিন নানা ছলে ওই ভাঙা ঘরটার আনাচে কানাচে ঘুরছে সে, কিন্তু সোজাসুজি মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারেনি। আজ করতে পেরে যেন আনন্দিত হল।

ঘরে ঢুকে ডানা বললে, "বসুন।"

সন্ন্যাসী নির্বিকার ভাবে মাটিতেই বসে পড়লেন।

"চেয়ারে আপনি বসেন না বুঝি?"

"না, আজকাল আর বসি না।" তারপর একটু হেসে বললেন, "একটা ব্রত চলছে আমার—তুমি বস চেয়ারে।"

"কম্বল পেতে দেব আপনাকে?"

"কম্বলে আপত্তি নেই। কিন্তু থাক্ না, কি দরকার?"

"আপনি মাটিতে বসে থাকবেন, আমি কি করে চেয়ারে বসি?"

ডানা একটা কম্বল পেতে দিলে। সন্ন্যাসী তার উপর উঠে বসলেন। ছোট একটা আসন পেতে ডানা বসল এক ধারে।

তারপর বললে, "আপনি এখনই স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন।"

"বলছিলাম, তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ঝিল্লীর তা নেই। একমাত্র মানুষকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ভগবান, সে যা ইচ্ছে করতে পারে, যা খুশি হতে পারে। তার সামনে অসংখ্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সে ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, যে কোনও জিনিসকে যেমন খুশি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারে। এ স্বাধীনতা আর কারও নেই।"

"কেন পশুরাও তো কম স্বাধীনতাতে ঘুরে বেড়ায় না?"

"পশুরা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাত্রি হলে তাকে ঘুমুতেই হবে, ইচ্ছে করলেও সে জেগে থাকতে পারে না। ক্ষুধার উদ্রেক হলেই তবে সে খায়, অক্ষুধার সময় কিছুতেই তাকে খাওয়াতে পারবে না। মানুষ কিন্তু যখন ইচ্ছে ঘুমুতে পারে, যতক্ষণ খুশি জাগতে পারে। ক্ষুধা অক্ষুধা—কোনো সময়েই তার খাওয়ার বাধা নেই, সামনে খাবার থাকতে স্বেচ্ছায় সে উপবাসও করতে পারে। অন্য কোনো প্রাণী তা পারে না।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি, কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তারপর আপন মনেই বললেন, "সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। জোর করেন না কখনও। অপেক্ষা করেন।"

"কিসের অপেক্ষা?"

"তুমি তাঁকেই নির্বাচন করে নাও কি না, তারই অপেক্ষা। তোমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন সীমাহীন ঐশ্বর্যভাণ্ডার, তোমার অন্তরে দিয়েছেন কামনা, মস্তিষ্কে দিয়েছেন বুদ্ধি। অনন্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পথের মোহনায়, যে কোনও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁকেই বেছে নাও কি না।"

"এ রকম ধাঁধায় ফেলার মানে কি?"

"জোর করে দখল করায় কোনও আনন্দ নেই। তিনি আনন্দময়, আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য নেই তাঁর। তুমি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ করে আনন্দ পাও, তা হলেই আনন্দ। সত্যিকারে আনন্দে ভণ্ডামির স্থান নেই, স্থান নেই জবরদস্তির। জবরদস্তির স্থান নেই বলেই বোধ হয় তিনি অন্য পথগুলোও মনোহর করেছেন, তাতেও দিয়েছেন কিছু কিছু আনন্দের খোরাক।"

আবার চুপ করলেন তিনি। আবার ঘনিয়ে এল নীরবতা। স্পষ্ট হয়ে উঠল নদী-তীরের ঝিল্লীধ্বনি।

"আচ্ছা, একটা কথা মনে হচ্ছে, তিনিও কি লোলুপ?"

ডানা এমন স্বরে কথাগুলি বললে যে, সন্ন্যাসীর মনে হল, সত্যিই তার প্রাণে জিজ্ঞাসা জেগেছে। মেয়েটির তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পেয়ে মনে মনে আনন্দিতও হলেন তিনি। কিন্তু চুপ করে রইলেন। যেন মনের গহনে তিনি উত্তর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন—ডানার মনে হল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনিও লোলুপ। প্রেমের কাঙাল তিনি।"

"তবে শুনেছি যে, তিনি নিখুঁত নির্বিকার।"

"তাও সত্য।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তীরের কাছে সমুদ্রের জল এক হাঁটু, আর একটু দূরে গেলে সেই সমুদ্রই অতলস্পর্শী—দুটোই সত্য। সমুদ্র নীল এও যেমন সত্য, সমুদ্র নীল নয় তাও তেমনই সত্য। একটা ঘটিতে তুলে দেখ সমুদ্রের জল সাধারণ জলের মতো। সামান্য সমুদ্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সত্য যদি নিহিত হয়ে থাকতে পারে, তা হলে কোটি কোটি পর্বত-সমুদ্রের যিনি আকর, তাঁর মধ্যে সত্যের অনন্ত রূপের সন্ধান পাওয়া কি অসম্ভব? তা ছাড়া নিজের অনন্ত রূপ তিনি দেখাচ্ছেন বলেই তুমি দেখতে পাচ্ছ।"

"এ রকম পরস্পরবিরোধী সত্য দেখাবারই বা মানে কি?"

"দেখাচ্ছেন বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজের নিজের অনন্ত রূপ দেখছেন তোমার চোখ দিয়ে। উপভোগ করছেন সেটা। কবি যেমন নিজের কাব্যকে নব নব রূপে উপভোগ করেন বিভিন্ন রসিকের সমালোচনায়, তেমনই। তোমার ভিতর দিয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করছেন তিনি বারংবার, কে জানে, হয়তো সংশোধনও করছেন নিজেকে। পুরাতন ছবিকে অবলুপ্ত করে আঁকছেন নতুন ছবি, তাঁর রবারের সামান্য ঘষায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরাতন

সমুদ্র পর্বত, ঐতিহাসিক পড়ছে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিকের পর্যায়ে, তুলির নতুন টানে ফুটে উঠছে আবার নব নব চিত্র সৃষ্ট হচ্ছে নব নব লোকালয়, নব নব লোকপাল।"

হঠাৎ আবার গান গেয়ে উঠলেন তিনি।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
অস্মিন ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ
ভূয়ঃ সৃষ্টা পথয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।

গান শেষ হলে চুপ করে রইলেন তিনি।

ডানাও চুপ করে রইল। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে। স্বল্পপরিচিত এই উদাসীন ব্যক্তিটির মধ্যে যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। লোকটির ঔদাসীন্য প্রথমে কৌতূহলী করেছিল তাকে, তাঁর শুচিতা শ্রদ্ধান্বিতও করেছিল তারপর; কিন্তু এতটা সে প্রত্যাশা করতে পারেনি। নতুন আবেষ্টনীর আকাঙক্ষা-অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ততটা বিভ্রান্ত হয়নি। ভেবেছিল, নিরাপদ আশ্রয় কোথাও জুটে যাবেই একটা না একটা। বিপদে পড়েছিল সে নিজের মনকে নিয়ে। মনের পুরাতন আশ্রয় ছিন্ন হয়েছে, নতুন আশ্রয়, পাওয়া যায়নি এখনও। কোথায় পাওয়া যাবে, কবে পাওয়া যাবে, কি রকম হবে সে আশ্রয়, কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। কল্পনা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করছিল নানা রকম। আদর্শও ঠিক হয়নি। আদর্শ ঠিক না হলেও অস্পষ্টভাবে যে আভাসটা তার চেতনায় আঁকা ছিল, তা সাধারণ বাঙালী নারীর গতানুগতিক জীবনেরই ছবি একটা। বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে, যুদ্ধ থেমে গেলে পৈতৃক সম্পত্তিও হয়তো ফিরে পাবে কিছুটা—এই ধরনের অনির্দিষ্ট চিত্র। নিখিল বিশ্বের বিধাতা যে তার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছেন, তার সমালোচনা শোনবার আশায় প্রতীক্ষা করছেন, তার রসবোধের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচিয়ে নিতে চাইছেন—এ খবরটা শুধু যে অদ্ভুত রকম নতুন মনে হল তার কাছে তা নয়, এর সত্যটা সহসা যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল তার। সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল, সে নিজেকে অত ছোট করে ভাবছে কেন? মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—

আমি নারী আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নারাতে নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হত আকাশে চাঁদ ওঠা
মিথ্যে হত কাননে ফুল ফোটা।

মাটির ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সবাই প্রত্যাশাভরে তাঁরই জন্যে সেজে বসে আছে, এ কথা বিশ্বাস করলে নিজের দৈন্যবোধ আর থাকে না। সমস্ত মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই আনন্দেই বোধ হয় ভরে উঠেছিল মীরার মন।

"মীরার যে ভজনটা আপনি গাইছিলেন এখনই, তারও বক্তব্য কি এই?"

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, "এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও বক্তব্য নেই। কেবল বলবার ধরনটা প্রত্যেকের আলাদা, কারণ প্রত্যেকে তাঁকে নিজের মতো করে দেখতে চাইছে, আসলে তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে দেখছেন। মীরা যখন বলছেন, হে প্রিয়তম, হে চিতনন্দন, আমি পায়ে প্রেমের নূপুর পরে, গায়ে অনুরাগের বসন ছড়িয়ে, লোক-লজ্জা কুলমর্যাদা বিসর্জন

দিয়ে তোমার সামনে নৃত্য করব, তোমার প্রেমকীর্তন করব, তোমার শয্যা আশ্রয় করব,—তখন বুঝতে হবে ভগবানেরই লীলা সেটা, মীরার মুখ দিয়ে নিজের একটা অভিব্যক্তি তিনি ব্যক্ত করছেন। তার প্রমাণ চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবে। ওই দেখ, সুনীল আকাশ-প্রাঙ্গণে নৃত্যপরা হয়ে উঠছে কোন্ পূজারিণী, বেজে চলেছে তার নূপুর, লুটিয়ে পড়ছে তার প্রেমাঞ্চল, কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠছে দশদিক, তোমার মুখের দিকে আকুলনয়নে চেয়ে আছেন তিনি। ওই একই কথা বলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথও আর এক ধরনে—"

হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন আবার সন্ন্যাসী—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার সূর্য চন্দ্র তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে—

গানটা কিন্তু সমাপ্ত হল না। হতে পারল না। হঠাৎ দ্বার ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন মাংসপূর্ণ টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে। সন্ন্যাসীর দিকে এক নজর চেয়ে টিফিন-কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি ঘরের কোণে। তারপর ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "টিঞ্চার আইয়োডিন আছে তোমার কাছে?"

"না, কেন বলুন তো?"

"হোঁচট খেয়ে আঙুলটায় লেগেছে বড্ড।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে পড়লেন। নমস্কার করে বলেলন, "আচ্ছা আমি এখন চলি তবে।"

উঠে বেরিয়ে গেলেন। অকারণে ডানার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তবু সে আত্মসম্বরণ করে লণ্ঠনটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

"খুব বেশি লেগেছে নাকি? ইস, জুতোটা রক্তে ভিজে গেছে দেখছি যে! খুলে ফেলুন। এত রাত্রে আসবার কি দরকার ছিল অন্ধকারে?"

"তোমার জন্যে মাংস রেঁধে এনেছি একটু। কেপনের মাংস।"

"মাংস? মাংস তো আমি খাই না।"

"তাই নাকি?"

নির্নিমেষে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ।

।। সাত ।।

অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয়নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না; কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায়নি অথচ সেটা যে ঠিক কি, তাও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই

তুচ্ছ করার মতো নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতর। আনন্দবাবু রূপচাঁদবাবু—দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চলে যান কোথায় যেন চরের উপর দিয়ে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায়। ডানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মতো কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করেনি একদিনও সে। বরং উল্টো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত করে রেখেছে তাঁকে।......

...সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবেশ করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, "আমার দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হলে শুরু করা যাক এবার।"

হাতে হাত ঘষে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, 'আনন্দবাবুরও আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি।"

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হল, এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটু যেন গ্রন্থিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কোনো রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায়নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ জেগে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন! ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বলতে পারতেন। তা কিন্তু বলেননি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবেন বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সময়ে আপিসে রোজ হাজিরা দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবাবু বললেন, "ইয়ে একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি।"

"কি বলুন?"

"ইংরেজীতে একটানা ডিক্‌টেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কোনো দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা বলে যেতে পারি। হয়তো অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লিখে যান, পারবেন কি? তারপর আমি সেটা দেখে দেব না হয়। পারবেন?"

"তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা করে দেখি একবার।"

"পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন তা হলে ইংরেজী করা আর শক্ত কি! বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেব আমি। নোট করে এনেছি সব।"

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

"আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে।"

"আমি তা হলে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি।"

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল আনিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

"আপনার এত দেরি হয়ে গেল?"

"আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে, আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?"

"কিসের শোভা?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রস্তুতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল তার ইয়ত্তা নেই! লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন। ন্যাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে বসে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটুফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন? সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমার দেখি না।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। ভাল করে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?"

"আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় বসে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?"

"ডিমের রঙ।"

"বেশ শোনাই যাক একটু।"

"বেশ বেশ"—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার টেনে ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার—ডিমের এত বর্ণ-বৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারেনি এখনও। এ যাঁরা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত রঙ, ইংরেজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মতো সমর্থন করবার মত প্রমাণ খুঁজে পাননি। এই ধরুন না কাকের ডিম greenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে

পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক সময় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের এলোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হত, তা হলে যে সব পাখি গাছে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হত। তা কিন্তু হয় না তো। আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। ট্রপিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই কারণে, তাঁদের মতে যে সব ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল হয়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা, কিন্তু অনেকের আবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ রঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন ঘুঘু, পায়রা, হাঁস, মুরগী। সুতরাং ঠিক নির্দিষ্ট করে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা অদ্ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখিদের এটা বোধ হয় artistic impulse অর্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা সে শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ ফলিয়ে। এটা অবশ্য কবিত্ব।"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, "সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে পায়। আপনারা কেবল আঁকপাঁক করে মরেন, তাতেও অবশ্য আনন্দ কম নেই।"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট করে ধরা যায় না লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির রঙের বা স্টোন কালার্ড (stone coloured) তাদের সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustar, Curiew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ করে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু ফাঁক রেখে দেবেন, রঙের খটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্ করে বার করেছেন Sorby ; এস ও আর বি ওয়াই; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন"—কবি উঠে পড়লেন।

"আচ্ছা, বেশ"—অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

"আমি এটা শেষ করে ফেলব এখুনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!"

কবি চলে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে?"

ডানা বললে, "রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্ করে বার করেছেন Sorby ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি,

তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ করে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ডিম শুষে নিচ্ছে। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, সবুজটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ জীবজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ডিমের রঙের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন আর বাইল পিগ্‌মেন্টের যে সম্বন্ধ আছে, তা তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চলে গেল। বৈজ্ঞানিক থেমে গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলেন?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো?"

"কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত নয়? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কারধ্বনি বলে একটা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন।"

"যে কোনো কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কারধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের শব্দকেই ক্রেঙ্কারধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা।"

"ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত?"

"সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর" মৃদু হেসে ডানা বললে।

"তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন? দেখেননি? ভারি চমৎকার দেখতে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে। এইটে হয়ে যাক, তারপর বেরুনো যাবে, কি বলেন? আমি কয়েকটা ফর্দ করে এনেছি ডিমের রঙের। পাখিগুলোর বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা কোনও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি? বাংলাতেই প্রথমে লিখে ফেলুন, পারবেন?"

"পারব না কেন? বাংলা ইংরেজী দু'রকমই লিখে দেব।"

"বাঃ, গ্র্যান্ড হবে তা হলে।"

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর বললেন, "হ্যাঁ লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে কালো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও বড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখিনি। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা নিছক একরঙা ডিম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে।"

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ করে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

"হল?"

"হয়েছে। আপনি বলে যান না।"

"নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey

headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোঁচ বক—"

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, "খয়রা কি পাখি?"

"ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (snake bird), অনেকটা হাঁসের মতো। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। ঝিলে প্রায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা বলে বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপের পাতের মতো। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা।"

ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত বলে যাবেন ইনি।

"ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি?"

"আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন তোলা দুধের রঙের মতো। ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।"

"ফ্লেমিংগো? বাংলা নাম আছে কোনও?"

"রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে। বার-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে, আবার মিউট সোয়ানও (Mute Swan) রাজহংস-রূপে চিত্রিত দেখেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে চলে গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা নামকরণ করতে পারেন যদি—"

"পাখিটা দেখতে কি রকম?"

"দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা, ঠোঁটও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।"

"পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?"

"খুব।"

"তা হলে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণর মতো লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায় অনায়াসে।"

"বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজী নামটা দিন।"

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয় তো। বাঃ! তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো চুলের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই রকম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—

হঠাৎ ডানা মুখ তুলে বললে, "তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?"

"আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle), দেশী নাম সাপমার। এদের ডিম ধবধবে

সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব—এরা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের ডিমও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন রকম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে পেয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম Blotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার সবুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও গ্রে হেরনের (Grey Heron) ডিম সী-গ্রীন।"

"গ্রে হেরনের বাংলা কি?"

"কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখেছেন? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয় দেখেছেন কখনও?"

"দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি?"

"কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল বক নামে পরিচিত। নীল-বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের.....আপনি এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা লিখে দিন....অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দুরকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক, গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis) দেশি নাম কাড়া কোল, এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালীশ্যামা আর দুর্গা টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোনও স্থিরতা নেই। কালীশ্যামার সাদা, পীতাভ, ফিকে সবুজ—তিন রকম ডিম হয়। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে সবুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish Green। আগে হয়েছে Greenish Blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল করে ফেলবেন না। কাক, দাঁড়কাক, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। কাক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের উপর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মতো এক রকম গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস মাখানো থাকে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন।"

"একটু বাকি আছে।"

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করে ডানা বললে, "হয়েছে, বলুন।"

কিন্তু বাধা পড়ে গেল।

একজন কন্‌স্টেব্‌ল সমভিব্যাহারে দুটো কুলি এসে হাজির হল। দুটো কুলির মাথায় দুটো বাক্স। কন্‌স্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম করে চিঠি দিলে একটা। রূপচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন। আমাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি

তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লোক ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি—আর. সি.।

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার?"

"রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"ও, বেশ তো! আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠিয়ে দেব এখন।"

ডানা কন্‌স্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, "ভিতরে রাখিয়ে দাও।"

কন্‌স্টেব্‌ল কর্তব্য সমাপন করে চলে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "নিন, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে এটা। আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে।"

আবার শুরু করলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "এইবার আসুন অলিভ গ্রীনের কোঠায়। এর বাংলা কি হবে? জলপাই সবুজ? আমাদের দেশী পাখিদের একমাত্র গৈয়রই অলিভ গ্রীন ডিম পাড়ে।"

"গৈয়র পাখির নাম শুনিনি তো?"

"ইংরেজী নাম স্টোন্ কারলিউ (Stone Curlew), অনেকটা বাটান পাখির মতো—গায়ে বাদামী ডোরা, চোখে চশমার মতো কালো দাগ আছে। পাথুরে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। খাকী রঙের ডিমও হয় এদের কখনও কখনও। ডিমের গায়ে ছিটেফোঁটাও থাকে। যে সব পাখি বালিতে, পাথরে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিম সবুজের সঙ্গে নানা আমেজের খাকী, হলুদ আর ছাই রঙ দেখা যায়। গাংচিল (Tern) আর বাটানের (Plover) ডিম Greenish Grey—সবুজ ধূসর, অন্য ধরনেরও হয়। ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজের ফর্দ শেষ হল এইখানে, এইবারে হলুদে আসা যাক। একেবারে ঠিক হলুদ রঙের কোনও ডিম নেই। জলমুরগির ডিম ফিকে হলুদ, খাকীও হয়।"

লিখতে লিখতে ডানা বললে, "জলমুরগি আছে নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। এগুলোর ইংরেজী নাম হচ্ছে Indian Moor Hen, ওয়াটার হেনও বলে কেউ, তবে আসলে ওয়াটার হেন হচ্ছে ডাহুক। Indian Moor Hen-কে পানপায়রা, কোড়াও বলে। সংস্কৃত নাম কোষষ্টি। বিলে-টিলে খুব থাকে। এদের ডাক হচ্ছে কিররিক-ক্রেক্-রেক্-রেক্। আর ডাহুকের ডাক কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কুক্ কুক্ কুক্। এদের দুজনেরই ডাক বর্ষাকালেই শোনা যায় বেশি। বিদ্যাপতি, না, কার ভাল একটি কবিতা আছে ডাহুক নিয়ে। আনন্দবাবু থাকলে বলতে পারতেন।"

ডানা বললে, "আমি একটা জানি। মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া"—বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

"হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটেই। বোধ হয় বর্ষার গান। এই সব পাখিদের মেটিং সিজন (Mating Season) বর্ষার কি না, আর সেই সময় খুব ডাকে ওরা।"

"ফিকে হলুদ রঙের ডিম আর কোন্ কোন্ পাখির আছে বলুন?"

"আর কারও নেই। তারপর লিখুন ক্রীম। কালীশ্যামা, তিলেবাজ, দুধরাজ, গ্রে তিতির আর ডাহুক। কালীশ্যামার ডিম ফিকে সবুজ হয়, একথা আগেই বলেছি। ডাহুকের ডিমও লালচে সাদা হয় অনেক সময়। কালীশ্যামা, দুধরাজ আর তিলেবাজের ডিম ছিটছিটও। মানে,

Blotched; এইবার লিখুন ফিকে ক্রীম—ময়ূর, নাক্‌টা হাঁস। ময়ূরের ডিমে ছিটছিট থাকে, নাক্‌টার ডিম আইভরির অর্থাৎ হাতীর দাঁতের তৈরি বলে মনে হয়। লিখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর লিখুন, পিংকিশ ক্রিম—কুলোপাখি আর বাজ। বাজের ডিম অবশ্য পেল স্টোনও (Pale stone) হয়। দেখুন এসব রঙের বাংলা নাম কি হবে—কপিশ-টপিশ হবে বোধ হয়, সেগুলো আপনি ঠিক করে নেবেন তো?"

"চেষ্টা করব। তারপর বলুন।"

"নানা ধরনের স্টোন রঙ আছে। কাদাখোঁচার ডিম Yellowish stone, Coot-এর ডিম Buffy stone, গাংচিল আর বাটানের ডিমও Buffy stone."

"কুট কি পাখি?"

"যার সংস্কৃত নাম কারণ্ডব।"

"ও।"

"পাশে লিখে রাখুন, গাংচিল আর বাটানের ডিমে ছিটছিট থাকে। এইবার আসুন খাকী রঙে। খাকী রঙের ডিম হয় Quail-দের। যাদের বটের বলে। তবে খাকীতে নানা রঙের আমেজ থাকে। Quail আছেও তো অনেক রকম। তাই খাকীর সঙ্গে কখনও লালচে, কখনও পীতাভ, কখনও ক্রীম মিশে থাকে। হুক্‌নার ডিমও এই ধরনের।"

"হুক্‌না? সে আবার কি রকম পাখি?"

"ইংরেজী নাম Indian Courser। শুকনো জায়গায় বালির চড়ায় থাকে সাধারণত। গায়ের রঙও Sandy Brown। চোখের উপর সাদা সাদা দাগ। আগেই বলেছি, যে সব পাখি বালিতে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে, তাদের ডিম হয় খাকী, Greenish খাকী বা ওই ধরনের। এই দলে ফেলতে পারেন Lapwing মানে টিট্টিভদের, Pipit মানে বগেরিদেরও। এদের ডিম ছিটছিটও। এই বগেরিদের সগোত্র হচ্ছে আবার ভরতপাখির দল—Finch Lark, Sky Lark, Crested Lark প্রভৃতি। এরাও মাটিতে ডিম পাড়ে। এদের ডিমও ওই ধরনের Greyish, Greyish Yellow বা Yellowish White. নানা রকম শেড আছে। এইবার আসুন লালের কোঠায়। ঠিক লাল ডিম কারও নেই। তবে বাদামী, Brick red, লালচে, ফিকে গোলাপী, Salmon এই সব আছে। লিখুন, বাদামী রঙের ডিম হচ্ছে কালো তিতিরের। এদের ডিম চকোলেট রঙেরও হয়। Painted তিতির, হিন্দীতে যাকে পতীলু বলে, এদের ডিমও বাদামী। চমৎকার Bronze Brown হচ্ছে জলপিপির ডিম। ছিটছিট আছে। হুক্‌নার ডিমও Brown হয় অনেক সময়। আর Florican যাকে হিন্দীতে লীখ বলে, তাদের ডিমও বাদামী।"

"লীখ।"

"হ্যাঁ।"

ডানা দ্রুতবেগে টুকছিল। বৈজ্ঞানিক তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হল?"

টোকা শেষ করে ডানা বললে, "বলুন।"

কিন্তু একটা দমকা হাওয়া এসে গোলমাল করে দিলে সব।

কবি টেবিলের উপর কয়েকখানা কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, সেইগুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"ধরুন, ধরুন—"

বৈজ্ঞানিক ও ডানা দুজনেই উঠে ছুটোছুটি করে কুড়োলেন কাগজগুলো।

দেখা গেল, একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "পড়ুন তো কবিতাটা, নিশ্চয় কোনও পাখির বিষয়েই লিখেছেন। এই নীরস আলোচনার পর—আপনার নিশ্চয় নীরস লাগছে খুব?"

"না। আমার তো বেশ লাগছে।"

শিশুসুলভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অমরেশবাবু।

"সত্যি, এগুলো নীরস নয় মোটেই, এতে একবার যদি রস পান তা হলে আর—আচ্ছা কবিতাটা পড়ুন।"

ডানা পড়তে লাগল।

একলা ঘরে দুপুরবেলায়
লিখছি চিঠি তোমায় প্রিয়,
চিড়িক চিড়িক ডাকছে চড়াই
চুনুক চুনুক ডাকছে কি ও।
স্বর্ণলতায় ফুটছে যা রং
শঙ্খচিলের কণ্ঠে সারং
এর ছবি কি আঁকতে পারি
নয়কো এ যে অঙ্কনীয়।
একলা ডালে বসন্ত-বউ
ডাকছে কারে আকুল ডাকে
দূরের বনে নিবিড় ছায়ায়
বউ-কথা-কও সাধছে কাকে
তপ্ত বায়ে কাঁদছে কি সুর
রোদের বীণায় কাঁদছে দুপুর
বাজায় পায়ে বহ্নি-নূপুর
কোন্ মোহিনী নর্তকী ও।
ফটিক জলের ব্যাকুল ডাকে
আকুল বিরাট ঔষধি যে
তীক্ষ্ণ সুরের শায়ক হেনে
চাইছে ও কোন্ দ্রৌপদীকে
পথ চেয়ে কার আকুল পাখি
'চোখ গেল' যে বলছে ডাকি
ধাপে ধাপে চড়ছে যে সুর
নয়কো তাহা বর্ণনীয়।

বর্ণনীয় নয়কো জানি।
বলতে তবু চাইছি সবি
অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি
ছন্দ-পাগল অন্ধ কবি
লুকিয়ে যাহা মর্মে বাজে
ভাষায় তাহা ফুটছে না যে
এ রূপকথার অরূপ বাণী
আন্দাজে তা বুঝেই নিও।

"অনেকগুলো পাখি লক্ষ্য করেছেন দেখছি ভদ্রলোক। চড়াই, শঙ্খচিল, বসন্ত-বউরি, বউ কথা-কও, চোখ-গেল, ফটিক জল। চমৎকার হয়েছে কবিতাটা, নয়?"

"হ্যাঁ"—ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল। কোনক্রমে 'হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ করে সে কাগজ দুখানা সরিয়ে রেখে দিলে। রূপচাঁদ যে গ্রামোফোন ও রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটার দিকেও আড়চোখে চেয়ে দেখলে একবার। তার মনে হল, দুটো বিরাট গর্ত যেন মুখ ব্যাদান করে আছে তার সঙ্কীর্ণ পথের দু পাশে। একটু অন্যমনস্ক হলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

"ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। চমৎকার ছন্দটি।"

"ব্রাউন তো হয়ে গেল। এর পর—"

"হ্যাঁ, এর পর লিখুন ফিকে লাল—উইদিন ব্রাকেট Pale Pink নাইটজারের ডিম ফিকে লাল। নাইটজারের বাংলা নাম জানি না, হিন্দি নাম ডাভাক। সাদা শকুনের ডিম Pale Brick Red. সাদা শকুন দেখেছেন? অতি কুৎসিত পাখি, ডিমগুলি কিন্তু চমৎকার। Pale Brick Red-এর উপর কালোর ছিটেফোঁটা হল? এইবার লিখুন সাদার লিস্ট। চোর পাখি, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, Tickel's Flower Pecker—ইনি পাখিদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্ত-বউরি, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, নীলকণ্ঠ, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, ধনেশ, তাল-চোঁচ, প্যাঁচা সবরকম—কেবল কালো প্যাঁচার ডিমে একটু ক্রীমের আভাস থাকে, শকুনি—এক সাদা শকুনি ছাড়া, কিন্তু সাদা শকুনির ডিমও সাদা হয় অনেক সময়। তারপর লিখুন গরুড়, সাপমার। এদের ডিম নীলচে হয় আগেই বলেছি। কোড়ল, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, হাড়গিলে, সিল্‌হি, দীঘৌচ, বুশ কোয়েল (Bush Quail), মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা, ডোকহর, কালীশ্যামা। কালীশ্যামার ডিম অন্য রঙেরও হয় আগেই বলেছি। তারপর লিখুন পিট্টা। পাশে নোট করে নিন যে, চোরপাখি, ফিঙে, গরুড় এদের ডিমে সাদার উপর ছিটছিটও থাকে। আর ধনেশ, বামুন শকুনি, সিল্‌হি, এদের ডিম প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু তা দিতে দিতে ঠিক সাদা আর থাকে না, আর সোনাজঙ্ঘা আর ডোকহরের ডিম একটু ময়লাটে সাদা হয়। তারপর লিখুন—হল আপনার?"

ডানা লিখতে লিখতে শুধু যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, কবিতাটা পড়ার পর থেকে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এসব লক্ষ্য করলেন না। করলে হয়তো ক্ষান্ত দিতেন।

"এইবার লিখুন, সাদার সঙ্গে অন্য যে সব রঙের আভা আছে। শ্যামাভ সাদা—ক্যারকাটা,

সাতসয়ালি মানে মিনিভেট, চড়াই, সব ছিটছিট। Buzzard Eagle, যাকে দেশী ভাষায় বলে তিস্‌সা, আর খয়রার ডিম যে নীলাভও হয় তা আগেই বলেছি। তারপর আসুন—Pinky White–ফটিকজল, বুলবুল, সাধারণ চিল। ফটিকজলের সঙ্গে চিলের কি আকাশ-পাতাল তফাত! কিন্তু ডিমের রঙের ক্ষেত্রে মিলেছে এসে দুজনে। ভারি অদ্ভুত না? সারসের ডিমও Pinky White হয়, Pale green-ও হয়। এদের প্রত্যেকের ডিমে ছিটছিট। এর পর লিখুন Reddish white—লালমাথা বাজ, দর্জিপাখি এদের ডিম নীলাভও হয়। ডাহুক, ডাহুকের ডিম, ক্রীম রঙের হয় আগেই বলেছি। সকলের ডিমই ছিটছিট। তারপর লিখুন, পীতাভ সাদা—বগেরি, ভরত, তিলেবাজ, মাঠ-চিল সব blotched। গ্রেইশ হোয়াইট—শঙ্খচিল, যার স্বরে আনন্দবাবু সারং সুর শুনেছেন, আর Bustard Quail. তারপর লিখুন, কফি-সাদা—ময়ূর, এদের ডিম Pale creamও হয়। মোটামুটি এই হল ফর্দ। এর থেকে কি বোঝা যায়? একটু গবেষণা করা যাক আসুন।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডানা টোকা শেষ করে বললে, "একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ ডিমই ছিটছিট।"

"হ্যাঁ, অনেক ডিমই। এ বিষয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি। যত গাইয়ে পাখি আছে, সক্কলের ডিম ছিটছিট। ফটিকজল, বুলবুল, শ্যামা, কালীশ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরি, পাহাড়ীময়না, ভরত, দুর্গা-টুনটুনি—"

"আচ্ছা, কোকিলের কথা বললেন না?"

"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! কোকিলেরা তো একটা class by themselves—ওরা আলাদা একটা শ্রেণীই—parasitic—বাংলায় কি যেন ভাল একটা নাম আছে—"

"পরভৃতিক?"

"হ্যাঁ, পরভৃতিক। এরা পরের বাসায় ডিম পাড়ে। আমাদের দেশেই কোকিল সতেরো রকমের আছে। আচ্ছা, এদের কথা বলছি, একটু বিশ্রাম করে নিন আপনি।"

"চা করে আনি?"

"আনুন।"

বৈজ্ঞানিক একটা কাগজে তাড়াতাড়ি নোট লিখতে লাগলেন। ডানা উঠে চা করতে গেল।

"এইবার শুরু করা যাক আসুন। কোকিলদের রঙের বৈজ্ঞানিক নাম Cuculidoe—এটা আবার দু-রকম sub family-তে বিভক্ত—থাক্, অততে দরকার নেই—আমরা যে চার রকম কোকিল এ দেশে সাধারণত দেখতে পাই, তার কথাই লিখুন। প্রথম, যাকে আমরা কোকিল বলি, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কোয়েল, পাশে একটু ফাঁক রেখে দিন, বৈজ্ঞানিক নামটা আমি পরে বসিয়ে দেব। এরা কাক কিংবা দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙও ওদের ডিমের রঙের মতই হয়—ফিকে নীলচে সবুজ গোছের। একটু ছোট। ছিটছিট থাকে।"

আর একবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরাটা। উৎকর্ণ হয়ে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"নিন নিন, শিগ্‌গির লিখুন। ওটাকে দেখতে হবে এক্ষুনি। কোকিল জাতের দ্বিতীয় নম্বর পাখি 'চোখ গেল' ইংরেজী নাম Brain-Fever Bird বা Hawk Cuckoo, কারণ হঠাৎ এদের দেখলে বাজ বলে ভ্রম হয়। এরা সাধারণত ছাতারে জাতীয় পাখিদের বাসায় ডিম

পাড়ে। ছাতারেদের ডিমের মতোই এদেরও ডিম নীল—ছিটছিট নয় কিন্তু চমৎকার নীল। তৃতীয় যে কোকিল এ দেশে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি 'বউ কথা কও', এর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo. এরা সাধারণত হিমালয় অঞ্চলে বাচ্চা পাড়ে, এদেশেও হয়তো পাড়ে, ঠিক জানা নেই। যতদূর জানা গেছে, এরা হিমালয় অঞ্চলের পাখি Blue Chat অথবা Laughing Thrush-এর বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ নীল, কখনও ছিটছিট থাকে, কখনও থাকে না। তারপর চতুর্থ কোকিল যা আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে চাতক—Pied Crested Cuckoo—এদের সাধারণত বর্ষাকালেই বাংলা বিহার অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এরা থাকে—বিশেষ করে মাদ্রাজ অঞ্চলে। সিংহলেও প্রচুর আছে। আফ্রিকাতেও এ পাখি খুব দেখা যায়। অনেকের ধারণা এরা শীতকালটা কাটায় আফ্রিকায়, বর্ষার সময়ে এ দেশে আসে। এ দেশেই ডিম পাড়ে। এরাও ডিম পাড়ে ছাতারেদের বাসায় কিংবা Laughing Thrush-এর বাসায়। ডিমের রঙ নীল, কিন্তু ছিটছিট নয়।

আমি যে থিয়োরিটা খাড়া করেছি যে, গায়ক পাখিদের ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে, এরা তার ব্যতিক্রম বলতে পারেন। কিন্তু এদের ডিমে ছিটছিট না থাকার কারণও আছে। এরা পরের বাসায় চুরি করে ডিম পাড়ে, সেইজন্য তাদের ডিমের মতো ডিম পাড়তে হয় এদের। এদের কথা যদি বাদ দেন, তা হলে কিন্তু এটা বেশ দেখা যায়, যেসব পাখি গায়ক অথবা শিল্পী অথবা চতুর অথচ মানুষ-ঘেঁষা তাদেরই ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে। গায়ক পাখিদের নাম আগেই বলেছি। এইবার শিল্পীদের কথা লিখুন। বাসা তৈরি করবার সময় যারা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাদেরই শিল্পী বলছি। চোরপাখি, ফটিকজল, বুলবুলি, শ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরী, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, দুর্গাটুনটুনি, দর্জিপাখি—এরা অনেক ভাল গায়কই শুধু নয়, ভাল শিল্পীও! এদের বাসা চমৎকার। তারপর যেসব পাখি খুব চতুর বলে বিখ্যাত, অথচ যারা মানুষ-ঘেঁষা—যেমন ধরুন কাক, দাঁড়কাক, চড়াই, হাঁড়িচাঁচা, চিল—এদের ডিমও ছিটছিট এ সবের ব্যতিক্রম অনেক আছে, যেমন ধরুন ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচারা খুব যে মানুষ-ঘেঁষা তা নয়, কিন্তু ওদের ডিমেরও চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য। তবু কিন্তু একটা কথা মনে হয়—"

বৈজ্ঞানিক চুপ করে গেলেন।

"কি কথা?"

"মনে হয়, এরা শিল্পী-মানুষকে মুগ্ধ করে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের ডিমকে বাঁচাতে চাইছে। এরা মানুষের শিল্প-বোধকে কোনো না কোনো উপায়ে তৃপ্ত করে। হয় গান গেয়ে, না হয় সুন্দর বাসা-বানিয়ে, না হয় ডিমের রঙ দিয়ে এরা আমাদের মুগ্ধ করে যেন নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। ওদের গুণ দেখে আমরা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি মনে মনে। যাদের বাসা খুব সাধারণ কিংবা যাদের গানের গলা তেমন নেই, যাদের ডিম সাদা, যারা গর্তে বাসা বানায়, অথচ যারা মানুষেব সান্নিধ্যে থেকে মানুষের প্রতাপের সহায়তা কামনা করে (কামনা করে কিনা জানি না, এটা আমার থিয়োরি), তাদের দেখবেন প্রায়ই রূপ আছে। দেখতে চমৎকার। কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্তবৌরী, হুপো, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, পিট্টা, নানারকম হাঁস। ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচাদেরও এই দলে ফেলতে পারেন। যারা চমৎকার নয়, তারা আবার অদ্ভুত—যেমন প্যাঁচা, শকুনি, হাড়গিলা, মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা

প্রভৃতি। এরা অদ্ভুত রস দিয়েই বোধ হয় মানুষের রসবোধকে তৃপ্ত করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরা বিপদেও পড়েছে হয়তো একটু, কারণ মানুষও এদের ওপর কম অত্যাচার করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বোধ হয় একমাত্র জীব যারা জ্ঞাতসারে এদের রক্ষণাবেক্ষণও করে নিজেদের রসবোধের তাগিদে। এরা বোধ হয় সেটা বুঝেছে, তাই মানুষের কাছাকাছি এসে নানা ভাবে তাকে আনন্দ দিচ্ছে তার বদলে আদায় করছে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ। অনেকটা সিমবায়োসিস ধরনের। পাখিদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ। বেশির ভাগ সরীসৃপদের ডিম সাদাই হয়, তাই বোধ হয় অনেক পাখির ডিমও সাদা, আর যাদের ডিম সাদা তারা প্রায়ই ডিম পাড়ে গর্তে—লুকিয়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যাদের ডিম সাদা, তাদের ডিমেও মাঝে মাঝে রঙের ছিটেফোঁটা লাগছে। ডিমের রঙ বদলাচ্ছে এমন পাখি অনেক আছে—কালীশ্যামা, হাঁড়িচাঁচা এর অতি সাধারণ উদাহরণ। নানারকম রঙের ডিম হয় এদের। দর্জি পাখি, ভরত, বগেরি, টুনটুনি. নাইটজার, বাজ, তিলেবাজ, ময়ূর, রেন কোয়েল, জলমুরগি, কায়েম, সারস, হুক্না, গাঙচিল, কালো তিতির প্রভৃতি অনেক পাখি আছে যারা একাধিক বর্ণের ডিম পাড়ে। মনে হয়, ডিমের রঙ নিয়ে এরা যেন পরখ করছে, কোন্‌টা মানুষের পছন্দ হবে। অর্থাৎ পাখিরা যত আধুনিক হচ্ছে, তত যেন তারা মানুষের মনোহরণ করে মানুষের বন্ধুত্ব কামনা করছে। মানুষের মধ্যেও যেমন বিশ্ব মৈত্রীর ভাব জাগছে ক্রমশ, মানুষ ক্রমশ যেমন হিংসার পথ ত্যাগ করে প্রেমের পথ আনন্দের পথ বেছে নিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, পাখিদের মধ্যেও সেইরকম কিছু একটা হচ্ছে হয়তো। তা না হলে এত বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোনও মানে হয় না যেন। এসব কিন্তু আমার কল্পনা। যুক্তির নিক্তিতে ওজন করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটাকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রথমত, পাখিদের ডিমে পাখিরা সজ্ঞানে রঙ ফলায় না, যদিও অবশ্য ডিমের গায়ের রঙ ডিমটা ডিম্বকোষ থেকে বেরোবার পর যখন ডিম্বনালীতে আসে তখন লাগানো হয়, দ্বিতীয়ত—"

কাঠঠোকরাটা ডেকে উঠল আবার।

"চলুন, ওটা যাক। বিজ্ঞানের অংশটুকু লেখা হয়ে গেছে। কল্পনার তো শেষ নেই। উঠুন। কাঠঠোকরাটাকে দেখা যাক। চলুন, আর দেরি করবেন না। আসুন।"

তড়াক করে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক বারান্দা থেকে। ডানাও নাবল। পিছু ফিরে ডানার দিকে চেয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমরা যেটার ডাক শুনলাম, সেটা হচ্ছে Golden-backed Wood-pecker. এ অঞ্চলে আর একরকম আছে, সেটাকে বলে মারহাট্টা Wood-pecker. হিমালয় অঞ্চলে আরও দেখা যায় কয়েকরকম। এসব দেশেও আরও দু-একটা ছোট জাতের কাঠঠোকরা আছে। এই Golden-backed Wood-pecker-ই তিন রকম আছে—

আবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরা।

সিঁড়িটা দিয়ে তড়বড় করে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাড়াতাড়ি নাবতে গিয়ে ডানার শাড়িটা গেল জুতোর সঙ্গে আটকে। ঘাড় ফিরিয়ে তা দেখতে পেয়েই বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি এবং হাঁটু গেড়ে বসে ছাড়াতে লাগলেন সেটা।

"থাক্ থাক্ আমি নিচ্ছি ঠিক করে"—ডানা প্রতিবাদ করে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে! ছটফট করবেন না। বকলশের কাঁটার সঙ্গে আটকে গেছে পাড়টা। বকলশওয়ালা জুতোগুলো শাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না ঠিক। এই হয়েছে।"

বৈজ্ঞানিক উঠে দাঁড়ালেন। ডানার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন, "চলুন।"

ডানার গালের পাশটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ডানার পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি একখানা। বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জাভায় একরকম সবুজ রঙের বনমুরগি আছে, তারা blush করে। মনে কোনও রকম আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হলে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে তাদের। টার্কিদেরও হয়, ডানার কথা ভুলে এই কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে।

ডানার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আলোড়ন চলছিল। হঠাৎ তার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল এই শিশুপ্রকৃতির মানুষটিকে। দুরন্ত নদের মতো দুর্দম বেগে বয়ে চলেছে যেন। কি গভীর আর কি পবিত্র! কোনো অহমিকা নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো গ্লানি নেই। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। সেই কম্পিত গহ্বরটা ভেসে উঠল মানসপটে। রত্নপ্রভার মুখটাও।

...কবি আসছেন দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

"বাটান একটাও নেই। কাদাখোঁচাদেরও দেখতে পেলাম না। বকের সারি বসে আছে কেবল। দু-একটা সাদা-মাথা খঞ্জনও দেখলুম। ভারি আনন্দ পেলাম আজ।"

"নতুন কিছু দেখলেন?"

"নতুন কিছু নয়, সবই পুরনো, কিন্তু চমৎকার। দোয়েল ডাকছে, চোখ গেল ডাকছে, কোকিল ডাকছে, দুর্গাটুনটুনি ছটফট করে বেড়াচ্ছে। মাঠে গম কাটা হচ্ছে, সরষে কাটা হচ্ছে। আমের মুকুলের গন্ধে আমোদিত চারিদিক। অশ্বত্থগাছগুলো ভরে উঠেছে সবুজ কচি পাতায়। সজনে গাছে সজনে ঝুলছে। গাছটা যেন সহস্র আঙুল বাড়িয়ে মাটিকে ছুঁতে চাইছে আবার। অপরূপ হয়ে উঠেছে নিমগাছটা। আমড়াগাছের ডালে ডালে সবুজ শিখায় লেগেছে সোনালী রঙ, মরকতমণির মতো ছোট ছোট ফল ধরেছে। আতাগাছে পরশু পর্যন্ত কিছু ছিল না, আজ ভিড় করে এসেছে কিশলয়ের দল তার গাঁটে গাঁটে। ঘেঁটুফুল ধরেছে, মনে হচ্ছে, সবুজ ছোট একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে যেন লাল ঘোমটার ভিতর থেকে। তেলাকুচো ফলগুলো পেকে টুকটুকে লাল হয়েছে......"

কবি সোৎসাহে বলে চলেছিলেন, আরও হয়তো বলতেন, কিন্তু বাধা দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"কবিতা লিখেছেন নিশ্চয়?"

"লিখেছি। একটা পাখির বিষয়ে।"

"কি পাখি? আসুন, বসা যাক এইখানটায়। এইখান থেকে চারিদিক দেখা যাবে বেশ, কাঠঠোকরাটাকে দেখবার সুবিধে হবে। কোন্ পাখির বিষয়ে কবিতা লিখলেন? বক ছাড়া তো বিশেষ কিছু দেখেননি বলেছেন।"

"না, আর একটা পাখিও লক্ষ্য করেছি। আপনি সেদিন যে একটা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এর ছবি দেখেছিলাম। আমাদের দেশে পাখিটার নাম কানাকুয়া। বইয়ে লিখেছে— কুকো।"

"ও, দেখেছেন? ক্রো-ফেজান্ট (Crow Pheasant), চমৎকার পাখি, নয়? বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।"

"অদ্ভুত ধরনের"—বলে উঠলেন কবি, "বেশ একটু রহস্যময়। আমাদের আশেপাশেই

থাকে, কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। কাক বা শালিকের মতো খেলো হয়ে যায়নি। ও দিকটায় বসে ছিলাম, হঠাৎ দেখি, ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল, বেশ গম্ভীরভাবে ভারিক্কি চালে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্যাওড়াগাছের ওপাশে যে নির্জন জায়গাটুকু আছে সেইখানে। কালো রঙের সঙ্গে ডানার বাদামী রঙটা মানিয়েছে চমৎকার। কুকো নামটা ভাল নয়, কানাকুয়ো নামটাও না। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। ভাল হয়নি?"

"বেশ হয়েছে। ওরা কিন্তু জাতে কোকিল, তা জানেন?"

"হ্যাঁ, আপনার বইটাতে পড়লাম তাই। দেখলে মনে হয়, রিটায়ার্ড ডেপুটি বা মুন্সেফ গোছের, ফাজিল ফক্কোড় নয়, নিজের মতে নিজের পথে চলবার মতো মনের জোর আছে বলে মনে হয়। নিজেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, যদিও কোকিল। ডাকে প্যাঁচার মতো, কিন্তু নিশাচর নয়—"

"গুপ্ গুপ্ গুপ্ গুপ্"—হঠাৎ ডেকে উঠল বাদামী-কালো।

"আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, এক রকম প্যাঁচার ডাকও অনেকটা ওই রকম, আপনি পড়াশোনা করেছেন দেখছি।"

"ওর বিষয়েই কবিতাও লিখে ফেলেছি একটা। শুনবেন?"

"নিশ্চয় শুনব। পড়ুন।"

কবি ডানার দিকে ফিরে দেখলেন, ডানা ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে পরপারের দিকে। গালের পাশটা লাল হয়ে রয়েছে তখনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে কবি পড়তে লাগলেন—

বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল করে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
বিদ্রোহ পিক, কোকিল অথচ কোকিল নয়,
সমাজ-বিধিকে অমান্য করে থাকে।
কোকিলের মতো ডাকবে না কুহু-কুহু
কিছুতেই নয়,—উঁহু—
দিনের আলোয় প্যাঁচার মতন ডাকবে
কোকিলের মতো কালো কালো দুটো ডানা
পছন্দ নয়—না—না—
বাদামী রঙের শাল দিয়ে তাকে ঢাকবে,
আপনার মনে বেড়িয়ে বেড়াবে আস্তে সে
বন-বাদাড়ের ফাঁকে
বাদামী-কালোকে দেখেছে কখনও ভাল করে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
পরের বাসায় ডিম সে কখনও পাড়বে না
আপনার ডিমে তা দিতে কখনও ছাড়বে না
বলুক যা খুশি লোকে,

কবি বিরহীর হৃদয় কখনও কাড়বে না।
অজানা বেদনা মনে যদি জমে এসে
হঠাৎ ফেলবে কেশে,
মনে হবে বুঝি ফেটে গেল কারো পাঁজর,
নিঝুম দুপুরে চমকাবে বারে বারে
সে কাশির ঝঙ্কারে
মনে হবে বুঝি বাজল কোথাও ঝাঁঝর!
লুকিয়ে তখন চুপ করে বসে থাকবে সে
ঘন পল্লব শাখে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল করে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

কবি থামতেই বৈজ্ঞানিক বলে উঠলেন, "বাঃ পাখিটার মোটামুটি জীবন-চরিতই লিখে ফেলেছেন দেখছি। ওর যে 'ঝন্‌ন্‌' করে আর একটা ডাক আছে, সেটাও লক্ষ্য করেছেন উনি—। ....এ কি হল!"

ডানার দিকে চেয়েই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। কবিও দাঁড়ালেন। ডানা শুয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, হাত দুটো মুঠো করা।

"ফিট হয়েছে"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

"তাই তো দেখছি! কি করা যায়?"—কেঁপে উঠল কবির কণ্ঠস্বর।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ডানার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা সাপের মতো সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে।

"একটু জল দরকার"—বৈজ্ঞানিক বললেন, "চাকরটাকে খবর দেবেন? কিংবা চলুন, আমরা দুজনে ধরাধরি করে ওঁকে বাসায় নিয়ে যাই। আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন।"

চিত্রটা কবির কল্পনায় এমন বিসদৃশ ঠেকল যে, তিনি বলে উঠলেন, "না না, সে কি! চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবেন কি! জল আমি এনে দিচ্ছি এখুনি।"

ছুটে গিয়ে নিজের চাদরটা তিনি নদীর জলে চুবিয়ে নিয়ে এলেন।

চোখে মুখে জলের ছিটে লাগাতেই উঠে বসেছিল ডানা। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল সে নিজেই। এমন ব্যাপার আর কখনও তো ঘটেনি তার জীবনে! হঠাৎ বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। শুয়ে পড়েছিল সে? আশ্চর্য!

"এখন কেমন লাগছে?"—কবি জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভালই।"

"একটু জল এনে দেব কি আপনাকে? তেষ্টা-টেষ্টা পায়নি তো? রোদের তাত বেড়েছে তো আজকাল।"

"না জলের দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডানা তারপর সলজ্জ কণ্ঠে যা বললে, তা অপ্রত্যাশিত। বললে, "আপনি আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। ভারি লজ্জা করে আমার।"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কবি। তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সহজকণ্ঠেই তিনি উত্তর দিলেন, "ও, আচ্ছা, তা বেশ।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "চলুন, যাই।"

"অমরবাবু স্ট্রেচার আনতে গেছেন। একটু বস।"

"স্ট্রেচারের দরকার কি? আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

উঠে পড়ল ডানা এবং হাঁটতে শুরু করল। কবিও অনুগমন করলেন।

"আমার কাঁধের উপর হাতটা রাখ না হয়। দুর্বল মনে হচ্ছে না তো?"

ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে ডানা বললে, "না। এমনিতেই যেতে পারব।"

"খুব আস্তে আস্তে চল তা হলে।"

কবির কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল। তিনি হয়তো ডানাকে স্ট্রেচারের জন্য অপেক্ষা করতে আর একবার অনুরোধ করতেন, কিন্তু কোথা থেকে ঝঙ্কার দিয়ে ডেকে উঠল একটা পাখি। সুরের তুবড়ি ফুটল যেন শূন্যে। কুর কুর কুর কুর কুর কুর, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল......। ধাপে ধাপে চড়তে লাগল সুর।

"কি পাখি ওটা?"

"পাপিয়া।"

"পাপিয়াই বুঝি 'চোখ গেল' পাখি?"

"হ্যাঁ।"

ডানা আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। কবিও চুপ করে রইলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁর মনের ভিতর যা হচ্ছিল তা এত বিচিত্র এত গভীর, এত কোমল যে, তাতেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি, কথা বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলেন না। বাসাটার কাছাকাছি এসে তাঁর চমক ভাঙল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে। দেখা গেল, তিনি স্ট্রেচার এবং লোকজন নিয়ে আসছেন। রত্নপ্রভাও সঙ্গে আছেন।

"ওঁকে হাঁটিয়ে আনছেন?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন শঙ্কিত কণ্ঠে।

"আমার আর কোনও কষ্ট নেই। কেন জানি না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তখন, এখন আর কোনো কষ্ট নেই।"

কথা কটি বলেই ডানা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। রত্নপ্রভা গম্ভীর ভাবে একবার চেয়ে দেখলেন তার মুখের দিকে। কোনও কথা বললেন না। মনে মনে ডানার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন তিনি খুব, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আর একবার চাইলেন ডানার দিকে। চোখাচোখি হতেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গম্ভীর মাংসল মুখটা। কোনও কথা বললেন না কিন্তু।

....বাসায় পৌঁছে বৈজ্ঞানিক স্ট্রেচার এবং স্ট্রেচার বাহকদের বিদায় করে দিলেন। তারপর রত্নপ্রভার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের চা খাওয়াও একটু তুমি। এখানে সব ব্যবস্থা আছে বোধ হয়, না?"

"আছে। আমিই করে খাওয়াচ্ছি, উনি কষ্ট করবেন কেন?" ডানা উঠে ভিতরে গেল। রত্নপ্রভার গম্ভীর চোখে হাসির আভাস ফুটে উঠল আবার একটা। ডানার পিছু পিছু তিনি ভিতরের দিকে চলে গেলেন। কবি এবং বৈজ্ঞানিক বসে রইলেন বারান্দায়। পাপিয়াটা সমানে

ডেকে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ভাবছিলেন কবিকে, কিন্তু বাধা পড়ল। পিওন হাজির হল একটা। বললে, সে আনন্দবাবুকে খুঁজছে, টেলিগ্রাম আছে একটা।

কবি ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পড়লেন টেলিগ্রামটা। বিনয়ের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তাঁদের নেবার জন্যে লোক আসছে।

কবি চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাড়ি চলে গেলেন।

।। আট ।।

বিনয়ের বিয়েতে যাবার ইচ্ছে কবির ছিল না। প্রথমত বিয়েবাড়ির গোলমাল ভালই লাগে না তাঁর; দ্বিতীয়ত, ভয় হচ্ছিল, ডানাকে কেন্দ্র করে তাঁর মানস-সরোবরে যে অপরূপ পদ্মটি ফুটছে ধীরে ধীরে, তা ঝরে পড়বে এই সব টানা-হেঁচড়ায়। ডানার প্রেমে পড়ে তিনি যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তা ঠিক নয়। হাবুডুবু খাওয়ার বয়স পার হয়েছিলেন তিনি। মানসিক গঠনটাও তাঁর অন্য রকম, তবু তিনি প্রেমেই পড়েছিলেন। চন্দ্রের টানে যেমন জোয়ার আসে, ডানার সংস্পর্শে তাঁর মনে তেমনই এমন একটা ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল যা যে কোনও কবির পক্ষে পুলকপ্রদ, অন্য কোনও কারণে নয়, তা কাব্যসৃষ্টির অনুকূলে বলে। যা সৃষ্টির প্রেরণায় মনকে উন্মুখ করে তোলে, স্পর্শে নিমেষে মনের মেঘে ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে, কল্পনাবীণায় লক্ষ সুরের সম্ভাবনা কাঁপতে থাকে, তাকে উপেক্ষা করা কবিমনের পক্ষে অসম্ভব, সাধারণ জীবের পক্ষে যেমন অসম্ভব খাদ্যকে উপেক্ষা করা। কাব্যই কবির জীবন, কাব্যেই তাঁর স্ফূর্তি, কাব্যলোকই তাঁর কাছে একমাত্র আনন্দলোক। কিন্তু কাব্যের আনন্দরূপ কবি-মনেও মূর্ত হয় না সব সময়ে, সরসী থাকলেই যেমন কমল ফোটে না। ঊনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত অপরূপ উপলক্ষ এসে হাজির হয় অকস্মাৎ কোনো অজানা আকাশ থেকে। শিহরন জাগে, পাখি ডাকে, সাড়া পড়ে যায় কিশলয়দের নিদ মহলে, বাঁশী বেজে ওঠে বনে বনে, কাব্য সুরধুনী মর্ত্যে অবতরণ করেন স্বর্গলোক থেকে। আনন্দবাবুর কবি-মন অবসন্ন হয়েছিল যেন এতদিন। ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতেন বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। ডানার অভ্যাগমে মরা-খাতে বান এসেছে হঠাৎ, মঞ্জুরিত হয়ে উঠছে শুষ্ক তরু। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন নতুন করে বিকশিত হয়েছে এই নতুন বৃন্তটির উপর। ডানার প্রেমেই তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু সাধারণত প্রেমে পড়া বলতে যে ধরনের জৈবলীলা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। এ তার চেয়ে ঢের বেশী তীব্র। হঠাৎ কোনো বাঁশীতে কোনও বংশীবাদক যদি নিজের মনের সুরটি প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে যান, তা হলে সেই বাঁশীর প্রতি তাঁর যে ধরনের টান হয়, ডানার প্রতি কবির টানটাও সেই ধরনের। যে বস্তুকে অবলম্বন করে মন অবাস্তব কল্পলোকে উড়ে যেতে পারে, ডানা যেন সেই অপরূপ বস্তুর, সেই নিখুঁত দেহ-শিল্প, যার মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই ডানাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাবার চিন্তা অসহ্য তাঁর কাছে। কিন্তু মন্দাকিনীকে কি যে বলবেন, তাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। সত্য কথা বলা অসম্ভব। অনর্থকও। মন্দাকিনী তার ঠিক মর্মটি বুঝবেন না। রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই কবি বাড়ি পৌঁছলেন টেলিগ্রামটি নিয়ে। খবরটা শোনামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন মন্দাকিনী।

"যাক, শেষ পর্যন্ত খবর একটা পাওয়া গেল তবু। আমার ভয় হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ভেসে গেল বুঝি আবার সব। কালই লোক আসছে? তা হলে তো রাজু ধোপার কাছে এখনই লোক পাঠাতে হয়, একটি গাদা কাপড় তার কাছে। ঠাকুরটাকেই পাঠাই না হয়—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। মাত্র একটি দিন হাতে, অনেক কিছু ব্যবস্থা করে যেতে হবে তাঁকে। গিয়েই তো ফিরে আসা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত মাস দুই থাকতে হবে সেখানে।

অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি, ছাড়বে কি তারা সহজে? তা ছাড়া, খোকনের গ্রীষ্মের ছুটি সামনে। মামাদের আমবাগান ছেড়ে সে কি আর আসতে চাইবে? এখানকার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব করেই যেতে হবে। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিন্তু মন্দাকিনী এক গুরুতর সমস্যায় পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।

আনন্দমোহন মন্দাকিনীকে খবরটা শুনিয়ে নিজের তেতলার ঘরটিতে গিয়ে বসে ছিলেন চুপ করে। পালে হাওয়া লেগেছে, নৌকোটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এ কি সর্বনেশে মেঘ দেখা দিলে ঈশান কোণে! বিনয়ের বিয়েতে তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই—এর আভাস মাত্র তো প্রকাশ করা যাবে না মন্দকিনীর কাছে! অসুখের ভান করবেন?

মন্দাকিনী এসে প্রবেশ করলেন।

"ওগো, শুনছ সুন্দরীকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? পোয়াতি গাই এমনভাবে ফেলেযাওয়া কি উচিত ঠাকুর-চাকরের হাতে? সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় না? সেখানে আমাদের বেশ বড় গোয়াল-ঘর আছে।"

"পাগল নাকি! গাড়ি পাবে কোথায়? এখন কি আর সেদিন আছে, মানুষই গাড়িতে জায়গা পাচ্ছে না এখন, তা গরু—'

"তা হলে উপায়? ও কি, কোমরে হাত বুলোচ্ছ কেন?"

"কোমরটায় ব্যথা হয়েছে।"

"তা হলে তুমি থেকে যাও না হয়। ওখানে গিয়ে অত্যাচারে আবার বেড়ে যায় যদি। অত্যাচার হবেই, ভিড়ের বাড়ি তো। সেই ভাল। ঠাকুর তো রইল, লোকটা রাঁধে ভাল, মসলার হাতটা কম। তুমি থাকলে সুন্দরীর সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব। সেই ভাল।"

কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে কবি বললেন, "ওঁরা আবার মনে করবেন না তো কিছু? বিনয় হয়তো ভাববে—"

"কি আবার ভাববে? কোমরে ব্যথা নিয়ে যেতে হবে তা বলে?" কবি চুপ করে রইলেন। মন্দাকিনী তাঁর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যার অর্থ—বুড়ো বয়সে এমন হুজুকে হওয়ার কোনো মানে হয় না।

কবি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। আকাশে ধপধপে সাদা স্তূপ-মেঘ জমে রয়েছে খানিকটা, আর সেই পটভূমিকায় বিরাট একটা পাখি ডানা মেলেছে। সাদার মাঝখানে কালো। চমৎকার দেখাচ্ছে। দূরবীনটা তুলে নিয়ে দেখলেন। দেখে কিন্তু হতাশ হয়ে গেলেন একটু। শকুনি। তখনই আবার মনে হল, এতে দুঃখ করবার কি আছে? শকুনিও পাখি। সৃষ্টির মহাকাব্যে ওর স্থান দোয়েল-কোকিলের চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথাও মনে হল। যুক্তি দিয়ে আমরা যা মানি, কার্যকালে তা মানি কি? নিরপেক্ষতার পোশাকী মুখোশটা দার্শনিকতা আস্ফালন করবার সময়ই ব্যবহার করি আমরা। প্রতি মুহূর্তের কাজে কিন্তু উৎসাহ পাই নিজেদের অতি-সঙ্কীর্ণ ভাল লাগার প্রেরণায়। পাপিয়া দোয়েলই

আমাদের আনন্দ দেয়, শকুনি নয়। শকুনি অতি উপকারী পাখি জেনেও আমরা তাদের আমল দিতে চাই না ভাল-লাগার ক্ষেত্রে। অথচ উপকারী পাখির উপকারকে আমরা যে তুচ্ছ করি তাও নয়। এই চিন্তাটা অনেকক্ষণ আবিষ্ট করে রাখল কবির মনকে। প্রাচীন গ্রীকদের কথা মনে পড়ল। তাঁরা তাঁদের সমাজব্যবস্থায় মোহিনী এবং কল্যাণী উভয়েরই গৌরবময় স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বিবাহ করতেন স্বাস্থ্যবতী নারী দেখে, যাঁরা সন্তানের জননী হয়ে গৃহলক্ষ্মীর বেদী অলঙ্কৃত করতেন, যাঁরা ছিলেন গার্হস্থ্যধর্মের প্রাণস্বরূপ, জাতির জন্য বীর সন্তান মানুষ হত যাঁদের কোলে। মোহিনী হওয়ার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। মোহিনীদের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র মাধুর্য বিশিষ্ট। তাঁদের কাজ ছিল মুগ্ধ করা। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী কবি রাজা সেনাপতি ছাত্র অধ্যাপক সকলকেই প্রেরণা যোগাত ওই মোহিনীর দল। তাদের মুঞ্জরিত যৌবনশ্রী স্পর্শমণির মতো সকল স্বপ্নকেই সোনার স্বপ্ন করে তুলতে পারত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, ডানা আর মন্দাকিনীকে অবলম্বন করে মন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ করেছে। সেই স্বপ্নলোকে সুন্দর হয়ে উঠেছে দুজনেই। ছন্দাবিষ্ট মন বন্দনা করছে দুজনকেই।

স্নিগ্ধ শ্যামল ছোট গ্রামখানি
বাঁধিছে শতেক বন্ধনে
দূর দিগন্তে কার হাতছানি
ডাকিছে অচেনা নন্দনে
চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে
দোলে অপরূপ হিন্দোলে
পুরাতন মন বলে বারে বারে
নব সুর নব ছন্দ নে।

কত নিঃসাড় হল যে উতলা
অশান্ত হল শান্ত যে
কত লৌহের শান্তি অচলা
নাশিল অয়স্কান্ত যে
দোলে হিন্দোলা সীমা-অসীমায়
শুষ্ক তরু ও মঞ্জুরে
পরিচিত পথে পথ ভুলে যায়
অতীব প্রাচীন পান্থ যে।

কবিতাটা লিখে শান্তি পেলেন তিনি। ডানার প্রতি তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়েছে—এর একটা সঙ্গত অজুহাত আবিষ্কার করে ফেললেন যেন। তাঁর মনে হল, জীবনের এবং জাগতিক ব্যাপারের কোনও কিছুর উপরই তো হাত নেই তাঁর। বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—এ যেমন তিনি রোধ করতে পারেন না, ডানার প্রতি এই আকর্ষণও তেমনই অনিবার্য। এও রোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। সে চেষ্টা না করে বরং আত্মসমর্পণ করাই ভাল। শুধু তাই নয়, নিয়তিনির্দিষ্ট এই বিধানকে মেনে নিয়ে সেটা উপভোগ করাই উচিত। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটা বিবেকের মোহে পড়ে আত্ম-নির্যাতন করার কোনও অর্থ হয় না। নিঃসাড়কে যে শক্তি উতলা করে,

চক্রবালরেখায় যে অজানার আহ্বান উন্মুখ করে তুলছে সমস্ত চিত্তকে, জড় লৌহকে চঞ্চল করে তুলছে যে অচেনা চুম্বকের মায়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ্ করলে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ নেই! কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে আনন্দ আছে। জীবনে আনন্দই তো কাম্য। হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। শিস দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন।

.....অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ সুরে ছন্দিত হয়ে উঠল চারিদিক। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, পুরুষ টুনটুনিটা কল্‌কে ফুলের ডালে বসে মুখ উঁচু করে ডেকে চলছে। কুচকুচে কালো পোশাক পরে বরবেশে সেজেছে। কাঁঠালগাছে গিয়ে বসল আবার। দুরন্ত দামাল একটা কালো প্রজাপতি যেন। কিংবা এক টুকরো কালো মেঘ। অন্তর্নিহিত বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে। আবার ডাকল। মনে হল মূলতানের আলাপ যেন। টু হুইট টু হুইট টু হুইট—গুলতানি করতে করতে আবার ছুটে গেল আমগাছের দিকে। ওই টুনটুনি-বউ বসে আছে আমের মুকুলের আড়ালে। উড়ে গেল অন্য গাছে। আবার নতুন একটা সুরের ফোয়ারা ছড়িয়ে পুরুষ পাখিটা ছুটল তার পিছু পিছু। দুপুরের রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে একটা। মাঠে মাঠে গম যবের পক্ব স্বর্ণকান্তিতেও যেন যৌবনের আভাস ফুটেছে। হাওয়ায় দুলে দুলে তারা যেন উপভোগ করছে দামাল টুনটুনি-দম্পতীর প্রণয়লীলা। সামনে ডেকে চলেছে পুরুষ টুনটুনিটা। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ উতলা করে তুলেছে প্রকৃতিকে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো উড়ে এল এক ঝাঁক উপমা কবির মনে, আকাশের কোনো অদৃশ্য স্বপ্নলোক থেকে। ছন্দের আবেগে কাঁপতে লাগল মন। টেবিলে গিয়ে বসলেন। টুনটুনির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

১

কুচকুচে রঙ ছোট্ট পাখি
গাইল কি সুর মূলতানই?
বুকফাটা এ কান্না নাকি
কিংবা কেবল গুলতানই!
নাইক মুকুট নাই জড়োয়া
নাই তবু তার কুছ পরোয়া
তম্বি করে বেড়ায় যেন
হাবশীদেশের সুলতানই।
আলোর বানে দিচ্ছে পাড়ি
আঁধার নায়ের মাল্লা নাকি
কাশিম মিঞার খুঁজছে বাড়ি
মরজিনার আবদুল্লা নাকি!

২

টুনটুনি-বউ কোথায় ওগো
বসলে গিয়ে কার ডালে
রোদ-বাহারি গান শোন গো
তাল দাও না তার তালে।

কান্না ও কি লক্ষ হিয়ার
মেঘদূত কি যক্ষ-প্রিয়ার
চোখের তারা কোন্ তন্বীর
জীবন্ত তিল কার গালে?

সূর্যলোকের হাপর থেকে
ছিটকে এল কয়লা নাকি
কিংবা এল দ্বাপর থেকে
সেই কেষ্ট গয়লা নাকি।

৩

আলোক-ধোয়া কয়লা ও যে
আগুন জ্বলে ওর বুকে
রাজার ছেলে গয়লা ও যে
রাধার বাঁশী ওর মুখে
চিরন্তনের ওই নমুনা
গঙ্গাবুকে ওই যমুনা
বইছে সুখে তোয়াক্কা নেই
আজ কাল বা পরশুকে।

মহাকালের শুভ্র ভালে
মহাকালীর টিপটি যেন
সমুদ্রেরি ঊর্মিজালে
মাটির ছোট দ্বীপটি যেন।

।। নয় ।।

সেদিন সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর থেকে ডানা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঙ্গত একটা কারণ খুঁজে বার করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে সে মনে মনে। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে দুজন স্বল্পপরিচিত পুরুষের সামনে এমনভাবে নিজের শালীনতাকে ক্ষুণ্ণ করলে কেন সে? কোনও উঁচু জায়গা থেকে হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে পড়ে গেলে অনেক সময় লোক যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারও কি সেই ধরনের কিছু হয়েছিল? সেও কি নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও উচ্চলোকে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল মনে মনে? কোথায়? ভাবাবেগের আতিশয্যে লোকে সংজ্ঞা হারায় শোনা গেছে। তারও কি তাই হয়েছিল? সেও কি কোনও অন্তর্নিহিত রুদ্ধ ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল? কি ধরনের ভাবাবেগ? মনে তো পড়ে না-কিছু! কিছুই নির্ণয় করতে পারছিল না সে। কিন্তু এ কথাও সে ভুলতে

পারছিল না যে, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। এমন একটা কিছু যা উপেক্ষণীয় নয়, যা হয়ত ইঙ্গিতে এমন একটা সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছে যার নিগূঢ় মর্ম তার মর্মবাণীরই আভাস। বীজকে বিদীর্ণ করে যেমন অঙ্কুরের আগ্রহ, ঝড়ের প্রাবল্যে সূচিতা হয় যেমন বায়ু-চাপের অসাম্য, তেমনই প্রবল অঘোম কোনও শক্তি সেদিন ঘোষণা করে গেছে তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব, জানিয়ে গেছে তার জাগরণের বার্তা।......

নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ করে বসেছিল সে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। ফিট হওয়ার পর থেকে কেমন যেন দুর্বল বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, যেন কতকাল অনাহারে আছে। হঠাৎ নদীর ধারের শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। বিশাল বলিষ্ঠ গাছটা লাল লাল ফুলে ভরে রয়েছে। ফুল নয়, ওর বলিষ্ঠতাটাই বিশেষ করে চোখে পড়ল। চোখে পড়ল ওর দুর্দম পৌরুষটা। মনে হল, কত শীততাপ, কত বর্ষা, কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্রপাত সহ্য করে যুগযুগান্ত দাঁড়িয়ে আছে ও মাথা উঁচু করে। কি একটা পাখি যেন বাসা বাঁধছে ওর ডালে। অমরবাবু বই দিয়েছিলেন একটা পড়বার জন্যে, কোলের উপর ছিল সেটা এতক্ষণ, উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল সেটা। মন কিন্তু বসল না। চোখ বার বার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ওই বলিষ্ঠ শিমুলগাছটাকে, আর মন উৎসুক হয়ে উঠল পাখির বাসাটা দেখবার জন্যে। বইটা রেখে উঠে পড়ল সে। নদীর ধারে শিমুলগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছেই সজনেগাছের উঁচু ডালে বসে ছিল একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আস্তে আস্তে ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ড্য ড্য ড্য ধরনের শব্দ করছিল কিছুক্ষণ থেমে থেমে। ডানাকে দেখে হঠাৎ সেটা উড়ল পাখা মেলে উচ্ছ্বসিত কলরবে চতুর্দিক সচকিত করে। ডানার মনে হল, তাকে দেখে অট্টহাস্য করে বলে উঠল যেন—এসেছে, এসেছে, ও-ও এসেছে এবার। ডানা শিমুলগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল, নূতন করে বিস্মিত হল সে আবার শিমুলগাছের শিকড়গুলো দেখে, কেবল বিস্মিত নয় রোমাঞ্চিত হল। বলিষ্ঠ শিকড়গুলো কি প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে আছে মাটিকে, কি দুর্বার আগ্রহে ঢুকে গেছে মাটির ভিতর! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেগুলোকে। স্পর্শ করে কেমন যেন আনন্দ হল একটু। তারপর বসল তার উপরে। বর্ষাকালে নদীর স্রোতে মাটি ধুয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে শিকড়গুলো। নিশ্চল একটা অক্টোপাস যেন। নিশ্চল, কিন্তু সজাগ অত্যন্ত সজাগ, এবং সক্রিয়। প্রতি মুহূর্তে শোষণ করছে রস। প্রাণরস। একটু দূরে একটা গোদা চিল এসে বসল মাঠের উপর। নখে করে কি যেন এনেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ডানা চেয়ে দেখতে লাগল মুগ্ধ বিস্ময়ে। এই হিংস্র পাখিটার হিংস্রতার মধ্যে একটা বিরাট সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে লাগল যেন সে। প্রত্যক্ষ করতে লাগল, কি বিচিত্র প্রেরণায় বিকশিত হচ্ছে জীবনের নব নব রূপ অভিব্যক্তিতে। চরাচরের সমস্ত কিছুই বাঁচতে চাইছে, উপভোগ করতে চাইছে নিজের অস্তিত্বকে নানাভাবে এবং তার জন্যে না করছে এমন জিনিস নেই। ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, সভ্য-অসভ্য, হিংস্র-অহিংস্র সব কিছুই হচ্ছে সে জীবনকে সার্থক করবার প্রেরণায়। সে বাঁচতে চায়, অমৃত চায় এবং সেই জন্যেই চায় এমন একটা আশ্রয়, যাকে অবলম্বন করে সে হাত বাড়াতে পারে আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের দিকে। পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় না থাকলে আকাশের দিকে তাকানো যায় না, সাগরের রহস্য জানতে হলে তরণী চাই। আনন্দসুধা পান করতে হলে চাই একটা পাত্র। ডানার মনে হল, তার তো কিছুই নেই। তার হঠাৎ সে যেন সেদিনের ফিটের কারণটা আবিষ্কার করে ফেললে। মনে হল, অন্তরের গহনলোকে তার গোপন

সত্তা স্বপ্ন-প্রাসাদের শিখরে উঠে বোধ হয় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অমৃতের পিপাসায়, হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল তার সেখানে থেকে। অলীক স্বপ্ন-প্রাসাদ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল, কিন্তু শূন্যলোক থেকে তার আকস্মিক পতনটা মূর্ত হয়ে রইল তার মূর্ছায়। সমস্ত চেতনাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তার সেদিন। অন্ধকার হয়ে গেল যেন চতুর্দিক।

.......অবলম্বন? শূন্য দৃষ্টিতে সে নদীর দিকে চেয়ে বসে রইল। চিলটা উড়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটা মাছরাঙাকে, দেখতে দেখতে কাছে চলে এল। সাদা রঙে কালোর ডোরা কাটা। জলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে উড়ে আসছিল। সহসা স্থির হয়ে গেল শূন্যে, পাখা দুটো নাড়তে লাগল কেবল—তারপর হঠাৎ জলের উপর ছোঁ মেরে উড়ে চলে গেল আবার। পদশব্দ শুনে ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, অমরেশবাবু আসছেন হনহন করে।

"আপনি এখানে? স্যান্ড পাইপার (Sand Piper) দুটোকে দেখছেন বুঝি? এই বোধ হয় লাস্ট ব্যাচ এইবার ওরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। স্যান্ড পাইপারগুলো অবশ্য সবচেয়ে শেষে যায়, এপ্রিল মে পর্যন্ত থাকে।"

"কোন্‌গুলো স্যান্ড পাইপার? আমি দেখতে পাইনি তো!"

"ওই যে ওপারে জলের ধারে ধারে ঘুরছে। এইটে নিয়ে দেখুন।"

গলায় ঝোলানো বাইনাকুলারটা খুলে ডানাকে দিলেন তিনি। ডানা দেখতে লাগল।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওগুলো স্নাইপ নয়?"

"না। স্নাইপের মতো, কিন্তু স্নাইপ নয়। স্নাইপের লক্ষণগুলো সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়!"

বাইনোকুলারটা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে ডানা হেসে উত্তর দিলে, "সব মনে নেই। ফ্যানটেল আর পিনটেল—এই দুটি কথা মনে আছে খালি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আচ্ছা, আর একদিন বলব এখন। আমাদেরই মনে থাকে না, আপনি তো মাত্র একদিন শুনলেন। এখন শুনুন যে জন্যে এসেছিলাম। দুটো রেডস্টার্ট ডিসেক্ট করেছিলেম, তাদের ওভারিগুলোর সেক্‌শন করে স্টেন করে মাউন্ট করে ফোটো তুলছি, এগুলো আমার ওই মাইগ্রেশনের (Migration) প্রবন্ধের সঙ্গে রেখে দিতে হবে। প্রবন্ধটা তো আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, টাইপ করা হয়ে গেছে।"

"ওর সঙ্গেই গেঁথে রাখতে হবে ফোটোগুলো।"

"আর কটা রেডস্টার্ট আছে? সবগুলোকেই ডিসেক্ট্ করবেন নাকি?"

"না, বাকিগুলোকে ছেড়ে দিলাম আজ। রিং পরিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটার পায়ে। অনর্থক কষ্ট পাচ্ছিল বেচারারা।"

"বেশ করেছেন।"

আনন্দিত হয়ে উঠল ডানা খবরটা শুনে। এতদিন সে অনুভব করছিল, রেডস্টার্টগুলোর অবস্থার সঙ্গে তার নিজের অবস্থার কোথায় যেন মিল আছে একটা।

"এবার আর একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করব।"

"কি ?"

"এই তো ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হচ্ছে, এইবার পাখিরা বাসা বানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি নানা জায়গায় কয়েকটা বাসা বানিয়ে দেব ভাবছি, দেখা যাক, তার কোনোটাতে কেউ আসে কি না! আপনার এখানেও দেব কয়েকটা, আপনিও লক্ষ্য রাখতে পারবেন।"

"পাখির বাসা আপনি কি করে বানাবেন? যন্ত্র আছে নাকি কোনো রকম?"

"না না, পাখির বাসা বানাব না ঠিক। আমি কাঠ দিয়ে এমন কয়েকটা আশ্রয় করে দেব যার ভিতর ওরা বাসা বাঁধতে প্রলুব্ধ হবে, অবশ্য হবে কি না সন্দেহ কারণ ওরা ভারি চালাক। বিশেষত যারা গাছের ডালে কিংবা ঝোপে বাসা করে, তাঁরা কেউ আসবে না। বুলবুলি, ওরিওল (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছে কনকসখি), এরা কেউ আসবে না। তবে কতকগুলো মানুষ-ঘেঁষা পাখি আছে, যেমন— শালিক, চড়াই—এরা আসতে পারে। গাইয়ে পাখিদের মধ্যে দোয়েল, সিপাহী বুলবুল অনেকটা মানুষ-ঘেঁষা, কিন্তু ওরা আসবে না। আর আসতে পারে যারা স্বভাবত গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, যেমন ধরুন বসন্ত-বউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা, ময়না, নীলকণ্ঠ হুপো (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন মোহনচূড়া), প্যাঁচা— ওহো, একটা জিনিস ভুলে গেছি তো এইখানে গেল বছর হুতোম প্যাঁচা দেখেছিলাম ওই দিকটায়। ওরা নদীর ধারেই সাধারণত থাকে। এই সময়েই ওরা ডিম পাড়ে, আসুন তো, খোঁজ করা যাক।"

বৈজ্ঞানিক সহসা ঘুরে খানা-খন্দ বনবাদাড় ভেঙে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো নদীর পাড়, মাঝে মাঝে গর্ত, কাঁকর আর পাথরের টুকরো ছড়ানো চারিদিকে। এসবের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে বৈজ্ঞানিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন! ডানার যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে একবারও ফিরে তাকাননি, কিন্তু এটা বড় গর্ত ল্যম্ফ দিয়ে পার হবার পর সহসা তাঁর খেয়াল হল যে, ডানা বোধ হয় এটা লাফিয়ে পার হতে পারবে না। পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, ডানা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলেন। গর্তটার ওপারে ডানা এসে হাজির হল একটু পরে।

"ওটা লাফিয়ে পার হতে পারবেন?"

"না।"

"তা হলে এক কাজ করুন, আপনি গর্তটার ভিতর নেবে এদিকে চলে আসুন। আমি হাত ধরে আপনাকে তুলে নিচ্ছি এদিক থেকে।"

তাই হল। গর্তটার ভিতর ডানা কোনো রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে নেবে পড়ল, তারপর এগিয়ে গেল অমরবাবুর দিকে। অমরবাবু ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। অমরবাবুর হাত ধরতে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা এল ডানার মনে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ আকর্ষণে পরমুহূর্তেই সে উপরে উঠে পড়ল।

"চলুন, আর বেশি দূর নেই। ওই উঁচু পাড়টার উপর যে গাছটা ঝুঁকে রয়েছে—"

দূরবীন দিয়ে দেখলেন একবার গাছটাকে।

"হ্যাঁ, গাছের গুঁড়িতে গর্তটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব বাসা আছে ওখানে, চলুন যাওয়া যাক।"

আবার অগ্রসর হতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। এদিকটার পথ আরও খারাপ। কেবল উঁচু-নীচু।

বড় বড় পাথর পড়ে আছে চারিদিকে। পুরনো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে এক দিকে। কারও বাড়ি ছিল বোধ হয় এখানে কোনো কালে। ডানার চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই সত্যটাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে এই কষ্টটাকে ডানা তীব্রতর করে তুলতে পারত, কিন্তু সে কথা তার মনেই হল না। তার এসব কিছুই মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল তার একটা। অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছিল সে হঠাৎ। খুব ছেলেবেলায় সে তার বাবার সঙ্গে একবার একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত কাটাতে হয়েছিল সেই পাহাড়ে একটা ডাকবাংলায়। মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। সেই অচেনা জায়গায় নিশীথ রাত্রে তার মনে যে অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব জেগেছিল, সেইটে যেন ফিরে এল হঠাৎ আবার এই রৌদ্রালোকিত প্রখর মধ্যাহ্নে এতদিনের পর। তা ভয় নয় দুর্ভাবনাও নয়। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে একা বিছানায় শুয়ে তার সমস্ত চিত্ত যেন একাগ্র হয়ে উঠেছিল, কিসের প্রত্যাশায় তা সে জানে না। কিন্তু উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে সে একটা কিছু আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা অভূতপূর্ব কিছু ঘটবে। বুঝি এখনই গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে আরও নীরব বা সহসা সচকিত করে দেখা দেবে সে। হয়তো সে রূপকথার রাজপুত্র, কিংবা আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য, মানস সরোবরের শ্বেতকমল বা কাব্যলোকের ওমর খৈয়াম.....ধীরে ধীরে মর্মরধ্বনি উঠেছিল সুচীভেদ্য তমসার মর্ম ভেদ করে, নিস্তব্ধতা ছন্দ পাচ্ছিল ধীরে ধীরে, সে চুপ করে শুয়েছিল, বিনিদ্র নয়নে...।

"একটা মুশকিল হল কিন্তু। ওঠা যাবে কি করে?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে ডানা আত্মস্থ হল। দেখলে বৈজ্ঞানিক ঊর্ধ্বমুখ হয়ে হেলানো গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে আছেন। উঁচু পাড়ের উপর হেলে আছে বিরাট বটগাছটা।

"ওই গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে চওড়া কালো দাগটা যেখানে রয়েছে? ওখানে হুতোম প্যাঁচার পক্ষে আইডিয়াল বাসা হওয়া উচিত।"

দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগলেন। ডানা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা বিরাট বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নির্ভয়ে। বাঘটা এখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে হুতোম প্যাঁচার বাসার দিকে, তার সমস্ত আগ্রহ এখন ওই দিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি সে তার দিকে ওই আগ্রহ নিয়ে দৃষ্টি ফেরায়— একটা শিহরণ বয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে।

"ওটা প্যাঁচারই বাসা, বুঝলেন—ও, এই যে—"

হঠাৎ বৈজ্ঞানিক লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন, মাটিতে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন কি যেন।

"এই যে পালক রয়েছে এখানে মাছের আঁশও রয়েছে। ও, কেটুপার পালকও রয়েছে দু-একটা। আর সন্দেহ নেই, ঠিক ওইটেই ওর বাসা। বাসার ভিতরটা একবার দেখা দরকার। কিন্তু মুশকিল, অত উঁচুতে ওঠা যায় কি করে বলুন তো? একটা মই আনতে হবে আর কি।"

হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"এক কাজ করবেন? এখনই তা হলে ডেফিনিট্‌লি বোঝা যায়।"

"কি বলুন?'

"আমার পিঠের উপর দাঁড়াতে পারবেন? আমি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি এই

পাথরটায় ভর দিয়ে। আপনি ওই শিকড়টা ধরে ওই খাঁজটায় পা দিয়ে আমার পিঠের উপর চড়ে দেখুন তো, ঠিক নাগাল পেয়ে যাবেন।"

এই প্রস্তাবে ডানা এত বিস্মিত হয়ে গেল যে তার নির্বাক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাক হতে পারলে না সে। বরং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ছি ছি, কি যে ছেলেমানুষি করেন আপনি! আপনার পিঠের উপর দাঁড়াব কি?"

"ও আচ্ছা, থাক তা হলে।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তিনি একজন মহিলার কাছে অসঙ্গত প্রস্তাব করে ফেলেছেন—এ বোধটা সহসা জাগ্রত হল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে ডানার মনে হল, যেন কোনও ক্রীড়নক-লুব্ধ শিশুর হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিয়েছে কেউ। মায়া হল তার।

"আপনার পিঠের উপর দাঁড়ালে আপনার লাগবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি।

"কিছুমাত্র না। আপনি আর কত ভারী হবেন!"

"খুব হালকাও নই, মাস ছয়েক আগে আট স্টোন ছিলাম।"

"মোটে? ওতে কিছু হবে না আমার। রত্না পাক্কা দশ স্টোন। পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমরা একবার। হেঁটে উঠেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে রত্না হাঁপিয়ে পড়ল। তখন কিছুদূর তাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কষ্ট হয়নি তো।"

ডানা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। তার ভয় হচ্ছিল, চোখাচোখি হলে সে হেসে ফেলবে এবং তা হলে পরদাটা উড়ে যাবে হঠাৎ। কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল তার একটু।

বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন, "আর কষ্ট হলেই বা কি! ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে কি কষ্টই যে করেছেন, তা যদি পড়েন, অবাক হয়ে যাবেন। হিউম সাহেব, রিপ্‌লে সাহেবের বইগুলো দেব আপনাকে, পড়ে দেখবেন। পড়লে অবাক হয়ে যাবেন। বনে জঙ্গলে, পর্বতে মরুভূমিতে, উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে, কোথায় না গেছে ওরা পাখিদের খবর জানবার জন্যে! আর আপনি এইটুকু কষ্টের কথা ভাবছেন? তা ছাড়া কষ্ট হবে না আমার, বিলিভ মি, আসুন।"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে সামনের পাথরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চতুষ্পদ জন্তুর মতো দেখতে হল অনেকটা।

"আসুন, উঠে পড়ুন। ওই খাঁজটায় পা দিয়ে শিকড়টা ধরুন। তারপর পিঠে পা দিন আমার।"

ডানার মনে হল, খরস্রোতে পড়ে গেছে সে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আর। তবু সে শেষ চেষ্টা করলে একবার এবং করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে ফেললে।

"দেখুন গুরুজনের গায়ে পা দেওয়াটা কি উচিত হবে?"

"গুরুজন! মানে? কে গুরুজন?"

"বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে সব বিষয়েই তো আপনি বড়।"

"গড়!"

বৈজ্ঞানিক উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলুন না, আমি উঠব না। রত্না থাকলে উঠত কিন্তু। রত্নার আসবারও কথা আছে এখনই। মিস্ত্রির আর কাঠের বাক্স-টাক্স নিয়ে আসতে বলেছি তাকে"—তারপর হাতঘড়িটা দেখে বললেন, "এসেও গেছে হয়তো এতক্ষণ। আপনি যদি না উঠতে চান, তা হলে অবশ্য জোর করতে চাই না। আপনি পিঠ পেতে দিলে আমি উঠতে রাজি আছি। কিন্তু না, আমি চোদ্দ স্টোন, আমার ভার সহ্য করতে পারবেন না আপনি। চলুন যাওয়া যাক তা হলে। উঠে দেখলেই পারতেন কিন্তু। প্যাঁচাটা আছে কি না এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হত আপাতত। রীতিমত আয়োজন করে ডিমের খোঁজ পরে করতাম তা হলে।"

"আপনি যখন ছাড়বেন না, উঠছি।"

"হ্যাঁ আসুন!"

সোৎসাহে আবার পিঠ পেতে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিক। খাঁজে পা দিয়ে এবং শিকড় ধরে তাঁর পিঠের উপর উঠে পড়ল ডানা!

"দেখতে পাচ্ছেন গর্তটা?"

"হ্যাঁ।"

"হাত ঢোকাবেন না যেন, ঠুকরে দিতে পারে। এক কাজ করুন, ডাল-টাল ভেঙে নিন একটা, আর সেইটে ভিতরে ঢুকিয়ে দেখুন।"

ডাল ভাঙবার দরকার হল না আর। গর্তের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই 'হিস্‌স্‌' করে তর্জন করে উঠল কি যেন গর্তের ভিতর থেকে।

"গর্তের ভিতর হিসহিস করছে কি যেন। সাপ হতে পারে।"

"হিসহিস করছে? তা হলে প্যাঁচা আছে ঠিক। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?"

"না।"

গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ল ডানার। তারা যেখানে ছিল, সেখানে নদীর পাড়টা খুব উঁচু। আর কিছুদূর গিয়ে পাড়টা খাড়া নেবে গেছে। নীচে গভীর খাদ একটা। তাতে জল ঢুকছে এসে। জলের এক ধারে চওড়া পাথর একটা এগিয়ে এসেছে ছোট বারান্দার মতো। ডানা দেখতে পেলে, তার উপর বসে আছেন রূপচাঁদ আর সনাতন মল্লিক। সনাতন মল্লিক ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি। রূপচাঁদ দুরবীন দিয়ে তাদেরই দেখেছেন বোধ হয়।

"নেবে পড়ুন তা হলে।"

ডানা নেবে পড়ল। নেবে প্রণাম করলে বৈজ্ঞানিককে।

"আরে, ছি ছি, ও কি, এটা কি হল?"

ডানা কোনও উত্তর দিলে না। বৈজ্ঞানিক অপ্রস্তুত মুখে ক্ষণকাল থেকে সোৎসাহে যা বলতে লাগলেন, তা প্রণাম-বিষয়ক কিছু নয়।

"দেখলেন? বললাম, প্যাঁচা ঠিক আছে। এগুলো খুব সম্ভবত হুতোম প্যাঁচা—কেটুপা জোলোনেন্‌সিস (Ketupa Zeylonensis), খুব বড় দেখতে। মুখটা বেড়ালের মুখের মতো। দেখি যদি ধরতে পারি এটাকে। চলুন যাওয়া যাক এবার। রত্না বোধ হয় বসে আছে এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায়।"

হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু করে দিলেন তিনি। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। শিমুলগাছটার

কাছাকাছি একটা বড় গাম্‌হার গাছ ছিল। দেখা গেল, তার উঁচু ডালে কাক বাসা বাঁধছে। বৈজ্ঞানিকই দেখতে পেলেন আগে।

"ওই [illegible]খুন, কাক বাসা বাঁধছে। ওটাতে লক্ষ্য রাখবেন। কোকিল এসে ঠিক ডিম পেড়ে যাবে ওতে।"

"কি করে বুঝব তা?"

"কাক যখন ডিম পাড়বে, তখন দেখবেন, পুরুষ-কোকিলটা কাকের বাসার কাছাকাছি এসে খুব ডাকাডাকি করছে। কোকিলের ডাক কাকেরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ডাক শুনলেই বাসা ছেড়ে তাড়া করে কোকিলটাকে। স্ত্রী-কোকিল লুকিয়ে থাকে আশেপাশে। সে তখন শূন্য বাসায় এসে ডিম পেড়ে চলে যায়। অনেক সময় কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিমটি রেখে যায়।"

"ভারি আশ্চর্য তো! কাকেরা নিজের ডিম চিনতে পারে না?"

"অনেক পাখিই পারে না। বেশি দূর যেতে হবে না, মুরগিরাই অপরের ডিমে বিনা আপত্তিতে তা দেয়। ডিউয়ারের (Dewar) 'বার্ডস্ অ্যাট দি নেস্ট' (Birds at the nest) বইটা পড়ে দেখবেন। বইটা আছে আমার কাছে।"

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন দুজনে। ডানা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টিতে রূপচাঁদের মুখটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল তার মনে।....

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল, রত্নপ্রভাও আসছেন, সঙ্গে জন চারেক লোক রয়েছে। একজনের কাঁধে একটা মই, দুজন দুটো কাঠের বাক্স বয়ে আনছে। যন্ত্রপাতি [illegible]য়ে আসছে একজন ছুতোরমিস্ত্রি। রত্নপ্রভাকে দেখে বৈজ্ঞানিক বালকের মতো ছুটে চলে গেলেন তাঁর দিকে।

"জান হুতোম প্যাঁচার সন্ধান পেয়েছি আজ আমরা। ও দিকের ওই বিরাট বটগাছটায় আছে, আমি বলিনি তোমাকে? ডিম পেড়েছে সম্ভবত। মইটা এনেছে, ভালই হয়েছে। যাবে এখনই?"

"এগুলো আগে টাঙানো হোক'—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন রত্নপ্রভা।

"ও হ্যাঁ। বাঃ, কাঠের গুঁড়ি কেটে এটা বেশ চমৎকার হয়েছে তো!"

"তোমার বইয়ে যেমন ছবি আছে, ঠিক তেমনই করিয়েছি। কোথায় টাঙাবে বলে দাও।"

খেলনা পেলে শিশু যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বাক্স দুটো পেয়ে বৈজ্ঞানিক তেমনি হয়ে উঠলেন। ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখছেন? এই গুঁড়ির টুকরোটা মাঝামাঝি লম্বালম্বি [illegible]নে—Longitudinally চিরে তার ভিতর থেকে কিছু কাঠ কুরে বার করে নেওয়া হয়েছে। [illegible]করো কাঠ দুটো স্ক্রু দিয়ে জুড়ে বাইরে থেকে উপরের দিকে এই গর্তটা করে দেওয়া [illegible]য়েছে পা[illegible] [illegible]কবার জন্যে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত আর সুড়ঙ্গ করে যে সব পাখি বাসা বানায়, যেমন—কাঠ[illegible] বসন্ত-বউরি, ভগীরথ, তাঁরা হয়তো এতে এসে বাসা বানাতে পারে। এই বাক্সটাও ওই প্ল্য[illegible] [illegible] এটা তক্তা দিয়ে তৈরি। এইটে ওই তেঁতুলগাছটায় টাঙিয়ে দেওয়া যাক, [illegible] এইটে মানে—[illegible] দিয়ে তৈরি যেটা, সেটা ওই আমগাছটায় দাও। এই শোন, এদিকে এস।"

শিশুর মতো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। রত্নপ্রভার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহস্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য চিকমিক করতে লাগল। ডানার [illegible]কে এক নজর চেয়ে ঈষৎ মুখ টিপে হাসলেন

।। দশ ।।

ডানার কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া না পেয়ে রূপচাঁদ হতাশ হননি, বিস্মিতও হননি, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এ ধরনের মেয়েরা যে ধরনের সাড়া দেয়, তা প্রায়ই এত মৃদু, এত প্রচ্ছন্ন হয় যে, অনেক সময় বোঝাই যায় না। তা বোঝবার জন্যে শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলেই যথেষ্ট হয় না, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও প্রয়োজন। ওর কাছে অমরবাবু আর আনন্দমোহন যে জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা ভেদ করে কিংবা অবলুপ্ত করে নতুন রকম একটা কিছু করার মানসিক ক্ষমতা রূপচাঁদের যে নেই তা নয়। কল্পনা তাঁর প্রচুর আছে, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেওয়ার মতো অর্থ নেই। ওকে নিয়ে এখন কলকাতা-বম্বে-দিল্লী-দার্জিলিং-পুরী-ওয়ালটেয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারলে অনেকটা কাজ হত। ওরই হিতার্থে এই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে, সে ভানটা করতে হত অবশ্য—রূপচাঁদ সে ভান করতেও পারতেন—কিন্তু টাকা কই? তা ছাড়া চাকরি এবং তৃতীয় বাধা বকুলবালা। এখানেই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি সেটা? আপিসে কাজ করতে করতে, পথ চলতে চলতে, রাত্রে বকুলবালার পাশে শুয়ে শুয়ে প্রায়ই কথাটা ভাবেন রূপচাঁদ।

....চমৎকার জরির পাড় দেওয়া একখানা নীলাম্বরী শাড়ি নিয়ে সকালে সেদিন হাজির হলেন রূপচাঁদ ডানার কাছে। ডানা পড়ছিল।

"এই নাও।"

'কি ওটা?"

"তোমার জন্মদিনের উপহার।"

"আজ পঁচিশে ফাল্গুন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার জন্ম-তারিখ আপনি জানলেন কি করে?"—একটু বিব্রত-ভাবে উঠে দাঁড়াল ডানা।

"তুমি আমাকে যে 'বলাকা'টা পড়তে দিয়েছিলে, তাতেই লেখা ছিল। তোমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন কে একজন সতুদা।"

"ও বইটা আপনার কাছে আছে বুঝি? আমি খুঁজছিলাম কাল।"

"কাল দিয়ে যাব। শাড়িটা দেখ দিকি, পছন্দ হয় কি না?

"কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি? ওসব শাড়ি-টাড়ি ভাল লাগে না আমার।"

রূপচাঁদ স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি এ কথা বলবে তা জানতাম। তবু না কিনে পারলাম না। ময়ূরের পেখম না হলে চলে না যে!"

"কিন্তু পেখম ধরে তো পুরুষ-ময়ূর, সেদিন পড়লাম।"

"ঠিকই পড়েছ।"

আবার চুপ করে গেলেন রূপচাঁদ, কিন্তু ভাষাময় হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি । সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—হ্যাঁ আমারই পেখম ওটা। দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ, আনন্দিত হও।

পেখমের নিগূঢ় অর্থটা উপলব্ধি করবামাত্র ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল হঠাৎ। রূপচাঁদ বসে রইলেন চুপ করে। মৎস্যশিকারী তিনি, ধৈর্যের তাঁর অভাব নেই। মিনিট দুই পরেই কিন্তু

ফিরে এল ডানা। মনে হল, যেন একটা মুখোশ পরে ফিরছে। ভাবলেশহীন মুখ। ডানার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে একটু আশ্বস্তই হলেন যেন রূপচাঁদ। আপাত-ঔদাসীন্যের যবনিকা মানেই যবনিকার ওপারে এমন একটা-কিছু ঘটছে যা অনাবৃত রাখতে লজ্জা করে। এইটেই তো চান রূপচাঁদ। কিন্তু সেই একটা-কিছুর স্বরূপটা কি?

"বড্ড গম্ভীর হয়ে গেলে যে হঠাৎ?"

হাসবার চেষ্টা করলে ডানা। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

রূপচাঁদ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেখ, জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারাটাই আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকেই আমাদের অমরাবতী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যারা রসিক, তারা সেটা খুঁজে বার করতে পারে। যারা বেরসিক, তাদের সে সামর্থ্যই নেই মোটে। কিন্তু রসিকরা যখন নীতি বা ধর্মের প্যাঁচে পড়ে কৃচ্ছ্র সাধনের কসরৎ করে, তখন ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই হয় না, করুণও হয়ে পড়ে। তোমার মতো মেয়ের কাছে যে রসের দাবি নিয়ে আসি, সে দাবি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, তা বিশ্বপ্রকৃতির দাবি—এটুকু অন্তত মনে রেখো।"

স্থূল কথাটার মর্মটুকু ডানার কাছে এক নিশ্বাসে বলে ফেলে রূপচাঁদ যেন ঈষৎ হালকা বোধ করতে লাগলেন। প্রকাণ্ড একটা বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়ে কুলী যেমন আরাম বোধ করে, তেমনই যেন আরাম বোধ করলেন তিনি একটা। তিনি আশা করেছিলেন, ডানা এরও কোনো উত্তর দেবে না। কিন্তু ডানা ঈষৎ হেসে সংযতকণ্ঠে যা বললে, তাতে বিস্মিত হলেন তিনি। ডানার হাসিটা অতি মধুর লাগল তাঁর।

"তা কি আর জানি না!"—ডানা বললে,—"কিন্তু আপনি জিনিসটার একটা দিকই দেখছেন কেন? দুই আর দুই যোগ করে চার হয় এটা যেমন সত্যি, এক আর তিন যোগ করে চার হয় সেটাও তেমনই সত্যি। পাঁচ থেকে এক বাদ দিলেও চার হয়। চার সংখ্যায় অসংখ্য রকম উপায়ে পৌঁছানো যায়।"

"ঠিক বলেছ। বাঃ!"—হঠাৎ উল্লসিত হবার ভান করলেন রূপচাঁদ।

"আপনি এখন বসবেন কি? চা করে আনব?"

"তুমি এখন কি করবে?"

"আমাকে অমরবাবুর একটা লেখা টাইপ করতে হবে। বিকেলেই চেয়েছেন।"

"ও, তা হলে আমি উঠি। আচ্ছা, অমরবাবুর কাজটা ভাল লাগছে তো?"

"খুব ভাল লাগছে।"

"ভাল লাগলেই ভাল। আচ্ছা উঠি তবে এখন। কাল 'বলাকা'টা দিয়ে যাব।"

রূপচাঁদ উঠে পড়লেন।

পরদিন ডানার বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সনাতন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সনাতন মল্লিকের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ। এদের নিয়ে কোথায় চলেছেন ভদ্রলোক? জনকয়েক সাঁওতাল প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক। বন্দুকধারীও আছে জন দুই।

"কোথা চলেছেন মল্লিক মশাই এই দুপুরে? শিকারে নাকি?"

"কাক মারতে।"

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"খেয়াল নয়, চাকরি। শ-খানেক কাক মেরে আনতে হবে— হুকুম হয়েছে।"

"কি হবে?"

"রিসার্চ, রিসার্চ—"

"কাক নিয়ে?"

"কাক বক শালিক চিল শকুন কেউ বাদ যাবে না। আপনি যাননি নাকি ইদানিং?"

"না, একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

"গিয়ে দেখে আসুন। বার-বাড়িটা কশাইখানা করে তুলছে একেবারে। মরা পাখিদের ডানা ঠোঁট পালক মাপা হচ্ছে। পেট চিরে চিরে চামড়া ছাড়িয়ে দিনরাত রিসার্চ চলছে পরশু থেকে। আর বউটাও জুটেছে তেমনই মশাই! পাগল স্বামীকে তুই কোথায় সামলে-সুমলে রাখবি, না, তুইও সমানে উবু হয়ে বসে বসে পাখির পালক মাপছিস ওর সঙ্গে!"

"তাই নাকি?"

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দেখে আসুন না গিয়ে।"

মুচকি হেসে রূপচাঁদ বললেন, "রিসার্চ করবার মতো দামী একটা চিড়িয়া তো পেয়েছেন। কাক বক নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ভদ্রলোক?"

চোখ মটকে সনাতন মল্লিক বললেন, "সে রিসার্চও চলছে, সেদিন তো দেখলেনই স্বচক্ষে। তা চলুক না, তুই বড়লোকের ছেলে, বদখেয়ালে দু-দশ হাজার ওড়া না, পাখির পিছনে এমন করে লেগেছিস কেন?"

দুম করে আওয়াজ হল একটা। কলরব করে এক দল কাক উড়ল একটা গাছ থেকে। যে লোকটা বন্দুক ছুঁড়েছিল, সে অপ্রস্তুত মুখে বললে, "লাগল না।"

"আরে, কাক মারা কি সহজ কথা!"—মল্লিক মশাই বলে উঠলেন, "ওপারে যাওয়া যাক চল। এপারে আর পাওয়া যাবে না, সব ভড়কে গেছে, একটু থিতুক। ও অঞ্চলটা ঘুরে আসি ততক্ষণ। আচ্ছা, চলি তা হলে। উঃ, রোদের তাত দেখেছেন এরই মধ্যে?"

সদলবলে চলে গেলেন মল্লিক মশাই। রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডানাকে 'বলাকা'টা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। ডানার সঙ্গে দেখা হয়নি। কপাট বন্ধ ছিল। বন্ধ দ্বারে অনেকক্ষণ করাঘাত করতে চাকরটা বেরিয়ে এসে খবর দিল যে, মাইজীর শরীর খারাপ, তিনি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

বৈজ্ঞানিক-পৃষ্ঠারূঢ়া ডানার ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়ালেন আবার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন সেটি নিপুণভাবে। তারপর আবার চলতে লাগলেন।

।। এগারো ।।

নিজের তেতলার ঘরটিতে বসে কবি কবিতা লিখছিলেন। মন্দাকিনী চলে গেছেন। মন্দাকিনীর চলে যাওয়াটাকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে কত কি যে হচ্ছে, তার ঠিক নেই। মন্দাকিনীই যেন বার বার নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছে মনে। মন্দাকিনী না থাকলে যে ডানাকে নিয়ে তাঁর সমস্ত কল্পনা মেতে উঠবে তিনি মনে করেছিলেন, সে ডানার কাছে

যেতেই ইচ্ছে করছে না যেন তাঁর। স্টেশনে ট্রেনের জানলায় মন্দাকিনীর মুখটা বার বার মনে পড়ছে। তাঁর কথাগুলোও—'সাবধানে থেকো, আমি যত শিগ্‌গির পারি চলে আসব।' মন্দাকিনীর চিন্তার সঙ্গে ডানার কথাও মিশছিল এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে। শব্দের ঝঙ্কারে আর ছন্দের রিলে যে অর্থটা কবিতায় পরিস্ফুট হচ্ছিল, তা হয়তো ঠিক তাঁর মনের কথা নয়, তবু তিনি তন্ময় হয়ে লিখে যাচ্ছিলেন।—

নানা সুরে তারা বলে যায়
পুনরায় ফিরে আসব তো
বলে যায় তবু চলে যায়
জীবনের লীলা শাশ্বত।

হাসি করে রোজ অশ্রু-স্নান
হয় হিমাংশু অংশুমান
সূর্য-হিমানী-প্রণয়-গান
রঙিন মেঘের বাষ্প তো
এসেছ কে তুমি নন্দিতে
অপরাজিতার স্বপ্ন কি
আলো-আঁধারির সন্ধিতে
গোধূলি-বেলাব লগ্ন কি।

জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ
কাঁপায় প্রাণ, ভরায় বুক
নবীন ফুল সে উৎসুক
বলে আমি ভালবাসব তো।

।। বারো ।।

তিন-চার দিন থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে একটা। ধুলো'বালি ঝরাপাতা উড়িয়ে একটা দুর্দান্ত পাগল যেন নেচে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দুপুরে ঘরের কপাট জানালা বন্ধ করে ডানা একা বসেছিল চুপ করে। এ কদিন কেউ আসেনি। বৈজ্ঞানিক নানা রকম পাখির বাসা বানিয়ে গাছে গাছে টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়। অনেকগুলো পাখি-ওলা লাগিয়েছেন নাকি পাখি ধরবার জন্যে, এখানে চিড়িয়াখানা বানাবেন নাকি একটা। কাক মারবার জন্যে শিকারীও বেরিয়েছে নাকি। প্রবন্ধ তৈরি হচ্ছে বোধ হয় আর একটা। হুতোম প্যাঁচাটাকে ধরবার কি হল? হঠাৎ মনে হল, আনন্দবাবুও আসেননি। এই বিশ্রী হাওয়ার জন্যেই বেরুতে পারছেন না বোধ হয় ভদ্রলোক। তাঁর সেই কবিতাটা এখনও ডানার কাছে পড়ে আছে। ডানা উঠে গিয়ে কবিতাটা বার করে আর একবার পড়লে। কার উদ্দেশ্যে কবিতাটা লিখেছেন ভদ্রলোক? রূপকথার

অরূপ বাণীর অর্থ কাকে বোঝাতে চাইছেন উনি? উইম্‌পোল স্ট্রীটের ব্যারেটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের মানসীর কথা। অন্যমনস্ক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের এলোমেলো হাওয়ার মতো মনের ভিতরও এলোমেলো চিন্তার হাওয়া উঠল যেন একটা। একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্পষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের প্রচ্ছন্ন লোকে। মনে হল কে যেন কোথায় তার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। যেতে হবে....। হঠাৎ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি কয়েকদিন আগে এই রকম কি একটা বলেছিলেন যেন! তিনি আছেন কি? কয়েকদিন খোঁজ নেওয়া হয়নি। হঠাৎ কপাট খুলে বেরিয়ে পড়ল সে দুপুররোদে। এগিয়ে গেল নদীর ধারের সেই ঘরটার দিকে। ঘরটার পাশে যে করবীগাছ আছে একটা, তা নজরেই পড়েনি এতদিন! গোছা গোছা ফুল ধরেছে। এলোমেলো হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠছে গাছটা। কিন্তু সেই অস্থিরতার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে যেন। মনে হচ্ছে, যেন কোনও শ্যামাঙ্গিনী তরুণী নৃত্য করছে, নৃত্য করতে করতে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে অঞ্জলি ভরে ডাইনে বামে ঊর্ধ্বে নিম্নে। কবরীফুলগুলো ঠিক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। সে দিকে চেয়ে সেই দুপুর-রোদে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। এলোমেলো হাওয়াটা হু-হু করে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, উড়ে গেল মাথার কাপড়টা, চুলগুলো উড়তে লাগল। একটা অদৃশ্য ঘূর্ণাবর্ত যেন মেতে উঠল তাকে ঘিরে। সেই ঘূর্ণাবর্তে কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ আর শুকনো পাতা নাচতে নাচতে চলে গেল পাশ দিয়ে। চু-কির-কির-কির-কির—তীক্ষ্ণ সুরের ফোয়ারা ছুটিয়ে উড়ে গেল বরবেশে সজ্জিত কালো টুনটুনিটা। সমস্ত প্রকৃতি অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর যেন। ডানারও দেহের অণু-পরমাণুতে স্পন্দিত হয়ে উঠতে লাগল নাচের ছন্দ। হঠাৎ নজরে পড়ল বালির চড়া ভেঙে সন্ন্যাসী আসছেন। পরিধানে মলিন গৈরিক, হাতে কমণ্ডলু। নগ্ন পদ, নগ্ন শির। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে হয় না, প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব তাঁর মনকে একটুও স্পর্শ করছে। নির্বিকার চিত্তে ঋজুদেহে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। সম্রাট যেন। ডানাও এগিয়ে গেল।

"আপনি এই রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে।

"ভিক্ষে করতে।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী।—"তুমি?"

চুপ করে রইল ডানা। সন্ন্যাসী যে ভিখারী এই বোধটা আঘাত করল সজোরে তাকে। ভিক্ষা করা যে অতিশয় হীন বৃত্তি! ভিক্ষুক ইনি? হোঁচট খেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, তারও যেন তেমনই হল। ইংরেজী পড়া সংস্কারের পাথরে খুব জোরেই হোঁচট খেল সে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে।

"এই রোদে কোথায়?"—হেসে জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাসী।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"আমার কাছে? কেন?"

"এমনিই।"

সন্ন্যাসী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডানাও ঢুকল গিয়ে তাঁর পিছু পিছু। সন্ন্যাসীর ঘরে ডানা ইতিপূর্বে একদিনও ঢোকেনি। ঘরটা ভাঙা, সে শুনেছিল। কিন্তু কত ভাঙা, তার তা ধারণা ছিল না। ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে বসেই আকাশ দেখা যায়। চালে খাপরা খুব কম আছে। যা আছে, তাও ঠিক স্থানে নেই, মেঝেটা এককালে পাকা ছিল, এখন কিন্তু সিমেন্ট উঠে গেছে। মাঝখানে একটা চৌ-কোনা পাথর বসানো হয়েছিল কোন কালে, সেইটেই অক্ষত

আছে এখনও। সেই মেঝেরই এক ধারে একটি কম্বল পাতা, তারই এক পাশে আর একটি কম্বল পাট করা রয়েছে, আর রয়েছে একটি ঝোলা। সেইটেই বোধ হয় যুগপৎ বাক্স এবং বালিশের কাজ করে। ঘরের আর এক ধারে কয়েকটি ইট পেতে উনুন করা রয়েছে। আর এক ধারে মাটির ছোট কলসী একটি, তাতে খাবার জল থাকে বোধ হয়, পাশে একটি মাজা-ঘষা পিতলের ঘটি চকচক করছে।

সন্ন্যাসী ডানার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "এস, বস। ওই কম্বলটার উপরই বস। কোনও দরকার আছে নাকি?"

ডানা কম্বলটার এক পাশে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী কমণ্ডলুটা টাঙিয়ে রাখলেন দেওয়ালের একটা পেরেকে।

"তেমন কোনও দরকার নেই। কয়েকদিন আপনাকে দেখিনি, তাই ভাবলাম, খোঁজটা নিয়ে আসি, একা বসে বসে ভাল লাগছিল না। আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা করেন কেন?"

সন্ন্যাসী কলসী থেকে জল গড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে হাসি-ভরা চোখে চাইলেন ডানার দিকে। তারপর বললেন, "আমি যে পথের পথিক, সে পথে এই নিয়ম।"

"আপনি যে বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে আপনার কিছু টাকা আছে?"

"তা আছে। তার থেকে টাকা বার করি মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিক্ষা করি ঠিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নয়, নিয়ম বলে।"

"নিয়ম? বুঝতে পারলাম না ঠিক।"

"মিলিটারিদের যেমন ড্রিল করা নিয়ম, ডাক্তারি পড়তে গেলে যেমন মড়াকাটা নিয়ম—এও তেমনই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডানা বললে, "ভিক্ষা করলে কি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না? মাপ করবেন, আমার যা শিক্ষা সেই অনুসারেই বলছি।"

"তোমরা আত্মসম্মান জিনিসটাকে বড় খাটো করে দেখ, তাই পদে পদে সেটা ক্ষুণ্ণ হয়।"

"খাটো করে দেখি মানে? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আজ তোমার ডান হাত যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে যে, বাঁ হাতের কাছে কিছু নিলেই তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, তা হলে যে রকম বিপদ উপস্থিত হয়, তোমাদেরও তাই হয়েছে। তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার প্রকাণ্ড একটা তফাত আছে, এ কথা মেনে নিলেই মুশকিল হবে। যদি মেনে নিতে পার যে, তুমি আমি একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তা হলে আর সঙ্কোচের কারণ থাকে না।"

"সত্যিই কি সেটা মেনে নেওয়া যায়?"

"প্রত্যক্ষ করলেই মেনে নেওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যেদিন জীবাণু প্রত্যক্ষ করলেন, সেই দিনই তাদের মেনে নিলেন। যেদিন তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, তুমি আর তোমার বাইরের বিশ্ব অভিন্ন, সেদিন তোমারও সংশয় থাকবে না।"

"কিন্তু সত্যিই কি সেটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব?"

"সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।"

খোলা দ্বারটা দিয়ে সন্ন্যাসী বাইরের দিকে চাইলেন। ডানার মনে হল, তাঁর দৃষ্টি দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গিয়ে নিমেষে কি যেন দেখে এল একবার। তারপর নিজের কমণ্ডলু

থেকে দুটি ছোট কলা বার করে একটি কলা একটি ডানার হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, এটি তুমি খাও। তুমি আসবে বলেই বোধ হয় একটি কলা বেশি পেয়েছি আজ।"

"আমি এখনই খেয়েছি। আপনিই দুটো খান।"

"তুমি অতিথি, তোমাকে না দিয়ে কি আমি খেতে পারি? ক্ষিধে না থাকে তো পরে খেও, নিয়ে যাও।"

"আপনি আর কিছু খাবেন না?"

"না।"

"ওই একটিমাত্র কলা খেয়ে থাকতে পারবেন?"

"তা পারব।"

"আমি না এলে দুটো কলাই তো খেতেন?"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "তা খেতাম। তুমি খেলেও আমারই খাওয়া হল।"

কলসী থেকে জল গড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার হাত পা মুখ ধুতে লাগলেন। ডানা চুপ করে বসে রইল। সন্ন্যাসীর কথাগুলো কে যেন তার কানের কাছে চুপিচুপি বলে গেল আবার—"সম্ভব বই কি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।"

"আচ্ছা, আপনি কি পেরেছেন?"—ডানা জিজ্ঞাসা করলে হঠাৎ।

"কি?"

ঝুলি থেকে একটি গামছা বার করে হাত-মুখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি আর বাইরের বিশ্ব যে অভিন্ন, এই সত্য কি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তা ছাড়া আমি কি পেরেছি বা পারিনি—এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি হিমালয়-চূড়ায় উঠতে পারিনি, তা প্রত্যক্ষও করিনি, তবু তা যে আছে এ কথা তোমাকে মানতে হবে।"

"কিন্তু যাঁরা হিমালয়-চূড়ায় উঠেছেন বা হিমালয়-চূড়া দেখেছেন এ রকম লোক আছেন, তাই সেটা নিঃসংশয়ে মানা যায়।"

"সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন এ রকম লোকও কম নেই—এ কথাও যেদিন বুঝবে, সেদিন এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকবে না।"

"সে রকম লোক কোথায় আছেন?"

"খুঁজে বার করতে হবে। তোমার সত্যকার জিজ্ঞাসা যেদিন জাগবে, সেদিন খোঁজবার পথও পাবে।"

ডানা চুপ করে রইল। ডানার মুখের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "মনে হচ্ছে, কোনও একটা মতলবে তুমি এসেছিলে, কি বল তো সেটা?"

ডানা আর একটু চুপ করে থেকে ইতস্তত করে বললে, "আমার সব কথা শোনেননি বোধ হয় আপনি?"

"না।"

ডানা নিজের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে শেষে বললে, "এখন পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছি একটা। এঁরা খুবই ভদ্রতা করছেন, আমার সঙ্গে। অমরবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু সবাই—"

রূপচাঁদবাবুর কথাটা বলে সে থেমে গেল নিমেষের জন্যে।

"অমরবাবু একটা চাকরিই দিয়েছেন আমাকে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে আছি। তবু কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করছি সর্বদা। কোথায় একটা ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা কর্তব্য আছে, যা করা হয়নি। সেই ক্ষুধাটা যে কিসের, কর্তব্যটা যে কোথায়, তা ঠিক করতে পারছি না। তাই মনে করলাম, আপনার কাছে আসি। কেন যে আপনার কথা মনে হল, তা বলতে পারি না, কিন্তু মনে হল যে আপনি হয়তো কিছু উপদেশ দিতে পারবেন।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "দেখ, উপদেশ দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি যে, সবাইকে একদিন না একদিন সচেতন হতে হবে। তুমি, আমি এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত লীলার প্রকাশ, তাঁকে জানবার আগ্রহ অভিনব ক্ষুধারূপে অনুভব করতে হবে সবাইকে একদিন। অনিত্য মোহের কষ্টিতে ঘষে নিত্যকে চেনবার আকুলতাই নিয়ত ব্যস্ত হচ্ছে রূপে রূপে জীবনে মরণে জন্মজন্মান্তরে। তুমিও হয়তো সেই ক্ষুধাই অনুভব করছ, কে জানে?"

"ভগবানকে জানবার ক্ষুধা বলছেন?"—ডানা প্রশ্ন করলে।

"সেটা তুমিই ঠিক করবে, কিসের ক্ষুধা তোমাকে আকুল করছে! তোমার ক্ষুধাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ক্ষুধা আমাকে বিপথেও তো নিয়ে যেতে পারে?"

"কোনও পথই বিপথ নয়। একমাত্র যে পথ, যে পথ সবাইকে ধরতে হবে একদিন, তার বহু গলি—গলির গলি আছে। ক্ষুধাকে অনুসরণ করে চলতে থাক, ঠিক পথে পৌঁছে যাবেই একদিন না একদিন। ক্ষুধাটা যদি সত্য হয়, তা হলে তার আগুনে অখাদ্যও হজম হয়ে যাবে।"

"কোন কিছুই পাপ নয় তা হলে আপনি বলছেন?"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন, "আমি কিছুই বলছি না। কোনও একটা কাজ পাপ কি না তা নির্ভর করে তোমার নিজের পাপপুণ্যবোধের উপর। মা-কালীর কাছে পাঁঠাকে বলিদান দেওয়া কারও কাছে পুণ্য, কারও কাছে পাপ। যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে যোগী হয়েছেন, তাঁদের কাছে আবার পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই অবান্তর। তাঁরা অনাসক্ত। পদ্মপত্রে যেমন জল লেগে থাকতে পারে না, তাদের মনেও তেমনই পাপ-পুণ্য লাভ-ক্ষতি এসব স্থান পায় না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।'

—গীতার এই শ্লোকটিতে মনের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনও ক্ষুধা নেই। কিন্তু এই সর্বসংকল্প সন্ন্যাস লাভ করবার আগে ক্ষুধার নির্দেশেই অনেক দুর্গম পথ চলতে হবে। সেই পথে যেটা তোমার বিবেকের কাছে পাপ বলে মনে হবে, সেইটেই ত্যাগ করবে তুমি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হেসে বললেন, "পুরাতন বিবেকের কাছে পুণ্য বলে যা মনে হয়েছে সেটাও কিছুদিন পরে হয়তো আবার ত্যাগ করতে হবে নতুন বিবেকের নির্দেশে। পুরাতন ক্ষুধা নতুন খাবার দাবি করবে। পুরাতন খাবারে তৃপ্তি হবে না তার তখন।"

"ক্ষুধাটা যে কিসের, তাইতো বুঝতে পারছি না?"—একটু অধীর কণ্ঠেই বললে ডানা।

"পারবে। চিন্তা কর, বুঝতে পারবে বইকি। বুঝতে হবেই। নিজেকেই বুঝতে হবে, আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারবে না। তোমার মধ্যে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শিষ্য, তিনি গুরু, তিনি নিজেকেই নিজে নতুন করে উপলব্ধি করবেন তোমার মধ্যে আবার। তুমিই কর্তা, তুমিই কর্ম, তুমিই কার্য, তুমি কারণ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মাহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।।

কিন্তু এ উপলব্ধি হবার আগে ভোগের পথে মোহের পথে হয়তো ঘুরতে হবে কিছুদিন। ঘোরাটা প্রয়োজনও হয়তো। তামসিক জীবনেব পর রাজসিক জীবনই স্বাভাবিক পরিণতি। তারপর আসবে; আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং মোহটা তুচ্ছ নয়। কিছুই তুচ্ছ নয়।" সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এল। ডানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "মোহ সম্বন্ধে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না।"

"মোহটা হচ্ছে তাঁকে চেনবার কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথর সোনা নয়, কিন্তু সোনার পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যায়। যে কোনও জিনিসেই আমরা মুগ্ধ হই না কেন, কিছুদিন পরেই তার নেশাটা কেটে যায়। কারণ মোহ নকল আলো, আসলে ওটা অন্ধকারই। ওই মোহই আমাদের জানিয়ে দেয় যে আমরা ভুল পথে গেছি। মন বলে ওঠে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনওখানে।"

"তা হলে মোহটাও দরকারী জিনিস?"

"এক হিসেবে দরকারী বইকি। মুক্তির স্বাদ পেতে হলে খানিকটা বন্ধন-ভোগ দরকার। মোহ মানে আসক্তি, বন্ধন, যুক্তিহীন অনুরক্তি। যে কোনো রকম আসক্তিই খারাপ। উপনিষদ বলছেন, যাঁরা অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যারা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তোমার যদি অনুরক্তি হয়, তা হলেও অন্ধকার। অনুরক্তি জিনিসটাই খারাপ। সত্য দর্শন হওয়ামাত্র অনুরাগ বিরাগ সব লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যের সঙ্গে তখন একাকার হয়ে যায় দ্রষ্টা। হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই তো অনুরাগের জন্ম— কিছুক্ষণ পরে হারিয়ে ফেলব, এই বোধ থেকেই দু হাত দিয়ে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায় সবাই। সত্যকে উপলব্ধি করলে সে ভয় আর থাকে না । কারণ তখন উপলব্ধি হয়, সবার মধ্যেই আমি এবং আমার মধ্যেই সব।"

বাইরের হাওয়াটা উদ্দামতর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা কোকিল ডেকে উঠল, কিক্, কিক্, কিক্। একরাশি ধুলোবালি হু-হু করে উড়ে এল খোলা দ্বার দিয়ে, তার সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে এল ঘুঘর কণ্ঠস্বর। ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু। ভীষণা প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুচ্ছ করে প্রণয়ীর মোহ কোমল সুরে আবেদন জানিয়ে চলেছে প্রণয়ীকে। ডানা উন্মনা হয়ে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। ছন্নছাড়া পাগলের মতো তার মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঝড়ো হাওয়াটার সঙ্গে।

"আচ্ছা, আপনারও মোহ আছে?"—তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"আছে বইকি। মায়াবিনী প্রকৃতির ছলাকলার কি অন্ত আছে? প্রতি পদক্ষেপেই যে তার একটা না একটা রঙিন ফাঁদ পাতা রয়েছে! তা কি এড়ানো সহজ?"

"আপনার তো কিছুই নেই, তবু কিসের মোহ আপনার?"

"আপাতত এই স্থানটার মোহ কাটাতে পারছি না দেখছি"—মলিন হেসে বললেন সন্ন্যাসী।

"এর আগে এখানে ছিলেন কখনও আপনি?"

"ছিলাম বইকি। সে অনেক কথা।"—বলে একটু চুপ করে রইলেন। তার পর হেসে বললেন, "সেসব কথা না-ই বা শুনলে। থাক। এটা মোহ, না কর্তব্য, তা-ও ঠিক করতে পারছি না।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন।

ডানাও চুপ করে রইল। তার মনে হতে লাগল, কি যেন একটা রহস্য আবৃত করে রেখেছে এই লোকটিকে। হয়তো সে আবার প্রশ্ন করত, কিন্তু বাধা পড়ল। চাকরটা এসে উঁকি দিলে দ্বার-প্রান্তে।

"আনন্দবাবু এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে।"

ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না?"

"পরে আসব কোন সময়ে।"

একটু ইতস্তত করে ডানা চলে গেল একাই। গিয়ে যা দেখলে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কবির সর্বাঙ্গে রঙ, মুখে আবীর।

ডানাকে দেখে তিনি বললেন, "আজ বসন্তোৎসব। সমস্ত প্রকৃতি রঙে রসে রূপে মেতে উঠেছে! এস, তোমাকেও একটু রঙ মাখিয়ে দিই। আপত্তি আছে কি?"

কি যে বলবে ডানা ভেবে পেল না। মাথা হেঁট করে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। তার কানে গালে ফুটে উঠল লজ্জারুণ ভাতি। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল শুধু যে ভয়ে তা নয়, আনন্দেও। চিরন্তনী নারী পুলকিত হয়ে উঠল চিরন্তন পুরুষের আহ্বানে।

"দিই একটু"

"দিন, ছাড়বেন না যখন।"

কবি ডানার মুখে চুলে আবীর মাখিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বার করলেন রঙের শিশি! বালকের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মন্দাকিনী চলে যাওয়ার পর তাঁর মনে যে ঔদাসীন্য এসেছিল, তা হঠাৎ কেটে গেল যেন। সমস্ত দিন আজ রঙ খেলে বেড়িয়েছেন। ডানার কাপড়ে বেশ করে রঙ দিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন।

"বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে।"

ডানা লজ্জায় ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। রঙে তার কাপড় জামা ভিজে গিয়েছিল একেবারে। কাপড়-জামা বদলে বাইরে এসে দেখে, কবি চলে গেছেন। বারান্দার টেবিলে উপর রঙের শিশিটা রয়েছে আর তার তলায় চাপা রয়েছে একখানা কাগজ। কাগজটা খুলে দেখলে, একটা কবিতা রয়েছে।

গৈরিক হরিতে পীতে
পুষ্পে ফলে ছন্দে গীতে
বহু বর্ণ বহু শিখা জ্বালি
বসন্ত আরতি করে যার,

যার লাগি সাজিয়াছে
মাঠে মাঠে গাছে গাছে
কিশলয় মঞ্জরীর ডালি
রচিয়া বিচিত্র উপহার,

তারই মূর্তি রক্তরাগে
সন্ধ্যার মেঘেতে জাগে
আগুনের প্রদীপ্ত আলোকে
কোকিলের জ্বলন্ত নয়নে,

রঙ্গনে পলাশে ফোটে
টিয়া চন্দনার ঠোঁটে
সহেলীর পালকে পালকে
তন্ময় সে কি স্বপ্ন চয়নে,
সে যে সিন্দুরের শোভা
পদ্মরাগ মনোলোভা
শোণিতের বরণে চর্চিত
শিবানীর রক্তজবা সে যে,

সেই বর্ণে জগদ্ধাত্রী
বালার্ক-অরুণ-গাত্রী
যুগে যুগে হতেছে অর্চিত
মানবের মনোমন্দিরে যে,

তার ছন্দে তারি সুরে
নিকট যেতেছে দূরে
সুদূর যে নিকটেতে আসে,
পুরাতন হয় যে নবীন,

অতীত ও বর্তমান
গাহে ভবিষ্যের গান
বক্ষে ধরি তাহারি সুবাসে
শুষ্ক বীজ তপস্যায় লীন,

এস, সখি, সমারোহে
বসন্ত-উৎসবে দোঁহে
পূজা করি কুঙ্কুমে আবীরে
সে চির-যৌবন দেবতার,

ওগো, সখী নীলাঞ্জনা
হও আজি অবন্ধনা
অশঙ্কিত কঙ্কণে মঞ্জীরে
ঝন্‌ঝনিয়া তোল ঝনৎকার,

জড়তা কাটিয়া যাক
অচঞ্চল শিহ্‌রাক,
ভাষা দাও স্থাবরে জঙ্গমে
অকুণ্ঠিত হও সুলোচনা

হও সখি, আত্মহারা
বন্ধহীন রসধারা
উদ্বেলিত অধর-সঙ্গমে
নবতীর্থ করুক রচনা।

ডানা দু-তিনবার পড়লে কবিতাটা। এলোমেলো হাওয়াটা থেমে গেল হঠাৎ। মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি। ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রিক্তপত্র একটা অশ্বত্থগাছের শাখায় বসে পুচ্ছ আস্ফালন করে একটা ফিঙে ডাকছে পাশে বসে আছে আর একটা ফিঙে। তারই সহচরী বোধ হয়।

।। তেরো ।।

রূপচাঁদ আপিসে গিয়েছেন। দুপুরের রোদ খাঁ-খাঁ করছে চতুর্দিকে। বকুলবালা উঠোনে গুলি খেলছেন চণ্ডীর সঙ্গে। চণ্ডী ছেলেটি স্কুল পালিয়ে প্রায়ই আসে তাঁর কাছে। তার জন্যে নানারকম খাবার তৈরি করে রাখেন বকুলবালা। যেদিন চণ্ডী আসে না সেদিন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। চণ্ডী যে পরের ছেলে, তার যে নিজের বাপ-মা আছে— একথা বকুলবালা যে জানেন না তা নয়, কিন্তু মানেন না। চণ্ডীকে আসতেই হবে রোজ। নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়ে চণ্ডী আসেও। শুধু খাবার নয়, অন্য প্রলোভনও আছে; বকুলবালা মাঝে মাঝে তাকে পয়সা দেন। সেই পয়সায় চণ্ডী তার সেই সব শখ মেটায় যা মা-বাপের পয়সায় মেটে না সহজে। ছবি, ঘুড়ি, লাট্টু এসব তো কিনেইছে, মাঝে মাঝে সিগারেটও কেনে। একটা টিয়াপাখিও কিনে দিয়েছেন তাকে বকুলবালা খাঁচাসুদ্ধ।

"ওই, বেইমানি করছিস ফের! ভাল করে মাপ্‌ আবার। থাম, আমি মাপছি।"

নিজেই হেঁট হয়ে মাপতে লাগলেন বকুলবালা গাব্‌বু থেকে তাঁর গুলিটা কতদূরে আছে। গাছকোমর বাঁধা, মাথার চুলগুলোও চুড়ো করে বেঁধেছেন তিনি, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়।

কৃষ্ট প্রিয়া।

দুজনেই সোৎসুকে মুখ তুলে চাইলেন আমগাছটার দিকে।

"বুলবুলিটা এসেছে বোধ হয়।"

"হ্যাঁ, ওই যে।"

"কই?"

"ওই যে সরু ডালটায় বসে আছে।"

এইবার দেখতে পেলেন বকুলবালা।

"চমৎকার দেখতে তো! গালের কাছে কি টুকটুকে রঙ—ওমা, কি সুন্দর!"

"পাখি-ওয়ালাটা বলছিল, এর নাম নাকি সিপাহি বুলবুল।"

"সিপাহীর মতোই তো দেখতে। ঘোড়াসোয়ার সিপাহীদের মাথায় টুপি তো ঠিক ওই রকমই। সেবার এসেছিল দেখিসনি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত?"

চণ্ডী ঘাড় উঁচু করে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পাখিটার দিকে। পাখি কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ দিলে না তাকে। উড়ে গেল। পাতার আড়াল থেকে আর একটা পাখিও উড়ল।

"ও মা, দুটো ছিল!"

"কিছুতেই বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে না ওরা। জাফরের কাছে এই পাখি যদি দেখি কোনোদিন, আনতে বলব মাসীমা?"

"বলিস। কিন্তু হলদে পাখিটা মরে গিয়ে থেকে আর পাখি কিনতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু খেলে না একেবারে। আয়,—আচ্ছা, তুই আগে টিপ কর্।"

আবার শুরু হল গুলিখেলা।

"বাচ্চাবেলা থেকে পুষতে হয়। ধাড়ি পাখি পোষ মানে না"—টিপ করতে করতে চণ্ডী বললে।

"হলদে পাখির বাচ্চা কোথায় পাব বল্?"

"গণশা বলছিল যে, গেল বছর হলদে পাখির বাসা দেখছিল সে এক জায়গায়।"

একটু থেমে চণ্ডী বললে, "নদীর ধারে অমরবাবুদের যে আমবাগান আছে সেই বাগানে। সে গাছে ফিঙেরও বাসা ছিল নাকি।"

"ফিঙে পাখির দরকার নেই। গণশাকে বলিস, হলদে পাখির বাচ্চা যদি পায় এনে দেয় যেন আমাকে।"

চণ্ডীর টিপ ব্যর্থ হল। বকুলবালা টিপ করতে লাগলেন।

"বলব। কিন্তু অন্য পাখি যদি পেয়ে যায়? নীলকণ্ঠের বাচ্চা ধরেছিল একবার গণশা।"

"না, অন্য পাখি চাই না।"

টকাস্ করে চণ্ডীর গুলিটা মেরে গর্বোৎফুল্ল মুখে চাইলেন বকুলবালা চণ্ডীর দিকে।

"তুমি আর একবার হলদে পাখি কিনেছিলে, না মাসীমা?"

"সেবারও বাঁচেনি। ঠাণ্ডা লাগল, না কি হল, সকালে দেখি, মরে পড়ে আছে খাঁচায়।"

"বার বার মরে যাচ্ছে, কি দরকার তা হলে ও পাখি পুষে? তার চেয়ে নীলকণ্ঠ পোষ এবার একটা। চমৎকার দেখতে।"

চোখ মুখ কুঁচকে আবার টিপ করছিলেন বকুলবালা। চণ্ডীর কথায় আগুনের ঝলক ছুটে বেরুল তাঁর চোখ থেকে।

"না, আমি হলদে পাখি পুষব। নীলকণ্ঠ আবার মানুষে পোষে, যেমন ক্যারকেরে গলার আওয়াজ, তেমনি ঝগড়ুটি।"

চণ্ডী চুপ করে রইল। বকুলবালার গুলি এবার লাগল না। চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ থেমে সে জিজ্ঞেস করলে, "হলদে পাখি খুব ভাল গান গায়, না?"

"নিশ্চয়। কি মিষ্টি গলার স্বর! শুনিস নি তুই?"

"শুনেছি, কিন্তু দোয়েলের গলা ওর চেয়েও মিষ্টি।"

"দোয়েল ওর মতন 'খোকা হোক' বলতে পারে?"

"হলদে পাখি 'খোকা হোক' বলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, কি মিষ্টি করে যে বলে!"

হঠাৎ বকুলবালার লজ্জা হল এবং সেই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে তিনি ধমকে উঠলেন।

"মার্ না, কি বাজে বকবক করছিস্!"

চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার।

"অমরবাবু কি কাণ্ড করছেন জানেন মাসিমা? কাক বক শালিক টিয়া মারছেন ক্রমাগত। অনে—ক মেরেছেন।"

"কেন? ওসব পাখি তো খায় না শুনেছি।"

"খাবেন না। ওদের পালক, পা, ঠোঁট মাপছেন। এখানে মিউজিয়ম হবে নাকি। জ্যান্ত পাখিও ধরেছেন অনেকে। অনেক পাখিওয়ালা এসেছে, তারা নানারকম ফাঁস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে।"

"তাই নাকি?"

উৎসাহে বকুলবালার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে-উঠল।

"যাবি একদিন? চ-না।"

"কোথায়?"

"অমরবাবুর বাড়ি। দুপুরবেলা উনি যখন আপিসে থাকবেন, আমরা দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে চল্ না, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে।"

রূপচাঁদের শিক্ষা সত্ত্বেও বকুলবালার কৌতূহলী মন বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"কে আবার দেখবে? পাশের গলিটা দিয়ে টুক করে চলে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। আর পেলেই বা কি, বড় জোর বকবে একটু।"

ঠোঁট উলটে বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরলেন বকুলবালা। চণ্ডী হেসে ফেললে। তার মুখের হাসি কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদের গলাও।

"মেসোমশাই এলেন নাকি। আমি পালাই।"

খিড়কি দরজাটা দিয়ে চণ্ডী এক ছুটে বেরিয়ে গেল। রূপচাঁদকে বড় ভয় করে তার।

বকুলবালা খিড়কি-দরজার খিলটা দিয়ে সদর-দরজাটা খুললেন। রূপচাঁদই এসেছিলেন।

"এমন অসময়ে ফিরলে যে আজ?"

"আপিসের কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি। ও কি, মুখ অত লাল কেন? রোদে রোদে ঘুরছিলে নাকি?"

"গুলি খেলছিলাম উঠোনে।"

"একা একা?"

"চণ্ডী এসেছিল, তোমার সাড়া পেয়েই পালাল। কি ভীতু ছেলে বাবা!"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ঘরে ঢুকলেন এবং একটা বড় খাম নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপিসের কাগজ নিতে তিনি আসেননি, এসেছিলেন 'বলাকা' বইখানা নিতে। বইখানা একটা বড় খামের মধ্যে রেখেছিলেন তিনি। আপিসের একটা কথা মনে হওয়াতে নিজের বইটা নিতে এসেছেন এই দুপুরের রোদ মাথায় করে। একটা কন্‌স্টেবল পাঠাতে পারতেন কিন্তু এসব ব্যাপারে চাকর-বাকরের উপর বিশ্বাস করা সমীচীন মনে করেন না তিনি। তা ছাড়া কন্‌স্টেবল পাঠিয়ে লাভও হত না। নিরক্ষরা বকুলবালা 'বলাকা' খুঁজে বার করতে পারত না।

যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, "আমাকে হয়তো সাহেবের সঙ্গে টুরে বেরুতে হবে।"

"কবে?"

"তারিখ ঠিক হয়নি এখনও।"

রূপচাঁদ চলে গেলেন। বকুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন হঠাৎ। তাঁর মনে হল, অমরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পাখি দেখবার পথটা সুগম হল তা হলে।

আপিসের শেষ ফাইলটি ক্লিয়ার করে রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ দোয়াতদানিটার দিকে চেয়ে। তারপর ঘণ্টাটি টিপলেন। একজন কন্‌স্টেবল সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

"সতুবাবুর দোকান থেকে এক কাপ চা আনাও দেখি মিশিরজী।"

"বহুৎ খুব।"

একটু পরেই চা এসে পড়ল। চা পান শেষ করে রূপচাঁদ মিশিরজীকে বললেন, "আমি একটা বই আর একখানা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে, সবজিবাগে নদীর ধারে যে মাঈজী থাকেন তাঁকে দিয়ে এস। তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর, চিঠিটা লিখে ফেলি আমি।"

"বহুৎ খুব।"

কন্‌স্টেবল চলে গেল।

রূপচাঁদ চিঠি লিখতে লাগলেন।

ডানা,

সেদিন সকালে তোমাকে 'বলাকাটা' দিতে গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাইনি। তোমার চাকরের মুখে শুনলাম, তোমার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে সম্ভবত। আনন্দমোহন তোমাকে রঙে চুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। সকলকেই সেদিন রঙে চুবিয়েছে ও। জলে ভিজেই শরীরটা বেভাব হয়েছে বোধ হয় তোমার। জলের সঙ্গে রঙ মেশানো থাকলে আরও বেশি বেভাব হওয়ার সম্ভবনা। ঘাবড়ালে চলবে না। তোমাদের ওপর দিয়েই তো এখন নানা রঙের খেলা চলবে। বিশ্বনাট্যমঞ্চে তোমরাই যে রঙ্গিণী। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সহসা যে সুরটা বেজে উঠেছিল আমার কণ্ঠে, সেটা সত্যিই আমার মনের সুর, এবং একেবারে বিশুদ্ধ সুর। বিশুদ্ধ মানে স্বাভাবিক, পবিত্রও বলতে পার। কিন্তু সমাজ নামক এমন

একটি আজব জিনিস তৈরি করেছি আমরা যে, প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ সুর আলাপ করবার সাহস নেই অনেকেরই। বিশুদ্ধ সুরের কালোয়াতি করতে গিয়ে চার্বাক, স্পাইনোজা প্রভৃতি বড় বড় ঋষিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করে নিশ্চিহ্ন করাটাই এখনও ভদ্র সমাজে সভ্যতা বলে গণ্য। কিন্তু অসাধারণ মানব-মানবী পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবেও বরাবর। তোমাকে অসাধারাণর দলে ফেলছি বলেই তোমার কাছে এ-ধরনের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। সমর্থ পুরুষের নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেরণার সত্য মূল্য তোমার মতো নারীই দিতে পারে বলে বিশ্বাস করি। তবে এটাও বিশ্বাস করি যে, তোমার পছন্দ-অপছন্দর একটা মাপকাঠি আছে নিশ্চয়ই, (সেদিন তোমার চার-এর উপমাটা বেশ লেগেছিল) এবং তা দিয়ে তোমার অজ্ঞাতসারেই হয়তো তুমি মাপছ অনেককেই। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের দলে পড়েছি কি না অর্থাৎ আমাকেও তুমি মেপেছ কি না জানি না, কিন্তু সেটা জানবার স্বাভাবিক কৌতূহল একটা আছে।

তোমার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা গদ্যে বলা যাবে না। আনন্দমোহনের মতো বাংলা কবিতা লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। কলেজ-জীবনে ইংরেজীতে কবিতা লেখার শখ ছিল। মাঝে মাঝে লিখেওছি। অনেক দিন পরে আজ আবার চেষ্টা করলাম। তোমার সম্বন্ধে যা আমার মনে হয়েছে, তা ইংরেজী কবিতায় লিখে পাঠাচ্ছি। ভাল যদি না লাগে, ছিঁড়ে ফেলে দিও। আর একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। আমি বিবাহিত লোক, সে কথাটা মনে রেখো। তুমি কি করবে বা করবে না, তা তুমিই ঠিক করো। একটি অনুরোধ শুধু করছি অর্থাৎ একটি জিনিস করতে মানা করছি। হৈ-চি করো না। তা যদি কর, তা হলে আমাকেও হয়তো আত্মরক্ষার জন্যে এমন সব অবাঞ্ছনীয় কাজ করতে হবে, যা আমি এখন করবার কল্পনাও করি না। কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
Lightening speaks in flight.

The manner in which they express
Is simple plain and sweet
But what we do, human beings?
We know not how to do it.

When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter
When the eyes speak the tongue denies
Words fail or falter.

I know not how to word my feelings
How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in Light and Hues.

হয়তো এর ছন্দে গোলমাল আছে, কিন্তু বক্তব্যটা আশা করি সুস্পষ্ট হয়েছে। এর বেশি কিছু আর বলবার নেই। ইতি— আর. সি.

চিঠি লেখা শেষ করে রূপচাঁদ চিঠিটা খামে পুরে খামটি বেশ ভাল করে জুড়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন কন্‌স্টেবলকে।

"মিশিরজী, এই চিঠিটা এবং বইটি মাইজীকে দিয়ে এস। মাইজীর হাতে দেবে, আর কারও হাতে দিও না যেন। মাইজী যদি না থাকেন, ফিরিয়ে নিয়ে এস। সাইকেলটা নিয়েই যাও। আমি এইখানেই আছি।"

কন্‌স্টেবল চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর হাতেই সে চিঠি এবং বই দিয়ে এসেছে।

"সেখানে আর কেউ ছিল নাকি?"

"জী, না।"

রূপচাঁদ আরও কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন। তারপর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বাড়ির কাছে এসে দেখেন, বিস্রস্তবাসা বকুলবালা একটা লোমওঠা কুকুরের পিছনে ঢিল নিয়ে ছুটছেন। যে ঢিলটা তিনি ছুঁড়েছিলেন, আর একটু হলেই সেটা রূপচাঁদকেই লাগত।

"কি, ব্যাপার কি?"

"মেরেই ফেলব মুখপোড়াকে আজ"—বকুলবালার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্‌ধক্ করে আগুন জ্বলছে।

"হল কি?"

"তোমার জন্যে হালুয়াটি করে পেয়ারাগাছে উঠেছিলাম কয়েকটা পেয়ারা পাড়বার জন্যে, মুখপোড়া কখন সুট করে ঢুকে সমস্ত হালুয়াটি খেয়ে গেছে!"

ক্ষুধার্ত রূপচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "যাক, চল, মুড়ি-টুড়ি আছে তো তাই খাওয়া যাবে।"

"মুড়ি আবার কখন কিনলাম!"

রূপচাঁদের ইচ্ছে করতে লাগল, তার চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন, কখন কিনেছ তা জানতে চাইছি না, আছে কি না জানতে চাইছি।

কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করে হাসিমুখে বললেন, "চল, ঘরে যা আছে তাই খাওয়া যাবে!"

"শুধু পরোটা কি খেতে পারবে?"

"তরকারি নেই কোনও?"

"তরকারি ওবেলা সব ফুরিয়ে গেছে। এবেলা আনতে হবে। তরকারি নেই বলেই তো হালুয়া করতে গেলুম।"

"দু-একটা আলু-পটলও নেই?"

"কচু আছে আধখানা।"

এই বলে শিশুর মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"ধ্যেৎ, তার চেয়ে চল, গুড় দিয়ে খাবে।"

'বেশ, চল।'

।। চোদ্দ ।।

রত্নপ্রভার কাণ্ড দেখে ডানা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবুও হয়েছিলেন। তিনি আশা করেননি যে, রত্নপ্রভা নিজে মরা কাকের ডানা, পা, লেজ, ঠোঁট মাপতে বসবেন। রত্নপ্রভা কিন্তু বেশ উৎসাহ সহকারেই মাপতে বসেছিলেন। যদিও এতে অমরবাবুর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছিল, কারণ রত্নপ্রভা সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপতে পারছিলেন না, বলে দেওয়া সত্ত্বেও গোলমাল করে ফেলছিলেন মাঝে মাঝে, তবু অমরবাবুর বেশ লাগছিল। ডানা একধারে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মাপের অঙ্কগুলো টুকে নেবার জন্যে বসেছিল। তার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছিল; শুধু তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল, এতগুলো প্রাণী হত্যা করে কি লাভ হবে শেষ পর্যন্ত? অমরবাবু সত্যিই যদি এ অঞ্চলের কাকেদের (Corvus Spendens) আর একটা উপ-শ্রেণী (Sub-Species) বার করতে পারেন, তাতেই বা কি? হয়তো বিজ্ঞান জগতে ওঁর একটু নাম হবে; কিন্তু তখনই আবার মনে হল, না ঠিক নামের জন্যে উনি এত করছেন না, উনি করছেন নিজের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে। একটা অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল মাতিয়ে রেখেছে ভদ্রলোককে। ছোট ছেলের মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছেন সর্বদা। একটা কাকের পেটে কয়েকটা ডিম পাওয়া গেছে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন যেন উনি। ডিমসুদ্ধ গোটা কাকটাকেই উনি একটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছেন একটা ওষুধে ডুবিয়ে। এমন বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার! জারে লেবেল লাগিয়ে অমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার রত্নপ্রভার দিকে। শেষ কাকটির মাপ নিচ্ছিলেন তিনি।

"না না, ভুল হচ্ছে, ল্যাজের মাপটা ক্যালিপার্স দিয়ে নাও। ছাড়িয়ে নাও বেশ করে আগে। হ্যাঁ। তারপর ওই মাঝখানের পালক দুটোর মাঝখানে একটা পয়েন্ট নাও, তারপর সবচেয়ে লম্বা পালকটার টিপ পর্যন্ত মাপ। হ্যাঁ, হয়েছে। ঠোঁটটা ঠিক করে মেপেছ তো বেস অভ দি স্কাল (Base of the skull) থেকে সোজা লাইনে? দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি আমি।"

নিজের ভুলের জন্যে রত্নপ্রভা খুব বেশি অপ্রস্তুত হয়েছেন, তা মনে হল না। তাঁর মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল শুধু। ক্যালিপার্স দিয়ে কাকের লেজটা মেপে পাশের কাগজে টুকে রাখলেন। অমরবাবু সেগুলো ঠিক হয়েছে কি না দেখে তবে ডানাকে টুকতে দেবেন।

হাত ধুয়ে এসে অমরবাবু নিজে হাতে আবার মাপতে লাগলেন।

"আর নেই তো?"—রত্নপ্রভা বললেন।

"না, এইটেই শেষ।"

"তা হলে আমি চায়ের চেষ্টা দেখি একটু।"

"এইখান থেকেই বলে দাওনা কাউকে। ভিখারী করুক না।"

"ভিখারী পারবে না। এত খাটুনির পর ভাল করে চা খেতে হবে একটু। কড়া করে কি বলেন?"

ডানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেলেন রত্নপ্রভা। বৈজ্ঞানিক মাপজোপ শেষ করে ডানার দিকে ফিরে বললেন, "ঠিকই আছে। আপনি টুকে নিন এ ফিগারগুলো।"

"পুরুষ-কাক—ডানা ২৬৬ মিলিমিটার; ঠোঁট ৫০.৫ মিলিমিটার; ল্যাজ ১৬৪ মিলিমিটার; নখ—মানে টারসাস্ ৪৮ মিলিমিটার; সবসুদ্ধ কটা হল দেখুন তো।"

ডানা গুনে বললে, "পুরুষ-কাক কুড়িটা, স্ত্রী-কাক ষোলটা।"

সনাতন মল্লিক উঁকি দিলেন দ্বারপ্রান্তে।

"আরও কাক কি মারতে হবে?"

"না। কোনও পাখিই মারবার দরকার নাই আর। এটা যে ব্রীডিং সিজন্ তা খেয়াল ছিল না আমার। আসছে বছর আবার দেখা যাবে। মরা কাকগুলো কি করলেন?"

"পুঁতিয়ে দিয়েছি।"

"যে পাখিওয়ালাগুলো এসেছে, তারা কিছু ধরতে পেরেছে কি?"

"ফেরেনি তারা এখনও। তবে সেদিন যে পেঁচাটা দেখে এসেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে ডিম সুদ্ধ।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি! কোথায় সেটা?"

"বার-বাড়িতে। আনতে বলব?"

"নিশ্চয়!"

কিন্তু অমরবাবুর আর তর সইল না। নিজেই তিনি বেরিয়ে গেলেন হুড়মুড় করে।

ডানা বসে রইল। তার আগেকার চিন্তার সূত্র ধরেই ভাবতে লাগল, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেও কি জীবহত্যার সমর্থন করা চলে? সে জানত না যে, এ নিয়ে বিদ্বৎ-সমাজে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও স্বাধীনভাবে ডানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষকে যথাসম্ভব অহিংস হতে হবে। হিংস্র হবার চরম ক্ষমতা আছে বলেই হতে হবে। সে শক্তিশালী বলেই সংযমী হতে হবে তাকে। যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রাণীহত্যার কারণ সে কৌতূহল সম্বরণ করাটাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হওয়া চাই, অন্য কোনও কারণে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। সে কোথায় যেন পড়েছিল—কোনো পাঠ্য পুস্তকেই সম্ভব—যে, জীবজগতের জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত যে, তার বেশি রকম ওলট-পালট করতে গেলে সমগ্র জীবজগতেরই সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অদরকারী বলে কিছু নেই। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও কিছু ধ্বংস করা মানেই প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেওয়া এবং তার পরিণাম শুভ নয়, অশুভ। যে 'ফাংগাস' (চলতি ভাষায় যাকে আমার 'ছাতা' বলি) এতদিন নানা রকম ঘৃণ্য রোগের হেতু বলে গণ্য হচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রোগ সারাবারও উপাদান আছে। মানুষ যদি ইতিপূর্বে কোনও উপায়ে এই 'ফাংগাস'দের নির্মূল করে দিতে পারত, তা হলে 'পেনিসিলিন' বা ফাংগাস-জাত অন্যান্য মূল্যবান ওষুধগুলি মানবসমাজ পেত না। মানুষের নিজের প্রয়োজনের জন্যই হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা আজ জানা যায়নি বলেই অনেক জীবকে

আমরা অদরকারী বা অনিষ্টকারী মনে করি, পরে হয়তো জানা যাবে যে, তারা উপকারীও। এই জন্যেই, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাই সভ্য মানুষ স্বভাবত অহিংস। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর একটা স্বাভাবিক হার প্রকৃতির প্রয়োজনবশতই ঠিক হয়ে আছে। অস্বাভাবিক উপায়ে সে হার নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য মানুষ হয়তো নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। হঠাৎ রূপচাঁদের চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি সে। এ ধরনের চিঠি ইতিপূর্বে পেয়েছে সে আরও দু-একবার, বর্মায় থাকতে। সে জানে, এর একমাত্র প্রতিষেধক ঔদাসীন্য। যেন কিছুই হয়নি, এ রকম তো হয়েই থাকে—এই গোছের একটা ভাব দেখানো। রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হলে খুব সহজভাবেই সে কথা কইবে ভেবে রেখেছে। রূপচাঁদ প্রশ্ন না করলে চিঠিটার উল্লেখও সে করবে না। প্রশ্ন যদি করেন, তখন যা হোক একটা উত্তর দিলেই হবে। চিঠিটা পেয়ে সে যে বিব্রত বা বিচলিত হয়েছে, এটা সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। চিঠিটার কথা এখন মনে পড়ে গেল, কারণ রূপচাঁদবাবু চিঠিতে স্বাভাবিক কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন বেশ জট পাকিয়ে গেল ডানার মনে। জীবনে স্বাভাবিক হতে চাওয়াটাই যদি কাম্য হয়, তা হলে রূপচাঁদবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। আর অস্বাভাবিকতাই যদি সভ্যতা হয়, তা হলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে। অমরবাবুর পক্ষী নিধনে আপত্তি করা চলবে না। তার মন পরস্পরবিরোধী দুটো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে কেন—স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা দুটোই বিস্বাদ লাগছে কেন? তৃতীয় একটা কিছু আছে না কি, যা স্বাভাবিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়, যা শুধু মনুষ্যোচিত। কি সেটা?....সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।...

সোরগোল করতে করতে বৈজ্ঞানিক ঢুকলেন দুজন লোককে নিয়ে। দুজনের মাথায় দুটো প্রকাণ্ড খাঁচা। মুরগি-ব্যবসায়ীরা বাঁশের তৈরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সব খাঁচায় মুরগি রাখে, সেই রকম দুটো খাঁচায় বেশ বড় দুটো পেঁচা রয়েছে।

"বুঝলেন, একটা নয়, দুটো পাওয়া গেছে। আর আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, কেটুপাই ঠিক। লক্ষ্য করে দেখুন—পা পালক দিয়ে ঢাকা নয়। আর ওই ডিমটাও দেখুন—একটি মাত্রই ছিল, এরা একটার বেশি পাড়েও না সাধারণত, বড় জোর দুটি। ডিমের রঙ কেমন চমৎকার দেখেছেন? সাদার উপর একটু ক্রীমের আভাস। প্রায় দু ইঞ্চি হবে, নয়? একেই বলে ব্রড ওভাল (Broad Oval), এটাকে রেখে দিতে হবে ভাল করে।"

কোণের আলমারি থেকে কার্ড-বোর্ডের বাক্স বার করলেন একটা। তার ভিতর তুলো দেওয়া ছিল। তুলোর উপর ডিমটি সন্তর্পণে রেখে আরও খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ফিরে এসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন পেঁচা দুটোকে। ডানাও দেখতে লাগল। এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে পেঁচা সে দেখেনি কখনও।

"কেটুপারা হচ্ছে ফিশ আউল, বুঝলেন। কয়েক রকম কেটুপা আছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের চেহারা, রঙ আর পা। টারসাসগুলো উলঙ্গ, মানে পালকহীন। বাইরে থেকে কোন্‌টা স্ত্রী কোন্‌টা পুরুষ বোঝবার উপায় নেই। এদের বাসা থেকে বার করলে কি সেই চামড়ার দস্তানাটা পরে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—সনাতন মল্লিক বললেন,—"ভাগ্যে দস্তানাগুলো দিয়েছিলেন, তা না হলে বার করাই যেত না।"

"আমি জানি কিনা।"

রত্নপ্রভা প্রবেশ করলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। অমরবাবু সনাতন মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন, "মল্লিক মশাই, আপনিও একটু চা খেয়ে যাবেন তো?"

"আজ্ঞে না, আমার এখনও আহ্নিক হয়নি।"

"ও, তাই নাকি, তা হলে আপনি বাড়ি যান, বাড়ি যান। এতক্ষণ কষ্ট করে আপনার থাকবার কোনও দরকার ছিল না তো।"

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন অমরবাবু।

সনাতন একটু হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, কষ্ট কি?"

"যান আপনি। আজ আনন্দবাবু আসেননি দেখছি। তিনি বলছিলেন, পেঁচাটা যদি ধরা পড়ে, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। আপনি তো ওই দিকেই যাচ্ছেন—না, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, একটা চাকর পাঠিয়ে দিন বরং।"

"আমিই যাবার পথে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আমার রাস্তাতেই তো পড়বে।"

সনাতন মল্লিক চলে গেলেন।

রত্নপ্রভা চায়ের আসর পেতে বসে প্রথমেই একটি সুখবর দিলেন।

"আমাদের আস্তাবলের আলসেতে একটা শালিক বাসা বাঁধছে বোধ হয়। খড় মুখে করে করে নিয়ে আসছে দেখলাম।' '

"তাই নাকি?"

বৈজ্ঞানিক উৎসাহিত হয়ে উঠে পড়লেন।

কবি বাড়িতে ছিলেন না।

তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শহরের বাইরে একটা বাগানে। বসন্ত শেষ হচ্ছে, তারই শোভা দেখছিলেন তিনি। সবাই যেন এবার ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। অনেক আমগাছ এখনও মুকুলে ভরা, আমও ধরেছে অনেক গাছে। সজনে গাছে কচি কচি ডাঁটা ঝুলছে, ফুলের স্তবকও রয়েছে এখনও। দূরে রাংচিত্তিরের বেড়া, তাতেও ফুল। ঘনশ্যাম সোজা ডাঁটাগুলোর গাঁটে গাঁটে ছোট ছোট আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে যেন। কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। কর্ণিকার গাছে পাতা দেখা যায় না, আপাদমস্তক সোনার ফুল। কত রকম পাখিই যে ডাকছে! দোয়েলের গিটকিরি-ভরা গান আকুল করে তুলেছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতকে। যে রিক্তাভরণা বসন্তশ্রী চলে যাবার আগে ফুলে ফলে কিশলয়ে সালঙ্কারা হয়ে উঠেছে, সহসা দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত যেন মাদকতার সঞ্চার করেছে তাতে। কোকিলও ডাকছে। ক্রমাগত ডাকছে, বিরাম নেই। তার অবিরাম আহ্বানকে ব্যঙ্গ করে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণকণ্ঠী কোকিলের ভর্ৎসনা—কিক্ কিক্ কিক্। পাপিয়ার সুরলহরী আকাশ স্পর্শ করেছে যেন। মনে হচ্ছে মর্তের আকুতি অমর্তলোকে গিয়ে পৌঁছল বুঝি। ট্র, টুরু টুরু—কয়েকটা বুলবুলি উড়ে গেল। ছোট্ট একটু জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন একবার। একটু দূরের একটা গাছে ভারি চমৎকার একটা সুর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন কবি। কাছে গিয়ে দেখেন ফিঙে এবং ফিঙেগিন্নী প্রেমালাপ করছেন। মিষ্টি সুরের মাঝে মাঝে কেররর-গোছের মিষ্টি ঝনৎকারও আছে একটু। দূর থেকে শুনলে মনে হয়, দু রকম পাখি ডাকছে বুঝি! ছাতারেগুলো কচকচ করছে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিতর। লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বকর-বকর করছে ক্রমাগত।

শালিক-দম্পতি খড় কুটো মুখে তুলে বাসা বানাতে ব্যস্ত। দূরের একটা পড়ো বাড়ির কার্নিসে বার বার উড়ে উড়ে যাচ্ছে খড় মুখে নিয়ে। ছোট ভগীরথও একটা গাছের ডালে ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গর্ত করছে, কুরে কুরে বাসা তৈরি করছে। দূরের আমগাছটায় টিয়া বসল এসে এক ঝাঁক।

হঠাৎ কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা লোক গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। মানুষ নয়, মার্জার যেন একটা। হঠাৎ জালটা ঘুরিয়ে ফেলল সে একটা ঝোপে। সমস্ত পাখি উড়ে গেল আশপাশের গাছগুলো থেকে।

"কে তুমি হে, কি করছ এখানে?"

এগিয়ে গেলেন কবি। লোকটা জাল গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোনও জবাব দিলে না প্রথমে।

"কি করছ, জাল ফেলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখি ধরব।"

"কেন?"

"অমরবাবুর চাই। পাখি পিছু এক টাকা করে দেবেন বলেছেন।"

"ও!"

পাখি-ওয়ালা জাল কাঁধে ফেলে অন্য দিকে চলে গেল। কবি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার প্রস্থান-পথের দিকে। জাল দিয়ে পাখি ধরার কথা ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন তিনি, খাঁচার ভিতর বন্দী পাখিও দেখেছেন, তবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি, বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ আবার কিক্ কিক্ করে উঠল কোকিল সুন্দরী। খিক খিক করে হেসে উঠল যেন। টুর্‌র্‌র্ করে সাড়া দিলে বুলবুলি। এক ঝাঁক গো-শালিক কলবর করে উঠল। কবির মনে হল, ওই পাখিওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে ওরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলছে যেন প্রত্যেকেই। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে ওদের বক্তব্যটা যেন নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। একটা গাছের তলা একটু পরিষ্কার ছিল, সেইখানে বসলেন আবার। পকেট থেকে খাতা কলম বেরুল। পাখিদের বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মনে হল পাখিরা যেন বলছে—

১

তোমাকে চিনি...
আমাদের তুমি চিনতে চাও কি ও পাখি-ওলা?
দূর হতে তুমি কারও শোন গান,
কারও দেখ রঙ, কাহারও দোলা,
ভাল করে তুমি দেখেছ কখনো কি
মোদের সুনীল উদার আকাশটি?
আকাশ খোলা
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

২

রঙ বা সুরের তুফান তুলিয়া
কেউবা টিয়া,
বাহার দিয়া,
কেউবা কোয়েল, কেউবা দোয়েল, কেউবা পাপিয়া
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল করে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৩

সুরের নেশায় কেউবা হারায়ে ফেলেছি দিশা,
কাহারও ফটিক-জলের তৃষা,
কেহবা জাগিয়া কাটাই নিশা—
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল করে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৪

কাহারও পালকে ইন্দ্রধনুর বরণ ঘটা
কাহারও রূপালী, কাহারও আবার
সোনার ছটা
সরল জটিল অনেক ধরন
বিবিধ বরণ চঞ্চু চরণ
লাল, নীল, শাদা, কালো বা কটা
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল করে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৫

হয়তো একদা পড়ে যাব ধরা ফাঁদেতে তোমার,
খাঁচাটি তোমার জানি না কেমন
হয়তো লোহার, হয়তো সোনার
হয়তো একদা ভুলাব তোমারে পেখম তুলি

হয়তো শিখিব তোমারি বুলি
খাইব তোমারি ছাতু বা ছোলা
তোমারি দাঁড়েতে দুলিব দোলা
দয়া করে শুধু যেও না ভুলি
ছিল আমাদের আকাশ খোলা,
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন কবি। ডানার কথা মনে পড়ল। সেদিন রঙ মাখিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে আর তিনি ডানার কাছে যাননি। রঙ দিতে দিতে মনে হচ্ছিল, ডানা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে নিরুপায় হয়ে রঙ দেওয়াটা সহ্য করছে। উৎসবটা উপভোগ করেনি। তাঁরও উৎসব তাই জমেনি সেদিন। এটাও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন যে, জোর করে উৎসব জমানো যায় না। আনন্দটা স্বতোৎসারিত না হলে তা নিরানন্দের চেয়েও পীড়াদায়ক। ডানা কেন অমন করে আছে? পাখিগুলো পাখিওয়ালাটাকে যে চক্ষে দেখছে, ডানাও হয়তো ঠিক সেই চক্ষেই দেখছে আমাকে। ভাবছে, আমি কবি নই, আমি একটা ফাঁদ। তার ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন সে উৎসবে যোগ দেবে হয়তো। প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। প্রতীক্ষাতেও আনন্দ আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ মনে হল, সত্যিকার উৎসব কবে জমবে? কবে ডানা বুঝতে পারবে যে, অপরকে বঞ্চিত করলে নিজেকেও বঞ্চিত হতে হয়? প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিত্য নব উৎসবের যে ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়েছে অহরহ, ঘরের দ্বার বন্ধ করে রেখে কতকাল তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে সে? দ্বার একদিন খুলতেই হবে। কিন্তু কবে?...

"চিঠ্‌ঠি হ্যায়।"

চমকে উঠলেন কবি। ফিরে দেখলেন, চন্দনচর্চিত তাঁর মৈথিল ঠাকুরটি একটি চিঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে এখানে থাকবেন, তা ঠাকুরটিকে বলে এসেছিলেন। চিঠিটি সনাতন মল্লিকের।—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আনন্দবাবু আপনাকে এক জোড়া হুতোম পেঁচা দেখাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অমরেশবাবু বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম। আপনার দেখা না পাইয়া এই চিঠিটি লিখিয়া যাইতেছি। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়
শ্রী সনাতন মল্লিক

চিঠিটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি উঠে পড়লেন। হয়তো সোজা অমরবাবুর বাড়িই যেতেন, কিন্তু ঠাকুরটি অদ্ভুত ভাষায় আর একটি খবর দিলে।

"রেন্না হোইয়ে গিয়েসে।"

"কটা বেজেছে?"

"বারহ্‌ বজ্‌ গিয়া।"

"তবে চল, বাড়িই যাই।"

।। পনেরো ।।

গত কয়েকদিন থেকে রূপচাঁদ মনে মনে একটি বড়ে হাতে করে কোথায় সেটি বসাবেন ভাবছিলেন। সনাতন মল্লিকের আগমনে তাঁর সে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। রূপচাঁদ যুক্তিপন্থী জড়বাদী লোক, দৈব-টৈবের ধার বিশেষ ধারেন না, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য তিনি বিচলিত হলেন একটু। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হল, এর মধ্যে দৈবের কোনো ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি! মনে হওয়াতে কিন্তু আনন্দিতই হলেন। সমস্ত যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর মন কোনো এক অজানা দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় লোলুপ হয়ে উঠল। এ ভাবে লোলুপ হয়ে ওঠাটা যে অযৌক্তিক, তা তাঁর মনেই হল না।

শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক অবশ্য রূপচাঁদকে সাহায্য করতে আসেননি, এসেছিলেন নিজের কাজে। তিনি যদিও অমরবাবুর একটা কাছারির ম্যানেজার বলেই বিখ্যাত, তবু তাঁর নিজেরও বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু। যদিও যৎসামান্য, তবু সেটাকে কেন্দ্র করেই একটা ফৌজদারী মামলায় পড়ে গেলেন তিনি। সিংহেশ্বর দারোগা যদি ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়, তা হলে খুনের দায়ে পড়তে হবে তাঁকে। বিপদে পড়লে সনাতন মল্লিকের বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে ওঠে। সিংহেশ্বর দারোগার কাছে না গিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তাঁর মনে হল, রূপচাঁদ যখন পুলিশ অফিসের বড়বাবু, তখন তিনি দারোগারও দারোগা।

রূপচাঁদ হাসিমুখে মল্লিক মশায়ের কথা শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। নিশ্চয় করবেন। মল্লিকের মুখের দিকে হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "আপনি অমরকে দিয়েও যদি একটু চেষ্টা করেন তা হলেও তো হয়ে যায়। অমরকে খুবই খাতির করে সিংহেশ্বর দারোগা।"

"তা জানি"—মৃদু হেসে বললেন মল্লিক মশাই—"কিন্তু পাখি নিয়ে উনি এমন উন্মত্ত যে, এ সব কথা ওঁর কাছে পাড়াই মুশকিল।"

এইবার ব'ড়েটি চালালেন রূপচাঁদ।

মুচকি হেসে বললেন, "বিশেষ করে পাখির ডানা নিয়ে বলুন। সেদিন স্বচক্ষেই তো দেখলেন।"

এর উত্তরে মল্লিক কোনো কথা বললেন না, তাঁর মুচকি হাসিটি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে গেল শুধু।

"না, না, হাসির কথা নয়"—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেলে এবার—"বন্ধু হিসাবে এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত আমাদের।"

"কি প্রতিকার করবেন? আপনি আমি কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? যার হাতে অত টাকা—"

কথাটা শুনে রূপচাঁদ দমে গেলেন একটু মনে মনে। বস্তুতান্ত্রিক লোক তিনি টাকার ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে অনেক টাকা আছে এ সংবাদটা মোটেই আনন্দজনক নয় তাঁর কাছে। তাঁর ধারণা, টাকা দিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। কাকে কিনতে কত সময় এবং কি পরিমাণ অর্থ লাগে, সেইটে কেবল নির্ভর করে প্রতি স্ত্রীলোকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের উপর। আর কোনো তফাত নেই। অমরেশ যে বড়লোক তা রূপচাঁদ জানতেন, কিন্তু তার ঠিক কত টাকা আছে এ খবরটা ঠিক তিনি জানতেন না। ঈষৎ কৌতূহল হল।

"অনেক টাকা আছে নাকি ওঁর?"

"নেই? বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু জমিদারি আছে যে। নগদ টাকাও আছে বেশ। বাপের, শ্বশুরের, মামার—তিন জায়গারই বিষয় পেয়েছেন কিনা। ত্রিবেণী-সঙ্গম। অগাধ জলের মাছ উনি।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক অবশ্য রাশ টেনে ধরতে পারেন—ওঁর পরিবার।"

মল্লিক মশাইও কথাটা স্বীকার করলেন।

"তা পারেন বৈকি, একশো বার পারেন। কিন্তু করছেন না তো কিছু বরং ওঁর গোড়েই গোড় মিলিয়ে—"

"আমরা সেদিন যেটা দেখলাম, সে খবরটা উনি জানেন না বোধ হয়। আমাদের উচিত খবরটা ওঁর কানে তুলে দেওয়া। আমার দ্বারা অবশ্য অসম্ভব সেটা, কোন কৌশলে আপনি যদি পারেন।"

"আমি? ও বাবা! কে পড়তে যাবে ওই বাঘিনীর পাল্লায়!"

"বাঘিনী নাকি? মনে তো হয় না দেখে?"

"আপনার মনে হবে কেন, হবার কথাও নয়, যার ঘাড়টি মটকায় সে-ই জানতে পারে।"

"ঘাড় মটকায় নাকি?"

"খুব মটকায়। এখানকার জমিদারি তো ওঁরই বাপের, উনিই সব দেখাশোনা করেন, পান থেকে চুনটি খসবার জো নেই কারও। লেখাপড়া তেমন জানেন না বটে, কিন্তু সমস্ত জমিদারির হিসাবপত্র একেবারে নখাগ্রে।"

"সেইজন্যেই তো আমার আরও আশা হচ্ছে যে নিজের স্বামীর পান থেকে চুন খসার খবরটা পেলে উনি ছেড়ে কথা কইবেন না। খবরটা আপনি পৌঁছে দিন কোনো রকমে, বুঝলেন? আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন।"

কথাটা বলে রূপচাঁদ এমনভাবে চাইলেন মল্লিক মশাইয়ের দিকে যে মল্লিক পুলকিত না হয়ে পারলেন না।

"নবুর মাকে দিয়ে খবরটা বলাতে পারি অবশ্য। এমনভাবে বলবে, যেন গুজব শুনেছে একটা। সেটা কিছু অসম্ভব নয়।"

"নবুর মা-টি কে?"

"ওঁর ঝি।".

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূপচাঁদ বললেন, "উপকারটি করুন তা হলে। অমরেশ আমাদের বন্ধুলোক, কিন্তু এসব ব্যাপার সামনাসামনি তো বলা যায় না কিছু। অথচ—"

রূপচাঁদ এমন একটা ভাব করলেন যে, মল্লিক মশাই যদি নবুর মাকে দিয়ে রত্নপ্রভার কানে খবরটা তোলেন তা হলে তিনি, মানে রূপচাঁদই, যেন ব্যক্তিগতভাবে বাধিত হবেন। মল্লিকমশাই রূপচাঁদের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, রত্নপ্রভার উপর তাঁর নিজেরও একটা আক্রোশ আছে, তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

"বেশ, নবুর মাকে বলব আমি। দু-চার দিনের মধ্যে চলেও যাচ্ছে ওঁরা।"

"কারা?"

"অমরবাবুরা।"

"কোথায়?"

"ওদের জমিদারি দেখতে। নানা জায়গায় সম্পত্তি আছে তো। একটা জরুরি তারও এসেছে নাকি কোথা থেকে।"

"ডানাও সঙ্গে যাচ্ছে নাকি?"

"প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন, যাওয়া তো উচিত।"

রূপচাঁদের মনটা ঝম্পনোম্মুখ বিড়ালের মতো একাগ্র হয়ে উঠল সহসা।

"সিংহেশ্বর দারোগাকে আজই খবর পাঠাব আমি। আপনিও নবুর মাকে লাগান আজই, দেরি করবেন না। দেরি করবেন না, বুঝলেন?"

"আচ্ছা।"

"মল্লিকমশাইয়ের কেমন যেন অস্পষ্টভাব মনে হল যে সিংহেশ্বর দারোগাকে সপক্ষে আনার মূল্য হিসাবেই যেন তাঁকে এ কাজটি করতে হবে।"

"উঠি তবে।"

"নবুর মায়ের কথাটা ভুলবেন না।"

"না।"

মল্লিকমশাই চলে গেলেন। চুপ করে বসে রইলেন রূপচাঁদ। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হতে লাগল তাঁর। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিলেন। তারই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একটা সর্পসঙ্কুল গুহায় মধ্যে ঢুকে পড়ে সিন্দবাদের মানসিক অবস্থা যে রকম হয়েছিল, তাঁরও যেন সেই রকম হল। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। প্রত্যেকটা মনোহর, প্রত্যেকটা বিষধর। প্রত্যেকের ফণার দুপাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ, না, মণি? রূপচাঁদের শরীরের শিরায় উপশিরায় অগ্নিস্রোত বইতে লাগল যেন। পরমুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। না, আত্মহারা হলে চলবে না। স্থির মস্তিষ্কে অগ্রসর হতে হবে। আপিসের কাজে মন দিলেন আবার।

।। ষোলো ।।

দ্বিপ্রহরটা ভারি অদ্ভুত মনে হল কবির কাছে। মনে হল, দ্বিপ্রহরের রূপটা চোখেই পড়েনি এতদিন। দিবসের পূর্ণ যৌবন যেন অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও কোনও সাজসজ্জা নেই, কোনও কলরব নেই। মানুষ, গাছ, পশুপক্ষী সকলেই যেন সংযত হয়ে আছে, একটা আত্মসম্বরণের সুর যেন ফুটে উঠেছে চারিদিকে। আত্মসম্বরণ, না, আত্মবিস্মৃতি?—সহসা মনে হল তাঁর? পূর্ণ যৌবন তো আত্মবিস্মৃত। নিজের মহিমার সম্পূর্ণ খবর সে নিজেও জানে না, অপরকে জ্ঞাতসারে জানাবার চেষ্টাও করে না তাই। সকালে অমরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে প্যাঁচা দুটো দেখেও এই কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। ওদের অটল গাম্ভীর্য, প্রচ্ছন্ন প্রতাপ, ওদের শ্বাপদসুলভ স্থূলতার সঙ্গে পক্ষীসুলভ লঘুতার সমন্বয়—এ সমস্তর সম্বন্ধেই ওরা উদাসীন। আমাদের মনে যে ভাব ওরা উদ্রেক করেছে, তার খবর ওরা নিজেরাই জানে না। ডানার কথা মনে হল। সকালে

যখন গিয়েছিলেন, ডানা তখন ছিল না সেখানে। না থাকাতে একটু আরামই পেয়েছিলেন মনে মনে। সেদিন অমন জোর করে রঙ দেওয়ার পর থেকে নিজেই যেন অপরাধী হয়ে আছেন নিজের কাছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এই সঙ্কোচটাকে তিনি যদি প্রশ্রয় দেন, তা হলেই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি তো অন্যায় কিছু করেননি, তাঁর মনে কোনো পাপ নেই, সেদিন নিছক আনন্দের প্রেরণায় রঙে রসে মেতে উঠেছিলেন তিনি, তার মধ্যে স্থূল কিছু ছিল না। উঠে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এ সঙ্কোচের বাধাকে সরাতে হবে, এখনই সরাতে হবে। ডানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি রূপরসিক কবি, মাংসলোলুপ পশু নন। তার দেহে, তাঁর যৌবন-শ্রীতে যে সৌন্দর্য ক্ষণিকের লীলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই তিনি উপাসক।

...হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আর একটা চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর এই সৌন্দর্য-পূজার ফলে ডানার মনোজগতে যদি একটা বিপ্লব ঘটে যায়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে? এ রকম বিপ্লব ঘটতে পারে কি? না পারার কোনও হেতু নেই। বয়সের পার্থক্য প্রেমের অন্তরায় নয়। বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতীর প্রেমের অনেক কাহিনী শোনা গেছে। আর এ কথাও সুবিদিত যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবেসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন দেহ সম্বন্ধে শুধু যে কোনও সঙ্কোচ থাকে না তা নয়, সমস্ত দেহ-মন দয়িতের কাছে নিবেদন করতে না পারলে তার তৃপ্তি হয় না,—আত্মসমর্পণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় সুতরাং—। হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভাবলেন, আমার নিজের মনে যখন ও-ধরনের কোনও চিন্তা জাগেনি, তখন ডানার মনেও জাগবে না।

খুকু নেই, খুকু নেই, খুকু নেই—

গাছের উপর থেকে পাখি ডেকে উঠল একটা। চেয়ে দেখলেন, হাঁড়ি চাঁচা পাখি। এই পাখি তো চ্যা-চ্যা-চ্যা করে ডাকে, ওই ডাকের জন্যই ওর হাঁড়ি চাঁচা নাম সম্ভবত। অমন মিষ্টি করেও ডাকতে পারে নাকি?

খুকু নেই, খুকু নেই—

কি চমৎকার দুলে দুলে ডাকছে। সত্যিই কি খুকু নেই বলছে? কান পেতে শুনলেন। এবার মনে হল, যেন 'কু অক্‌ রিং' 'কু অক্‌ রিং' বলছে। কবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই পাখিটা কিন্তু উড়ে গেল। উড়তেই তার ঝোলা লেজের বাহার দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা জাপানী পাখা যেন। কালোর চারিদিকে চওড়া সাদা পাড়। অতি সাধারণ পাখি তবু একে ভাল করে দেখেননি কোনোদিন। দেখেছেন, কিন্তু চেনেননি। তখনই আবার মনে হল চেনা সহজ কি? যার চ্যা-চ্যা ডাক 'খুকু নেই' হয়ে যায় এবং সেই 'খুকু নেই' 'কু অক্‌ রিং' শোনায় পর-মুহূর্তে, তার পরিচয় কি সহজে পাওয়া যাবে? অমরবাবু যে বইটা দিয়েছেন, সেই বইটা উলটে দেখতে হবে একটু। এই প্রসঙ্গে মনে হল, একটা পাখির ব্যাপারেই যখন এত হেঁয়ালি, মানুষের ব্যাপারে সে হেঁয়ালি না জানি আরও কত জটিল। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ডানার বাসার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে অপ্রত্যাশিত রূপ তিনি এই সামান্য পাখিটার মধ্যে দেখলেন, ডানার মধ্যেও তেমনিই একটা কিছু পাওয়া যাবে কি না এই ধরনের একটা ঔৎসুক্য তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, একটা শব্দ শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোর বালক ডানার বাড়ির পিছন দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে

মাঠামাঠি দৌড়চ্ছে। কবি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ভদ্রঘরের বয়স্ক মেয়েকে এমনভাবে ছুটতে কখনও দেখেননি তিনি। মাথার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে পিঠে, পরনের শাড়ি গাছকোমর করে বাঁধা। বকুলবালা আনন্দমোহনকে দেখেই ছুট দিয়েছিলেন, দূর থেকে আনন্দমোহন তাঁকে চিনতে পারলেন না। চণ্ডীর সঙ্গে বকুলবালা চুপি চুপি দুপুর বেলা বেরিয়েছিলেন, অমরবাবু পাখিদের জন্যে কাঠের যে সব বাসা বানিয়ে নানা গাছে টাঙিয়ে দিয়েছেন তাই দেখবার জন্যে। ডানার বাসার সামনের গাছেই টাঙানো ছিল কাঠের বাক্স একটা চণ্ডী দূর থেকে সেইটে দেখাচ্ছিল বকুলবালাকে।

কবি গিয়ে দেখলেন, দূর থেকেই দেখতে পেলেন ডানা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তার বাঁ কাঁধের উপর। শাড়ির জরি-পাড়টা জ্বলছে রোদ লেগে, কমলা রঙের শাড়িটা যেন আগুনের শিখা। অনেকক্ষণ চুপ করে দেখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে গেলেন।

"পড়া হচ্ছে না?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললে, 'আসুন। অনেক দিন আসেননি।"

"কি পড়ছ?"

"পাখির বই একটা।"

"অমরবাবু দিয়েছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

কবির সঙ্কোচ কেটে গেল। সহজ সুরেই আলাপ করতে লাগলেন তিনি।

।। সতেরো ।।

জরুরি তার এসেছিল রত্নপ্রভার বাপের বাড়ি থেকে। পয়লা বৈশাখ সেখানে খুব উৎসব। সেই উপলক্ষে যেতে হবে। যেতেই যখন হচ্ছে, তখন বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্মগুলোও মিটিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন অমরবাবু। কিছুদিন আগেই এটা ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাখির ব্যাপারে সম্প্রতি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কথাটা মনে ছিল না। মনে পড়াতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যাপারগুলোর কি হবে ভেবে। এতগুলো পাখি ধরা হয়েছে, নানা গাছে পাখির বাসা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো আস্ত পাখি বম্বে পাঠান হয়েছে ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে, পাখির ঘর তৈরি করবার জন্য নানা রকম খাঁচা করতে দিয়েছেন, ইট পোড়ান হচ্ছে, তিনি না থাকলে এসব দেখবে কে? মল্লিক পারবেন না। অথচ তাঁকে যেতেই হবে। এখানকার ব্যাপারের সমস্ত ভারটা ডানার উপরেই দিয়ে যেতে চান তিনি। কোন্ পাখিকে কি খেতে দিতে হবে, তার ফর্দ এবং বই ডানাকে তিনি দিয়েছেন। পাখির যেসব বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ পাখি আসা সম্ভব তারই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এখন। হাতে বই ছিল একটা। হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, ডিউয়ারের (Dewar) এ বইখানা আমি নিয়ে যাব। আপনি বরং নোটই করে নিন।"

ডানা কাগজ-পেন্সিল বার করে বসল।

"পাখিরা সাধারণত কোন্ কোন্ জায়গায় বাস করে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ আছে এতে। লিখুন, বড় হেডিং দিন--বাড়ি। তারপর সাব-হেডিং দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে। লিখুন—চড়াই, হুপো (মানে মোহনচূড়া), শালিক, কুট্রে-প্যাঁচা অবশ্য পুরনো বাড়িই আশ্রয় করে বেশি, নীলকণ্ঠ, দোয়েল, খঞ্জন (মানে Pied Wegtail)—যেগুলো এ দেশে থাকে। তারপর সাব-হেডিং—পারলে বা কড়ি-বরগার ফাঁকে—কালিশ্যামা, পায়রা, ঘুঘুও অনেক সময়, শালিক। আবার সাব-হেডিং—উঁচু ছাদ (যেমন চার্চের ছাদ)—শকুনি, ইন বলেছেন ছাদের উপর টিট্টিভও নাকি কখনও কখনও বাসা বাঁধে, আমি কখনও দেখিনি। আমাদের নদীর ধারের বাড়িটায় লক্ষ্য রাখবেন একটু। তারপর সাব-হেডিং দিন—বাইরের দিকের দেওয়ালে, পারলের কাছে—তাল-চোঁচ, মানে Indian Swift, সোয়ালো, ক্র্যাগ মার্টিন—'

"সোয়ালো কোন্‌গুলো বলুন তো, দেখেছি কি? ক্র্যাগ মার্টিন কি এদেশী পাখি?"

"সোয়ালো আপনাকে দেখিয়েছি। ল্যাজে সরু তারের মতো—Wiretailed নাম সেইজন্য। জগদানন্দবাবু ওর বাংলা নাম দিয়েছেন 'নকুটি'। ক্র্যাগ মার্টিনের পুরো নাম হচ্ছে ডাস্কি ক্র্যাগ মার্টিন (Dusky Crag Martin), আমিও খুব বেশি দেখিনি এ অঞ্চলে। তারপর লিখুন—কড়ি বা বরগা থেকে, কিংবা কোনো তার থেকে যেসব পাখি বাসা ঝুলিয়ে দেয়—টুনটুনি, বাবুই, বারান্দার টবের গাছে যারা বাসা বাঁধে—দর্জিপাখি, বুলবুল। বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ হয়ে গেল। এইবার বাইরে যাওয়া যাক। নদীর তীরে যারা গর্ত কবে বাসা বাঁধে—গাংশালিক, বাঁশপাতি (গ্রীন ব্লুটেল্‌ড্‌ও), মাছরাঙা (কমন পায়েড, হোয়াইট-ব্রেস্টেড)। গাছে যারা গর্ত করে বাসা বানায়—বসন্তবউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা (গোল্ডেন ব্যাক্‌ড—সেদিন যেটা দেখলাম, আর পায়েড, মারহাট্টা)। এরা গাছের গুঁড়িতে বা ডালে নিজেরাই গর্ত বানায়। আর কতগুলো পাখি থাকে, তারা গাছের গুঁড়িতে যেসব ফাটল বা গর্ত থাকে, তাতে বাসা বানায়—যেমন পাওয়াই (দু রকমই—গ্রে-হেডেড, ব্ল্যাক-হেডেড), এরাও শালিক জাতীয়, সাধারণ শালিকও এসব জায়গায় বাসা বানায়, চড়াই, কালিশ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হুপো, প্যাঁচা, টিল, মানে ছোট ছোট হাঁস। হয়েছে?"

ডানা তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছিল, চোখ তুলে একটু হেসে বললে, 'টিল বললেন?"

"হ্যাঁ, টিল। কুম্ব্ ডাকও লিখুন। কুম্ব্ ডাক বুঝলেন তো? নাক্‌টা যাকে বলে। এইবার সাব-হেডিং হবে—ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের নীচের দিকে—"

ডানা লেখা শেষ করে বলল, "হয়েছে, এইবার বলুন।"

বাধা পড়ল। রত্নপ্রভা এসে ঢুকলেন। চকিতে বৈজ্ঞানিকের এবং ডানার দিকে চেয়ে নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। মিনিট কয়েক আগে নবুর মার মুখে তিনি পল্লবিত কাহিনীটি শুনেছেন, ডানা নাকি বৈজ্ঞানিকের পিঠে উঠে নদীর ধারে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। কাহিনীটি সালঙ্কারে বিবৃত করার ফলে নবুর মায়ের চাকরিটি গেছে। রত্নপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিয়েছেন তাকে।

রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ডানাও চলুক না আমাদের সঙ্গে। তোমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে।"

"অসম্ভব। এখানে তাহলে দেখা-শোনা করবে কে? ওর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি

এখানকার। অতগুলো পাখির বাসা টাঙানো হয়েছে, কোন পাখি কোথায় বাসা বাঁধে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো?"

"একা একা ওঁর ভাল লাগবে কি?"

"তা লাগবে"—ডানা হেসে বললে।

"আনন্দবাবুও থাকবেন। তাঁর উপরও ভার দিয়ে যাব। নিন লিখুন। এই বার লিখুন—যেসব পাখি ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা গাছের নীচের দিকে বাসা বানায়।"

রত্নপ্রভা উঠে গেলেন। তিনি যা জানতে এসেছিলেন, তা জেনে গেলেন। নবুর মা ইঙ্গিতে যা প্রকাশ করে গেল তা যদি সত্য হত, তা হলে ডানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক উল্লসিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর উপর ক্ষণিকের জন্যও সন্দেহ হয়েছিল বলে অনুতাপ হল তার। রাগও হল। নবুর মাকে আবার ডাকতে পাঠালেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক আরম্ভ করলেন, 'ঝোপে-ঝাড়ে বা গাছের নীচের দিকে—সাব-হেডিং দিয়েছেন? এইবার লিখুন—ছাতারে, হোয়াইট আর সবজে মুনিয়া, বুলবুল, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, বাবুই, টুনটুনি। হল? তারপর লিখুন—কুয়োপাখি, আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন বাদামী-কালো, ঘুঘু, আরও কয়েকটা নাম আছে, থাক সেগুলো। এইবার সাব-হেডিং দিন—যে সব পাখি গাছের উপরে মগডালের কাছাকাছি বাসা বাঁধে—সবরকম চিল, কাক, হাড়িচাঁচা, ফটিকজল, ফিঙে, শুকুনি, সবরকম বাজ, হরিয়াল, বক, সারস, মুণ্ডক, পানকৌড়ি, গগনভেড় ইত্যাদি। আরও অনেক নাম আছে, সে সব এখানে দেখতে পাবেন না। তারপর সাব-হেডিং দিন—যারা ফসলের ক্ষেতে কিংবা নলখাগড়ার বনে কিংবা বড় বড় ঘাসের ঝোপে বাসা বানায়—হলদে-চোখ ছাতারে, বুলবুল, দর্জিপাখি, রেনওয়ার্বলার (হিন্দীতে যার নাম ফুৎকি), টুনটুনি, নীল বগলা, যার ইংরেজি নাম Purple Heron. এইবার লিখুন, ও, হয়নি বুঝি এখনও?"

"হয়েছে। বলুন।"

"লিখুন—মাটিতে যারা বাসা বানায়—কালিশ্যামা (কদাচিৎ), বগেরি, ভরতপাখির দল, নাইট্‌জার, ময়ূর, বনমুরগি, বটের, তিতির, সারস, হুকনা, বাটান, কাদাখোঁচা, টিট্রিভ, গাংচিল (হুইস্কার্ডগুলো নয় কিন্তু)। এইবার সাব-হেডিং দিন—ঝিলে বিলে যারা বাসা বানায়—জলমুরগি, কূট অর্থাৎ কারগুব (এ দেশে যাদের বাবাজী বলে), জলপিপি, পানডুবি অর্থাৎ Dabchick, Whiskered Tern, গুঁপো, গাংচিল বললে কি খুব খারাপ শোনাবে?"

ডানা লেখা শেষ করে হেসে বললে, "এর অনেক পাখি কিন্তু চিনি না।"

"সালিম আলি আর হুইসলার বই দুটো রেখে যাব। দেখে নেবেন। ছবি দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না।"

কবি এসে হাজির হলেন।

"আসুন, আসুন, আপনারই প্রতীক্ষা করছি। আমার অবর্তমানে আপনি আর ইনি আমার পাখিগুলোর তদারক করবেন। পাখিদের সম্বন্ধে যদি নতুন কিছু দেখেন, লিখে রাখবেন।"

"আমি লিখব কবিতায়, তা আপনার কাজে লাগবে না তো।"

"বেশ, আপনি কবিতাতেই লিখবেন। ইনি লিখবেন গদ্যে। দুটো মিলিয়ে দেখা যাবে, আমার সঙ্গে কোনটা বেশি মেলে।"

ডানার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কবি বললেন, "আমার সঙ্গে কিছু মিলবে না। আপনি সেদিন প্যাঁচার জাতি বংশ নখ পালক নিয়ে অত বক্তৃতা করলেন, কিন্তু আমার কবিতায় যা ফুটল সে একেবারে অন্য জিনিস।"

"কবিতা লিখেছেন নাকি?"

"এনেওছি সঙ্গে।"

"পড়ুন।"

কবি পকেট থেকে কবিতার খাতা বার করে পড়তে লাগলেন--

দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর-বিলাস
মার্জারের শব্দহীন সুগোপন শিকারান্বেষণ
তীক্ষ্ণ তব নখ-চঞ্চু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাধা-বিদারণ
চীৎকার-ছুরিকাঘাতে নিশীথের স্তব্ধতা-বিনাশ
কর যবে হে পেচক,
শান্তরে অশান্ত কর, কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা আকাশ।
অতি স্বচ্ছ দিবালোকে শুনি গান অসংখ্য পক্ষীর
হিংস্র শ্বাপদেরা জানি অন্ধকারে করে সঞ্চরণ
উভয়ের প্রাণধর্ম করিয়াছ তুমি সংহরণ
অন্ধকার প্রাসাদের দ্বারপাল, হে গুরু-গম্ভীর,
শক্তিধর, হে পক্ষী-পাঠান,
হে অদ্ভুত, হে বলিষ্ঠ, হে বাহন জীবন-লক্ষ্মীর।

"চমৎকার হয়েছে তো!"—বৈজ্ঞানিক বললেন,—"প্যাঁচার চরিত্রটা বেশ ফুটেছে।"

"বেশ ফুটেছে?"—ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

ডানা হাসিমুখে চুপ করে রইল ক্ষণকাল, তারপর বললে, "সত্যিই বেশ হয়েছে।" কবিতার কথা কিন্তু চাপা গেল পরমুহূর্তেই।

বৈজ্ঞানিক কবিকে বললেন, "কোন্ কোন্ পাখি কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা বানায়, তার মোটামুটি ফর্দ দিয়ে গেলাম একটা এঁর কাছে। লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের তৈরি বাসাগুলোতে কোনও পাখি আসে কি না।"

"বেশ।"

"পাখিদের খাবার যদি বাসার চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হত তা হলে খাবারের লোভে পাখিগুলো আসত অন্তত। তারপর বাসা পছন্দ হলে হয়তো থেকেও যেত। দাঁড়ান, পাখিদের খাবারেরও আইডিয়া একটা দিয়ে দিই আপনাদের।'

বৈজ্ঞানিক উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বই খুঁজতে লাগলেন।

কবি ডানাকে বললেন, "কি টুকছিলে এতক্ষণ? দেখি—"

ডানা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল কবির।

এই সব রাবিশ লিখে যেতে হচ্ছে ওকে প্রত্যহ। ডানাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করাতে

তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। এখন কষ্ট হতে লাগল। খাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বসে রইলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল, ছ্যাকড়াগাড়িতে ঘোড়াই জোতা উচিত ছিল অমরবাবুর, ময়ূরকে এ কাজে লাগানোটা ঠিক হয়নি। আর কিছু নয়, অশোভন। ময়ূরের কথায় মনে পড়ল ময়ূরবাহন কুমার কার্তিকেয়কে। তারপরই মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য্যবিভূতিভিঃ।

যিনি নিজের বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী দেববালাদের বেণী বিমোচন করতে পারেন, তিনিই ময়ূর বাহন হওয়ার উপযুক্ত।

একগাদা বই নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"এই বইগুলো আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। অনেক রকম খরব পাবেন এগুলোতে।"

বইগুলো খুলে খুলে প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে শুরু করলেন। দিতে দিতে সক্ষোভে বলে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, "সত্যি, আমরা কিছুই করছি না, এরা কত রকম ভাবে পাখির বিষয়ে লিখেছেন দেখুন। ইনি কেবল পাখির ওড়া নিয়েই বই লিখেছেন একটা। ইনি লিখেছেন গান নিয়ে। পাখির বাসা নিয়ে, ডিম নিয়ে, দেশভ্রমণ নিয়ে, খাদ্য নিয়ে এঁদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই। রিপ্লে সাহেব হামিং বার্ড দেখবার জন্যে ডাচ নিউগিনি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। আমরা কি করলাম জীবনে?"

"আপনিও করুন না। বাধাটা কিসের?"—হেসে বললেন কবি।

"অত টাকা কোথায় মশাই? আমার যদি টাকা থাকত, আমিও নিউগিনি গিয়ে থেকে আসতাম কিছুদিন।"

"আপনার টাকা নেই বলেন কি?"

"যা আছে তা যথেষ্ট নয়। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিজের ছোটখাট একটা জাহাজ থাকা দরকার। আমি একা তো যেতে পারব না। রত্নাকে চাই। তা ছাড়া আরও লোকজন চাই। ভাল একজন ফোটোগ্রাফার চাই। দোভাষীও দরকার প্রতিপদে। খরচ অনেক।"

"কিন্তু আপনার তো আয়ও অনেক শুনেছি।"

"খরচ নেই? চারটে স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় কাছারি আছে, কর্মচারী আছে। আমার মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করিয়ে দিতে হবে, তাতেই দশ-বারো লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাবে। জগুচকের প্রজারা ধরেছে, তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে একট লক্‌গেট করে দিতে, প্রতি বছর বানে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। করে দিতেই হবে। পাখির পিছনে খুব বেশি টাকা খরচ করব কোথা থেকে? এখানে যা ফেঁদেছি, তাতেই লাখ খানেক বেরিয়ে যাবে। এইটেই অপব্যয় মনে হচ্ছে।"

বৈজ্ঞানিকের মুখে অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল একটা। তারপর সে ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

"এই বইটাও আপনি পড়বেন আনন্দবাবু,—Hunters and the Hunted. বিশেষত পাখির অধ্যায়টা। আপনার কল্পনারও অনেক খোরাক আছে ওতে।"

"বেশ, রেখে যান।"

।। আঠারো ।।

চরের দৃশ্য জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। রৌদ্রালোকে দিবা দ্বিপ্রহরে যা ছিল অসহ্য, জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাই হয়ে উঠেছে মনোরম। এও অসহ্য মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীর। একটা বালুস্তূপের উপর বসে বসে তিনি ভাবছিলেন, অনুভূতির এ বিকার কবে অবলুপ্ত হবে? চক্রবাল-রেখালগ্ন বৃক্ষশ্রেণীর রূপ বদলে গেছে, সবুজের লেশমাত্র নেই, সব কালো। নদীতীরের হেলে-পড়া গাছটাকে মনে হচ্ছে, একটা বিরাট সরীসৃপ যেন মাথা তুলেছে নদী থেকে, বীভৎস নয়, অদ্ভুত। অদ্ভুত বলেই কিন্তু খারাপ লাগছে সন্ন্যাসীর। অন্য কোনও কারণে নয়, এই অনুভূতির মধ্যে নিজের অপূর্ণতার প্রমাণ আছে বলে। যা অপ্রত্যাশিত, তাই অদ্ভুত। এ ব্যাপারটাকে অপ্রত্যাশিত কেন মনে হচ্ছে তাঁর? নিত্যপরিবর্তনশীল বহির্লীলার অন্তরালে যিনি শাশ্বত অক্ষর, তিনি তো অপ্রত্যাশিত নন, তাঁকে চিনতে বার বার ভুল হচ্ছে কেন? চোখ বুজে বসে রইলেন সন্ন্যাসী। মনে মনে বলতে লাগলেন, হে নিগূঢ়, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষলোকে অসংখ্য তোমার রূপ—কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর; অসংখ্য তোমার ভাষা—কখনও সরব, কখনও নীরব; অসংখ্য তোমার নির্দেশ—কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট; অসংখ্য তোমার আশ্বাস—কখনও সহজ, কখনও দুরূহ। তুমিই প্রলোভন, তুমিই সংযম। ভোগেও তোমার আনন্দ, ত্যাগেও তোমার আনন্দ। রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়, সবুজে কালোতে, পাপে পুণ্যে তুমিই ওতপ্রোত। কল্পনায় যা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তা প্রতিভাত হচ্ছে না কেন? চোখ বুজে বসে রইলেন অনেকক্ষণ, দৃষ্টি প্রেরণ করলেন অন্তরের অন্তস্থলে, কল্পনাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে দেখতে চেষ্টা করলেন।

....টিহি—টিট্রিহি—টিট্রিহি। টিট্রিভ পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। দূর থেকে শোনা যেতে লাগল কেবল—টিটি, টিটি, টিটি। সন্ন্যাসীর ধ্যানলোকেও পৌঁছল সে ডাক ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে, এবং রূপান্তরিত হল বলে ধ্যানের একাগ্রতাও নষ্ট হল। তিনি শুনতে লাগলেন—চিঠি, চিঠি, চিঠি। ভিন্ন খাতে বইল চিন্তাধারা, মানসপটে মায়ের মুখখানা ফুটে উঠল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁর দিকে ফিরে বলছেন—বাক্সর তলায় চিঠিখানা আছে, পড়ে দেখিস বাবা। ওতেই লেখা আছে সব কথা। বাক্সর তলা থেকে চিঠিখানা বার করে নিয়েছেন তিনি। পড়েওছেন। কিন্তু....। বাবার মুখখানা মনে পড়ল। চোখ দুটো নির্নিমেষে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পাঞ্জাবে চাকরি করতে করতে হঠাৎ তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেকালের স্বদেশী-আন্দোলনে। দীক্ষিত হয়েছিলেন অগ্নি-মন্ত্রে। সন্ন্যাসী যদিও রিভল্‌ভার হাতে তাঁকে দেখেননি কোনদিন, তবু যখনই তাঁকে মনে পড়ে তখনই একটা বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে তিনি যেন একা হেঁটে চলেছেন বিরাট এক প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। বলিষ্ঠ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধরে আছেন পিস্তল। নির্জন প্রান্তর—বন্ধুর, উপলাকীর্ণ। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চলেছেন তিনি।......মনে হয়, আজও চলেছেন যেন। আর তিনি ফিরে আসেননি। অর্থাভাবে দেশের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলেন মা। গঙ্গার ধারের ওই পড়ো ঘরটাই নাকি বিক্রি করেননি কেবল। অমরেশবাবু কি জানেন এ কথা?—সহসা মনে হল সন্ন্যাসীর। মা যাঁকে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন, তিনি আবার সেটা বিক্রি করেছিলেন আর একজনকে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অমরেশবাবুর শ্বশুর কিনেছিলেন। অমরেশবাবুর

শ্বশুরও বেঁচে নেই। সুতরাং গঙ্গার ধারের ওই পড়ো বাড়িটার প্রকৃত মালিক কে—এ কথা অমরেশবাবু হয়তো জানেনই না। জানবার প্রবৃত্তিও নেই সন্ন্যাসীর। বাবার মুখটা আবার জেগে উঠল মনে! মনে হল, অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ যেন তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিতার পথ চেয়ে কতদিন যে কেটেছে তাঁদের! শোকে দুঃখে মা মারা গেলেন অবশেষে। তারপর এলেন সাধু অলখবাবা। তিনি বলেছিলেন, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধেই তো সমস্ত মানবজাতির অভিযান। কিন্তু সর্বাগ্রে ঠিক করা চাই, কি অসত্য, কোন্‌টা অন্যায়? যা সৎ নয়, তাই অসৎ, তাই অসত্য। যা অসত্য, তাই অন্যায়, তাই অযৌক্তিক। যা সৎ তাই চিৎ, তাই আনন্দ, তাই আমি। এই আমিকেই আবিষ্কার করতে হবে আগে, এই আবিষ্কারের পরিপন্থী যা কিছু তার বিরুদ্ধেই করতে হবে সংগ্রাম। এই আমির সন্ধানেই তো কাটল অনেক দিন। কত তীর্থে, কত মন্দিরে, কত আশ্রমে, কত আখড়ায়!

টিট্রিহি—টিট্রিহি—টিট্রিহি।

টিট্রিভের ডাক শোনা গেল আবার। আবার চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। ওই চিঠিখানাই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। এখনও কিন্তু করা হয়নি কিছু। মাঝে মাঝে মনে হয়, কি হবে হাঙ্গামা করে? যেমন আছে থাক্ না। তাঁর নিজের তো কোনও প্রয়োজন নেই। চিন্তাটা কিন্তু নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না কিছুতে। অদৃশ্য কাঁটার মতো কেবলই যেন খচখচ করছে। মনে হচ্ছে, তাঁর নিজের প্রয়োজন নেই সত্য, শুধু যে প্রয়োজন নেই তা নয়, ও একট জঞ্জাল, বাধা, কিন্তু তাঁর এই মনোভাব তো নির্বিকার মনোভাব নয়। কোনো কিছুকেই বাধা বলে মনে হবে কেন? তা ছাড়া এটাও ঠিক যে, তাঁর হয়তো কাজে লাগবেনা কিন্তু অপরের কাজে লাগতে পারে। এটাও ঠিক যে, অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে অকাজেও লাগতে পারে। হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তিনি। মনে হল, একটা জালে যেন আটকে গেছেন। না, এসব চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আবার চোখ বুজলেন। অন্তরে অন্তস্থলে প্রেরণ করলেন দৃষ্টি। দূরে দূরে বহুদূরে গোপন সত্তার গভীরে চলে গেল মন, অবলুপ্ত হয়ে গেল বাহ্য জগৎ, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি।

সন্ন্যাসী যখন চোখ খুললেন, চন্দ্র তখন পশ্চিম-গগনে ঢলে পড়েছে, পূর্বাকাশে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। প্রভাতের বেশি বিলম্ব নেই আর। উঠে পড়লেন তিনি। উঠতেই টিট্রিহি-টিট্রিহি শব্দ করে কয়েকটা টিট্রিভ কলরব করে উড়ল। কাছেই তারা একটা বালুস্তূপের আড়ালে বসে ছিল, সন্ন্যাসী দেখতে পাননি। সন্ন্যাসী বালির চড়া ভেঙে নদীর ধারে এলেন, তারপর বাঁশের সঙ্কীর্ণ সাঁকের সাহায্যে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হননি। অন্তরের যে জ্যোর্তিময় লোকে এতক্ষণ তিনি বিহার করছিলেন, তারই প্রভায় তখনও তাঁর মন আবিষ্ট হয়ে ছিল। তাই তিনি লক্ষ্য করলেন না যে, তাঁর ঘরের কপাটটা খোলা রয়েছে। কপাট অবশ্য খুবই জীর্ণ, তবু তাতে শিকল ছিল, যাবার সময় রোজই তিনি শিকলটা তুলে দিয়ে যান, আজও গিয়েছিলেন। কপাট খোলা কেন? এ প্রশ্ন তাঁর মনে যদিও জাগল না, কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি বিস্মিত হলেন। ঘরের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন বসে রয়েছে!

"কে?"

"আমি, ডানা।"

"তুমি এ সময়ে এখানে কেন?"—রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

"ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

ভয়টা যে কিসের, তা ডানা সোজাসুজি বলতে পারলে না। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, "বলছি, বসুন।"

আসনটা পেতে সন্ন্যাসী বসলেন। ভগ্ন বাতায়নপথে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল, সেই জ্যোৎস্নালোকে ডানার আনত মুখখানি দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হল, এই ধরনের একখানি মুখ কোন এক মন্দিরের গাত্রে তিনি যেন চিত্রিত দেখেছিলেন। ভীত সঙ্কুচিত, কিন্তু একাগ্র। দেবতার কাছে বক্তব্যটা নিবেদন করতে বাধছে কিন্তু তাই বলে নিবেদন করবার আগ্রহটা কম নয়—এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

কি বলবে, তা ডানাও সত্যি ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের আচরণে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সে। যে ঔদাসীন্যের বর্মে নিজেকে আবৃত করে রূপচাঁদের প্রণয়-অভিযানকে ব্যাহত করবে সে ভেবেছিল, কার্যকালে তা কোনো কাজেই লাগল না। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসতে হল। পালিয়ে আসার লজ্জাটাই সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল তাকে। নিজের দুর্বলতার এত বড় অকাট্য প্রমাণ তার জীবনে আর কখনও এমন নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি।

সন্ন্যাসী নীরবে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। নীরবতাটাই যেন প্রশ্ন করেছিল, চুপ করে আছ কেন, কি বলবে, বল?

বলতেই হল শেষকালে।

"রাতদুপুরে রূপচাঁদবাবু হঠাৎ এসেছিলেন আমার ঘরে।"

"কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে ডানা বললে, "কি জানি!"

"জান নিশ্চয়, তা না হলে পালিয়ে এলে কেন?"

ডানা নতমস্তকে বসে রইল চুপ করে।

সন্ন্যাসী বললেন, "অন্যায় করেছ। নিজেকে বুঝতে পারনি। তুমি অভয়, তুমি ভয় পাবে কেন?"

কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ডানা বুঝতে পারলে না। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে, "ভয় করল যে।"

"তার মানেই—নিজেকে বুঝতে পারনি। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি।"

ঘরের কোণে ছোট একটা ডিবে ছিল, সেইটে জ্বেলে ফেললেন তিনি। জ্বেলেই দেখতে পেলেন, ডানার পাশে কাগজের ঠোঙায় লাল আপেল রয়েছে কয়েকটা।

"ওগুলো এনেছ কেন?"

"আমার জন্যে রূপচাঁদবাবু এনেছিলেন এগুলো। আমি আপনাকে দেবার ছুতো করে পালিয়ে এসেছি তাঁর কাছ থেকে।"

সন্ন্যাসী আবার গিয়ে বসলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই কিন্তু।"

"পাপকেও ভয় করব না?"

"ভয় করবে কেন? জয় করবে। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতিস্বীকার করা হল।"

"আপনি নিজেও কি পলাতক নন? সংসার থেকে আপনিও তো পালিয়ে এসেছেন।"

কথাগুলো বলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ডানা। সন্ন্যাসীকে কটু কথা বলতে সে আসেনি। আহত আত্মসম্মানের জ্বালায় কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে কিন্তু আরও অপ্রতিভ হল সে।

"আমি যে খুব একটা মহৎ ব্যক্তি—একথা তো তোমাকে বলিনি কোনোদিন। আমিও তোমারই মতো দুর্বল। ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিও পলাতক। কিন্তু অনেকদিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিনা তাই কথাটা ভাল করে বুঝেছি যে, পালিয়ে কোনো লাভ হয় না। কারণ, ভয়ের হেতু বাইরে কোথাও নেই, আছে আমাদেরই ভিতরে, আমাদেরই বোঝবার ভুলে। পাপ বা পুণ্য, ভীষণ বা সুন্দর, ভাল বা মন্দ আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি। সংস্কারবশে আমরা নিজেরাই নানা রঙে রঙিন করে দেখি সব জিনিসকে। আলকাতরা মাখিয়ে কাউকে করি কালো, আবার কুঙ্কুম মাখিয়ে কাউকে করি লাল। আবার নিজের সৃষ্টি কালোকে দেখে নিজেরাই শিউরে উঠি, লালকে দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হই। আসলে কেউ লালও নয়, কেউ কালোও নয়।"

ডানা হেসে বললে, "আসলে কে যে কি, তা জানি না। কিন্তু রূপচাঁদবাবুর উদ্দেশ্যটা এত স্পষ্ট মনে হল যে—"

সন্ন্যাসী হেসে প্রশ্ন করলেন, "মনে হল, তার কারণ, রূপচাঁদের উদ্দেশ্য তোমার মনকে প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করেনি, আতঙ্কিতও করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা রূপচাঁদবাবুর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে! কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশি হতে। ভয় না পেয়ে খুশি হলেও খুব যে বেশি একটা অপরাধ হত, তা মনে করি না। ভয়, খুশি—দুই-ই মনের বিকার। ভয় পেয়ে তুমি বরং রূপচাঁদবাবুকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিয়েছ।"

কথাগুলো শুনে ডানা বিস্মিত হল।

"আমার তা হলে রূপচাঁদবাবুর কাছে থাকাই উচিত ছিল বলছেন?"

"যা বললাম তত্ত্ব হিসাবে সেটা সত্যি যদি উপলব্ধি করতে, তা হলে নিজেই বুঝতে পারতে সেটা, কারও উপদেশের দরকার হত না। এই আপেলগুলোতে দাঁত বসিয়ে যখন রসাস্বাদন কর কিংবা কোনও তৃষিতকে জলদান করে যখন তৃপ্তিলাভ কর, তখন যেমন দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় না, এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই সহজভাবে নিতে পারতে। নির্বিকার নও বলেই গোল বেধেছে। সংসারের তুলো দিয়ে কান বন্ধ করেছ বলেই মহাসঙ্গীতের ঐকতান শুনতে পাচ্ছ না। অসম্পূর্ণ শোনার ফলে বেসুরো লাগছে, কোনোটা খারাপ কোনোটা ভাল মনে হচ্ছে।"

"কাম ক্রোধ কি খারাপ নয় তা হলে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আগেই তো বললাম, নির্বিকার চিত্তে খারাপ ভাল কিছু নেই। আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। সকলেই আনন্দ চায়, নানা ভাবে সবাই সেটা পেতে চাইছি। সাধারণ লোকের বাইরের জীবনটাকে যদি বাঁশী বলি, তা হলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিকে সেই বাঁশীর ছিদ্র বলা যেতে পারে। অধিকাংশ লোকই আনন্দ পাবার আশাতেই নানা সুর আলাপ করছে

ওতে। সাধারণ বাঁশীতে গোটা কয়েক মাত্র ছিদ্র থাকে, মহাজীবনের বাঁশীতে কিন্তু অসংখ্য রাগরাগিণীর আলাপ চলে তাতে। চলছেও। ওর কোনোটাকে ভাল, কোনোটাকে ভাল, কোনোটাকে মন্দ বলার অর্থ হয় না। নিজেদের রুচিভেদে সাধন ভেবে আমরা ভাল খারাপ ভাগ করে নিয়েছি কেবল। আসলে ভাল খারাপ কিছু নেই।"

"শাস্ত্রে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে রিপু বলেছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে একটা।"

ডানার বিস্ময় কেটে গিয়েছিল বলেই হোক কিংবা বিস্ময়ের সংঘাতে হোক, তর্ক করবার প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সহসা।

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রও সংস্কার-মুগ্ধ মানুষেরই তৈরি। সংস্কারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রও বদলেছে যুগে যুগে। তা ছাড়া ওদের রিপু বলবার কারণ একটা আছে বইকি। তুমি গান-বাজনা করেছ কখনও?"

"কিছু কিছু করেছি। সেতার বাজিয়েছিলাম কিছুদিন।"

গানের উপমা দিয়েই বলি তা হলে। ওড়ব জাতীয় বৃন্দাবনী সারঙ্গে গান্ধার এবং ধৈবত লাগে না। গান্ধার এবং ধৈবত বৃন্দাবনী সারঙ্গের পক্ষে রিপু। তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনের পথে কাম-ক্রোধেরাও রিপু।"

ডানা হেসে বললে, "আধ্যাত্মিক উন্নতিই তো মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

"তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার পথও অনেক এবং অনেক সময় পরস্পর বিরোধীও। শুনেছি, সহজিয়া মতে পঞ্চকাম উপভোগই সাধনার পথ। কাম উপভোগ করে করেই তাঁরা নিষ্কাম হতে চান।"

"কি রকম?"

"তাঁরা বলেন যে, আসক্তি আমাদের বদ্ধ করে, তা-ই আমাদের আবার মুক্তিও দেয়। তাঁদের কথা, 'রাগেণ বধ্যতে লোকে রাগেণৈব বিমুচ্যতে। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তি স্বাদ।' বন্ধন মানেই—বাসনার বন্ধন। সুতরাং বাসনা-কামনা খুব অবহেলার জিনিস নয়। সবই নির্ভর করছে তোমার মনের উপর, তোমার চাওয়ার আন্তরিকতার উপর।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। গভীর নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। ডানা নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল। ধীরে ধীরে তারপর তার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা এতই অদ্ভুত যে, কথায় সেটা প্রকাশ করা উচিত কি না তা ঠিক করতেই আরও খানিকক্ষণ গেল। প্রকাশ করাই ঠিক করলে সে শেষ পর্যন্ত। তার কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি এই সন্ন্যাসীটিকে যাচিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে মৃদু হেসে বললে, "মনে করুন, আন্তরিকভাবে আপনাকেই যদি চাই, পাব?"

সন্ন্যাসী শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এত ছোট জিনিস চাইবে তুমি?"

"আমার কাছে তো আপনি ছোট নন।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন।

"বলুন, পাব?"

"তা আমি কি করে বলব? তোমার আন্তরিকতার উপর নির্ভর করবে তা। পেলে কি না তাও নিজেই বুঝতে পারবে।"

"আন্তরিকতার পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হই, তা হলে সম্পূর্ণরূপে পাব তো?"

"পাবে বলেই তো মনে হয়।"

"আপনার দেহটাকে যদি ভোগের সামগ্রী করে তুলি, তা হলেও আপনি আপত্তি করবেন না?"

"সম্পূর্ণরূপে আমাকে যদি পাও, তা হলে আমার এই ভঙ্গুর দেহটা তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। আর এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে যদি তুমি উন্মত্ত হতে চাও ক্ষণিকের আনন্দে, তা হলেও আমি আপত্তি করব না, এখনই আমার ওই গায়ের কাপড়টা নিয়ে গায়ে জড়াতে চাও তাতেও জেন আপত্তি করব না।"

সন্ন্যাসী হাসতেই ডানাও হেসে উঠল। বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। মেঘটা কেটে গেল।

"তর্ক করে আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই দেখছি। বাজে কথা থাক্ আপনার মতটা কি, তাই বলুন?"

"সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে তো?"

"নিশ্চয়।"

"আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। আমি সন্ধান করে বেড়াচ্ছি শুধু।"

"কি সন্ধান করছেন?"

"উপলব্ধিকে। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি—আমি কে, এই বাইরের জগৎটা স্বপ্ন কি না, এই স্বপ্ন-জগতের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বপ্নেরই মতো অলীক কি না?"

"সত্যিই যদি সে উপলব্ধি হয় আপনার, তাতে লাভটা কি হবে?"

"পরমানন্দ। যে সব সুখ দুঃখ প্রতি মুহূর্তে কম্পিত করছে মনকে, হঠাৎ যদি উপলব্ধি করি সেসব অলীক, তা হলেই তো দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাবে, মুক্তি পাব।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। ডানাও চুপ করে রইল। শেষরাত্রির আলো-আঁধারিতে আবার একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য! ডানাই কথা বললে একটু পরে।

"আপনি যে পথের পথিক, সে পথের নিয়ম কি? সে পথে কামিনী কাঞ্চন ত্যাজ্য, না, পুজ্য?"

"বিষবৎ ত্যাজ্য। একাগ্র ধ্যানই হচ্ছে আমার পথ। সংযমের পথ থেকে একচুল বিচলিত হলেই আমার পতন। তাই সংসার থেকে আমি পলাতক। রাজর্ষি জনকের মতো মনের জোর আমার নেই।"

একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর চোখে মুখে। ডানা মুচকি হেসে বললে, "তা হলে কোন্ ভরসায় এখনই বলছিলেন যে, আমি যদি চাই আপনি ধরা দেবেন?"

"তোমার অজ্ঞতার ভরসায়। আন্তরিক ভাবে চাওয়া যে কাকে বলে, তা তোমার জানা নেই বলেই অত সহজে কথাগুলো বলতে পেরেছিলে। কায়মনোবাক্যে চাওয়াটা নিতান্ত সহজ নয়।"

ডানা স্মিতমুখে চুপ করে রইল। তারপর বললে, "আমি এখন কোন্ পথে যাব, তাই বলে দিন।"

"সেটা তোমাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, কেউ তা কাউকে বলে দিতে পারে না। অন্তত আমি পারব না।"

"আধ্যাত্মিক পথের কথা বলছি না, রূপচাঁদবাবুর হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাই, বলুন?"

"তার উপায়ও তোমাকেই বার করতে হবে। একটি কথা শুধু বলতে পারি—পালিয়ে যাওয়া তার উপায় নয়। রূপচাঁদ জাতীয় লোকদের অভাব নেই পৃথিবীতে। এক রূপচাঁদের কবল থেকে পালিয়ে গেলেও আর এক রূপচাঁদের কবলে পড়তে হবে। নিজের চরিত্রকে নিজের মনের বর্মাবৃত করা ছাড়া উপায় নেই, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি।"

"আমার চরিত্রে বা মনে কোনও দুর্বলতা নেই। কিন্তু ধরুন, তিনি যদি জোর করে আমার গায়ে হাত দেন, কিংবা—"

"তাতেও কিছু আসে যায় না, তোমার মন যদি ঠিক থাকে।"

"খুব এসে যায়, আপনি পুরুষমানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। পরপুরুষের অবাঞ্ছিত স্পর্শের চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু নেই আমাদের জীবনে।"

"তা জানি। কিন্তু এও জানি, ওর প্রতিকার তোমারই হাতে।"

"আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকত, তা হলে আমি প্রতিকার করতে পারতাম। এমন একদিন ছিল, যখন বন্দুকধারী দরোয়ান আমাদের গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই আপাতত।"

"তোমার চাকরটা নেই?"

"ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। ওই জীর্ণ ছোঁড়াটা থাকলেও যে কিছু করতে পারত, তা মনে হয় না।"

"টাকা পেলেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে মনে কর?"

"তা তো হবেই। কিন্তু অত টাকাই বা পাই কোথায় বলুন? আমি বলছিলাম, আপনি যে কদিন এখানে আছেন, আমার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে যদি থাকেন—"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "না , তা হয় না। আমি একা থাকতে চাই। কারও সান্নিধ্য আমার সাধনার পক্ষে অনুকূল নয়।"

হঠাৎ এক যোগে কলরব করে উঠল পক্ষীকুল। সন্ন্যাসী দ্বারের দিকে ফিরে দেখলেন, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

"সকাল হয়ে গেল নাকি?"—ডানা সবিস্ময়ে বললে।

"হ্যাঁ, এইবার যাও তুমি।"

"আপনিও একটু চলুন আমার সঙ্গে।"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "বেশ, চল।"

বাসায় পৌঁছে ডানা ভিতরে ঢুকে গেল, সন্ন্যাসী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানা ভিতরে গিয়ে দেখলে, কেউ নেই। বেরিয়ে এসে বললে, "চলে গেছেন।"

"আমিও যাই তা হলে।"

সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

ডানা আবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই রূপচাঁদের ছোট চিঠিটা দেখতে পেলে এবার। ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

ভীতি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভয় পেলে দেখে কিন্তু খুশি হয়েছি। নির্ভয় হওয়ার আগে ভয়ই তো থাকে। চললাম— আর. সি.

ভ্রূকুঞ্চিত করেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ কাগজের টুকরোটার দিকে। তারপর কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সেটা।

।। উনিশ ।।

রূপচাঁদও ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন মনে মনে। নিজের ব্যর্থতার লজ্জায় তিনি মরে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু সে লজ্জাটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না নিজের কাছেও। নিজের অক্ষমতা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, ও কিছু নয়, ও রকম হয়েই থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন রকম কৌশল করতে হবে আর একটা। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন তিনি, যার মূল লক্ষ্য ঐহিক সুখ, সেই সুখলাভের বিবিধ প্রচেষ্টা যে শিক্ষাকে বহুমুখী করেছে, তারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ভাবছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অহঙ্কৃত ধারণা থাকাতে অন্য রকম কিছু ভাবতে পারছিলেন না। যে স্থূল বাস্তব-বিজ্ঞান-মোহ মদদৃপ্ত করেছিল। বিস্মার্ক-হিটলারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নীটশের দর্শন, তা রূপচাঁদকেও যুক্তি যোগাচ্ছিল। ডারবিনের ভক্ত রূপচাঁদও ভাবছিলেন, ছলে বলে কৌশলে জয়লাভ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এবং সে ছল বল কৌশল যথাসময় যথাস্থানে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি। বার বার সেই পুরাতন কথাটাই আবৃত্তি করছিলেন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার চেষ্টা করাই জীবের একমাত্র ধর্ম। সঙ্কোচ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতির স্থান মানবজীবনে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, ও-গুলো মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। ও-গুলোও অস্ত্র। বহুরূপী গিরগিটি যেমন প্রয়োজন অনুসারে গায়ের রঙ বদলাতে পারে, অনন্তরূপী মানুষও তেমনই প্রয়োজন অনুসারে মহৎ, লাজুক, পরোপকারী, অহিংস সাজতে পারে। কখনও সে জ্ঞাতসারে সাজে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক থাকা চাই। জয়লাভ করাই লক্ষ্য। আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়ায় বা কবিত্বের কুয়াশায় লক্ষ্যটাকেই হারিয়ে ফেলে যারা, তারা ওই সন্ন্যাসীর মতো কৃচ্ছ্রসাধন বা আনন্দমোহনের মতো কবিতা লিখেই মরে খালি। ওই রোগা সন্ন্যাসী বা পানসে আনন্দমোহনকে ভয় নেই রূপচাঁদের। ওই সন্ন্যাসী যদি বিবেকানন্দের মতো পুরুষসিংহ হতেন কিংবা আনন্দমোহন যদি উদ্দাম বায়রন হতেন, তা হলে ভয়ের কারণ ছিল। ছন্দের আর ভাবের ফুলঝুরি কাটলে নারীর মন পাওয়া যায় না। রূপচাঁদের ধারণা, ওমরখৈয়াম আর হাফেজ সারাজীবন কেবল প্যানপ্যান করেই মরেছে, সাকীকে পায়নি। নারী আত্মসমর্পণ করে পৌরুষের পদপ্রান্তে—তা তিনি শিবই হোন, বিবেকানন্দই হোন, বায়রনই হোন বা চেঙ্গিস খাঁই হোন। আমি কি? হঠাৎ মনে হল রূপচাঁদের। এই জৈবিক জীবনদর্শনের নিকট তাঁর মূল্য কতটুকু? পৌরুষের কোন্ পরিচয় দিয়ে ডানাকে তিনি মুগ্ধ করবেন? ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উত্তরটা ঠিক যোগাল না। মনে হতে লাগল ডানার মনের প্রবণতা যে কোন দিকে, তা এখনও আবিষ্কার করতে

পারেননি তিনি ঠিক। অর্থের প্রতি সব নারীরই (নরেরও) স্বাভাবিক লোভ আছে একটা, ডানার কি নেই? হঠাৎ মনে হল, টাকার কুমীর অমরেশটা চলে যাওয়াতে সুবিধাই হয়েছে। হয়েছে কি? ডানা ওর সঙ্গে গেল না কেন? টাকার প্রতি লোভ থাকলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। টাকার প্রতি লোভ নেই হয়তো। হয়তো ও ব্যতিক্রম। রূপ চায় হয়তো, হয়তো যশ, কিংবা প্রতিপত্তি, কিংবা—না, ঠিক বোঝা যায়নি এখনও, ঘনিষ্ঠতর পরিচয় না হলে বোঝাও যাবে না।.....ডানার সুন্দর মুখখানা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মনে। যে রূপের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে টিশিয়ান ভেনাসের ছবি এঁকেছিলেন, তাজমহলের কল্পনা করেছিলেন শাহজাহান, কবিতা লিখেছিলেন কালিদাস, যে অজানার আকর্ষণে সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন কলম্বাস, হিমালয় অভিযান করেছিলেন ইয়ংহাজব্যান্ড (Young-husband), যে রূপ অজস্র ভঙ্গীতে সহস্র লীলায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হচ্ছে প্রকৃতির অরণ্যে-পর্বতে, সমুদ্রে-আকাশে, নদীতে-নির্ঝরে, মরুতে-মরীচিকায়, জীবনের বিচিত্র বিকাশে, যে রূপ ছন্দিত স্পন্দিত আনন্দিত, সেই রূপের স্বপ্নে রূপচাঁদও তন্ময় হয়ে গেলেন চার্বাকীয় নিষ্ঠাসহকারে। তাঁর ক্ষুধিত মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলোকেই সুধার সন্ধান করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা তিনি শুনছেন বটে, কিন্তু আস্থা নেই তাঁর অরূপ কোনও কিছুর উপরই, এমন কি অরূপরতনের উপরেও না। যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বোঝা যায় তিনি জানেন, তাই এখনও ধরা হয়নি, ছোঁয়া হয়নি, বোঝা যায়নি। সেইটেকেই আয়ত্তের মধ্যে আনার তপস্যা করতে হবে আগে। তপস্যা মানে যোগ্যতা অর্জন। হবে কি তা? হতেই হবে। যখন হবে....। বাসনার আকাশে রূপচাঁদের মন পাখা মেলে উড়তে লাগল। পাশে বকুলবালা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। ছোট ছেলের মতো নাকও ডাকছিল তাঁর। রূপচাঁদ পাশ ফিরতেই তাঁর ঘুমটা ঈষৎ ভেঙে গেল যদিও, কিন্তু রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত পত্নীর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত একটা আরাম অনুভব করলেন রূপচাঁদ। তবু কিন্তু ডানার স্বপ্নেই আবিষ্ট হয়ে রইল তাঁর মন। বস্তুর ক্ষুধাও অল্পে তুষ্ট হয় না, বস্তুজগতেও সে ভূমাকে ধরতে চায় আকাঙ্ক্ষার জাল পেতে।

।। কুড়ি ।।

অমরেশবাবু সস্ত্রীক চলে গেছেন। কবি একা নিজের ঘরটিতে বসে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটু আগেই তিনি একটা পাখির বই পড়ে শেষ করেছেন। অমরেশবাবুর সাহচর্যে এসে এবং তাঁর দেওয়া বই পড়ে পড়ে পক্ষীজগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা অকৃত্রিম কৌতূহল জাগছিল ক্রমশ। ডানাকে দেখে যে কারণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই পাখিদের দেখেও অনেকটা সেই কারণে তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন। ভাষা ভঙ্গী গতির একটা নবতর সৌন্দর্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর কবিসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। রিপ্লে (Repley) এবং সিট্‌ওয়েল (Sitwell) সাহেবের বই দুটো পড়ে কাল সারা রাত তিনি বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বপ্ন দেখেছেন। ওদের নামকরণ করেছেন পরম পাখি। ওদের বিচিত্র রূপ, ওদের অদ্ভুত গান, ওদের নৃত্যভঙ্গী ফুল-ফল-পাথর দিয়ে সাজাবার প্রবৃত্তি ওদের যেন ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ওরা যেন ঠিক পাখি নয়, পক্ষীরূপী কোনও শিল্পী-সম্প্রদায়। মনুষ্যরূপী পশু থাকা যদি সম্ভব হতে পারে, এই-বা

অসম্ভব হবে কেন? বইটা মুড়ে রেখে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি বসে বসে। নিউগিনিতে ঘন ঝোপে কষ্ট করে তিনিও যেন পরম পক্ষী-দম্পতীর নাচ দেখেছিলেন রিপ্লে সাহেবের সঙ্গে বসে বসে। পুরুষ পাখিটির সমস্ত গা কালো মখমলে মোড়া, মাথার উপর ছোট ত্রিভুজাকৃতি রৌপ্য-ধবল তিলক একটি। সেই তিলকের পিছন থেকে সরু সরু লম্বা তারের মতো কয়েকটা চুল চলে গেছে পিঠের দিকে। প্রত্যেকটি চুলের আগায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে তৈরি থুপনি ঝুলছে। বুকের উপর ছোট্ট একটি ঢাল বাঁধা আছে যেন। সূর্যালোকে তার থেকে কখনও সবুজ, কখনও তাম্রাভ রঙ ছিটকে পড়ছে। দুলে দুলে নাচছে,—ঠিক যেন মানুষ। তন্ময় হয়ে বসে রইলেন কবি। অনেক কাজ আছে তাঁর, তবু বসে রইলেন। অমরেশবাবুর পাখিগুলোর তদারক করতে হবে, ডানার কাছে যেতে হবে একবার, মন্দাকিনীর চিঠির জবাব দিতে হবে। বিয়েবাড়িতে কি আয়োজন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি রকম যে নাকাল হচ্ছে, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন মন্দাকিনী। আনন্দনাড়ুর জন্য নারকেলই পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে অগ্নিমূল্য দিয়ে নাকি যোগাড় হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সব নতুন কাপড় এসেছে তার পাড়গুলো মোটেই ভালো নয়, খোকনের জামার ছিট মোটেই পছন্দ হয়নি অথচ দাম নিয়েছে এক গাদা, কন্যাপক্ষ নমস্কারী নিয়ে নানা বায়নাক্কা তুলেছে নাকি— এই রকম বহু খবর দিয়েছে মন্দাকিনী। আনন্দবাবু এবং সুন্দরীর সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সে কথাও বার বার জানিয়েছেন। উভয়ের সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণও চেয়েছেন অবিলম্বে। সুন্দরীকে রোজ চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার গোবরের যে পাতলা ভাবটা ছিল সেটা গেছে কি না, মৈথিল ঠাকুরটা রান্নাবান্না কেমন করছে, আনন্দবাবুর সর্দিটর্দি আর হয়েছে কি না—এমনই নানা প্রশ্ন করেছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীকে একটা উত্তর দিতে হবে, আজই দেওয়া উচিত, মনে হচ্ছিল কবির। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতেই ভাল লাগছিল। দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, গাছে ফুলও ধরেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় খানিকটা সবুজ খানিকটা হলদে, সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের উপর, এবং সমস্তটার উপর ফুটে উঠেছে পরম পাখির স্বপ্নটা। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বুলবুলির সাড়া পাওয়া গেল। বাগানের ঝোপের মধ্যে টুর টুর টুর টুর কুড়ুক কুড়ু শব্দ পেয়েই কবি বুঝলেন, বুলবুলি এসেছে। কদিন থেকে আসছে ওরা ওই ঝোপটায়। ওদের নিয়ে কবিতা লেখবারও চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা কিন্তু শেষ হয়নি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খাতাটা তুলে নিলেন।

ওরে, তোরা চুপ কর্
খোকা বুঝি হেসেছে
বাতাসেতে ফুট তুলে
কার সুর ভেসেছে।
ও মা, না তো, আতাবনে
বুলবুলি এসেছে
টুরু টুরু টুরকি টুরু টুরু টুরকি
আতাবন রাতারাতি হল মধুপুর কি!

পছন্দ হয়নি। কেটে দিয়ে আর একটা শুরু করেছিলেন ভিন্ন ছন্দে।

ওই শোন্ ওই শোন্
টুরু টুরু টর
বুলবুলি এসেছে রে
ওরে চুপ কর্
ফোটে যেন খই
কই কই কই
ওই যে বসল উড়ে
বেড়াটার পর।
সারা মন ওঠে নেচে
শুনে গান তোর
ভুলে যাই দুষ্টুরে
তুই ধান-চোর
ওরে চঞ্চল
বল্ বল্ বল্
কোন্ ঝোপটির মাঝে
বেঁধেছিস ঘর।

এটাও পছন্দ হয়নি, এটাও কেটে দিয়েছেন। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে আবার তিনি চাইলেন বাইরের দিকে। ওই যে বেরিয়েছে বুলবুলি দুটো। আমের ডালে উড়ে বসল। বাঃ চমৎকার জায়গাটি বেছে নিয়েছে তো! উপরে-নীচে আশে-পাশে গোছা গোছা আমের মুকুল দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণিকার পুষ্পের স্বর্ণকান্তি, রোদও এসে পড়ছে এক ফালি, চমৎকার লাগছে দেখতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল বুলবুলিরা। বসল গিয়ে ভাঙা কার্নিসটার ধারে। শ্যাওলাপড়া বিশ্রী জায়গাটা। কিন্তু ওখানেও ওদের উৎসাহ উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। একজন আবার ফুড়ুৎ করে আর একটু উপরে উঠে বসল ল্যাজটি ঘুরিয়ে! ল্যাজের তলায় টুকটুকে লাল অংশটুকু দেখা গেল ক্ষণিকের জন্য, তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসল আবার। উড়ে গেল। উড়তে উড়তেও যেন লাফাচ্ছে। হঠাৎ যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল কবির! ওদের তুলনায় নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। তাঁর যে এই জানালার ধারটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, মনোমত পরিবেশকে আঁকড়ে থাকবার এই যে লুব্ধ প্রবৃত্তি, এটা—এই স্থাণুতাটা যেন মৃত্যুরই নামান্তর মনে হল তার। প্রাণের ধর্ম গতি। সে চলবে, থামবে না। মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়লেন তিনি। ডানার কাছে যেতে হবে। ডানার কাছ থেকে ফিরে এসেই চিঠি লিখতে হবে মন্দাকিনীকে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড়টা ছেড়েই হঠাৎ কিন্তু আবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর মনে হল, বুলবুলির কাছে ঋণ-স্বীকার না করলে অধর্ম হবে সেটা। চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

আমার মনের ভুলগুলি
শুধরে দিলে বুলবুলি
আটকে থাকা নয় কিছু

চললে পরেই হয় কিছু
হয় উঁচু বা নয় নীচু
কোথাও গিয়ে ঠেক্ না রে—
ছাড়তে হবে ঘুলঘুলি
শিখিয়ে দিলে বুলবুলি
পায়ের দড়ি পাকাস কে
পথের দিকে তাকাস কে
চাইতে হবে আকাশকে
ডানা মেলেই দেখ্না রে।

কবিতাটা লিখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আবার। কবিতাটা কোটের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আলোয়ানটা টেনে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। পথে যেতে যেতে আর একটা অদ্ভুত কথাও মনে হল। মনে হল, যে সুষমা ডানার অঙ্গে নেমেছে, তাও হয়তো পাখির মতোই একটা কিছু, একটু পরেই উড়ে যাবে। উড়ে গিয়ে বসবে হয়তো কোনো কার্নিসের উপর, তারপর উড়ে যাবে হয়তো আকাশে, নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় লোকে গিয়ে বসবে হয়তো ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার....। কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়তে লাগল তাঁর মন।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হল মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে। মল্লিকের চেহারাটা কেমন যেন মনে হল। মুখ শুষ্ক, চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্বাভাবিক নয়। কবিকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, "ওদের কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন আপনি?"

"না, পাইনি তো! অমরবাবু গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন বলেছিলেন দোয়েল পাখির বিষয়ে। আপনি পেয়েছেন নাকি কিছু?"

"আমি পেয়েছি। কাণ্ড দেখুন!"

মল্লিক মশাই পকেট থেকে একটি রেজেস্ট্রি করা খাম বার করে দিলেন। কবি খাম থেকে চিঠি বার করে দেখলেন, রত্নপ্রভার চিঠি। গোটা গোটা গোল অক্ষরে রত্নপ্রভা লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আনন্দমোহনবাবুকে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া অপিস-ঘরের চাবিটি দিয়া দিবেন। আমরা তাঁহাকেই হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ কবির। আপনার ছয় মাসের বেতন অদ্য মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। টাকাটি পাইলে আনন্দমোহনবাবুকেই একটা রসিদ দিয়া দিবেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রী রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। বেশ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। চিঠিটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা চুলকে বললেন, "আমি তো কিছু জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

যদি ব্যাপারটা কি এবং কেন তাঁকে তাড়ানো হল মল্লিক মশাই সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন, তবু তিনি বললেন, "কি জানি! স্ত্রীবুদ্ধিও বলতে পারেন। যাক্ ভালই হল, আমি বাঁচলুম। এ বয়সে ওসব ঝামেলা পোষায়ও না। আপনি তা হলে কবে সব বুঝে নিচ্ছেন বলুন?"

"আমি! আমি কোনও চিঠি পাইনি। তা ছাড়া আমিই কি পারব ওসব?"

"সে আপনি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। আমাকে খালাস করে দিন। আমি কালই আপনাকে চাবি-টাবি দিয়ে দেব। এখন চলি।"

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মল্লিক মশাই হন হন করে চলে গেলেন এবং দেখতে দেখতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। নিজেকে অকস্মাৎ একটা নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্কার করে কৌতূহলও জাগল একটু মনে। তিনি হবেন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার! অদ্ভুত কাণ্ড!

কবি ডানার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলেন, ডানা তখন স্নান সেরে চুল শুখাচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ করে। কবি দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, আলোকের থেকে অন্ধকারের একটা প্রপাত নামছে যেন! ডানা তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল, সম্বৃত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কবি এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "বাঃ, চমৎকার!"

"কি চমৎকার?"

"তোমার চুলের শোভা। অনেক দিন এমন শোভা দেখিনি।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ঘরে ঢুকে গেল। একখানা চিঠি হাতে করে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"মিসেস সেনগুপ্ত একটা চিঠি লিখেছেন, পড়ে দেখুন।"

কবি দেখলেন, এটিও রেজেস্ট্রি চিঠি। খুলে পড়লেন—

সুচরিতাসু,

বিশেষ প্রয়োজনে এই পত্র লিখিতেছি। স্থির করিয়াছি, মল্লিক মহাশয়কে হরিপুরার ম্যানেজারি-পদ হইতে অব্যাহতি দিব। আনন্দবাবু যদি এই কার্যের ভার লইতে সম্মত হন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। তাঁকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কর্মচারীরাই সমস্ত করিবে। তিনি কেবল একটু নজর রাখিবেন। তাঁহার মতো একজন সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ বিদ্বান লোক যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। তাঁহাকে বেতন হিসাবে কিছু দিবার স্পর্ধা আমাদের নাই, প্রণামীস্বরূপ যদি কিছু গ্রহণ করেন আমরা কৃতার্থ হইব। তুমি ভাই আমার হইয়া একটু অনুরোধ করিও। তিনি যদি বরাবর কাজ করিতে রাজী না-ও হন, তাহা হইলে আমরা যতদিন না ফিরি তত দিন অন্তত যেন কাজটা চালাইয়া দেন, কারণ আমরা মল্লিক মহাশয়কে জবাব দিয়াছি। তিনি অবিলম্বে যেন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি এবং হিসাবপত্র বুঝিয়া লন। আর বেশি কিছু লিখিবার নাই। উনি তোমাকে যে সব কাজ দিয়া আসিয়াছেন, সেগুলি ভালভাবে করিও। টাকার প্রয়োজন হইলে সদর-নায়েব জগৎবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইবে। তাঁহাকে এই মর্মে লিখিত উপদেশ দিয়া আসিয়াছি। টাকা লইয়া তাঁহাকে একটা রসিদ দিয়া দিও। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। আনন্দবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবে। ইতি—

শ্রী রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

চিঠিটা পড়ে কবি বললেন, "এ মহা মুশকিল হল দেখছি।"

"মুশকিল আর কি!"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"একটু-আধটু দেখাশুনা করবেন।"

"কিন্তু তাও কি পারব? আমি কবি, বৈষয়িক তো নই।"

"খুব পারবেন।"

"তুমি বলছ পারব?"

"না পারবার কি আছে এতে?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু যেন ধমকের সুরেই বললে ডানা।

"বেশ। তা হলে তাই হোক। চেষ্টা করা যাক। তোমার চাকরটা আছে কি?"

"না। কেন?"

"একটু চা খেতুম।"

"আমিই করে দিচ্ছি।"

"একটা খাতা দিয়ে যাও। কবিতা লিখি ততক্ষণ একটা।"

একটা খাতা দিয়ে ডানা ভিতরের দিকে চলে গেল। স্টোভে তেল ছিল না। উনুন ধরাতে হল। খানিকক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে ডানা দেখলে, কবি কবিতা লেখা শেষ করছেন।

"নিন।"

"কবিতাটা আগে শোন।"

"পড়ুন। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"যাক। তুমি পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সব ভাল করে।"

ডানা বসতেই কবি শুরু করলেন—

আয়, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেন কালিন্দী-তরঙ্গ দলে তোলে শিহরণ,
আলোকের শুভ্র বৃন্তে ফুটিল কি তমস্কান্তি কৃষ্ণ শতদল,
প্রত্যক্ষ জীবন আর পরোক্ষ মরণ—
কাজল নয়ন মাঝে হাসি অশ্রু করে টলমল,
শিব-সুন্দরের বক্ষে নৃত্যপরা কালীর চরণ,
ময়ূর-মানস-পটে নবোদিত মেঘের বরণ,
অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল
কবিচিত্ত করিল হরণ।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

আসন্ন-নগ্নতা ভীতা অসম্বৃতা কৃষ্ণা যেন কৌরব-অঙ্গনে,
শুক-কলরব-মুগ্ধ মধুমত্তা মাতঙ্গিনী বল্লরী মোদিতা
সহসা চকিতা যেন দৈত্য-আগমনে;
অন্তলোকে ধ্যানলগ্না ওজস্বিনী আঁধার কবিতা
সংযম-প্রস্তর ভেদি' সমুচ্ছ্রিতা শত প্রস্রবণে
খুঁজিল প্রকাশ যেন শব্দহীন বিরাট গর্জনে'

বিমুগ্ধ বিমূঢ়া ক্ষুব্ধা অকুণ্ঠিত মত্তা প্রলোভিতা
কে ছুটেছে আত্ম-বিসর্জনে।
অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

"বুঝতে পারলাম না ভাল"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"বড় খটমট হয়েছে। বিষয়টা কি?"

কবি হেসে উত্তর দিলে, "অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল! তুমি সংস্কৃতের ছাত্রী, তোমার কানেও খটমট লাগল?"

লাল হয়ে উঠল ডানার কানের পাশটা। সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ভান করছিল না-বুঝতে পারার।

"কি যে বাড়াবাড়ি করেন আপনি! লোকে শুনলে কি বলবে!"

এ ধরনের কথা ডানার মুখে কবি ইতিপূর্বে শোনেননি। শুনে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "বাড়াবাড়ি তোমার মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, কিছু হল না; লোকের কথা ভেবে ভয় পাবার দরকার নেই। এখনই আমি যে লোকে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এমন কি তুমিও—মানে, তোমার স্থূল দেহটাও—ছিল না সেখানে।"

ডানা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। কবি চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, "বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমাকে কবিতা আর দেখাব না।"

"না না আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এমনিই বল্‌ছিলাম"—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে ডানা।

"আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে দু-একটা কবিতা লেখেনই, তাতে মনে করবার কি আছে। কিন্তু সখী বলেছেন কেন, বুঝলাম না।"

কবি হেসে ফেললেন।

"তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়ে হতে, তা হলেও তোমার এলোচুল নিয়ে কবিতা লেখবার সময় তোমাকে সখী সম্বোধন করতুম। কাব্যলোকে বয়সের হিসাবটা সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে হয় না। স্থূল বস্তুজগতের কোনো মাপকাঠিরই দাম নেই সেখানে। কাব্য-বৃন্দাবনে সবাই সখী। অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম তার সবটা মনে নেই, প্রথম চার লাইন আছে—

সন্ধ্যার মেঘে যে স্বর্ণ লাগে
স্যাকরা তাহার বোঝে না মর্ম
কুসুমে কুসুমে যে বর্ণ জাগে
রঙ-রেজ তার জানে না ধর্ম।

একটু আগে বুলবুলিকে দেখে যে কারণে কবিতা লিখছিলাম, তোমার কালো চুলের রাশি দেখেও ঠিক সেই কারণেই কবিতা লিখেছি। বুলবুলিও নয়, কালো চুলের রাশিও নয়, ওদের

অবলম্বন করে মনের ভিতর কে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। ওগুলো বৃন্ত, সেই বৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে কি একটা যেন। কবির লক্ষ্য বৃন্তও নয়, ফুলও নয়, সেই কি-যেন-কি-টা।"

এ কথা শুনে ডানার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এতে তার আত্মসম্মান একটু আহত হল যেন। সে যে কবির কবিতার বিষয় হতে পেরেছে, এতে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভিতরে ভিতরে সে খুশি হয়েছিল বইকি। তাকে নয়, তাকে অবলম্বন করে যা কবিমানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাই কবিতার হেতু—এ কথা শুনে একটু মর্মাহতই হয়ে গেল সে। মৃদু হেসে বললে, "তাই নাকি?"

"নিশ্চয়। আর একটা কথাও শুনে রাখ। যে কবিতা লেখে, সে আমার এই দেহটা নয়। সেও যেন কি-একটা-কি মাঝে মাঝে ভর করে এসে আমার উপর।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ডানার গ্রীবাভঙ্গীতে যে অপরূপ শ্রী ফুটেছে তা শুধু রক্তমাংসের সমন্বয় নয়, তা যেন কোনো অজ্ঞাত শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, আরও কোনও শিল্পীর নবতর সৃষ্টিতে মূর্ত হবার আশায় অপেক্ষা করছে।

একুশ

বসন্ত শেষ হচ্ছে।

নিজের বাপের বাড়িতে রত্নপ্রভা স্বামীর ঘরে ঢুকে একটা বই খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু রকম পাখির বহু রকম ঠোঁটের ছবি। চওড়া, সরু, লম্বা, ছোট, উপরের দিকে বাঁকানো, নীচের দিকে বাঁকানো, চামচের মতো, ছাঁকনির মতো....বইটা নতুন এসেছে। বেশ মোটা বই। পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগলেন রত্নপ্রভা। কত ছবি, কত লেখা...। খানিকক্ষণ পরে তাঁর মনে হল গহন অরণ্য। গ্রন্থটা নয়, তাঁর স্বামী। বিশাল বিরাট অরণ্য। প্রতি পদক্ষেপেই নতুন কিছু চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয়ে গা ছম ছম করে। আবার পরিচিত শব্দ শুনে, প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ভয় কেটে যায়। কত রকমের গাছ-পালা, পশু-পাখি, কত ধরনের শব্দ গন্ধ রূপ রস, আর এই সমস্তটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, কখনও গাম্ভীর্যে অটল, কখনও শিশুর মতো সজীব। অজানাটা যদিও জানা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিঃশেষ হতে চাইছে না; মনে হচ্ছে, যেন কত কি আছে আরও। সহসা রত্নপ্রভার সমস্ত চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল। অরণ্যটা যে তাঁর একার, আর কারও নয়—এই অনুভূতি আনন্দিত করে তুলল তাঁর সমস্ত সত্তাকে। একটা নবীন উৎসাহ জাগল তাঁর মনে, হোক জটিল, হোক দুর্গম, তবু সমস্তটা আয়ত্ত করতে হবে তাঁকে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে তা করবার জন্যে।

পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দোয়েল পাখির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন একটা। আনন্দবাবুকে বলে এসেছিলেন, কিন্তু লেখবার সময় করে উঠতে পারেননি এতদিন। দোয়েলরা নিশ্চয়ই ডাকতে শুরু করেছে খুব সেখানে। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন একটু। তারপর নিজের ডায়েরি খুলে দেখলেন। দোয়েলের গান তো তিনি শুনেই এসেছেন—

প্রথম গান শুনিয়েছিলেন ১০ই ফাল্গুন, এতদিন ধুম লেগে গেছে নিশ্চয়। তন্ময় হয়ে লিখতে লাগলেন আবার। পাশে চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

কবি কবিতা লিখছিলেন নিজের ঘরটিতে বসে! গঙ্গা এবং শান্তনুর পৌরাণিক গল্পটা উদ্দীপ্ত করছিল তাঁর কল্পনাকে। তাঁর মনে হচ্ছিল, গঙ্গাই বুঝি বসন্তের বেশে এসেছিল পৃথিবী-শান্তনুর কাছে। এইবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।

ফুটিছে ঝরিছে ফুল অরণ্যে উদ্যানে;
গঙ্গা-বাসন্তিকা যেন আপন সন্তানে
ভাসাইছে কাল-স্রোতে লীলায় কৌতুকে।
পৃথিবী-শান্তনু চেয়ে ছিল শুষ্ক মুখে
নিষ্ঠুরা প্রেয়সী পানে।

"আর নয়—না—না"
সহসা ধ্বনিল যেন শান্তনুর মানা
আতঙ্কিত কলকণ্ঠে—"ক্ষান্ত দাও প্রিয়া।"
"চলিলাম আমি তবে" সুমিষ্ট হাসিয়া
কহিলেন সুরধুনী।

মর্ত্য-পাশ হতে
চলে হায় বাসন্তিকা, জাগে নদী-স্রোতে
কল্লোল-ক্রন্দন মৃদু; থাকিয়া থাকিয়া
আর্তকণ্ঠে হাহাকার করিছে পাপিয়া।
শিশু ভীষ্ম পড়ে আছে মাতৃহারা হায়
শিশু গ্রীষ্ম জাগিতেছে দিগন্ত-সীমায়।

রূপচাঁদ নদীতীরে একা নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি যাওয়াতে তিনি নিজে যেন ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হননি। সীমাহীন সমুদ্রে পথ-হারা হয়ে কলম্বাস হাল ছাড়েননি, রূপচাঁদও ছাড়েননি, তিনিও আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন বাতাসের গতি। যদিও আশ্বস্ত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে যাবেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

বকুলবালাও স্বপ্ন দেখছিলেন। চণ্ডীর বন্ধুটি হলদে পাখির বাচ্চা যোগাড় করে দেবে বলেছে। মার্বেল খেলার জন্য ভাল একটা 'চ্যাম্পিয়ান' মার্বেলও এনে দেবে বলেছে চণ্ডী। চণ্ডীর বন্ধু সত্যিই যদি হলদে পাখির বাচ্চা এনে দেয়, কি মজাই যে হবে! এবার আর ছাতু খাওয়াবেন না তিনি। ফড়িং ধরবার ব্যবস্থা করাতে হবে। চণ্ডী ঠিকই বলেছে, বাচ্চা-বেলা থেকে না পুষলে পোষ মানে না পাখি। পাখিদের বাসা বানাবার জন্যে অমরবাবু গাছে গাছে

যে সব বাক্স টাঙিয়ে দিয়েছেন, তাঁর একটাতেও কোনও হলদে পাখি বাসা বাঁধতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্দকিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে। বিনয় সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে এসেছিল, তার মাথার দিকে চেয়ে মন্দাকিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। ভগ্নী নন্দরাণীকে ডেকে বলছিলেন, "ওলো নন্দ, বিনুর চুলের বাহার দেখে যা। একবার বিয়ের নামেই এই, বিয়ে হয়ে গেলে না জানি কি করবে ছেলে!"

স্নেহে গলে পড়েছিলেন তিনি যেন। যে বিনুকে তিনি এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন তাকে ঘিরেই রঙিন হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁদের বাড়ির পাশের সজনেগাছটায় একটা দোয়েলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না মন্দাকিনীর।

সন্ন্যাসী একা বসে ছিলেন নদীর পরপারে বালুস্তূপের উপর। তিনি সহসা যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করছিলেন। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা কাঁটার মতো খচখচ করছিল তাঁর মনের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে ডানার সঙ্গে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন, তার প্রকৃত মর্ম ডানা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, যদি তাঁর অতি-সরল অভিমতকে ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করে থাকে, তা হলে হয়তো সে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই পোষণ করছে। এই চিন্তাটা পীড়িত করছিল তাঁর মনকে। কিন্তু এখনই একটু আগে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, কে তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করছে—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেকে তিনি চেনেননি এখনও। তিনি যে কি এবং কে, তার নির্ভুল প্রমাণ তো তাঁর নিজের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। অপরের সমর্থন বা প্রতিবাদে তার মূল্য তো এতটুকু পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং ডানা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছে বা ভাবেনি—এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। ওই শস্যক্ষেত্র কিছুদিন আগে সবুজ ছিল, এখন স্বর্ণকান্তি। কিছুদিন পরেই আবার রিক্তভরণ হবে। কোনও অবস্থাতেই তো সে সঙ্কুচিত নয়, তার এই পরিবর্তন কার মনে কি ভাবোদ্রেক করছে তা জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহও নেই ওর। নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন যেন, কারও স্তুতিনিন্দায় বিচলিত হবার ওর প্রয়োজনই নেই। খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থেকে তার পর শস্যক্ষেত্রকে প্রণাম করলেন তিনি। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে ভারি তৃপ্তি হল তাঁর।

ডানাও খুঁজছিল।

সে যথারীতি কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছিল সব। পাখিগুলির তদারক করছিল, দেখে বেড়াচ্ছিল কোনও পাখি কোথাও বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছে কি না, অমরবাবু যে সব বই রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি পড়ে 'পাখিদের পালক' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধও লেখবার আয়োজন করছিল, কবির কবিতা শুনছিল, রূপচাঁদবাবুকে এড়িয়ে চলছিল, সন্ন্যাসীর গতিবিধি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল দূর থেকে। কিন্তু আসলে সে খুঁজছিল নিজেকে। খুঁজছিল নিজের সেই বিশেষ আকাশটিকে, যেখানে পক্ষ বিস্তার করে সত্যিই আনন্দ পাবে সে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। কবির মনে হচ্ছিল যেন মধ্য-রাত্রি, রহস্যময় মধ্য-রাত্রি। নিশীথ গগনের অসংখ্য নক্ষত্রমালাই সহসা যেন কোনও মন্ত্রবলে একত্রিত হয়ে সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর জানলা দিয়ে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সেটা যেন বাস্তবের নয়, রূপকথালোকের। যদিও বাল্যকাল থেকে বহুবার তিনি এ দৃশ্য দেখেছেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর পূর্ব-জীবনের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে। ওই কর্ণিকার, পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উদ্দাম অথচ নীরব বর্ণসমারোহকে ঘিরে ফটিকজলের যে তীক্ষ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে পার্থিব—এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সহসা আজ পরম মুহূর্তে আবিষ্কার করেছেন পরম সত্য—সে সত্য শুধু অপরূপ নয়, অবর্ণনীয়। ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অন্তরলোকে একটা অস্ফুটভাব রূপায়িত হচ্ছিল কেবল অসম্বদ্ধ লীলায়, মনে হচ্ছিল, ছন্দবন্ধনে বাঁধলেই ওর অপরূপ অসীমতা খণ্ডিত হবে। মনের মধ্যে তবু ছন্দ জাগছিল, গুঞ্জন করছিল কবিতার মিল। ফটিকজল পাখি 'ফটি—ক জল' সূক্ষ্ম সুন্দর তীক্ষ্ণ সুরে যেন তাঁকে বলছিল, তুমি চুপ করে আছ কেন, তুমিও তোমার গান গাও না! তোমার মনে যদি সুর থাকে, কণ্ঠে তার ফুটবেই কিছুটা। সবটা নাইবা ফুটল! তা ছাড়া, সবটা তুমি ফোটাতে পারবে, এত অহঙ্কারই বা কেন তোমার? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি সবটা ফোটাতে পেরেছেন একসঙ্গে?

পাখির সুরে তিরস্কৃত হয়ে লজ্জিত হলেন কবি। কবিতার খাতাটা বার করে নীরবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে
তারি টানে তারি পানে ছুটেছে সুরের বেগ
পুলকিত বিহগের স্বরে,
সে সোনার মেঘ হতে নামিছে ফটিক-জল-ধারা
বৃক্ষলতা করে স্নান, পুষ্পে বর্ণ হল মাতোয়ারা
চঞ্চল পতঙ্গদল, মুখরিত পাখি আত্মহারা
মানুষ ঘুমোয় শুধু ঘরে!
ওরে কবি, দ্বার খোল্—বাহিরে বারেক দাঁড়া এসে
সোনার স্বচ্ছ মেঘ নামিয়াছে তোরই দ্বারদেশে
রুদ্রের অন্তর হতে বাহিরিল যে মোহন বেশে
দেখ্ তারে দু'নয়ন ভরে
রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে।

কবিতাটা লিখে কবির সত্যিই মনে হতে লাগল যে, বাইরে যে কড়া রোদ দিগ্-দিগন্ত

পুড়িয়ে দিচ্ছে তা রোদ নয়, তা সোনার স্বচ্ছ মেঘ, যে মেঘ থেকে ফটিকজল নামে। কপাট খুলে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হল, এই অনবদ্য অপরূপ প্রকাশকে অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব তো তাঁরই, তিনি যে কবি। সাধারণ মানুষ কপাটে খিল লাগিয়ে বৈশাখের এই পরম প্রকাশকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তিনি কি পারেন? বেরিয়ে পড়লেন? বেরিয়ে প্রথমেই মনে হল, কোথাও কেউ নেই, চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে যেন। তিনি যেন অকস্মাৎ কোনও রূপকথালোকের নিদমহলে ঢুকে পড়েছেন। প্রখর রৌদ্রালোকিত দিনমহল। আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা—ওটা কি কর্ণিকার বৃক্ষ? অপ্সরীই বা নয় কেন? ওই যে দূরে রক্তশিখার মতো দেখাচ্ছে, ওটা পলাশ, না, শিমুল, না, ধরণীর মর্মভেদী কামনা? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। একটা তপ্ত হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে, এসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

'ফটি—ক জল'—ফটি—ক জল—

কবির চমক ভাঙল। কোথা থেকে ডাকছে পাখিটা? দূরের ওই বড় গাছটা থেকে নিশ্চয়। ঘন পত্রপল্লবের মাঝখানে উঁচুতে ছোট্ট একটি ডালে বসে আছে বোধ হয়। কয়েক দিন আগে দেখেছিলেন তিনি পাখিটিকে। অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতের পর দেখেছিলেন। ছোট্ট পাখি, সুন্দর দেখতে। কালো, সাদা আর সবুজাভ হলুদের অপরূপ সমন্বয় পুরুষটির গায়ে, সঙ্গিনীটির গায়ে কিন্তু কালোর ছোঁয়াচ নেই। পুরুষ-পাখিটিকে দেখে মনে হয়েছিল, অমানিশীথিনীর কালোর সঙ্গে যেন স্বর্ণকান্তি সূর্যালোকের দ্বন্দ্ব চলেছে ওর সারা অঙ্গ জুড়ে; মনে হয়েছিল, পুরুষ-পাখিটি তামসিকতার কালোকে জয় করতে পারেনি, সঙ্গিনীটি কিন্তু পেরেছে, তার সারা গায়ে কেবল সবুজ আর হলুদের দ্যুতি, কালোর আভাসমাত্র নেই।

'ফটি—ক জল'—ফটি—ক জল—

কবি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দিন কয়েক আগে ফটিকজলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন একটা। তাঁর হঠাৎ মনে হল, কবিতাটা এখন একবার পড়া দরকার। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কথা ভুলে গেলেন আবার। অসংলগ্নভাবে মনে পড়ল অমরেশবাবুর জমিদারিতে কোথায় যেন খুন হয়ে গেছে একটা। জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে হয়তো থানায় যেতে হবে। একজন গোমস্তাকে তিনি যেতে বলেছেন; কিন্তু সে যদি এসে বলে যে, তাঁকে যেতে হবে, তা হলে—। বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন তিনি। অমরেশবাবুর স্ত্রী এ কি বিপদে ফেলে গেলেন তাঁকে? সঙ্গে সঙ্গে ডানার কথাও মনে হল তাঁর। শুধু তাঁকে নয়—ডানাকেও বিপদে ফেলে গেছেন ওঁরা। দুজনকে দুরকম 'টাস্‌ক' দিয়ে গেছেন যেন। এই বিপন্ন ভাব সত্ত্বেও কিন্তু মনে মনে ঈষৎ আনন্দিত হলেন তিনি। ডানার সঙ্গে একই কারাগারে বন্দি হয়ে আছি কেবল অর্থাভাবে—এই ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়া মাত্র ডানার সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের আত্মীয়তা-বোধ মনে জাগল। কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়াটা অনুচিত—এ কথাও মনে হল সঙ্গে সঙ্গে। একটু লজ্জিত হলেন।

'ফটি—ক জল'—

কবিতার খাতাটা খুলে পাতা ওলটাতে লাগলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে, কর্তব্যে অবহেলা করে ধরা পড়ে গেছেন যেন। কবিতাটায় অনেক কাটাকুটি ছিল, তবু পড়তে কষ্ট হল না তাঁর।—

বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে
সবুজাভ হলুদে সাদাতে ও কালোতে
সাজিয়া আসিল কে অজানারে চাহিয়া
ফটিকজলের গান বারে বারে গাহিয়া
সাথে লয়ে সঙ্গিনী তন্বী শ্যামলীকে
আলোকের রূপ ওর সারা মন ভরিয়া
পালকের কালো তবু যায় না যে সরিয়া
হয়তো বা আশা আছে ওরই গাঢ় কালিমা
প্রেয়সীর অন্তরে জাগাইবে লালিমা
শস্যের সুষমায় সাজাইবে পলিকে।

বেরিয়ে পড়লেন আবার। দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার বসে আছে একদল গরু, অর্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করছে, একটা ছোট বাছুর কেবল লেজ তুলে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তাঁর সুন্দরীও কি আছে ওদের মধ্যে? কর্তব্যবোধেই যন্ত্রচালিতবৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু গরুগুলির কাছাকাছি গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা গরু নয়—গাছের উপর এক ঝাঁক হাঁড়িচাঁচা পাখি। দুটো পাখি দুলে দুলে কি মিষ্টি করেই না ডাকছে। 'খুকু নেই' বলছে কি? না,'কু অক্‌রিং' না, 'ববো লিং'? সহসা কবির মনে হল, ওরা যেন পরস্পরকে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি খেলার সময় যেমন বলে। দুষ্টু কিশোরী মেয়ের মতোই দেখতে তো। সারাটা দুপুর এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়াচ্ছে, কখনও মগডালে মগডালে, কখনও ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে। ফল চুরি করছে, অন্য পাখির ডিম চুরি করছে, পোকামাকড় যা পাচ্ছে খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উঁচু ডালে বসে দুলে দুলে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন। স্নেহরসে কবির মন সিক্ত হয়ে উঠল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা যেন। পরমুহূর্তেই কোকিল ডেকে উঠল একটা। তারপর, শোন গেল—'ফটি—ক জল'। দূরে স্বর্ণাভরণভূষিতা কর্ণিকার বীথিতে নীরব সমারোহে যে বর্ণ-বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে, তারই প্রভাব যেন উন্মত্ত করে তুলেছে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পগুচ্ছকে। ওরা যেন রঙের ভাষায় ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কবির আবার মনে হল, তিনি রূপকথা-লোকে প্রবেশ করেছেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্বস্ত আনন্দিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি দূর প্রবাস থেকে সহসা নিজের দেশে ফিরে এসেছেন যেন। এই পাখির ডাক, ফুলের ভাষা, রৌদ্রমণ্ডিত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষে লতায় তৃণে গুল্মে সহস্র ইঙ্গিতভরা অসংখ্য আবেদন—এই তো তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এরই ক্রোড়ে, এই বৈচিত্র্যের দোলায়, এই সহজ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতেই তো মানুষ হয়েছেন তিনি। কত জন্ম, কত জন্মান্তর, কত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার কত সংঘাত আন্দোলিত করেছে তাঁকে এই প্রকৃতির কোলেই। মায়াবিনী সভ্যতার পিছু পিছু কোথায় গিয়েছিলেন তিনি এতদিন ঘর ছেড়ে? জটিল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এতকাল কিসের মোহে? নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ করে কোথায় চলেছে মানুষ। কোথায় এর পরিণতি! হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত হাওয়া তাঁকে ঘিরে ছোট্ট একটু নাচ নেচে দূরে ছুটে চলে গেল কতকগুলো শুষ্ক পাতাকে নাচিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, বৃদ্ধ বটের পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে। মুগ্ধ কবি দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছেলেবেলার সাথী একজন যেন পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ছুটে পালাল। ও তো এখনও তেমনি দুষ্টু, তেমনি চঞ্চল, তেমনি উত্তপ্ত, তেমনি উদ্দাম আছে। তিনিই কি বুড়ো হয়ে গেলেন না কি? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ করে উঠল। দেহটা হয়তো অপটু হয়েছে, মনে তো একটুও বুড়ো হয়নি। তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল ওই দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে। একটু ছুটলে ক্ষতি আর কি হবে। বড় জোর হাঁপিয়ে পড়বেন একটু। কেউ দেখতে পেলে হয়তো হাসবে, পাগল ভাববে। তাতেই বা ক্ষতি কি! ঊর্ধ্বপুচ্ছ কচি বাছুরটা তাঁর দিকে একছুটে চলে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর সামনে। যেন বলতে লাগল—ছুটবে? বেশ তো, এস না। কবি সত্যিই ছুটতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। রাস্তার বাঁকে পিওনকে দেখতে পেয়ে তাঁর গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে গেল, টান পড়ল ভব্যতার নিগড়ে। সহজ মন্দ গতিতেই এগিয়ে গেলেন তিনি পিওনের দিকে। পিওনও তাঁর দিকেই আসছিল, তাঁর চিঠি ছিল একখানা। বেশ মোটা একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে পিওন নিজ গন্তব্যপথে চলে গেল। কবি চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝলেন, অমরেশবাবুর চিঠি। হাতের লেখাতেই ভদ্রলোকের চরিত্র পরিস্ফুট। গোটা গোটা বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষর। বেশ মোটা চিঠি। খামটা ছিঁড়েই কবির মনে হল, এ চিঠি এখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। বেশ লম্বা চিঠি। প্রথমেই চোখে পড়ল—"একটা দোয়েল পাখি আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আমি আরও খানকয়েক বই পাঠালাম। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে—" এই টুকু পড়েই কবির মনে হল চিঠিখানা নিয়ে ডানার কাছে যাওয়াই উচিত। যা এতক্ষণ মনের প্রত্যন্তদেশে গোপন ইচ্ছা ছিল, তা এইবার কর্তব্যরূপ পরিগ্রহ করে দ্বিধামুক্ত হল। চিঠিখানা হাতে করে দুপুর রোদে মাঠ ভেঙে তিনি ডানার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। কবি বাইরে যদিও একটা সপ্রতিভতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রূপকথালোকের যে অবাস্তব চিত্রটা সহসা তাঁর মনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব তখনও কাটেনি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চিরন্তন রাজপুত্র, চিরন্তনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলেছেন। যে মেঘ স্ফটিকজল বর্ষণ করে, সে তার স্বচ্ছ স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করেছে চতুর্দিক, তাঁর বয়স যেন অনেক কমে গেছে, তাঁর কবিতা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁকে।.....

কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে তিনি যখন সবজিবাগের পড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন, তখনও তাঁর ঘোর কাটেনি। শিকল-তোলা দরজাটার দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চমকে উঠলেন চাকরটার সাড়া পেয়ে।

"মাইজী বেরিয়ে গেছেন।"

ঘোর কেটে গেল। মুখ দিয়ে কিন্তু কথা বেরুল না তবু।

"আপনি কি বসবেন?"—চাকরটাই প্রশ্ন করল আবার।

"হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কোথায় গেছেন মাইজী?"

জোর করে কথা কটা বলতে পেরে যেন আত্মস্থ হলেন তিনি। মনের একটা অজানা গুরুভার যেন নেবে গেল।

"তা ঠিক জানি না বাবু। মাইজী আমাকে ডাকঘরে পাঠিয়েছিলেন খাম-পোস্টকার্ড আনতে। এসে দেখছি, বেরিয়ে গেছেন তিনি। কাছাকাছিই গেছেন কোথাও। আপনি বসেন তো একটু বসুন। আসবেন এখুনি।"

কপাটটা খুলে দিলে সে। কবি ভিতরে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল, টেবিলের উপর তিনখানা মোটা মোটা পক্ষী-বিষয়ক বই রয়েছে। অমরেশবাবু পাঠিয়েছেন নিশ্চয়। কবির একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। অমরেশবাবু শুধু পাখিদেরই খাঁচায় পোরেননি। তাঁকে এবং ডানাকেও পুরেছেন। অদৃশ্য যন্ত্র দিয়ে তাঁদেরও ঠোঁট নখ পালক মাপছেন কি না কে জানে?

অমরেশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনে হল, লোকটির প্রতি সুবিচার করেননি তিনি। তাঁকে কখনও অবজ্ঞাভরে, কখনও অনুকম্পা সহকারে তিনি যেন দয়া করে সহ্য করে এসেছেন, তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের আলোক কখনও তাঁকে বিচার করবার চেষ্টা করেননি। তাঁর মনে হল, চেষ্টা করলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। অসুরের মতো বলিষ্ঠ; শিশুর মতো কৌতূহলী, ঋষির মতো জ্ঞানবৃদ্ধ, রাজার মতো ধনী, অগ্নির মতো পবিত্র এই লোকটির অনন্যতায় তাঁর অন্তত মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কবি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু। মুগ্ধই হয়েছেন তিনি মনে মনে, কিন্তু বাইরে ভান করছেন ঠিক উলটোটা। কি দরকার এ চাতুরির? আত্মসম্মানের মুখোশটা বজায় রাখার জন্যে? চিঠিখানার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পকেট থেকে বার করে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আনন্দমোহন বাবু,

একটা দোয়েলপাখি আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আরও খানকয়েক বই পাঠাচ্ছি। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয় এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে। আমাদের রেডিওর এরিয়েলটা এখানকার একটি দোয়েল-গায়কের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর বসে কত গানই শোনায় ও! সম্ভবত প্রেয়সীকেই শোনায়, কিন্তু মাঝ থেকে আমরাও লাভবান হই। কি বলেন? একজন ইংরেজ লেখক—ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাখিরা নাকি তাদের প্রেয়সীদের ভোলাবার জন্যে গান গায় না। ময়ূর নাকি ময়ূরীকে মুগ্ধ করবার জন্যে পেখম মেলে নৃত্য করে না! ওরা যা করে, সবই নাকি অকারণ পুলকে করে। কার্যকারণের যোগাযোগ মানতে চান না ভদ্রলোক। অকারণ পুলকে যে পাখিরা গান করে না তা নয়, লক্ষ্য করে দেখবেন, অনেক সময় এই দোয়েলই অহেতুক আনন্দে গান গেয়ে চলেছে! কিন্তু ওর অধিকাংশ গানের লক্ষ্য যে ওর প্রিয়—এ কথা অস্বীকার করা শক্ত! লরেন্স বলেছেন, সৌন্দর্য ব্যাপারটা রহস্যজনক। ওর কোনও হেতু নেই। বিজ্ঞান জোর করে একটা হেতু বার করবার চেষ্টা করেছে, কারণ বিজ্ঞানীদের একটা হেতু-বাতিক আছে। আছে তা মানছি। কিন্তু ওই লরেন্সই ওই প্রবন্ধেই বলছেন যে, জীবন্ত যৌবনই সৌন্দর্য। অর্থাৎ তিনিও রূপের প্রকাশকে যৌন অভিব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে পারেননি। বিজ্ঞানকে গাল দিতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যাক ও-কথা, এখন দোয়েলের কথা শুনুন।

পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু, কচ্ছ প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র দোয়েল স্থায়ী বাসিন্দা। পার্বত্য প্রদেশেও আছে; চার হাজার ফুট, কখনও কখনও পাঁচ হাজার ফুট

উঁচুতে পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়েও এক হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বাসা এবং ডিম পাওয়া গেছে। এদের চালচলন লক্ষ্য করেছেন কি কিছু? নিশ্চয়ই করেছেন। দোয়েল পাখির সম্বন্ধে অমন সুন্দর কবিতা যখন লিখেছেন, তখন দেখেছেন নিশ্চয় ওদের ভাল করে। কিংবা কি জানি, না দেখেও হয়তো ভাল কাব্য রচনা করতে পারেন আপনারা, এর অজস্র প্রমাণ তো বিশ্বসাহিত্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী অথবা শেক্‌স্পীয়ার মিডসামার নাইটস্‌ ড্রীম দেখেননি নিশ্চয়। যাক, আবার বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি আপনার। দোয়েলের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। দোয়েল হচ্ছেন— ইংরেজী গ্রন্থকারের ভাষায়—"A bird of groves and delight to move about on the ground in the mixed chequer of sunshine and shade"—এর সংক্ষেপে বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমাদের দোয়েল হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী, (নিকুঞ্জবিহারী বললেও ক্ষতি নেই) কাননের আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে বিহার করতে ভালবাসেন। একজন বিদেশী গ্রন্থকার লিখেছেন যে, দোয়েল ঘন ঝোপের ভিতর ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে না (thick undergrowth it dislikes); কিন্তু আমি দু-তিনবার একে ঘন ঝোপে দেখেছি। অবশ্য শীতের সময়। সে সময় বেচারারা একটু মন-মরা হয়েই থাকে। গলা দিয়ে সুর পর্যন্ত বেরোয় না ভাল করে। তবে ছোট-খাটো পরিচ্ছন্ন জায়গাই বেশী পছন্দ করে এরা। আমাদের বাড়ির সেই ছোট্ট জায়গাটুকু ভারি ভাল লাগে ওদের—সেই যেখানে আয়না বসিয়েছিলাম, মনে আছে নিশ্চয় আপনার। এখানকার বাগানেও দোয়েল আছে একটা—সে তো আমার গিন্নীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। গাছের তলায় তলায় তুড়ুক তুড়ুক করে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাফেরা করে আহারের খোঁজে, তার পর উড়ে হয়তো একটা ডালে বা বাগানেব দেওয়ালের ওপর বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কোনও গাছের তলায় কোনও পোকামাকড় নড়ছে কি না দেখতে পাওয়া মাত্রই বোঁ করে নেবে সেটি সংগ্রহ করে গলাধঃকরণ করা হল, তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসা হল সেই ডালে বা দেওয়ালের ওপর। ফুল তুলতে তুলতে আমার গিন্নী হয়তো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন, দোয়েলের ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং তার চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—ও, আপনি! খাবার সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি আমি। আপনার ওই ফুলগাছ গুলো যে-সব পোকামাকড় নষ্ট করছে তাদেরই সাবাড় করছি! এই ধরনের বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। তারপর হঠাৎ উড়ে গিয়ে এরিয়েলের ডগায় বসে গান ধরে দিলে একখানা, মনে হল, আমাদের বাগানে আমরা যে ওকে থাকতে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতায় ও যেন উচ্ছ্বসিত এবং সেইটেই যেন ওর গানের মুখ্য প্রেরণা। দোয়েলের গানের যে কত মূর্ছনা, কত উত্থান-পতন, কত লালিত্য, কত বৈচিত্র্য তা তো আপনি রোজই শুনছেন। দিনকয়েক চেষ্টা করে আমাদের এখানকার দোয়েলের গানের ধরনটা আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই হয়নি অবশ্য, কারণ গানের সুরটাই আসল, তা লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর থেকে ধরনটা হয়তো একটু বোঝা যাবে। কিছুটা টুকে পাঠাচ্ছি।—

ও পি পি পি পি পি—চিঃ.....

(দু মিনিট)

ও জা—গো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শিগ্‌গির

(সঙ্গে সঙ্গে উড়ল)

পিঁ—কেরেঃ পিঁ কেরেঃ পিঁ কেরেঃ......

(৫ মিনিট)

পি পি পি—কই তুমি—কই তুমি—কই তুমি—কি কি কি

(তিন মিনিট)

প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—য়া—প্রি—য়া.....

(দুই মিনিট)

পি ই ই ইঃ—পি ই ই ইঃ

(মিনিট খানেক)

পি—ঞি—ঞি—ঞি—ঞি—ঞি—চি—চি—চি

(ডাকতে ডাকতে উড়ল)

কি যে—কি যে—কি যে কি যে—কি এ কি এ কি এ—ক্রিকিক্ ক্রিকিক্....

(মিনিট খানেক)

পি পি পি—কি করছ যে কি করছ যে—দুত্তোর—দুত্তোর—

(দু মিনিট প্রায়)

এ—কি রেঃ এ কি রেঃ—এ কি রেঃ—চোখ গেল—চোখ গেল.....

(তিন মিনিট)

এ ছাড়া আরও কত রকম যে ডাক আছে তা আমাদের অক্ষর দিয়ে লেখাও শক্ত। আমার ইচ্ছে আছে, দোয়েল পাখির জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে একটি ছোট বই লিখব। ডেভিড ল্যাকের (David Lack) 'দি লাইফ অব দি রবিন' বইখানা দেখেছেন কি? ওখানে আমার শেল্‌ফে আছে, ইচ্ছে করেন তো দেখতে পারেন। ওই ধরনের বই একটা লেখবার ইচ্ছে আছে। হয়ে উঠবে কি না জানি না। এ দেশে নানা বাধা। একটা বাধা হচ্ছে জনসমাগম। বহু বেকার লোকের বাস এ দেশে, তাদের কোনও কাজ নেই। লোকের বাড়িবাড়ি ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। যখন-তখন হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, দূর করে দেওয়া যায় না, প্রাণ খুলে আপ্যায়িত করাও যায় না। অসময়ের বৃষ্টি বা ঝড়ের মতো। মহা বিরক্তিকর। তবু একটু একটু করে লিখছি। ওই ডেভিড ল্যাকের বইয়ে আর একটা কথাও দেখবেন এবং সম্ভব হলে মিলিয়ে দেখবেন—যা তিনি রবিন রেডব্রেস্টের সম্বন্ধে লিখেছেন, তা দোয়েলের সম্বন্ধে খাটে কি না! আমার মনে হচ্ছে খাটে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পাখিরা সব সময়ে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই যে গান গায় তা নয়। ডেভিড ল্যাক লক্ষ্য করেছেন যে, কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্টের নিজস্ব এলাকায় যদি অন্য কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্ট এসে পড়ে, তা হলে আগন্তুক পাখিকে লক্ষ্য করে এলাকার মালিক গানের তুফান তোলে। অর্থাৎ ঝঙ্কারের মাধ্যমেই তাকে হুঙ্কার দেয়। মানুষের সঙ্গে ওইখানেই ওদের তফাত। এলাকার স্বত্বে কেউ যদি অবাঞ্ছিত দাবি করে—আমরা গালাগালি দিই, মোকদ্দমা করি; কিন্তু পাখিরা গান গেয়ে ওঠে। এবং সেই গানের মর্যাদাও রক্ষা করে ট্রেসপাসার পাখিটি। ও, এটা যে আপনার এলাকা বুঝতে পারিনি ঠিক, সো সরি মুখের এই রকম একটা কাঁচুমাচু ভাব করে সরে পড়ে সে। সব পাখি অবশ্য এতটা বিনীত নয়, দু-একজনকে মারধোর করেও তাড়াতে হয়। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এদের নিজস্ব এলাকার মালিকানা কে ঠিক করে দেয়? এরা নিজেরাই ঠিক করে। কোনও অনধিকৃত এলাকা যে আগে দখল করতে পারে সে এলাকা তারই হয়—পক্ষী জগতে

এই নিয়ম মেনে নিয়েছে সবাই। একাধিক দোয়েলের পায়ে বিভিন্ন রঙের 'রিং' পরিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আপনারও লক্ষ্য করতে পারেন, ডেভিড ল্যাক যেমন করেছেন। দোয়েলের বিষয় আরও কয়েকটা কথা জানিয়ে দিয়ে পত্র শেষ করি। দোয়েলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়। ওদের যদি খাঁচায় পুষতে চান, তা হলে ছোলা, ছাতু বা ফল খাওয়ালে চলবে না,—ওরা টিয়া-চন্দনার মত বৈষ্ণব-প্রকৃতির নয়, রীতিমত শাক্ত। সেই জন্যেই বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বুলি ওদের শেখানো যায় না। এদের প্রকৃতিতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার আছে। এরা ছাতারের মতো দল বেঁধে থাকতে পারে না। এমন কি নিজের প্রিয়ার সঙ্গেও এদের খুব যে একটা মাখামাখি আছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রিয়াকে লক্ষ্য করে এরা গানের ঝরনা বইয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিনরাত প্রিয়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে রাজি নয় এরা। মেজাজটাও এদের একটু ঝাঁঝালো রকমের, ইংরেজীতে যাকে বলে pugnacious। অর্থাৎ এদের ধরন-ধারণ চাল-চলন সবই প্রকৃত আর্টিস্টের মতো। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে চায় না। ফিন্ সাহেব লিখেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রস আইলাণ্ডে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল পাখি দেখা যায় এবং তারা মানুষ দেখলে নাকি পালায় না। বড় দোয়েলকে ধরে খাঁচায় পোষা বেশ শক্ত, সহজে পোষ মানে না। মরে যায়। এর একটা কারণ বোধ হয়, যে-পোকামাকড় ওদের খাদ্য তা প্রত্যহ জোটানো শক্ত। একজন সাহেব কিন্তু খাঁচায় দোয়েল দম্পতিকে পুষেছিলেন, খাঁচায় তারা নাকি ডিম পেড়ে বাচ্চাও লালন করেছিল—ফিন সাহেব লিখেছেন। ওদের লেখা বই যখনই পড়ি, একটা কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওদের কি অদম্য কৌতূহল। অগাধ বিদ্যা আর শিশুসুলভ কৌতূহলের মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে ওদের প্রতিভায়। আমাদের দেশে কত ফুল, কত পাখি, কত রকমের গাছ; কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহলই নেই। দু-চারটে পাখি বা গাছের নাম অনেকে অবশ্য জানেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে যা কিছু তা সব 'জংলি' বা 'কি জানির' পর্যায়ে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা আরও অজ্ঞ। একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু সে চেষ্টাই কারও নেই। সবাই চাকরি কিংবা ব্যবসা ছাড়া আর যা কিছু করেন তা অতিশয় নিম্নস্তরের পরচর্চা। ভাবলে দুঃখ হয়। কি আশ্চর্য দেখুন, কথায় কথায় আমিও বেশ পরচর্চায় মেতে উঠেছি। এটা বোধ হয় আমাদের মজ্জাগত দোষ। চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। পাখির বিষয়ে নতুন কি কবিতা লিখলেন? পাঠাবেন? পাখি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে কোনও পাখি আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানাতে বলবেন শ্রীমতী ডানাকে। আমার ছোট চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আশাকরি সুস্থ আছে। যদি কাউকে অসুস্থ দেখেন ছেড়ে দেবেন। প্যাঁচাটা কেমন আছে? ও খুব মাংসাশী লোক। মালিটাকে বলে এসেছি ইঁদুর ধরে দিতে। ইঁদুর যদি রোজ না পাওয়া যায় বাজার থেকে মাংসের কিমা কিনে দেবেন। এখানকার ব্যাপার মিটিয়ে ফিরে যেতে আমার বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম চালাবার জন্যে আপনাকে একটা 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' পাঠালাম এই সঙ্গে। রত্নপ্রভা এই সঙ্গে আপনাকে হাজার টাকার ক্রস্‌ড্ চেকও পাঠাচ্ছেন। সে বলছে, এটা পারিশ্রমিক নয়—প্রণামী। শ্রীমতী ডানার চেকটা কাল বা পরশু পাঠাবে সে।

আপনারা আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। সব খবর দিয়ে উত্তর দেবেন ইতি—

আপনাদের

অমরেশ

কবি চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হল তাঁর। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ডানার টেবিলে চিঠি-লেখার যে প্যাডখানা ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে তিনি লিখলেন—

কবির তপস্যা-লোকে এসেছে অপ্সরী
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি'।
কখনও সে মদিরাক্ষী টলমল-পান-পাত্র হাতে
যৌবন-হিল্লোলে দুলি' আসিয়াছে জ্যোৎস্নানীল রাতে
কভু চুপে চুপে
এসেছে ভক্তের রূপে;
প্রশংসার বাণী-রূপে কভু এসেছে সে
উচ্ছ্বসিত রসিকের বেশে;
জনতার রূপ ধরি করিয়াছে কভু অভিষেক,
আদেশ করেছে কভু, কখনও সে 'চেক'।
বারম্বার তার কাছে পরাভব করেছি স্বীকার
তবু আমি কবি নির্বিকার
গুটি-কারাগার-মাঝে কিছুদিন থাকি শূন্য-গতি
তারপর একদিন উড়ে যাই মুক্ত প্রজাপতি।

কবিতাটির দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে কবি চেকটি মনি-ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ঠিক পর-মুহূর্তেই ডানা এসে ঘরে ঢুকল।

"ও, আপনি এসেছেন। ভালই হয়েছে। আমি আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। তালগাছে যে বাক্সটা আমরা টাঙিয়েছি, তাতে একজোড়া শালিক বাসা বাঁধছে। ও কি, কবিতা লিখলেন বুঝি?"

কবি কবিতাটা পড়ে শোনালেন

"হঠাৎ এ ভাব মনে এল যে আপনার?"

"এল।"

"চলুন, শালিকের বাসাটা দেখবেন।"

"চল। ফিরে এসে চা খাব কিন্তু।"

"বেশ।"

দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

কবি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে-ফিরে বাসাটা দেখলেন। সত্যিই এক শালিক-দম্পতি খড়কুটো মুখে নিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

"দেখছেন? ভারি মজা লাগছে আমার।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"মানাচ্ছে না একটুও। মনে হচ্ছে যেন এক সাঁওতাল দম্পতিকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে কলকাতা শহরের দোতলা ফ্ল্যাটে। মনে হচ্ছে—ওটা যেন ফাঁদ, বাসা নয়।"

"কি যে আপনার আজগুবি কল্পনা। চলুন, চা করে দিই আপনাকে।"

ডানা হেসে কথাটা বললে বটে, কিন্তু কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন তার মনে গেঁথে গেল।

"তাই চল।"

দুজনে আবার বাসার দিকে ফিরলেন।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

।। দুই ।।

পরের দিন সকালে উঠেই ডানার সর্বপ্রথম মনে পড়ল শালিকের বাসার কথাটা। তাড়াতাড়ি চোখ-মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তালগাছটার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল, তাতে চমকে উঠল সে। বাসা থেকে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। পাখি দুটো কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দেখতেই পেল না। মহা মুশকিল হল তো! ওদের বাসায় সাপ ঢুকেছে না কি! তাড়াতাড়ি গিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে এল। চাকরটা খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, "ঢিল ছুঁড়ে দেখব?"

"ঢিল ছুঁড়বি? যদি ওরা ভেতরে ডিম পেড়ে থাকে! তুই গাছে উঠতে পারবি না?"

"না।"

"তা হলে উপায়?"

চাকরটা তালগাছের তলায় গিয়ে গাছটাকে নাড়া দিতে চেষ্টা করল। গাছ নড়ল না একটুও।

"মই জোগাড় করতে পারিস কোথাও থেকে?"

"মই নিয়ে কি হবে?"

"মই লাগিয়ে তুই উঠতে পারিস।"

"সে আমার দ্বারা হবে না। ওখানে উঠে জান দেব না কি? সত্যিই যদি সাপ থাকে আর সে যদি তাড়া করে আসে—ওরে বাবা, সে আমি পারব না মাইজি।"

ডানার মনে হল, সাপের খোলসটা দুলছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল তার। দিনের আলোয় তার চোখের সামনে এত বড় একটা সর্বনাশ হতে থাকবে আর সে কিছুই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি! না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

"তুই একটা মই যোগাড় করে আন তো। তুই উঠতে না চাস আমি উঠব।"

"মই আমি কোথায় পাব?"

"আমি আনন্দবাবুকে একটা চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটা নিয়ে তুই ছুটে চলে যা। তিনি নিশ্চয়ই একটা মই যোগাড় করে দিতে পারবেন। চট করে যাবি আর আসবি।

ডানা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কবিকে একটা চিঠি লিখল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহা মুশকিলে পড়েছি। তালগাছে শালিক পাখির বাসায় সাপ ঢুকেছে। একটা মই চাই। একটা লোকও যদি পাঠাতে পারেন ভাল হয়। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না, একটা মই পেলে আমিই সব ঠিক করে নেব। আপনি আসবেন না কিন্তু। এলে খুব রাগ করব। বিপদে পড়লে পুরুষদের সাহায্য ছাড়াও যে আমরা সামলে নিতে পারি, দোহাই আপনার, সেটা যাচাই করবার সুযোগ দিন। ইতি—

ডানা

আগের দিন ছিমছাম কৃত্রিম মানুষের তৈরি বাসায় শালিক-দম্পতিকে দেখে কবির মনে যে বেসুর বেজেছিল, সেইটেই তাঁকে পরদিন প্রভাতে একটি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করল। উপলক্ষ হল একটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকটি তাঁর বাড়ির সামনের একটি ডালে বসে তারস্বরে চীৎকার করছিল। মন্দাকিনী থাকলে তার ওই শ্রুতিকঠোর খা-খা-খা শব্দ কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না, কাকটাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। কবি কিন্তু উদ্বুদ্ধ হলেন এবং ছন্দে গেঁথে দাঁড়কাককে খামখা উপদেশ দিতে বসে গেলেন। প্রথম দু লাইন লিখেই তাঁর মনে হল, ভাবটি যেই জমে আসবে অমনি ঠিক খুনের মামলার নথিপত্র নিয়ে কুঁজো গণেশ গোমস্তা হাজির হবে এসে। সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই ভরু কুঁচকে গেল তাঁর। রাগও হল, মনে হল এলেই দূর করে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে, মনের সুরটাও কেটে যাবে তা হলে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও বিদায় নেবে! কিন্তু উপায়ই বা কি! গণেশকে কি করে ঠেকাবেন তিনি, সত্যিই যদি এসে পড়ে সে! হঠাৎ মনে পড়ল, একটা উপায় আছে। ঠাকুরকে ডাকলেন। চন্দনচর্চিত মৈথিলী ঠাকুরটি দ্বারপ্রান্তে এসে নিজস্ব বাংলায় সসম্ভ্রমে বললে, "আমাকে ডাকিয়েসেন বাবু?"

"দেখ, কেউ যদি এখন আসে বলো যে, বাবুর শরীরটা ভাল নেই, এখন দেখা করবেন না কারও সঙ্গেও।"

"বেশ। ভাত তো রান্না করিয়েসি, দু-চারঠো রোটি কি বানাব? শরীর যখন খারাব—"

"না, ভাতই খাব।"

ঠাকুর চলে গেল। জানলা দিয়ে কবি চাইলেন বাইরের দিকে। দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছিল। কবি তাকে উদ্দেশ করে লিখলেন—

বলিষ্ঠ দাঁড়কাক,
যা আছিস তাই থাক্
  বুলবুলি হবি কোন্ দুঃখে
শুনে লেগে যায় তাক
তোর ওই হাঁকডাক
  রূপ দেয় রুষ্টে ও রুক্ষে।

মনে আছে কবি কি দিয়েছিল তোরে গাল
ময়ূরের পেখমেতে হয়েছিলি নাজেহাল!

দেখিস খবরদার
করিস না যেন ধার
অভাব কিসের তোর কচ্ছ
কুচকুচে কালো গায়ে
আলো যে পিছলে যায়
কুচকুচে চোখ তোর স্বচ্ছ!

শৌখিন পাখিদের মিহি সুর ছাপিয়ে
গলা ছেড়ে হাঁক দে রে চারিদিক কাঁপিয়ে
ন্যাকামিকে তাড়িয়ে
সা রে গা মা ছাড়িয়ে
ছোটা তোর বেসুরের অশ্ব
রে হাবসি-সম্রাট,
তোর ঠাঁট তোর বাট
একেবারে তোর যে নিজস্ব।
ওরে ওরে দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক
কালো-কালো বোম্বেটে পক্ষী
বুলবুলি দোয়েলের
টুনটুনি কোয়েলের
হস না নকল যেন লক্ষ্মী!

ডানার চাকর আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় এসে কড়া নাড়তেই ঠাকুর গিয়ে হাজির হল। সে যেন ওৎ পেতে বসে ছিল।

"বাবুর তবিয়ত খারাপ। মুলাকাত হোবে না।"

"মাইজি আমাকে একটা মই নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"মই? মানে সিঁড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"সিঁড়ি তো হামাদের নাই।"

"কাদের আছে?"

"রূপচন্দবাবুর বাসায় খুব লম্বা সিঁড়ি দিখিয়েছি একটা। সিথায় গেলে মিলতে পারে।"

"ও, আচ্ছা—"

রূপচাঁদবাবু আপিসে চলে গিয়েছিলেন।

যথারীতি চণ্ডী এসেছিল বকুলবালার কাছে। সে একটি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছিল। অনেক চেষ্টা করেও গণশা এবার নাকি হলদে পাখির বাসা আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ এই হলদে পাখির বাসা আবিষ্কারের উপর চণ্ডীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করছিল। বকুলবালা তাকে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে হলদে পাখির বাচ্চা এনে দিতে পারে তা হলে 'এয়ার-গান' কিনে দেবেন একটা। চণ্ডীকে অবশ্য তিন-সত্যি করতে হয়েছিল যে, সে এয়ার-গান দিয়ে কাক ছাড়া আর কোনও পাখি মারতে পারবে না। বেড়াল, নেউল, শেয়াল, ক্ষ্যাপা কুকুর এসব মারতে পারে, কিন্তু কাঠবেড়ালী, ছাগলছানা বা গরু-বাছুরকে কিছু বলতে পাবে না। চণ্ডী এসব শর্তে রাজি ছিল, গণশা যা বললে তাতে তো এ বছর এয়ার-গান পাবার আশা দুরাশা।

বকুলবালা একটা ধনুকে ছিলে পরাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য দুর্বৃত্ত কাককুলকে শাসন করা। বকুলবালা একটু আরাম করে বারান্দায় তোলা-উনুনটি নিয়ে রাঁধতে চান, (গরমে ওই ঘুপসি রান্নাঘরে টেকা যায় নাকি!) কিন্তু কাকের দৌরাত্ম্যে তা হয়ে উঠছে না। একটু নড়বার জো নেই—কখনও মাছভাজাটা নিয়ে পালাচ্ছে, কখনও দুধে মুখ দিচ্ছে। জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি আজ ঠিক করেছেন, তীর-ধনুক দিয়ে কাক তাড়িয়ে তবে রাঁধতে বসবেন। তীর ধনুকটা পাশেই থাকবে, তা হলে মুখপোড়ারা ভয়ে আর আসবে না।

চণ্ডীর মুখ থেকে দুঃসংবাদটি শুনে তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু। ভাবটা—তুমি যে একটি অপদার্থ তা আমি বরাবরই জানি।

মুখে বললেন, "ছিলেটা পরা তো, আমি বাঁখারিটা ভাল করে বাঁকিয়ে ধরছি। খুব কস্-কসিয়ে বাঁধবি।"

চণ্ডী যথাসাধ্য শক্ত করে দড়িটা বেঁধে ফেললে।

"এইবার একটা তীর ছোঁড় দিকি। ওই কাকটাকে মার্। মুখপোড়া সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে আমাকে।"

"তীর কোথায়?"

"ওই যে। সকাল থেকে তো তীরই বানাচ্ছিলাম। একা হাতে বাঁশ চিরে তৈরি করেছি। তুমি তো এই এতক্ষণে এলে।"

চণ্ডী ধনুকে তীর যোজনা করে লক্ষ্য করতেই কাকটা সরে পড়ল। আশেপাশে আরও যা দু-একটা ছিল, তারাও উড়ে গেল।

"এই হচ্ছে ওদের ওষুধ।"

বকুলবালার চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

"দেখি, দেখি, আমাকে দে তো—"

একটা কাক অনেক দূরে মিত্তিরদের চিলেকোঠার ছাদে এসে বসে ছিল আবার। বকুলবালা তীর-ধনুক আঁচল দিয়ে ঢেকে গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন সে দিকে।

"এই বার মারুন।"—ফিস ফিস করে চণ্ডী বললে।

বেশ বাগিয়ে তীর ছুঁড়লেন বকুলবালা। আর একটু হলেই লাগত, একেবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কাকটা কা-কা করে পাড়া মাতিয়ে তুলল।

"তীরটা খুঁজে নিয়ে আয়।"

একছুটে বেরিয়ে গেল চণ্ডী এবং একটু পরেই তীরটা নিয়ে এল। এ সব ব্যাপারে সে ওস্তাদ একজন।

"রেখে দে ঠিক জায়গায়। গুছিয়ে রাখ্।"

চণ্ডী বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল।

বকুলবালা এবার হলদে পাখির প্রসঙ্গে এলেন।

"গণশা এবার হলদে পাখির বাসা দেখতেই পায়নি?"

"অমরবাবুর আমবাগানে গণশা গেল-বছর হলদে পাখির বাসা দেখেছিল। এ বছর সে বাগানে হলদে পাখিই নাকি দেখা যাচ্ছে না। গণশা বলছিল, অমরবাবুর লোকেরা নানা রকম ফাঁদ পেতে, জাল ফেলে, বন্দুক আওয়াজ করে সব পাখিদের ভড়ক দিয়েছে, এ বছর ওরা হয়তো এ অঞ্চলে বাসা বাঁধবে না।"

"দুৎ তা কি কখনও হতে পারে? এখানকার পাখি কি বাসা বাঁধবার জন্যে দিল্লী মক্কা চলে যাবে? গণশাটা বোকা, কিছু জানে না। তুই নিজে খুঁজিস একটু।"

"আমি যে হলদে পাখির বাসা চিনিই না।"

"পাখির বাসা চেনা আর শক্ত কি! পাখির বাসা দেখিসনি কখনও?"

"আমাদের ঘরের আলসেতে একবার শালিক বাসা বেঁধেছিল। কাকের বাসাও দেখেছি। বাবুই পাখির বাসাও দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রকম যে। হলদে পাখির বাসা দেখিনি কক্‌খনও কিনা!"

"গণশা তো দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করিস না।"

"আচ্ছা।"

এমন সময় বাইরের দুয়ারে ডাক শোনা গেল,"বাবু বাড়ি আছেন?"

"দেখ্ তো কে এল এমন অসময়ে?"

চণ্ডী বেরিয়ে গেল। ডানার চাকরকে সে চিনত। আনন্দবাবুকে লেখা ডানার চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এল সে।

"অমরবাবুর বাগান বাড়িতে যে মেয়েটি আছেন তিনি একটা সিঁড়ি চেয়ে লিখেছিলেন আনন্দবাবুকে। আনন্দবাব্ এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"চিঠিটা পড়্ তো।"

ডানার সম্বন্ধে দু-একটা কথা রূপচাঁদের মুখে বকুলবালা শুনে ছিলেন। মেয়েটি নাকি বেশ লেখাপড়া জানা, অমরবাবু দু শো টাকা মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি ওকে। ডানার সম্বন্ধে বকুলবালার বেশ একটা কৌতূহল ছিল, চিঠিটা শুনে তো আরও বেড়ে উঠল। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেশ লিখেছে তো চিঠিখানা। নিশ্চয়, পুরুষদের সাহায্য নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কল্পনানেত্রে তিনি যেন শালিক পাখির বাসায় প্রবিষ্ট সাপটাকে দেখতে পেলেন। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় একবার এ ধরনের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁদের পায়রার খোপে সাপ ঢুকেছিল। সহসা তাঁর সমস্ত শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

বললেন, "চণ্ডী, তুই তীর-ধনুকটা সঙ্গে নে। চাকরটাকে ডাক্ মইটা সঙ্গে নিয়ে চলুক, আমরাও যাই চল্।"

ডানাকে দেখে বকুলবালা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, মেমসাহেব-গোছের হোমরা-চোমরা কিছু দেখবেন। খড়কে-ডুরে-পরা, ছিপছিপে-গড়ন ইনিই ডানা না কি! মুখখানি তো চমৎকার! নিতান্ত ছেলেমানুষও। খুব ভাল লেগে গেল।

"নমস্কার।"

সপ্রতিভভাবে নমস্কার করে ডানা এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো চিনতে পারছি না!"

"আমি বকুলবালা। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"কে আপনার স্বামী?"

বকুলবালা চণ্ডীর দিকে ফিরে বললেন, "বল্ না রে।"

"রূপচাঁদবাবু।"

"ও, রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী আপনি! আসুন, আসুন। আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। ওই দেখুন—"

বকুলবালা দোদুল্যমান সাপের খোলসটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"সব শুনেছি আমি। আনন্দবাবুর কাছে মই ছিল না। লোকটা ঘুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল। তার হাতে আপনি যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা চণ্ডী আমাকে পড়ে শোনালে। আমি নিজে লিখতে পড়তে কিছু জানি না, 'ক' অক্ষর গোমাংস যাকে বলে তাই। কিন্তু আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন তা শুনে এত ভাল লাগল যে, থাকতে পারলাম না, নিজেই চলে এলাম। সত্যিই তো, তুচ্ছ সব ব্যাপারের জন্যে পুরুষমানুষের সাহায্য কেন নিতে যাব আমরা? চলুন, দেখা যাক। ওরে, মইটা দে তো এইবার আমাকে।"

ডানাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বকুলবালা মইটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে গেলেন তালগাছটার কাছে। মইটা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর পেশীর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল ডানা। অনেক দিন আগে সার্কাসে এই রকম মেয়ে দেখেছিল সে। মইটা তালগাছে লাগিয়ে ডানার দিকে ফিরে বকুলবালা বললেন, "আসুন আপনি।"

বকুলবালার গাছকোমর বাঁধাই ছিল, মাথার খোঁপাটা এলিয়ে বেণীটা লুটিয়ে পড়েছিল পিঠের উপর। কৌতূহল ঝলমল করছিল চোখের দৃষ্টিতে। অদ্ভুত দৃশ্য! ডানা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে।

বকুলবালা হঠাৎ ডানার দিকে ফিরে অনেকটা যেন জবাবদিহি সুরে আবার বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, চাকরকে দিয়ে মই বইয়ে আনা কেন তবে, ও কি পুরুষমানুষ নয়? এর উত্তরে আমি বলব, ওদের মাইনে দিয়ে যখন রেখেছি তখন খাটিয়ে নেব বইকি। ওরা যখন থাকবে না, তখন নিজেরাই সব করব। কি বলেন? আসুন, সিঁড়ির নীচের দিকটা চেপে ধরুন, আমি উঠি।"

ডানা এগিয়ে গেল। বকুলবালার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যদিও প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু তাঁর সরল সপ্রতিভ আলাপে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল। রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী এমন চমৎকার মানুষ, অথচ আলাপ হয়নি এতদিন!

"বেশ জোরে চেপে ধরে থাকুন।"

"আপনি উঠছেন তো, কিন্তু সত্যিই যদি সাপ থাকে!"

"থাকলেই বা, কি করবে আমার! চণ্ডে, ওই বাখারিটা পড়ে আছে, আমায় দে তো। কিছু দূরে উঠে খোঁচা দিয়ে দেখব প্রথমে। সাপ থাকলে হয় ফোঁস করবে, না হয় বেরিয়ে পড়বে।"

চণ্ডী বাখারিটা এনে দিতে বকুলবালা তলোয়ার গোঁজার মতো কোমরে সেটা গুঁজে নিলেন। তারপর উঠতে লাগলেন। ডানা মইটা ধরে রইল শক্ত করে। আর্তকণ্ঠে চীৎকার

করতে লাগল শালিক পাখিরা। দু-একটা পাখি উড়ে এসে ঠোকরাবারও চেষ্টা করতে লাগল বকুলবালাকে। বকুলবালা কোমর থেকে বাখারিটা খুলে তলোয়ার-চালানোর ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে করতে উপরে উঠতে লাগলেন।

"আর বেশি উঠবেন না। এবার খোঁচা দিয়ে দেখুন, ভিতরে কিছু আছে কি না!"

বকুলবালা তর্ তর্ করে বেশ অনেকখানি উঠে পড়েছিলেন। পাখির বাসা তাঁর বাঁখারির নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তিনি সাপের খোলসটায় প্রথমে খোঁচা দিলেন, খোঁচা দিতেই পড়ে গেল সেটা। বাসার ভিতর খোঁচা দিলেন, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সোজা তিনি উঠে গেলেন এবং বাসার ভিতর উঁকি মেরে দেখলেন। ডানা সোৎসুকে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, বকুলবালা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তার দিকে প্রেরণ করে বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নেই। চারটি নীল রঙের ডিম রয়েছে। পেড়ে আনব?"

"না না, পাড়বেন কেন! বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাবে। আপনি নেবে আসুন?"

বকুলবালা অকম্পিত চরণে দ্রুতগতিতে নেবে এলেন।

"আচ্ছা, সাপের খোলসটা ওখানে গেল কি করে তা হলে?"

ডানা সমস্যাটার সমাধান করতে পারছিল না কিছুতে। বকুলবালা সমাধান করে দিলেন। বললেন, "ওই মুখপোড়ারাই নিয়ে গেছে হয়তো মুখে করে। কে শত্রু, কে বন্ধু, সে বোঝবার বুদ্ধি কি ওদের আছে! দেখুন না, আমাকেই তেড়ে তেড়ে ঠোকরাতে আসছে, অথচ আমি ওদের বাসা থেকে সাপ তাড়াতে যাচ্ছি। ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকলে ভাবনা ছিল কি!"

"চলুন, একটু চা খাওয়াই আপনাকে।"

"এ সময় কেউ আবার চা খায় না কি? চা খাব সেই পাঁচটায়, উনি আপিস থেকে ফিরে এলে।"

"তবু চলুন, বসবেন একটু।"

"তা বসছি একটু, চলুন।"

বকুলবালা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল ডানার টেবিলের উপর মোটা মোটা বই দেখে।

"এই সব আপনি পড়েন?"

"পড়ি মাঝে মাঝে। অমরেশবাবু দিয়ে গেছেন, পাখির বিষয়ে কিছু জানবার দরকার হলে উলটে-পালটে দেখি।"

"এতে সব পাখির কথা আছে না কি? সব পাখির বই?"

"হ্যাঁ। অনেক রকম পাখির ছবিও আছে, দেখুন না।"

"হলদে পাখির ছবি আছে?"

"হলদে রঙের পাখি তো অনেক আছে, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন?"

"বেনেবউ।"

"ও, বুঝেছি। খুব ভাল ছবি আছে, দেখাচ্ছি আপনাকে।"

ডানা ছবি বার করে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বকুলবালা। চণ্ডীও সমান উৎসাহে বইটা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু বকুলবালার ধমক খেয়ে ছেড়ে দিতে হল বেচারাকে।

"তুই ছাড়্ না, আমি আগে দেখে নিই তারপর তোকে দেখাচ্ছি। অমন আদেখলাপনা

করিস নেক? বাঃ, চমৎকার তো! ঠিক যেন জ্যান্ত পাখিটি ডালে বসে রয়েছে! এর একটা বাচ্চা পোষবার খুব শখ আমার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।"

ডানা বললে, "আমরা লোক বহাল করেছি সব রকম পাখির বাচ্চা সন্ধান করবার জন্যে। হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই দেব আপনাকে পাঠিয়ে।"

"দেবেন? সত্যি বলছেন? তিন সত্যি করুন।"

বকুলবালা উদ্ভাসিত চক্ষে ডানার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

এতটা ছেলেমানুষি ডানা প্রত্যাশা করেনি। সেও ছেলেমানুষের মতো হেসে ফেললে, হেসেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভও হল একটু।

"তিন সত্যি করবার দরকার কি? পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।"

বকুলবালার জেদ চড়ে গেল হঠাৎ।

"না, আপনি তিনবার বলুন—দেব দেব দেব। বলতেই হবে আপনাকে।"

বকুলবালার চোখের দিকে চেয়ে ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। শুধু তিন সত্যি করেই নিস্তার পেলে না সে, গায়ে হাত দিয়ে দিব্যিও করতে হল তাকে। আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে চোখ-মুখ ঝলমল করতে লাগল বকুলবালার।

"এবার যাই ভাই। ওঁর আসবার সময় হল আপিস থেকে, খাবার টাবার কিচ্ছু করা হয়নি এখনও। এই চণ্ডী, ওঠ্।"

চণ্ডী সবিস্ময়ে নানা রকম পাখির ছবি দেখছিল। কি অদ্ভুত সব পাখি।

"এটা কি পাখি?"

"ধনেশ।"

বকুলবালা খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

"ধনেশ আবার পাখির নাম হয় নাকি। ধনেশ বলতেই মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের ধনেশ ময়রাকে—মোটা কালো গোলগাল, দেখলেই মনে হত একটা তরমুজ বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলত, পানতোয়া খাবে? চল তা হলে দোকানে। আমি তাকে দেখলেই ছুটে পালাতাম। এ তো অদ্ভুত পাখি দেখছি, ঠোঁটের ওপর একটা আবের মতো রয়েছে।.....চণ্ডী, তুই উঠবি কি না বল্, না উঠিস তো আমি একাই চললাম।"

বকুলবালা চণ্ডীর সঙ্গে চলে গেলেন। ডানা একা বসে বসে বকুলবালার কথাই ভাবছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার মেয়েটিকে। অনিবার্যভাবে রূপচাঁদের কথাটাও তার মনে হচ্ছিল। ওই রকম প্যাঁচোয়া লোকের এত সরল স্ত্রী! এমন চমৎকার সহজ সরল স্বাস্থ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পেয়েও ওঁর এমন কাঙালপনা কেন? মনে হল, সহজ সরল বলেই হয়তো মনের মিল হয়নি। হাবভাবময়ী লীলাকুশলা হলে হয়তো পছন্দ হত। হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। ছুটতে ছুটতে বকুলবালাই এসে হাজির হলেন আবার।

"একটা কথা আপনাকে মানা করা হয়নি। ওঁর কাছে যেন ভুলেও কক্খনও বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"কেন?"

"ওরে বাবা! খেয়েই ফেলবেন তা হলে আমাকে। কোথাও যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।"

"হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই, তা হলে পাঠাব কি করে আপনাকে?"

"চণ্ডে আসবে নিতে। মাঝে মাঝে ও এসে খবর নিয়ে যাবে। এই চণ্ডে, ভুলিস না যেন।"

"না।"

চণ্ডী সাগ্রহে মাথা নেড়ে জানাল যে, কিছুতেই তার ভুল হবে না।

"চললুম। ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি।"

বকুলবালার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

"চললুম ভাই, তা হলে।"

"আসুন। মাঝে মাঝে আসবেন লুকিয়ে। আমি রূপচাঁদবাবুকে কিছু বলব না।"

"আচ্ছা, আসব। চণ্ডে, চল্, আমরা ওই বাগানটার ভেতর দিয়ে যাই। রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায়। রোদ পড়ে গেছে তো, লোক চলাচল শুরু হয়েছে।"

"বেশ, তাই চলুন।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা চলে গেলেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন আর একবার। তারপর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডানা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য মেয়েটি! বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন বাড়েনি। দেহটা যেন মনের ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, হাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে খেয়ালও নেই। একটু যেন ঈর্ষা হল। মনে হল, আধুনিকতার অতিসভ্য জটিল মানসিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের কারু-কলায় যার নিত্য নতুন রূপ বিকশিত, এই সরলতার কাছে হার মেনেছে। গাছের ফুলের কাছে কাগজের ফুল দাঁড়াতে পারে কখনও। অকারণ ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর মনে হল, পাখির পালক বিষয়ে যে প্রবন্ধটা সে ফেঁদেছিল, সেটা খানিকটা লেখা হয়ে পড়ে আছে। শালিক পাখির বাসাটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল, বকুলবালাকে নিয়ে কাটল আরও খানিকক্ষণ। এইবার পাখির পালক নিয়ে পড়া যাক। সময় কাটানোটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ফিরে পাখির পালক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অমরবাবু একগাদা বই দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অকুল পাথার। কিন্তু এ অকুল পাথারে কষ্ট হয় না, নব নব বিস্ময়ে ভরে ওঠে মন। সাপ যে সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত, সেই সরীসৃপই যে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে পরিণত হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, অথচ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেছেন। সরীসৃপের গায়ের আঁশই নাকি পালকের রূপ ধারণ করেছে! সরীসৃপ-পূর্বপুরুষদের আঁশ পাখিদের গায়ে এখনও বর্তমান, পাখিদের নখও নাকি আঁশ থেকে হয়েছে, কোন কোনও পাখির ঠোঁটও। এদের ঠোঁট নাকি খোলসও ছাড়ে বছরে বছরে সাপের মতো। এ সব কথা কল্পনাতীত ছিল তার, অথচ সবই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে-সরীসৃপ বুক দিয়ে মাটিতে হাঁটত, সে-ই ক্রমশ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মাথা করে হাঁটতে শিখল, তারপর লাফিয়ে গাছে চড়ল, তারপর উড়ল আকাশে। আকাশ পেরিয়ে আর কোথাও যাবে নাকি? কিংবা হয়তো গেছে, এখনও জানা যায়নি। আকাশচারী হয়ে এদের চঞ্চলতা তো বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঘ্রাণশক্তি নাকি কমেছে। তাই এরা দুর্গন্ধ স্থানে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, দুর্গন্ধ পোকামাকড়ও গিলে খায় স্বচ্ছন্দে। ঘ্রাণশক্তি কমে গিয়ে একটা বাধাই যেন অপসারিত

হয়েছে, জীবনকে আরও তীব্রভাবে উপভোগ করতে পারছে ওরা। বস্তুত পাখির মতো অমন স্বতস্ফূর্ত চঞ্চল প্রাণের প্রকাশ প্রকৃতির আর কোনও প্রাণীতে আছে কি? পাখির আসল পরিচয় ওর প্রাণলীলায়। যতক্ষণ জেগে থাকে স্থির থাকে না এক মুহূর্ত। নেচে গেয়ে লাফিয়ে উড়ে রঙের বাহার ছড়িয়ে ও যেন সর্বদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি শুধু বেঁচে নেই, আমি জীবনটাকে উপভোগ করছি। পালক ওদের এই অতিদ্রুত ছন্দ-মুখরিত বর্ণ-বিচিত্র জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। এই পালক ওদের গায়ের লেপ (ওদের পালক চুরি করে আমরাও লেপ তৈরি করি), এই পালক ওদের যানবাহনও, পালকের সাহায্যেই ওরা ওড়ে। এই পালকের সাহায্যে ওরা শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে পালকের রঙ বেমালুম ভাবে মিলিয়ে দিয়ে ওরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। জীবন্ত পাখিটাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, বুঝি ঝোপের ভিতর ওটা আলোছায়ার কারিকুরি—বনমুরগী নয়, কিংবা গঙ্গার চরে ওগুলো বালির ঢেউ—টিট্টিভ নয়। এছাড়া পালকের সাহায্যে ওরা প্রণয়লীলাও করে নানা রকম। পুরুষপাখি নানা বর্ণের পক্ষ বিস্তার করে আহ্বান জানায় প্রণয়িনীকে। প্রণয়িনীও সাড়া দেয় পালকের ইশারায়। অনেক পাখি পালক দিয়ে বাসাও তৈরি করে ডিম পাড়ার সময়। মোট কথা, পাখির জীবনে পালক অপরিহার্য, ওই ওদের ব্যক্তিত্ব। দু জাতের দু রকম পাখি, পালকের জন্যই দু রকম, পালক ছাড়িয়ে ফেললে কোনও তফাত থাকে না আর বিশেষ। পালকের রঙের বিষয়েও একটা আশ্চর্য কথা চোখে পড়ল তার। সাধারণত প্রাণীদের শরীর থেকেই রঙ তৈরি হয়। পাখিরও হয়। কিন্তু অনেক পাখির পালকের এমন গঠন-বৈচিত্র্য যে, সূর্যালোকই সেই পালকে পড়ে ভেঙে যায় এবং সূর্যালোক-ভাঙা রঙ তখন প্রতিফলিত হয় পালক থেকে। আকাশে যেমন আমরা রামধনুর রঙ দেখি, অনেকটা তেমনই; রঙটা আলোর, পালকের নয়; সব পাখির পালকে অবশ্য এমন আলোর লীলা হয় না, কোনো কোনো পাখির পালকের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ রকম হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর একটা কথা চোখে পড়ল। অদ্ভুত কথাটা। কোটি কোটি বৎসর ধরে পৃথিবীর জীবেরা নাকি বোবা ছিল, তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে অনেক পরে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে এখনও অনেকেই মূক। তাদের কণ্ঠে ভাষা নেই। তাদের অনেকে শব্দ করে বটে, কিন্তু তা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় না, হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। পতঙ্গরা শরীরের এক অংশ অন্য অংশে ঘর্ষণ করে শব্দ করে। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচরেরাই সর্বপ্রথমে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছিল। মত্ত দাদুরীরাই গান গেয়েছিল প্রথম এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রণয়িনীকে আহ্বান করা।

কবি এসে ঢুকলেন হুড়মুড় করে।

"মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

"কি?"

"সেই খুনের ব্যাপারটার তদ্বির করতে এখন ছুটতে হবে আমাকে সদর এস. ডি. ও.-র কাছে। কি বিপদ বল দিকি! অমরেশবাবু এক ভীষণ ঘানিতে জুড়ে দিলেন আমাকে দেখছি। তোমাকেও। তোমার জন্যও একটা দুঃসংবাদ এনেছি। একটা হুতোম প্যাঁচা কিছু খাচ্ছে না। মালীর ভার্সন অবশ্য, তুমি গিয়ে একটু দেখে এস। মালীটা বেশ মুটিয়েছে দেখলুম। প্যাঁচার বরাদ্দ 'কিমা'টা ও-ই খাচ্ছে কি না কে জানে!"

বলেই কবি নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডানার মুখের দিকে চেয়ে—রোদের তাতে ডানার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

"কি দেখছেন?"

"তোমাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে। এই নিদারুণ রোদে একটা অদ্ভুত রূপ ফুটেছে তোমার। দাঁড়াও।"

বসে পড়লেন টেবিলের ধারে এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

মরুভূমির তপ্ত বায়ে
গোলাপ ফোটে কাঁটার বনে
পথিক শুধু হারায় দিশা
অসম্ভবের আমন্ত্রণে
মরীচিকায় বয় নদী যে
স্বচ্ছধারা অলীক খাতে
কাঁটার বনে গোলাপ জাগে
পথিক-অলির প্রতীক্ষাতে।
লগ্ন জাগে কোন্ আকাশে
কোন্ বাঁশরীর কোন্ সুরে যে
বলতে পারে সেই কবি সে
কাছে থেকেও রয় দূরে যে।

কবিতাটা পড়ে ডানা বললে, "এটা কি হল?"

"হল একটা যা হোক কিছু। গোলাপের সঙ্গে প্রলাপ মেলাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পারলাম না। হাতে সময় নেই এখন। চললুম। তুমি প্যাঁচাটার খবর নিও একটু।"

কবি চলে গেলেন। ডানা ভ্রূকুঞ্চিত করে কবিতাটা পড়লে আর একবার। আনন্দ হল, ভয়ও হল। অদ্ভুত প্রকৃতির ভদ্রলোক। বাপের বয়সী, অথচ ছেলেমানুষের মতো মন। কোনও কুমতলব আছে বলে মনে হয় না, অথচ কেমন যেন.....

হুতোম প্যাঁচাটার খবর নেওয়ার জন্যই ডানা বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় বেরুতে হল বলে খারাপ লাগতে লাগল খুব। একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, অর্থাভাবে পড়েই এই সব করতে হচ্ছে। তারপর মনে হল, কবিও ওই কথাই বলেছিলেন। অর্থাভাব সকলকেই যেন ঘানি টানাচ্ছে, ঘানির চেহারাও নানারকম। অমরবাবুর কথা মনে হল। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পাখি সম্বন্ধে যে সব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না বলে অমরবাবুর মতো বড়লোকও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একদিন, মনে পড়ল। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা। সকলেরই টাকার দরকার, সকলেরই টাকার প্রতি লোভ।

কক্রিং—কক্রিং—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে; বাদামী রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখিটা আমগাছের ডালে দুলে দুলে ডাকছে। তারপর নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী আসছেন, তাঁর হাতে কি যেন একটা রয়েছে। কাছাকাছি হতে ডানা জিজ্ঞাসা করলে, "হাতে ওটা কি আপনার?"

"শাবল।"

"শাবল নিয়ে কি করবেন? ও, আপনার ওদিকের সেই খুঁটিটা পড়ে গেছে বুঝি? তা, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি কাল আমার চাকরটাকে পাঠিয়ে ঠিক করে দেব। আমাকে একটু খবর পাঠালেই হত, আমি আগেই করিয়ে দিতাম।"

সন্ন্যাসী কিছু না বলে মুচকে হাসলেন একটু। তারপর নিজের গন্তব্যপথে চলে গেলেন। ডানা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হল, এ লোকটি একেবারে স্বতন্ত্র। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না, নিজেকে নিয়েই আপন মনে আছেন ওই ভাঙা ঘরটাতে অথচ এঁকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। ডানার সমস্ত মনটা তো এঁকে ঘিরেই স্বপ্ন রচনা করছে। রূপচাঁদের লোলুপতা, কবির কবিত্ব, অমরেশবাবুর পক্ষীতত্ত্ব মাঝে মাঝে তার ভাল যে লাগেনি তা নয়, ওঁদের নিয়ে কিন্তু তার মন স্বপ্নরচনা করতে পারে না। ডানা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন পারে না? সামাজিক বাধা আছে বলে? কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হত তা হলে সে বাধা তো এই সন্ন্যাসীর বেলাতে আরও প্রবল। তা ছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের বাইরের আচরণেরই সম্পর্ক বেশি, মন তো স্বাধীন। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে যে জগৎ সে সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাইরের সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। না, কারণটা সামাজিক নয়, অন্য কিছু। খানিকক্ষণ পরে ডানার মনে হল, সন্ন্যাসীর চরিত্র রহস্যময় বলেই কি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে? কিন্তু তখনই আবার মনে হল, কিই বা এমন রহস্যময়! অস্পষ্ট তো কিছু নেই। সোজাসুজি সন্ন্যাসী, ভাঙা কুঁড়েতে আপন খেয়ালে থাকেন, ভিক্ষে করেন, ভজন করেন, কাছে গেলে আলাপ করেন, কোনো রকম বাজে ভড়ং নেই, আত্মগোপন করবার প্রয়াস সেই, তাক লাগিয়ে দেবার কসরৎ নেই। নিতান্তই সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক। ওঁর চেয়ে রূপচাঁদ ঢের বেশি রহস্যময়। কিন্তু রূপচাঁদকে ঘিরে মন স্বপ্ন রচনা করতে চায় না তো। কেন.....? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ডানা অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, মল্লিক মশাই যে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তা সে লক্ষ্যই করেনি।

"নমস্কার। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"নমস্কার। আমার কাছে? কেন, কিছু দরকার ছিল?"

"আনন্দবাবু শুনলাম আপনার বাসার দিকে এসেছেন, দরকারটা আমার তাঁর সঙ্গে। কোথায় তিনি?"

"আমার কাছে একটু আগে এসেছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা খুন হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও-র কাছে গেলেন।"

"এস. ডি. ও-র কাছে! সেখানে যাবার কিছু দরকারই ছিল না। রূপচাঁদবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। উনিই তো পুলিশ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। এই কথাটাই ওঁকে বলবার জন্যে আসছিলাম। আমার অবশ্য মাথাব্যথা হবার কথা নয়, ম্যানেজার এখন আমি নই, ম্যানেজার আনন্দবাবুই, কিন্তু ঘাঁৎঘোঁৎ ঠিক রপ্ত হয়নি তো ওঁর, তাই ভাবলাম—কথাটা ওঁকে বলে আসি। অমরবাবুর নিমক তো অনেক দিন ধরে খেয়েছি, ভাবলাম—যাতে ওঁদের একটু সুবিধা হয় সেটা করা আমার কর্তব্য। কর্তব্য নয়?"

কর্তব্য কি না তার উত্তর না দিয়ে ডানা বললে, "আচ্ছা, উনি এলে আমি বলব আপনার কথা!"

"বলবেন, নিশ্চয়ই বলবেন। রূপচাঁদবাবুকে আমি বলব। তবে আমি ডিটেল্‌স্ সব জানি না তো।"

"আচ্ছা।"

ডানা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

মল্লিক মশাই বললেন, "এই তাঁ-তাঁ রোদে চলেছেন কোথা?"

"পাখিগুলোর তদারক করতে। শুনলাম, একটা প্যাঁচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"একটি পাখিও বাঁচবে না। বনের পাখি কি অমন ভাবে রাখলে বাঁচে? আপনি বললেন, চিড়িয়াখায় বাঁচে কি করে তা হলে? চিড়িয়াখানায় কত রকম ব্যবস্থা, কত রকম তদারক, গবর্মেণ্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টই রয়েছে ওর জন্যে, তবু মরে যায়। আর আপনারা ভেবেছেন, মুন্সী আর গোটাকতক বদমাইস পাখিওলা আপনাদের চিড়িয়াখানা চালাবে! ছাগল দিয়ে বলদের কাজ হলে কি কেউ বলদ কিনত?"

"কিন্তু ওরা তো মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে।"

"টিয়া কটা আছে গুনে দেখেছেন?"

"না, গুনিনি। গোটা দুই মরে গেছে।"

"মরেনি। মুন্সী বিক্রি করেছে। একটা কিনেছে আমার ছেলে আর কিনেছে চণ্ডী—রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে যে ছোঁড়াটা।"

ডানা অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি?"

"আরও শুনবেন? পাখিদের যে ছোলা, ফল, মাংস, মাছ আপনারা কিনে দেন, তা কি ওদের দেয় ওরা? কিচ্ছু দেয় না, বিক্রি করে।"

"তাই নাকি?"

ডানার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মনে হল, অপরাধ তারই। অমরবাবু তার উপরেই বিশ্বাস করে পাখি রেখে গেছেন, তারই উচিত সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ানো। মুন্সীটা এত চোর! এ কথা ভাবতেই পারেনি সে। যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হয় তাকে।

"এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছেন, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে যে! আমার ছাতাটা নিয়ে যান না হয়।"

"না, থাক্। রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে।"

আর কোনও কথা না বলে ডানা হন হন করে এগিয়ে গেল। মল্লিকমশাই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর মাথা নাড়লেন। মুখে একটা বিচিত্র হাসিও ফুটে উঠল তাঁর।

।। তিন ।।

এক লোলুপ ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার সামনে রক্ত-চর্চিত মেদ-মণ্ডিত একটা মাংসের প্রকাণ্ড টুকরো ঝুলছে আর সেটা না পেয়ে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে

মরছে—ঠিক এ উপমা রূপচাঁদের সম্বন্ধে খাটবে না। মনে মনে তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরছিলেন ঠিকই, ডানা এখনও তাঁর নাগালের বাইরে আছে—এ কথাও মিথ্যা, তাঁর একাধিক চাল ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করেছেন। কিন্তু খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরবার লোক তিনি নন। খাঁচার অস্তিত্বই ছিল না তাঁর কল্পনায়। এ ধরনের আজগুবি রূপকে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি একটু নির্লিপ্ত হয়ে ক্রেতা রূপচাঁদের কৃপণতাটা উপভোগ করছিলেন। ঠিক কত দাম দিলে যে মালটা পাওয়া যাবে তা বেচারা নির্ণয় করতে পারছে না কিছুতে। বহুকাল আগে রূপচাঁদ একবার নিলামে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। একটা কাশ্মীরী শাল খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পঞ্চাশ থেকে শুরু করে ডাক দেড় শো পর্যন্ত উঠল, হেঁকে দিলেন তিন শো। প্রতিপক্ষ আবার দশ বাড়ালেন—তিন শো দশ টাকায় লোকটি আর একটু হলে নিয়ে নিয়েছিলেন শালটা। রূপচাঁদ হাঁকলেন পাঁচ শো। প্রতিপক্ষ আর বাড়তে সাহস করলেন না। রূপচাঁদ শালটা কিনে নিলেন। দমকা অত টাকা খরচ করে তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল কিছুদিন; কিন্তু তাঁর জন্যে তাঁর মনোকষ্ট হয়নি, ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ করে তিনি প্রীতই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ডানাও নিলামে চড়েছে। ঠিক কত দাম হাঁকলে যে তাকে পাওয়া যাবে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রতিপক্ষ অমরেশ ও আনন্দমোহন যে কত দাম হেঁকেছে তাও ঠাহর করতে পারছিলেন না তিনি। সেটা জানতে পারলে সুবিধা হত। তবে আর একটা কথাও অবশ্য ঠিক যে, রূপচাঁদ নিছক ক্রেতাও নন। তিনি আর্টিস্টও। অতসী কাচের ভিতর দিয়ে যে কোনও মুহূর্তে রামধনু দেখতে পাওয়া যায় বলেই অতসী কাচের প্রতি তাঁর লোভ। লোভের সঙ্গে রামধনুর স্বপ্নটা জড়িয়ে থাকাতে লোভটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু একটু বিশেষত্ব লাভও করেছে। কারণ লোভটা কাচের প্রতি নয়, আকাশচারী রামধনুর প্রতি। নারীমাংস বাজারে অপ্রতুল নয়। প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর ছাগমাংসও যেমন বাজারে বিক্রি হয়, নারী মাংসও হয়। কিন্তু তার প্রতি লোভ নেই রূপচাঁদের। তারা সুলভ বলে নয়, তাদের সংস্পর্শে এসে স্বপ্ন জাগে না বলে। নিতান্তই খেলো কাচ তারা—কেউ রঙিন, কেউ সাদা, কেউ পাতলা, কেউ পুরু, কিন্তু অতসী কাচের বিশেষত্ব নেই তাদের। আলোকে তারা রামধনু করতে পারে না ডানা পারে। ডানা কাচও নয় ঠিক, দামী হীরের টুকরো। যখনই ডানার সান্নিধ্যে এসেছেন তখনই এটা অনুভব করেছেন তিনি। ওর চোখে শুধু দৃষ্টি নেই—মদিরাও আছে, ওর রূপ শুধু দেহেই নিবদ্ধ নয়—দেহাতীত রূপকথালোকে নিয়ে যাবার শক্তি আছে তার। ওর কাছে গেলেই মনে হয়, বয়স কমে গেছে, দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে মন থেকে, কোনও কিছুর জন্যেই কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আর যেন। মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা ভূমিকা রচনা করবার জন্যেই মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন তিনি ডানার কাছে। তার কাছে যাবার একটা অজুহাত চাই তো! মল্লিককে সেই অজুহাতের পটভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মল্লিকও সানন্দে রাজি হয়েছিল। ডানাকে, আনন্দবাবুকে, অমরেশবাবুর চিড়িয়াখানাকে, জমিদারকে ছারখার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। এই মাগীকে (অর্থাৎ অমরেশ গৃহিণী রত্নপ্রভা দেবীকে) দেখিয়ে দিতে হবে যে, মল্লিক ছাড়া তাঁদের এখানকার জমিদারি অচল। রূপচাঁদ অধীরচিত্তে মল্লিকের আগমন

প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে বাদামী-কালো পাখিটা ডেকে উঠল—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

কয়েক সেকেন্ড পরে আর একটু দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিলে—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের।

।। চার ।।

সমস্ত দিন 'লু' চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু হাওয়ার তাপ কমেনি। ঘরের বাইরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট চেয়ার বার করে ডানা বসে ছিল চুপ করে! জাহাজে আসবার সময় ইঞ্জিনের কাছাকাছি বসলে যেমন মনে হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল তার। জাহাজের কথা মনে হওয়াতে বর্মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মা-বাবা-ভাইটির কথা। মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর কথা। নিজের মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপন ছিল, আজ তাদের কথা ক্বচিৎ মনে পড়ে। যখন পড়ে তখনও ওদের খুব আপন বলে মনে হয় না, মনে হয় ওরা যেন অন্য জগতের লোক, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা মানতে হয় যেন নীতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। মৃত্যু ছিন্ন করে দিয়েছে অন্তরের যোগ। এখন তার কাছে ঢের বেশী আপন অমরেশবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু (হ্যাঁ, রূপচাঁদের বর্বরোচিত লোলুপতাই যেন বেশী আপন করেছে তাকে), আর ওই ভগ্নকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। রত্নপ্রভাকেও খুব ভাল লেগেছে তার। শ্রদ্ধা হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু সত্যিকার ভাল লেগেছে বকুলবালাকে। মন্দাকিনীর কথা শুনেছে সে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয়নি, তবু তিনি আনন্দমোহনবাবুর স্ত্রী—এই পরিচয়টুকুই যেন ওই অচেনা মানুষটিকে আপন করেছে। নিজের লোক পর হয়ে যায়, পরলোক আপন হয়ে ওঠে মনের কি রহস্যময় নিয়মে, কে জানে! যারা চোখের সামনে সদাসর্বদা ঘোরাঘুরি করে, তারা যে সব সময় মনের মতন হয় তা নয়, কিন্তু আপন হয়। মনের মতন লোকও দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে আর আপন থাকে না। ইংরাজীতে প্রবচনই আছে—আউট অব সাইট আউট অব মাইন্ড। ডানার মনে হল, দৃষ্টিটা শুধু চোখের না বলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বললে যেন আরও ভাল হত। যা যতক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তা ততক্ষণ আমার আপন, ভাল হোক মন্দ হোক তা ততক্ষণ আমার অধিকারভুক্ত, যেন আমার আপন সম্পত্তি, তাই তার সম্বন্ধে মমত্ববোধ প্রবল। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল চিন্তার। মনে হল ওই সন্ন্যাসী হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে পারবেন। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। সন্ন্যাসীর কাছে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে সে যেন বর্তে গেল মনে মনে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিনা কারণে বার বার ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হয় নিজের কাছেই। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে গেল সে। মনে হল সন্ন্যাসী হয়তো ভাববেন যে, মিছিমিছি একটা অজুহাত সৃষ্টি করে তাঁর কাছে গিয়েছে সে। একদিন স্পষ্টই যখন বলেছিলেন যে নারীর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ ত্যাজ্য, তখন এমন

ভাবে সেখানে যাওয়া কি উচিত? ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তার কানে অদ্ভুত শব্দ এল একটা। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিরররর....। টুক্ টুক্ টুব্ টুক্ টুকিরররর....। ঠিক মনে হল একটা মারবেল যেন পাকা শানের মেঝেতে পড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর গড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল ডানার। মনে হল কোথায় যেন পড়েছে এই রকম ধরনের কি একটা। ঘরে ফিরে এল, আলো জ্বেলে হুইস্‌লারের বইটা ওলটাতে লাগল। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। নাইট্‌জার নামক নিশাচর পাখির ডাক ঠিক ওই রকম। হুইস্‌লার লিখেছেন—resembling the sound of a stone skimming over the surface of a frozen pond....নাইট্‌জারের কয়েকটা হিন্দী নামও অমরবাবু লিখে রেখেছেন ডানার চোখে পড়ল। চিপ্‌পাক, ডাবচুরী, ডাভাক্। একটা নামও পছন্দ হল না তার। যে কখানা বই অমরবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন, সবগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল সে। পাখিটার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় মুখ, বড় বড় পোকা টপটপ করে গিলে ফেলতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এর যা নাম, তার বাংলা হচ্ছে 'ব্যাঙপাখি' মন্দ না নামটা। পাখিটার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ওতে। পঠিতব্য যা কিছু ছিল সব পড়ে ফেলে ডানা টর্চ আর অমরবাবুর দেওয়া বাইনাকুলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। পাখিটাকে দেখতে হবে। শুকনো নদীর খালের কাছে কাছে যেদিকে ঝোপঝাপ আছে, সেই দিকেই এগুতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে গেল। কোনও সাড়া শব্দ নেই। অনিশ্চিতভাবে কতক্ষণ অগ্রসর হবে? কাছেই একটা উঁচু ঢিপির মতন ছিল। তারই উপরে উঠে বসল। ব্যাঙপাখি কাছাকাছি যদি থাকে কোথাও সাড়া পাওয়া যাবে ঠিক। অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কিন্তু ব্যাঙপাখির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডানা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দু-একটা নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে। মেঘ নয়, ধুলো! প্যাঁচার চোখটা মনে পড়ল, অমন স্বচ্ছ চোখ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল মরবার আগে। কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না পাখিটাকে।

চ্যুইস্—

ঠিক মাথার উপর লম্বা-ডানা পাখি উড়ে গেল একটা। ব্যাঙপাখিই বোধ হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। একটু পরেই আবার শুরু হল একটু দূর থেকে—

টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিরররর.,....

মনে হল যেন ব্যঙ্গ করছে। নাগালের বাইরে চলে গিয়ে খুক খুক করে হাসছে যেন দুষ্টু ছেলের মতো। ওদের স্বভাবটাই এই ধরনের। সারাজীবন ধরে যেন লুকোচুরি খেলছে সকলের সঙ্গে। দিনের আলোয় পারতপক্ষে বেরোয় না। দিনের বেলা পারিপার্শ্বিকের রঙের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে দেয় নিজেকে যে, দেখাই যায় না। বাদামী, পাঁশুটে, সাদা আর কালোর বিস্ময়কর সমন্বয়। একটু পরে আর একটা পাখি ডাকল, তারপর আর একটা, তার পর আর একটা। অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঐকতান শুরু হয়ে গেল। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। অজানা কোনো এক জগৎ থেকে ভেসে আসছে যেন আনন্দ-কলরবের প্রতিধ্বনি, একদল ছেলে মার্বেল খেলছে, না হাসছে...?

হঠাৎ নজরে পড়ল, একজন কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর শুনতে পেল, গানও করছে গুন গুন করে। টর্চ জ্বালতেই বুঝতে পারল, সন্ন্যাসীই আসছেন। উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী তার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে।

"কোথা যাচ্ছেন অন্ধকারে?"—ডানা প্রশ্নটা না করে পারল না।

"ওই বালির চরে যাচ্ছি।"

"ওখানে এত রাত্রে?"

"ওখানেই রাত কাটাব।"

"ওই চরে? একা?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "প্রায়ই তো ওখানে রাত কাটাই।"

"একা ভয় করে না আপনার?"

"একা তো থাকি না। আরও অনেকে থাকে।"

"আর কারা থাকে?"

"এক ঝাঁক টিট্টিভ, কীটপতঙ্গ, একটা প্রকাণ্ড সাপকেও দেখি মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আকাশভরা নক্ষত্র, চাঁদ—একা থাকবার কি জো আছে!"

ডানার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে উঠল।

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে!"

"তা বেশ, এসো একদিন। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আমি যা পাই তা পাবে না।"

"কেন?"

"কেউ কাছে থাকলে অনিবার্যভাবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে হয়। মনের খানিকটা তাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, আর তা থাকলেই অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির মৃদু সাড়া শোনা যায় না। বেশ, এসো একদিন। আমি চলি এখন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় চরের দিকে অগ্রসর হলেন।

"অন্ধকারে যাচ্ছেন, টর্চটা নেবেন?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ। টর্চ দরকার হবে না।"

সন্ন্যাসী চলে গেলেন। ডানা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু হল দূর—টুক্‌-টুক্‌-টুক্‌-টুক্‌—টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌—টুক্‌ টুব্‌ টুক্‌ টক্‌রররর.....

সমস্ত দিনের 'লু' যে ধুলোকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল তা বোধ হয় নেমে আসছিল আবার মাটির দিকে। যে আকাশ একটু ঘোলাটে হয়েছিল তা স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমশ। নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে দু-একটা। পূর্বদিগন্তেও আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। দিন দুই আগেই পূর্ণিমা গেছে, একটু পরেই চাঁদ উঠবে তারই আয়োজন হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। আকাশের দিকে চেয়ে যে কথাটা তার প্রথমেই মনে হয়েছিল, তারই একটা নতুন তাৎপর্য নতুন আলোকে যেন তার মনে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রবল ঝঞ্ঝা যে ধুলোকে সবেগে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল, যার প্রাবল্যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, একটু আগে পর্যন্ত যা নক্ষত্রদেরও ঢেকে ফেলেছিল, সে ধুলো আবার মাটিতে

নেবে আসছে। আকাশে থাকতে পারল না তারা। আকাশের চিরন্তন অধিবাসীদের কোনো ক্ষতিও করতে পারল না। নক্ষত্ররা যেমন ছিল তেমনই আছে, ধুলোরাই নেবে আসছে। জোর করে কিছু করা যায় না। কুকুরকে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না। সহসা আর একটা কথাও মন হল তার সঙ্গে সঙ্গে। ধুলোরা আকাশে বেমানান, কিন্তু মাটিতে তাদের গৌরব। মাটির আসনেই তাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত। যথাস্থানে তাদের মহিমা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারা আকাশে যেতেও চায় না, ঝড়ে তাদের ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত করে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ডানার মনে হল, মানব-সমাজেও এই ঝড় মাঝে মাঝে এসে সমস্ত বিশৃঙ্খল করে দেয়। তার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। তারপর মনে হল তার নিজের স্থান কোথায়? সে নামছে, না, উঠছে? প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ নামা-ওঠার মানদণ্ডটা ঠিক জানা নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা উন্নতি বলে মনে হয়, সত্যি তা কি উন্নতি? কে বেশি উন্নত—ওই সন্ন্যাসী, না অমরবাবু? কল্পনাবিলাসী কবি কথায় কথায় ছন্দ মিলিয়ে কবিতা রচনা করতে পারেন বলেই কি উন্নত বলতে হবে তাঁকে? সংসারের সাধারণ বিচারে রূপচাঁদবাবুও তো মন্দ লোক নন। জীবনটাকে তিনি নিজের পছন্দ অনুসারে উপভোগ করতে চান। কে না চায়? কিন্তু রূপচাঁদবাবুকে উন্নত মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলবে কি! সে নিজেই বা কি! বাল্যকাল থেকে নিষ্ঠাভরে নিজের পানের চুনটি আগলানো ছাড়া আর কিই-বা সে করেছে! তার লেখাপড়া, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিবিধ আচরণ একটা মাত্র যে জিনিসের উদ্দেশ্যে বিকশিত হয়েছে, সংক্ষেপে তার নাম আত্মবিনোদন। বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ সকলেই আত্মবিনোদনের জন্য ব্যস্ত, প্রত্যেকের পথ শুধু আলাদা। ওই সন্ন্যাসী? তিনিও কি আত্মবিনোদন নিয়েই আছেন!

"টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ররররর..."

আবার শুরু হয়ে গেল 'নাইট্জার'দের ঐকতান। পূর্বদিগন্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত হয়ে উঠল ক্রমশ। চাঁদ উঠল। নদীর চরটা স্পষ্ট হয়ে এল। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল ডানা। তার মনে হতে লাগল একটা সত্য যেন অস্পষ্টভাবে আভাসিত হচ্ছে তার মনের দিগন্তে। কিন্তু কি তার রূপ?

অনেকক্ষণ পরে ডানা যখন তার নিজের বাসায় ফিরে এল তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে, বারান্দায় উপবিষ্ট রূপচাঁদকে দেখতেই পায়নি প্রথমে। বারান্দায় চন্দ্রালোকে চেয়ারের উপর যে একজন লোক বসে আছে তাই নজরে পড়েনি তার। খুব কাছাকাছি এসে তাই সে চমকে উঠল রূপচাঁদের কথা শুনে।

"অনেকক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ।"

ডানার মনে হল, রূপচাঁদ সহসা আবির্ভূত হলেন যেন। তিনি এতক্ষণ যেন অদৃশ্যভাবে ওৎ পেতে ছিলেন, যাদুমন্ত্রবলে কায়া পরিগ্রহ করলেন সহসা। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক বলে মনে হল যে, চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল সে কিছুক্ষণের জন্য।

"আপনি!"

"হ্যাঁ গো আমিই। অনেকক্ষণ থেকে বসে মশার কামড় ভোগ করছি। এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেললুম প্রায়। কোথা ছিলে বল তো?

"গঙ্গার ধারে বসে ছিলাম।"

"একা?"

"হ্যাঁ, একা বসে নাইট্‌জারের গান শুনছিলাম।"

"নাইট্‌জারটা কি ব্যাপার। মানুষ, না আর কিছু?"

"নিশাচর পাখি একরকম। আপনি এ সময়ে যে?"

ডানার মানসিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে এল আবার।

"নিশাচর পাখি সম্বন্ধে মোহ আছে নাকি। শুনে সুখী হলাম। আমিও নিশাচর কি না! আমি এসেছি একটা জরুরী দরকারে। অমরেশবাবুর জমিদারিতে যে খুনটা হয়ে গেছে সেটা সহজে মিটবে বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশ অমরেশের ম্যানেজারকে আসামী বলে সন্দেহ করছে। যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট করতে পারে। আনন্দমোহনকে একটু সাবধান করে দিতে এলাম। ওর এখন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। ওর বাড়িতে ওকে পেলাম না, ঠাকুরটা অদ্ভুত বাংলায় বললে 'ডেনা মাইজির কাসে গিয়েসেন।' এখানে এসে দেখি, এখানেও কেউ নেই। আনন্দ কি এসেছিল বিকেলে?"

"এসেছিলেন। এসেই চলে গেলেন সদরে। বললেন, ওই খুনের মামলা সম্পর্কেই এস. ডি. ও.-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"সদরে গেছে না কি! সেরেছে! তা হলে তো এতক্ষণ পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেছে সে। কি মুশকিল! এই কবিগুলোর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে! উঠি।"

চিন্তিতভাবে উঠে পড়লেন রূপচাঁদ। তাঁর ভয় হচ্ছিল, অভিনয়টা তিনি ঠিকভাবে করতে পারছেন কি না! ডানাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। খবরটা শুনে সত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

"পুলিশ তাঁকে অ্যারেস্ট করেছে নাকি!"

"করাই সম্ভব। এস. পি. দারোগাকে যে রকম কড়া হুকুম দিয়েছে, তাতে তাই তো মনে হয়।"

"কে খুন হয়েছে?"

"একটি স্ত্রীলোক"

"স্ত্রীলোক? তার সঙ্গে আনন্দবাবুর সম্পর্ক কি?"

"তা কি করে বলব বল? কার সঙ্গে কোথা দিয়ে কার যে কি সম্পর্ক থাকে বলা শক্ত। পুলিশ আর আদালতে সেটা নির্ণয় করবে। আনন্দমোহনের সই-করা একটি চিঠি নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির ঘরে।"

"কি চিঠি?"

"নোটিশ একটা। মেয়েটি বিধবা এবং যুবতী। তার কিছু জমি আছে এঁদের জমিদারিতে। খাজনা বাকি অনেক দিনের। তাই সম্ভবত ম্যানেজার হিসাবে আনন্দমোহন বাকি খাজনার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু কবি কিনা, তাই নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছে—নোটিশের ভাষাটা স্বভাবতই রুক্ষ, কিছু মনে করো না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল, যদি চাও তো খাজনা কিছু মাপও করে দিতে পারি। এই চিঠি পাওয়ার দু দিন পরেই তার রক্তাক্ত লাশ পুকুরধারে আবিষ্কার করেছে পুলিশ। তারপর তার ঘর থেকে বেরিয়েছে ওই চিঠি। পুলিশ সন্দেহ করছে নানারকম। আমি উঠি। খবরটা পেলে তোমাকে জানিয়ে যাব।"

রূপচাঁদ বাইক এনেছিলেন। মুচকি হেসে বাইক চড়ে চলে গেলেন।

অনেক রাত্রে বাইকের ঘণ্টার ঝঞ্ঝানায় ঘুম ভেঙে গেল ডানার। বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসেই রইল। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি যে অবস্থাটা মানুষকে অসহায় করে ফেলে, কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে বসে রইল ডানা। বাইকের ঘণ্টার শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। ঝিল্লীধ্বনিতে রূপান্তরিত হল যেন। তারপর পদশব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়।

"ডানা, ডানা—"

রূপচাঁদবাবুর গলা।

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল ডানা। পিছনের ঘরে চাকরটা থাকে, তাকে উঠিয়ে দিলে।

"দেখ্ তো, বাইরে কে ডাকছে।"

চাকরকে দেখে রূপচাঁদ হতাশ হলেন একটু, কিন্তু সপ্রতিভভাবে বললেন, "মাইজি কোথা? তাঁকে ডাক্, জরুরী দরকার আছে।"

ডানা বেরিয়ে এল।

"আনন্দবাবুর খবর পেলেন কিছু?"

"পেয়েছি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে, 'বেল' দেয়নি।"

"কোথায় তিনি এখন?"

"জেলে।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তার দিকে, সেই দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা মেরে সম্বিত ফিরিয়ে দিলে তার।

"কি উপায় করা যায় তা হলে এখন?"

"সেইটে ঠিক করবার জন্যেই তো এলাম এত রাত্রে। কাল আমার আপিসের নানান ঝামেলা, সময় পাব না। চল, বসা যাক কোথাও। চা খাওয়াতে পারবে কি একটু? এই, জগন্নাথের দোকান চিনিস? তাকে উঠিয়ে আমার জন্য এক প্যাকেট কাঁইচি নিয়ে আয় তো। আমার নাম করলেই দেবে।"

পকেট থেকে পয়সা বার করে চাকরটাকে দিলেন তিনি। চাকরটা চলে যাচ্ছিল। ডানা তাকে থামিয়ে বললে, "শোন্। আমাদের নায়েব মশাইকেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

ঘরের কোণে যে কমানো লণ্ঠনটা ছিল সেটা উস্কে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে সে, তারপর চিঠির প্যাডটা টেনে লিখলে—

হরসুন্দরবাবু,

এইমাত্র রূপচাঁদবাবু খবর এনেছেন যে, আনন্দমোহনবাবুকে নাকি পুলিসে ধরেছে। রূপচাঁদবাবু এখানে বসে আছেন। আপনি অবিলম্বে চলে আসুন।

ইতি—ডানা

চাকরটা চিঠি নিয়ে চলে গেল।

রূপচাঁদ বললেন, "অত ব্যস্ত হয়ো না। হরসুন্দরকে বৃথা ডেকে পাঠালে। হাত কচলানো ছাড়া আর কি করবে ও?"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে চায়ের টেবিলে দাঁড়িয়ে সে স্টোভটা জ্বালাতে গেল। স্পিরিটের স্বচ্ছ নীল শিখাটার দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ চমকে দেখলে রূপচাঁদ তার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছেন তিনি, তা ডানা বুঝতে পারেনি। তার সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। খুব ধীরভাবেই কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে দিলে, খুব সংযতকণ্ঠেই বললে, "এ সব কি?" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রূপচাঁদ বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে ফেললেন একটা। হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আত্মসম্বরণ করতে পারিনি। মাপ কর আমাকে।"

"ছি ছি, কি করছেন আপনি উঠুন।"

"বল, আমাকে মাপ করেছ?"

"যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সে-ই মাপ করতে পারে। আমার কাছে মাপ চেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কেন? আপনিই বরং মাপ করুন. আমি অসহায়।"

রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "আমার কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারছি না ঠিক। একটু যদি ভেবে দেখ—একটু যদি অনুকম্পাসহকারে ভেবে দেখ—তা হলেই বুঝতে পাবরে, সবচেয়ে অসহায় আমি। বাঘ বা সিংহের কবলে পড়ে লোকে যেমন ছটফট করে. আমিও তেমনিই একটা হিংস্র আবেগের কবলে পড়ে ছটফট করছি। তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারে না।"

ডানার নারীত্ব হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হল এ কথা শুনে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হল সে। সত্যিই তো লোকটাকে সে মারতে কিংবা বাঁচাতে পারে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নির্দেশে বাঁদরের মতো নাচাতেও পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। ঠিক এই ঘটনাটা যদি কোনো আধুনিক বিদেশী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মূর্ত হত. কি করতেন তিনি! যা করতেন তা ডানার অবিদিত নেই, রূপচাঁদবাবুরও নেই সম্ভবত, তাই তিনি নাটকীয় ঢঙ করে ব্যাপারটাকে সেই সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ উনি ধরে নিয়েছেন (এবং আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা এবং বিজ্ঞানীরা ওঁর এই ধারণাটাকে সমর্থনও করেছেন) যে, নারীকে পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিতে হবেই—ওইটেই তার সহজাত প্রবণতা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, এক কথায় আধুনিক. সমস্ত চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সতীত্ব বা সংযমের, শ্লীলতার বা শালীনতার কোনো মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয় যেন! যে যত বেপরোয়াভাবে উলঙ্গ হতে পারবে সে তত আধুনিক, সে তত আর্টিস্টিক। নারী মানেই পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধন, অন্য রকম কিছু হলেই যেন সে বেমানান। তাকে নানা রঙে রঞ্জিত হতে হবে, নানা ঢঙে সজ্জিত হতে হবে—ওই একই উদ্দেশ্যে। বিদ্যুদ্বেগে কথাগুলো মনে হল তার, নিমেষে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যে উদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে বরপ্রদা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছিল, এই নতুন আলোক সেই উদ্বুদ্ধ নারীত্ব কামাতুরা কুক্কুরীর রিরংসারই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হল তার।

"আপনি এ ছাড়া যদি অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে না পারেন, তা হলে আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে।"

"অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করা কি সম্ভব এখন?"

"চললুম তা হলে।"

রূপচাঁদবাবুর বাইকটা পাশেই ঠেসানো ছিল। ডানা হঠাৎ সেইটেতে চড়েই বেরিয়ে গেল। বিস্মিত রূপচাঁদ তার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পর মুহূর্তেই তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কোথায় গেল ও? কোথায় যাওয়া সম্ভব? মাথা হেঁট করে ভাবলেন একটু। তারপর ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। ঘড়ি দেখলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন পায়ের পাতাটা। ঠিক করলেন, অপেক্ষাই করবেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ডানা চা তৈরি করছিল। উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। আবার স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করলেন। দু কাপ করলেন! এক কাপ নিজে খেলেন, আর এক কাপ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িটা দেখলেন আবার। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনও ফিরল না? ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হল। বাইরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আবার। আবার পায়ের তলাটা নাচাতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর আবার পায়চারি শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। কোথায় গেছে ডানা? মনে হল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন অন্ধকারে। বেশিদূর যেতে হল না। দেখলেন, তাঁর বাইকটা একটা গাছে ঠেসানো রয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হরসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলেন, ডানাও তার সঙ্গে কথা কইতে কুইতে আসছে। রূপচাঁদের দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে হেসে ডানা বললে, 'খবরটা পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম হরসুন্দরবাবুর কাছে। ভাগ্যে গিয়েছিলাম। উনি বাড়ি ছিলেন না। চাকরটা এই খবর নিয়ে ফিরে আসছিল।. আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, উনি সিংহি মশায়ের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন, সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলাম ওঁকে। আমি ওঁকে এখনই সদরে চলে যেতে বলছি—"

হরসুন্দরবাবু বিপন্ন মুখে রূপচাঁদের দিকে চাইলেন।

বললেন, "এখন গিয়ে লাভ কি। কাল সকালের ট্রেনেই যাব না হয়। এখন গিয়ে কারু সঙ্গে দেখা হবে কি?"

ডানা উত্তেজিত হয়েছিল। বললে, "জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—কটায় ট্রেন?"

হরসুন্দর আরও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

"কটায় ট্রেন বলুন না?"

রূপচাঁদ এতক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করে চেয়ে ছিলেন।

বললেন, "আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তুমি যদি যাও, সঙ্গে সঙ্গে 'বেল' দিয়ে দেবেন। তবে ট্রেনে গিয়ে সুবিধে হবে না, যদি বল রামেশ্বর বাবুর মোটরটা যোগাড় করি। অনুরোধ করলে এখনই পাঠিয়ে দেবেন। হরসুন্দরবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া

কেন? আমিই চল না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আজ তো আর তাকে ছাড়বে না।"

ডানা বললে, "বেশ, কাল সকালেই যাব তা হলে। হরসুন্দরবাবুর সঙ্গেই যাব। আপনার তো আপিস আছে।"

রূপচাঁদ বললেন, "তা আছে। তবে দরকার হলে ছুটিও নেওয়া যায়। কাল দিনের ট্রেনে যদি যাও, আমার অবশ্য যাওয়ার দরকারই হবে না। আমি বরং এস. পি. কে বলব একবার।"

"তা হলে তাই ঠিক রইল। চলুন হরসুন্দরবাবু, আপনার গিন্নী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফুলুরি ভাজা খাওয়ার জন্যে। রাতের খাওয়াটা আপনার ওখানেই সারব আজ।"

"চলুন চলুন। বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।"

হরসুন্দরের মুখের বিপন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রূপচাঁদকে নমস্কার করে তিনি চলে গেলেন। রূপচাঁদ তাদের প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

।। পাঁচ ।।

হরসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে ডানা যখন বেরুল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হরসুন্দরবাবু একটা চাকর আর একটা টর্চ সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিছুদূর এসে ডানা চাকরটাকে বললেন, 'তুমি শোও গে যাও। টর্চটা সঙ্গে থাকলেই আমি চলে যেতে পারব।" চাকর চলে গেল। ডানা টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল, অর্থাৎ চিন্তা করতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়। হঠাৎ ঠিক করলে, নিজের বাসাতেই ফিরে যাবে। রূপচাঁদবাবুর ভয়ে গৃহত্যাগী হতে হবে নাকি। দেখাই যাক না ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর। ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন হতাশ হল একটু। মনের নিভৃত প্রদেশে কে যেন আশা করে বসেছিল যে, রূপচাঁদবাবু তার অপেক্ষায় এখনও অধীরভাবে পায়চারি করছেন মাঠে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে চাকরটা উঠে বসল।

"রূপচাঁদবাবুর চাকর এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ বসে ছিল, এই একটু আগেই চলে গেল।"

খামটা নিয়ে ডানা ঘরে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনটা উসকে চিঠিটা হাতে করে বসে রইল খানিকক্ষণ। কি লিখেছেন ভদ্রলোক! যা লেখা সম্ভব তা তার অজানা নেই...হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে কথাটা সন্ন্যাসী বলেছেন। হাসিমুখেই বলেছিলেন—ওই রূপচাঁদবাবুর লালসা তোমার মনকে ও প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করেনি, আতঙ্কিত করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা ওঁর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশী হতে.....।

খামটা ছিঁড়তেই কয়েকখানা নোট বেরিয়ে পড়ল, আর এক টুকরো কাগজ। রূপচাঁদবাবুর লিখেছেন—

ডানা,

একটু আগে ঠিক করেছিলাম, তুমি না ডাকলে আর তোমার কাছে যাব না। সে সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে হল। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে তুমি সদরে যাবে আনন্দমোহনের 'বেল' নেবার জন্যে। তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি জানি পুলিশ সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা জিনিসটা দরকারি, তালা খুলতে হলে চাবি যেমন দরকারি। তোমার হাতে টাকা আছে কি না আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে যা ছিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে ফেরত দিও। আমি নিজে পুলিশ আপিসের বড়বাবু, আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা আমি করব নিশ্চয়ই; কিন্তু একটা কথা ভেবে মনে হচ্ছে ব্যর্থকাম হব। পুলিশ যেখানে টাকার গন্ধ পায় সেখানে শুষ্ক খাতিরে কাজ করে না। অমরেশবাবু বড় জমিদার, তাঁর ম্যানেজারকে তারা ফাঁসিয়েছে। অত বড় রুইকে তারা শুধু হাতে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। তবে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজে যদি যাও, বঁড়শিটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতি—

আর সি.

ডানা গুনে দেখলে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। তারপর সেগুলো আর একটা খামে পুরে খামটা ভাল করে জুড়ে দিলে। চাকরটাকে উঠিয়ে বললে, "জবাবটা রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে আয়। চিঠিটা তাঁর হাতেই দিবি।"

চাকরটা ফিরে এল একটু পরে। দেখলে ঘরের কপাট বন্ধ। ভাবলে, মাইজি বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। সে যদি ভাল করে দেখত তা হলে বুঝতে পারত যে, কপাটে খিল বন্ধ নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ডানা বেরিয়ে গিয়েছিল চরের দিকে।

ডানা টর্চটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টর্চের দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে চরে। সে যে ঠিক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছিল তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে ভীত সে যে পালিয়ে এসেছিল তাও ঠিক নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তর্ক করছিল নিজের সঙ্গে। অতীতে যে জীবনকে সে পিছনে ফেলে এসেছে, সে জীবনেরই পুনরাবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ জীবনে কি করে আবার হবে, আবার নতুন করে ভদ্রভাবে কোথায় সংসার পাতবে—এই অতি স্বাভাবিক চিন্তাটাও তার মনে সজাগ হয়েছিল না, কখনও থাকতও না। খরস্রোতা জীবননদীর তীরে ছোট্ট একটি গাছের মতো বেড়ে উঠেছিল সে, হঠাৎ ধস ভেঙে পড়ে গেছে নদীর স্রোতে। যে শিকড় আগে স্থাণু মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করত, তা এখন করছে বহমান স্রোতের জল থেকে। প্রথমে কষ্ট হয়েছিল, এখন আর হয় না। ভেসে চলাটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভেসে এসেছে নতুন জগতে। নতুন জগতের বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ, সন্ন্যাসীকে ঘিরে ঘিরে স্রোতাবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াতে পারছে না। অস্থির মনও স্বপ্ন রচনা করে। তার মনও করছিল। বিজ্ঞানীকে, কবিকে এবং রূপচাঁদকে কেন্দ্র করে তিন রকম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল তার কল্পনা, যদিও জ্ঞাতসারে তার মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীই বুঝি তার স্বপ্নের

খোরাক জোগাচ্ছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ঘিরে কোনো বিশিষ্ট স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে ওঠেনি তার মনে। সে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবার উপাদানই পায়নি। ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসেছে কিন্তু কিছুই সহ্য করতে পারেনি। অমরেশবাবুকে ঘিরে যে স্বপ্নলোক সে সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধাই তার প্রধান উপকরণ, কবিকে ঘিরে যে জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল কিছু অনুকম্পা, রূপচাঁদের জগতে ছিল রিরংসা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ছিল কেবল কৌতূহল। নিছক কৌতূহল নিয়ে স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করা যায় না, স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করবার জন্যও উপকরণ চাই, কৌতূহল সে উপকরণ সংগ্রহের প্রেরণা মাত্র দিতে পারে। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে যে কৌতূহল জেগেছিল, সে কৌতূহলও সব সময়ে একাগ্র থাকতে পারছিল না। চরে এসে সে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিল না। আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ সন্ন্যাসী যে এখানে কোথাও আছেন এই ধারণাটা মনের প্রচ্ছন্নলোকে অস্পষ্টরূপে আভাসিত হচ্ছিল, একটা আবছা প্রত্যাশাও ছিল—হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত চরটাই কিন্তু পেয়ে বসেছিল তার মনকে। একটা অপরূপ আবির্ভাব যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। জ্যোৎস্না সে আগে অনেকবার দেখেছে, চরও দেখেছে, কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে আকাশ-ভরা নির্মল জ্যোৎস্না আর দিগন্ত-বিস্তৃত শুভ্র চরের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও সে দেখেনি। আকাশ যেখান চক্রবালরেখাকে স্পর্শ করেছে সেই দিকেই স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সমস্ত জোৎস্না যেন তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। কলরব করতে করতে চরের উপর পাখি উড়তে লাগল, মনে হল চরটাই বুঝি বহু পক্ষীর রূপ ধরে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। একটা বালুস্তূপের আড়ালে বসে ছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল। পাখিদের এই হঠাৎ চাঞ্চল্য কেন জানবার জনোই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডানাকে তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কোনো সম্ভাষণও করলেন না। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানাই এগিয়ে এল।

"ও, আপনি এখানে বসে আছেন বুঝি? আপনাকে দেখতেই পাইনি। পাখিগুলোকেও দেখতে পাইনি। ওগুলো টিট্টিভ মনে হচ্ছে।"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, টিট্টিভই। তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছি।"

"ভাব করে ফেলেছেন?"

"তোমার সঙ্গেও ভাব হয়ে যাবে যদি ওরা বোঝে যে, তুমি ওদের হিতৈষী।"

"সেটা কি করে বোঝাব ওদের?"

"আপনিই বুঝবে। মন অন্তর্যামী।"

"তা হলে এখনই বোঝা উচিত ছিল। আমি তো ওদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা করিনি।"

"কিন্তু তোমার মতো চেহারাওলা অনেকে করেছে। এই সেদিনই ভোরবেলা নৌকা করে শীকারিরা এসেছিল হাঁসের সন্ধানে। হাঁসেরা অনেক আগেই চলে গেছে, অনর্থক কতকগুলো টিট্টিভকে মারলে ওরা।"

"মানা করলেন না আপনি?"

"মানা করলে শোনে না কেউ। উপদেশও শোনে না। সবাই আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে।

আমাকে তুমি যদি বল, আপনি এমন ছন্নছাড়া জীবনযাপন করছেন কেন, বিয়ে করে সংসারী হোন—তোমার এ উপদেশ আমি শুনব না।"

"সত্যিই, এই ছন্নছাড়া জীবন ভাল লাগে আপনার?"

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "বস। একটু আগে তুমি একটা অদ্ভুত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছ। না জেনেই করেছ বোধ হয়। বস, সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক। আলোচনা করলে ব্যাপারটা আমার কাছেও বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশটাও মনোমত হয়েছে। বস।"

এই বলে চুপ করে গেলেন তিনি। তলিয়ে গেলেন যেন কোথায়। তারপর বসলেন আস্তে আস্তে। ডানাও বসল। অনেকক্ষণ কোনও কথা হল না। নীরবতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ডানার।

বললে, "পাখিগুলো এইবার থিতিয়ে বসেছে। খুব কাছেই বসেছে অনেকগুলো। ও-রকম করে বসেছে কেন?"

"ডিম পেড়েছে ওরা। ডিমে তা দিচ্ছে। রাত্রেই ওরা ডিমে তা দেয়। দিনে বড় একটা বসতে দেখি না। দিনের বেলা নদীর ওপর উড়ে উড়ে মাছ ধরে খালি।"

"ওদের ডিম দেখেছেন আপনি?"

"হাত দিয়ে তুলে দেখিনি, দূর থেকে বসে বসে দেখেছি। দিনের বেলা আমিই তো ওদের ডিম পাহারা দি।"

নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে ডানা বললে, "ওরা বালির খাঁজে খাঁজে ডিম পাড়ে, নয়?"

"হ্যাঁ। কি করে জানলে তুমি? এসেছিলে নাকি কোনো দিন?"

"বইয়ে পড়েছি। ওরা ডিমে তা দেয় না কেন জানেন? রোদে বালি এত তেতে যায় যে তা দেবার দরকারই হয় না। ওদের ডিম পাহারা দেবারও দরকার নেই, বালির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।"

"ওদের দরকারের জন্যে পাহারা দিই না, পাহারা দিই নিজের প্রয়োজনে। আমি যে ওদের বন্ধু সেটা ওদের বোঝার জন্যে। ওরা সেটা বোঝে। সেদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল।"

"কি?"

"ওই যে উঁচু বালির ঢিপিটা দেখছ, তার ওপারে কয়েক জোড়া বেশ বড় ধরনের টিট্টিভ আছে। টিট্টিভই বোধ হয়, বেশ বড় ঠোঁট, পিঠ আর ডানার উপরটা কালচে বাদামী, জলের ঠিক ওপর দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়।"

"বুঝেছি, বোধ হয় স্কিমার (Skimmer)।"

"তা হবে। ওদের বাচ্চা হয়েছে ওখানে। দুপুরে বসে আছি সেদিন, হঠাৎ দু-তিনটে পাখি উড়ে এল, এসে আমার মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করতে লাগল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর মনে হল, পাখিগুলো আমাকে বোধ হয় বলতে চাইছে কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়াতেই পাখিগুলো আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে ওই ঢিপিটার দিকে উড়তে লাগল। মনে হল, আমাকে যেন ইঙ্গিত করছে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করলাম।

গিয়ে দেখি, একটা সাপ ওদের একটা বাচ্চাকে ধরেছে। তাড়া দিলাম, নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে মারতে হল সাপটাকে।"

"কি সাপ?"

"কোনও চেনা সাপ নয়।"

"আহা, কেন মেরে ফেললেন বেচারীকে! ও তো কোনও দোষ করেনি, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল।"

"আর্তকে রক্ষা করা কর্তব্য—শাস্ত্রের এই উপদেশ। ভৃগুপত্নী আর্ত দৈত্যদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন।"

"ভৃগুপত্নী মানে?"

"শুক্রের মা।"

"তাই বুঝি শুক্র দেবতাদের ওপর চটা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি।"

"বলুন।"

"আমার মনে হচ্ছে, বলে কিই বা হবে! ভাবের সমুদ্রে কত বুদ্বুদই তো উঠছে প্রত্যেকটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না, প্রকাশ করবার দরকারও নেই।"

"না না, বলুন তবু।"

সন্ন্যাসী চুপ করে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করেই রইলেন। নীরবতাটা আবার পীড়া দিতে লাগল ডানাকে।

"বলুন না, কি বলতে চাইছিলেন!"

"তুমি তখন বললে, মন অন্তর্যামী, কিন্তু সে এক নজরে বন্ধু বা শত্রুকে চিনতে পারে না কেন? কেন ভয় পায়, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে, কেন যাচিয়ে নিতে চায়? ওটা একটু অদ্ভুত রহস্য। ওর আসল উত্তর কি জান? অর্ন্তযামীর শত্রু কেউ নেই, মিত্রও কেউ নেই, কারণ, এই নিখিল বিশ্বই অন্তর্যামী। সে-ই সব, তার আবার শত্রু মিত্র কি? তোমার ডান হাতটা কি তোমার মিত্র, না তোমার ডান পাটা তোমার শত্রু? ডান হাতও তোমার, ডান পাও তোমার, তুমিই সবটা। তেমনই বাইরে যা কিছু দেখছ, সবই অন্তর্যামী, তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন নানা রূপে, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নেই কিছু।"

"তা হলে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন, তিনি একজনকে শত্রু, একজনকে মিত্র মনে করেন কেন?"

"ওইটেই তাঁর খেলা। অনেকে বলেন—লীলা।"

"তার মানে?"

"তিনিই যুধিষ্ঠির, তিনিই দুর্যোধন, তিনিই বেদব্যাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রই তিনি। এ না হলে মহাভারতের কাব্য জমত না। মহাকবি তিনি, অনন্ত তাঁর কাব্য, সে কাব্যের প্রতি ছত্রে নিজেকেই মূর্ত করছেন তিনি নানা ভাবে, নানারূপে, নানাছন্দে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আমিও পারি না। আভাসে যতটুকু বুঝেছি বললাম। হয়তো ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কারণ ঠিক বুঝিনি। বুঝতে পারলেই তো মুক্তি!"

"কি বুঝতে পারলে?"

"যে তুমিই সেই।"

আবার নীরব হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ডানাও চুপ করে রইল।

মনে হতে লাগল, একটা অসীম পাথার যেন থৈ-থৈ করছে চারিদিকে।

।। ছয় ।।

কবি হাজতে গিয়ে মন্দ ছিলেন না। তাঁর বিবেকে কোনো গলদ ছিল না, মনে তাই কোনো অশান্তিজনক আশঙ্কা জাগেনি। তিনি যে অবিলম্বে ছাড়া পেয়ে যাবেন—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। পুলিশের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অভিনব পারিপার্শ্বিকে নীত হয়ে বরং একটু মজাই লাগছিল তাঁর। কোনও অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে যেন দৈনন্দিন একঘেয়েমির বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতলোকে এনে হাজির করে দিলেন, রূপকথার হারুন অল-রসিদ যেমন দিয়েছিলেন আবু হোসেনকে। আর একটা কথা ভেবেও পুলকিত হচ্ছিলেন তিনি। ডানা নিশ্চয়ই খবরটা পাবে, পেয়ে উতলাও হবে নিশ্চয়। উতলা হয়ে জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা করবেই। কি করবে, কি করা সম্ভব? কল্পনা নানা রকম ছবি আঁকছিল। মশগুল হয়ে এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। ডানা কি রূপচাঁদের শরণাপন্ন হবে? অমরেশবাবুকে টেলিগ্রাম করবে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীকে খবর দিয়ে দেবে না তো? তা হলে কিন্তু হুলুস্থূল বেধে যাবে। মন্দাকিনীর ঠিকানা অবশ্য ডানার জানা নেই। রূপচাঁদ জানে। চিন্তিত হয়ে হাঁটু দোলালেন খানিকক্ষণ। চিন্তার অন্তরালেও কিন্তু একটা পুলকের স্রোত ফল্গুর মতো বইছিল। ডানা যা-ই করুক, তাঁকে নিয়েই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—উঠেছে নিশ্চয়ই—এই ধারণাটা পুলকিত করে তুলেছিল তাঁকে।

যে ঘরটায় ছিলেন তিনি, সে ঘরে জানলা ছিল একটা। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীল আকাশ। নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল একটা গাছের কঙ্কাল। পাতা সব ঝরে গেছে। যে শাখা-প্রশাখাগুলি অসংখ্য সবুজ পত্রকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা আজ রিক্ত। একটি পাতাও নেই। গাছের শীর্ষদেশে বসে আছে এক গোদাচিল। খানিকক্ষণ চিলটার দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে ভাব জাগল। একটা ছোট খাতা আর পেন্সিল তাঁর পকেটে সর্বদা থাকত। বার করে লিখতে লাগলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

যে নিগূঢ় মিল আছে ছবি আর পটভূমিকায়
ফুটিবে তা কোন্ বর্ণে কার তুলিকায়?
পিছনে আকাশ গাঢ় নীল,
এই পটভূমিকায় গাছের কঙ্কাল আঁকা
শিরে তার বসে আছে চিল।
তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চুবান বসে আছে অশঙ্কিত হিয়া
তাম্রবর্ণ পক্ষ দুটি সূর্যালোকে উঠে ঝলসিয়া,

শক্তি-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত মহিমার প্রতীক যেন সে,
দৃষ্টি তার প্রশ্ন করে এখনও কেন সে
পায়নি শিকার;
গাছের কঙ্কাল কিম্বা আকাশের নীল বর্ণ
চিত্তে তার তোলেনি বিকার
আমি কবি, আমি শুধু মুগ্ধ নেত্রে হেরি এই ছবি
মনে মনে খুঁজি সেই মিল
রিক্ত-বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ-চিল, নির্বিকার আকাশের নীল
যে মিলে মিলিত হলে খুলে যাবে সমস্যার খিল।
স্বপ্নে দেখি যেন এক নতুন ধরণী,
নূতন নদীর স্রোতে ভেসে চলে নতুন তরণী;
আরোহী ওরাই
আকাশের নীল আর গাছের কঙ্কাল আর ওই চিলটাই;
সে তরীতে আমিই নাবিক
কোন ঘাটে ভিড়িব যে তাও যেন জানি আমি ঠিক।

কবিতাটা লেখা শেষ করে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। নতুন ধরণীর নতুন নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেলেন কোথায় যেন। হঠাৎ চমক ভাঙল, জানলার ঠিক নীচেই খুব চেনা পাখি ডেকে উঠল একটা। ছোটছেলেরা 'টু' শব্দ করে যেমন লুকোয়, অনেকটা তেমনি মনে হল তাঁর। মনে হল তাঁকে ডেকে যেন বলছে—কি যা-তা ভাবছ তুমি! আমি এত কাছে রয়েছি দেখতে পাচ্ছ না! কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠিক নীচেই কুন্দফুলের ঝাড় রয়েছে একটা। আর কিছু দেখতে পেলেন না প্রথমে। একটু পরেই পেলেন। দরজিপাখি একটি, কুন্দ-ঝাড়ের নিচের ডালটিতে বসে আছে, ডালটি দুলছে, একফালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। দরজিপাখিকে একাধিক বার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে, তার নানারকম ডাক শুনেছেন, তার পাতায় পাতায় সেলাই করা বাসাও দেখেছেন—সংগ্রহ করা আছে একটি অমরেশবাবুর মিউজিয়মে; কিন্তু এত কাছে, এমন ঘনিষ্ঠভাবে দরজিপাখিকে দেখবার সুযোগ তিনি পাননি। বইয়ে যেন বর্ণনা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। বইয়ে লেখা আছে 'অলিভ গ্রীন' রঙ, লালচে পা, ছোট্ট মুখ, ছোট ঠোঁট, গলায় কালো কণ্ঠি। সবই মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাজটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল পিঠের ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'টোয়িট্' 'টোয়িট্'! 'টোয়িট্' শব্দ করে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল দরজি পাখি। বোঝা গেল, কবিকে দেখতে পেয়েছে এবং চটেছে। 'স্পাই'কে পাখিরাও ঘৃণা করে। কবির মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ছোট নাতির কাণ্ড-কারখানা দেখে দাদামশায়ের মুখে যেমন ফোটে। খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, এঁকেবেঁকে নানারকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাখিটিকে আর দেখতে পেলেন না। একটু দূরে ডাক শোনা গেল—পীপ্ পীপ্ পীপ্। ঠিক এর পরই কবি বুঝতে পারলেন, বন্দীত্বের দুঃখটা কোথায়! তার ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে গিয়ে পাখিটার খোঁজ করেন; কিন্তু তার উপায় নেই এখন। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যেই। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। একটু পরে খাতা

পেন্সিল বেরুল পকেট থেকে, ভাব ছন্দ আর মিলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে পড়ল মন, ভেসে চলল কল্পনা-তরণী নতুন নদীর নতুন স্রোতে। অনেকক্ষণ লাগল কবিতাটা লিখতে, অনেক কাটাকুটি হল, তবু মন খুঁত খুঁত করতে লাগল, মনে হল ঠিক যেন বলা হল না।

দরজিপাখি শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলেন
'পীপ্' 'পীপ্' 'পীপ্' দু-চার কথা খেয়াল মাফিক বলেন।
তোমার আমার দৃষ্টিটিকে পারতপক্ষে এড়ান,
পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।
চটে গেলেই ধমকে ওঠেন 'টোইট্' 'টোইট্' 'টোইট্'
যার অর্থ সরল ভাষায়—চটছি আমি, 'নো ইট'।
মনটা যখন তলিয়ে ছিল বিষণ্ণতার তলায়
হঠাৎ গানের উঠল গমক দরজিপাখির গলায়।
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সবুজ কুন্দ-শাখায়
দোল খাচ্ছেন দরজিপাখি রোদ পড়েছে শাখায়।
বুকটি সাদা পিঠটি রঙিন গলায় আভাস কালোর,
হচ্ছে মনে দুলছে যেন রঙিন সুরের ঝালর।
জলপাই রঙ সাধছে সারং শুনছে স্বয়ং তপন
বইছে হাওয়া মন্দ-মৃদু আকাশ দেখছে স্বপন।
দেখছে যেন বসুন্ধরাই দরজিপাখির মতন
রূপের হট্টলোকের মাঝে খুঁজছে অরূপ রতন।
আকাশ-ভরা সূর্য তারা লক্ষ পাতা শাখীর
সব ছাড়িয়া সুর উঠেছে বসুন্ধরা-পাখির।
পাতায় পাতায় সেলাই করে সেও তো বাসা বানায়
কিন্তু সে যে নয়কো ছোট্ট গান গেয়ে তা জানায়।

কবিতাটি বার দুই মনে মনে পড়লেন তিনি। তারপর জোরে জোরে পড়লেন একবার। 'ছোট্ট' কথাটাকে কেটে 'ছোট' করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন কবিতাটার দিকে। ভাবতে লাগলেন, আরও গোটা দুই লাইন জুড়ে দেবেন কি না। এমন সময় জেলার বাবু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আপনার 'বেল' হয়ে গেছে। আসুন।"

কবি দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। খাতাটা পড়ে গেল তাঁর কোল থেকে। সেটাকে তুলে আবার পকেটে পুরলেন। খবরটা শুনে তিনি মনে মনে একটু হতাশই হয়ে গেলেন যেন। এত সহজে সব শেষ হয়ে গেল? তিনি আশা করেছিলেন, অনেক হৈ চৈ হবে এ নিয়ে।

"'বেল' হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। একজন ভদ্রমহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে। উনিই সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর এস. পি.-র সঙ্গে দেখা করে 'বেলে'র ব্যবস্থা করেছেন। আসুন।"

কবি বেরিয়ে দেখলেন, ডানা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। তারপর হঠাৎ গদগদ হয়ে বললেন, "চমৎকার। এইটেই আশা করেছিলাম।"

"চলুন, ট্রেনের বেশি দেরি নেই আর।"

"এ ঘোড়ার গাড়ি কি আমাদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। ওইটে করেই তো ঘুরছি সকাল থেকে।"

"ও। খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানা কেবল বললে, "চলুন।"

গাড়িতে উঠে কিছুই কথা হল না খানিকক্ষণ। ডানা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। কবি উসখুস করতে লাগলেন। ডানাই কথা কইলে প্রথম।

"মনে হচ্ছে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।"

"ষড়যন্ত্র? মানে? কারা ষড়যন্ত্র করছে?"

"মল্লিক মশাইরা।"

"আগে যে মল্লিক ম্যানেজার ছিল, সেই?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা তো খারাপ নয়। তুমি জানলে কি করে?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন। মল্লিক মশাই নাকি গোপনে পুলিশ সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন যে, এ খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত।"

"কি রকম?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব কথা খুলে বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু বললেন যে, আপনাদের নিজের লোকই তো পুলিশকে এ খবর দিয়েছে। নিজের লোকটি কে তা জিজ্ঞেস করাতে একটু ইতস্তত করে তিনি মল্লিক মশাইয়ের নামটা বললেন। তাঁর ধারণা, মল্লিক মশায় আগে এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং অমরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনাকে বসিয়েছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হল, মল্লিকের এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। তারপর যখন শুনলেন আপনি প্রফেসার ছিলেন, তখন তাঁর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কলেজের প্রফেসার ছিলেন? আমি জানতাম না। বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, আমি এক আনন্দবাবুর ছাত্র ছিলাম ইনি তিনি নন তো? প্রশ্ন করলেন, কবিতা লেখেন কি খুব? এ খবরটা জানা ছিল। বললাম, লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ইনি তা হলে সেই আনন্দবাবু। আমাকে একটা দরকারে এখুনি এক জায়গায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হলে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে। যাই হোক, তাঁর 'বেলে'র ব্যবস্থা আমি এখুনি করে দিচ্ছি।"

কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"নাম কি বল তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের?"

"তা তো ঠিক জানি না।"

"আমার এক ছাত্র—নিখিল বোধ হয় তার নাম—কোথায় যেন এস. ডি. ও হয়েছিল শুনেছিলাম, এ হয়তো সেই।"

ডানা বললে, "উনি একদিন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

কবি হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। তাঁর কল্পনা-তরণী তখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—অকূলে কূল খোঁজবার আশায় নয়, আনন্দের আবেগে।

ডানা বললে, "মিছিমিছি কি কাণ্ড দেখুন তো! খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় আপনার?"

"কিছুমাত্র না। আমি কবিতা লিখছিলাম। শুনবে?"

"এখন থাক্। বাড়ি গিয়ে শুনব।"

"না, অত তর সইবে না আমার। এখনই শোন।"

ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর পাল্লা দিতে লাগল।

ডানা ইন্টার ক্লাস টিকিট করতে চেয়েছিল, কবি কিন্তু শুনলেন না।

ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করতে হল।

কবি বললেন, "তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমত দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।"

ডানা মৃদু হেসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। হাওয়ার বেগে বিস্রস্ত হতে লাগল তার চুলগুলো।

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তার দিকে।

হঠাৎ বললেন, "তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হত তা হলে—ভারী খুশী হতাম।"

"কেন?"

"অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর করে যা বলতাম তা বেমানান হত না। এখন কিছু বললেই তুমি চটে যাবে, লোকে শুনলেও ছি-ছি করবে।"

"কেন, কি বলতে চান?"

ডানা মুখ টেনে নিলে ভিতরে।

"বলতে চাই—।" বলেই কবি পকেট থেকে খাতা বার করে পড়তে লাগলেন—

তুমি সুন্দরী, মন্দার মালা,
  তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
  যাচে তব সখ্যতা।

জ্যোৎস্না-সাগরে তোমার তরণী
  পাড়ি দেয় যবে রাতে
বেরসিক যারা ঘুমাইয়া থাকে
  কবি জেগে থাকে ছাতে।
তাহাই কাব্য-তীর্থে, ক্ষণিকা,
  ক্ষণতরে অবতরি,
মর্ত-মলিন কল্পনা তার
  দাও যে সুধায় ভরি।

তুমি দেহ নও, তুমি কেহ নও,
অথচ তুমি যে সব,
তোমারে ঘিরিয়া হয় যে মূর্ত
নিখিলের উৎসব।

তোমারই নয়নে, তোমারই অধরে,
তোমারই ডাহিনে বামে
সত্য শিবের চির-সহচর
সুন্দর এসে নামে।

জানি না তাহারে, চিনি না তাহারে,
নাম নাই তার জানা,
তবু তারি লাগি কাব্যে ও গানে
সাজাই ছন্দ নানা।

ডানা স্মিতমুখে শুনছিল।

কবি থামতেই হেসে বললে, "আমি তা হলে আপনার মতে, স্টেজ মাত্র!"

"স্টেজের মহত্ত্ব কম নাকি! স্বয়ং শেক্সপীয়র বলে গেছেন—সমস্ত পথিবীটাই স্টেজ।"

ডানা হাসিমুখে চুপ করে চেয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে আবার মুখ বাড়াল। কোনো কথা কইল না। যে আমগুলো স্টেশন থেকে কেনা হয়েছিল, কবি তারই একটা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—হাত বেয়ে রস পাঞ্জাবিতে লাগল।

হঠাৎ ডানা মুখ ফিরিয়ে বললে, "ও কি করছেন? দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। ক্ষিধে পেয়েছে আপনার? বলেননি কেন?" কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুণভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন।

"কি দেখছেন অমন একদৃষ্টে?"

"মেয়েকে, মাকে।"

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন, চোখে যে হাসি চিকমিক করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

।। সাত ।।

ফিরে এসেই ডানা আবার বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর খোঁজে। তাঁ-তাঁ করছে দুপুরের রোদ। এই রোদে কেন যে সে বেরিয়ে পড়ল তা নিজেও সে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করল না। আমাদের সব কাজের আসল কারণ কেউ আমরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি না। অজুহাত অবশ্য সকলেরই একটা থাকে, ডানারও ছিল। যে আমগুলো কাল স্টেশনে কিনেছিল, তাই সে দিতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীকে। পরে দিলেও চলত, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। কিন্তু

পিপাসার্ত পশু যেমন সহজ বুদ্ধিবলে টের পায়—জল কোথায় আছে এবং সে জলের সমীপবর্তী কি করে হতে হয়, ডানাও ঠিক তেমনই অনুভব করছিল, সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তাকে এমন কিছু একটা দেবে যার জন্যে সে মনে মনে আকুল। কিন্তু সেটা যে কি, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার। ধারণা করবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি সে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, এই হেতুটুকুই যথেষ্ট ছিল তার কাছে।....বেরিয়েই চোখে পড়ল ছাই-রঙের একটা পাখি জিওলগাছের ডালে বসে আছে। অনেকটা বাজের মতো। বুকের কাছটা বাদামী, তাতে ডোরাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চোখ দুটো লালচে। ডানার মনে হল, বাজ নয়, বাজ হলে ঠোঁটটা বাঁকা হত। কি পাখি ওটা? এর আগে দেখেনি তো এ পাখি! পাখিটা যেই দেখলে ডানা তাকে লক্ষ্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। উড়তেই ডানার নজরে পড়ল, পাখিটার ল্যাজের নীচে কালো রঙের ডোরা রয়েছে। পাখিটা উড়ে গিয়ে দূরে একটা আমগাছে বসল। ডানা চলতে শুরু করল আবার। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, কি পাখি ওটা! মনে পড়ছে, অথচ পড়ছে না। ঘুরতেই আবার পাখি। এক ঝাঁক ছাতারে একটা ঝোপের ধারে কচকচ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দূরে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর বসে আছে ফিঙে। আর একটু দূরে মন্দিরের চূড়ার উপর নীলকণ্ঠ—ট্যাক ট্যাক শব্দ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে। শালিকের বাসা চোখে পড়ল একটা। পক্ষীজগতের সঙ্গে আগে তার কোনও পরিচয় ছিল না, কোনো ঔৎসুক্যও ছিল না। বাড়ির বাইরে বেরুলে পাখিদের সম্বন্ধে চোখ কান আগে সজাগ হয়ে উঠত না। এখন হয়। পাখিদের সামান্য সাড়াও মনে সাড়া জাগায়। অমরেশবাবু তাকে নতুন একটা রহস্য-লোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন। অমরেশরবাবুর মুখটা মনে পড়ল। কত বড় বিদ্বান অথচ কত সরল। এ দেশের এত রকম পাখি দেখেও তৃপ্তি হয় না ভদ্রলোকের। আরও টাকা থাকলে বিদেশে গিয়ে আরও পাখি দেখতেন। ছোট শিশু যেন। ডানার মনের নিভৃত কন্দর থেকে মাতৃস্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠল। তার মনে হল, কত টাকা লাগে বিদেশে যেতে? আমার যদি থাকত আমি নিশ্চয় দিয়ে দিতাম। কবির কথায়ও মনে হল, উনিও একটি শিশু, কিন্তু অন্যরকম। ছিটগ্রস্ত। ভাবের ঘোরে কখন যে কি বলেন, কি করেন—কিন্তু ঠিক নেই। অনুকম্পা হল। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল হঠাৎ। রাস্তার ধারে একটা কাক কি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাকে দেখেই উড়ে গেল। ডানা দেখলে, মরা ইঁদুর একটা। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, নীচের দাঁত দুটোও দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ করে ব্যঙ্গ করছে যেন। কাকে? বিধাতাকে? মৃত্যুর সম্মুখীন হলে সকলেরই যেমন ক্ষণকালের জন্য জীবনের নশ্বরতার কথা মনে জাগে, ডানারও জাগল। বর্মা থেকে পালাবার সময় একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথা। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বাবার মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠল মনে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? হারিয়ে যায় কি চিরকালের মতো? নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়াই ভাল বোধ হয়। এই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ বোধ সমস্ত স্মৃতিসম্ভার বহন করার সার্থকতা কি থাকতে পারে, জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রই যদি চিরকালের মতো ছিন্ন হয়ে যায়? যায় কি? তার এ চিন্তাস্রোতও ব্যাহত হল। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল আর একটা পাখি—বউ কথা কও। চমৎকার মিষ্টি ডাকটি। 'থাটি'র উপর একটু সামান্য জোর দিয়ে, সামান্য টান দিয়ে কি অপরূপ করে বললে—বউ কথা কও। একবার ডেকেই কিন্তু চুপ করে গেল। ডানা এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল, কোন্ গাছের ফাঁকে কোথায়

লুকিয়ে আছে কে জানে! যে ছাই-পাখিটাকে একটু আগে দেখতে পেয়েছিল, সেটা বউ-কথা-কও নয়। যদিও সে চোখে দেখেনি এখনও, কিন্তু বইয়ে পড়েছে বউ-কথা-কও পাখির রঙ কালো, ঠোঁটের দিকটা সাদা। ওর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo ......ছাই রঙের পাখিটা কি তা হলে? পরমুহূর্তেই পাখিটা তারস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল। সুরের উৎস পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উৎসারিত হল, দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতপ্ত নির্মেঘ আকাশ সে উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দিগ্‌দিগন্তকে আকুল করে তুলল যেন। ডানার তখন মনে পড়ল, অনেক কষ্টে এই চোখ-গেলকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েছে সে। আরও মনে পড়ল এর সঙ্গে বাজের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলে এর ইংরেজী নাম Hawk Cuckoo......ডানা চেয়ে দেখলে, কিছুদূর একটা আমগাছের শাখা ফলভারে অবনত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া, শাখায় শাখায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে, তার পাশেই কর্ণিকার, মনে হচ্ছে অসংখ্য হলুদ রঙের প্রজাপতি যেন কোনও মন্ত্রবলে অচঞ্চল হয়ে গেছে ওর পত্রপল্লবে। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্রকিরণেও উৎসবের আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। সরবে-নীরবে, আভাসে-ইঙ্গিতে, স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় সে উৎসব আত্মপ্রকাশ করছে নানা সুরে নানা ছন্দে। বউ-কথা-কও আবার ডেকে উঠল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডানার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু। সন্ন্যাসীর কাছে যাবে বলে বেরিয়েছিল, রাস্তার মাঝখানে ছেলেমানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে পাখির ডাক শুনে আর ফুলের গাছ দেখে। আবার চলতে শুরু করল। অনেক দিন আগে কবি একটা কবিতা লিখে শুনিয়েছিলেন তাকে। তার লাইনগুলো মনে পড়ল।

নকল কাজেতে মত্ত থাকিয়া আসল কাজটি হয়নি করা,
মিলন-সভায় যাইতে পারিনি, সে যে হবে ওগো স্বয়ম্বরা।
সে বারতা লেখা তারায় তারায় ফুলে ফুলে তাহা উঠেছে ফুটি।
অকাজের পাকে রয়েছি জড়ায়ে কিছুতেই যেন পাই না ছুটি।

কবিতার লাইনগুলো গুঞ্জন করত লাগল মনের ভিতর। এর যে অর্থ সে আগে বোঝেনি, সেই অর্থটা ক্রমশ যেন প্রতিভাত হল তার মনে। মনে হল, আনন্দের একটা উৎসব অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

সন্ন্যাসীর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ডানা যখন পৌঁছল, তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। দূর থেকে সে যা দেখতে পেল তা অপ্রত্যাশিত। দেখলে, একটা শাবল নিয়ে সন্ন্যাসী একটা নারকেলের ছোবড়া ছাড়াবার চেষ্টা করছেন প্রখর রৌদ্রে বসে। ডানার মনে পড়ল কাকের ইঁদুর খাওয়ার দৃশ্যটা।

"কি করছেন আপনি?"

সন্ন্যাসী একটু অপ্রতিভ হলেন।

"ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। তুমি এই রোদে বেরিয়েছ যে?"

"এই আমগুলো দিতে এসেছি আপনাকে।"

"দেখ, কি অদ্ভুত যোগাযোগ!"

শাবল ও নারকেল সরিয়ে রেখে হাসিমুখে সন্ন্যাসী চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

"যোগাযোগ মানে?"

ডানা আমগুলি রেখে জিজ্ঞেস করল।

আর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, "যোগাযোগ বলছি এইজন্যে যে, ভগবানই আমার নিতান্ত দৈহিক ক্ষুধায় বিচলিত হয়ে প্রথমে নারকেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপর যখন দেখলেন নারকেলটা আমি ছাড়াতে পারছি না তখন তোমাকে দিয়ে আম পাঠালেন—এ কথা ভাবতে পারছি না। যাঁকে নির্বিকার পরমব্রহ্ম বলে ভাববার চেষ্টা করছি, তিনি এভাবে বিচলিত হচ্ছেন—একথা আমার পক্ষে ভাবা শক্ত। তাই যোগাযোগ বলছি।"

"নারকেলটা কে দিলে?"

"কেউ দেয়নি। নদীর ধারে বসে ছিলাম, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আমার সামনে ঠেকল, ঠেকেই রইল অনেকক্ষণ, তাই তুলে নিয়ে এলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব।"

"আপনি তো রোজ ভিক্ষা করতেন! ভিক্ষেয় কিছু পাননি বুঝি?"

"ভিক্ষা আজকাল আর করি না। আজকাল উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছি।"

"উঞ্ছবৃত্তিটা আবার কি?"

"তুমি মহাভারত পড়েছ?"

"না। কেন?"

"মহাভারতে শান্তিপর্বে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে। পদ্মনাভ সে কাহিনী ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণকে বলছেন।"

"কি, বলুন না শুনি!"

"এখানে বড্ড রোদ, ঘরে চল।"

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল, সেখানেও খুব ছায়া নেই। ভাঙা চালের ভিতর দিয়ে সেখানেও রোদ ঢুকেছে।

ডানা বললে, "এই ঘরে কি করে যে আপনি আছেন! আনন্দবাবু আজকাল অমরেশবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন, তাঁকে বলব আপনার ঘরটা সারিয়ে দিতে।"

"না থাক। কদিনই বা আর আছি!"

ভাঙা ঘরটার আসল মালিক যে তিনিই, অমরেশবাবু নন—এ কথা তিনি ডানাকে বললেন না। অমরেশবাবু নিজেও সে কথা জানতেন না বোধ হয়।

"চলে যাবেন না কি এখান থেকে?"

"সবাইকেই যেতে হবে, তোমাকেও। এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার জো আছে কি! স্রোতের মুখে ভাসছি যে সব।"

"স্রোতের মুখে থেকেও তো মনে হয়, নড়ছি না।"

ডানা হেসে জবাব দিলে।

"বাইরের জগৎটা কার চোখে যে কেমন ঠেকে, কার মনে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বলা শক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, সেইজন্য কারও মাপের সঙ্গে কারও মেলে না।"

"ওসব আধ্যাত্মিক কথা থাক্ এখন। আপনি আমগুলো খান আগে।"

"এনেছ যখন খাবই তো। তুমি ওই কোণের দিকটায় বস, যদি বসতে চাও অবশ্য। দাঁড়াও, আমগুলো নিয়ে আসি বাইরে থেকে।"

সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন আবার। ঘরের কোণে ছেঁড়া মাদুর গোটানো ছিল একটা। সেইটে

পেতেই ডানা বসল। সন্ন্যাসী আমগুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, "তুমি ওই মাদুরটা পেতে বসলে! আচ্ছা থাক্ বসেছ যখন—"

"কেন, কি হয়েছে মাদুরে?"

"হবে আবার কি! নদীর চরে শ্মশানে পড়ে ছিল, কুড়িয়ে এনেছিলাম একদিন। ওতেই শুই রাত্তিরে। তোমার ওতে যদি বসতে আপত্তি থাকে আমার ওই আসনটায় বস। আমি আমগুলো কাটি ততক্ষণ।"

মাদুরের ইতিহাস শুনে ডানার উঠে পড়তেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে উঠল না। মনে হল, সন্ন্যাসী এতে শুতে পারেন আর আমি বসে থাকতে পারব না?

সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে ছুরি বার করে আমগুলি ধুয়ে কাটতে লাগলেন। ঝুলি থেকেই বার করলেন কয়েকটি শালপাতা। একটি আম কেটে এগিয়ে দিলেন ডানার দিকে।

"তুমি খাও।"

"আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।"

"তবু খাও। তুমি সামনে বসে থাকবে, আর আমি একা খাব—সেটা কি ভাল দেখায়।"

"তা হলে আমি উঠি। আপনি খান।"

"তুমি না খেলে আমি খাবই না। তাছাড়া একটা আমই যথেষ্ট আমার পক্ষে। অতগুলো আম নিয়ে কি করব আমি? তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। বাকিগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"রেখে দিন, কাল খাবেন।"

"আমি সঞ্চয় করি না। কালকের আহার কাল জুটেই যাবে কোথাও থেকে।"

ডানার মনে একটু খটকা লাগল। সন্দেহ হল, লোকটা তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য বাজে ভাঁওতা দিচ্ছে না তো! মুখে কিন্তু কিছু বললে না। শালপাতা থেকে আমের একটা চোকলা তুলে নিয়ে খেতে লাগল হাসিমুখে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসী নিজের এবং ডানার শালপাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, ডানাকে কিছুতেই ফেলতে দিলেন না। ডানা হাত মুখ ধুয়ে নিজের আঁচলেই হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, "আপনি এত একগুঁয়ে কেন বলুন তো?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

"কিছু বলছেন না যে?"

"যা বলতে ইচ্ছে করছে তা বললে তুমি আমাকে হয়তো ভণ্ড মনে করবে। এ সব জিনিস বললেই খেলো শোনায়। চুপ করে থাকাই ভাল।"

এবার ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগে ওঁকে ভণ্ডই মনে হচ্ছিল। তার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি! শক্তিশালী সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী। এ কথা সে শুনেছিল যেন কার কাছে! সরলভাবে সত্য কথাই বললে সে, "আমরা সাধারণ লোক অনেক সময় আপনাদের বুঝতে পারি না, তাই ভণ্ড বলে মনে হয়। ভণ্ড সাধুরও অভাব তো নেই দেশে।"

সন্ন্যাসী খুশী হলেন।

বললেন, "সত্যি কথা বললে বলতে হয়—আমিও ভণ্ড। আমার বাইরেটা দেখে বা আমার

কথাবার্তা শুনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা লোকের হওয়া স্বাভাবিক, আমি ঠিক তা নই। অথচ মুশকিল, আমি আমার বাইরের প্রকাশটা ঠিক আমার স্বরূপের অন্তরের অনুরূপ করতেও পারি না। তাই চেষ্টা করি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে।"

এই স্বীকারোক্তির পর কি বলা উচিত, ডানার মাথায় এল না। কিন্তু আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, লোকটা ভণ্ড নয়।

"উঞ্ছবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি কি একটা গল্প বলবেন বললেন বলুন না শুনি।"

"এ সব আজগুবি গল্প কি ভাল লাগবে তোমার? মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে গল্পটা। ধর্মারণ্য বলে একজন ব্রাহ্মণ কোন্ ধর্ম আচরণীয় তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে একজন পরামর্শ দিলেন—তুমি পদ্মনাভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ধর্মারণ্য পদ্মনাভের বাড়ি গিয়ে শুনলেন, পদ্মনাভ সকালে উঠে সূর্যের রথচক্র বহন করতে গেছেন। রোজই যান। সূর্য অস্ত গেলে তিনি বাড়ি ফিরবেন। ধর্মারণ্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে এলেন তিনি। ধর্মারণ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যলোকে কি কি আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন আপনি? পদ্মনাভ নানা রকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা করে শেষে বললেন—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে। তিনি সূর্যের মতোই জ্যোতিষ্মান। তিনি যেন দ্বিতীয় সূর্য। দেখলাম, তিনি এসে সূর্যের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেলেন। আমি সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আপনার মতো দীপ্তিশালী এই মহাপুরুষ কে? সূর্য বললেন—ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিধারী তপস্বী। এই গল্পটি শুনেই ধর্মারণ্য উঠে পড়লেন। পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন তা তো বললেন না? ধর্মারণ্য উত্তর দিলেন—আমি যা জানতে এসেছিলাম তা জেনেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তাই আমি চলে যাচ্ছি।—এই বলে প্রণাম করে তিনি চলে গেলেন।"

গল্পটি বলে সন্ন্যাসী চুপ করে রইলেন। ডানাও চুপ করে রইল। তার কানে এল অনেক দূরে বউ-কথা-কও পাখিটা আর একবার ডেকে উঠল। মনে হল, পাখিটাই যেন তাকে বললে—চুপ করে আছ কেন? কথা কও, যা জানতে চাইছ জেনে নাও। একটু ইতস্তত করে ডানা বললে, "উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে তা আমি জানি না। আমার মূর্খতায় আপনি হাসবেন হয়তো।"

"কুড়িয়ে খাওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ফল ফুল শস্য কন্দ কত রকম খাবার ছড়িয়ে পড়ে থাকে চতুর্দিকে। কুড়িয়ে খেলে একজনের অনায়াসে চলে যায়। বিষয়ী মানুষরাই কেবল খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে, পৃথিবীর বাকি সমস্ত প্রাণীই তো কুড়িয়ে খায়। পৃথিবীই অন্নপূর্ণা, তিনিই সকলের জন্য অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখছেন অহরহ। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?"

ডানা হেসে বললে, "পশুত্বের স্তরে নেমে আসাই তা হলে সাধুত্বের লক্ষণ বলুন!"

"পশুরা অসহায়। উঞ্ছবৃত্তি না করে ওদের উপায় নেই। মানুষ কিন্তু স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে রাজরাজেশ্বর হতে পারে আবার উঞ্ছবৃত্তিধারীও হতে পারে। সাধুরা রাজরাজেশ্বর হতে চান না, কারণ রাজরাজেশ্বর হলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাধুরা চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে চান।"

"সেই চিরানন্দলোক কোথায়? ঠিকানা পেলে যাবার চেষ্টা করতাম।"

"ঠিকানা কেউ বলে দিতে পারবে না। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমি কোথায় খুঁজব?"

"ঠিকানা তোমার মনের মধ্যেই আছে। যদি খোঁজ, পাবেই নিশ্চয়।"

"কই, কোনোদিন আভাস মাত্র তো পাইনি!"

"চেষ্টা করলেই পাবে। শুধু আভাস কেন, তোমার তেমন আগ্রহ যদি থাকে সাক্ষাৎদর্শন পর্যন্ত পাবে।"

"কার সাক্ষাৎদর্শন পাব?"

"সত্যের।"

"কিন্তু আপনি চিরানন্দলোকের কথা বলছিলেন যে!"

"সত্যই চিরানন্দময়। সত্যই আনন্দ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর। যে মুহূর্তে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে, সেই মুহূর্তে এমন আনন্দ তোমার সমস্ত সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাবে, যার শেষ নেই, যা অবর্ণনীয়।"

"কি রকম সে ব্যাপারটা—কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সেটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখেনি, তাকে বর্ণনা করে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার রাত্রি শেষ হলে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ করে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারও বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো করে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে।"

"কিন্তু আপনি এখনই তো বললেন, তা আমার মনের মধ্যেই আছে! তবে আবার দূরে আছে বলছেন কেন?"

"মনের মধ্যেই আছে। কিন্তু তোমার মন কি ছোট? সে যে বৃহৎ—অতি বৃহৎ। তারও সীমা নেই, শেষ নেই, তাও দুর থেকে দূরান্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিস্তৃত। তা তোমার ওই দেহটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার স্বরূপ-আবিষ্কারই তো আত্ম আবিষ্কার। সে আবিষ্কার সকলকেই করতে হবে একদিন, আর সেই আবিষ্কারের পথেই সত্য-দর্শনও হবে। তখনই বুঝতে পারবে, চিরানন্দলোক কোথায়।"

...ডানা আনত-দৃষ্টিতে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মনে হল, সে যেন খর-স্রোতে ভেসে চলেছে। ছোট একটা নৌকার উপর বসে আছে সে। কোথাও কূলকিনারা নেই। মনে হচ্ছে, স্রোতের ধারা দূরদিগন্তে আকাশে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। দিগন্ত রেখা সরে সরে যাচ্ছে কেবল। সে যে কঠিন মাটির উপর সন্ন্যাসীর সামনে বসে আছে, তা ভুলে গেল সহসা। কয়েক মুহূর্তের জন্য অসীম যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে পড়ল সে যেন, স্থান কাল অবরুদ্ধ হয়ে গেল তার চেতনা থেকে। একটা সুনিশ্চিত অবলম্বনের আশায় আকুল হয়ে উঠল সে...ভয়-ভয় করতে লাগল...মনে হল, নৌকাটা এই স্রোতের ধাক্কা কতক্ষণ সইতে পারবে—টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এখনই...আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই একটা। আশ্রয় মিলল। বাইরে একটা দোয়েল পাখি তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিলে। কি বললে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না; কিন্তু মনে হল, যেন আশ্রয় মিলল।

ডানা চেয়ে দেখলে, সন্ন্যাসী চোখ বুজে বসে আছেন।

।। আট ।।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ডানা যখন চলে এল, তখনও বাইরে রোদের তেজ একটুও কমেনি। তখনও 'লু' বইছে। বাইরের এই রুদ্র রূপ কিন্তু ডানার মনকে একটুও স্পর্শ করল না। সে সন্ন্যাসীর কথাই ভাবছিল, কেবল। ভাবছিল, উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যায় তুলনায় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওঁর কাছে। নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনের ভেতর দিয়ে কি পেতে চাইছেন উনি? ভগবানকে? উঞ্ছবৃত্তিধারী না হলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না? প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না, চুপ করে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, কখনও আবার সোৎসাহে এমন সব কথা বলেন য'র মানে বোঝা যায় না। অথচ ওঁকে পাগলও ঠিক বলা চলে কি! এই সব ভাবতে ভাবতে ডানা পথ চলছিল।

"মাসীমা, মাসীমা শুনুন।"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, চণ্ডী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কয়েক দিন আগে রূপচাঁদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছিল—ডানার মনে পড়ল।

"কি?" ডানা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চণ্ডী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চৌধুরীদের বাগানে একটা গাছে হলদে পাখির বাসা দেখে এসেছে গণেশ।"

"ও, আচ্ছা। গণেশকে নিয়ে এস। একটা চাকরকে নিয়ে যাব আমি। বাসাটা দেখব।"

"আপনি নিজে যাবেন?"

"যাব।"

"কখন আসব?"

"তোমাদের যখন সুবিধে। এখনও যেতে পারি।"

"গণেশকে নিয়ে আসছি তা হলে।"—চণ্ডী একছুটে চলে গেল আবার।

সন্ন্যাসীর কথাটা ডানার মনের প্রত্যক্ষলোক থেকে সরে গেল, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হল না। সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে দেখলে, কবি বসে আছেন। ডানাকে দেখেই বললেন, "ছিলে কোথা? অমরেশবাবুর একখানা চিঠি এসেছে। আমি ভাবছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখ। উনি সিমলায় গিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর ঘোরবারও ইচ্ছে আছে অথচ চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই যে, চিঠি লিখি।"

ডানা চিঠিখানা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি এই দুপুর রোদে?"

"সন্ন্যাসীটিকে কয়েকটা আম দিতে গিয়েছিলাম।"

"ও! সেই সন্ন্যাসী এখনও আছেন নাকি?

"আছেন।"

"চিঠিটা আর একবার পড় দেখি চেঁচিয়ে।"

ডানা পড়তে লাগল।—

প্রীতিভাজনেষু,

আনন্দবাবু, গতবার 'প্যারাডাইস ফ্ল্যাইক্যাচার'-এর (Paradise Flycatcher) যুগ্মমূর্তির একটা রঙিন ক্রিশমাস্ কার্ডে আপনি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। নকল করে

রেখেছিলেন কি না জানি না। তাই প্রতিলিপি আপনাকে আবার পাঠালাম। প্যারডাইস ফ্ল্যাইক্যাচারের দেশী নাম—দুধরাজ। কেউ কেউ শাহবুলবুল বলে। কিন্তু ওটা সম্ভবত ঠিক নয়। আপনার কবিতাটি এই—

১

সমাজ মানে আঁধার গলি
বাধার কাদা মানার পলি
পরদানসীন আনারকলি
ছদ্মবেশে তাই বুঝি।
চুলগুলো তাই বব্ করেছে
নাই বুঝি তাই বোরখাটা
পরদা-ভাঙা সুর ধরেছে—
জরদা-রঙের ওড়নাটা।

২

তেপান্তরি মাঠের শেষে
রূপান্তরি স্বপনদেশে
শঙ্খধবল পাখির বেশে
রাজপুত্র ওই বুঝি
নতুন ধরন নতুন বরণ
নতুন রকম ছন্দ রে
সাদায় কালোয় মেলায় চরণ
কষ্টি এবং মর্মরে।

কবিতাটি টুকে রাখবেন। আমার খুব ভাল লেগেছে। মেয়ে-পাখিটির মধ্যে আপনি যে আনারকলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে আপনার কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এখন সিমলায় আছি। কাশ্মীরের নানা জায়গায় বেড়াবার ইচ্ছে আছে। আপনাকে কাশ্মীরের পাখি বিষয়ে একটি বই পাঠালাম। ছবি দেখে যদি কবিতার প্রেরণা পান খুশি হব। যদি কবিতা লেখেন আমাকে পাঠাবেন।

এখানে অনেক নতুন পাখি দেখলাম।

আমাদের শালিকের মতো অনেকটা দেখতে একরকম পাখি আছে, গায়ে সাদা সাদা দাগ, নাম Straited Laughing Thrush (স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ্)—এদের দেশী নাম কি জানি না। তবে থ্রাশ্ পাখির কাস্তুরা, পাণ্ডু, শামা এসব নাম শুনেছি, পড়েওছি। এদের হুইশলিং ডাকটা খুব অদ্ভুত—'ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইট্'। এ অঞ্চলে এ পাখি অনেক। হিমালয়ের বসন্ত-বউরি পাখিও দেখলাম। বেশ বড় পাখি। প্রায় পায়রার মতো। সালিম আলির 'ইন্ডিয়ান হিল বার্ড্স্' বইটাতে ছবি আছে দেখবেন। পাখিটার সর্বাঙ্গে চমৎকার রঙ! নানা রকম রঙ। তাছাড়া গ্রেহেডেড ফ্লাইক্যাচার, ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচার (Verditer Fly catcher) অনেক দেখলাম এখানে। এই শেষোক্ত পাখিটি চমৎকার দেখতে। নীল রঙের ওপর সবুজের আভা। আপনি দেখলে নীল-পরী

বা ওই ধরনের কিছু একটা নামকরণ করে ফেলতেন। আসামের দিকে ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird) নামে নাকি এক রকম পাখি আছে, দেখিনি এখনও। এখানে হিমালয়ান হুইশলিং থ্রাশের একটানা শিস ঝরনার কলধ্বনি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেশ। কোকিলের কুহু কুহু ডাকেই অভ্যস্ত আমরা। এখানে কুলু উপত্যাকায় কুক্কুর 'কুক্-উ' ডাক শুনলাম। কিন্তু সালিম আলির বইয়ে একথা লেখা নেই। আর একটি নতুন পাখি দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। ব্রাউন ডিপার। ব্যাল নদীর স্রোতে খেলতে দেখলাম পাখিটিকে। এর কথা পড়ে দেখবেন। অদ্ভুত লাগবে। এরা খুব উঁচুতে তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে থাকে। আর খেলা করে স্বচ্ছ বরফ-গলা নদীস্রোতে। কথাটা যত সহজ শোনাল, আসলে ততটা সহজ নয়। পাহাড়ের বরফ-গলা নদী তোড়ে নেবে আসে—ফেনায় আবর্তে কলকলধ্বনিতে চতুর্দিক মাতিয়ে। এই দুর্দম দুরন্ত নদীর জলে ওই ছোট্ট বাদামী রঙের পাখিটি (আমাদের দোয়েলের চেয়ে বড় নয়) ঝাঁপাই ঝুড়তে ভালবাসে। জলের তলায় ডুব-সাঁতার কেটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ব্যাপারটা কল্পনা করুন। একে যদি জলপরি বলেন ঠিক মানাবে না। জলদস্যু বললে খানিকটা ঠিক হবে হয়তো। দু রকম ডিপার আছে, এক রকম পুরোপুরি বাদামী, আর এক রকমের বুকটা সাদা (এর ছবি সালেম আলিতে পাবেন)। ব্লু ম্যাগপাইও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। আপনার ওখানে যে ল্যাজঝোলা পাখি দেখেন (যার ইংরেজী নাম ট্রিপাই, বাংলায় কেউ কেউ হাঁড়িচাঁচাও বলে) তারই জ্ঞাতি এই ব্লু ম্যাগপাই। বেশ বড় পাখি। প্রায় বাইশ-তেইশ ইঞ্চি লম্বা হবে। ল্যাজটা খুবই লম্বা। নীল (প্রায় কালো) রঙের সঙ্গে সাদা ও ধূসরের অপূর্ব সমন্বয়। ঠোঁটটি লাল। হলদে ঠোঁটওলা আর একটা জাতও আছে, কিন্তু এখানে লাল-ঠোঁটই বেশি। কালীজ ফেজান্ট (Kaleej Pheasant), মোনাল ফেজান্টও (Monal Pheasant) দেখেছি। চমৎকার বর্ণসজ্জা! একটা 'স্কিন' জোগাড় করেছি। এখানে বার্কিং ডিয়ারও (Barking Deer) পাওয়া যায়। শিকার করতে দেখেছি।

আরও নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সব চিঠিতে লেখা যাবে না। আপনারা আশা করি ভাল আছেন। আমি দিন সাতেক পরে এখান থেকে চলে যাব আরও উঁচুতে। সম্ভব হলে নতুন ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব। শ্রীমতী ডানা আশা করি ভাল আছেন। আমার পাখিগুলি কেমন আছে?

আমরা ভাল আছি। আপনারা আমাদের ভালবাসা নিন। রত্না ডানাকে একটা চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু আর ডাকের সময় নেই। ইতি

আপনাদের অমরেশ

চিঠিপড়া শেষ হতেই কবি বললেন, "কাণ্ড দেখ! এ এক আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! এই খুনের মোকদ্দমা এখন কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। এখুনি আমার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ডানা একটু মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে কাজে ইস্তাফা দিলেও আপনি মোকদ্দমার হাত থেকে উদ্ধার পাবেন না।

"কেন?"

"যে মেয়েটি খুন হয়েছে তার ঘরে খানাতল্লাশি করে পুলিস আপনার লেখা এক টুকরো চিঠি নাকি বার করেছে। বাকি খাজনার নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে আপনি কিছু লিখেছিলেন নাকি?"

"লিখেছিলাম হয়তো। শুধু তার নয়, অনেকেরই নোটিশের পিছনে লিখেছি। দেখলাম, অনেক খাজনা বাকি পড়ে রয়েছে, যদি কিছু মাপ করে দিলে আদায় হয় তাই সে কথা লিখে দিয়েছিলাম অনেক নোটিশের পেছনে। কেন, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে?"

"অন্যায় কিছু হয়নি। তবে পুলিশ নাকি ওই সূত্র ধরেই আপনাকে জড়িয়েছে এতে?"

"কে বললে?"

"রূপচাঁদবাবু।"

"রূপচাঁদ কবে এসেছিল তোমার কাছে?"

"আপনি যেদিন সদর এস. ডি. ও.র কাছে যান, সেই দিনই। ও নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের এস্টেটের ভাল উকিল আছেন, তিনি যা করবার করবেন। আমি ফিরে এসেই অমরবাবুর স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি। কিন্তু তিনি সে চিঠি পাবেন না বোধ হয়।"

"কি লিখেছ?"

"এখানকার সব ঘটনা। আপনি অমরবাবুকে কিছু লেখেননি? ওঁদের সব জানানোই তো ভাল।"

"আমি ভাবছিলাম, কাজে একেবারে ইস্তাফা দিয়ে দেব। কিন্তু মন স্থির করতে পারিনি, তাই দেরি হচ্ছে। তোমার মতে তা হলে কাজ ছাড়া ঠিক নয়?"

ডানা হেসে বললে, "সেটা আপনি ঠিক করুন। আমি কি বলব!"

"না, তুমিই ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই করব। আমার নিজের উপর আর আস্থা নেই।"

কবির কণ্ঠে যে অসহায় সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তা শিশুর কণ্ঠেই মানায়।

ডানা হাসিমুখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বললে, "তাড়াতাড়ি এখন কাজ ছাড়বার দরকার কি! যেমন চলছে চলুক না। এ মোকদ্দমার কিছু হবে না।"

"বেশ।"

গণশাকে সঙ্গে করে চণ্ডী এসে হাজির হল। গণশা চণ্ডীরই সমবয়সী, কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, পরিধানে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট, হাতে একটি গুলতি। ডানার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, "আপনি ডেকেছেন আমাকে?"

ডানা একবার চণ্ডীর দিকে একবার গণশার দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি হলদে পাখির বাসা কোথায় দেখেছ?"

"অমরবাবুর বাগানে।"

"আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

"পারব। অনেক উঁচুতে আছে। গাছে না উঠলে দেখা যাবে না। কিন্তু।"

"আমার দূরবীন আছে, আমি নীচে থেকেই দেখতে পাব।"

"বেশ, চলুন তা হলে।"

ডানা কবির দিকে ফিরে বললে, "আপনি বসুন। আমি হলদে পাখির বাসাটা দেখে আসি চট করে।"

কবি বললেন, "এরা কে?"

"চণ্ডী আর গণেশ। এদের হলদে পাখির বাসার সন্ধান করতে বলেছিলাম।"

"আপনি বসুন। আমার বেশি দেবি হবে না।"

"চল না, আমিও যাই।"

"না, এই রোদে আপনার কষ্ট হবে। আপনি বরং বসুন এখানে। এই বইগুলো ওলটান কিংবা লিখুন কিছু।"

"বেশ। বেশী দেরি করো না কিন্তু।"

"না দেরি হবে না।"

চণ্ডী ও গণশাকে নিয়ে ডানা বেরিয়ে পড়ল।

অমরবাবুর বাগানে ডানা ইতিপূর্বে আসেনি কখনও। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, এ একটা আলাদা জগৎ যার পরিচয় সে জানত না। নানা রকম পাখি ডাকছে—কোকিল, বসন্ত-বউরি, চোখ-গেল, দোয়েল, ফিঙে, নীলকণ্ঠ। ভগীরথের অবিশ্রান্ত টুক্-টুক্-টুক্ও ধ্বনিত হচ্ছে কোথায় যেন। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙের। পতঙ্গের বিচিত্র ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূরে একটা তালগাছের ওপর শকুনি বসে আছে একটা। আর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আমগাছেরা—কেউ ফলভারনত, কেউ মুকুল-ভূষিত, কেউ রিক্ত, কারও বা শাখায় কিশলয়ের শোভা। তারা নীরব ভাষায় যা বলছে তা অবর্ণনীয়। ডানা বাগানের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হল সন্ন্যাসীর কথা। মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানলে মানুষের কোনো ভয় থাকে না, তিনি অভয়। এমন ভাবে বলেছিলেন যেন তিনি চেনেন তাঁকে। অথচ স্বীকার করেন না সে কথা। বলেন—পাইনি এখনও, খুঁজছি। ডানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওই মুকুল-ভরা আমগাছ, ওই দোয়েলের গিটকিরি, ওই পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার আর ওই শকুনির বীভৎস চেহারা—এ সবই ব্রহ্মের প্রকাশ? এদের মধ্যে মিল কোথায়? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন।

চণ্ডী আর গণেশ এসেই চলে গিয়েছিল খুব বড় একটা আমগাছের তলায়। গণেশ গাছটায় উঠেছিল। ডানা দেখতে পেলে, গণেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডানা এগিয়ে গেল। গণেশ গাছের ওপর থেকেই ফিসফিস করে বললে, "আমি যেদিকে আঙুল দেখাব, সেইদিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওই যে ডালটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই ডগায় দেখুন বাটির মতো ঝুলছে, তার ওপরে হলদে পাখিটা বসেও আছে। ওই দেখুন, উড়ে গেল।"

ডানা দূরবীন দিয়ে বাসাটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পাখিটাকে দেখতে পায়নি।

বললে, "দেখেছি। নেবে এস। রোজ এসে খবর নিতে হবে। ওটা হলদে পাখিরই বাসা।"

গণেশ তরতর করে নেবে পড়ল।

"রোজ খবর নেওয়া তো মুশকিল। ইস্কুল পালিয়ে আসা যাবে না। মাসী জানতে পারলে খাওয়াই বন্ধ করে দেবে।"

"ও! মাসীমা বুঝি খুব কড়া গার্জেন?"

"আর বলবেন না। সমস্ত সকালটি তাঁর সামনে বসে পড়া করতে হয়। দুপুরে ইস্কুল, সেখানে আছেন রামবাবু। আসলে তিনি রাবণবাবু। একটি ভুল হলে আর রক্ষে নেই। বিকেলে ফিরে জলখাবার খেয়ে মাসীমার সামনে বসে দুখানি বাংলা, ইংরিজী হাতের লেখা লিখে তবে

ছুটি। তখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন এই বাগানে এসে কি পাখির খবর নেওয়া যায়। রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে নিতে পারি।"

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মা-বাবা কোথা?"

"তাঁরা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। মাসীই আমাকে মানুষ করেছেন।"

"তোমার মেসোমশাই কি করেন?"

"তিনিও মারা গেছেন। অমরবাবুর এস্টেটে চাকরি করতেন আগে।"

"এখন তোমাদের চলে কি করে তা হলে?"

"অমরবাবুর এস্টেট থেকেই মাসী মাসোহরা পান। কিছু জমিও দিয়েছেন অমরবাবু।"

"তোমার মাসীমার ছেলেপিলে কটি?"

"মাসীর কোনও ছেলে হয়নি।"

চলতে চলতে কথাবার্তা হচ্ছিল। চণ্ডী চুপ করে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে বললে "গণশা প্রতিবার ফার্স্ট হয়।"

গণেশ ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর, ফাজিল কোথাকার!"

চণ্ডী যেন চুপসে গেল।

এই দুটি কিশোরের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল ডানার। একটা গোপন মাধুর্য ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ করে তুলছিল। তার এও মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর চারিদিকে—দূরে নিকটে এই যে এত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ কোনো যোগ নেই। সকলের কাছেই সে যেন পর। কারোরই আপন লোক নয় সে। সবাই তাকে খাতির করে, অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো কথাও কয়, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেতে ও চায় দু-একজন (আনন্দবাবু, রূপচাঁদ); কিন্তু দূরত্বটা যেন ঘুচতে চায় না। মনে হয় সে যেন এদের মাঝখানে আগন্তুক একজন। এসেছে, আবার চলে যাবে। সন্ন্যাসীর কথা মনে হল হঠাৎ। মনে হল আজই আবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

চণ্ডী বললে, "আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব রোজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি গাছে উঠতে পারি না ভাল।"

"তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। আমিই আসব এখন বিকেলের দিকে।"

"আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। আমাকে দূরবীন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তো?"

"দেব।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চণ্ডী সসঙ্কোচে বললে, "রূপচাঁদবাবুর বাড়ি যাবেন? কাছেই খুব।"

"রূপচাঁদবাবু আপিস থেকে ফিরেছেন এখন। বকুলদি ব্যস্ত আছেন। পরে যাব কোনদিন দুপুরে।"

"কবে যাবেন?"

চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল। ডানা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললে, "দুপুরে যাওয়াই ভাল। আপনি যেদিন বলবেন এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল যাবেন?"

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"কাল সকালে এসে তা হলে জেনে যাব। কেমন?"

"আচ্ছা।"

চণ্ডীর কেন যেন মনে হচ্ছিল ডানার সঙ্গে বকুলবালার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে তার এয়ার্-গান্ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

গণেশ হঠাৎ বললে, "ফিঙে পাখির বাসাও দেখেছি আমি একটা। অনেকটা হলদে পাখির বাসার মতো দেখতে। একবার দেখেছিলাম, একই গাছে প্রায় পাশাপাশি ফিঙে পাখি আর হলদে পাখির বাসা ছিল।"

গণেশের কথাবার্তায় ডানা বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান। তার মনে হল অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হয়তো ছেলেটিকে ভাল করে মানুষ করে তুলতে সাহায্য করবেন।

"পাখির বাসা দেখবার খুব ঝোঁক বুঝি তোমার?"

গণেশ বললে "ঝোঁক আগে ছিল না। কিন্তু অমরেশবাবু বলেছেন যে, পাখি সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখবে তাকে তিনি একশো টাকার প্রাইজ দেবেন। প্রাইজটা আমাকে নিতে হবে। অমরেশবাবু বলেছেন—বই দেখে লিখলে চলবে না, নিজের চোখে পাখিদের লক্ষ্য করে লিখতে হবে। তাই সময় পেলেই পাখি দেখে বেড়াই।"

"তুমি লক্ষ্য করেছ কিছু?"

"কিছু কিছু করেছি।"

"খাতায় লিখে রেখেছ?"

"রেখেছি।"

"দেখিও তো আমাকে একদিন।"

"আচ্ছা। আমি এবার যাই। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ওই যে আমার বাড়ি।"

গণেশ আঙুল দিয়ে ছোট একটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

"ও, আচ্ছা। তোমার মাসীমার সঙ্গে এসে আলাপ করব একদিন।"

"আসবেন।"

গণেশ চলে গেল।

গণেশ সব দিক দিয়েই চণ্ডীর চেয়ে ভাল ছেলে। উঁচু ক্লাসে পড়ে, ফার্স্ট হয়, পাখির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে—এসবই সত্য; কিন্তু এ সত্য ডানার কাছে এমন ভাবে প্রকটিত হওয়াতে চণ্ডী একটু মন-মরা হয়ে পড়ল। সে স্কুল-পালানো খারাপ ছেলে। এক বকুলবালা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার আশা হয়েছিল, ডানাও হয়তো দেবে। কিন্তু গণেশের মতো একটা জ্যোতিষ্ক এসে পড়াতে সে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "গণশা মাথায় মাথায় আমার মতো দেখতে। কিন্তু ওর বয়স হয়েছে বেশ। ষোল পেরিয়ে গেছে—ওর মাসী বলছিল।"

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, কোনও উত্তর দিলে না। চণ্ডী আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ডানার দিকে, আর কিছু বলা সমীচীন মনে হল না তার। নীরবেই বাকি পথটুকু হেঁটে ডানার বাসার কাছাকাছি যখন এল, তখন বললে, "মাসীমা, আমি তা হলে এবার যাই। কাল আসব সকালে।"

"এসো। কিছু খাবে নাকি?"

"না, আমার খিদে পায়নি।"

"তবু দুখানা বিস্কুট নিয়ে যাও।"

ডানা ঘরে ঢুকে চারখানা বিস্কুট এনে দিলে তাকে। মহানন্দে চলে গেল চণ্ডী। ডানা ঘরে ঢুকে দেখলে, কবি টেবিলের উপর কবিতা লিখে গেছেন একটা।

"অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে একটি পাখির ছবি দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টা করলাম। এই দাঁড়াল—

১

খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই
এটা পড়ে, ওটা পড়ে না,
আসল পাখির সাথে ছবিটার মিল নেই
এটা নড়ে, ওটা নড়ে না।
কার সাথে কার কত মিল বা অমিল আছে
খুঁজি খালি দিবা-রাতি রে
হিসাবের গোলমালে বেসামাল হয়ে পাছে
ছুঁচো বলে ফেলি হাতীরে
এই ভয়ে ক্রমাগত কষিতেছি অঙ্ক
ওদিকে কমল ফোটে ভেদ করি পঙ্ক।

২

জীবনের পথে যেতে দেখা হল যার সাথে
সে যেন রাগিণী ললিতা
কিংবা পাহাড়ি-পথে ঝরনার ধারা যেন
উচ্ছলা কল-কবিতা!
তারে লয়ে কি করিব ভাবিতে ভাবিতে মোর
বেলা বয়ে গেল হায় রে
কি লেবেল গায়ে তার জানি না মানাবে ঠিক
বিবেক যে ধমকায় রে
"ঠিক করে যুক্তির তুলোটাকে ধোন্ না
ওটা তোর মাসী, পিসী, প্রেয়সী না কন্যা!"

৩

কবি কয়—দুত্তোর
দেব নাকো উত্তর!"

কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ডানা। আবার পড়ল কবিতাটা। তার অজ্ঞাতসারেই সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে, অন্তর্লীন একটা গর্ব যেন অভিব্যক্ত হতে চাইল সে হাসির রেখায়। হঠাৎ কিন্তু ভয় হল তার, মনে হল, সে যেন অতলস্পর্শ একটা গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেসামাল হলেই পড়ে যাবে। আবার ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল সে। মনে হল। ঘরের ভিতরেই বুঝি বিপদটা লুকিয়ে আছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মুখে লাগল

রোদের তাত, চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় উদ্দাম বর্ণসমারোহ, কানে এল দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্ষণকালের জন্য। মনে হল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে; যেন বলছে—পালাচ্ছ কোথায়, পালাচ্ছ কেন, চারিদিকেই যে ফাঁদ! কৃষ্ণচূড়ার ফুলে, দোয়েলের গানে, স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে যে নাটক জমে উঠছে তাতে যোগ না দিয়ে পালাবার প্রবৃত্তি কেন তোমার! এই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল। আনন্দ হল, ভয়ও হল। মনে হতে লাগল, তার বুকের ভিতর কাঁটার মতো কি যেন একটা বিঁধে আছে, যা আনন্দজনক অথচ কষ্টকর। আবার চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী কি আছেন এখন বাসায়? না থাকলেও খুঁজে বার করবে সে। একমাত্র ওই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল। বেশ দ্রুতপদে চলতে লাগল সে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল, কি বলবে তাঁকে গিয়ে। এই তো কিছুক্ষণ আগে আম দেওয়ার ছুতোয় গিয়েছিল তাঁর কাছে, এখন কোন্ ছুতোয় যাচ্ছে? যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দিতে হবে তো। কি বলবে গিয়ে? নারীর সান্নিধ্য যিনি পছন্দ করেন না, তাঁর কাছে এমনভাবে যাওয়ার অর্থই বা কি! নিজের উপর রাগ হল, মনে মনে নিজেকেই সে বলতে লাগল—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করে নাও না, পরের কাছে সাহায্য চাইতে যাচ্ছ কেন? উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ওঁকে বিব্রত করার মানে হয় না। তবু কিন্তু সে থামল না, চলতে লাগল। সন্ন্যাসীর বাসার কাছে এসেই চোখে পড়ল, উনি সেই শাবলটা একটা পাথরে ঘষে ঘষে শান দিচ্ছেন। ডানার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শাবলটা সরিয়ে রেখে দিলেন।

"আবার কি মনে করে?"

ডানার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের উত্তর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"একটা কথা জানতে এলাম। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়? ইংরেজিতে যাকে নেচার বলে, তাই কি প্রকৃতি?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বললেন, "হঠাৎ এ আগ্রহ হল কেন?"

"আগ্রহ ঠিক নয়, কৌতূহল হয়েছে। নানারকম পাখি গান করছে, সঙ্গিনীকে ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভ্রমর আসছে, আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যেও অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। একা একা বসে প্রকৃতির কত লীলা দেখি রোজ। নিজের মধ্যেও প্রকৃতির নিগূঢ় ষড়যন্ত্র টের পাই। তাই মনে হল, প্রকৃতির রহস্যটা কি জেনে আসি একটু আপনার কাছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি যা বর্ণনা করলে তা প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। এই সাম্যভাব বিচলিত হলেই সক্রিয় হয়, তখনই সৃষ্টি-লীলা আমাদের ইন্দ্রিয়লোকে ফুটে ওঠে। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও আমাদের নেই।"

"তাহলে তার অস্তিত্ব আছে তা বোঝেন কি করে?"

"অনুমান করে, ধ্যান করে।"

ডানা চুপ করে রইল। সন্ন্যাসী একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ

বেরুলেন না। ডানা বসেই রইল চুপ করে। সন্ন্যাসীর কাছে এসে সে যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির স্বরূপ জানতে সে সন্ন্যাসীর কাছে আসেনি। সে এসেছিল তার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি জাগছে, বৈশাখের উন্মত্ত প্রকৃতি যে অস্বস্তিকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলছে, সেই অস্বস্তির প্রতিকার-কামনায়। সে ভেবেছিল, সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝবেন, কিন্তু তিনি একেবারে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করলেন। আনন্দবাবু কবিতার ইঙ্গিতে ক্রমাগত যা বলতে চাইছেন তা ভাল লাগছে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। আনন্দবাবু নিজেও সেটা বলতে চাইছেন না। একটু আগে যে কবিতাটি লিখেছেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেছেন—"কবি বলে দুত্তোর, দেব নাকো উত্তর।" ওঁর মনের ভিতরেও সে কথাটা স্পষ্ট নেই কি? কে জানে!

সন্ন্যাসী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হঠাৎ। এসে বললেন, "প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অশান্তি আছে। ওতে ভয় পেয়ো না। ওটা জীবনের লক্ষণ। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই হল, বাকি সব তুচ্ছ! কিসের অভাবে তোমার জীবন অশান্তিময় হয়েছে, তা জানলে চেষ্টা করতাম সে অভাব পূরণ করবার। বেশ তো আছ, কিসের অভাব তোমার?"

ডানা হেসে বললে, "আপনার কাছে বলতে লজ্জা করছে।"

"কিসের লজ্জা?"

"আমার অভাব টাকার। যদি অনেক টাকা পেতাম তা হলে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি থাকতে পারতাম। টাকা নেই, তাই চাকরির গ্লানি বহন করতে হচ্ছে—আপানর মতো লোকের কাছে এই তুচ্ছ কথাটা বলা লজ্জাকর বইকি।"

সন্ন্যাসী চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হেসে বললে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভাবনাই সিদ্ধির রূপ ধরে আসে। হয়তো তোমার কামনা নিষ্ফল হবে না। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। তুমি বসবে নাকি?"

"না, চলুন, আমিও যাই। কোন্ দিকে যাবেন আপনি?"

"চরের দিকে। স্নান করব।"

"আপনার সেই পাখির দল আছে এখনও?"

"আছে। তবে অনেক পাখি চলে গেছে।"

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অমরবাবুর পাখিগুলোর খবর নিতে হবে।"

"অমরবাবুর পাখি পোষার শখ আছে নাকি?"

"আছে। উনি পাখি পুষেছেন পক্ষীবিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে।"

"ও।"

সন্ন্যাসী চরের দিকে চলে গেলেন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে চেয়ে, তারপর চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে দেখলে, আনন্দবাবু বসে আছেন।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি?"

"একটু বেরিয়েছিলাম।"

সত্য কথাটা ডানা চেপে গেল। আনন্দবাবুও আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না, যে সংবাদটি এনেছিলেন তারই উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ছিলেন তিনি।

"জান, নিখিল এসেছিল একটু আগে?"

"নিখিল কে?"

"ম্যাজিস্ট্রেট এখানকার। সত্যিই সে আমার ছাত্র। চমৎকার ছেলে।"

"মোকদ্দমার কথা কি বললেন?"

"ও মোকদ্দমা ডিসমিস হয়ে যাবে। কেসটা যে সাজানো তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু আমি আর এক মুশকিলে পড়েছি যে!"

"আবার কি?"

"অমরবাবু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।"

"তিনি কাশ্মীর যাবেন লিখেছিলেন যে?"

"কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আপনি এখন যাবেন কি করে? আপনি জামিনে খালাস আছেন, মোকদ্দমার দিন আপনাকে তো হাজির থাকতে হবে।"

"দেখি, নিখিলের সঙ্গে দেখা করি। নিখিল চলে যাবার ঠিক পরেই টেলিগ্রামটা এল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করি, কি বল?"

"তাই করুন। তা হলে তো এখনই বেরুতে হয় আপনাকে। আর একঘণ্টা পরেই ট্রেন।'

"তাই নাকি? আমি উঠি তা হলে।"

আনন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলেন আবার।

"আমি তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেলাম। আমি কবিতায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে ফেলি—না লিখে পারি না, তাতে তুমি রাগ করো না বা ভয় পেয়ো না। আমার কবি-সত্তা কল্পনালোকে তোমাকে নিয়ে যে উৎসব করে, আমার সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি বোধহয়। আবার বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমার কবিতা তোমার মনে ঠিক—মানে—"

ইতস্তত করে কবি থেমে গেলেন।

ডানা স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি থামতেই চোখ তুলে বললে, "আপনার কবিতা খুব ভাল লাগে আমার। আর সেই জন্যেই বোধহয় ভয় করে।"

"জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার মেঘ, ফুল, পাখি—এদের দেখেও ভয় করে নাকি?"

"তার মানে?"

"কথাটা ভাব। পরে আলোচনা হবে। চললুম।"

কবি চলে গেলেন।

ডানা স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। পাখিগুলোর তদারক করতে এখুনি তাকে বেরুতে হবে। জ্বলন্ত স্টোভের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। আনন্দবাবু যা বলে গেলেন তার অর্থ কি! জ্যোৎস্না, ফুল, পাখি—এরাও তো এক-একটা সৃষ্টি, কবিতাও সৃষ্টি, আনন্দবাবুর কবিতা পড়ে কিন্তু ভয় হয়। যেমন ব্যাঘ্র নামক পশুটি সৃষ্টি হিসাবে চমৎকার

হলেও তাকে দেখলে ভয় হয়। আনন্দবাবুর কবিতার সঙ্গে বাঘের উপমা দিয়ে নিজেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, আনন্দবাবুর কবিতার মধ্যে এমন একটা কি যেন আছে যা ভীতিজনক, অস্বস্তিকর। ভাবতে ভাবতে নতুন কথা মনে হল একটা। মনে হল, তার এই চিন্তার মধ্যে অহঙ্কার কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই। সে নিজেকে এমন মোহিনী রূপসী বলে কেন ভাবছে? আনন্দবাবুর মতো বিজ্ঞ লোক তাকে দেখে বেসামাল হয়ে পড়বেন—এই কুৎসিত চিন্তা তার মনে আসছেই বা কেন? আনন্দবাবু কবিতায় যা-ই লিখুন, তাঁর ব্যবহারে কোনো অশোভনতা তো সে লক্ষ্য করেনি।......কবিতায় কবিরা একটু বাড়াবাড়ি করেই থাকেন। সে বাড়াবাড়িকে সত্য মনে করা হাস্যকর নয় কি? সে কি কর্পূরলতা, না, মন্দারমালা! উচ্ছলা কলকলিতা পাহাড়ী ঝরণার সঙ্গেই বা তার মিল কোথায়! এই অসম্ভব উদ্ভট ধারণা কেন তার মনে আসছে। কেন সে ওই কবিতাগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়াচ্ছে! কেন? হঠাৎ রূপচাঁদবাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটির আচরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন কিছু নেই। ধূর্ত শিকারী। একটা কথা মনে হওয়াতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রূপচাঁদবাবুর অভব্যতাকে সে যদিও প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু তার বর্বরতাটা মনের নিভৃতে উপভোগ করেছে সে। আশ্চর্য।

চায়ের জলটা ফুটে উঠল।

।। নয় ।।

ট্রেন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও সূর্য ওঠেনি। কবি প্রত্যাশা করেননি যে, এত ভোরে অমরবাবু স্টেশনে আসবেন তাঁকে নিতে। তিনি গ্র্যান্ড হোটেলের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে—এই ঠিক করে রেখেছিলেন কবি। ধরতে যদি না পারেন, তা হলে কি অকূল পাথারে যে পড়বেন তা ভেবেও চিন্তিত ছিলেন একটু। যে লোক সিমলা থেকে হঠাৎ কলকাতা চলে আসতে পারে, তার পক্ষে কলকাতার হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। অমরবাবুকে সশরীরে স্টেশনে দেখে আনন্দবাবু শুধু আনন্দিত হলেন তা নয় একটু অবাকও হলেন।

"জিনিসপত্র খুব বেশী আছে নাকি সঙ্গে?"

"না, স্যুটকেস আর বিছানটা।"

"কবিতার খাতাখানা এনেছেন তো?"

"এনেছি।"

"এইখানেই হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে তা হলে সোজা এখান থেকেই যাওয়া যাক।"

"কোথা যেতে হবে?"

"সন্টলেক।"

কবির চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললেন অমরবাবু।

"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

"সিমলা থেকে হঠাৎ এখানে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন, তারপর দুজনে মিলে সল্টলেকে যাচ্ছি, একটু দুর্বোধ্য বইকি!"

অমরবাবু ব্যাপারটা যেন উপভোগ করলেন মনে মনে, ছোট ছেলেরা নিজেদের জানা হেঁয়ালী অপরকে সমাধান করতে বলে যেমন মজা উপভোগ করে অনেকটা তেমনি। কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, "হোরেস অ্যালেকজান্ডারের নাম শুনেছেন?"

"না। কে তিনি?"

"একজন বড় পক্ষীবিজ্ঞানী। খঞ্জন-স্পেশালিস্ট। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। হঠাৎ সিমলায় চিঠি পেলাম, তিনি কলকাতায় আসছেন দুদিনের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্য। তাই কালবিলম্ব না করে চলে এলাম। কাল আর পরশু—দুদিন তাঁর সঙ্গে সল্ট লেকে ঘুরেছি, নানারকম পাখি দেখলাম, অনেক পাখি এর আগে দেখিইনি। অ্যালেকজান্ডার কাল চলে গেছেন। আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন দুটো কারণে। প্রথম, আপনাকেও পাখিগুলো দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়, আপনার আর ডানার চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি কোন এক খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আসতেই পারবেন না। আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘামাবার মতো যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা রত্না ঘামাবে। সে এতক্ষণ ডানার কাছে পৌঁছে গেছে সম্ভবত। এবার আশাকরি আর কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে না? চলুন, সোজা বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। আগে কিছু খেয়ে নিন।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "সল্টলেকটা কোথায়?"

"বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে। সল্টলেকের বাংলা নাম হচ্ছে ভাঙড়, প্রচুর পাখি আছে মশাই, স্বদেশী বিদেশী দুই-ই। আপনি গেছেন কখনও?"

"না। কখনও দরকার পড়েনি।"

"চমৎকার জায়গা। জলের মধ্যে আল-বাঁধা জমি, তা ছাড়া জলা, ডোবা, ঝিল, হ্রদ সব একসঙ্গে পাবেন। আবার ওর ভিতর বাবলা গাছও আছে, ছোট বড় ঝোপঝাড়ও আছে, নল বন, নানাজাতের শর, হোগলা, শ্যাওলা, দেশী পানা, কচুরিপানা—হরেক রকম জিনিস দেখবেন সেখানে। আজ বিশেষ করে গ্রেট মার্শ ওয়ার্বলার (Great Marsh Warbler) দেখাতে চাই আপনাকে। দেখতে বোধহয় পাবেন না, ডাক শুনেই ফিরে আসতে হবে। নল বনের ভিতর ঢুকে থাকে ওরা। চলুন, যাওয়া যাক।"

স্টেশনের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে সল্টলেকের উদ্দেশ্যে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। খাল পেরিয়ে তবে সল্টলেকে পৌঁছতে হবে। পারাপার করবার জন্য খেয়া আছে। কবি আর বিজ্ঞানী খেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"দেখুন, দেখুন—"

"কই, কি?"

"উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক।"

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

কবি বললেন, "শালিক অনেক দেখেছি।"

"কিন্তু এমন দল বেঁধে এত উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন? সাধারণত সকাল বেলায় ওরা এমন করে উড়ে বেড়ায়। এক্‌সারসাইজ করে সম্ভবত। আগেও লক্ষ্য করেছি।"

কবি চুপ করে রইলেন।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, "পাখিদের নানাভাবে লক্ষ্য করলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ধরুন, এই শালিকরাই সমস্ত দিন কখন কি ভাবে চলাফেরা করে তার একটা রেকর্ড যদি রাখা যায়, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেদিন আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা বাগানে রোজ যেতাম। যখনই ভোরে গেছি তখনই দেখেছি, 'ফটিক জল' পাখিরা এ-গাছ ও-গাছে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিন যেতে একটু বেলা হল, দেখি, ফটিক-জল একটিও নেই, ঘুঘুর দল এসেছে। মনে হল, প্রত্যেক পাখির বোধহয় খেলা করবার নির্দিষ্ট সময় আছে একটা। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য না করলে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আপনাকে আইডিয়াটা দিয়ে দিলাম, ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তো যদি সময় পান। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না তো! ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না, আমলা-গোমস্তারা যা পারে করুক, আপনি শুধু একটু নজর রাখবেন। ব্যাস্‌। বেশী গোলমাল দেখেন তো রত্নাকে খবর দিয়ে দেবেন। ও এসব ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে। চলুন এবার।"

খেয়াটা এসে ভিড়ল। যাত্রীর দল নেমে গেল। ঝুড়ি-মাথায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি গ্রাম থেকে তরি-তরকারি মাছ নিয়ে যাচ্ছে শহরের বাজারে। একজনের সঙ্গে একটি ছাগ-শিশুও ছিল। কবি আর বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন মৎস্য শিকারীও উঠলেন। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হল আল ধরে।

"দেখুন, দেখুন, কি বলুন তো এগুলো? বাইনাকুলারটা নিয়ে ভাল করে দেখুন।"

বাইনাকুলারটা নিয়ে কবি দেখতে লাগলেন।

"বক মনে হচ্ছে।"

"গ্রে হেরন (Grey Heron)। ওরা খেয়ে ফিরছে সম্ভবত। ওরা খুব ভোরে একবার খায়, আর একবার খায় সন্ধ্যায় দিকে। সমস্ত দিন কোনও গাছে নিঝ্‌ঝুম হয়ে বসে থাকে।"

কবি যতক্ষণ দেখা গেল হেরনগুলিকে দেখলেন।

তারপর বললেন, "এখানে কোথাও যদি বসবার জায়গা পাওয়া যেত একটু, বেশ হত।"

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেক হাঁটতে হবে এখন।"

"হাঁটতে পারব, বসবার জায়গা খুঁজছি কবিতা লিখব বলে।"

"গুড। আছে জায়গা,—ওই দেখুন।"

দূরে একটি কুটির ছিল। অমরবাবু সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

"ও তো বেশ ভাল জায়গা। চেনা-শোনা আছে নাকি আপনার সঙ্গে?"

"না, তবে চেনা-শোনা করে নিতে কতক্ষণ। এটা ভারতবর্ষ—সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মশাই? তা ছাড়া কবি-গুরুর সেই কবিতাটাই বা ভুলে যাচ্ছেন কেন—কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই? আসুন।"

অমরবাবু হনহন করে, প্রায় ছুটে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে বললেন, "বাইনাকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।"

কবির মনে যে কবিতার ভাব জেগেছিল, সেইটেতে তা দিতে দিতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন

তিনি। আলোর উপর দিয়ে বেশি জোরে চলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কুটিরের কাছাকাছি এসে কবি দেখলেন, কুটিরের মালিক অমরবাবুর সঙ্গে আলাপ করে বেশ গদগদ হয়ে পড়েছেন। মনে হল, লোকটি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে সের পাঁচেক দুধ ছিল, অমরবাবু সমস্তটা কিনে নিয়েছেন। কবি শুনলেন, অমরবাবু বলছে—"দুধটা একটু গরম করে দিতে হবে কিন্তু। আর গোটা দুই গেলাস, আর একটু জল চাই।"

ঝোলা-গোঁফ দুগ্ধ-ব্যবসায়ী সবিনয়ে বললেন, "সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বাবু। আপনারা ততক্ষণ পাখি দেখুন, আমি পীতুকে ডেকে আনি। সে এসে সব ব্যবস্থা করে দেবে আপনাদের। এক শিকারী বাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার পিছু পিছু ঘুরছে শালা।"

"পীতু তোমার চাকর বুঝি?"

"আমার ছেলে বাবু। চাকর রাখবার মতো পয়সা আছে কি বাবু? নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নিই। দুধ কেনা-বেচা করে কায়ক্লেশে সংসার চালাই কোনো রকমে। আপনারা এই চৌকিটাতে বসুন। আমি যাব আর আসব।"

"তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

অমরবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

"আমার নাম নীলাম্বর; 'নীলু' বলেই ডাকবেন আমাকে। আমার ছেলের নাম পীতাম্বর, ডাকনাম পীতু।"

"ও—"

"পীতুকে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা বসুন।"

নীলাম্বর চলে যেতেই অমরবাবুর চোখে শিশুসুলভ দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল।

"আপনি ওই চৌকিটাতে বসে ততক্ষণ যা মনে এসেছে লিখে ফেলুন। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওই যে ওই গাছের ডগায় বসে আছে ওটা কি? ঠিক চিল বলে মনে হচ্ছে না। আর একটু এগিয়ে না গেলে ফোকাস করতে পারব না। আপনি কি বিষয়ে লিখবেন এখন? খুব গ্র্যান্ড ভাব এসে গেছে নিশ্চয়?"

"ওই বকগুলোর কথা শুনে দু-চার লাইন মনে এসেছে, তাই লিখে রাখব।"

"হেরনদের সম্বন্ধে লিখবেন? তা হলে হেরনদের কোর্টশিপের ব্যাপারটা শুনে নিন। আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। হেরন-যুবা প্রিয়ার সন্ধান করবার আগে ঠিক করে, কোথায় বাসা বাঁধবে। সেটা ঠিক হয়ে গেল হেরন যুবা সেই নির্বাচিত বৃক্ষের একটি শাখায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শব্দ করে 'উ উ উ উ'। যতক্ষণ না প্রিয়ার দেখা পায়, ততক্ষণ ক্রমাগত এই রকম শব্দ করে যায় সে।.....আমি চললুম, এক্ষুনি আসছি।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, হেরনের বাংলা কি হবে? বক?"

"হেরন—বড় বক। কঙ্ক বা বলাকা বলতে পারেন। আমি চললুম। দেখে আসি, ওটা কি! আপনি চটপট লিখে ফেলুন, অনেক ঘুরতে হবে।"

অমরবাবু বাইনাকুলারটা গলায় দুলিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

কবি চারিদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা প্রণিধান করলেন। কবিতা লেখবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। কিন্তু চৌকিতে বসে হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা যাবে না। পাশেই একটা চট পড়ে ছিল। সেইটে মাটিতে পেতে বসলেন, আর চৌকিটাকে করলেন টেবিল। ব্যবস্থাটা বেশ

মনোমত হল। বাগিয়ে বসলেন। পকেট থেকে খাতা আর কলম বেরুল। মুখ ছুঁচোল করে হাঁটু দুলিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

বিজ্ঞানী কষে শুধু তথ্যের অঙ্ক
কবি বলে—পাখি নয়, মহর্ষি কঙ্ক!
কবি খোঁজে কবিতা, বিজ্ঞানী তথ্য,
কঙ্কই জানে শুধু কোথা সার সত্য।
সকালেই খাওয়া সেরে চলে যায় বাসাতে
সন্ধ্যায় খাবে বলে বসে থাকে আশাতে।
চিত্তে তোলে না সুর কবিতার মাধুরী
তার ধ্যান চুনোপুঁটি মৎস্য বা দাদুরী।
'হু' 'উ' ডাকে উড়ে আসে প্রিয়া নভোচারিণী
সু-অণ্ড-প্রসবিনী অতি মনোহারিণী।
বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বেড়ে যায় বংশ
ছানা নয়, আহা, যেন কুল-অবতংস!
এই সত্যের নীড়ে বাস করে কঙ্ক
এই কাব্যের তালে বাজে তার ডঙ্ক।
বাজিতেছে চিরকাল যুগে ও যুগান্তে
হারাইয়া গেল কত ডারবিন্ দান্তে।

কবিতাটা লিখে কবি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর খাতার পাতা ওলটালেন। উলটেই আর একটা কবিতা চোখে পড়ল। নিজেরই ছেলের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হল যেন। অদ্ভুত লাগল। ভাবটাও অদ্ভুত!

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী
  চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ-সমাজের এই নব-শাকেরা,
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখিদের করে দেবে ঠাণ্ডা!
ময়ূর, ফটিক-জল, দোয়েল হলদে পাখি
আমেরিকা যাবে বলে খুঁজিতেছে 'ভিসা' নাকি!
  দুধরাজ-দম্পতি
  কম্পিত চিত অতি,
নীলকণ্ঠের নীল হইতেছে গাঢ়তর
তিতির বটের হুপো ভয়ে কাঁপে থরথর,
  খঞ্জন, টিট্টিভ
  ভয়ে বুক টিপটিপ!
  থিরথিরা ছোটপাখি

কাঁপিতেছে থাকি থাকি।
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া
চোখ গেল চোখ গেল—ফুকারিছে পাপিয়া।
টুনটুন বুলবুল
ঘামিতেছে কুলকুল।
শুধু কাঠঠোক্‌রার শোনা যায় ঝঙ্কার—
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও,
চুপি চুপি ডাকে—বউ কথা কও।
দরজি বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

কবিতাটা নিজেরই ভাল লাগেনি বলে ডানাকে শোনানো হয়নি আর। আর একটা অদ্ভুত কবিতাও চোখে পড়ল। লাল কালিতে লেখা। পড়তে পড়তে মুচকি হাসি ফুটল—কেন লিখেছিলেন এসব! রাবিস যত!

বল দেখি ভাই—ডাব,
বলত যদি সে,
অমনি হেসে জবাব দিতাম
তোমার সঙ্গে ভাব।
ছেলেবেলায় সহজ ছিল সব
এখন সবাই 'স্নব'।
শিকড়সুদ্ধ নারকেল গাছটাও এখন যদি আসে
ফিরবে হতাশ্বাসে,
জমবে না ঘটকালি
ঘটবে না তো 'ডাব' বললেই ঘটত যাহা খালি।

কাটাকুটির ভিতর আর একটা কবিতা চোখে পড়েও মজা লাগল খুব।

কবি। [উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যের প্রতি] ওরে ভুতো—
পাখিগুলো তাড়া তাড়া, মার, জুতো।
[চড়ুই পাখির প্রতি, ভদ্রতা সহকারে]
চড়ুই পাখি, চড়ুই পাখি,
তোমার না হয় নাই শরম।
কিন্তু তোমার বোঝা উচিত
আমি একটা ভদ্রলোক
আমার দুটো আছে চোখ
আমার সামনে না-ই করলে
এমনধারা কান্ড চরম।

[ঈষৎ ভাবিয়া এবং ইতস্তত করিয়া]
একটা কথা হচ্ছে মনে, বলছি সেটা,
আমার ঘরের আল্‌সে জুড়ে করছ যেটা
সেটাই হবে শিল্প-সৃষ্টি
সংস্কৃতি কিংবা কৃষ্টি
সভ্য ভাষা যদি একটা শিখতে পার
করছ যা তা গল্পে যদি লিখতে পার
করতে পার বাজার গরম
পটাং করে পক্ষী-কবি হতেও পার
কেউ তোমাকে বলবে—লরেন্স,
কেউ বা হয়তো বলবে—মম্‌।

কবি তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছিলেন। অমরবাবু যে 'এক্ষুনি আসছি' বলে অনেকক্ষণ দেরি করছেন—এ খেয়ালই ছিল না তাঁর। তিনি পুরনো কবিতাগুলোই আবার কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ অমরবাবু এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত কলেবর, সঙ্গে চার-পাঁচটা ছোঁড়া।

"লেখা হল আপনার?"

"হয়েছে।"

"উঠুন তা হলে। অনেক জিনিস দেখাব আপনাকে আজ। গাছের ওপর ওটা কি বসে আছে জানেন? চিল নয়, কোড়াল—হোয়াইট টেল্‌ড্‌ ফিশিং ঈগল (White Tailed Fishing Eagle), সংস্কৃত ভাষায় বললে বলতে হয়—মৎস্য-গরুড়। ভাণ্ডড়ের জলচারী পাখিদের রাজা। প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

কবি প্রশ্ন পরলেন, "এ ছেলেগুলি কে?"

"এদের ডেকে নিয়ে এলাম ওদিকের গাঁ থেকে। দুধ খাওয়াব এদের। পাঁচসের দুধ না হলে হবে কি? এদের সাহায্যও দরকার আমাদের। নল বনের ভেতরে যে সব ওয়ার্বলার ঢুকে আছে তাদের তাড়া না দিলে বেরুবে না, তাড়া দিলেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। এরা ঢিল মারবে। চলুন বেরুনো যাক। চড়চড় করে রোদ উঠছে।"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পিছনে পিছনে ছোঁড়ার দল চলল। আলের ওপর দিয়ে কোনোক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অমরবাবু বললেন, "কি কি দেখাব আপনাকে তার মোটামুটি একটা ফর্দ করে ফেলেছি—এই দেখুন। মানে, এই পাখিগুলো এখনও এখানে আছে। খঞ্জন কয়েক রকমই আছে। বিদেশ থেকে এ দেশে যারা শীতকালে এসেছিল, তাদের এবার নিজের দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে এবার ওরা ডিম পাড়বে। সেই জন্যে ওরা সবাই এবার ব্রিডিং প্লুমেজে (Breeding Plumage) অর্থাৎ বর-বেশে সেজেছে। এদের মধ্যে এক রকম হচ্ছে হলদে খঞ্জন। এদের মধ্যে আবার তিনটি উপজাতি আছে। নীল মাথা, ফিকে ধূসর মাথা, গাঢ় ধূসর মাথা। এদের মধ্যে এক রকম হলদে খঞ্জন আছে যাদের মাথাটাও হলদে। এরা ভিন্ন জাত। পঞ্চম হচ্ছে গ্রে ওয়াগ্‌টেল (Grey Wagtail)—এও ভিন্ন জাত। সব দেখতে পাবেন আজ। খঞ্জন ছাড়া আর এক রকম নতুন পাখি দেখাব, যা আপনি

দেখেননি কখনও—ওয়ার্বলার (Warbler)। এদের বাংলা নাম দিয়েছি কলকলানি। ক্রমাগত কলকল করে। পাঁচ রকম আছে দেখলাম—স্ট্রায়েটেড মার্শ ওয়ার্বলার (Striated Marsh Warbler), গ্রেট্ রীড্ ওয়ার্বলার (Great Reed Warbler), জাংগল্ রেন্ ওয়ার্বলার (Jungle Wren Warbler), ইণ্ডিয়ান রেন ওয়ার্বলার (Indian Wren Warbler), প্যাডি ফিল্ড্ ওয়ার্বলার (Paddy Field Warbler)—"

অমরবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আমার নোট-বুকের কয়েকটা পাতা খুলে পড়ে গেছে দেখছি।"

"এই যে আমি কুড়িয়ে রেখেছি!"—একটি ছেলে খান কয়েক পাতা ছেঁড়া কামিজের পকেট থেকে বার করলে।

"বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে! চল, খাওয়াব তোমাদের।"

অমরবাবু তার হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বলতে লাগলেন, "এ ছাড়া আর যা আছে তা আপনি দেখেছেন সম্ভবত। টিট্টিভ, গাংচিল, বাজ, জলপিপি, ফেজান্ট টেল্ড্ জ্যাকানা আছে দেখলাম একটা, ওর দিশী নাম পিউয়া। পিউয়া এখন বর-বেশে সেজেছে, একটা তুতীও দেখেছি, চলুন, অনেকক্ষণ ঘুরতে হবে।"

গতিরোধ করতে হল আবার। দেখা গেল, নীলাম্বর পীতাম্বরকে নিয়ে ফিরছে। নীলাম্বর অবাক হয়ে গেল, একটু অপ্রস্তুতও হল যেন।

"আপনারা সব চলে যাচ্ছেন যে?"

"আসছি এখুনি, তুমি ততক্ষণ দুধটা গরম কর না।"

"কতক্ষণে ফিরবেন? দুধ জুড়িয়ে যাবে যে!"

"আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। একটু পরে না হয় গরম করো।"

অমরবাবু নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন একবার।

"চলুন, যাওয়া যাক।"

আবার তিনি তাঁর নোট-বুক থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বাইনাকুলারটা তুলে ফোকাস করলেন আকাশের দিকে, করেই নাবালেন সেটা চোখ থেকে, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল উত্তেজনায়।

"ওই দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?"

কবি বাইনাকুলার লাগালেন চোখে, তারপর বললেন, "চিলের মতো মনে হচ্ছে।"

"চিলের মতো, কিন্তু চিল নয়। ওর পেটের তলাটা দেখুন ভাল করে, আর গলার পাশটা দেখুন। পেটের তলাটা দেখেছেন?"

"দেখেছি, সাদা। গলার পাশে কালো মতো একটা দাগ রয়েছে।"

'দ্যাট'স ইট। চিলের ও-রকম থাকে কি? বরং হোয়াইট আইড বাজার্ড ঈগলের (White Eyed Buzzard Eagle) সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বাজার্ড অনেক ছোট ওর চেয়ে। অস্প্রে (Osprey) মশাই। উৎক্রোশ, কবি কালিদাস যাকে কুররী বলে বর্ণনা করেছেন। সেবার শীতকালে আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে নেই? এরা সব শীতের অতিথি। গ্রীষ্মকালে ওরা ইউরোপে চলে যায়। ইউরোপে গিয়ে এতদিন ওর বাসা বাঁধা উচিত ছিল। ভাঙড়ের মাছের লোভ ছাড়তে পারছে না বোধ হয়।"

অমরবাবু আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু নীলাম্বর-পুত্র পীতাম্বর ছুটে এসে বাধা দিলে।

"দুধটা আপনারা খেয়েই যান। বাবা বললেন, তা না হলে দুধ হয়তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাত্রের বাসি দুধ তো।"

"চলুন, ঝামেলা মিটিতে ফেলা যাক।"

অমরবাবু আবার সদলবলে ফিরলেন কুটিরের দিকে। ঘুঁটে আর কাঠ জ্বালিয়ে দুধটা গরম করে ফেললে নীলাম্বর। অমরবাবু প্রত্যেকটি ছেলেকে দু-তিন গ্লাস করে দুধ খাওয়ালেন।

কবি বললেন, "আমার মশাই খিদে নেই এখন।"

"যা পারেন খেয়ে নিন। সমস্ত দিন ঘুরতে হবে তো। মিল্‌ক্ ইজ এ গুড ফুড। একটু খান।"

এক গ্লাশ খেতে হল কবিকে। অমরবাবু উবু হয়ে বসে ঢকঢক করে প্রায় এক ঘটি দুধ খেলেন।

নীলাম্বর বললে, "আরও খানিকটা দুধ পড়ে রইল যে?"

রুমালে মুখ মুছে অমরবাবু হেসে বললেন, "ওটুকু তোমরা দুজনে শেষ করে ফেল। চলুন এবার। আহার-সমস্যার সমাধান হল, নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার পাখি দেখা যাক।"

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরিশ্রান্ত কবি একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। অমরবাবু তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘন নলখাগড়া ঝোপের পাশে। ছেলেগুলো তখনও ঝোপের ভিতর ইট ফেলছে মাঝে মাঝে। একটিও কলকল্লানি পাখি দেখা যায়নি তখনও। নলখাগড়ার ভিতর থেকে কিন্তু অবিরাম শব্দ হচ্ছে, গোড়া থেকেই হচ্ছিল। চক্ চক্ চক্ চক্— কেরে কেরে ক্রেং ক্রেং— চক্ চক্— পৃং পৃং পৃতিক—ক্রেং ক্রেং ক্রেং। হঠাৎ মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে। সারা দুপুর এই শব্দ শুনে কবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটা কবিতার কয়েকটা ছত্র ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পকেট থেকে খাতা কলম বার করে হাঁটুর উপর খাতাটা রেখে কবিতাটা লিখে রাখলেন। এখুনি না লিখে ফেললে ভুলে যাবেন পরে—

জয় জয় জীবনের জয় জয়
নলখাগড়ার বন বাঙ্ময়।
বাঙ্ময় আকাশের শূন্য
ক্ষিতি অপ্ মরুৎ যে পূর্ণ
রোদে জ্বলে বাণী কার পুণ্য
        নলখাগড়ার বন কিবা কয়!
জয় জয় জীবনের জয় জয়!

"দেখুন, দেখুন, দেখুন—একটা বেরিয়েছে।"

অমরবাবু চিৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

ফুড়ুৎ করে একটা পাখি বেরিয়েই আবার ঝোপে ঢুকে পড়ল। অমরবাবু সাগ্রহে ছুটে এলেন।

"দেখেছেন পাখিটা? অলিভ ব্রাউন রঙ, ঠোঁটটা কালচে বাদামী?"

কমি দেখতে পাননি। কিন্তু বিজ্ঞানীকে সে কথা বললে তিনি বড়ই মর্মাহত হবেন, তাই বললেন, "দেখেছি, তবে ভাল করে দেখিনি।"

"ওর চেয়ে ভাল করে দেখা শক্ত। মার্শ ওয়ার্বলারটা দেখেছেন ভাল করে আশাকরি। অনেকটা ভরত পাখির মতো উড়ল, না? গানটিও সুন্দর, হুইট্—হুইট্—টু—টু—হুইট্—হুইট্—"।

ছেলেগুলো নলখাগড়ার ঝোপে আবার ঢিল ছুঁড়ছিল। দুধ খাইয়ে অমরবাবু তাদের কেন গোলাম করে ফেলেছিলেন একেবারে। অমরবাবু বললেন, "ওই ঝোপটার ওপর আসুন আমরা বাইনাকুলার ফোকাস করে বসে থাকি। কখন ফট করে বেরুবে বলা যায় না তো!"

দুজনে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলেন। কবির হঠাৎ মনে হল, গ্রীষ্মের এই দুপুরে কৃচ্ছ্রসাধন করে আমরা কি খুঁজছি? পাখি না, আর কিছু?

।। দশ ।।

ডানা আবার সন্ন্যাসীর কাছেই গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না, কারণ আনন্দমোহনবাবুর চলে যাওয়ার ঠিক পরেই রূপচাঁদ এসে হাজির হয়েছিলেন আবার। রূপচাঁদের ব্যবহারে কোনোরকম অশোভনতা ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শাণিত ছুরিকার ঝলক চকমক করে উঠেছিল যেন মাঝে মাঝে। যাওয়ার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, "এখন আমি চললুম। কিন্তু আবার আসব। একবার নয়, বার বার। ওই নীলকণ্ঠ পাখিটা তার সঙ্গিনীকে ঘিরে যে উৎসব করছে, একবার উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণিত উৎসাহে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করে, তা কি দেখতে পাও না তুমি? বাইনাকুলার চোখে দিয়ে কি দেখ তা হলে? ওইটেই তো দেখবার মতো একমাত্র সত্য। শুধু পক্ষী জগতে নয়—সর্বত্র। আর একটা জিনিসও এতদিন তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল, চোখে পড়া উচিত ছিল অন্তত। পাখিদের মধ্যে এটা কি তুমি লক্ষ্য করনি যে, যে পুরুষপাখিটা বেশি শক্তিমান, সে-ই অবশেষে প্রণয়-দ্বন্দ্বে জয়ী হয়? শক্তিরই জয় সর্বত্র। বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সবাই এই কথাই বলছেন। ডারউইন 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' আর নীট্‌শের 'সুপারম্যান' একই তথ্যের দুটো দিক। আমাকে তুমি কি অক্ষম মনে কর? শক্তির পরিচয় যেদিন চাইবে, যেমন ভাবে চাইবে, পাবে। এমনও হতে পারে যে, না চাইলেও পাবে। এখন চললুম, কিন্তু আবার আসব। হয়তো অসময়ে অতর্কিতে আসব।"

ডানার দিকে চেয়ে একটু হেসে চলে গিয়েছিলেন তিনি। ডানা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইতিহাস পড়েছ তুমি?"

"পড়েছি কিছু কিছু।"

"তা হলে তোমার জানা উচিত, ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা অসভ্যতার লক্ষণ। মানুষ যখন খুব

অসভ্য ছিল, তখন তার পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত কাম ক্রোধ লোভ মোহ্ মদ মাৎসর্য। কিন্তু চারদিকে যে অদৃশ্য শক্তির প্রতাপ সে অনুভব করত, যার প্রভাব সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, যার প্রকাশ সে দেখত ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, বজ্রে-বিদ্যুতে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, হিংস্র জন্তুতে, তার রূপ ভয়ঙ্কর ছিল তার কাছে। সেই ভয়ঙ্কর কল্পনা যখন দেবতারূপে মূর্ত হল তাদের সমাজ-জীবনে, তখন সে দেবতাও হল ভয়ঙ্কর। তার রূপ হল রক্তপায়ী পিশাচের রূপ। যে সব সভ্যতা অতি প্রাচীন, যেমন ধর—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, উর, তাতে তুমি কোনও সুন্দর দেবতার সাক্ষাৎ পাবে না। সবই বীভৎস। পশু আর মানুষে মিলিয়ে, দুরকম পশুর সংমিশ্রণ করে যে সব দেবতার মূর্তি তারা নির্মাণ করেছিল, তা ছিল তাদের ভয়েরই প্রতীক। মানুষ আরও যখন সভ্য হল, তখন ভয় কমতে লাগল। ও-দেশে বোধ হয় গ্রীসেই প্রথম মানুষের রূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বোধ হয় তারও আগে। আমাদের দেশে চিন্তাধারা আরও নানাভাবে এগিয়েছে। ভগবানকে আমরা নিজেদের মধ্যেই পেয়েছি, আমরাই বলেছি—সোহং, আমরাই জেনেছি—প্রেমই ভগবান, আমরাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। যদিও নানাভাবে নানা সাধক নানা পথে এগিয়েছেন, প্রত্যেকের পথ আলাদা আলাদা হয়েছে, হয়তো বিপরীতমুখী হয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ভয়কে কেউ আমল দেননি, ভয়ের স্থান কোথাও নেই। আমাদের দেশে আত্মার অপর নামই অভয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রূপচাঁদবাবু কি করবেন তোমার?"

"যদি অপমান করেন?"

"সম্মান মানেই আত্মসম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।"

"যদি জোর করে গায়ে হাত দেন?"

"দিলেই বা। তোমার যদি খারাপ লাগে, বাধা দেবে। তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই প্রতিবাদ করবে।"

"তা তো করবই। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকু বলুন?"

"যতটুকু আছে প্রতিবাদ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তোমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ও-লোকটা যদি তোমাকে অভিভূত করে ফেলে, তা হলে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে না। তা ছাড়া, তোমার যে আসল 'তুমি' তার গায়ে কেউ হাত দিতেই পারে না। তোমার দেহটা তুমি নও। তুমি ভয় ত্যাগ কর। তা ছাড়া, তোমার কাছে চাকর থাকে তো একজন?"

"তা থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, চাকরটাও ওঁর দলে। উনি যোগাড় করে দিয়েছিলেন লোকটাকে। সেদিন দেখলাম, একটা রঙিন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না।"

সন্ন্যাসী আবার কিছুক্ষণ হাসিমুখে থেকে বললেন, "আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসই টেকে না শেষ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে আস্থাবান হও, ভয় পেয়ো না। ভয়টা মিথ্যা, একমাত্র সত্যই অভয়।"

"আপনি আমার কাছে গিয়ে থাকবেন চলুন। আমি বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।"

"পরিষ্কার আমি নিজের হাতেই করে নিতে পারি। কিন্তু তোমার ওখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বাধা আছে।"

"কিসের বাধা?"

"তা ঠিক তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।"

ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। রাগটা হল তার নিজেরই ওপর। ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একবার আলোচনা হয়েছিল, ঠিক এই একই অনুরোধ করেছিল সে সন্ন্যাসীকে—তখনও তিনি ঠিক এমনই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নারীসঙ্গ বিষবৎ আমার পক্ষে। তবু সে কোন্ লজ্জায় ওই একই প্রসঙ্গ তুলছে আবার! কিন্তু এ অবস্থায় সে করবেই বা কি? হঠাৎ কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

"চিনতে পারছ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং রত্নপ্রভা দাঁড়িয়ে। গোলগাল কালো মুখটি হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হাতে একটি বেঁটে ছাতা, বগলে ফাইল। ডানা কি যে বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল শুধু। তার পর বললে, "আপনি আসবেন কোনো খবর পাইনি তো?"

"খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একাই এসেছি। আনন্দবাবুর বিপদের খবর পেয়ে মনে হল, নিজে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসি। আমি এসেছি সকালে। এসেই সদরে গিয়েছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে।"

তার পর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে তিনি নমস্কার করলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনি এখনও আছেন এখানে?"

"এইবার যাব।"—সন্ন্যাসীও হাসিমুখে উত্তর দিলেন।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে এসেছেন কতক্ষণ আগে?"

"এখুনি। সোজা স্টেশন থেকেই তো আসছি। তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। চাকরটার কাছে শুনলাম—তুমি এখানে আছ, তাই এখানেই চলে এলাম।"

স্মিতমুখে ডানার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অকারণে ডানার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, সে যেন একটা দুষ্কার্য করছিল, হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "চলুন, আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করি তা হলে।"

"সে সব সেরে এসেছি আমি সদরে। চা খাব একটু।"

"চলুন।"

কিছুদূরে এসে রত্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ভাব হল কি সূত্রে?"

"সূত্র কিছু নেই, এমনি আলাপ করেছিলাম একদিন নিজেই গিয়ে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক, নিজেকে নিয়েই থাকেন ওই ভাঙা ঘরে। নদীর চরে একা একা ঘুরে বেড়ান। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করি।"

"আমাদের পাখিগুলোর খবর কি?"

"মাঝে মাঝে মরে যাচ্ছে দু-একটা।"

"তা তো যাবেই। চা খেয়ে যাব একবার দেখতে। তার পর হেসে বললেন, "দেখবার

মতো বিদ্যে নেই অবশ্য আমার। আমার দৌড় লাহা মশায়ের 'পেট বার্ডস অফ বেঙ্গল' (Pet Birds of Bengal) পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে এতদিন থেকেও বিদ্যে বিশেষ বাড়েনি। তোমার কেমন লাগছে?"

ডানা স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না, অর্থাৎ ঠিক কি বললে যে সত্য কথা বলা হবে তা মাথায় এল না। অমরবাবু তাকে যে নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যে খারাপ লাগছিল—এ কথা সত্য নয়; কিন্তু যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থেকে তাকে সে জগতের পরিচয় নিতে হচ্ছিল, সেই পরিবেশটাই ক্রমশ এমন নিদারুণ হয়ে উঠছিল যে কিছুই তার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, দাঁতের ব্যথা নিয়ে তাকে যেন বাধ্য হয়ে বসে কোনও ভাল ওস্তাদের গান শুনতে হচ্ছে। গানের কিছুটা সে বুঝতে পারছে, কিছুটা তাকে মুগ্ধও করছে, কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু এত কথা সে রত্নাপ্রভাকে বুঝিয়ে বলবে কি করে? তাই চুপ করেই রইল। রত্নপ্রভা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন।

বললেন, "তোমার ভাল লাগছে না বোধহয়। কিন্তু পাখির পালক নিয়ে যে প্রবন্ধটা তুমি ওঁকে লিখে পাঠিয়েছিলে, তা পড়ে মনে হয়েছিল যে, পাখিদের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি।"

"ও-প্রবন্ধে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। পাঁচটা বই দেখে লিখেছিলাম। পাখিদের কথা আগে তো কিছুই জানতাম না, এখন যত দেখছি তত ভাল লাগছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে।"

"মুশকিল আবার কি?"

"চলুন, সব বলছি।"

ডানা অবশ্য অকপটে সব কথা রত্নপ্রভাকে বলতে পারেনি। বলা সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল, তাতেই রত্নপ্রভা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর নিটোল ভারী মুখখানা যদিও গম্ভীর হয়েই ছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, "ওতে ভয় পেয়ো না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়। ও কিছু নয়। আমাকে তো রূপসী বলা চলে না, সাঁওতালনীর মতো চেহারা আমার, আমাকেও ও-ভোগ ভুগতে হয়েছে। ও কিছু নয়। দুদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব। আমাদের দেউড়ির সিপাহী সুখন পাঁড়েকে বলে যাব, সে তোমার কাছে না হয় থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এক কাজ করলেও তো হয়। এখানে থাকবার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা কি দুটো ঘর নিয়ে থাকলেই তো পার।"

"নদীর ধারে এই জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। গোড়া থেকেই এখানে আছি, মন বসে গেছে এখানে। তবে আপনি যদি বলেন—"

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করেই সে থেমে গেল। নিজের কানেই অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। তার যে নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে যে একজন বেতনভোগিনী দাসী মাত্র, কর্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাকে চলতে হবে, গত্যন্তর নেই—এই ভাবটা যেন কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষের কটা কথায়।

রত্নপ্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য অটুট রইল।

বললেন, "বেশ, এখানেই থাক তা হলে। সুখন থাকবে তোমার কাছে—তাকে বলে যাব।"

"না, তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এখন। ও যেমন দেউরিতে আছে থাকুক। যদি তেমন দরকার বুঝি আনিয়ে নেব ওকে।"

"বেশ। চল, এবার পাখিগুলো দেখে আসা যাক।"

"চলুন।"

আনন্দবাবুর ব্যাপারটা কি হল তা রত্নপ্রভা কিছু বলেননি এতক্ষণ। রাস্তায় যেতে যেতে বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। আনন্দমোহনবাবুর ছাত্র উনি, আমার সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।"

"আনন্দমোহনবাবুর মকদ্দমার আবার দিন পড়েছে?"

"পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু আনন্দমোহনবাবুকে ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আসল খুনী ধরা পড়েছে, দোষও স্বীকার করেছে।"

"ও! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আনন্দমোহনবাবুকে এর জন্যে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তবে—। আচ্ছা, এখানকার এস. পি. মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?"

"না, তেমন আলাপ হয়নি।"

"আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। আমার সঙ্গে দেখা হল না। কোথায় বেরিয়েছেন শুনলাম। আজই ফেরার কথা। আমি চিঠি লিখে এসেছি একটা। হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর জাল-ঘেরা পক্ষী-নিবাসে এসে হাজির হলেন তাঁরা। একজন চাকর পাখিদের জন্যে নানারকম খাবার নিয়ে আগে থাকতেই বসে ছিল। রত্নপ্রভাই সদরে যাবার আগে এ ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

দানা আর ফল ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের মধ্যে একটা শোরগোল পড়ে গেল যেন, বিশেষ করে টিয়া, শালিক আর ছাতারের মধ্যে। আলাদা আলাদা খাঁচায় শামা, হরবোলা, দামা, দোয়েল, পাহাড়ী ময়না, হলদে পাখি প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাখা ছিল। তারা বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলে না কিন্তু। খাবারের দিকে চেয়েও দেখলে না।

"হুতোম প্যাঁচাটা মরে গেছে?"

"হ্যাঁ। ফিঙে দুটোও বাঁচল না। ওই পাহাড়ী ময়নাটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। গায়ে পোকা হয়েছে বোধহয়। হলুদ-জলে একদিন স্নান করিয়েছিলাম। কি করা যায় বলুন তো?"

"বেশি অসুস্থ হলে ছেড়ে দিও। হরবোলটা কেমন আছে? ছেলেবেলায় আমি একটা হরবোলা পুষেছিলাম, কতরকম ডাকই যে ডাকত!"

হরবোলার খাঁচার কাছে গিয়ে রত্নপ্রভা অপ্রত্যাশিতভাবে শিস দিলেন একটি। ডানা অবাক হয়ে গেল; হরবোলা পাখিটাও। খাঁচার ভিতরই সে তুড়ুক করে এগিয়ে এল, ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখলে একবার রত্নপ্রভার মুখের দিকে, তারপর সেও মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে জবাব দিলে। মনে হল, রত্নপ্রভাকে যেন বললে—তুমি যে আমার আত্মীয় তা তোমার শিস শুনেই বুঝেছি। তারপর খাঁচার দাঁড়ে পা দুটো আটকে ডিগবাজি খেয়ে নিজের আর একটা কৃতিত্ব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাওয়া গেল না, আর একজনের ডাক শোনা গেল। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল।

"ফটিক-জলগুলো বেঁচে আছে না কি?"

"না তিনটে মরে যাবার পর বাকিগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বন্দী অবস্থায় কেমন যেন মন-মরা হয়ে থাকে।"

"বেশ করেছ। কিন্তু ডাকটা এল কোথা থেকে?"

"ওই বড় গাছটায় ওরা বাসা বাঁধছে বোধ হয়। প্রায়ই ডাক শুনি। বাইনাকুলার দিয়ে দেখতেও পেয়েছি দু-একবার।"

"চমৎকার দেখতে, নয়?"

"সুন্দর।"

পক্ষী-প্রসঙ্গ কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পেল না। মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। চাকরটা এসে খবর দিলে—পুলিশ সাহেব এসেছেন, মালকাইনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

পক্ষী-নিবাসের গেটেই দেখা হল মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে। রত্নপ্রভাকে দেখেই মিস্টার গুপ্ত স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এলেন এবং পরিধানে সাহেবী পোশাক থাকা সত্ত্বেও হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"মাসীমা, আপনি যে এখানে আসতে পারেন তা কল্পনাই করিনি আমি। এখানে হঠাৎ কি সূত্রে এসেছেন?"

"এখানে আমার একটা বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে আসি। তুমি কতদিন হল এসেছ এখানে?"

"বেশিদিন নয়। মাস দুয়েক।"

"এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী ডানা, আমাদের পক্ষীনিবাসের কর্ত্রী। এখানেই থাকেন উনি। রিটায়ার্ড প্রোফেসার আনন্দমোহনবাবু আমাদের জমিদারির ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গেও আলাপ করো, চমৎকার লোক, চমৎকার কবিতা লেখেন। এখন এখানে নেই, কলকাতা গেছেন, দু-একদিনেই ফিরবেন।"

"আচ্ছা, ইনিই কি খুনের মোকদ্দমায় পড়েছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ। কোনও দুষ্টু লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছিল বেচারিকে, তোমাদের আইনের জালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ওঁকে রেহাই দিয়ে দিয়েছ তোমরা।"

মিস্টার গুপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে নিজের বাটার-ফ্লাই গোঁফে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করতে করতে রত্নপ্রভার কথা শুনছিলেন। রত্নপ্রভা থামতেই বললেন, "সে দুষ্টু লোকটিকে চিনি আমি। এ যে আপনাদের জমিদারি, আপনাদের ব্যাপার—কিছুই জানতাম না আমি। আই সি। আপনি যাবেন কখন?"

"আজই রাত দশটার ট্রেনে আমি ফিরতে চাই তোমার মা কোথায় আজকাল?"

"ডেরাডুনেই আছেন। মেসোমশায়ের পাখি-বাতিক এখনও আছে?"

"বেড়েছে। পক্ষী-নিবাস দেখে বুঝছ না? তুমি সন্ধেবেলা আজ খাও না আমার কাছে। সুনীরা এখানেই আছে?"

"না, সে বাপের বাড়ি গেছে, তার বোনের বিয়ে। আসবে দিন সাতেক পরে। আচ্ছা, আমি আসব আজ সন্ধের পর। সাড়ে সাতটা নাগাদ।"

"ডানা, তুমিও এস, আমার ওখানেই খাবে আজ।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খাকি-পোশাক-পরা গোঁফ-ছাঁটা ঘাড়-কামানো এই বলিষ্ঠ লোকটার সামনে বসে খেতে হবে! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। চুপ করে রইল!

মিস্টার গুপ্ত বললেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, আসুন না, পৌঁছে দি।"

"আমরা বেশিদূর যাব না। এই কাছে-পিঠেই ঘোরা-ফেরা করব। তুমি যাও।"

"আচ্ছা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনাদের কাছারিতে পৌঁছব, কাছারিটা চিনি। পাশেই দোতলা বাড়িটাই নিশ্চয়ই আপনার?"

"হ্যাঁ।"

মিস্টার গুপ্ত চলে গেলেন।

রত্নপ্রভা পক্ষী-নিবাসটাই ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন নীরবে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে জিজ্ঞেস করলেন। "এ পাখিটা কি—বেশ সুন্দর দেখতে তো! এটাকে আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না!"

"আপনারা চলে যাওয়ার পর একটা পাখিওলা দিয়ে গিয়েছিল।"

"নাম কি?"

"বলেছিল, দামা। দামাই লিখে রেখেছি, ইংরেজী নাম খুঁজে পাইনি।"

"লাহা মশায়ের বইয়ে দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অরেঞ্জ-হেডেড গ্রাউন্ড থ্রাশ (Orange-headed Ground Thrush)।"

আরও কিছুক্ষণ নীরবে পাখি দেখে বেড়ালেন। তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নি। এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে। এদের একটু যত্ন করো। তুমি যত্ন করছ নিশ্চয়ই, তবু বললাম কথাটা। এদের নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। আচ্ছা, কটা পাখি মরে গেছে? লিস্ট করে রেখেছ কি?"

"রেখেছি। বাসায় আছে।"

"মরতে দিও না কাউকে। যদি দেখ খাচ্ছে না বা বিমর্ষ হয়ে আছে, ছেড়ে দিও।"

"আচ্ছা।"

ডানার বাসার দিকেই ফিরছিলেন রত্নপ্রভা। হঠাৎ রত্নপ্রভার কানের কাছ দিয়ে সোঁ করে একটা তীর বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"এ কি ব্যাপার, তীর ছুঁড়ছে কে?"

পর-মুহূর্তেই তীরন্দাজদের দেখা গেল। বকুলবালা গাছ-কোমর বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসে তৃতীয়বার শর-সন্ধান করছিলেন, পাশে এক গোছা শর নিয়ে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল, তারও আর এক হাতে ধনুক।

ডানা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে, "বকুলদি, কখন এলেন আপনি?"

"এখুনি এসেছি। এসেই দেখি একটা বাজ না চিল তোমার ওই পাখির বাসার উপর বসে আছে। আর একটু হলে বাচ্চাগুলোকে শেষ করে ফেলত। ভাগ্যে আমি আর চণ্ডী এসে পড়েছিলাম।"

উৎসাহভরে তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রত্নপ্রভাকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গায়ে দিয়ে মাথায় আধঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

ডানা পরিচয় করিয়ে দিলে, "ইনি অমরেশবাবুর স্ত্রী। আসুন, আলাপ করুন।"

বকুলবালার আলাপ করবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ লজ্জিত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর বার বার আঁচল দিয়ে নিজের স্থূল বপুটি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এলেন তিনি।

ডানা বললে, "ইনি রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী। এঁরও পাখি পোষার খুব শখ। তালগাছে ওই যে বাক্সটা আমরা বেঁধে দিয়েছি, তাতে শালিক বাসা বেঁধেছে। বাচ্চাও হয়েছে তাদের। উনি কিছুদিন আগে এসে ডিমগুলো দেখে গিয়েছিলেন।"

"নমস্কার।" হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন রত্নপ্রভা।

বকুলবালা আর একটু ঘাড় হেঁট করে আঁচলটা গায়ে আর একটু টেনে দিলেন।

"আসুন। আপনার যখন পাখি পোষার এত শখ, তখন আপনি তো আমাদের ঘরের লোক। এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত ছিল। আসুন।"

একটু দূরে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। শুধু দেখছিল নয়, উপভোগ করছিল। তার চোখ-মুখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব মিলনের কৃতিত্বটা যেন তারই।

বকুলবালা নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন, "আমার ধনুকটা তুলে রাখ্ ভাল করে। এখনি বাড়ি ফিরব আমরা। তুই পালাসনি যেন।"

"না।"

এই আদেশ দিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় আবার সামলে-সুমলে বকুলবালা রত্নপ্রভাকে অনুসরণ করে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

রত্নপ্রভা চণ্ডীকে দেখিয়ে বললেন, "ওটি কে? ছেলে বুঝি?"

"না। আমার ছেলে হয়নি।"

হঠাৎ একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল। তিনটি নিঃসন্তান রমণীকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠল যেন।

রত্নপ্রভাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বললেন, "কি পাখি ভালবাসেন আপনি?"

"অনেক রকম ভাল পাখি পুষেছি আমি। টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া। একটা হলদে পাখি পোষবার শখ, কিন্তু পাচ্ছি না যোগাড় করতে। একবার একটা পেয়েছিলাম, না খেয়ে মরে গেল। ইনি একটা যোগাড় করে দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছিলাম খোঁজ করতে।"

"চেষ্টা করছি। বাচ্চা পেলেই আপনাকে খবর পাঠাব। আপনার চণ্ডী-গণশাও তো খোঁজে আছে!"—ডানা হেসে উত্তর দিলে।

গণশার নাম শোনামাত্র কিন্তু বকুলবালা ক্ষেপে গেলেন। রত্নপ্রভার খাতিরে যে ভব্যতাটুকু এতক্ষণ তিনি বজায় রেখেছিলেন তা আর টিকল না, চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল। ঘাড়ের ঝাঁকানিতে আঁচল সরে গেল মাথা থেকে।

"গণশা মুখপোড়ার কাণ্ড শুনবেন? বলে কিনা—আমাকে একটা ভাল ডিশ্‌ক্যারি না কিনে দিলে হলদে পাখির বাচ্চা পেলেও উড়িয়ে দেব আমি। মুখপোড়া আমাকে আবার মাসীমা বলে সোহাগ জানাতে আসে। অমন বোনপোকে ঝাঁটা মারি আমি।"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার। এক নজরেই তিনি বকুলবালার স্বরূপ অনেকটা টের পেয়েছিলেন। গণশাকে তিনি চেনেন। গণশার মেসোমশাই এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন, কিছুদিন আগে মারা গেছেন, রত্নপ্রভাই পেনশন বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তাঁর বিধবার জন্যে, জমিও দিয়েছেন কিছু। গণশা যে পড়াশোনায় ভাল তাও তিনি জানেন। বকুলবালার কাছে গণেশের নতুন পরিচয় পেয়ে খুব মজা লাগল তাঁর।

ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, "এই কথা বলেছে গণেশ?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চণ্ডীকে জিজ্ঞেস করুন। এই চণ্ডে, এদিকে আয়। গণশা তোকে কি বলেছিল বল্ তো এঁদের।

চণ্ডী থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে বকুলবালার কথা সমর্থন করলেন, না করে উপায়ও ছিল না। কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর নাম এ ভাবে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে। তার ভয়ও করছিল। কথাটা গণশার কানে গেলে সে যে কি করবে, তা কল্পনা করে হৃৎকম্প হচ্ছিল তার। হয়তো আচমকা নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দেবে কোন্‌দিন!

বকুলবালা বললেন, "এরা দুটেতে কম জ্বালায় আমাকে! ইনি জেদ ধরে বসে আছেন একটা এয়ার-গান্ কিনে দিতে হবে, উনি বলেছেন ভাল ডিশ্‌কনারি চাই। আমি অত টাকা পাব কোথা? বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে কতই বা জমানো যায়! ডিশ্‌কনারি জিনিসটা কি? কুডুল-টুডুল না কি—সাতজন্মে ও-কথা শুনিনি কখনও।"

ডানা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল। রত্নপ্রভা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, "আপনাকে এমন ভাবে জ্বালাতন করা খুব অন্যায় হয়েছে ওদের। আচ্ছা, আমি ব্যাবস্থা করে যাচ্ছি, আপনি হলদে পাখি ঠিক পাবেন এবার।"

"ধাড়ি পাখি চাই না কিন্তু, বাচ্চা দিতে হবে।"

"বেশ, তাই পাবেন।"

বকুলবালার চোখের দৃষ্টি ঝলমল করে উঠল আনন্দে।

চণ্ডীর দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলি তো! আর তোদের তোয়াক্কা করব না আমি।"

কথাবার্তা আরও হয়তো কিছুদূর অগ্রসর হত, কিন্তু সনাতন মল্লিকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা চাপা পড়ে গেল। বকুলবালা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে সরে পড়লেন চণ্ডীকে নিয়ে। সনাতন মল্লিক যা করলেন, তা আরও নাটকীয়। তিনি রত্নপ্রভার পদপ্রান্তে দড়াম্ করে শুয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন রত্নপ্রভা। উঠে সরে দাঁড়ালেন। মাথায় কাপড়টা টেনে দিলেন একটু। মল্লিক সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে বলতে লাগলেন, "আপনি আমার মা, বাঁচান আমাকে, ছাপোষা মানুষ আমি, দয়া করুন আমার ওপর।"

"কি হয়েছে?"

মল্লিক তখন জামার পকেট থেকে একটি ছোট চিঠি বার করে রত্নপ্রভার হাতে দিলেন। পেন্সিলে ছোট চিঠি। এস. পি. লিখেছেন—

"মাসীমা, এই লোকটিই সেই দুষ্ট লোক, যার কথা আপনি আন্দাজ করেছিলেন একটু আগে। ইনিই আনন্দমোহনবাবুর নামে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন পুলিশকে। এঁর লেখা একখানা চিঠি আছে আমাদের কাছে। আনন্দমোহনবাবুর মতো নিরীহ ভদ্রলোককে

বিব্রত করার জন্যে এঁর শাস্তি হওয়া উচিত। আপনারা যদি এঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন, আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে যদি ক্ষমা করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার পর যাব। ইতি—

—অনিল”

রত্নপ্রভা চিঠিখানা পড়ে ডানাকে দিলেন সেটা। মল্লিক মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, “আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না করে কিছুই বলতে পারছি না আপনাকে এখন। তিনি যদি মামলা করতে চান মামলা হবে, যদি না করতে চান হবে না।”

“আপনি দয়া করলে—”

রত্নপ্রভা আর কোনও জবাব দিলেন না, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ডানা তাঁর পিছু পিছু গেল।

।। এগারো ।।

কবি দিনের গাড়িতে ফিরছিলেন কলকাতা থেকে। অমরবাবু ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন পাখিদের মাইগ্রেশন (Migration) সম্বন্ধে একটা নতুন বই। কবি অভিভূত হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর অভিভূত ভাবটা একরঙা ছিল না অবশ্য, রঙ বদলাচ্ছিল। প্রথমে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন অমরবাবুর ব্যবহারে। কিছুতেই ছাড়লেন না ভদ্রলোক, জোর করে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দিলেন। বললেন, “কিছু বলা যায় না, একটু আরামে গেলে হয়তো আরও দু-চারটে ভাল ভাল কবিতা পাব আমরা। তার দাম এই টাকা কটার চেয়ে অনেক বেশি। একটু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, একটু নির্জনতা না থাকলে ভাল ভাব আসতে পারে না। ভাল ভাবও পাখির মতো, গোলমাল দেখলেই সরে পড়ে।”

কবি সত্যিই খুব আরাম বোধ করছিলেন। গাড়িতে নির্জনতাও ছিল, কিন্তু কোনও কবিতার ভাব মনে আসছিল না। তিনি তন্ময় হয়ে জানলা দিয়ে দেখছিলেন কেবল—দৃশ্যের পর দৃশ্য আসছে আর চলে যাচ্ছে, থামছে না কেউ। এ সব দৃশ্য আগে অনেকবার দেখেছেন, নতুন কিছু নয়, সবই চেনা; তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন চেনা নয়, ওঁদের মধ্যেই অচেনার রহস্য যেন মাখানো রয়েছে। টেলিগ্রাফের তারে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ফিঙেকে, নীলকণ্ঠকে, বাঁশপাতিকে, কাজলা পাখিকে (যার ইংরেজী নাম শ্রাইক—Shrike), বুলবুলিও দু-একটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—সবই চেনা; কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একটু যেন অচেনার আমেজ আছে প্রত্যেকটির মধ্যে। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাঁর। মনে হল, যা চেনা তা ফুরিয়ে যায়, তা ক্ষণভঙ্গুর, নিজের পরিচয়ের পসরা সে যখন উজাড় করে দেয়, যখন নতুন-কিছু দেবার আর থাকে না তখনই সে মরে যায়, অনেক সময় সে বুঝতেও পারে না যে তার মৃত্যু হয়েছে। অচেনার মধ্যে কিন্তু অসীম সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা আমাদের প্রত্যাশার নব নব দাবি মিটিয়ে চলেছে চিরকাল, মেটাবার পরই আবার মৃত্যু হচ্ছে তারও, আসছে নতুন অচেনা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে, শুধু তাই নয়, আসছে ওই চেনাকে অবলম্বন করেই। ভাবটা কবির মনে নানাভাবে প্রসারিত হতে লাগল মেঘের মতো। তার পর ক্রমশ কবিতায় রূপান্তরিত হল তা। খাতা কলম বার করে অনেক ভেবে ভেবে তিনি লিখলেন—

হে অচেনা, কতবার চেনা তুমি হলে
কত রূপে এ জীবনে; কত প্রসাধনে
দেখা দিলে রঙ্গমঞ্চে—শূন্যে জলে স্থলে,
জীবে-জড়ে, অন্ধকার অরণ্যে-গহনে,
জনাকীর্ণ সমাজের হাসি-অশ্রু-জলে,
নিত্য-নবায়িত করি জীর্ণ পুরাতনে
চিরকাল এ কি লীলা তব পলে পলে।
অচেনার অনন্যতা অবলুপ্ত হয়
পরিচয়-ঘর্ষণেতে, অপূর্ব পরশে
তারই মাঝে সঞ্চারিয়া নবীন বিস্ময়
সঞ্জীবিত কর তারে নব প্রাণ-রসে,
মৃত্যুর মুখেতে শুনি জীবনের জয়
ভীত প্রাণ উল্লসিয়া ওঠে যে হরষে,
মৃত্যু যেন এসে বলে—আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কবিতাটা বার দুই পড়লেন, কেমন যেন তৃপ্তি হল না। মনে হল, যে ভাবটি মনে এসেছিল ঠিক সেটি ফোটাতে পারেননি তিনি। ভাষা আর ছন্দকে বাঁচাতে গিয়ে ভাব মারা পড়েছে। বচনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে অনির্বচনীয়। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেন। চুপ করে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। একটা পুলের উপর গাড়ি উঠেছিল, শুভ্র সৈকতের মাঝখান দিয়ে শীর্ণস্রোতা নদীটি বইছে। এখন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু মরে যায়নি। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে রেখেছে, দু-কূল প্লাবিত করে একদিন তা আত্মপ্রকাশ করবে। পুকুর হলে মরে যেত। এই চিন্তার সূত্র অনুসরণ করে একটা দার্শনিক-লোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হল, নদীর উৎস উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে, তাই সে বেঁচে থাকে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপও তার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক করতে পারে না। মানুষের জীবনও একটা অদৃশ্য স্রোতের মতো, তারও কি কোনও উৎস আছে কোনও উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে? ভগবানের কথা মনে হল, অনেকদিন আগে পড়া উপনিষদের কথা মনে পড়ল, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কোল থেকে বার্ড মাইগ্রেশনের বইটা পড়ে গেল, মর্ত্যলোকে নেবে এলেন আবার। বইটারই পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তার পর পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে নতুন ভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন আবার। গ্রন্থকার লিখছেন যে, কেবল যে পাখিরাই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায় তা নয়। অনেক প্রাণীও যায়। জলচর, স্থলচর, উভচর, মাছ, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি এমন কি কাঁকড়ারা পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আদিম মানবজাতিদের মধ্যে যারা নিজেদের আদিম স্বভাব এখনও রক্ষা করতে পেরেছে তারাও স্থাণু নয়, পরিভ্রমণশীল। এক স্থানে বেশিদিন থাকে না তারা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের সন্ধানে, শিকারের সন্ধানে, পালিত পশুদের জন্য মাছের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা। কালাহারি মরুভূমির বুশ্‌ম্যানরা, সাইবেরিয়ার বল্গাহরিণ-শিকারীরা, মধ্য এশিয়ার পশুপালকেরা নিয়মিত ভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। আরব দেশে ভ্রাম্যমাণ রুওয়ালা (Ruwala) জাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। সভ্য

Birol migranis by ERICSIMMS

মানুষেরাও মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে। পড়তে পড়তে কবির মনে হল, মুক্তি বলে যে অবস্থাটা আমরা কল্পনা করি, যার স্বপ্ন সাধুরা দেখেন, প্রতি জীবনের মধ্যে এই স্থান পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কি সেই মুক্তি আকাঙ্ক্ষারই আদিম রূপ না কি? যে কোনও পরিবেশেই আমরা বাস করি না কেন, কিছুদিন পরে সেই পরিবেশ যেন কারাগার মনে হয়। একঘেয়েমির কারাগার। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। তাই উত্তরমেরুর পাখি চলে আসে ভারতবর্ষের নদীতীরে, আফ্রিকার হাতী গভীর অরণ্য ত্যাগ করে অগভীর বনে বেড়াতে আসে, উরাল পর্বত বা কামস্কাট্কা থেকে চলে আসে হলদে খঞ্জনের দল ভারতবর্ষের মাঠে। কলকাতার সল্টলেকে যে খঞ্জনগুলোকে দেখে এসেছেন, তাদের দোদুল্যমান পুচ্ছভঙ্গির ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে, নতুন দেশে এসে তারা যেন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। এই আনন্দই কি মুক্তির আনন্দের আভাস? সত্যিই কি এমন কোনো পরিবেশ আছে যা কিছুদিন পরে কারাগার হয়ে ওঠে না, যেখানে নিত্য-নতুনের আবির্ভাব মনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচাতে পারে? চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লম্বা হয়ে শুলেন। শুয়ে শুয়ে আবার পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন এল। অদ্ভুত স্বপ্ন! ছেলেবেলার একটা দুপুর হঠাৎ যেন ফিরে এল স্বপ্নে। অতীতের একটা টুকরো সহসা মূর্ত হল চৈতন্যলোকে। স্কুলের সঙ্গী ভুতোকে দেখতে পেলেন। হরিবাবুর বাগানের বেড়ায় ধারে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা পেয়ারা। আনন্দবাবু, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ভুতো, তুই বেঁচে আছিস? আমি খবর পেয়েছিলাম তুই মারা গেছিস কলেরায়। ভুতো কোনও উত্তর দিলে না। মুচকি হেসে পেয়ারাটা দেখালে শুধু। বালক আনন্দমোহন যেন তাকে ধরতে গেলেন। সে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখিয়ে পেয়ারাটায় কামড় দিলে একটা। এই দেখে আনন্দমোহন ছোটার বেগ বাড়িয়ে দিলেন এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, ঘেমে গেছেন বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। সত্যিই যেন ছুটছিলেন। উঠে বসে ভাবতে লাগলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ ভুতোকে স্বপ্ন-দেখার মানে কি। ভুতোর কথা তিনি তো ভাবছিলেন না, তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। ছেলেবেলার কথাও ভাবছিলেন না, তা হলে এ রকম স্বপ্ন দেখলেন কেন? হঠাৎ মনে হল, এও এক রকম ভ্রমণ না কি? আমাদের মনও বোধ হয় ভ্রমণ করে, একস্থান থেকে আর এক স্থানে—কখনও স্বপ্নে, কখনও কল্পনায়। পাখিরা নতুন দেশে কিছুদিন থেকে যেমন পুরাতন জায়গায় ফিরে আসে, তাঁর মনও বোধ হয় বর্তমানের নতুন পরিবেশ থেকে ফিরে গিয়েছিল অতীতের পরিবেশে, হরিবাবুর বাগানের ধারে ভুতোর কাছে। বিজ্ঞান এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়তো অন্য রকম করবে, কিন্তু কবি নিজের ব্যাখাতে নিজেই তুষ্ট হলেন। অন্যমনস্ক হয়ে ভুতোর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। ভুতো সত্যিই ইহলোকে নেই, কিন্তু সে বেঁচে আছে। অতীত নিগূঢ়ভাবে বেঁচে থাকে। সহসা আর একটা কথাও তাঁর মনে হল, বর্তমানটা প্রবাস, অতীতই যেন স্বদেশ। এ চিন্তা কিন্তু আর বেশিদূর প্রসারিত হল না তাঁর মনে, ট্রেন এসে একটা বড় জংশনে ঢুকল। কলকাতার পর এইটেই প্রথম বড় জংশন, অর্থাৎ বর্ধমান। ভিড় চীৎকার কোলাহল কলরব। একটা নতুন জগতে এসে হাজির হলেন যেন, একটা এঞ্জিন খুব জোরে হুইস্‌ল্ দিয়ে উঠল, মনে হল যেন স্পর্ধিত হুঙ্কার ছাড়ছে কোনও অদৃশ্য আততায়ীকে উদ্দেশ্য করে। কবি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন একবার, মনে হতে লাগল, সহসা যেন কোনো অপরিচিত বিদেশে এসে পড়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

অপ্রত্যাশিত আর একটা ঘটনাও ঘটল একটু পরে। স্টেশনের হোটেলের এক পোশাকপরা চাপরাসী এসে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিই আনন্দমোহন তরফদার কি না, কারণ হাওড়া থেকে তারে খবর এসেছে যে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী মিঃ তরফদারকে যেন খাবার দেওয়া হয়। অমরবাবু বলে এক ভদ্রলোক এ জন্য হাওড়ায় টাকা জমা করে দিয়েছেন। কবি অবাক হলেন, তাঁর খাওয়ার দরকার ছিল না তত। কিন্তু দাম যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন না খেলে লোকসান। কথাটা অমরবাবুর কানে গেলে হয়তো.....

...সাড়ম্বরে খাচ্ছিলেন তিনি। মাংসের ঝোলটা বেশ ভালই লাগছিল। ট্রেনে চড়ে ঝড়ের বেগে যেন নতুন পরিবেশে হঠাৎ তিনি হাজির হয়েছিলেন. সে পরিবেশের সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিছু আর বিসদৃশ লাগছিল না, মাংসের ঝোলটা খুব ভাল লাগছিল। আপন মনে নিবিষ্ট চিত্তে তিনি খেয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা ঘটনা ঘটল।

"এ কি, তুমি এখানে?"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মন্দাকিনী প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর মামাতো শালা যজ্ঞেশ্বর। কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সহসা তাঁর মনে পড়ল, এই বর্ধমানের কাছেই তো তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এই স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি করে যেতে হয়। মন্দাকিনী এবং তাঁর মামাতো ভাই উঠে প্রণাম করলেন কবিকে।

কবি বললেন, "একটু দরকারে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ফিরছি।" তারপর একটু থেমে একবার ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি আসছ তা তো জানাওনি, জানলে আমি—"

"আমি যে আসব তা কি নিজেই জানতাম? রূপচাঁদবাবুর চিঠি পেয়ে আসতে হল।"

মন্দাকিনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কবি ভয় পেয়ে গেলেন একটু।

"ব্যাপার কি? কি লিখেছে রূপচাঁদ?"

"বলছি।"

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা শোনা গেল। মন্দাকিনী তাঁর মামাতো ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তা হলে আর কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কি? টিকিট কিন্তু কাটা হয়ে গেছে নয়?"

"টিকিট ফেরত নেবে।"

"তা হলে তোকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমার টিকিট দিয়ে তুই না হয় ফিরে যা। আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথা?"

"এনে দিচ্ছি।"

যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি নেমে গেল এবং পুঁটুলি, ঝোলা, ঝুড়ি, তোরঙ্গ, বিছানার বাণ্ডিল প্রভৃতি নিয়ে এল। গুছিয়ে রেখে দিলে সব নিপুণভাবে। জামাইবাবু যে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন, এতে যেন সে বিশেষ একটা গৌরব বোধ করছিল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা।

গার্ডের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল।

যজ্ঞেশ্বর একখানি ইন্টার ক্লাস টিকিট সসম্ভ্রমে কবির হাতে দিয়ে বললে, "এই দিদির টিকিট। আমি 'ক্রু'কে বলে দিচ্ছি, চেঞ্জ করে দেবে।"

হোটেলের খানসামা এসে প্লেট প্রভৃতি নিয়ে নেমে গেল। যজ্ঞেশ্বরও প্রণাম করে নেমে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

কবি ও মন্দাকিনী পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে যা অহরহ ঘটছে কিন্তু যার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই—ক্ষুদ্র পরিবেশে সেই ঘটনাটা কবির মনে কৌতুক সঞ্চার করলে একটু। পৃথিবী যে সেকেন্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে যে সেটা চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করছি—ঠিক এ কথাটা কবির মনে হল না দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনের কামরায় সহসা জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে এ কথাটা তাঁর মনে হল যে, আমাদের প্রত্যাশাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে অপ্রত্যাশিতকে আমরা ভাল করে সম্বর্ধনা করি না, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। সে যখন আসে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দাকিনী না এসে যদি একটা শ্যাওলা ধরা কলসী জানলার ভিতর দিয়ে এসে হাজির হত আর সেই কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য না বেরিয়ে যদি মন্দাকিনী বেরিয়ে আসতেন এবং এসে বলতেন যে যাদুকর পি. সি. সরকারের সঙ্গে আলাপ হল. তিনি আমার গাড়িভাড়াটা বাঁচিয়ে দিলেন—তা হলে কি এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর হত কিছু? কবি লক্ষ্য করলেন, মন্দাকিনীর গালে কপালে কালো কালো দাগ হয়েছে কিসের। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন মনে করলেন না। চুপ করে চেয়েই রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মন্দাকিনী কোনও কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক নজর চেয়েই সত্যই হৃদয়ঙ্গম করছিলেন, করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রূপচাঁদবাবু চিঠিতে যে সব ইঙ্গিত করেছিলেন তা যে মিথ্যা তা কবির মুখভাবের সূক্ষ্ম শুচিতা দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শুচিতার স্বরূপ আর কারও চোখে হয়তো ধরা পড়ত না, কিন্তু মন্দাকিনীর চোখে পড়ল, কারণ এই শুচিতাটুকুর ভিত্তির উপরই তাঁর সমগ্র দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠেছিল, সে ভিত্তির স্বরূপ তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না, তাতে এতটুকু চিড় খেলে আর কেউ না জানুক তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারতেন তা কোনও প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই। তবে একটা কাণ্ড যে কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, আর খুব সম্ভবত ঘটেছে কবিরই নির্বুদ্ধিতার জন্য বা কোনও কিছু নিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে—এ রকম ধরনের কাণ্ড তো একবার নয়, অনেকবার উনি করেছেন। একবার তো চাকরিটাই যেত আর একটু হলে। ছেলেরা করেছে স্ট্রাইক, ওঁর সর্দারি করে তাদের দলে ভিড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উনি ভিড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকাটা ক্রমশ যেন একটা সেতুর মতো হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে মন্দাকিনী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে, কবির মনে হল।

মন্দাকিনী এর পর যা বললেন, তা কিন্তু কবি প্রত্যাশা করেননি।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয়েছে নিশ্চয়। ঠাকুরটা রাঁধে কেমন?"

কবি তবু চুপ করে রইলেন। অভিভূত হয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

"রূপচাঁদের চিঠি পেয়ে আসছ তুমি! কি লিখেছে রূপচাঁদ? আমাকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে চিঠি লেখার মানে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

মন্দাকিনী যে প্রশ্ন করেছিলেন এটা ঠিক তার জবাব নয়। নিজেও তিনি বুঝতে পারছিলেন তা, কিন্তু যত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই হোক সবচেয়ে দরকারি কথাটা তিনি যে ব্যক্ত করেছেন, করতে পেরেছেন, এইতেই তিনি যেন আরাম পেলেন একটু, সাহসও পেলেন।

মন্দাকিনীর উত্তর কিন্তু একটুও অপ্রাসঙ্গিক হল না।

তিনি বললেন, "তিনি তোমার বন্ধু বলেই লিখেছিলেন। এসব কথা তোমারই উচিত ছিল আমাকে জানানো। তুমি দিনরাত বসে বসে কবিতা লিখতে পার, কিন্তু আমাকে দু লাইন চিঠি লিখতে পার না। শঙ্করীকে চিঠি লিখেছিলে? না তাও লেখনি?"

মন্দাকিনীর কথার ধাঁচে সেই সাবেক সুর বেজে ওঠাতে আনন্দমোহন আর একটু সাহস পেলেন। সাহস পাবার আর একটা কারণও ছিল। যে সব অস্ত্র চালনা করে মন্দাকিনী তাঁকে কাবু করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মনে হল, সে সব অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার মতো একটা অস্ত্র অন্তত তাঁর তূণে আছে। ব্যবহার করলেন সেটি।

"অতবড় জমিদারির ম্যানেজারি করতে করতে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না, চিঠি লিখব কখন? তার ওপর খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম একটা।"

এইবার মন্দাকিনী আকাশ থেকে পড়লেন এবং পড়েই নির্বাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জমিদারির ম্যানেজারি? খুনের মামলা? এসব কি আবার! এসবের বিন্দুবিসর্গ তো তিনি জানেন না! রূপচাঁদবাবুও তো লেখেননি কিছু! তিনি কেবল লিখেছেন—'আপনি চলে আসুন, আনন্দমোহন কাছাখোলা লোক, আপনি না থাকাতে নানা ভাবে ও নানা রকম কেলেঙ্কারি করে বেড়াচ্ছে, ওকে একদিন থানায় পর্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অনেক তদ্বির করে জেল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা; একটা মেয়েমানুষের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে যা তা রটাচ্ছে লোকে।' জমিদারির কথা তো লেখেননি কিছু!

তাঁর বাক্‌শক্তি যখন ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, "কার জমিদারির ম্যানেজারি করছ তুমি?"

"অমরেশবাবু। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি গেছে। আমিই এখন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার।"

"কি রকম?"

মন্দাকিনীর মুখভাব দেখে কবি খুশী হলেন। এই সংবাদ-বোমাটি যে মন্দাকিনীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বিধ্বস্ত করে দেবে এ তিনি জানতেন। কিছুদিন পূর্বে মল্লিক-গৃহিণী মন্দাকিনীকে তাচ্ছিল্যভরে কি একটা বলেছিলেন যার থেকে মন্দাকিনীর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, উনি ম্যানেজারের বউ বলেই এ ধরনের কথা বলতে সাহস করেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, চাকা ঘুরে যেতে পারে এবং তিনিই একদিন ম্যানেজারের বউ হয়ে যেতে পারেন। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—এ কথা স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। কবিকে নানা রকম প্রশ্ন করে নানা ভাবে কুরে কুরে সম্পূর্ণ খবরটি তিনি যখন জানলেন বিশেষত যখন টের পেলেন যে এর জন্যে মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে হাজার টাকা পাওয়াও গেছে তখন তিনি উথলে উঠলেন। তাঁর এই উথলে-ওঠা অবস্থা দেখেও কবি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন মনে মনে। শঙ্করীকে, মানে তাঁর মেয়েকে সত্যিই এখনও চিঠি লেখা হয়নি। সেই প্রসঙ্গটা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হলে কি জবাব দেবেন তিনি! মরীয়া হয়ে ঠিক

করলেন, নিজেই প্রসঙ্গটা তুলবেন। বললেন, "ফিরে গিয়েই তোমাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা ছুটতে হয়েছিল। শঙ্করীকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে পারিনি এখনও। ওই খুনের মকদ্দমাটায় এমন জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে—আমার বিশ্বাস মল্লিক আছে এর ভিতরে।"

দেখা গেল মন্দাকিনীর প্রত্যয় আরও দৃঢ়।

তিনি বললেন, "নিশ্চয় আছে।"

একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মন্দাকিনী একটা ফেরিওলাকে দেখে বললেন, "আমার জন্যে কিছু ফল কেনো তো, আজ আমার ষষ্ঠীর উপোস।"

কবি তাড়াতাড়ি ফল কিনতে লাগলেন।

।। বারো ।।

কবি যথাসময়ে এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক, কিন্তু ডানার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। কবি ব্যস্ত ছিলেন মন্দাকিনীকে নিয়ে—ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ডানাকেও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পাখিগুলোকে নিয়ে, আবার দু-চারটে পাখি মরে গিয়েছিল সে জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। দ্বিতীয়ত, রূপচাঁদবাবু আবার বিব্রত করছিলেন তাকে। আগ্নেয়গিরিশিখর থেকে আবার ধূমোদ্‌গিরণ শুরু হয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে যেদিন কলকাতা চলে গেলেন সেই দিন রাত্রে রূপচাঁদবাবু এসেছিলেন। অনেক রাত্রে। ডানা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয়নি, বই পড়ছিল। রূপচাঁদবাবুর ডাকাডাকিতে উঠে আসতে হল। তাকে দেখেই রূপচাঁদবাবু হাত দুটি জোড় করে বললেন, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তুমি না ডাকলে আর আসব না। কিন্তু আসতে হল, তোমার জন্যেই আসতে হল। একটু আগে তোমার চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসছিলাম—মন হল, তোমার চিড়িয়াখানায় সাপ ঢুকেছে। পাখিগুলো খুব চেঁচামেচি করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দও পেলাম দু-একবার। মালীটার কি রাত্রে ওখানে শোবার কথা? ডাকাডাকি করে সাড়া পেলাম না কারও, তাই ভাবলাম তোমাকে অন্তত খবরটা দিয়ে যাই।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সপ্রতিভভাবে বললে, "ও। কি করা যায় তা হলে বলুন তো? মুন্সীর ওখানে শোবার কথা। ঘর রয়েছে তার।"

"আমি তো ডেকে সাড়া পেলাম না কারও। তুমি যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি—ও, বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে না তা মনে ছিল না।"

"আমি গিয়েই বা কি করব? সাপ মারা তো আমার সাধ্যে কুলবে না। আচ্ছা আমি দেউড়িতে খবর পাঠাচ্ছি, সুখন পাঁড়ে যা পারে করুক।"

"বেশ, আমি চললাম তা হলে।"

রূপচাঁদ চলে গেলেন কিছুদূর তার পর ফিরে এলেন আবার। এসে যা বললেন, তা অপ্রত্যাশিত নয়, ওই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিল ডানা।

"সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে কাজটা করে ফেলেছি, তার জন্যে এখনও কি ক্ষমা করনি আমাকে? ভগবানও শুনেছি পাপীকে ক্ষমা করেন, তুমি কি তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর?"

প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলা চলত, কিন্তু ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড, তার পর তিনিও ভিতরে উঠে গেলেন।

বললেন, "ডানা, এমন অবুঝের মতো ব্যবহার তোমার কাছে আশা করিনি। তুমি সত্যিই যদি আমার নিতান্ত স্বাভাবিক আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাক, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তোমার এই সঙ্কোচ দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার সেদিনকার ব্যবহারে সত্যিই হয়তো তুমি তত রাগ করনি।"

এর উত্তরে ডানা যে কথা যে সুরে বললে, তা তার নিজের কানেই অত্যন্ত নরম শোনল। সে বলতে চাইছিল, "এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে" বা ওই ধরনের একটা রূঢ় কিছু। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনুনয়ের সুর—"কেন আপনি আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করছেন রূপচাঁদবাবু?"

"এটাকে জ্বালাতন মনে করছ কেন তুমি? অভিনন্দন এটা, পুরুষের অকৃত্রিম অভিনন্দন প্রকৃতির উদ্দেশে। আচ্ছা, সত্যিই তুমি বিরক্ত হয়েছ?"

"আমার সেদিনের আচরণ থেকে তা কি স্পষ্ট হয়নি?"

"না। সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় আমন্ত্রণেরই নামান্তর। পুরুষের শক্তি বা আগ্রহকে মাপবার মাপকাঠি ওটা অনেক সময়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তোমরা অনেক সময় ব্যবহার কর ওটা—বড় বড় প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের বিচার প্রাণীদের নিয়ম নিয়ে হয় না। প্রাণীরা প্রকৃতির কারাগারে বদ্ধ জীব। মানুষ সে কারাগার ভেঙেই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। কামনার দাসত্ব করা প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, মানুষের পক্ষে নয়। অন্তত আমার পক্ষে নয়।"

"আমাকে কি তা হলে তুমি অমানুষ বলে মনে কর?"

"আপনার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা আমি কোনোদিন করিনি। করবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। এইটুকু শুধু বুঝেছি, আপনি যে পথে চলতে চান সে পথে আমি চলতে চাই না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীও চান না।"

কথাটা বলেই ডানার মনে পড়ল, বকুলবালা মানা করে দিয়েছিল রূপচাঁদবাবুকে তার কথা বলতে।

"আমার স্ত্রীর কথা জানলে কি করে তুমি?"

"শুনেছি।"

"কি শুনেছ?"

"শুনেছি তিনি সতী।"

"কে বললে তোমাকে?"

"ঠিক মনে নেই। আশাকরি সংবাদটা মিথ্যে নয়।"

"কিন্তু তিনি আমার পথে চলতে চান না—এ খবরটা তো তাঁর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ খবরটা পেলে কোথা?"

"ওটা আমার অনুমান। আর খুব সম্ভবত সত্য অনুমান। তিনি সত্যিই যদি সতী হন, তা হলে আপনার পথে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।"

রূপচাঁদ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এ দেশের সতী স্ত্রীরা স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে সব কিছু করতে পারে। সতী স্ত্রী পঙ্গু স্বামীর লালসা চরিতার্থ করবার জন্য তাকে কাঁধে করে বেশ্যাবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে—এ গল্পও প্রচলিত আছে এ দেশে।"

"হয়তো আছে। কিন্তু ও গল্পের মূলে আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। ওতে স্বামীর অকপটতাও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর লালসার কথা স্ত্রীর কাছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে তার সন্দেশলোলুপতা। লুব্ধ অসহায় পঙ্গু স্বামীর তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্যে হয়তো করুণাময়ী সতী স্ত্রী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যালয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার আচরণের মিল কোথায়? আপনি কি আপনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে? আমার বিশ্বাস, করেননি। আপনি যা করছেন, তা চোরের মতো করছেন। আপনার লোলুপতায় শিশুর সারল্য নেই, আছে অতি জঘন্য ভণ্ডামি। যান, বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

রূপচাঁদ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মতো জ্বলতে লাগল। নাসারন্ধ্রযুগল বিস্ফারিত হল একটু। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি বললেন, তাতে উষ্মার আভাস পাওয়া গেল না।

"তুমি আমার নিখুঁত ছবি এঁকেছ; তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটু খটকা লাগছে। তুমি আমাকে এতটাই যদি বুঝেছ তা হলে আমাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ কেন, আর প্রশ্রয়ই যদি দিয়েছ তা হলে মাঝ পথে থামছই বা কেন?"

"আমি আপনার কথার উত্তর দেব না। আপনি বাড়ি যান।"

ঠিক এই সময়ে চাকরটা না এসে পড়লে কি হত বলা শক্ত। চাকরটার আগমনে রূপচাঁদ বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু, সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

"মাইজি, মুন্সী এসেছে।"

"এতক্ষণ তা হলে ঘুম ভেঙেছে যাদুর। আচ্ছা, আমি চললাম। আবার আসব পরে।"

রূপচাঁদ বেরিয়ে গেলেন।

মুন্সী এগিয়ে এসে সেলাম করে প্রশ্ন করলে, মাইজি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

"আমি তো ডেকে পাঠাইনি।"

"রূপচাঁদবাবুই তো একটু আগে ডাকছিলেন আমাকে। আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি এই দিকেই আসছেন, তাই মনে হল আপনিই বোধহয় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"না, আমি ডাকিনি। রূপচাঁদবাবু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে শুনেছিলেন যে, পাখিগুলো চিৎকার করছে, সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজও পেয়েছিলেন তিনি, তাই তোমাকে ডাকছিলেন। চিড়িয়াখানার সব ঠিক আছে তো?"

"ঠিক আছে। অনেক পাখি তো রাত বারোটার সময় রোজ ডেকে ওঠে। সাপের আওয়াজ তো পাইনি। অমন ঘন জালের বেড়ার মধ্যে সাপ ঢুকবেই বা কি করে?"

"তুমি চিড়িয়াখানার চারিদিকে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দাও তো?"

"রোজ দু বেলা দি মাইজি।"

"নতুন যে প্যাঁচাটাকে আজ এনেছ, সেটা খেয়েছে কিছু?"

"একটা ইঁদুর খেয়েছে।"

"আচ্ছা, যাও তুমি। আমি কাল সকালে যাব।"

মুন্সী চলে গেল, চাকরটাও শুতে গেল নিজের ঘরে।

ডানা বিছানায় শুয়ে আবার আগের মতন পড়তে শুরু করল।

ভাবতে চেষ্টা করল. যেন কিছু হয়নি। রত্নপ্রভার কথাগুলো মনে পড়ল—ও কিছু নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়, ওতে ভয় পেয়ো না। ডানা ভয় পায়নি। কিন্তু এটা সে ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে, রূপচাঁদ সমস্যার একটা ভদ্র সমাধান করতে না পারলে তাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে যাবে কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? খুঁজলে হয়তো আশ্রয় কোথাও মিলবে, কিন্তু তার জন্যে যে প্রাথমিক প্রয়াস প্রয়োজন তা করবার শক্তি তার আছে কি? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেকগুলো দরখাস্ত সে করেছিল। সন্তোষজনক কোনও জবাব আসেনি। দু-এক জায়গা থেকে ইন্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছিল, কিন্তু ডানা যায়নি। তার মনে হয়েছিল, চাকরিই যদি করতে হয় তা হলে এর চেয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না আপাতত। অমরেশবাবু বা রত্নপ্রভাকে মনিব বলে মনে হয় না কখনও. তাঁরা যেন আত্মীয়। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেল ডানা একটু। নিজের ভবিষ্যতের কথা এমন ভাবে কেন ভাবছে সে? এ ভাবনার কোনও কূলকিনারা তো নেই! সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কাজ কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করো না। নির্বিকার হয়ে যদি কাজ করতে পার, তা হলে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে। আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, কাজ করবার বদলে আমি এ চাই ও চাই—এই সব অহংচিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তা হলে দুঃখের শেষ থাকবে না। এ কথা নতুন নয়, চির পুরাতন। কিন্তু পুরাতন বলেই পরিত্যাজ্য নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার ওটা একটা পরীক্ষিত পথ।"....ডানা ভাবতে লাগল, নির্বিকার হয়ে কাজ করা কি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বা কেমন ধারা কথা? ভাল কাজ, মন্দ কাজ—দুই-ই সমান বলে মনে করা যায় কি! তা হলে ওই কামুক রূপচাঁদের বাহুপাশে ধরা দেওয়া আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করায় কোনো তফাত নেই? ডানার মনে হল, সন্ন্যাসীর যুক্তি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারেনি সে। কাল গিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গটা আবার একবার তুলতে হবে। সন্ন্যাসীকে ধরাই কিন্তু শক্ত। প্রায়ই তো বাসায় থাকেন না। ডানা বইটাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলে আবার। বিলেতের এক স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার প্যাট্রিজ (E. H Patridge) লিখেছেন বইখানা। এ বইটাতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর পক্ষে তা খুব নতুন কথা নয়। বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার ভাব ও-দেশের মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমাদের দেশে এখনও ততটা করেনি, কারণ আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এখনও তেমন প্রবল হয়নি, যদিও আমরা কামনা করছি—প্রবল হোক। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। প্যাট্রিজ সাহেব বলছেন যে, যদিও বর্তমান যুগের টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপহাস করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা করতে যাওয়া যুক্তিযুক্তও নয়; কিন্তু তবু এ কথা ভুললে চলবে না, টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে অতি-প্রবণতা আমাদের ক্রমশ অমানুষ করে

ফেলেছে—আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল করছে, আমরা আদর্শ পিতা-মাতা হতে পারছি না, আদর্শ ভাই-বোন হতে পারছি না, আদর্শ বন্ধু-আত্মীয় হতে পারছি না, আদর্শ দেশসেবকও হতে পারছি না। ওসব হতে হলে বুদ্ধিবলের চেয়ে চরিত্রবল থাকা বেশি দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধিতেই শান দিচ্ছে কেবল, স্বার্থপর করে তুলছে আমাদের। আমরা এর ফলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছি, জীবনটাকে ভাল করে ভোগও করতে পারছি না। টাকা রোজগার করছি কিন্তু সুখী হচ্ছি না, জীবনটাই ক্রমশ যেন বিস্বাদ হয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ-রস থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এমন অবস্থা হয়েছে, যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে চান না, ভয় পান। যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী তারা এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং প্যাট্রিজ সাহেবের অভিমত, নানা ছুতোয় প্রকৃতির সংস্পর্শ লাভ কর। আমরা এই যে একপেশে জীবনযাপন করছি, এ জীবন অসম্পূর্ণ, তাই আমরা অসুখী। ডানার মনে হল, প্যাট্রিজ সাহেবের প্রকৃতি-সম্পূর্ণ জীবনের যে শিক্ষা আমাদের দেবে, তাও কি আমাদের কাম্য? প্রকৃতিলালিত বর্বর মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে, তারা প্রকৃতিকে চেনে, প্রকৃতির ভাষা বোঝে, তার প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ তাদের নখদর্পণে, আমরা কি তাই হতে চাই? প্যাট্রিজ সাহেব তা চান না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চান। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানা। ভারতবর্ষের দর্শনেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। ঠিক বুঝতে পারেনি কথাটা। আর একদিন গিয়ে বুঝে নিতে হবে। বইটা আবার পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু আর ভাল লাগল না। আলো নিবিয়ে পাশ ফিরে শুল। সন্ন্যাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল কেবল। স্বপ্নেও দেখা দিলেন সন্ন্যাসী।

খুব ভোরেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল ডানার। তখনও অন্ধকার কাটেনি। উঠে বসল সে বিছানার উপর। বসেই মনে হল, শরীরের ক্লান্তি একটুও দূর হয়নি। সমস্ত রাত সে কেবল চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সত্যিকার ঘুম আসেনি। একটা অস্বস্তি সারা মন জুড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে খবর পেলে যে ধরনের অস্বস্তি হয়, অনেকটা তেমনি। রূপচাঁদই কি এর একমাত্র কারণ? না, অন্য কিছু? চিড়িয়াখানার বন্দী পাখিগুলো? তাদের অসহায় অবস্থা গোড়া থেকেই পীড়া দিচ্ছে তাকে। পাখিগুলোকে দেখে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের কথা মনে পড়ে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও দোষ প্রমাণ করা যায়নি, এমন কি যাদের বিচারালয়ে বিচার পর্যন্ত হয়নি, তাদের চেয়েও নিরপরাধ এই পাখিগুলো। একটা বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার পাহারাদার। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে বলেই কি এই অস্বস্তি? আবার তার মনে হল, তার নিজের টাকা যদি থাকত কিছু, তা হলে সে বোধ হয় এমন অশান্তি ভোগ করত না। নির্ভরযোগ্য কোনো নিজের লোকও যদি থাকত কেউ!....হঠাৎ একযোগে সমস্ত পাখিগুলো ডেকে উঠল। ফরসা হয়ে এল বোধ হয়। ঘোর গ্রীষ্মেও সে সাহস করে জানলা খুলে শুতে পারত না। দু-একদিন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি, শুধু রূপচাঁদের ভয় নয়, সে ভয়ও অবশ্য ছিল খুব, কিন্তু অন্য ভয়ও ছিল—বিশেষ করে সাপের ভয়। গঙ্গার ধারে প্রায়ই বড় বড় সাপ বের হয়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। চাকরটাকে উঠিয়ে দিলে চা করবার জন্য। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখলে যে, অত ভোরেও

একটা দোয়েল এসে নদীর ধারে পোঁতা উঁচু বাঁশের ডগাটার উপর বসে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। পূর্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত। মনে হল, ও যেন পাখি নয়, বৈদিক যুগের কোনও ঋষি, উষাদেবীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছে স্বতঃ-উৎসারিত সঙ্গীতের মন্ত্র দিয়ে। বহু উষাকে অনুসরণ করে যে নতুন উষা আজ এসেছে, অনন্তের যাত্রাপথে চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য যে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর পূর্বতোরণে, তার সম্বন্ধে আর সবাই উদাসীন, কিন্তু ওই দোয়েল নয়। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে ওই ক্ষুদ্র পাখিটি যে কর্তব্য পালন করছে তার জন্য তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তাকে চমকে উঠতে হল আর একটা পাখির ডাকে, যেন সুরের ছোট্ট তুবড়ি ছুটিয়ে উড়ে চলে গেল একট টুনটুনি পাখি। তার পরেই পাশের পুটুস ফুলের ঝোপটাতে টিক-টিক-টিক শব্দ করে খুব ছোট একটা পাখি তুড়ুক তুড়ুক করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। দরজি পাখি কি? বেশিক্ষণ ভাববার অবসর পেলে না, এক জোড়া ঘুঘু তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। পাশাপাশি এসে বসল তারা অশ্বত্থগাছের কাঠের বাক্সটার উপর। এই বাক্সটা অমরেশবাবু টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি কোনও পাখি ওতে বাসা বাঁধে এই আশায়? কোনও পাখি এখনও পর্যন্ত বাঁধেনি। ঘুঘু পাখি দুটোকে বসতে দেখে ডানার একটু আশা হল, বাসা বাঁধবে কি ওরা? পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল পাখি দুটো। উড়ে অনেক দূর চলে গেল। অনেক গাছে অনেক বাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন অমরেশবাবু—অনেক রকম আকারের বাক্স, কিন্তু এক ওই তালগাছে টাঙানো বাক্সটায় ছাড়া অন্য কোনও বাক্সে কোনও পাখি বাসা বাঁধেনি। মানুষকে পাখিরা এখনও তত বিশ্বাস করে না। ওই বাক্সগুলোকে তারা ফাঁদ ভাবছে। বাক্সগুলোর অভিনবত্ব যখন লোপ পাবে, পুরনো হয়ে যাবে ওগুলো যখন, প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যাবে, তখন হয়তো ওগুলোতে বাসা বাঁধবে পাখিরা। অভিনবত্বকে ওরা ভয় করে, অভিজ্ঞতার ধোপে না টিকলে ওরা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করে না। মানুষের মতো দ্রুত আধুনিক হওয়ার দিকে ওদেরও প্রবণতা কম। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানী পাখিদের আধুনিক করে তোলবার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য বৈঠকখানা, বাসা প্রভৃতি বানিয়ে দিচ্ছেন, এই ভদ্রমহিলার টাইপরাইটারের উপর ছোট্ট একটি পাখির ছবিও সে একবার দেখেছিল অমরেশবাবুর একখানা বইয়ে; কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন যে, পাখিদের বিশ্বাস উৎপাদন করানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডানার এ চিন্তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পেল না একদল শালিকের চিৎকারে। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে হল, শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে কেন। দেখল, একটা নেউল বেরিয়েছে। তাকে দেখেই নেউলটা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে। তারপরই চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী চর থেকে ফিরছেন। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল আবার। যতক্ষণ পাখিদের নিয়ে মন নিযুক্ত ছিল ততক্ষণ নিজেকে সে ভুলে ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখেই নিজের কথা মনে হল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সন্ন্যাসীর উপর একটু অভিমান তার মনের প্রত্যন্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে। আবিষ্কার করে সে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল নিজের কাছেই। সন্ন্যাসী তো তার সঙ্গে কোনোদিন কোনও অভদ্র ব্যবহার করেননি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু, কোনও দাবিই তো নেই, তবে অভিমান কেন? অভিমানকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সামান্য একটু প্রেমের সম্পর্ক থাকা দরকার—তা সে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটুকু সম্পর্কও তো তার হয়নি।

সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে হয়তো হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী সে ইচ্ছা করেননি। বরং বিপরীত ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন তিনি, নারীসঙ্গ তিনি পরিহার করতে চান। ডানার মনে হল, এই জন্যই অভিমান হয়েছে তার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মনে মনে সে কি যেন একটা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে যদিও স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তার, কিন্তু প্রত্যাশা একটা ছিল মনে মনে, এখনও আছে। সে যেন মনে মনে নির্ভর করে আছে ওই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটির উপর, তার নিভৃত অন্তরবাসী সত্তাটির দৃঢ় প্রত্যয়—ওই লোকটির সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন, ইচ্ছে করলে তারও সমস্যার সমাধান করতে পারেন, কিন্তু করছেন না। এই জন্যই অভিমান হয়েছে বোধহয়। আর একটা কারণও সম্ভবত আছে, যদিও সেটা নিজের কাছে এতদিন স্বীকার করতে বেধেছে তার। কিন্তু প্রশান্ত প্রভাত-আলোকে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। সে বুঝতে পারল যে, তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই রাগ হয়েছে; এও সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসীর দুর্নমনীয় সংযমকেও তার নারী-প্রকৃতি সুচক্ষে দেখছে না, মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বা পরিখা যা তাকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। মনে পড়ল আর একটা ভোরের কথা। সে দিন সে রূপচাঁদের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সন্ন্যাসীর ওই ভাঙা ঘরটাতে। সন্ন্যাসী ঘরে ছিলেন না, একটু পরে ফিরে এসে যা যা বলেছিলেন তা এখনও মনে আছে তার। একটা কথা বিশেষ করে মনে আছে—"পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হল।" সে তো সবার কাছ থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন কি ওই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও। কে কি বলবে, পাছে সন্ন্যাসী কিছু মনে করেন, এই সব ভেবে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গ এড়িয়ে এসেছে, ইচ্ছে থাকলেও যায়নি তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে সে কি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না? তার ঘনিষ্ঠতা কি উপেক্ষা করতে পারতেন উনি? তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে জীবনে। অমরেশবাবু, আনন্দবাবুর মতো লোকও আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি। রূপচাঁদ তো হয়েইছেন।...হঠাৎ অনেক দিন পরে আবার মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরী আর ভাস্কর বসুর কথা। এরা দুজনেও আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। রিসার্চস্কলার ভাস্কর বসুকে তার নিজেরও ভাল লেগেছিল। জাপানীরা বোমা ফেলে যদি রেঙ্গুন বিধ্বস্ত করে না দিত, তা হলে হয়তো ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত। কথাবার্তা তো প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেছে। সৌম্যদর্শন ভাস্কর বসুর মুখটা মনের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল! কোথায় আছে এখন সে? বেঁচে আছে কি? তার মন কিন্তু ভাস্কর বসুকে নিয়ে, অতীতকে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে চাইল না, সন্ন্যাসীই এসে মনটা জুড়ে বসলেন আবার। সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন তার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল ভূমিতে। তাঁর ভূমি নিবদ্ধ দৃষ্টি ডানার অহঙ্কারকে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল যেন। ডানা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, উনি চোখ তুলে চাইবেন এবং তাকে দেখে মৃদু হেসে বলবেন কিছু। কিন্তু উনি সে সব কিছুই করলেন না। ওঁর বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে জগতের সম্বন্ধে উনি যেন সচেতনই নন মনে হল। নিজের ভাঙা ঘরের মধ্যে যখন তিনি ঢুকে পড়লেন, তখনও ডানা দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে বাইরের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীময় হয়ে গিয়েছিল। চাকরটার ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল।

"চা ভিজিয়ে দিয়েছি মা, আপনি আসুন।"

"ভিজিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ভেজাতে গেলে কেন? আমাকে ডাকলেই পারতে। ভেজাবার আগে টী-পট্‌টা গরম জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?"

"নিয়েছিলাম। ভরতি ভরতি দু চামচ চা দিয়েছি।"

"দুধটা গরম করেছ?"

"করেছি।"

নিরর্থক জেনেও চাকরের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ সে করল নিজেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকবার বাসনায়। কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, কি করলে সে আর পাঁচজনের মতো বেশ সহজ হতে পারবে। ত্রিশঙ্কুর মতো কতদিন আর সে কাটাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে? চা খেতে খেতে সে ঠিক করলে, ওই সন্ন্যাসীর কাছেই সে পরামর্শ চাইবে আর একবার গিয়ে। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনি দয়া করে আমাকে একটা সহজ পথ বলে দিন। আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশ অত্যন্ত ধোঁয়াটে মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও অনুসরণ করতে পারি না। কখনও মনে হয় হাস্যকর, কখনও মনে হয় অসম্ভব। সেদিন উঞ্ছবৃত্তির কথা বলছিলেন, এ যুগে ব্যাপারটা কি বেমানান নয়? মনে মনে সন্ন্যাসীকে সামনে বসিয়ে মনেমনেই কথাগুলো বললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। কি ছুতোয় সে যাবে তাঁর কাছে? তাঁর দিক থেকে আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তো সে পায়নি কোনোদিন। এমনভাবে যাওয়াটা কি শোভন? কথাটা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না গিয়ে পারেনি। এর কারণ সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, তাঁর সান্নিধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা অনির্বচনীয়, যার অপরূপত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সমস্যার কথা সে তো পেড়েছিল কয়েক দিন আগে, সন্ন্যাসী বিরক্ত হননি। বলেছিলেন, যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে হলে ভাবনাকে একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে। সেই পথের কথাই জিজ্ঞাসা করবে এবার গিয়ে। একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হয়ে তার মন যেন একটু শান্ত হল।

পর-মুহূর্তেই চাকরটা এসে বললে, "কাল দুপুরে যখন আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, তখন পিয়ন এসে ওই পার্সেলটা দিয়ে গেছে। আপনি রসিদ সই করে দিন, পিওন এসে আজ নিয়ে যাবে।"

খুব ছোট একটা পার্সেল রত্নপ্রভা পাঠিয়েছেন। ডানা খুলে দেখলে, তার মধ্যে একটা চাবি রয়েছে আর একটা চিঠি।—

ডানা,

আমাদের লাইব্রেরি-ঘরের চাবিটা তোমাকে পাঠালাম। মাঝে মাঝে গিয়ে বইয়ের শেল্‌ফ্‌গুলোর একটা তদারক করো। অনেক সময় উই লাগে। কোনও বই যদি পড়তে ইচ্ছে করে, পড়ো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকাই স্থির কর, সুখন পাঁড়েকে বললেই সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। তাকে বলে এসেছি। তুমি যে সব ভয় করছ তা অলীক। আমি যতটা করবার করে এসেছি। কোনও ভয় নেই। পাখিগুলোর খবর দিও মাঝে মাঝে। কাল আমরা

সিমলা যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানা গিয়ে পাঠাব। বকুলবালার জন্যে একটা এ-বছরের হলদে পাখি কিনেছি টেরেটি বাজার থেকে। কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আগে থাকতে তাকে বলো না যেন কিছু। পৌঁছলে তারপর খবর দিও। আশাকরি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও। ইতি—

রত্নপ্রভা।

মুক্তোর মতো গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল। নতুন ধরনের একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল যেন সে। ঠিক করলে, আগে লাইব্রেরিতে যাবে, তারপর চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর। একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল।

লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন একটা জগৎ আবিষ্কার করলে সে। তাদের বাড়িতেও বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, কিন্তু তাতে ছিল প্রধানত আইনের বই। যখন কলেজে পড়ত, তখন কলেজ-লাইব্রেরির বই সে নিত মাঝে মাঝে। প্রায়ই কাজের বই নিত, পড়ার বই বা যে সব বই পড়লে পরীক্ষা পাস করবার সুবিধা হয় সেই সব বই। তার সঙ্গে আনন্দের বিশেষ কোনো যোগ ছিল না, কলেজ-লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামায়নি সে। অমরেশবাবুর ছোট্ট-লাইব্রেরিটি কিন্তু তাকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান দিলে। তার অবলম্বনহীন ক্ষুধিত মন যেন একসঙ্গে অবলম্বন এবং খাবার পেয়ে গেল নানারকম। কত রকম বই। পাখির বই-ই যদিও বেশি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজী বাংলা নানা রকম মাসিক পত্র, গ্রীক নাটকের একটা পুরো সেটা, ইংরেজী নভেল, বাংলা নভেল, নক্ষত্রের বই, পাকপ্রণালী, ইতিহাসের বই দু-চারখানা, কয়েকটা অভিধান—নানা রকম বই রয়েছে। ডানা একটা চাকরকে দিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললে। পরিষ্কার করাবার সময় একটা খাতা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সাধারণ একসারসাইজ বুক। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পক্ষী-পর্যবেক্ষণ বাই গণেশ'। খাতা খুলে আরও অবাক হয়ে গেল ডানা। চণ্ডীর বন্ধু গণশার খাতা, গত বছরের ডায়েরির মতো, সম্ভবত অমরেশবাবুর উৎসাহে পাখি দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল গণেশ। যা যেমন দেখেছিল, লিখে রেখেছে।

১লা কার্তিক, ১৩৫৬ ঃ বেনেবউ পাখির ডাক শোনা গেল, সকাল প্রায় আটটা নটার সময়। প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি পাখিগুলোকে। একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছিল। একটা ফিঙে ডাকছিল, চমৎকার মিষ্টি ডাক, প্রায় নটা দশটার সময়।

২রা কার্তিক ঃ আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম কোকিলেরা ডেকে উঠল। তার একটু পরে—প্রায় ছটার সময়—একটা দোয়েলের শিস শুনতে পেলাম। বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেলাম কয়েকটা গোশালিককে। দোয়েলটাকে দেখা গেল না। আর একটা ছোট্ট পাখি দেখলাম—টোইট্ টোইট্ টোইট্ একরকম ডাকছে। ওই কি—দরজি পাখি। অনেক রকম পাখি দেখলাম আজ। টিয়া এক ঝাঁক, একটা বেনেবউ, কয়েকটা গেছোভরত—অমরেশবাবু এদের ইংরেজী নাম বলেছিলেন ট্রি-পিপিট, হলদে খঞ্জন একটা, চিল, বুক-সাদা মাছরাঙা; বসন্ত-বউরির ডাকও শুনলাম; স্যাকরা পাখিও (ছোট বসন্ত-বেউরি) ডাকছিল—টংক, টংক, টংক।

৩রা কার্তিক ঃ একটা ঘুঘু ঠিক আমাদের চালের উপর বসে ডাকছিল আজ ভোরে।

৪ঠা কার্তিক ঃ কোকিল, ঘুঘু।

৫ই কার্তিক ঃ তেমন কিছু দেখিনি। ঘুঘুর ডাক শোনা গেছে।

৬ই কার্তিক ঃ অমরেশবাবু যে নতুন পাখিটা চিনিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে আবার দেখলাম—রেডস্টার্ট। দেশী নাম থিরথিরা। আতাগাছে বসে ছিল।

পাতার পর পাতা লিখে গেছে গণেশ। খাতাটির শেষ পাতায় অমরেশবাবু লিখেছেন—"খুব খুশী হলাম; ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। রত্নাকে দেখাতে হবে খাতাখানা।" অমরেশবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। খাতাখানা রেখে দিয়ে আর একটা শেলফের দিকে এগিয়ে গেল ডানা। চোখে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রয়েছে। একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাই বেরিয়ে পড়ল 'কর্মযোগ'। তাতেই মগ্ন হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতটা পড়া সম্ভব ততটা পড়ে শেষকালে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়তে লাগল সে। মনে হল, তার প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে। উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহের আর একটা হেতুও ছিল। এই প্রবন্ধটা পড়বার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করাটা সহজ হবে মনে হল। উনিও আলাপের সূত্র পাবেন কিছু। 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে সন্ন্যাসীর কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল। উনি নিশ্চয় পড়েছেন এসব, ওঁর নাম কি, বাড়ি কোথা? বাধা পড়ল একটু পরে। আনন্দবাবুর চাকর একটি চিঠি নিয়ে হাজির হল। চিঠির গোড়াতেই কবিতা একটা—

'আমি আছি', 'আমি নেই' এ দুটোই সত্য,
'ছিলাম', ছিলাম না' তা-ও নয় মিথ্যে,
'থাকব না', 'থাকব' দুই-ই খাঁটি তথ্য—
সব জানি তবু হায় সুখ নেই চিত্তে।
কোথায় যে আছে সুখ কিসে যে ভরিবে বুক
তারই লাগি অহরহ হয়ে আছি উন্মুখ,
চিরে তর্কের চুল গাছে কি ফুটেছে ফুল,
প্ল্যান করে হয়েছে কি মহাসাগরের কূল,
মোদের জীবন তবে অপূর্ণ কেন রবে
দর্শন-মন্থনে সুখ কে পেয়েছে কবে!
যাহাতে ভরিবে বুক কোথায় সে চিরসুখ
যেখানেই থাক্ না সে নিত্যে অনিত্যে
তাহারই ঠিকানা চাই সুখ নেই চিত্তে।

উল্লিখিত কবিতাটি পড়ে তোমার যদি মনে হয়, আমি দর্শন-শাস্ত্রকে বিদ্রূপ করেছি, তা হলে মারাত্মক ভুল হবে তোমার। দর্শন নয়, অদর্শনই আমার ক্ষোভের কারণ। যিনি আমার আসল মনিব তিনি এসেছেন, সুতরাং আপিস কামাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাবছি, ছুটির ক্ষেত্রটাকে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়? অর্থাৎ গৃহিণীর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ করিয়ে দিই; তা হলে সমস্যার সমাধান হবে কি? এ বিষয়ে তোমার যদি অমত না থাকে, তা হলে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যদি অমত থাকে, জানিয়ে দিও সেটা। অমরেশবাবুর কাছারির অনেক পুরনো দলিলের পঙ্কোদ্ধার করেছি। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র

করছি একটা। তুমি যদি একটু সাহায্য কর, প্রয়োজনীয় কর্তব্যটা মনোরমও হয়ে উঠবে। সন্ধ্যার সময় আসবে কি না এক লাইন লিখে জানিও।

আনন্দমোহন

ডানা ভুরু কুঁচকে ভাবলে স্মিতমুখে, তারপর এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে—"যাব নিশ্চয়ই; আমি নিরামিষ খাই সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে ডানা নতুন জগতে নীত হল। সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব-স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় মেথরে, সন্ন্যাসী গৃহস্থে সম্মানের কোনো তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। কর্মই যে জগতের একমাত্র অবলম্বন—কর্মফল নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয়। সে জগতের সামান্য পক্ষী-পরিবারও তাই অতিথি-সেবার জন্য আত্মবিসর্জন করতে ইতস্তত করে না, সন্ন্যাসী হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজ্যেশ্বরী রূপসী রাজকন্যাকে। সে জগতে কর্তব্যই সব চেয়ে বড়—আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র—স্বার্থপরতা নয়। এই নতুন জগতে নীত হয়ে ডানা খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হল, সে কি আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করতে পারবে? এমন পুরুষ কি এ দেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্য যে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপনই করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? বইটা বন্ধ করে উঠে পড়ল সে। কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করলে নিজেকে। শেল্‌ফ্ গোছাতে গোছাতেও কিন্তু ওই একই কথা ভাবতে লাগল—আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপন করবার উপায় আছে কি এ যুগে? সকলেই যে যুগে স্বার্থপর, সে যুগে পরার্থপরতার অর্থ বোকামি বা পাগলামি, সে যুগে এ সব কথা ভাবাও কি সঙ্গত? কোথায় আছে সে রকম পুরুষ, যে সংসার পাতবে নিজের জন্য নয়—পরের জন্য? যদি সে রকম পুরুষ দুর্লভ হয়—হবেই—তা হলেই বা তার কর্তব্য কি? সন্ন্যাসীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি এর কি উত্তর দেবেন, শোনবার জন্য তার মন আগে থাকতেই উৎসুক হয়ে উঠল। একটু পুলকিতও হল সে। কল্পনায় সে সন্ন্যাসীর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি সুন্দরী রাজকন্যাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন, এ সন্ন্যাসীরও কি তেমনি মনের জোর আছে? বেগতিক দেখলে ইনিও কি অমনি অন্তর্ধান করবেন? করতে পারবেন? হঠাৎ তার কল্পনা বিঘ্নিত হল। চিড়িয়াখানার চাকর মুন্সী এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

"মাইজি, পাখিদের দানা ফুরিয়েছে। গোটা দশেক টাকা দিন, কিনে আনি। হরেওয়াদের জন্যে কিছু ঝাড়-জঙ্গলও আনাতে হবে। মিহিপুরার একটা বাগানে আছে পেয়েছি। আমাকে যদি এক বেলা ছুটি দেন, আমিই গিয়ে কেটে আনতে পারি, তা না হলে একটা মজুর পাঠাতে হবে—তার আবার মজুরি লাগবে।"

ডানা সহসা যেন আর এক জগতে এসে হাজির হল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে নীরবে চেয়ে রইল সে মুন্সীর দিকে। তারপর তার মনে পড়ল, হরবোলা পাখিরা লোরেনথাস্ (Loranthus) ফুল খেতে ভালবাসে। এগুলো একরকম পরগাছার ফুল, সাধারণত

আমগাছের উঁচু ডালে হয়। অমরবাবু একবার তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ল। তারপর তার মনে হল, মুন্সী যে প্রস্তাবটি এনেছে তার অন্তরালে মুন্সীর চতুর একটা মতলবও যেন লুকিয়ে আছে। যে টাকাটা সে দানা কেনবার জন্যে চাইছে তার সবটা হয়তো সে দানা কেনবার জন্যে খরচ করবে না। কিছু বাঁচাবে নিশ্চয়ই। আর যে মিহিপুরার বাগানে সে লোরেনথাস্ ফুল আনতে যাচ্ছে, সেই মিহিপুরা গ্রামেই তার শ্বশুরবাড়ি, তার যুবতী বধূ সেখানে আছে। ডানা ইচ্ছে করলে একজন গোমস্তাকে দিয়ে পাখির দানা আনিয়ে নিতে পারে, একবার হুকুম করলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। এ বাড়ির কোনও চাকরকে ফরমাশ করলে লোরেনথাস্ ফুলও অনায়াসে এসে যাবে। অমরেশবাবুর আস্তাবলে ঘোড়া নেই কিন্তু সহিস আছে, তাকে রত্নপ্রভা বরখাস্ত করেননি, পেন্‌শন দিয়েছেন। সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উৎসুকও, তাকে বললেই সে সানন্দে লোরেনথাস্ ফুলগুলি এনে দেবে। ডানা আর একবার মুন্সীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার চোখ দুটো মিটমিট করছে। মায়া হল, মনে হল, বেচারার আশা ভঙ্গ করে তার কোনো লাভ হবে না, হয়তো তার অনুচ্চারিত অভিশাপ তাঁর অনিশ্চিত জীবনকে আরও অনিশ্চিত করে তুলবে। অদেখা বধূটির প্রত্যাশা-ভরা পথ চাওয়াটাও সে যেন দেখতে পেল কল্পনায়। তার নিজের মনের ভিতরই কে একজন যেন বধূটির হয়ে সুপারিশ করতে লাগল। ডানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দশ টাকার নোট বার করলে একটি।

"পাখির দানা কিনে আন। ভাল জিনিস কিনো, আর ওজনও ঠিক ঠিক দেখে নিও। দানা কিনে নিয়ে চল তুমি চিড়িয়াখানায়। সেখানে পাখিদের খাইয়ে তার পর মিহিপুরা যেয়ো। আমিও যাচ্ছি এখুনি।"

মুন্সী সানন্দে চলে গেল।

চিড়িয়াখানায় অনেক রকম পাখি ছিল। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরকে প্রথমে দেওয়াল দিয়ে এবং পরে তার দিয়ে ঘিরে অমরেশবাবু নিজের যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন—এখনও যদিও তা সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ডানাকে হিমসিম খাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশির ভাগ পাখি পাখিওয়ালারাই দিয়েছে। মুনিয়া, তিতির, বটের, দামা, দোয়েল, হরবোলা, বুলবুলি, চাতক, শ্যামা, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ, বুনোচড়াই, গাংশালিক, পাহাড়ী ময়না, রেডস্টার্ট (কবি যার নামকরণ করেছিলেন ফুলকি), ভিংরাজ, টিয়া, চন্দনা, ফিঙে প্রভৃতি পাখিকে বড় বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে. একটা পুকুরে কিছু পানকৌড়ি এবং একজোড়া ডাহুককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হুতোম প্যাঁচাও রাখা হয়েছে খাঁচার ভিতরে, কতকগুলো ভরদ্বাজ পাখিও ছাড়া আছে ঘাসের জঙ্গলে, দরজিপাখি, টুনটুনি, সাধারণ চড়াই, ছাতারে. এ সব তো আছেই। কিছুদিন আগে রেডস্টার্টগুলোকে ডানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটা প্যাঁচা মারা গেছে, আর একটাও মরমর। এইটের জন্যেই ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ভাবছে এটাকেও ছেড়ে দেবে কি না।

মুন্সী দানা নিয়ে আসতেই ডানা জিজ্ঞেস করলে, "প্যাঁচাটা কিছু খেয়েছে?"

"একটা গোটা মাছ খেয়েছে হুজুর।"

"ভালই আছে তা হলে।"

"চোখ খোলেনি কিন্তু হুজুর। পিছু ফিরে বসে মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল, তারপর থেকে চোখ বুজে বসে আছে।"

ডানা প্যাঁচাটার খাঁচার সামনে এগিয়ে গেল। সত্যিই রোগা হয়ে গেছে বেচারা।

"কত বড় মাছ দিয়েছিলি?"

"বেশ বড় পুঁটি একটা। আধপোয়াটাক হবে।"

ডানা কেটুপা প্যাঁচার প্রধান বৈশিষ্ট্যটা আবার ভাল করে লক্ষ্য করছিল, পায়ে মোটে পালক নেই। হঠাৎ প্যাঁচাটা চোখ খুলে একবার চাইলে, বড় বড় গোল গোল চোখ দুটোর দৃষ্টি ডানার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর পিঠ ঘুরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, তোমাদের মতো পাষণ্ডদের মুখদর্শন করাও পাপ। ডানা মুচকি হেসে এগিয়ে গেল মুন্সীর দিকে। মুন্সী শ্যামা পাখিটার খাঁচায় কিছু মাংসের কিমা আর কিছু মরা ফড়িং দিচ্ছিল। ডানা কাছে আসতেই সে বললে, "এগুলো আরশোলা খুব ভালবাসে। পুরনো গুদোম ঘরটায় অনেক আছে, কিন্তু নায়েব মশাই সেখানে ঢুকতেই দেন না আমাকে। আপনি যদি একটু বলে দেন।"

"আচ্ছা, বলব। গুদোম ঘরে অনেক জিনিসপত্তর আছে কি না, তাই সে ঘরের চাবি কাউকে দিতে চান না তিনি। আমি কাল চাবি চেয়ে রাখব, তুমি আমার সামনে কিছু আরশোলা ধরে এনো।"

প্রস্তাবটা মুন্সীর খুব মনঃপূত হল না। সে গম্ভীর মুখে নীলকণ্ঠ, ভিংরাজ, দোয়েল প্রভৃতি মাংসাশী পাখিদের কিমা আর ফড়িং দিতে লাগল। হঠাৎ শ্যামা পাখিটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল আর লাফালাফি করতে লাগল খাঁচার ভিতরে।

"ওর পেট ভরেনি বোধ হয়। ওকে আর একটু কিমা দাও মুন্সী।"

মুন্সী আদেশ পালন করলে, কিন্তু মন্তব্য করলে, "ওর পেট কি ভরাতে পারবেন আপনি মা, রাক্ষস একটা! দশটা ফড়িং ওকে দিয়েছি।"

নীলকণ্ঠটাও চীৎকার শুরু করল। ভিংরাজ দোয়েলেরও আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। ডানার মনে হল, কোন বড়লোকের বাড়িতে যেন কাঙালীবিদায় হচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বটের পাখিটা বলে উঠল—ঠিক, ঠিক তো।

"আমি চললুম! তুই এদের খাইয়ে মিহিপুরায় চলে যাস। আজই ফিরবি তো?"

"নিশ্চয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।"

ডানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বন্দী পাখিগুলোর দুর্দশা অতিষ্ঠ করে তুলল তাকে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ডানা একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখলে। সন্ন্যাসী পান খাচ্ছেন কাছেই খান দুই শালপাতা দেখে সন্দেহ হল, হয়তো বাজার থেকে খাবার কিনেও খেয়েছেন। ডানাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন একটু, কোনো কথা বললেন না। কিন্তু ওই মৃদু হাসির মধ্যেই এমন একটি সূক্ষ্ম অভ্যর্থনা ছিল যা ডানার মর্ম স্পর্শ করল।

"রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব, কিন্তু সাহস পাই না। আজ জোর করে চলে এলাম। যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন বকুন আমাকে, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।"

"বকতে যাব কেন শুধু শুধু। তুমি এলে তো ভালই লাগে!"

"আপনি যে পথের পথিক সে পথে তো আমরা বাধা, নিজেই তো বলেছেন এ কথা।"

"কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পথের বাধাকে অতিক্রম করবার শৌর্য যে আমার আছে তা যাচাই করব কি করে যদি বাধা না থাকে? তাই বাধাটা অনাবশ্যক নয়, ওরও প্রয়োজন আছে। তাছাড়া যা অনিবার্য তাকে কি নিবারণ করা যায়। বাধা হিসাবে তুমি দুস্তরও নও, ভয়ঙ্করও নও।"

কথাগুলি বলে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ডানার দিকে।

"পান পেলেন কোথা? উঞ্ছবৃত্তিধারীরা পান কুড়িয়ে খায় না কি!"

"না। কিনেছি। শুধু পান নয়, কচুরি এবং রসগোল্লাও।"

"পয়সা পেলেন কোথা?"

"আমি তো নিঃস্ব নই। পোস্টাফিসে আমার টাকা আছে কিছু।"

"এখানকার পোস্টাফিসে?"

"হ্যাঁ।"

ডানা যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে উকিলের মেয়ে, তার বাবা নামজাদা উকিল ছিলেন বর্মায়, জেরা করবার সহজ শক্তি তার অন্তরের মধ্যেই ছিল সম্ভবত। সে জেরা করতে লাগল।

"এখানে এসে পোস্টাফিসে টাকা জমা করেছিলেন?"

"না। টাকা অনেক আগে থাকতেই ছিল।"

"আগে তা হলে আপনি আর একবার এসেছিলেন এখানে?"

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন হাসিমুখে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "আমার সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন তোমার?"

"বাঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জানতে চাইব না!"

"আমার পরিচয় তো জেনেছ, আমি সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের কাছে এর বেশি পরিচয় দেওয়া নিরর্থক।"

"আমি কিন্তু ঠিক সংসারী লোক নই। আপনাকে তো সব কথা বলেছিলুম একদিন! আমার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ঘটনাচক্রে আমিও সংসার থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। তাই বোধহয় আপনার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক, নারীর সান্নিধ্য আপনি পছন্দ করেন না। এসব জেনেও তবু আপনার কাছে আসি। আপনার পরিচয়ও জানতে তাই আগ্রহ হয়।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটা মাটির সরা আর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে করে বেরিয়ে এলেন আবার। ডানার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তা হলে।"

"কি ?"

"আমার পরিচয়। এককালে খুব খাইয়ে ছিলাম। কদিন থেকে রসগোল্লা, গরম কচুরি আর মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিছুতেই একাগ্র হতে পারি না ভগবৎ চিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও লোভটা এসে উঁকি মারে দুষ্টু ছেলের মতো। আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে তাই ওটাকে শান্ত করলুম আগে। কিছুদিন বিরক্ত করবে না আর।"

অকৃত্রিম সরল হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর। ডানাকে বললেন, "নাও, তুমিও খাও।"

"এখন তো আমি গিয়ে ভাত খাব। এখন খেলে দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হবে।"

"সঙ্গে নিয়ে যাও তা হলে।"

"আপনিই রেখে দিন না, বিকেলে খাবেন।"

"আমি আর খাব না! লোভকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। ওগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"আমি না এলে কি করতেন?"

"কাককে কুকুরকে খাইয়ে দিতাম। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নেই।"

"পোস্টাফিসে টাকা তো সঞ্চয় করেছেন!"

"আমি করিনি। আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন।"

কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সন্ন্যাসীর, কথার পিঠে বেরিয়ে পড়ল। জেরার মুখে আরও অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল।

"আপনার পূর্বপুরুষরা? তাঁরা এখানকার পোস্টাফিসে টাকা জমালেন কি করে?"

"তাঁরা এই অঞ্চলেই ছিলেন এককালে। আমারও ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে।"

এইবার ডানা আকাশ থেকে পড়ল!

"অমরবাবু আনন্দবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার?"

"এঁরা অনেক পরে এসেছেন। আমরা এখানে ত্রিশ বছরেরও আগে ছিলাম। আমি যখন এখান থেকে চলে যাই, তখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম।"

"আর আসেননি?"

"এসে ছিলাম একবার পোস্টাফিসের খাতাটা ঠিক করিয়ে নেবার জন্যে। চার-পাঁচদিন ছিলাম মাত্র।"

"পোস্টাফিসের খাতা আপনার নামেই ছিল?"

"আমার নামেই ছিল। এখনও আছে।"

"এখানে আপনার পূর্ব পরিচিত লোক আছেন নিশ্চয় তা হলে?"

"বেশি নেই। দু-একজন আছেন। না থাকলে টাকা বার করা যেত না। কারণ এখন যিনি পোস্টমাস্টার, তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁদের একজনকে ডেকে আনলাম গিয়ে, তারপর টাকা পেলাম।"

ডানার ভারি মজা লাগল—রসগোল্লা, লুচি আর মিঠে পান খাওয়ার জন্য ভদ্রলোক এত কাণ্ড করেছেন! লোকটির চরিত্রের আর একটি দিক দেখতে পাওয়ার পর লোকটাই যেন বদলে গেল তার চোখে। এতদিন সে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, এই অপ্রত্যাশিত নতুন আলোতে একটা পথের রেখা সে যেন দেখতে পেল। যদিও অস্পষ্ট আভাস মাত্র, তবু আশাপ্রদ।

অনুযোগ ভরা কণ্ঠে ডানা বললে, "এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনি আমাকে পর মনে করেন। আমাকে একটু যদি খবর দিতেন তা হলে আপনাকে কচুরি আর রসগোল্লার জন্যে এত কাণ্ড করতে হত না, আমি অনায়াসে সব ব্যবস্থা করে দিতাম।"

"তা দিতে, জানি। কিন্তু তোমার যুক্তিটা ঠিক হল না। পরের কাছেই অসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের লোকের কাছে সঙ্কোচ হয়! তাছাড়া তোমার কথা মনেও হয়নি। জীবন্ত কারো কাছে ভিক্ষা না করে মৃতের দ্বারস্থ হচ্ছি এর অভিনবত্বেই মশগুল হয়ে ছিলাম আমি।"

"মৃতের মানে?"

"পূর্বপুরুষদের।"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল ডানার মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে আবার বললেন,

"পূর্বপুরুষদের কাছে যে আমরা সর্বদাই ঋণী সে কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন করে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধান মানিনি, কথাটা মনেও লাগেনি খুব। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য এই আমার বিশ্বাস। পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যের দ্বারে হাত পেতে তাই ভারি আনন্দ পেয়েছি আজ।"

ডানা মুচকি হেসে বললে, "আমি আপনার মতো পণ্ডিত নই। অত চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারব না। তবে রামায়ণে পড়েছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কয়েকটি শহুরে মেয়ে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শহরে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সন্দেশ দেখে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে তিনি রাজা লোমপাদের জামাইও হয়ে গেলেন। আপনার কথা শুনে গল্পটা মনে পড়ে গেল।"

সন্ন্যাসী হেসে জবাব দিলেন, "অতটা বেকুবি আমি করব না! যাক, আমার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ওটা এখন বন্ধ থাক্। কোনও দরকারে এদিকে এসেছিলে, না, এমনি বেড়াতে এসেছ?"

"দরকার আমার একটা আছে। আগেও দু-একবার বলেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি ব্যাপারটাকে আমল দেননি। অথচ আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন!"

সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে একটা শঙ্কার ছায়াপাতও হল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে মনে করবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটি কবে কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছে এসে বিফলমনোরথ হয়েছে। কিন্তু মনে পড়ল না। তখন বললেন, "তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার দ্বারা তোমার যদি কোনও উপকার হয়, নিশ্চয় করব যথাসাধ্য। ব্যাপারটা কি?"

"আপনাকে আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি অতি সদাশয় লোক সন্দেহ নেই। আমার অনেক উপকার করেছেন, আরও হয়তো করবেন; কিন্তু যে কাজ তিনি আমাকে দিয়েছেন তা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার। কতকগুলো নিরীহ পাখিকে তিনি বন্দী করে রেখেছেন আর আমার ওপর ভার দিয়েছেন তাদের তদারক করবার। ওদের আর্ত-চিৎকার রোজ রোজ আর শুনতে পারি না। মাঝে মাঝে মরেও যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়েছি কয়েকটাকে। ইচ্ছে করে, সবগুলোকেই ছেড়ে দিই। কিন্তু ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যখন আমার চাকরি তখন সব ছেড়ে দিলে হয়তো আমার চাকরিই থাকবে না। নিজের স্বার্থের জন্য অতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছি—একথা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। তার ওপর আছেন ওই রূপচাঁদবাবু, লোকটার ধরন ধারণ মোটেই ভদ্র নয়। মোটের ওপর আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। মনে হচ্ছে, এ পরিবেশ থেকে সরে না গেলে স্বস্তি পাব না। অথচ সরে যাবই বা কি করে, হাতে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। এ অবস্থায় কি করি বলুন তো? আমাকে একটা পরামর্শ দিন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাংসারিক ব্যাপারে আমি তোমার চেয়েও আনাড়ী। অনেকদিন হল সংসার থেকে চলে এসেছি। তোমাকে সাংসারিক পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, এ পরিবেশ তোমার যদি খারাপ লাগে এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সত্যের সন্ধানে যে শক্তি আমাদের একমাত্র সম্বল,

স্বাধীনতা না থাকলে সে শক্তিও আমাদের থাকে না। সংসারে অনেকেই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, আমি পারিনি, তাই আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে। সকলের পথ অবশ্য এক নয়, কোন্ পথে গেলে তুমি সুখী হবে, তা তোমাকে ঠিক করতে হবে।"

"কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি কই?"

"তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কোন্ খাবারের স্বাদ কি রকম, তা ভাল লাগছে, না মন্দ লাগছে—এ যেমন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, আনন্দের পথও তেমনি নিজেকে বার করতে হয়, কেউ সংসারের ভিতর থেকেই তা পারে, কাউকে সংসার ছাড়তে হয়। আমাকে হয়েছে। তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক কর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধ্রুবকে পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তার পটভূমিকাতেই তো চেনা যায় তাকে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ পরিবেশ যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও চলে যাও।"

"আমার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। মুশকিল হয়েছে আমি নিঃস্ব।"

"কষ্ট করে থেকে কিছু টাকা জমাও তা হলে মাইনে থেকে। তারপর কোথাও একটা চাকরি যোগাড় করে চলে যেয়ো। এই লক্ষ্যটা ঠিক রেখে চলা ছাড়া আর অন্য কি-ই বা উপায় আছে তা তো মাথায় আসছে না আমার। অলক্ষ্য থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যরকম হয়ে যাবে কিছু একটা, তখন আবার তদনুসারে চলতে হবে। এই তো জীবন।"

সন্ন্যাসী ডানার দিকে চেয়ে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

ডানাও চুপ করে রইল। মনে হতে লাগল, সে যা বলতে এসেছিল তা বলেছে, কিন্তু তবু যেন বাকি আছে কিছু। অনেক কিছু।

।। তেরো ।।

ডানা কবির বাড়িতে যখন গিয়ে উপস্থিত হল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছেছিল—যদিও তাতে নতুনত্ব কিছু ছিল না, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে—এ কথায় চমক-লাগানো অভিনবত্ব কি-ই বা থাকতে পারে, কিন্তু তবু এই আলোচনার ঘোরটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না তার মন থেকে। ক্ষিধে পেলে খাবারটা পছন্দসই কি না তা ভাববার অবসর থাকে না অনেক সময়, যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়, ক্ষিদের মুখে অখাদ্যও ভাল লাগে, তাই সন্ন্যাসী বলছিলেন—যে-পথ সামনে সেই পথেই চল। চলতে চলতে নিজেই বুঝতে পারবে পথটা তোমার মনোমত কি না! পথই তোমাকে নতুন পথের সন্ধান দেবে, নতুন বিচারের প্রেরণা জোগাবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কবির বাড়িতে এসে হাজির হল সে। হাজির হয়েই অর্থাৎ কড়া নাড়ার আগেই মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মনের রঙটা বদলে গেল একেবারে, কল্পনা-বীণায় বেজে উঠল নতুন সুর। বকুলবালার মতো মন্দাকিনীও অপ্রত্যাশিত কিছু হবেন নাকি! হঠাৎ মনে হল, মন্দাকিনী লেখাপড়া জানেন কি? আনন্দবাবুর কবিতা পড়েন কি? সহসা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। আনন্দবাবু তাকে লক্ষ্য করে যে-সব কবিতা লিখেছেন তা যদি ওঁর নজরে পড়ে থাকে.....। কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুত ভাবে

দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে কড়া নাড়ল। কপাট কিন্তু খুলল না। কবি দোতলায় নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন, কড়া নাড়ার শব্দ তাঁর কানে গেল না। মন্দাকিনী রান্নাঘরে মৈথিল ঠাকুরটার সঙ্গে বাগযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তিনিও কিছু শুনতে পেলেন না। চাকরটা ছিল না, তাকে মন্দাকিনী বাজারে পাঠিয়েছিলেন সা-জিরে আনবার জন্যে। ডানা নিরামিষ খায় শুনে তিনি নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই ডানার সম্বন্ধে একটু সশ্রদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া-জানা বর্মী মেয়ে মাছ-মাংস খায় না—এটা যেন বাঘের গায়ে কালো-ডোরা-নেই জাতীয় আশ্চর্য খবর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া আর একটা বড় কথা, আনন্দবাবুও প্রশংসা করেছেন মেয়েটির। উনি যার-তার প্রশংসা বড় করেন না। মোষের মতো মোটা একটা মেয়ে কিছুদিন আগে ওঁর পিছু নিয়েছিল, যখন উনি প্রফেসারি করতেন। এক গাদা পদ্য নিয়ে এসে পড়ে পড়ে রোজ শোনাত ওঁকে। মুখখানা কাছিমের পিঠের মতো, তার উপর বড় বড় হলদে হলদে ফাঁক ফাঁক দাঁত, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। চুল ফাঁপিয়ে, হাত-কাটা জামা পরে, কত ঢঙ করেই যে আসত। আসতে যেতে পেন্নাম। কিন্তু তবু উনি আমোল দেননি তাকে। এলে বিরক্তই হতেন। তাঁর দূরসম্পর্কের ছোট বোন জবাও ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তাঁর সঙ্গে শালী হিসেবে, কিন্তু ওঁর গাম্ভীর্যও টলাতে পারেনি, প্রশংসাও কুড়োতে পারেনি। আড়ালে বলতেন, মেয়েটা ডেঁপো। জবা সুন্দরী ছিল, কিন্তু উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। তাঁর মতো লোক যখন বলেছেন যে—মেয়েটির রূপও আছে, গুণও আছে, তখন সে কথা মূল্যবানই মনে হয়েছিল মন্দাকিনীর। তিনি বাইরে স্বামীর যত রূঢ় সমালোচনাই করুন, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। এত বয়েস হয়েছে কিন্তু শিশুর মতো সরল, নিজের কাপড়জামাটা পর্যন্ত সামলাতে পারেন না, কখন কোথায় কোন্ কথা বললে মানাবে জানেন না, ফট করে বেমানান হয়তো বলে বসলেন একটা কিছু, এসবের জন্যে অনেক বকাঝকা, অনেক অশান্তি সৃষ্টি তিনি করেছেন, কিন্তু ওই সরলতার জন্যেই ওঁকে শ্রদ্ধাও করেন। আসল কথা, মন্দাকিনীর মনটা এসে থেকেই খুশী হয়ে আছে, সেই জন্যেই সব কিছু ভাল লাগছে তাঁর। তিনি এখন সামান্য মাস্টারের স্ত্রী নন, এত বড় জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজারের স্ত্রী, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুশির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে। মল্লিক মশায়ের বউয়ের গুমরটা যে ভেঙেছে, এতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছেন। জগু মোক্তারের স্ত্রীও পরশু ঘটা করে বেড়াতে এসেছিলেন—আগে কখনও আসতেন না, দেখা হলে কথাও কইতেন না। এখন মুখে কথার খই ফুটছে! রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন দুবার। আগে এত ঘন ঘন আসতেন না। স্বামীর আয় বাড়তেই শুধু নয়, পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে মন্দাকিনীর যেন নবজন্ম হয়েছে। স্বামীকে তিনি পাখি দেখতেও উৎসাহ দিচ্ছেন আজকাল। জমিদারের যখন পাখি দেখার বাতিক আছে, তখন পাখিদের খবরাখবর রাখলে তিনি খুশী হবেন নিশ্চয়, আর তিনি খুশী হলে চাকরির বনিয়াদ ক্রমশ পাকা হবে—এই তাঁর যুক্তি। ডানা মেয়েটিও এই পাখি-তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে শুনে ডানার প্রতি একটা আত্মীয়সুলভ মনোভাব হয়েছিল তাঁর। মহা উৎসাহে তার জন্যে রান্না করছিলেন তিনি।

তৃতীয় বার একটু জোরে কড়া নাড়ার পর ফল হল। মৈথিল ঠাকুরটি এসে কপাট খুলে দিয়ে আধা-বাংলা হিন্দীতে অভ্যর্থনা করলে, "আসেন মাইজি, ভিতরে আসেন।"

ব্যাপারটা কবিরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নেবে এলেন। মন্দাকিনীও কড়াটা নাবিয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘরে থেকে। লণ্ঠনটা তুলে ধরে ডানার মুখখানি ভাল করে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "ইনিই ডানা নাকি। একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এ যে আমার শঙ্করী গো।"

ডানার মধ্যে নিজের মেয়ে শঙ্করীকে দেখে মন্দাকিনী বিগলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। কবি কোনও কথা বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মন্দাকিনীর আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছিল একটু, মাথায় টাক পড়েছিল সামনের দিকটা, কপালে গালে কালো কালো দাগ পড়েছিল, দেহ শীর্ণ, গায়ে সেমিজ পর্যন্ত নেই; কিন্তু তবু মন্দাকিনীকে খুব ভাল লাগল ডানার। তাঁর স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হল যেন সে। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। প্রণাম করতে গেলে অনেকে যেমন মৌখিক লৌকিকতা করে 'হাঁ-হাঁ' করে ওঠেন, মন্দাকিনী সে সব কিছু করলেন না। তাঁর প্রাপ্য প্রণামটা নিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের আঙুলগুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে আলগোছে চুম্বন করলেন। তারপর আশীর্বাদ করলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে দীর্ঘজীবী হও। ডানার মনে হল, মস্ত বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেল সে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাকে এমন করে আশীর্বাদ কেউ কখনও করেনি। তার দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল যেন।

"রান্নার এখনও একটু দেরি আছে। তোমরা ওপরে বসে ততক্ষণ লেখাপড়া কর। ঠাকুর তুমি বেরিয়ে দেখ একটু, হরিয়া মুখপোড়া দু-আনার সা-জিরে আনতে গিয়ে যুগ কাবার করে দিলে। ঠিক মোড়ে বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মুখপোড়া।"

ডানাকে নিয়ে কবি উপরে উঠে গেলেন।

"আমার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। তুমি ততক্ষণ আমার কবিতার খাতাটা ওলটাও। শেষের দিকে দেখ, কয়েকটা নতুন কবিতা লিখেছি।"

ডানা খাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটি নতুন কবিতা চোখে পড়ল।

টিয়া

ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ
ঠোঁটটি তা হলে তোর মোচা,
কিন্তু যে কবি তোকে কলাগাছ বলবে
সে কবি নিতান্তই ওঁছা!

তুই কিরে সবুজের জয়-গান
তাই কি কোরাস্ ধরে যত বন-ময়দান
যোগ দিয়ে পান্নার সঙ্গে
এসে কি মিশল তোর অঙ্গে!

সবুজ হতে না পেরে চুনীটা
হল বাঁকা টুকটুকে ঠোঁট কি
চুনীতে তৈরি ওটা আবীরের মটকি:

সে আবীর কারো কারো কণ্ঠেও লেগেছে
কারো কারো ডানাতে
এ কথা রটেছে-রূপখানাতে।

সেখানের রূপসীরা তাই নাকি ঠোঁটে গালে চরণে
আলতা মাখায় নানা ধরনে!
রসিকেরা হেসে হয় সারা
টিয়ার নকল করা—এ কেমন ধারা!

ছাতারে

দিন গেল, মাস গেল, কাটিল বছর
তবু তোর থামিল না কচর-বচর
রে ছাতারে পাখি,
বল্ তোর ভাষণের আর কত বাকি!
কান প্রাণ গেল যে ছাপিয়ে
আর কত বকবি রে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ফুৎকি

ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না?
একটু থামবি না?
ডালে ডালে চিরকাল ছটফট করবি
সারাদিন ক্রমাগত কত পোকা ধরবি?
একটু নাম্ না ভাই
একটু থাম্ না ভাই!
দূরবীনে দে না ধরা ক্ষণিকের জন্য,
চট্ করে দেখে নি
কবিতায় এঁকে নি,
কোন্ গুণে হয়েছিস এতটা অনন্য!

ফটিক জল

ফটিক জল পাখিটির দেখা পেলাম সকালে
দেখা দিয়েই ঠকালে,
ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গিয়ে লুকোল
অমনি আমার কাব্য-মুকুল শুকোল,
কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ উঠল ফুটে হর্ষিত
'ফটি—ক জল' গহন থেকে হল যখন বর্ষিত।

ফিঙ্গক-শারিকা-কাব্য

আমড়াগাছের শুকনো ডালে একটি ফিঙে এবং একটি শালিক পাশাপাশি বসে ছিল। কেন জানি না, মনে হল শালিক টি স্ত্রী-শালিক এবং ফিঙেটি পুরুষ-ফিঙে। এ অবস্থায় মানব-কবির মনে যে ভাব আসা স্বাভাবিক তাই এসেছিল। কিন্তু শেষে অপ্রস্তুত হতে হল।

ওহে ফিঙে চৌধুরী
করেছ কার বউ চুরি?
শালিকপ্রিয়া তোমার পাশে
আছেন বসে কিসের আশে!
মিল হবে কি শালিক-ফিঙে কূজনে?
করছ নাকি কেলেঙ্কারি
বাঙালী আর তেলেঙ্গারি
গাঁথছ নাকি মিলন-মালা দুজনে!
খাসা কাব্য ফেঁদেছিলাম
ছন্দটি বেশ গেঁথেছিলাম
এমন সময় ফিঙা গেল উড়িয়া
শালিক পাখি নির্বিকার
দেখলে নাকো ফিরেও আর
রইল একা আমড়া-শাখা জুড়িয়া।
তার পরেতে একটু পরে
উড়ল সেও 'পিড়িং' করে
দিব্যজ্ঞান হইল পরকীয়ার কি।
বসল শিরীষ গাছে গিয়ে
তার পরেতে ঘাড় ফুলিয়ে
ঝাঁকিয়ে মাথা বললে এ কি ইয়ার্কি!
মনে রেখো শালিক মোরা
এবং মোর সেকেলে,
মানুষ নই, মানুষ নই
এবং নই একেলে।

শিকারী পাখি

অলঙ্কৃত কর তুমি আকাশের নীল
বহু নামে। কভু তিস্‌সা, কভু চিল,
কখনও কোড়ল; ঈগলের রূপ ধরি
কভু দৃপ্ত পক্ষীরাজ। শিক্‌রে কুররী
কভু; কখনও আবার সাপমার হয়ে
ধ্বংস করি সর্পকুল বেড়াও নির্ভয়ে।

পানডোবা-মাঠচিল-রূপে পুন দেখি
ক্ষিপ্র বেগে শত্রুমাঝে ঝম্প দিয়া, একি
অসঙ্কোচে অনুসরি বেদুঈন-রীতি
সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রান্তে ঝুলায়ে ঝটিতি
রক্তাক্ত শিকারটিরে, হও নিরুদ্দেশ।
কভু দেখি ধরিয়াছ অপরূপ বেশ
পাংশু মাথা লাল ডানা; কভু লাল শির
ডানায় নীলাভ পাংশু তন্বী তুরমতীর।
মাঝে মাঝে মনে হয় ঋষি দুর্বাসার
তুমিই কি পক্ষীরূপ? অথবা দুর্বার
চেঙ্গিস নাদির কোন ধর পক্ষীসাজ।
পক্ষীজগতের বজ্র, হে বিহঙ্গ বাজ,
কহ, কহ, সমুদ্যত-নখ-চঞ্চুবান,
রুদ্রবীণে তুমিই কি সারঙের তান?

কাজল গৌরী

ও রূপসী বণিক বধূ
মাথা তোমার করছে ধূ-ধূ
হঠাৎ কেন করলে এমন ক্ষৌরী,
হলদে পাখি বললে হেসে
দিলেম দেখা নূতন বেশে
নামটি আমার এখন কাজল গৌরী।
বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম
কালার দেখা পেয়েছিলাম
মাথার কালো হারিয়ে গেল সেই কালোয়,
তাহার ধটির পীতবরণ
হলদে রঙও করবে হরণ
থাকব কি আর তখন আমি এই আলোয়?
শুনি এই নিদারুণ বাণী
আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িলাম জীর্ণ গীতাখানি।

ডানা

পাখির ডানা আছে, তুমিও ডানা
আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
মনে মনে তারই দরশ মাগো

যাহার বাজারেতে অনেক দাম
স্বর্ণ-পিঞ্জর যাহার নাম
হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর,
সবাই চেনা-শোনা নাইক পর
তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি পড়ে ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কবির দিকে চেয়ে দেখলে একবার। কবি নিবিষ্টচিত্তে কি লিখে যাচ্ছিলেন, ফিরে চাইলেন না। ডানা তবু চেয়েই রইল, তার মনে যে প্রতিবাদটা জেগে উঠেছিল, সে ভাবছিল, সত্যিই কি সেটা অন্তরের কথা তার? অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে ডানা কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারল না। পৌঁছবার আগেই কবি বাধা দিলেন।

"একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। নিখিল বদলি হয়ে গেল এখান থেকে। তার জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিস্টার বোস। তিনি নাকি চেনে তোমাকে। আসবেন তোমার কাছে একদিন।"

"মিস্টার বোস?"

"হ্যাঁ, ভাস্কর বোস্।"

ডানা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

।। চোদ্দো ।।

যে ভাস্কর বসুর সঙ্গে রেঙ্গুনে আলাপ ছিল, যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সেই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে! কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হল না ডানার। কিন্তু আর কোনও ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার তো আলাপ নেই! তা হলে....। আশা-আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার। বিয়ে করেছে কি ভাস্কর? যদি করে থাকে, যদি না করে থাকে—উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যেই সে নিমেষে প্রস্তুত করে নিলে নিজেকে। যেন পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। বাইরে কিন্তু কোনও বিচলিত ভাব দেখা গেল না তার। কবি ঝুঁকে কি একটা কাগজ দেখছিলেন, ডানা তাঁর দিকে শান্তমুখেই চেয়ে রইল। তার পর প্রশ্ন করল, "ভাস্কর বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে নাকি?"

কবি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, "না। শুনছি লোকটা ট্যাসমার্কা। আলাপ হবেই একদিন। ব্যস্ত কি! যেচে আলাপ করতে যাব কেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে চেয়েই রইলেন খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে। তার পর বললেন, "একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছি পুরনো কাগজপত্র থেকে। অমরবাবুও বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।"

"কি?"

"তুমি যে বাড়িটাতে আছ আর ওই সন্ন্যাসী যে পোড়ো বাড়িটাতে আছেন—ওই বাড়ি দুটো আর ওর সংলগ্ন বিশ বিঘে জমি অমরবাবুর নয়। ওটা সহায়রাম ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের। সমস্ত জমিদারিটাই এককালে তাঁর ছিল। রত্না দেবীর বাবা তাঁর কাছ থেকে জমিদারিটা কেনেন। গঙ্গার ধারের ওই বাড়ি দুটো আর ওই বিশ বিঘে জমি তিনি বিক্রি করেননি, আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল বোধ হয়, এসে বাস করবেন। কিন্তু আর আসেননি। ওটা ক্রমশ অমরবাবুর সম্পত্তি বলে গণ্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো।"

ডানার মনে পড়ল, সন্ন্যাসী বলছিলেন যে ছেলেবেলায় তিনি এখানে ছিলেন। সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই তো? তাঁর বাবা এখানকার পোস্ট-অফিসে টাকা জমিয়ে গেছেন। চকিতের মধ্যে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কথা বিদ্যুৎ-চমকের মতো খেলে গেল তার মনে। কিন্তু কোনো কথা বললে না সে। শান্তমুখে বসে রইল চুপ করে। মনে মনে ঠিক করে ফেললে, পোস্ট-অফিসে যখন পাসবুক আছে তখন সন্ন্যাসীর সব খবর সে বার করতে পারবে। যদি পারে, তখন....চিন্তা আর এগোল না। তখন কি করবে সে? বিশেষ কিছুই তো করবার নেই! বিশেষ কিছু করবার নেই, এই কথাটা মনে হওয়াতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে। ওই উদাসীন লোকটা আজ এখানে আছে, কাল আবার অন্যত্র চলে যাবে, কোনো ঘটনাই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোথাও।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন।

"আমার সব রান্না হয়ে গেছে। এইবার রূপচাঁদবাবু এলেই তোমরা খেতে বসতে পার। আমি তোমার জন্যে নিরামিষ রান্না করেছি, রূপচাঁদবাবু নিজেই নিজের জন্যে মাংস রান্না করে আনবেন। আমি আর আঁশের হাঙ্গামাই করিনি এ বেলা। উনি এখানে কাজ করছেন, চল তুমি ও-ঘরে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে বক বক করলে উনি রাগ করবেন এখুনি আবার। রাগটি তো কথায় কথায় কিনা। লেখাপড়ার সময় টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।"

কবি কোনো কথা না বলে গৃহিণীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু ক্ষণকাল। তারপর আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। রূপচাঁদবাবু আসবেন শুনে ডানা মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু তার বাইরের শান্তভাব ব্যাহত হল না তাতে। মন্দাকিনীর কথা শুনে হাসিমুখে সে উঠে দাঁড়াল।

কবি তার দিকে চেয়ে বললেন, "আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি আজ সকালে। সেটা ও-খাতায় নেই। অন্য আর একটা খাতায় আছে। পরে দেখাব। খাওয়া-দাওয়ার পর।"

মন্দাকিনী ঠোঁট উলটে বললেন, "আমি মুখ্যু মানুষ। ও-সবের কিছু বুঝি না। তোমার ভাল লাগে বুঝি?"

ডানা হেসে বললে, "লাগে একটু একটু।"

"তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, কত পরীক্ষা পাস করেছ, তোমার তো লাগবেই। চল ও ঘরে।"

পাশের ঘরে গিয়ে ডানা বললে, "পরীক্ষা পাস করলেই বা, আপনার সংসারের বিষয়ে যত জ্ঞান যত বুদ্ধি আছে তার সিকির সিকিও আমার নেই। আমি কতকগুলো বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করেছি মাত্র।"

মন্দাকিনী মনে মনে খুশী হলেন। তাই একটু ঝাঁকের সঙ্গে বললেন, "তাই বা কটা মেয়ে পারে! কটা ছেলেই বা পারে। আমার খোকা তো এবার প্রমোশনই পেল না। কেবল ঘুড়ি, ঘুড়ি আর ঘুড়ি।"

বিছানায় দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

মন্দাকিনী বললেন, "তোমাকে দেখে আমার শঙ্করীকে মনে পড়ছে। তোমার চিবুকের দিকের গড়নটা ঠিক শঙ্করীরই মতো। তার চোখ অবশ্য তোমার চোখের মতো ভাসা ভাসা নয়, ধরন-ধারণ কিন্তু তোমারই মতো। মুচকি মুচকি হাসে, বেশি কথা বলে না। অনেক দিন চিঠি পাইনি মেয়েটার। তার কোলের মেয়েটা কেমন আছে কে জানে।"

এইভাবে আলাপ শুরু করে মন্দাকিনী নিজের জগতে নিয়ে গেলেন ডানাকে, যে জগতে মলোটভ বা নেহরুর চেয়ে সুন্দরী গাই বড়, বেকার-সমস্যার চেয়ে বড়ি-সমস্যার প্রাধান্য বেশি। কথায় কথায় তাঁর ভাইয়ের বিয়ের কথাও উঠে পড়ল; বিয়েতে কতরকম বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কত জিনিস নষ্ট হয়েছিল (আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত গামলা গামলা সন্দেশ রসগোল্লা চুরি করেছিল—নীচু গলায় বললেন খবরটা), পাত্রীপক্ষ অলঙ্কারে, বরাভরণে কি রকম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছিল, এমন খেলো চেলী দিয়েছিল যে রঙ উঠে যাচ্ছিল, আংটিটা পেতলানি, দানের বাসন কংকঙে, নগদ টাকা তো দেয়ইনি—যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তারা। তবে মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া ঘরের কাজকর্মও ভাল জানে। চমৎকার মোরব্বা তৈরি করেছিল। আচারও নাকি চমৎকার করে শুনলাম। আচার-প্রসঙ্গ এসে পড়াতে মন্দাকিনীর ক্ষোভ উথলে উঠল। ঠিক সময় কুল কেনা হয়নি বলে তিনি কুলের আচার করতে পারেননি। উনি (আনন্দবাবু) যদি একটু হুঁশ করে কিনে রাখতেন তা হলে হত, কিন্তু ওঁকে বিধি যে কি দিয়ে নির্মাণ করেছেন তা তিনিই জানেন। এ অঞ্চলে কুল একটু দেরিতে পাকে, কুল পাকবার আগেই তাঁকে ভায়ের বিয়ের জন্যে চলে যেতে হল, কুল কেনা হল না। এবার আমের কাসুন্দি করবার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ মন্দাকিনী ডানার ব্লাউসের হাতাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছুঁচের কাজ তুমি নিজে করেছ?"

ডানা লজ্জিত হয়ে বলল, "আমিই করেছি। কিন্তু ভাল হয়নি, আমি ভাল জানি না।"

"কেন, বেশ চমৎকার হয়েছে তো। আমি এসব কিছুই পারি না। কাঁথা সেলাই করতে দাও, পারব। পাড় জুড়ে জুড়ে পরদা বা বিছানার চাদর করতে দাও, পারব। কিন্তু ছুঁচ দিয়ে ফুল পাখি লতাপাতা আঁকা—এ আমার দ্বারা হয় না। কেউ তো শেখায়নি ছেলেবেলায়। শঙ্করীটা পারে। এক মাস্টারনী শিখিয়েছিল ওকে।"

ডানা চিত্রার্পিতবৎ বসে বসে শুনে যাচ্ছিল। যে জগতে সে মানুষ হয়েছে সে জগতেও গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহলক্ষ্মীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আলাদা জাতের। বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগে তাঁদের স্বভাবটা একটু যেন দো-আঁশলাগোছের হয়ে গিয়েছিল। চাকরকে 'বোয়' বলে ডাকতেন, বাইরের কেউ এলে চট করে তার সামনে বেরুতে পারতেন না। দু সেকেন্ডের জন্যেও অন্তত আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সামনে বার হওয়া অসম্ভব ছিল

তাঁদের পক্ষে। যখন বার হতেন তখন মুখে ঝুলত একটা মেকি হাসি। মন্দাকিনীর মতো এ রকম বেশে বাইরের কারো সামনে বসে গল্প করার কল্পনাও করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের গল্পও পোশাকী গল্প, খবরের কাগজের খবর, আবহাওয়া, বড় জোর মার্কেট-সংক্রান্ত দু-চারটে কথা। অন্তরের কথা নয়। তাঁরা যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তাঁদেরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের, মন্দাকিনীর মতো নয়। শুধু যে তাঁরা টেবিলে খেতেন বা ইংরেজী বকুনি দিয়ে কথা বলতেন বলেই স্বতন্ত্র জাতের তা নয়, তাঁদের মন এবং চরিত্রের গড়নই ছিল অন্য রকম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়াতে মজা লাগল একটু। মনে পড়ল, বিপদে পড়লে এই স্বতন্ত্র সংস্কারে গঠিত চরিত্র বা মন এক নিমেষে বদলে যেতেও সে দেখেছে। জাপানীরা যখন বর্মায় বোমা ফেলল তখন তাদের এক সাহেবী-মেজাজের প্রতিবেশী মিস্টার বিশওয়াস্ বদলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে দাড়িওলা গলায়-রুদ্রাক্ষের মালা এক বেঁটে কালো-গোছের লোক ছিলেন। তিনি বিশওয়াস্-পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন কয়েক দিনের মধ্যে। বহু লোক একসঙ্গে পালাচ্ছিল। কয়েক দিন মিস্টার বিশওয়াস্দের খবর পাওয়া যায়নি ভিড়ের মধ্যে। সবাই তখন নিজের নিজের সামলাতে ব্যস্ত। দিন দশেক পরে হঠাৎ তাঁদের দেখা গেল একেবারে ভিন্ন চেহারায়। মিস্টার বিশওয়াস্ হঠাৎ ভোল বদলে একেবারে বিশ্বেস মশাই হয়ে গেছেন। মাথা কামিয়ে টিকি রেখেছেন, গায়ে নামাবলী। মিসেস বিশ্বাসের ঠোঁটে রুজ নেই, কপালে তিলক। তিনি নিষ্ঠাভরে নিজেকে বিপত্তারিণী-ব্রতে নিযুক্ত করেছেন।

মন্দকিনী বক্ বক্ করে বকেই চলেছিলেন। ডানা যে তাঁর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না সে খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি যেন তাঁর শঙ্করীকে পেয়ে তার কাছেই বহুদিনকার সঞ্চিত সংবাদ সব বলে যাচ্ছিলেন অসঙ্কোচে। পাশের ঘরে রূপচাঁদের গলা পেয়ে তাঁর একটু হুঁশ হল, মাথার কাপড়টা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

"রূপচাঁদবাবু এসে গেছেন। এবার খাবার ঠিক করি তোমাদের। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে তো?"

"আছে।"

"তা হলে পাশের ঘরেই বসবে চল।"

বলা বাহুল্য, রূপচাঁদবাবুর সামনে ডানার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তবু বেশ সপ্রতিভভাবেই পাশের ঘরে গেল।

ডানাকে দেখে রূপচাঁদবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন।

"এ কি, তুমি এখানে? আমি তোমার বাড়ি হয়ে ঘুরে এলাম।"

"কেন, কোনও দরকার ছিল?"

"একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে হঠাৎ এখান থেকে বদলি করে দিয়েছে। খবর পেলাম, মিসেস সেনগুপ্তের ইঙ্গিতেই এটা নাকি হয়েছে। পুলিশ সায়েব তাঁর নাকি চেনা লোক। মল্লিককেও তিনি বিপন্ন করেছিলেন। আনন্দমোহনের দয়াতে সে বেচারা ছাড়া পেয়েছে। মল্লিকের না হয় কিছু দোষ ছিল, কিন্তু আমাকে কি অপরাধে বদলি করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না। তাই তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, তুমি কিছু জান কি না! তুমি রত্নপ্রভা দেবীর পেয়ারের লোক— হয়তো জানতেও পার।"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার বদলির খবর আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ডানার মনে হল, তার দু গালে কে যেন দুটো ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। আনতচক্ষে বসে রইল সে।

"যাক, এ ব্যাপারটা শেষ হল মোটামুটি এখন।"

কবি সশব্দে মোটা খাতাখানা বন্ধ করে দিলেন।

"কি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে তুমি? কবিতা লিখছিলে, না, আর কিছু?" —রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"কিছুক্ষণ আগে কবিতা লিখেছি একটা। কিন্তু এই খাতাটায় সমস্ত প্রজাদের একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী ও তাদের পরিচয় লিখে ফেললাম। আচ্ছা, সহায়রাম ভট্টাচার্যকে চেন তুমি, নাম শুনেছ কখনও তাঁর?"

"না কোথাকার লোক?"

"এককালে তিনিই এই জমিদারির মালিক ছিলেন। রত্নপ্রভা দেবীর বাবা, মানে—অমরবাববুর শ্বশুর তাঁর কাছ থেকেই জমিদারিটা কেনেন। কিন্তু নদীর ধারের বিশ বিঘে জমি আর দুখানা বাড়ি তিনি বিক্রি করেননি। একটা বাড়িতে ডানা থাকে, আর একটাতে ওই সন্ন্যাসী থাকেন।"

এ নিয়ে আরও আলোচনা চলত, কিন্তু মন্দাকিনী এসে বললেন, "লুচি ভাজছি, তোমরা বসবে চল।"

রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত নেই? মাংসে একটু বেশি ঝোল থেকে গেছে। চারটি গরম ভাত পেলে ভাল হত।"

"ভাত আছে বইকি।"

"তবে চলুন।"

ডানা খেতে বসে অবাক হয়ে গেল। মন্দাকিনী এক হাতে দশ রকম নিরামিষ তরকারি, দু রকম ডাল, পায়েস, এমন কি পিঠে পর্যন্ত করেছেন। এত রকম এবং এমন সুস্বাদু নিরামিষ তরকারি সে জীবনে আর কখনও খায়নি। খেতে খেতে রূপচাঁদের বদলি নিয়েই আলোচনা হতে লাগল। পূর্ণিয়ায় বদলি করেছে তাঁকে। জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর, গেলেই নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ডানা এ আলাপে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হবার পর রূপচাঁদ ডানার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? যাও তো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।"

"আমি একটু পরে যাব। আপনি যান।"

রূপচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর চলে গেলেন।

সকলের খাওয়ার পর মন্দাকিনী খেতে বসলেন। ডানা তার কাছে বসল গিয়ে।

"এ কি, আপনি আর কিছু খাবেন না?"

মন্দাকিনী দুখানি রুটি, একটু তরকারি আর গুড় নিয়েছিলেন।

"রাত্রে বেশি খেলে হজম হয় না। ভাত লুচি কিচ্ছু না। দুখানি শুকনো রুটি খাই, তাও রাত্রে দুবার উঠে জল খেতে হয়।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরের এক ধারেই খেতে বসেছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ডানা ভদ্রতা

রক্ষা করবার জন্যেই একটা আসন নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসে আছে। বসবার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বসে নেই সে। অসুবিধা হচ্ছে।

"তুমি ওপরে ওঁর কাছে গিয়ে বস না। আমার কাছে আর বসতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েও গেল।"

একটি ছোট ঘটি বাঁ হাতে তুলে আলগোছে জল খেয়ে আহার শেষ করলেন তিনি।

"তুমি ওপরে যাও। আমার সারতে-সুরতে এখনও ঢের দেরি।"

"আমি তবে চলেই যাই। আর একদিন আসব।"

ডানা কবির সঙ্গে যখন ওপরে দেখা করতে গেল, তখন তিনি লিখছিলেন। ডানাকে দেখে বললেন, "এ কবিতাটা নিয়ে যাও, বাড়ি গিয়ে পড়ো। এখানে পড়বার নয় ওটা।"—বলে তিনি মুচকি হাসলেন।

"এখনই লিখলেন নাকি?"

"না। আগেই লিখেছি। টুকে দিলাম এখন। অনেকদিন পরে এ ধরনের কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল, শুনলে হয়তো তোমার ভালই লাগবে।"

"কি কথা?"

"এ ধরনের কবিতা আর লিখব না।"

"কেন?

"লিখতে পারব না। যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে।"

কবি স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তার পর বললেন, "কিন্তু সেই জোয়ারের মুখে নৌকো ভাসিয়ে যে অমরাবতীতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। যদি হাতে কোনোদিন পয়সা হয়, কবিতাগুলো ছাপাব, আর তুমি যদি আপত্তি না কর, তোমাকে উৎসর্গ করব সেগুলো।"

এর উত্তরে ডানা কিছু না বলে একটু মুচকি হেসে চলে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা কথা তার মনে হল। যে রকম যোগাযোগ ঘটছে, তাতে তার জীবনে নবপর্বের সূচনা হবে বোধ হয়। এখানে যে লোকটি দুষ্টগ্রহের মতো তার জীবনের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তিনি অস্ত যাচ্ছেন। রূপচাঁদের বদলির খবরটা পেয়ে তার মনের একটা অংশ খুশীই হয়েছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও এ কথা সে না মেনে পারছিল না যে, ওই লোকটিই তার নারীসত্তাকে এমন একটি মূল্য দিয়েছিল যা আর কারও দেবার সাহস হয়নি, এবং যে মূল্য পেয়ে সে গর্বই অনুভব করেছিল মনে মনে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি সে নানা কারণে, কিন্তু তার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত আকুলতাকে সে সত্যি সত্যি ঘৃণা করেনি কখনও। ভয় পেয়েছে, ঘৃণা করেনি। রূপচাঁদবাবু আর তার জীবনে ছায়াপাত করবেন না—এই সম্ভাবনাতে তাই সে একটু বেদনাও বোধ করল যেন। বেদনাটা আরও বাড়ল কবির কথা ভেবে। তাকে দেখে তাঁর মনে যেন জোয়ার এসেছিল তা নেবে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আর তিনি কবিতা লিখবেন না—এ সংবাদটা স্বস্তিকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না। মনে হতে লাগল, তার জীবন থেকে কি যে একটা হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। পর-মুহূর্তেই মনে হল, ভাস্কর এসেছে। মনে পড়ল তার কথা—'তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর কাউকে বিয়ে করব না।' অপেক্ষা করে আছে কি? হঠাৎ তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল খবরটা জানবার জন্যে।

"মাসীমা—"

"কে?"

"আমি চণ্ডী। কলকাতা থেকে একটা লোক চমৎকার একটা হলদে পাখি নিয়ে এসেছে। অমরবাবুর স্ত্রী পাঠিয়েছেন। বকুল-মাসীমাকে তিনি একটা পাখি পাঠাবেন বলে গিয়েছিলেন। হয়তো এইটে সেই পাখি! তাই আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

"ও! আচ্ছা, চল দেখি।"

সত্যিই রত্নপ্রভা বকুলবালার জন্য চমৎকার একটা হলদে পাখি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিও একটা লিখেছিলেন—

ডানা,

শ্রীমতী বকুলের জন্যে হলদে পাখি পাঠালাম একটা। এই বছরেরই বাচ্চা। তাঁকে পাখিটা পাঠিয়ে দিও। তোমার সমস্যার, আশাকরি, সমাধান হয়ে গেছে। অনিলের (মিস্টার গুপ্ত) চিঠি পেয়েছে। আমরা এবার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব। কালই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। আশাকরি, তোমরা সব কুশলে আছ। পাখিগুলোর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই রইল। ওদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে কর করো। যদি ইচ্ছে কর, ছেড়ে দিতেও পার। ওঁর এখন চিড়িয়াখানা করার দিকে তত ঝোঁক নেই। ঝোঁক হয়েছে বিদেশে গিয়ে (ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ও-দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে) বিদেশী পাখিদের পরিচয় লাভ করা। টাকার যোগাড় যদি হয় চলে যেতে পারি। সুতরাং তুমিই ওই পক্ষীনিবাসের সর্বেশ্বরী হয়ে থাক। ওখানকার জমিদারির আয় থেকেই তোমাদের খরচ চলে যাবে। আমরা ওখান থেকে আপাতত কিছু নেব না ঠিক করেছি। আনন্দমোহনবাবুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি স্নেহ-আশীর্বাদ নিও। ইতি—

রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত,

ডানা যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল চণ্ডী সোৎসুকে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে। পড়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করলে, "আমাদেরই পাখি, নয়?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমার চাকরটাই গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি চিঠিও লিখে দিচ্ছি একটা। দাঁড়াও একটু।"

চিঠিটা রূপচাঁদবাবুরও হাতে পড়বে এই সম্ভাবনাটা মনে হল তার। তাই অতি সংযত ভাষায় ছোট চিঠি লিখলে একটা—

শ্রীমতী বকুলবালা,

আপনার জন্যে রত্নপ্রভা দেবী কলকাতা থেকে একটা হলদে পাখি উপহার পাঠিয়েছেন। পাঠালাম এই সঙ্গে। শুনলাম, আপনারা বদলি হয়ে গেছেন। যাব একদিন আপনাদের বাড়িতে। নমস্কার জানবেন। ইতি—

ডানা

পাখি নিয়ে ওরা যখন চলে গেল, তখন চুপ করে বসে রইল সে বারান্দায় একা। মনে হল, সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। চোখে পড়ল, কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে বটগাছের মাথার উপরে। একটা উপমা মনে এল, সংস্কৃত কাব্যের উপমা, বটগাছটা যেন ধূর্জটির জটাজাল,

সেই জটাজালে সুশোভিত হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্র। চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—পাপিয়াটা ডেকে উঠল দূরের গাছ থেকে। তার আকুল স্বরে ডানার মনের আকুলতাই ফুটে উঠল যেন। আরও খানিকটা চুপ করে বসে রইল। তারপর ঘরে ঢুকে শোবার আয়জন করতে লাগল, ব্লাউসটা খুলতে গিয়েই কবিতাটা বেরিয়ে পড়ল। সে কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। আলোটা কমানো ছিল টেবিলের উপর। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু জুৎ করে বসে কবিতাটা পড়তে লাগল—

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে
একা চলেছিলে তুমি।
কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, আমিও না,
তুমি নিজেও ছিলে না নিজের কাছে!
আমি যে সুদূর লোক থেকে দেখেছিলাম তোমাকে
হয়তো তারই উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিলে,
কিন্তু নিজেই তা জানতে না।।
মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত মাঠের আর্ত কামনা মূর্ত হয়েছে,
তোমার চলাটা মনে হচ্ছিল প্রবাহ।।
স্বচ্ছতোয়া তন্বী তটিনীর উপর নেমেছে নব জলধর,
এক জোড়া খঞ্জন উড়ছে,
নীল শাড়িতে ফুটেছে আকাশের মহিমা,
চলার বেগে অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্য।।
রুক্ষ মাঠের তৃষ্ণার্ত কামনা যে ছবি সেদিন এঁকেছিল,
জানি তুমি তা নও,
কখনও হবে না তা-ও-জানি।।
কিন্তু সত্যি তুমি যা
তা নিয়ে স্বপ্নের ছবি আঁকা যায় না।
তোমার ভঙ্গুরতা তোমার ক্ষণিকের সত্যকে,
যে রূপে তুমি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছ তাকে,
চুরমার করে দেবে একদিন।
বেঁচে থাকবে শুধু এই স্বপ্নটুকু।
অলীক রঙে আঁকা এই ছবিটি, যা তুমি নও,
যা তুমি হবে না।।

ডানা কবিতাটা ভ্রূকুঞ্চিত করে বার দুই পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল একটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থেকে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে কবিকে নয়, ভাস্কর বসুকে।

।। পনেরো ।।

পরদিনই ভাস্কর বসুর সঙ্গে দেখা হল ডানার। ভাস্কর বসু নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি যখন আসছিলেন তখন ডানা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারেনি। যে লোক সিগারেটটি পর্যন্ত খেত না, তার মুখে যে অত বড় পাইপ ঝুলবে তা প্রত্যাশা করতে পারেনি সে। পরনে খাকী রঙের হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, হাতে ছোট একটা বেত, চোখে গাঢ় কালো রঙের গগল্‌স্‌। ডানা বারান্দায় বসে চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতে একবার চোখ তুলে দেখতে পেয়েছিল তাকে। দেখে বিরক্তই হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কোনও বেকার ছোকরা বোধ হয় আসছে তাকে বিরক্ত করতে। অনেকে আজকাল আসে অমরবাবুর 'পক্ষী-নিবাস'টা দেখতে। অসংলগ্ন অবান্তর প্রশ্ন করে নানারকম। প্রশ্ন শুনলেই মনে হয় পাখির সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই, কেবল খানিকটা সময় কাটাতে এসেছে।

"চিনতে পারছ আমাকে?"

গগল্‌স্‌ খুলে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর বসু। বজ্র পড়ে ডানার স্বপ্নসৌধ যেন চুরমার হয়ে গেল। এই সেই ভাস্কর? এত পরিবর্তন হয়েছে! চোখের কোলে কালি, রঙও ময়লা হয়ে গেছে, কেবল চোখের দৃষ্টিটাই উজ্জ্বল আছে তেমনি। আরও উজ্জ্বল হয়েছে বোধ হয়। ডানা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল।

"ভাস্কর! এস এস! তুমি এমন ভাবে আসবে তা প্রত্যাশা করিনি। কাল আনন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, ভাস্কর বসু নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এখানে, তখন—"

"আমি এসেই তোমার খবর পেলাম এস. পি. মিস্টার গুপ্তের কাছে। 'মিস্‌ ডানা' শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তার পর তিনি যখন বার্মা রেফিউজি বললেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। শুনলাম, এখানে তুমি কোন পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী হয়েছ? ব্যাপারটা কি? পোল্‌ট্রি?"

"না। চাকরি। এখানকার জমিদার অমরেশবাবু একজন পক্ষীতত্ত্ববিদ। তিনি অনেক রকম পাখি ধরে রেখেছেন এখানে। তারই তত্ত্বাবধান করি আমি।"

"আই সি। কতদিন আছ?"

"ছ মাস হয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষে এসেছিলাম।"

"একাই আছ? মিস্টার গুপ্ত তাই বললেন যেন।"

ভাস্কর বসু উঠে এসে আরাম-কেদারাটায় বসে পাইপে টান দিয়েই বুঝলেন, পাইপ নিবে গেছে। নিবিষ্ট মনে সেইটেই ধরাতে লাগলেন।

"একাই আছি।"

"আর সবাই কোথা?"

"মারা গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তুমি শোননি?"

"বাই জোভ, বল কি! না কিচ্ছু শুনিনি তো! আমি অনেক দিন এ দেশে ছিলাম না।"

ভাস্কর বসু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারের উপর। ডানা চুপ করে রইল।

তারপর সব বলতে লাগল। তার নূতন জীবনের মাঝখানে পুরাতন জীবনটা হঠাৎ এসে হাজির হল যেন খানিকক্ষণের জন্য।

।। ষোলো ।।

দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদে সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চরের উপর। জ্যোৎস্নার মতো রোদটাকেও তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। দৈহিক কষ্টটাকে আমলই দিচ্ছিলেন না; যে বোধশক্তি আরাম বা কষ্টের কারণ, সেই শক্তিটাকেই তিনি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে সে কষ্টটাকেও সুখ বলে গণ্য করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে মুহূর্তে তিনি সুখ-দুঃখের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারবেন সেই মুহূর্তে সত্যকেও উপলব্ধি করবেন। সুদূর আকাশে চক্রকার ঘুরে ঘুরে একটা শকুনি উড়ছিল। তারই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন। মনে মনে বললেন, সুদূর আকাশে উঠেছ তুমি। অনেক জিনিসই তোমার চোখে পড়ছে। শুভ্রমেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়েছে দিগ্বলয়ের কাছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি ওসব কিছুই দেখছ না। তুমি ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করছ, মড়া কোথায় আছে! ও ব্যাকুল একাগ্রতা যদি আমারও থাকত! কিছুতেই একাগ্র হতে পারছি না, কিছুতেই নিস্পৃহ হতে পারছি না। মায়া কেটেও যেন কাটছে না। এই স্থানটার মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। আবার পদচারণ শুরু করলেন। গম যব ছোলা মটর সব কাটা হয়ে গেছে। চরের যে সব জায়গায় ফসল ফলেছিল সে সব জায়গা আবার প্রস্তুত হচ্ছে নতুন ফসলের জন্যে। সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন সদ্য-কর্ষিত জমিগুলোর দিকে। যে গম যব ছোলা মটর তাদের অলঙ্কৃত করেছিল একদিন, বুকে করে ধরে রেখেছিল যাদের, তাদের সম্বন্ধে সামান্যতম শোক বা মোহের চিহ্ন তো নেই। ভূমি নির্বিকার। তার কাছে ভাল গাছ খারাপ গাছ দুই-ই সমান; ফুল, শস্য, খাদ্য, বিষ সমস্তই সে উৎপাদন করে, কিন্তু কাউকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। তারা দলে দলে আসে আর চলে যায়। সে নির্বিকার। নির্বিকার বলেই এত অসংখ্য সম্ভাবনার জননী সে। সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়লেন ভূমির উপর। উত্তপ্ত চরের নিদারুণ উষ্ণতা প্রবেশ করতে লাগল তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁর মনে হতে লাগল, বীর্যমতী জননীর আশ্বাসবাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি যেন বলছেন—ভয় নেই, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে; থেমো না, এগিয়ে চল। সন্ন্যাসী আবার উঠে বসলেন। স্থির হয়ে বসে রইলেন চোখ বুজে। তাঁর খুব কাছে একটি বকও ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে ছিল অনেক আগে থেকেই। সন্ন্যাসীকে দেখে সে সরে গেল না। সন্ন্যাসীকে চিনত সে। নিঃসংশয়ে জানত, এঁর দ্বারা কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তার। অনেক দিন এসেছেন, বসেছেন, বেড়িয়েছেন, স্নান করেছেন, কোনোদিন তাকে মারতে বা ধরতে যাননি। অনড় হয়ে বসে রইল বক। সন্ন্যাসীও অনড় হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে নদীর জলে নামলেন। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তার পর উঠে ভিজে কাপড় পরেই নিজের সেই ভাঙা ঘরটির উদ্দেশ্যে চলতে লাগলেন। স্নান করবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আসছিলেন, খাওয়ার মত যদি কিছু জুটে যায় পথে। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আশা করতে লাগলেন, নদীর ধারে যে বেলগাছটা আছে তাতে একটা বেলও অন্তত পেয়ে যাবেন। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ডানার চাকর এক ঝুড়ি ফল নিয়ে বসে আছে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর একদিনও হয়েছিল।

চাকর বললে, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাইজীকে অনেক ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে কিছু পাঠিয়ে দিলেন।"

সন্ন্যাসী একটি মাত্র ল্যাংড়া আম তুলে নিয়ে বললেন, "আর আমার লাগবে না। ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"আরও কিছু রাখুন।"

"না। আর দরকার নেই।"

সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে গেলেন। চাকরটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর চলে গেল।

।। সতেরো ।।

প্রথম কয়েকদিন ডানার সঙ্গে ভাস্কর বসুর যে পরিচয়টা হল তা ঠিক পুরনো পরিচয় ঝালানো নয়, তা সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়। ভাস্কর বসু যে-ডানাকে দেখলেন, সে-ডানা ঠিক তাঁর পূর্বপরিচিত তন্বী রূপসীটি মাত্র নয়। বর্মায় জাপানী বোমা না পড়লে যাকে তিনি বিয়ে করে এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশ থেকে আর এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশে অনায়াসে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, এ ডানা সে ডানা নয়। এর দেহ মন আরও পরিপুষ্ট হয়ে অনেক বদলে গেছে। এখন মুখের দিকে চাইলে ও আগেকার মতো চোখ নীচু করে না, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, বেশ সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় না, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, অনেক সময় পালটা প্রশ্নও করে। অবশ্য সেজন্য আগের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি লোভনীয়ও হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব ওকে আরও মোহিনী করেছে, মনে হল, সেই ব্যক্তিত্বের বেড়াটা পেরিয়ে তার কাছে যাওয়া শক্ত, ঘনিষ্ঠ হওয়া আরও শক্ত।

ডানাও দেখলে, যে ভাস্কর বসুকে সে চিনত, যাকে নিয়ে তার মন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল একদিন, এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি ঠিক সে-লোক নন। তরুণ তেজস্বী রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার দীপ্তি নিবে গেছে। তার সঙ্গে এ লোকটির কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। একটা বহুমূল্য আসবাব অযত্নে বাইরে পড়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা যেন তেমনি। রঙ চটে গেছে, জৌলুস নেই। ডানা একে দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-চার দিন দেখবার পর সে ভাবটাও কেটে গেল। কৌতূহল হল বরং বাইরেটা বদলেছে। ভিতরটাও বদলেছে কি? দুজনেই পরস্পরের অন্তরের খবর নেবার চেষ্টা করছিল। সোজাসুজি কোনো প্রশ্ন না করে। কথায় কথায় যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই বেরুচ্ছিল না। দুজনেই সাবধানী। এই ভাবেই চলছিল।

...অসহ্য গরম ছিল সেদিন। গাছের পাতাটি নড়ছিল না। ডানা নিজের ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ভাস্কর বসুর কথাই ভাবছিল। রোজই প্রায় ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কিন্তু ও বিয়ে করেছে কি না তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। সে নিজেও বলেনি, ডানা লজ্জায় ও-প্রসঙ্গ তোলেইনি। কিন্তু কথাটা জানবার জন্যে তার মন ছটফট করছে। মনে হচ্ছে যদি...কিন্তু না, কথাটা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছে।

সে নিজের মুখে কিছুতেই বলতে পারবে না। নিজের মনের এই হ্যাংলাপনাতেই সে মরমে মরে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সত্য সে কিছুতেই এড়াতে পাচ্ছে না, বরং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেটা। ভাস্করের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে অচিরাৎ তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা করবে কে? যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, তা যদিও ঠিক গোঁড়া বাঙালী সমাজ নয়; কিন্তু সে সমাজেও পিতামাতারাই বিবাহ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী। তারা তো কেউ নেই, তা হলে কি নিজেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে? মৎস্যশিকারীরা টোপের লোভ দেখিয়ে মাছ ধরে যেমন করে? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু...চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়ল। মনে হল, টোকা নয়, ঘুষি। কপাট খুলে দেখলে, বকুলবালা দাঁড়িয়ে আছেন। রোদের ঝাঁজে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। পিছনে চণ্ডীও রয়েছে।

"আসুন আসুন।"

বকুলবালা বললেন, "একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন?"

ডানা কুঁজোতে হাত দিতেই বললেন, "খাব না, পা ধোব। পা দুটো ঝলসে গেছে আমার। রাস্তার ধুলো যেন তপ্ত খোলার বালি।"

"তা হলে চানের ঘরে চলুন।"

চানের ঘরে ঢুকে উপর্যুপরি কয়েক ঘটি জল ঢেলে বকুলবালা পা ধুলেন। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়েই মুছলেন পা দুটি। ডানা একটা তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছিল, তিনি নিলেন না।

বললেন, "কি হবে তোমার ফরসা তোয়ালেটা ময়লা করে? আমাকে তো একটু পরে কাপড় ছাড়তেই হবে। তখন ভাল করে থুপে কেচে নেব। এখন যে জন্য এসেছি তা বলি। চমৎকার পাখিটি পাঠিয়েছ ভাই। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ফাঁকই পাইনি। উনি কদিন ছুটি নিয়েছিলেন, বাড়িতে বসেই আপিসের কাজকর্ম করছিলেন। আমরা এখান থেকে বদলি হয়ে গেছি, মাসখানেক পরেই বোধ হয় চলে যেতে হবে। আজ উনি আপিসে গেছেন, তাই চলে এসেছি আমি। পাখি নিয়ে কিন্তু অনেক কাণ্ড হয়েছে ভাই। উনি পাখি দেখে ভয়ানক চটে গেছেন। বলছেন, অমরবাবুর স্ত্রীই মিথ্যে করে ওঁর নামে লাগিয়ে ওঁকে এখান থেকে বদলি করিয়েছেন, তাঁর উপহার ফেরত দাও। আমি কিছুতেই রাজি হইনি। বাড়িতে সে কি ধুম কাণ্ড ওই পাখি নিয়ে, চণ্ডীকে জিগ্যেস কর না। বল না-রে—"

চণ্ডী কিছু বলল না, মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

বকুলবালা বলতে লাগলেন, "আমি শেষে বলেছি, আমি নিজে কিছুতেই পাখি ফেরাতে পারব না। একজন ভদ্দরলোকের মেয়ে একটা উপহার পাঠিয়েছেন, তা আমি কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিতে যাব। তোমার যদি চোখের চামড়া না থাকে তা হলে তুমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

এই বলে বকুলবালা এমন ভাবে ডানার দিকে চাইলেন যেন ডানাই রূপচাঁদবাবু। ডানা স্মিতমুখে চুপ করে রইল, কি আর বলবে?

বকুলবালা তখন আসল প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"উনি যে রকম জেদী লোক, ঠিক পাখিটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসবেন। তখন তুমি

যেন ঘুণাক্ষরেও বলো না যে, আমি অমরবাবুর স্ত্রীর কাছে পাখি চেয়েছিলাম; তা হলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন বাড়ি গিয়ে। উনি পাখি যদি ফেরাতে আসেন, তা হলে তুমি টু শব্দটি না করে পাখিটি নিয়ে নিও। চণ্ডী তার পরদিন এসে পাখিটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে, বলবে—ও আর একটা পাখি, ও এক পাখিওলার কাছ থেকে জোগাড় করেছে। কি রে চণ্ডী, যা বলছি তা করবি তো? নিজে যেন গাপ করো না পাখিটি। তোমার এয়ার গান্ আমি দেব—যখন বলছি ঠিক দেব। সেই পাখিওয়ালাটার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে রাখিস, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন তা হলে যেন বলে সে-ই পাখি দিয়েছে। কিছু পয়সা দেব বললেই রাজী হয়ে যাবে। ভাল বুদ্ধি করিনি ভাই, পাখির গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। চমৎকার পাখিটি। এর মধ্যেই এমন মায়া বসে গেছে। কি সুন্দর করে আজ সকালে ডাকল—ইষ্টিকুটুম! না রে চণ্ডে?"

চণ্ডী বললে, "একবার 'খোকা হোক' ও বলেছিল। তুমি তখন চানের ঘরে ছিলে।"

"মিথ্যুক কোথাকার। চানের ঘরে থাকলে আমি শুনতে পাব না। কানের মাথা খেয়েছি না কি?"

"আমার কিন্তু মনে হল।"

"ভুল শুনেছ তুমি। ইষ্টিকুটুম ছাড়া আর কিছু বলেনি। বলবে অবশ্য ক্রমশ। আর একটু পোষ মানুক।"

একটা গাড়ি হর্ন দিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে।

"কেউ এল বোধ হয় ভাই। আমি পালাই, লুকিয়ে এসেছি তো। উনি হয়তো আজ সকাল সকালেই আপিস থেকে এসে পড়বেন। যাবার আগে আর একদিন আসবার চেষ্টা করব ভাই। যা যা বললুম সব মনে থাকবে তো?"

ডানা মৃদু হেসে বললে, "থাকবে।"

"পালাই তা হলে। পিছনের দরজা আছে? তা হলে ওই দিক দিয়েই যাই।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা খিড়কি-দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

আমার গাড়িটা আজ কলকাতা থেকে এল! বাইরে বেরুচ্ছি একটু। তোমার হাতে যদি তেমন বিশেষ কাজ না থাকে, চল না, ঘুরে আসবে আমার সঙ্গে।"

"কতদূর যাবে?"

"বেশি নয়, মাইল ষোল। ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"এই গরমে বেরুবে?"

"মোটরে চললে বেশি গরম লাগে না। হাওয়া লেগে আরামই লাগে বরং। আমাকে যেতেই হবে—একটা এনকোয়ারি আছে। তুমি যদি না যেতে চাও, থাক্ তা হলে।"

ডানা দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তকাল। এই সফরের সম্ভাব্য ফলাফলের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল তার মনে। তার পরে যেন মরীয়া হয়ে বলল, "বেশ, চল।"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ভাস্কর নিজেই ড্রাইভ করছিল। পিছনে বসে ছিল চাপরাসী। পোস্ট-অফিসের কাছে এসেই

ডানার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সন্ন্যাসীর কথা। তিনি বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে তাঁর নামে খাতা আছে। সেই খাতা থেকে ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা জেনে নেবে ভেবেছিল সে।

"পোস্ট-অফিসের কাছে একটু থামো তো। একটু দরকার আছে।"

ব্রেক কষে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার?"

"নদীর ধারে এক পড়ো বাড়িতে একটি সন্ন্যাসী থাকেন। শুনেছি এই পোস্ট-অফিসে তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। ভদ্রলোকের আসল নামটা সম্ভবত সেই খাতা থেকে পাওয়া যাবে। আমাকে বলবে কি?

"তোমাকে না বলতে পারে, আমাকে বলবে।"

ভাস্কর চাপরাসীকে আদেশ দিলেন পোস্টমাস্টারবাবুকে সেলাম দিতে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

"এখানে নদীর ধারে অমরবাবুদের একটা পড়ো বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আছেন শুনলাম। তাঁর এখানে নাকি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। সেই অ্যাকাউন্টে তাঁর কি নাম আছে একটু দেখে বলুন তো।"

পোস্টমাস্টার বললেন, "কয়েক দিন আগেই তিনি টাকা বার করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে— বিশ্বপতি ভট্টাচার্য। আমিও তাঁকে চিনতাম না, তাঁকে আইডেন্টিফাই করলেন আপনারই আপিসের একজন ক্লার্ক বিনয়বাবু। তিনি ওঁর খবর বলতে পারবেন।"

"কত টাকা আছে ওঁর অ্যাকাউন্টে?"

"সাত হাজার টাকা। অনেকদিন ধরে পড়ে আছে।"

"ও। আচ্ছা।"

আবার মোটর চলতে শুরু করল।

ডানার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যার সাত হাজার টাকা, সে উঞ্ছবৃত্তিধারী! কেন?....অন্যমনস্ক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে।

ভাস্কর বসু উঠলেন এসে একটা ডাক-বাংলোয়। নদীর ধারে বেশ মনোরম বাংলোটি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য দারোগা-জাতীয় কয়েক জন লোক অপেক্ষা করছিলেন। ভাস্কর ডানাকে বললেন, "আমি যত শিগ্‌গির পারি কাজটা সেরে নিচ্ছি। তুমি যদি গাড়িতে বসতে চাও—"

ডানা বললে, "তুমি কাজ সারো। আমি নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই একটু। দু-চারটে পাখির দেখা নিশ্চয়ই পাব।"

নদীর উপর গোটা দুই কালো-পেট গাংচিল উড়ছিল। তাদের সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ওড়ার দিকে চেয়ে ডানা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর দেখতে পেলে, দুটো বাঁশপাতি উঁচু পাড়ের গর্ত থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখল দুটো নয়, অনেক। গর্তও অনেক। বাঁশপাতিরা পাড়া বসিয়ে ফেলেছে একটা। দূরবীনটা আনেনি বলে দুঃখ হতে লাগল। গাংশালিকও আছে মনে হল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর ঝিরঝির করে সুন্দর হাওয়া উঠেছিল। ঝিল্লীর ঝঙ্কারে স্পন্দিত হচ্ছিল অন্ধকার। ডানা চুপ করে বসে ছিল একটা ক্যাম্প-

চেয়ারে হেলান দিয়ে। ভাস্কর বসুও পাশেই বসে ছিলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না। না-বলা কথার ভারে পরিবেশটা যেন আরও নিবিড় আরও ঘন হয়ে উঠেছিল। ভাস্কর হঠাৎ দেশলাই জ্বেলে পাইপটা ধরালেন, নিবিড় ভাবটা কেটে গেল।

"চা দিতে তো বড্ড দেরি করছে। দুধ যোগাড় করতে পারেনি বোধ হয়। আমি টাটকা দুধ দিয়ে চা তৈরি করতে বলেছি। দেখি।"

ভাস্কর বসু উঠে ডাক-বাংলোর সামনের দিকে গেলেন।

ডানা চুপ করে বসে রইল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। কয়েকটা কাদাখোঁচা আকৃষ্ট করেছিল তাকে। গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হতে চলল, এদের এতদিন এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। এরা বোধ হয় এখনও এ দেশের মায়া কাটাতে পারেনি। এরা কোন্ জাতের, গ্রীন স্যান্ডপাইপার (Green Sandpiper), না কমন স্যান্ডপাইপার (Common Sandpiper) তা বোঝা যাচ্ছিল না। উড়লে গ্রীন স্যান্ডপাইপারের সাদা পিছন দিকটা থেকে বোঝা যায়—অমরবাবুর দেওয়া একটা বইয়ে পড়েছিল সে। তাই দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাখিগুলো এমন ভাবে উড়ছিল যে, পিছন দিকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই করতে করতে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল সে নদীর ধার দিয়ে। নদীর তীরে একজায়গায় ঝোপের মতো ছিল একটু, তারই পাশে গিয়ে বসল সে অবশেষে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি চলে গেল। ছোট কবিতাও মনে পড়ল একটা। আনন্দবাবু তার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কবিতাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

দূরের আকাশে অনেক সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে
কাছের আকাশে এখনও ওঠেনি কেউ
দূরের বাগানে অনেক ফুলেরা ফুটেছে ঝরেছে অতীত কালে
কাছের বাগানে এখনও ফোটেনি কেউ।

কাছের আকাশে উঠবে সূর্য কাছের বাগানে ফুটবে ফুলেরা জানি
মনের ভিতরে তবুও কিন্তু কাহারা বসিয়া করে যেন কানাকানি
বিরাট সূর্য খুব কাছে এলে সহ্য করতে পারবে কি তাকে হায়
খুব কাছাকাছি ফুটলে ফুলেরা লাগবে কি তব রসবোধ চেতনায়
তাদের সূক্ষ্ম গন্ধ বর্ণ ঢেউ?

কবি অজ্ঞাতসারেই তার মনের কথাটা লিখেছিলেন ওই কবিতাটাতে। তাই মনে থেকে গেছে। হঠাৎ সেই কাদাখোঁচা পাখির দল খুব কাছে এসে বসল এবং উড়ল তখনই। এবার সাদা পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা গেল। ডানা বুঝতে পারল, ওরা গ্রীন স্যান্ডপাইপারই। ভারি আনন্দ হল বুঝতে পেরে। তার পরই মনে হল, কেন এই আনন্দ? সত্য নির্ণয় করে? না, নিজের অহঙ্কার তৃপ্ত হল বলে? আবার পাখিগুলো এসে বসল, আবার উড়ল। এবার উড়ে অনেক দূরে চলে গেল। আকাশের ভিতর মিলিয়ে গেল যেন। ডানার মনে পড়ল ওরা দূরের যাত্রী। তার পরই সে সচেতন হল যে, তাকেও ফিরতে হবে। ভাস্করের কাজ হয়তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। এসে দেখলে, ভাস্কর সত্যিই তার অপেক্ষায় বসে ছিল।

"ওদিকের ঘরটায় চা দিয়েছে, চল।"

"চল।"

ডাক-বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য যে ঘরটা নির্দিষ্ট থাকে, তাতে বেশ কেতাদুরস্তভাবে চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোম্যাক্‌স্‌ জ্বলছিল একটা ঘরের কোণে। চাপরাসী চা ঢেলে দিতে যাচ্ছিল, ডানা তাকে মানা করলে। নিজেই চা ঢালতে লাগল সে। চাপরাসী বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বসু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ডানার আনত মুখের দিকে। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটা সঙ্কটই যেন ঘনিয়ে এসেছে ডানার মনে হচ্ছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। অনেক ফুল নিয়ে দ্বারপ্রান্তে একটি লোক এসে দাঁড়াল। ভাস্কর ঘাড় ফেরাতেই ঝুঁকে সেলাম করল লোকটি। তার পর ঘরে ঢুকে একটি চিঠি দিল। ভাস্কর ভ্রূকুঞ্চিত করে চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তার পর লোকটিকে বললে, "আচ্ছা, দিয়ে যাও ওগুলো। বাবুজীকে আমার সেলাম দিও।" লোকটি ফুলগুলো চাপরাসীর হাতে দিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর মৃদু হেসে চিঠিটা এগিয়ে দিল ডানার দিকে। ডানা দেখলে, লেখা রয়েছে—"মিসেস বসুর জন্যে কিছু ফুল পাঠালাম। আপনারা আমার নমস্কার জানবেন। ইতি কৃষ্ণলাল।"

"বেচারা জানেই না যে, আমি বিয়ে করিনি।"

"ও! খবরটা আমিও তো জানতুম না।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ভাস্কর বসু এ সুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, "তোমার জানা উচিত ছিল। সব ভুলে গেছ নাকি? তোমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার আস্থা ছিল, এখনও আছে।"

ডানা মনে মনে যা প্রত্যাশা করেছিল, যা চাইছিল, তাই হল। কিন্তু সে সহসা উত্তর দিতে পারল না কিছু। চোখ নীচু করে চামচেটা চায়ের পেয়ালার ভিতর নাড়াতে লাগল আস্তে আস্তে। কি বলবে মাথাতেই এল না।

"ভুলে গেছ সব?"

"না। কিছুই ভুলিনি, তবে—"

আবার থেমে গেল সে।

"তবে কি?"

"কিছুই নয় তেমন। চল, এবার ফেরা যাক।"

ডানা উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর বসু কিন্তু বসেই রইলেন।

"কথাটা শেষ করেই দাও না যাবার আগে।"

"শেষ করবার তো কিছুই নেই। ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। এখন চল।"

"আলোচনা করবার মতো কিছু আছে না কি?"

"আছে কি না সেইটেই আলোচ্য।"

"হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল,

ভাস্করের চোখের নীচেটা ফোলা ফোলা। আগে তো এমন ছিল না। এর আগে তার চোখেও পড়েনি।

"কি দেখছ অমন করে?"

"কিছু নয়, চল। আমার কাজ আছে।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

।। আঠারো ।।

কল্পনার নতুন খোরাক পেয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কাব্যচর্চায়। বিশেষ করে সংস্কৃত কাব্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। তার পর যখন কলেজে তিনি চাকরি পেলেন, তখন মেতে উঠলেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা লেগে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের সুরুচি-সৃষ্টি করবার কাজে। কলেজের যা পাঠ্য তা তো তাঁদের পড়াতেনই নানা রকম করে, যা পাঠ্য নয় তাও পড়াতেন। কালিদাস যাঁদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, তাঁরা ভবভূতি, ভারবী ও মাঘেরও আস্বাদ পেতেন কিছু কিছু। ছাত্রদের নিয়েই মেতে ছিলেন তিনি তাঁর চাকরি-জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। বাল্যবন্ধু রূপচাঁদ ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা মাতিয়ে দিতে পারে। তাঁর চতুর বৈষয়িকতায় কোনও প্রেরণা পেতেন না তিনি। তবু তাঁকে নিয়েই দিন কাটছিল। তাঁর পাল্লায় পড়েই নীট্শের দু-একখানা বইও পড়েছিলেন। খুব ভাল লাগেনি তাঁর। মনে হয়েছিল, তখনকার হেঁইও-মার্কা বীরপুরুষদের মন রাখবার জন্যই ভদ্রলোক বুদ্ধির কসরৎ করেছেন নানারকম। যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করেছে, তাদের কাছে নীট্শের 'সুপারম্যান' খুব ফিকে। এ দেশে চার্বাক কল্কে পায়নি, নীট্শেও পাবে না। এ নিয়ে রূপচাঁদের সঙ্গে তর্ক হত মাঝে মাঝে। অর্থাৎ নীট্শেকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু জমত না। এমন সময় অমরবাবু এলেন তাঁর চোখের সামনে, তা শুধু পাখির জগৎ নয়, তা এক অদ্ভুত রহস্যময় অমরাবতী। তার পর এল ডানা। অপরিচিতা, রূপসী, যুবতী। মানবী নয়, যেন স্বপ্ন। নতুন রঙে, নতুন রসে মেতে উঠল তাঁর কল্পনা। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠল, যা পাষাণ মনে হচ্ছিল তা ফেটে গেল হঠাৎ, কুল কুল করে বেরিয়ে পড়ল কাব্যনির্ঝরিণী। চলল কিছুদিন। এখন সে ভাবটাও কেটে গেছে। এখন নতুন সুর লেগেছে মনে। অমরবাবুর জমিদারির ম্যানেজার হওয়ার পর থেকে প্রজাদের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কি করলে তারা ভালভাবে থাকতে পারে—এই হয়েছে এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। ডানার কাছ থেকে মন সরে গেছে অনেক দূরে। জোর করে যে সরিয়ে দিয়েছেন তা নয়। নদীর মতো আপনিই সরে গেছে।

......দুপুরের রোদ অগ্রাহ্য করে সেদিন বেরিয়েছিলেন তিনি ইছাপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। হেঁটে নয়, গরুর গাড়ি করে। ইছাপুরের প্রজারা জানিয়েছিলেন, যে, এবার তাদের ফসল ভাল হয়নি। তার ওপর গ্রামে কলেরার মড়ক লেগেছে। পুকুরে জল নেই, কাদা উঠছে। যে কটি কূপ আছে

তাও শুষ্ক হয়ে আসছে। আনন্দবাবু ডাক্তার পাঠিয়ে কলেরার প্রকোপটা আগেই কমিয়েছিলেন। নবাগত ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্কর বসুর সহায়তায় কয়েকটা কূপের জীর্ণসংস্কারও হয়েছে। দু একটা টিউবওয়েল করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। কবি যাচ্ছিলেন স্বচক্ষে সব দেখবার জন্যে। একটা বাগানের কাছাকাছি এসে গাড়োয়ানটা বললে, হুজুর গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে আনি। বড্ড হাঁপাচ্ছে। কাছেই নদী, আমি যাব আর আসব। চান করিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। যা রোদ!"

কবি বললেন, বেশ, যাও। খুব বেশি দেরি করো না। আমার বিছানাটা একটা গাছের তলায় বিছিয়ে দাও তা হলে। গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে ওখানে বসে থাকা ভাল।"

ছায়াসুশীতল একটি বড় গাছের নীচে বিছানাটি পেতে দিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল। কবি উপবেশন করলেন। উপবেশন করেই অনুভব করলেন, এক অদ্ভুত স্বর্গরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। চতুর্দিক যখন রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তখন এই শ্যামাঙ্গিনী কানন-লক্ষ্মী আশ্চর্য কৌশলে অদৃশ্য এক স্নেহ-অঞ্চলের আড়ালে এই স্থানটুকুকে রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত পরিবেশ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন পরিবেশটা। তারপর গান শুরু করলে একটা দোয়েল পাখি। গ্রাম-সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। কবিতার খাতা বেরুল পকেট থেকে। দেখলেন, পুরনো খাতাটা এনেছেন। মাত্র চার-পাঁচ পাতা সাদা আছে। মাঝে মাঝে যে সব পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই পরিষ্কার করে টোকা আছে এতে। বহুবার-পড়া কবিতাগুলোতেই চোখ আটকে গেল আবার। আবার পড়তে লাগলেন।

বক

গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক
কেউ সাদা, কারো গায়ে নানা ছক।
নদী-নালা-পুকুরেতে চুপচাপ
বসে বসে মাছ খায় কুপকাপ।
এক মনে বসে থাকে নড়ে না।
চোখে তার আর কিছু পড়ে না।
আকাশেতে ওঠে রবি, তারা, চাঁদ,
বাগানে রূপের বান ভাঙে বাঁধ।
বাতাসেতে কত লীলা সুরভির
কত সাহানার কত পূরবীর।
বকদের প্রাণে নেই কোন শখ
গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক,
দেখে শুধু চুনো-পুঁটি মারে ঘাই
তার চোখে আর কিছু পড়ে নাই।
বক কয়, কবি, মোরা সত্যিই নাজেহাল
তোমাদের মত বল কোথা পাব বেড়াজাল।

ময়ূর

নীল-সবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি
ছন্দ সাথে মহানন্দে মিলিয়াছে মনের আবেগ
উচ্ছ্বাসিত পেখমেতে জ্বলিতেছে বর্ণের দীপালি
প্রেয়সী এসেছে, কাছে, আকাশেতে উঠিয়াছে মেঘ।

* * *

ভঙ্গী-ভরা দৃপ্ত গ্রীবা অপাঙ্গে কি বহ্নি-বিভা
প্রতি পর্ণে বর্ণময় সুর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।
নাচিছে কবির চিত্ত বনভূমি হল তীর্থ
স্থূল রূপ হল সূক্ষ্ম, দুঃখ হল দূর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।

* * *

নাচে পক্ষী-নটরাজ পরিয়া অপূর্ব সাজ
গ্রীষ্মও যে হল স্বপ্নাতুর,
শাল তাল কর্ণিকার ভাষা নাহি বর্ণিবার
সর্ব অঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ মধুর
প্রিয়া-পাশে নাচিছে ময়ূর।

শকুনি

কলির জটায়ু তুমি জয়, জয়, জয়,
ক্ষুধারূপী রাবণের করেছ দমন
জীবন্ত কোন সেনা নাহি করি ক্ষয়।
মরিয়া পড়িয়া থাকে ভাগাড়ে যারা
অভিনব তব রণে যোদ্ধা তারা
শবের বাহিনী লয়ে হে শিব-দোসর,
ক্ষুধাসুরে কর পরাজয়।
নহ তুমি মনোহর, বিলাসী নহ,
দুঃখের রুক্ষতা অঙ্গে বহ
মৃত্যুর সাথে তব কি দুঃসহ
ঘনিষ্ঠ ঘোর পরিচয়।
জয়, জয়, জয়।

বাবুই

চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি
আসল সেটা দেখাই নয়,
আসল দেখা হয় যে অনেক পুণ্যে।

বাবুইটাকে ভাবছ পাখি?
কিন্তু ওরা পাখিই নয়
ব্যাবিলনের শিল্পী ওরা
শহর বানায় শূন্যে।
* * *

খড়ের বোতল বানিয়ে ওরা
দুলিয়ে দিল তালগাছে,
না, না ভায়া, তাড়ির নেশায় নয় গো!
ঘোজখাজ আর কোটর ছেড়ে
নতুন কিছু করল ওরা
শিল্পী মনের সেই তো পরিচয় গো.
* * *

নাইক তাঁত, নাইক হাত
নাইকো কোন যন্তর
তালগাছেতে বুনল শহর
এ কোন্ যাদু মন্তর!
* * *

আছে কেবল ছোট্ট মুখ
হলদে মাথা, হলদে বুক,
এবং আছে কল্পনা
নেহাত সেটা অল্প না!
* * *

তাই কি বুড়ো তালগাছটা সসম্ভ্রমে যেন
পাতার ছাতা ধরছে মাথায় ওদের?
কিন্তু ওরা মশগুল যে, তোয়াক্কা নেই রোদের।
শূন্যে শহর দুলছে
এই আমোদেই রোদ বৃষ্টি ভুলছে!

আরও অনেক পাখির বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা আছে। কিন্তু দোয়েল পাখিটার অশ্রান্ত গানের তাগিদে পড়া বন্ধ করতে হল তাঁকে। দোয়েল যেন ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলতে লাগল—কি কাণ্ড তোমার! আমি এসেছি দেখছ না? এখন অন্য কিছু করা সম্ভব কি! মনে পড়ল, অমরবাবু অনেকদিন আগে একটা চিঠিতে একটা দোয়েলের গানকে আমাদের অক্ষরে লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিতায় সে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কান পেতে শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর ভেবে ভেবে লিখলেন—ওরই গানের যথাসম্ভব অনুসরণ করে লিখলেন—

চিচাকি—চিচাকি—চিচির্‌র্‌র্
কিনি কিনি কিনি কিনি কুংকিনি কোনিয়া

টুকচি কুটর কিম কোনিয়া
কুরুরু কিচির চং
কুরুরু কিচির চং
জুচকি জুচ্‌কি কি রে কিচ্‌কিচ্‌ কোনিয়া।

মানুষের কাছে এর কোনো অর্থ নেই। কিন্তু দোয়েলের কাছে আছে। দোয়েলটা উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে বসল একটা ল্যাজ-ঝোলা পাখি। এ পাখিটি তাঁর প্রিয় পাখি। লম্বাটে ধরনের বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজটি লম্বা, মাথাটি কালো; কিন্তু ওর রূপের জন্য নয়, ওর সাবলীল বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গীর জন্য ওকে কবির ভারি ভাল লাগে। বুলিও ছাড়ে নানারকম। চ্যা—চ্যা—চ্যা ডাকের জন্য বেরসিক লোকেরা ওর নাম দিয়েছে হাঁড়িচাঁচা। কিন্তু তারা বোধ হয় ওর ক-অক্‌রিং ডাকটা শোনেনি। ওই ডাকটাই মাঝে মাঝে শোনায় 'খুকু নেই' 'খুকু নেই'। এ ছাড়াও কখনও কখনও গঁয়-গঁয়-গঁয়-গঁয় ধরনের শব্দ করে পাখিটা। অদ্ভুত শোনায়। মনে হয় কোনও ছোট ছেলে যেন গন্‌ গন্‌ করে বায়না করছে। ল্যাজ ঝোলা যেন মনের কথা টের পেয়ে তারা সেরা বুলিটা শুনিয়ে দিল।

"ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং।"

বেশ দুলে দুলে ডাকতে লাগল। যাকে উদ্দেশ্য করে এই সুরেলা সম্ভাষণ সেই পক্ষী-প্রিয়াকেও দেখতে পেলেন কবি। আর একটা গাছে বেশ সপ্রতিভভাবে সে বসে আছে, যেন কেউ তাকে ডাকছে না। কবি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। শুরু করলেন কবিতা আবার। এবার পাখির ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায়।

যদিও পুরুষ পাখি তবু যেন কিশোরী
বাদামী গায়ের রঙ, কালো মাথাটি
পুচ্ছের পাখিটি জাপানী, না মিশরী
(তোমরা তা ঠিক কর আমি জানি না)
আমি জানি চুরি করে খাবে আতাটি।

চুরি করে ফল খায়, চুরি করে ডিম খায়,
প্রেয়সীব কাছেতেই শুধু হিমসিম খায়,
খোশামোদী সুর জাগে গলাতে
মনে হয় যেন আমতলাতে
বৃন্দাবনের সুর বাজল
বাঁশরীর সুরে বুঝি শ্রীরাধিকা সাজল।
ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং—
ল্যাজ-ঝোলা পাখিটাই দুলে দুলে ডাকছে
মাঝে মাঝে চুপ করে থাকছে।
ভাবছে, প্রিয়ার কথা ভোল্‌ না
আবার দুলিয়ে দেহ দোল্‌ না

পুনরায় ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং,
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

উঁচু ডাল থেকে পাখি নিচু ডালে নামছে
মাঝে মাঝে ডাকছে ও থামছে।
গাছের সবুজে রোদ জ্বলছে
মদন-দহনে পাখি বলছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

সহসা বেসুরো ডাক—চ্যা চ্যা চ্যা—
বিবেকই বলছে বুঝি ছ্যা ছ্যা ছ্যা
আর কত খোশামোদ করবি
আর কত ডেকে ডেকে মরবি
বাড়িয়ে সুরের হাত আর কত পায়ে তার ধরবি।

একটুও নেই তোর লাজ হায়!
ল্যাজের বাহার দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল
ফল-ভরে নত আমগাছটায়।
ক্ষণ পরে দেখি পুন ডাকছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

কবিতাটা শেষ করে কবি অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। হঠাৎ একটা কথা মনে হল। মানুষ ছাড়া আর কেউ বুড়ো হয় না। গাছেরা পাখিরা প্রতি বছর বার্ধক্যের খোলস ফেলে দিয়ে যৌবনের সাজে সজ্জিত করে নিজেদের। নবমুকুলে সজ্জিত বৃদ্ধ আমগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি মুগ্ধ নেত্রে। ল্যাজ-ঝোলা পাখিটা সমানে ডেকে চলেছে। ওর বয়স কত সে প্রশ্নই মনে জাগছে না, যৌবনসুলভ আনন্দে মেতে উঠেছে—এইটেই এই মুহূর্তে ওর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ডানার কথা মনে হল। ডানাও ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার আবির্ভাব তাঁর কল্পলোকে যে উৎসবের সাড়া তুলেছিল, তা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে তুবড়ির মতো। ডানা আর তাঁর কবিতার খোরাক যোগাতে পারবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল।

"এবারে চলুন হুজুর।"

গাড়োয়ানের আগমনে সহসা নতুন জগতে নীত হলেন তিনি।

।। উনিশ ।।

সেদিন মোটরে ভাস্করের সঙ্গে ডানার আর কোনো কথা হয়নি। দুজনেরই মন নানা কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু দুজনেই ইতস্তত করছিল। শীতকালে জলের ঘটিটা মাথায় ঢালার আগে অনেকে

যেমন ইতস্তত করে, অনেকটা তেমনি। দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, কথাটা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শেষ করতেই হবে। কোথায় শেষ হবে এই অনিশ্চয়তাটাই দুজনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলাচ্ছিল। দুজনের মনে হচ্ছিল, অসাবধানে বেফাঁস কিছু বলে ফেললে সুরটা কেটে যাবে হয়তো। তাই কেউ কিছু বলছিল না। তা ছাড়া, চাপরাসীটা পিছনে বসে ছিল।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে ভাস্কর বললেন, "এখানেই নাববে, না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"পৌঁছেই দাও। আমার কাজ আছে একটু।"

"এত রাতে আবার কি কাজ?"

"পাখিগুলোর খবর নিতে হবে একটু। আজকের ডাকটাও দেখা হয়নি। অমরেশবাবুর বা রত্নাদির চিঠি আসতে পারে।"

"চল, তা হলে পৌঁছে দিই। আলোচ্য বিষয়টার আলোচনা কখন করবে?"

"করলেই হবে একদিন। ব্যস্ত কি?"

"আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া?"

"এক মিনিটের জন্য নেবে এস, দেখাচ্ছি, তা হলেই বুঝতে পারবে।"

বাংলোর ভিতর ঢুকেই ডানা বুঝতে পারল, বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই কেউ। জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নেই। ড্রইংরুমের মাঝখানে একটা বিশ্রী কালো টেবিলের উপর আধ-খোলা স্যুটকেস একটা। ভাস্কর সেইটেই হাঁটকাতে লাগলেন এসে। কাগজপত্র, রুমাল, টাই ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। সুটকেস থেকে একগোছা খাম বার করলেন ভাস্কর বসু।

"এই দেখ। একটা খুলে দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে।"

খুলতেই একটি সুশ্রী মেয়ের ফটো বেরিয়ে পড়ল।

"প্রত্যেক খামেই একটা করে ফটো আছে। আরও আসবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও কোনো জবাব দিই না। কিন্তু কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?"

"আচ্ছা, পরে কথা হবে এ বিষয়ে। আজ আর নয়।"

মুচকি হেসে ডানা বেরিয়ে গেল। বাইরে সে যতটা সপ্রতিভতা দেখাল, মনে মনে কিন্তু ঠিক ততটা সপ্রতিভ সে থাকতে পারল না। হঠাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল, আর সেজন্য লজ্জিতও হল মনে মনে।

ভাস্কর তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে চলে গেলেন। ডানা চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কেউ নেই। চাকরটাও নেই। মনে হল যেন অসীম নির্জনতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাকে আবার। আবার নতুন করে নবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে বুঝি। পুরাতন পরিবেশেই কিন্তু ফিরে আসতে হল পর-মুহূর্তে। চাকরটা এল। কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছিল।

"মুন্সী এসেছিল কি?"

"এসেছিল।"

"কিছু বলে গেছে?"

"আরও দু একটা পাখি মরে গেছে বললে।"

চুপ করে রইল ডানা। সে যদি ভাস্করের সঙ্গে না গিয়ে পক্ষী-নিবাস পরিদর্শন করতে যেত তা হলে যে ওরা বাঁচত তা নয়, কিন্তু তবু ডানা নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে যায় উপর তার কোনও হাত নেই। বন্দী পাখিদের স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তার নেই, অথচ ওই তার চাকরি।

"চা খাবেন মা?"

"কর একটু। পিওন এসেছিল?"

"এসেছিল। একটা চিঠি আছে।"

ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে অনেকটা যেন আরাম বোধ করল। এতক্ষণ যেন রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিঠি লিখেছিলেন অমরেশবাবু। ডানা খামখানা উল্টে-পাল্টে দেখলে। মনে হল, কাশ্মীর থেকে লিখেছেন, ভাবলে, স্নান সেরে ভাল করে পড়া যাবে।

স্নান শেষ করে চা খেতে খেতে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে, অমরেশবাবুর চিঠিখানার কথা মনেই রইল না তার আর। কেন সে অন্যমনস্ক হয়েছে তা নিজেও সে বলতে পারত না। সজ্ঞানে সে কিছুই ভাবছিল না, ভাস্করের কথাও নয়। তার মনটা যেন অন্ধকার ঘরের মতো হয়ে ছিল, সচেতনভাবে কিছুই যেন পরিস্ফুট হয়ে ছিল না সেখানে। অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবল চায়ের পেয়ালার ছোট ছোট চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে উঠল, সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। ভাস্কর আসার পর থেকে কয়েকদিন তাঁর খোঁজ নেওয়া হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিস্ময়কর খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হল, মস্ত বড় একটা কর্তব্য যেন অসমাপ্ত রয়েছে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের তলায় যে বিশ্বপতি ভট্টাচার্য আত্মগোপন করে আছেন, তার রহস্যটা আবিষ্কার করতেই হবে। প্রাক্তন জমিদার সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেটা জানাও যেন দরকারি মনে হল তার। টর্চ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। চাকরটাকে বলে গেল, সে একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, খুব জরুরী দরকারে কেউ যদি আসে, সে যেন অপেক্ষা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সন্ন্যাসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, "বিশ্বপতিবাবু বাড়ি আছেন?" কোনও উত্তর এল না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ডানার। চলে গেছেন না কি ভদ্রলোক। আর একবার ডাকলে, কোনো সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর কেউ নেই। টর্চের আলোয় শাবলের ডগাটা চক্ চক্ করে উঠল। সেটা একটা কোণে ঠেসানো ছিল। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার পর মনে হল, হয়তো চরে কোথাও গেছেন। তিনি সাধারণত কোথায় গিয়ে বসেন তা ডানার জানা ছিল। চরের উপর পায়ে-চলা পথও হয়েছে আজকাল। একটু খুঁজে দেখলে ক্ষতি কি! চরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

চরে ভীষণ অন্ধকার। নিঃশব্দ নয়, বাঙ্ময়। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকছে। ঝিল্লীও বোধহয় এক রকম নয়, নানারকম শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশছে ভেকের ডাক, পেচকের কর্কশ চীৎকার, টিট্টিভ পাখিদের ডিড্-হি-ডু-ইট্ (Did-he-do-it)। 'চোখ গেল' পাখিও ডাকছে একটা। গাং চিলদের

কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটা কি পাখি মাঝে মাঝে ডাকছে আর থামছে। মনে হচ্ছে, সাপে বুঝি ব্যাঙ ধরেছে—কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্, তিন চারবার ডেকেই থেমে যাচ্ছে। কোনো রকম প্যাঁচা কি? ডানার মনে হচ্ছিল, বিরাট অন্ধকারই যেন নানাভাবে কথা কইছে। দিনে আলোর নানা লীলায় প্রকৃতি যে বার্তা আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়, অন্ধকারে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শ্রুতিপথে কি সেই বার্তাই পাঠাচ্ছে প্রকৃতি? না, এ অন্য কিছু? অন্ধকারকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করছিল ডানা। অন্ধকার কিন্তু চমকাচ্ছিল না। তার বিরাট অতিকায় রূপের নিকষে এতটুকু দাগ পড়ছিল না। ক্ষুদ্র আলোর রেখাটাই যেন অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল তার সীমাহীন বিশালতার কাছে। হঠাৎ ডানার মনে হল, যা আমরা অসীম বা অনন্ত বলে কল্পনা করি তা কি আলোহীন? আলোয় আমাদের বুদ্ধি দৃষ্টিসীমায় আটকে যায়. আদি এবং অন্ত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকারে তা পাই না, অন্ধকারই আমাদের মনে অসীমের আভাস জাগিয়ে তোলে। টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে নানারকম এলোমলো ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যমনস্ক হয়ে ডানা এগিয়ে চলেছিল অন্ধকারে! তার ভয় করছিল না, সে জানতে পারছিল না যে, তার মনের নেপথ্যে এক শক্তিবান পুরুষ অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল, নদীর মৃদু কলধ্বনি শোনা গেল। সে বুঝতে পারল যে, চরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে, সামনেই নদী। নদীর জলে টর্চ ফেলতেই একদল হাঁস কলরব করে উড়ে গেল। ডানার মনে হল, হাঁসেরা এখনও ফেরেনি নাকি নিজেদের দেশে? ডাক শুনে মনে হল চখা। মনে পড়ল, চখারা অনেকদিন পর্যন্ত এ দেশে থাকে। তারপর মনে হল, হাঁসদের স্বদেশ বলে কিছু আছে কি। সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাদের দেশ, যখন যেখানে ভাল লাগে তখন সেখানে থাকে। হিমালয়, রাশিয়া, উত্তরমেরু, ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা ওদের কাছে যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। আমরাই কেবল একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বাস করে এটা স্বদেশ ওটা বিদেশ, এ আত্মীয় ও পর—এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করি। টর্চের আলোটা এদিকে ওদিকে ফেলে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ছোট-বড় বালির টিপি, ঝাউগাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা শেয়াল তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর চলে গেল। সন্ন্যাসী যেখানটায় সাধারণত বসেন সেখানে উপস্থিত হল সে অবশেষে। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মনে হল, দূর—অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে! সন্ন্যাসী কি? উনি একা বসে অনেক সময় গান করেন। এগিয়ে চলল ডানা সেই দিকে। বালি ভেঙে ভেঙে অনেক দূর যেতে হল। গিয়েও কিন্তু সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। ডানা টর্চ ফেলে ফেলে নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগল, গানটা গাইছে কে, আর কোথায় বসেই বা গাইছে! হঠাৎ দেখতে পেল, নদীতে একটা নৌকা ভেসে চলেছে। নৌকা থেকেই গানটা ভেসে আসছে। গানের লাইনগুলো সুন্দর। এ গান আর কোথাও শুনেছে বলে মনে পড়ল না।

স্রোতে তরী ভাসিয়েছি ভাই
নাইক আমার পথের চিনা রে,
ভরসা আছে স্রোতই আমায়
নিয়ে যাবে সাগর-কিনারে।

সন্ন্যাসী আছেন নাকি ওই নৌকোতে? চলে যাচ্ছেন এখান থেকে?—এই প্রশ্ন মনে

জাগবামাত্র একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন হল সে। সন্ন্যাসী যে তার মনে কতখানি স্থান জুড়ে বসে আছেন তা সে বুঝতে পারল।

"বিশ্বপতিবাবু—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—।"

চিৎকার করে ডাকল সে একবার। কিন্তু সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল। নদীর বাঁকে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, টর্চ ফেলে ফেলে এইটেই দেখতে লাগল সে দাঁড়িয়ে। গান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, তার পর আর শোনা গেল না। নৌকোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ডানার পা দুটো ব্যথা করছিল, সে বসে পড়ল বালির ওপর। অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। অসীম অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে তার মনে হতে লাগল, নবজন্মের প্রতীক্ষায় সে যেন বসে আছে, মাতৃজঠরের অন্ধকারে ভ্রূণ যেমন থাকে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর কণ্ঠে অন্ধকারের ভাষা শুনতে লাগল। মনে পড়ল, সন্ন্যাসী অনেক দিন আগে বলেছিলেন—তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ডানার মনে হল, অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা হয়তো আছে, কিন্তু সেই অর্থটাই যে ঠিক অর্থ তা কে বলে দেবে! তা নির্ণয় করবার মানদণ্ড কি? হঠাৎ একটা শব্দ হল—বুম্-ও-বুম্। চমকে উঠল ডানা। মনে হল কে যেন কথা কইল। টর্চ ফেলেই কিন্তু দেখতে পেলে হুতোম প্যাঁচাটাকে। নদীর উপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছের ডালে বসে ছিল, টর্চের আলো পড়তেই উড়ে গেল। নদীর উপর দিয়ে, প্রায়, নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গাংচিলের মতো উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যাঁচাটাকে দেখে হঠাৎ অমরেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর কাঁধে উঠে সে একবার একটা প্যাঁচার বাসায় দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, অমরেশবাবুর যে চিঠিটা এসেছে সেটা খোলা হয়নি এখনও। আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বাসার দিকে ফিরতে লাগল। ফিরতে ফিরতে একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, সে সন্ন্যাসীর খোঁজে এসেছিল কেন? শুধু কি নিছক কৌতূহল? নিছক কৌতূহল কি তাকে এই অন্ধকারের চরের মধ্যে ঘোরাতে পারত? কেন এই আকর্ষণ?

ডানা যখন ফিরল, তখন প্রায় এগারোটা বাজে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে উঠিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে অমরেশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে বসল সে। চাকরটা বললে, খানিকক্ষণ আগে রূপচাঁদবাবুর ঠাকুর এসেছিল, পাখির খাঁচাটা রেখে গেছে।

"খালি খাঁচা?"

"না, পাখিটাও আছে।"

"কোথায় রেখেছ?"

"আপনার শোবার ঘরে।"

ডানা অমরেশবাবুর চিঠিটা পড়তে শুরু করল এবার।

কল্যাণীয়া ডানা,

এখন ভূস্বর্গে এসেছি, সুতরাং লৌকিকতার ছদ্মবেশ খুলে ফেললাম। তোমাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। এ ব্যাপারে রত্না অনেক আগেই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ থেকে আমিও হলাম। কাশ্মীরকে যে কেন ভূস্বর্গ বলে তা বলে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও

আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও আমি তা পারব না। সুতরাং সে চেষ্টাও করব না। ছোট্ট একটি ইংরেজী কথায় কেবল বলব, লাভলি! আমাদের এ কাশ্মীর ভ্রমণে মহত্ত্ব বা রোমাঞ্চকর কিছু নেই। সার্ ফ্রান্‌সিস্ ইয়ং হাস্‌ব্যান্ডের মতো দুর্গম গিরি-কান্তার পার হয়েও আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করিনি। সার্ ফ্রানসিস্ পিকিং থেকে হাঁটাপথে উনিশ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন 'মুস্তাঘ্ পাস' অতিক্রম করে বাল্‌টিস্তানে এসে পৌঁছেছিলেন। পথ চলতে চলতে তাঁকে বিছানা কেতলি প্রভৃতি সব ফেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর তাঁবু ছিল না। আকাশের নীচে মাটির উপর শুয়ে থাকতেন তিনি হিমালয়ের বুকের উপর। নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার মালমসলা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই জোটে। আমার সে রকম ভাগ্য নয়। আমি রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, টোঙ্গা এবং হাউসবোটের সহায়তায় আরামেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি এবং আনন্দবাবু যদি সঙ্গে থাকতে তা হলে ভ্রমণটা আরও মনোরম হত। রত্না বড় বেশি গম্ভীর লোক তো, খুম কম কথা বলে। মনে যখন খুব বেশি কথা জমে ওঠে, তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা উপচে পড়ে। ভ্রমণকালে ওর চেয়ে আর একটু কম নীরস সঙ্গী থাকলে বেশি জমত। রত্নাও সে কথা কাল বলছিল। রত্নার মুখে তোমার বিপদের কথা শুনে কৌতুক অনুভব করলাম। আশাকরি, বিপদ এতদিনে কেটে গেছে। এখন আমরা শ্রীনগরে একটা বোটহাউসে আছি। যখন সিমলায় ছিলাম তখন সেখানকার দু-চারটে পাখির খবর আনন্দবাবুকে লিখেছিলাম। এখানেও সে সব পাখি আছে। তবে কাল সন্ধ্যার দিকে 'চাক্ চাক্ চাক্ চাওয়াক্' এই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। ঠিক এ ধরনের পাখির ডাক আগে শুনেছি বলে মনে পড়ল না। বেরিয়ে এলাম। দেখি, খাঁচা নিয়ে একটা লোক বসে আছে। কি পাখি আছে খাঁচায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে—'চকুর'। দেখলাম, পাখিটি এক রকম পাহাড়ী তিতির। চমৎকার দেখতে। সালেম আলির বইয়ে ছবি আছে দেখো। ও-দেশে অনেকে যেমন শখ করে তিতির পোষে, ও-দেশে যেমন তিতিরের লড়াই হয়, এ-দেশেও শুনলাম, চুকরকে নিয়ে ঠিক একই কাণ্ড। চুকরকে কেন্দ্র করে অনেকে টাকা হাত বদল করে এখানে। আমি ভাবছি এই চুকর আমাদের কাব্যের চকোর নয় তো! চাঁদ বা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না। খোঁজ করব। তুমি আনন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা করো, কাব্যের চকোরের কোনও বর্ণনা কোথাও তিনি পেয়েছেন কি না। আমার লাইব্রেরিতে গিয়ে অভিধানখানা একবার উল্টে দেখো। যদি কোনো খবর পাও জানিও। এখানে আর এক রকম পাখি দেখছি। লালমাথা লাফিং থ্রাশ। সিমলায় যে লাফিং থ্রাশ দেখেছি তা অন্যরকম। তার নাম স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ। এখানকার পাখিদের পুরো পরিচয় এখনও পাইনি তেমন। এই গরমের সময়টা হিমালয়-ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল নয়, তবু যখন এসে পড়েছি যতটা পারি দেখে যাব। তবে এখানে কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। কিছু টাকার যোগাড় হলে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। রত্নার মুখে শুনলাম, তুমি আর আনন্দবাবু খুব মন দিয়ে কাজ করছ। আমারও তোমাদের মতো কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না। মনটা ছটফট করে অন্য কোথাও যাবার জন্যে। হয়তো সব জায়গা দেখা হয়ে গেলে কোথাও মন স্থির করে বসতে পারব, কিন্তু পারব কি? অত টাকা আর সময় কোথা পাব? ডাকের সময় বেশি নেই। সুতরাং এইখানেই শেষ করি। তুমি আর আনন্দবাবু আমার প্রীতি ও নমস্কার নিও। ইতি—

তোমাদের অমরেশ

চিঠি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে টোকা দিয়ে কপাটটা ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন। মুখে মৃদু হাসি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

"সিগারেটটা ফেলেই দিয়ে আসি।"

বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"কপাটটা বন্ধ করে দেব?"

"কেন, খোলাই থাক্ না।"

"ভেজানো থাক্ তা হলে। চাকরটা বাইরে নেই। তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।" ডানা উঠে দাঁড়াল।

"এত রাত্রে কি দরকার আপনার?"

তার কণ্ঠস্বরে যেন ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিত হল। রূপচাঁদ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "বলছি। ভয় পাবার মতো কিছু নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তাই বিদায় নিতে এসেছি। তোমার কাছে এটা হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে এটা অসামান্য। তুমি আমার জীবনের কতখানি—না, থাক্, সস্তা কবিত্ব করব না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে দশজনের সামনে মেকি হাসি হেসে ছোট্ট নমস্কার করে তোমার কাছে বিদায় নেওয়া চলে না। এর জন্যে খানিকটা নির্জন নিবিড় সময় চাই। সেই জন্যেই এখন এসেছি। একটু আগেও এসেছিলাম। তুমি তখন ছিলে না। ভয় পেয়ো না, বস।"

এর পর না-বসাটা একটু অশোভন। ডানাকে বসতে হল।

"আপনি যে এখন এখানে আসবেন—এ কথা আপনার স্ত্রী জানেন?"

"না। সে জানে আমি এখানে নেই, আপিসের কাজে বাইরে গেছি। তাকে বলে গিয়েছিলাম, হলদে পাখিটা আজ সন্ধেবেলা যেন ফেরত পাঠানো হয়। পাঠিয়েছি কি?"

"পাঠিয়েছে। রত্নাদি আপনার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন পাখিটা। ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন?"

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার রত্নাদির চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই। তিনি হঠাৎ উপহার দিতে গেলেন কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে এখান থেকে বদলি হতে হল। তিনি গুপ্ত সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে কি যেন বলে গেছেন। বদলির অবশ্য সময় হয়েছে আমার, কিন্তু গুপ্ত সাহেব ইচ্ছে করলে আমাকে এখানে আরও কিছুদিন রাখতে পারতেন। কিন্তু তোমার রত্নাদির জন্য সেটা আর হল না। আই হেট দ্যাট ওম্যান। উপহার দেওয়ার ছলে অপমান করেছেন আমাকে তিনি। এসব টাকার গরম; আর কিছু নয়।....."

সত্য কথাটা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না ডানার। বকুলবালা মানা করে গিয়েছিলেন, তাই চুপ করে থাকতে হল। রূপচাঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুচ্ছিল।

"এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত একটা। খাঁচাটা কোথায়?"

"ওই খাটের নীচে আছে।"

রূপচাঁদ খাঁচাটা বার করলেন।

"কি করবেন ওটা নিয়ে এখন? পাখিটা পাঠিয়েই দেব তাঁকে।"

"পাখির গলাটা মুচকে দেব। রক্তাক্ত মরা পাখিটা পাঠিয়ে দিও। বলে দিও, আমি স্বহস্তে ওর গলা মুচড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আই উইশ আই কুড রিং হার নেক টু।"

রূপচাঁদ সত্যিই খাঁচাটা খুলে খাঁচার ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন। ডানা বাধা দিল, তাঁর হাতটা ধরে বললে, "ছি ছি, কি করছেন আপনি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার?"

ডানার হাতের স্পর্শে সহসা অভিভূত হয়ে পড়লেন রূপচাঁদ। খাঁচার ভিতর থেকে হাতটা বার করে খাঁচাটা বন্ধ করে দিলেন।

"মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার। তুমিই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ।"

ডানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে। তার পর নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ নীচু করে কোলের উপর হাত দুটি রেখে এমন একটা মোহিনী ভঙ্গীতে বসে রইল যে, রূপচাঁদ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবার তার হাত দুটো ধরতে গেলেন। ধরেই ফেললেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমার উপর রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আমার বিদায়-মুহূর্তটা অন্তত মধুর করে দাও, সেইটুকুই অন্তত যথেষ্ট মনে করব আমি। তারই স্মৃতি শাশ্বত অমৃতের উৎস হয়ে থাকবে আমার জীবনে। রাগ করো না, সরে এস।"

ডানা হাতটা ছাড়িয়ে নিল বটে, কিন্তু আর কিছু করল না। উঠে দাঁড়াল না, বাইরে চলে গেল না, চাকরটাকেও ডাকল না! সেও কেমন যেন একটু সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। একটা সমর্থ পুরুষের এই আত্মনিবেদন সে যেন উপভোগই করছিল। সে আনতচক্ষে বসেই রইল।

রূপচাঁদ বলতে লাগলেন, "তুমি যখন নিতান্ত অসহায় পথের ধারে বসে ছিলে, তখন আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবারও ফিরে চাওনি। তুমি আনন্দমোহনের কবিতার খোরাক জুগিয়েছ, অমরেশবাবুর চাকরি করেছ, ওই লোফার সন্ন্যাসীটাকে পর্যন্ত আমল দিয়েছ,—বঞ্চিত করেছ কেবল আমাকে। বঞ্চিত হয়েই কি চলে যেতে হবে? একটুও দয়া করবে না? লোকে ভিক্ষুককেও একটা পয়সা দেয়। আমাকে কিছুই করতে দেবে না তুমি?"

ডানা এইবার যেন হঠাৎ সচেতন হল। বিপদ আসন্ন বুঝে দাঁড়িয়ে উঠল সে?

"আপনাকে তো অনেকবার বলেছি, আপনি যা চাইছেন তা দিতে পারব না। আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, ওসব নোংরামির মধ্যে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আপনি বাড়ি যান।"

"অনেকবার হতাশ হয়ে ফিরেছি, আজ আর ফিরব না। তুমি স্বেচ্ছায় যদি না দাও, জোর করে কেড়ে নেবার শক্তি আমার আছে।"

পর-মুহূর্তেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে ডানাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন তিনি। কি হত বলা যায় না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বল্লমহস্তে বকুলবালা প্রবেশ করলেন।

ডানা চীৎকার করছিল—"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন—"

রূপচাঁদ ছাড়তে চাইছিলেন না, কিন্তু মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে ছাড়তে হল; শুধু তাই নয়, পড়ে গেলেন তিনি। বল্লমের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে জামাকাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর।

বকুলবালার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ ওই হলদে পাখিটি। তিনি জানতেন, রূপচাঁদ বাইরে গেছেন, রাত্রে ফিরবেন না। রূপচাঁদের হুকুম অনুসারে পাখিটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাখিটার জন্যে এত মন-কেমন করতে লাগল যে, বল্লম আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। বল্লমটা এনেছিলেন আত্মরক্ষার্থে কিন্তু সেটা আর্তরক্ষার্থে কাজে লাগল। রূপচাঁদকে দেখে ক্ষেপে গেলেন বকুলবালা। ঈর্ষায় যে নারী একদিন বঁটি দিয়ে এক ছাগশিশুকে হত্যা করেছিল, সে-ই বহুদিন পরে আবির্ভূত হল তাঁর মধ্যে।

"তুমি! তুমি এখানে কেন? তুমি সদরে গিয়েছিলে না?"

রূপচাঁদ নিরুত্তর। বকুলবালা ডানার দিকে সপ্রশ্ন জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "ব্যাপার কি?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করুন। রাত-দুপুরে হঠাৎ এসে উনি যে কাণ্ড করবেন, তা আমি ভাবতেই পারিনি। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান, ছি-ছি-ছি-ছি!"

ডানা আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে ডাকল একবার, কিন্তু তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত রূপচাঁদ কোনও কৌশল করে আগে থাকতেই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। ডানা বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার পর এগিয়ে গেল খানিকটা, ঘরের ভিতর আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ঘরের ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। দ্রুতপদে ফিরে এসে আবার ঢুকল সে। যা দেখল, তা ভয়াবহ। বকুলবালা স্বামীর বুকের উপর বসে বাঁ হাতে তাঁর-চুলের মুঠি ধরে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছেন, আর্তনাদ করছেন রূপচাঁদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করবার শক্তি নেই।

"উঠুন, উঠুন—ওঁকে নিয়ে বাড়ি যান আপনি। ছি-ছি, কি করছেন?"

বকুলবালা কর্ণপাত করলেন না তার কথায়।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তা হলে।"

টর্চ এবং হাত-ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল ডানা। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সত্যি সত্যি থানায় খবর দেবার জন্যে সে বেরোয়নি, থানা যে কোথায় তাই সে জানত না, ভয় দেখিয়ে বকুলবালাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। হয়তো এতেই বকুলবালা নিরস্ত হবেন। কিন্তু হলেন কি-না তা দেখবার ধৈর্য তার আর ছিল না, সে কোথাও ছুটে পালাতে চাইছিল, কিন্তু কোথায় যাবে? সন্ন্যাসী কি ফিরেছেন? টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে সে সন্ন্যাসীর ঘরের দিকেই চলতে লাগল। গিয়ে দেখল, সন্ন্যাসী নেই। ঘরের দ্বার খোলা। হু-হু করে হাওয়া একটা বইছে চর থেকে। ডানা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর মনে পড়ল ভাস্করের কথা। রাত একটার পর সদরে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে, সে শুনেছিল। স্টেশনের দিকেই চলে গেল সে। মিনিট কুড়ি পরে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়ি যখন ছাড়ছে, তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী একটা তোরঙ্গ ঘাড়ে করে ওভারব্রিজে উঠছেন! এখনই সদরের দিক থেকে যে গাড়িটা এল, তাতেই এলেন না কি? সদরে কি জন্যে গিয়ে ছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। ডানার একবার ইচ্ছে হল, নেমে পড়ে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না।

ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। যে কোনও অবস্থাতেই মানুষের মন ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্মার জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েও নিতে হয়েছিল। আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গেও তার মন আপোস করে ফেললে। ট্রেনের কামরায় এক কোণে বসে বসে ক্রমশ বরং তার মনে হল যে, ঘটনাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রূপচাঁদবাবুর কাছ থেকে অন্যরকম আচরণ বরং অপ্রত্যাশিত হত। তাঁর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত চেহারাটা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটু দুঃখই হল ভদ্রলোকের জন্যে। বকুলবালার কাণ্ড দেখে সে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনো নারীর মধ্যে এ রকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে আর দেখেনি। হঠাৎ মনে হল, জোয়ান আব আর্ক হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আর একটা কথা হঠাৎ মনে হল তার। এই ঘটনাটা যদি না ঘটত, তা হলে এত শীঘ্র সে কি ভাস্করের কাছে যেত? যেত না। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব, তার শোভনতা বজায় রাখবার জন্যেই তাকে আরও কিছুদিন দেরি করতে হত। অশোভন আগ্রহ দেখিয়ে এর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করবার প্রবৃত্তি তার হত না। সে প্রবৃত্তি থাকলে ওই ডাকবাংলায় বসেই তো সে কথা শেষ করে দিতে পারত। তার নিজের কোনও অভিভাবক নেই, ভাস্করের আগ্রহ যে অটুট আছে তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তবু সে শেষ কথা দেয়নি হয়তো শালীনতার জন্যে কিংবা হয়তো ভাস্করকে আর একটু ভাল করে চেনবার জন্যে, কিংবা—(এ কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে)—কিংবা হয়তো তার গোপন নারী-সত্তা কামনা করছিল, ও আর একটু খোশামোদ করুক, অত সহজে ধরা দেব কেন! কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা ঘটাতে ব্যবধানের প্রাচীরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, শালীনতার সূক্ষ্ম ওড়নাটা উড়ে গেল, তার নিরাশ্রয় মন যে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল, সেই দিকেই অতি দ্রুতবেগে ছুটতে হল তাকে। সন্ন্যাসী যদি বাসায় থাকতেন, তা হলে হয়তো আজই এমন ভাবেই ছুটতে হত না, কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। এটা বিধাতার ইঙ্গিত, না, আকস্মিক যোগাযোগ একটা। তোরঙ্গ-কাঁধে সন্ন্যাসীর ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সদরে কেন গিয়েছিলেন উনি? তোরঙ্গ এনেছেন কেন? উঞ্ছবৃত্তিধারীর তোরঙ্গের দরকার কি? ফিরে এসে খোঁজ করতে হবে। চলে যাওয়ার আয়োজন করছেন না কি? সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে কি না সেটাও জানতে হবে। ট্রেন হু-হু করে চলেছে, গাড়ির কামরায় কেউ নেই, হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা, নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে রইল ডানা....হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল তার। বিপদে পড়ে কবির কাছে তো সে যেতে পারত। গেল না কেন? যাবার কথা মনেই হয়নি। এর কারণ সম্ভবত মন্দাকিনী। এই রাত্রে সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলা যেত না, বললে কেলেঙ্কারির ভয় ছিল। রূপচাঁদ আনন্দমোহনের বন্ধু একজন। আর একটা কারণও ছিল বোধ হয়। কবি বলেছিলেন, যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে। যে কবিতাটা দিয়েছিলেন তাতেও ওই ধরনের কথা ছিল। তাঁর কাছে সে এখন অলীক স্বপ্নমাত্র। এ লোকের কাছে বাস্তবের সমস্যা নিয়ে যাওয়া অর্থহীন; নানারকম ভাবতে ভাবতে চলেছিল ডানা। মনে হচ্ছিল, সে যেন নতুন কোনও দেশে চলেছে, পুরাতন বন্ধু ভাস্করের কাছে নয়।

।। কুড়ি ।।

ডানা একটা রিক্‌শায় চেপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পৌঁছিল, তখনও ফরসা হয়নি। রিক্‌শাওয়ালা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ডানা দেখল, গেট ভিতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে, বাড়িটাও গেট থেকে বেশ একটু দূরে। গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে কেউ যে শুনতে পাবে তা মনে হয় না। কাছে পিঠে কোনও লোক বা চাকরও দেখা গেল না। ডানা গেটের সামনে টর্চ জ্বেলে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল, ভিতরে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা! পাওয়া গেল না। বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, লোকজন কেউ নেই। এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ডানা তখন কাছে-পিঠে অন্য কোনো আশ্রয়ের সন্ধান করবার জন্যে এগিয়ে গেল। কাছেই আর একটা বাড়ি ছিল রাস্তার ধারে। সেইটেরই বারান্দার উপর গিয়ে বসল সে। এ বাড়িতেও লোকজনের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। যদি কেউ থাকে, ঘুমুচ্ছে তারা নিশ্চয়। ডানা খানিকক্ষণ বসেই বুঝতে পারল, এখানে বসে থাকা যাবে না। ভয়ঙ্কর মশা। উঠে দাঁড়াল এবং পথেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছ, দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে, কেউ আবার কথাও কইছে পেচকের ভাষায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছের উপর থেকে ফিঙেরও মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। একটা গাছের উপর খুব আস্তে একটা কোকিল 'কু-উ' করে একবার ডেকেই থেমে গেল। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল ডানার—'দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান কুহরে'। এর পরই কিন্তু কাব্যলোক থেকে সহসা তার পতন হল। সামনেই একদল মহিষ! ধীর মন্থর গতিতে চলেছে—একটির পর আর একটি। প্রায় নিঃশব্দেই, পায়ের খুরের শব্দ শুধু। সর্বশেষ মহিষটির পিঠের উপর বসে আছে রাখালটি, হাতে তার প্রকাণ্ড একটা লাঠি। ডানা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিষের দল যখন চলে গেল, তখন আবার সে পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর—এক মুরগীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল রাস্তার ধারের একটা ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা। মনে হল মুরগীটা যেন তাকে আর অগ্রসর হতে মানা করছে, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে কোথাও। মনে পড়ল, অনেক দিন রাত্রি দশটার পর সে একবার পথ ভুলে একটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্কের প্রহরী চিৎকার করে উঠছিল—হুকুম দার! (Who comes there)? এই মুরগীও যেন বলছে—হুকুম দার! ডানা সত্যিই ইতস্তত করতে লাগল, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না! পরমুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠল, তার এই ইতস্তত ভাব দেখে একযোগে হেসে উঠল যেন একদল তরুণী অন্ধকার যবনিকার আড়াল থেকে। ডানার চোখে পড়ল পূর্বাকাশে ঊষার অরুণিমা আভাসিত হয়েছে। আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে হল না তার। সে ফিরতে লাগল। আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলার কাছে ফিরে এল, তখন বেশ আলো হয়েছে। গেট কিন্তু তখনও খোলেনি। যে বারান্দার উপর প্রথমে বসে ছিল, সেখানে গিয়েই বসল আবার। অনেকক্ষণ বসেই রইল। মনে হতে লাগল, এভাবে কোনও খবর না দিয়ে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। এও হতে পারে যে, ভাস্কর এখানে নেই, কোনও জরুরী দরকারে আবার বেরুতে হয়েছে তাকে রাত্রে। এইসব ভাবছে, এমন সময় এক কাণ্ড হল। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে ভাস্করের গেট খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কালো, কিন্তু সুশ্রী। পিঠের লম্বা বেণী দুলছে। ডানার হঠাৎ একটা উপমা মনে হল—'কালভুজঙ্গিনী'। মেয়েটি

তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ের জামাও ছাপা সিল্কের। খুব ডগডগে রঙ। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ, যেন সমস্ত রাত ঘুমোয়নি। আরও যখন কাছে এল, তখন ডানাকে উঠে দাঁড়াতে হল। ওর বাড়ির বারান্দাতেই সে বসে আছে নাকি? দেখা গেল, সত্যিই তাই। মেয়েটি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডানার দিকে চাইতেই ডানা হেসে হাত তুলে নমস্কার করলে।

মেয়েটি উত্তর দিলে ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই আলাপ হল।

"গুড মর্নিং। কোনো দরকার আছে কি?"

"আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, "আমি নার্স। এইখানেই থাকি।"

"এ বাড়ি আপনার?"

"হ্যাঁ। ভাড়া। আমি বিদেশিনী, এখানে প্র্যাকটিস করবার জন্যে এসেছি।"

"ও! আপনাকে ওই বাড়ির গেট থেকে বেরুতে দেখলাম। মিস্টার বসু কি অসুস্থ না কি?"

আবার মুচকি হাসল মেয়েটি।

"অসুস্থ হয়েই কাল রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু নয়। একটু বেশি 'ড্রিংক' করেছিলেন। কথাটা বলা হয়তো উচিত হল না। কথাটা আনুগ্রহ করে গোপন রাখবেন। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি?"

"আমি ওঁর পুরাতন বান্ধবী। দেখা করতে এসেছি।"

"আই সি। উনি ঘুমচ্ছেন এখন। আপনি ভিতরে গিয়ে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে পারেন। এর আগে এসেছিলেন কখনও?"

"একবার এসেছিলাম।"

"আচ্ছা, এক্সকিইজ মি।"

আর কোনো কথা না বলে মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। মনে হল, কথার ধরনে এবার যেন একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। যে ভেলাটি অবলম্বন করে সে ভাসছিল, সেটাও ডুবে গেল নাকি?

ড্রইং-রুমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ডানাকে। চাপরাসীর মারফৎ নামটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর বসু বেরিয়ে এলেন।

"এ কি। ডানা! এ যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য! এখন কি করে এলে?"

"ট্রেনে।"

এর পর কি বলবে ডানা ভেবে পেল না, চুপ করে গেল। এমন অসময়ে কোনও খবর না দিয়ে চলে আসার সত্য হেতুটা অকপটে বিবৃত করা সমীচীন হবে বলে তার মনে হল না। কিন্তু কি বলবে তাও সে ভেবে আসেনি। চুপ করেই রইল তাই।

"ট্রেনে? তার মানে রাত আড়াইটের সময় এখানে পৌঁছেছ। ব্যাপার কি?"

"কিছুই নয়, এমনি। ইচ্ছে হল চলে এলাম।"

"বেশ করেছ। চল, চা খাওয়া যাক। আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে। একটা গ্রামে দাঙ্গা হয়ে গেছে।"

এবার ডানা যেন একটু আত্মসচেতন হল। কেতা-দুরস্ত ভাষায় বললে, "আমি আসাতে তোমার কর্তব্যে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না আশাকরি।"

"বাধা হবে কেন? তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার। আমার নীরস কর্তব্যে সরস হয়ে উঠবে তা হলে। আর কালকের যে আলোচনাটা মুলতুবি আছে, সেটাও হয়তো সেরে ফেলা যাবে। আমার কাজ খুব বেশি নেই, শুধু একবার যাওয়া দরকার। পুলিশ যা করবার করে ফেলেছে এতক্ষণ। এস, চা-পর্বটা সেরে ফেলা যাক। চান করবে না কি?"

"কাপড়চোপড় তো আনিনি। হাত মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।"

"এস তা হলে। আমিও কামিয়ে নিই।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় একটা ক্যাম্পচেয়ারে আনত-নয়নে বসে ছিল ডানা। ভাস্কর বসু পাশেই আর একটা ক্যাম্পচেয়ারে ঠেস দিয়ে কথা বলে চলেছিলেন। তাঁর কথার ধরনে যে সরল আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল, তা ডানার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল কি না তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। ডানা নির্বাক হয়ে আনত-নয়নে চুপ করে বসে ছিল। বুঝতে পারছিলেন না বলে ভাস্করের বক্তব্য যেন আরও আবেগময় হয়ে উঠেছিল।

ভাস্কর বলছিলেন, "তোমাকে বিয়ে করব বলেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা করে আছি। কেন জানি না, আমার বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। বিয়ে করবার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব—এ কল্পনা কখনও করিনি। তুমি কোনও কথা বলছ না যে? যদি কিছু জানতে চাও আমার বিষয়ে, বল সেটা।"

ডানা হেসে বললে, "যা জানতে ইচ্ছে করছে তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হচ্ছে যে! যাদের বিয়ে করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ বা পাচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

ভাস্করের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা লাগল।

"তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বর্মা থেকে চলে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বর্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তার পর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তার পর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক, দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে, সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্ততও করিনি কখনও—হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সাময়িক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও অসুখও আমার হয়নি।"

ডানার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

ভাস্কর আবার বললেন, "ওসব বিষয়ে আমার কুসংস্কার নেই। মানে, তোমারও জীবনে যদি ওসব ঘটে থাকে সেটাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই আমি মেনে নেব। শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমি নই।"

ডানা তবু নীরবে বসে রইল। একটা কথাই তার মনে হতে লাগল, রূপচাঁদই নবরূপে দেখা দিয়েছে আবার।

"একেবারে চুপ করে গেলে যে? কোনও কথাই বলছ না?"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "বলবার আর কি আছে! চল, এবার ওঠা যাক।"

"আমার প্রস্তাবটা তা হল—"

"পরে জানাব। এখন চল। এখনি ট্রেন আছে একটা, আমি চলে যাই। তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও।"

ডানার মুখের দিকে চেয়ে ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।

।। একুশ ।।

ডানা একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় বসে ছিল। ভাবছিল, যা সে এতদিন কামনা করছিল তার সবই হল, রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে সরে যাচ্ছেন, কবির কল্পনাস্রোত অন্য খাতে বইছে—তাকে নিয়ে তিনি আর কবিতা লিখবেন না, তার কলেজের বন্ধু ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধাসাধি করছে; কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, তার জীবনের সমস্যার সমাধান হল কই? কিছুই তো হল না। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, আর কেউ না থাক্, সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন। সন্ন্যাসীর নানা কথাই ঘুরে ফিরে জাগতে লাগল মনের ভিতর। মেঘের মতো প্রসারিত হতে লাগল নানা আকারে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। দেখল, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ডাকে উঠে বসল সে।

"রূপচাঁদবাবু আর তাঁর স্ত্রী কতক্ষণ ছিলেন কাল?"

"তা তো জানি না মা। আমি এসে দেখলাম, কেউ নেই। পাখিটাও নিয়ে গেছেন।"

"আজ কেউ এসেছিল?"

"একটু আগে ওই গঙ্গার ধারের বাবাজী এসেছিলেন। তিনি একটা বাক্স আর চিঠি রেখে গেছেন।"

"কি বাক্স?"

"ঘরে রেখে দিয়েছি। খুব ভারী। নতুন তোরঙ্গ একটা।"

একটি খামের চিঠি সে ডানার হাতে দিল। চিঠিটা হাতে করে ডানা ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেল তোরঙ্গটি। এইটেই তো কাঁধে করে কাল আসছিলেন তিনি। চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

শ্রীমতী ডানা,

আমি এবার চললাম। আর সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার কিছু সম্পত্তি এখানে ছিল, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ হয়ে গেল সব। তুমি বিপন্ন মুখে বার বার আমার কাছে আসতে সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, নিজেই অসহায়, তোমাকে কি সাহায্য করব তা ভেবেই পেতাম না। অথচ কিছু করবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তুমি একদিন বলেছিলে যে,

কিছু টাকা পেলে নাকি তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই দিনই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু দেব বললেই চট করে দেওয়া যায় না। অনেক দিন ধরে এর জন্যে আয়োজন করতে হয়েছে। একটা সামান্য শাবল যোগাড় করতেই বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। যে ঘরটায় তুমি আছো, আর এই ভাঙা ঘরটা যেখানে আমি আছি—এ দুটোই আমার সম্পত্তি। এর সংলগ্ন কিছু জমিও। ঠিক কত জমি আমার জানা নেই, তুমি পুরাতন দলিল খোঁজ করলেই জানতে পারবে। আমি সদরে গিয়ে আমার এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এলাম। পোস্ট-আপিসের টাকাগুলোও তুমি পাবে। এই তোরঙ্গের ভিতর সমস্ত দলিল আছে। আমি সদরের উকিল হরনাথ মল্লিককে আমার 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দিয়ে এসেছি। তিনি রেজেস্ট্রি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার করে দেবেন। এ ছাড়াও আরও কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মায়ের কাছ থেকে একখান চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল যে, গঙ্গার ধারের এই পড়ো বাড়িটার মেঝেতে এক ঘড়া মোহর আছে। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এটা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। মোহর আছে কি না দেখবার জন্যেই শাবল সংগ্রহ করতে হল আমাকে। চিঠির নির্দেশ অনুসারে খুঁড়ে দেখলাম, সত্যিই আছে। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়ায় দু-হাজার মোহর। মোহরগুলো তোমাকে দেবার জন্যে একটা মজবুত তোরঙ্গ কিনতে হল। ওর ভিতর সমস্ত মোহরগুলো, আমার পোস্ট-আপিসের পাস-বই এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও চিঠিপত্র সব রইল। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গলকামনা করে আমি বিদায় নিলাম। ভগবান তোমাকে সুখী করুন। ইতি—

শ্রীবিশ্বপতি ভট্টাচার্য

ডানা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

।। বাইশ ।।

তিন মাস কেটে গেছে। ঘনঘোর হয়ে নেমেছে বর্ষা। শ্রাবণের নিবিড় সমারোহে আকাশ বাতাস থমথম করছে। নদী কূলে-কূলে ভরা। সবুজের বান ডেকেছে বনে বনে। চাতক পাখি ডাকছে একটা। সমস্ত সকাল ধরে ঘুরে ফিরে ডাকছে, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে, কখনও কাছে কখনও দূরে। বিদেশী পাখি, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। কবি পাখিটাকে নিয়েই মেতে আছেন সারা সকাল। দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে তাঁর সাধ যেন আর মিটছে না। কালো পাখি, মাথায় ঝুঁটি, ল্যাজটি লম্বা, ল্যাজের ডগায় সাদা সাদা বিন্দু, বুকটি সাদা—এক কথায় অপরূপ। পাখিটা যখন দূরবীনের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেল তখন কবি কবিতা লিখতে বসলেন। অনেক ভেবে ভেবে আরম্ভ করলেন—

নব জলধর হতে আসিলে কিনা নামিয়া
ওগো ও চাতক পাখি, ওগো মেঘবরণী,
ছায়া-মেঘনার স্রোতে ভাসাইয়া তরণী
একটু না থামিয়া

গাঢ় সবুজের স্রোতে খুঁজিতেছ সরণী
কিছুই না মনিয়া
গাছে গাছে দূরে কাছে কার অভিসারে গো
বল না বাখানিয়া
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো
ডাকিছে কাহারে বারে বারে গো।

বাধা পড়ল। পিওন এসে দেখা দিল। একটা খামের উপর অমরেশবাবুর হস্তাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কবি। তিনি কাশ্মীর থেকে ইউরোপ চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনও চিঠিই লেখেননি ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললেন। ছোট চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক কিছু দেখে দেশে ফিরেছি। এখন আমি লছমনঝোলার একটা ধরমশালায়। বর্ষার সময় এ জায়গা মনোরম নয়। আমি এখানে এসেছি ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের (Verditer Flycatcher) বাসার সন্ধানে। আর একটু আগে এসে পৌঁছতে পারলে ভাল হত। মে-জুনেই ওদের বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লন্ডনে একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। পাহাড়ী পাখির বিষয়ে সে গবেষণা করছে। তারই অনুরোধে ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের বাসা আর ডিমের সন্ধান করছি এখানে। যদি পাঠাতে পারি খুব খুশী হবেন তিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি যে রকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন তা অবর্ণনীয়। তিনি সাহায্য না করলে আমরা সমুদ্রের নানা রকম পাখি দেখতেই পেতাম না। অনেক নোট্স আর ফোটো এনেছি। সব দেখাব। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে কাল। পাহাড়ে কিছুদূর উঠে একটা ঝরণার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ডানাকে দেখতে পেলাম। ময়লা একটা গেরুয়া কাপড় পরে ঝরণা থেকে জল তুলছে। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারিনি আমি প্রথমে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ডানাই। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি, তুমি এখানে? সে মৃদু হেসে বললে, আমি আর চাকরি করতে পারলাম না। আনন্দবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ? বললে, এমনিই আছি। বেশ আনন্দেই আছি। নমস্কার। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জলের ছোট কলসীটি তুলে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এসে খবরটা রত্নাকে বললাম। লোকজন পাঠিয়ে খোঁজও করলাম। কিন্তু আর তাকে ধরতে পারিনি। আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানাবেন। আমরা বোধ হয় মাসখানেক পরে ফিরব। নমস্কার জানবেন। ঠিকানা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। পত্রপাঠমাত্র উত্তর দেবেন। ইতি—

আপনাদের
অমরেশ

কবি পত্রপাঠমাত্রই উত্তর লিখতে বসে গেলেন।—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আপনাদের কোনও খবর না পেয়ে খুব ভাবছিলাম। শ্রীমতী ডানার আচরণ সত্যই খুব বিস্ময়কর। সে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে আপনার পক্ষী-নিবাসের সমস্ত পাখিগুলোকেও ছেড়ে

দিয়ে গেছে। সে চলে যাওয়ার পরদিন তার চাকরটা এসে খবর দিলে যে, মাইজি কাল রাত্রে ফেরেননি, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। রাত্রে তাঁর জন্যে রান্না করে রেখেছিলাম, সে খাবারটা নষ্ট হয়েছে। আবার রাঁধব কি? আমি গিয়ে টেবিলের উপর ছোট একটা চিঠি পেলাম। সেটা হুবহু নকল করে দিচ্ছি।—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এখানে পড়ো বাড়িতে যে সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁর চিঠিটা পড়ে দেখলে তোরঙ্গ-রহস্য বুঝতে পারবেন। আমি আর চাকরি করব না, আমিও চললুম এখান থেকে। যাওয়ার আগে পক্ষী-নিবাসের পাখিগুলোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এ অধিকার রত্নাদি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যে অর্থ আমাকে দিয়ে গেছেন, তা আমি নিলাম না। আমার অনুরোধ—আপনি, অমরেশবাবু আর রূপচাঁদবাবু টাকাটা ভাগ করে নিয়ে নেবেন। আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিকবার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের আকাশে নাকি আরও ভালভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই। তাই টাকাগুলো আপনাদের তিনজনকেই দিয়ে দিলাম। বিশ্বপতি ভট্টাচার্য যে সহায়রাম ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বাড়ি আর জমির যে কোনও সুব্যবস্থা করবার অধিকার আমি অমরেশবাবুকে দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তার স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে। আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। একটি অনুরোধ, আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কিংবা পুলিশে খবর দেবেন না। ঘরের চাবি চাকরটার কাছে রইল। টাকাকড়ির ব্যাপার তার কাছ থেকে গোপন রেখেছি। আমার প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি আপনাদের ডানা।"

ডানার চিঠিব সঙ্গে সন্ন্যাসীর চিঠিও ছিল। সেটা না টুকে এমনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ডাকের বেশি সময় নেই। টুকতে গেলে ডাক পাব না। ওটা হারাবেন না যেন। তোরঙ্গটা তুলে নিজের কাছে এনেছি। মোহরগুলো বড় আয়রন সেফে রেখেছি। আপনি এলে তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এখানকার অন্যান্য খবর সব ভাল। খাজনা ভালই আদায় হয়েছে। গ্রামসংস্কারের কাজে লেগেছি। সেটাও ভাল চলেছে। আপনারা উভয়ে আমার নমস্কার জানবেন।

ইতি—

প্রীতিবদ্ধ
আনন্দমোহন

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তার পর তিনি কবিতা লিখলেন—

কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বহ্নিনিশান উড়িয়েছিল যে
আজকে দেখি শ্রাবণ-মেঘে
বৃষ্টি ঝরায় সে।

বৈশাখেতে দোয়েল শ্যামা
বনে বনে যে সুর সেধেছিল

টুনটুনি আর বুলবুলিরা
যে নীড় বেঁধেছিল
চাতক পাখির কণ্ঠে ওগো
তাই কি আজি জল-তরঙ্গে বাজে
ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের
নিবিড়তার মাঝে।

একই বাণী, ওগো রসিক,
বলছ তুমি নানান সুরে সুরে,
সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি
রোদ উঠেছে দূরে।
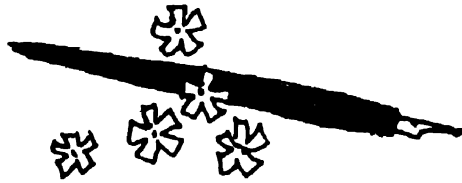
পিতামহ

।। এক ।।

যে চন্দনচর্চিত নীলাকাশতলে কল্পনার সহিত চার্বাকের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল সে চন্দনচর্চিত নীলাকাশ চিরকালের মতো হারাইয়া গিয়াছে। সেদিন জ্যোৎস্না-মণ্ডিত লঘু মেঘখণ্ডগুলিকে মেঘ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য নিপুণ হস্ত আকাশ-প্রাঙ্গণে চন্দনের আলপনা আঁকিয়া দিয়াছে। যে কুঞ্জে তাহাদের আলাপ হইয়াছিল তাহাও মনে হইতেছিল যেন পারিজাতকুঞ্জ। মর্ত্যলোকেই সেদিন সহসা যেন অমর্ত্যলোকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। চার্বাক নিজেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল। তাহার বারম্বার মনে হইতেছিল যে রূপসী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছে সে মানবী তো নিশ্চয়ই—স্বপ্ন মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে—এ জাতীয় কবিত্বের প্রশ্রয় আর যেই দিক চার্বাক দিবে না—কিন্তু আজ সমস্ত প্রকৃতিই এমন অপ্রকৃতিস্থ কেন, অতি সাধারণ ঝুমকো লতাকেই পারিজাত বলিয়া মনে হইবার কারণ কী। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতেই চার্বাক নির্জন প্রান্তরে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ভাবিতেছিল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহেশ্বরকে লইয়া কত অদ্ভুত জল্পনা যে কত লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক কার্যেরই সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য কেহই সচেষ্ট নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আজগুবি একটা জল্পনার উপর চক্ষু বুজিয়া নির্ভর করিবার জন্যই সকলে উন্মুখ....তাহার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া সহসা এই তন্বী রূপসী কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বানও করিল। তাহার পর হইতেই যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপার্থিব মনে হইতেছে ইহা বড়ই বিস্ময়কর।

"আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?"

বিস্মিত চার্বাক প্রশ্ন করিয়া কল্পনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমি? কই না!"

কল্পনার অধরের আকম্পনে যাহা সূচিত হইল তাহা ব্যঙ্গ না আমন্ত্রণ তাহা চার্বাক ঠিক বুঝিতে পারিল না।

"মনে হল আপনি যেন ডাকলেন আমাকে।"

"ও, তাই না কি! তাহলে আসুন একটু আলাপ করা যাক।"

"আলাপ? ও, আচ্ছা, বেশ তো।"

চার্বাকের মুখে ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখিয়া কল্পনার অধরপ্রান্তে অতি মধুর একটি হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

"আপনার যদি অবসর না থাকে তাহলে—"

"না, না, অবসর আছে। আমি কেবল একটা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্যে নির্জনে এসেছিলাম। তা সে পরে হলেও ক্ষতি নেই।"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমিও আপনার চিন্তার অংশ নিতে পারি। নিঃশব্দ চিন্তার চেয়ে সশব্দ চিন্তা অনেক সময় বেশী ফলপ্রদ হয়। দুজনে মিলে যদি চিন্তার জট ছাড়াতে থাকি তাহলে—"

কল্পনার ইন্দিবর নয়নের দিকে চাহিয়া চার্বাক বলিল, "সুবিধা হয়, যদি দুজনেরই চিন্তার

পদ্ধতি একরকম হয়। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমাদের ধারণা পিতামহই সৃষ্টিকর্তা—"

কল্পনার অধরে আবার হাসি ফুটিল।

"আমার ধারণা তা নয়। আমার ধারণা পিতামহকে খতম করতে না পারলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না। পিতামহ আছেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে হবে।"

"আছেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"কোথায়।"

"আপনার মনে, আমার মনে। তাছাড়া সশরীরেও আছেন চতুর্মুখ। আমার জীবনের একটা লক্ষ্য চতুর্মুখকে সম্পূর্ণ নির্মুখ করা, তাঁকে ধ্বংস করতে না পারলে জগতের মঙ্গল নেই।"

চার্বাক রোমাঞ্চিত হইল। এই রূপসীর সহিত এমন মনের মিল হইয়া যাইবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। নারীদের সহিত প্রায়শই মতের মিল হয় না, প্রয়োজনের খাতিরে ভান করিতে হয় যে মতের মিল হইয়াছে ইহাই চার্বাকের ধারণা, এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটাতে, বিশেষত নারীটি রূপসী হওয়াতে, চার্বাকের স্বভাবসুলভ অবিশ্বাস পুলক-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চার্বাক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা প্রকৃতই চার্বাকীয়। জ্যোৎস্না মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে, ঝুমকো লতাকে পারিজাত বলিয়া ভ্রম হইতেছে, মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোকের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপসী তরুণীটিও অপরূপা, এই লক্ষণ-পরম্পরা প্রণিধান করিয়া চার্বাকের মনে হইল সহসা আত্মসমর্পণ করা অনুচিত হইবে। অবিশ্বাস-নিকষে যাচাই না করিলে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। রমণীর সহিত কৌশলে আলাপ করিতে হইবে, একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলে চলিবে না।

"আপনার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে চমকিত হয়েছি। আপনার এই বিদ্রোহ-বলিষ্ঠ ধারণার সম্পূর্ণ তাৎপর্য কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি না। পিতামহের শারীরিক অস্তিত্বও আপনি কল্পনা করেন?"

"কল্পনা করি না, বিশ্বাস করি, জানি।"

"জানেন? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?"

"এই মুহূর্তে।"

চার্বাকের ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া গেল। কল্পনার চক্ষুর্দ্বয়ে কৌতুক নাচিতে লাগিল।

"চক্ষু বিস্ফারিত করলে পিতামহকে দেখতে পাবেন না। চক্ষু বুজুন। বুজলেই দেখবেন পিতামহ চতুর্মুখ আপনার মানসপটে ফুটে উঠেছেন।"

"কিন্তু তার দ্বারাই কি শারীরিক অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা সংশয় অপনোদন করে থাকি। অনেক পণ্ডিত বলেন, মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পিতামহকে দেখে যদি আপনার তৃপ্তি না হয় অন্য কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে চান বলুন? তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে চান? তাঁর বাক্য শ্রবণ করলে কি আপনার প্রত্যয় হবে? না, তাঁকে স্পর্শ করতে আপনি উৎসুক? তাঁকে আঘ্রাণও করা যেতে পারে, এমন কি রসনা দ্বারা—"

চার্বাক বলিলেন—"আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি, বিস্তারিত করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার শারীরিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সেইরূপ নিঃসংশয় হতে চাই।"

আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি কি নিঃসংশয়?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটুকু নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব ততটুকু নিঃসংশয় বই কি। সন্দেহ নিরসনের যে নিরিন্দ্রিয় উপায় ঋষিরা বর্ণনা করে থাকেন, তা আয়ত্ত করবার চেষ্টা আমি কখনও করিনি। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই আমি চরম বলে মানব। তবে মন নামক যে ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আপনি এখনই করলেন, তার একক সাক্ষ্যকে গ্রাহ্য করা বিপজ্জনক বলেই তা গ্রাহ্য আমি করব না। কারণ আমি জানি মন কল্পনাপ্রবণ, এমন অনেক অলীক বস্তু সে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করে—যার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং তার উপলব্ধি অন্তত আর একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। আপনাকে যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছি, পিতামহকে যদি তেমনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পারি তবেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করব।"

কল্পনার মুখ-মণ্ডলে যে জ্যোতি প্রতিভাত হইল তাহার উৎস যে গভীর আত্মপ্রত্যয় তাহাতে চার্বাকের কোনও সন্দেহ রহিল না। হর্ষ-কণ্টকিত হইয়া সে প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করিতে লাগিল—এই সহসা-আবির্ভূতা সৌন্দর্য-প্রতিমা হয়তো সত্যই তাহার সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবে। বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সে কল্পনার অপরূপ মুখ-শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। কল্পনা বলিল—"আপনি পিতামহকে চাক্ষুষই প্রতক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়া করতে হবে। আর একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে আমাকে।"

"কি প্রক্রিয়া? কি প্রতিশ্রুতি? বলুন। যদি অসম্ভব না হয়—"

"মোটেই অসম্ভব নয়। প্রক্রিয়াটি অতীব সহজ। আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুতে হবে, তারপর চোখ বুজতে হবে। আমি যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ আপনি চোখ খুলতে পাবেন না। আমি আপনাকে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যাব। ব্রহ্মালোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে আমি আপনাকে চোখ খুলতে বলব, তখন আপনি পিতামহ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। হয়তো তাঁর কথাও শুনতে পাবেন।"

যুবতীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন প্রান্তরে শয়ন করিতে চার্বাকের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহার যুক্তিবাদী মন প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—"এরকম করবার অর্থ কি?"

"অর্থ খুবই প্রাঞ্জল। সত্যকে সহজে পাওয়া যায় না। নানাবিধ প্রক্রিয়ার জটিল পথে ভ্রমণ করে তবে সত্যের সমীপবর্তী হতে হয়। কেউ যোগাসনে বসে প্রাণায়াম করেন, কেউ বিজ্ঞানাগারে বসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু লগ্ন করে বসে থাকেন, রসায়ন শাস্ত্রের গভীর অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েন কেউ বা। সত্যের সন্ধানে বহু জ্ঞানী বহু প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনাকেও হতে হবে। আমি যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম তা কঠিনও নয়—"

"কঠিন তো নয়ই, বরং কোমল। হয় তো অতি কোমল, সেই জন্য আশঙ্কা হচ্ছে হয় তো অভিভূত হয়ে পড়ব।"

"তাতে ক্ষতি কি?"

"অভিভূত চেতনা দিয়ে কি সত্যকে ঠিক মতো দেখতে পাব?"

"অভিভূত না হলে সত্যকে দেখাই যায় না। একটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই তো লোকে সত্যের সন্ধান করে এবং সেই ভাবের আলোকেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। যাঁরা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে দেখতে চান তাঁরাও 'আমি সর্ব সংস্কারমুক্ত' এই সংস্কারের অধীনতা স্বীকার করেন, যদিও সব সময়ে সেটা বুঝতে পারেন না। সুতরাং অভিভূত হতে ভয় পাবেন না, বরং কামনা করুন যাতে অভিভূত হতে পারেন—"

চার্বাক তখন অনুভব করিল যে তরুণীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিবার পূর্বেই সে অভিভূত হইয়াছে। ইহাও সে বুঝিতে পারিল যে এই মায়াবিনী তরুণীর সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া কোনো লাভ নাই। ইহার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে পিতামহের সাক্ষাৎ মিলিবে এ বিশ্বাস চার্বাকের ছিল না, কিন্তু ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে যে ক্রোড়েই মস্তক ন্যস্ত হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল। চার্বাকীয় নীতি অনুসারে সুতরাং সে আর অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

"বেশ, তবে তাই হোক। আপনি বসুন।"

"একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে।"

"কি বলুন—"

"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মতো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়—"

"কিন্তু আমি জানি অবিশ্বাসটাই আলো। অবিশ্বাসের আলো দিয়েই সত্যের সত্যতা দেখা যায়—"

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। আলো দিয়ে সব জিনিস দেখাই যায় না—"

"যেমন?"

"অন্ধকার।"

কল্পনার বিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত হইল। চার্বাকের দিকে চাহিয়া গ্রীবাভঙ্গী করত সে প্রশ্ন করিল—"আমাকেও কি আপনি অবিশ্বাস করছেন?"

"মোটেই না।"

"তবে যা বলছি তা করুন। পিতামহকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবেন এই আকাঙ্ক্ষা আপনার সর্ববিধ অবিশ্বাসকে দূর করুক। আপনি বিশ্বাস করুন যে পিতামহ আছেন, তাঁকে আপনি দেখতে পাবেন। চোখ খুলে না রাখলে দেখতে পাবেন কি করে? বিশ্বাসই আমাদের চক্ষু। বাইরের চক্ষু বন্ধ করে সেই চক্ষু খুলে রাখুন—"

কল্পনার দিকে চাহিয়া চার্বাকের সর্বাঙ্গ আবার রোমাঞ্চিত হইল, সে যেন অনুভব করিল যে ফল যাহাই হউক আপাতত এই মনোরমার নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

"বেশ তাই হবে। আমি মনে কোনও অবিশ্বাস রাখব না। কিন্তু একটা কথা, সত্যই পিতামহ যদি থাকেন তাঁকে ধ্বংস করার সার্থকতা কি—আর কি করেই বা তা সম্ভব হতে পারে?"

"খুবই সঙ্গত প্রশ্ন করেছেন আপনি এবার। পিতামহকে ধ্বংস করা প্রয়োজন, কারণ তাঁকে ধ্বংস না করলে তাঁর নবতম সৃষ্টি আমাদেরই ধ্বংস করে ফেলবে। তিনি এবার সৃষ্টি করছেন মারণ-অস্ত্র। সে অস্ত্র এমনই মারাত্মক যে তার সামান্যতম প্রহারে নিখিল বিশ্ব লোপ পেয়ে যাবে।"

"তাই না কি!"

"আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা—সে অস্ত্র সশরীরে কোথাও বর্তমান নেই অর্থাৎ তা বস্তু নয়। পিতামহের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ক্ষুদ্রতম ভাবরূপে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করছে তাঁর অবচেতন লোকে, এখনও তা অমূর্ত, কিন্তু যে মুহূর্তে তা মূর্ত হবে সেই মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু। সেই জন্যই পিতামহকে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করা প্রয়োজন।"

চার্বাক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার বিস্ময় শুধু যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহা নয়, তাহা আর বিস্ময় ছিল না, তাহা অবিশ্বাস আতঙ্ক প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অপরূপ একটা উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তরতম সত্তা এই পরম উপলব্ধিকে প্রশ্ন দ্বারা বিক্ষত করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু চার্বাকের চার্বাকীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় সে প্রশ্ন করিল—"এই অদ্ভুত খবর আপনি পেলেন কি করে?"

"তা যদি বলতে পারতাম, অর্থাৎ তা যদি বর্ণনীয় হত তা'হলে এত ভণিতা করতাম না, বলে ফেলতাম। এই অদ্ভুত খবর আমি যে উপায়ে পেয়েছি আপনাকেও ঠিক সেই উপায়েই পেতে হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে হবে—"

"আপনি কার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন জানতে পারি কি?"

"জানাতে আমার আপত্তি নেই। তিনি একজন পুরুষ, পুরুষ পরম—"

"কি করে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন?"

"আপনি যেভাবে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেদিনও জ্যোৎস্না এমনই মনোহারিণী ছিল, সেদিনও আকাশ-পটে ঠিক এমনই সমারোহ ছিল শুভ্র মেঘমালার। আমিও সেদিন ঠিক আপনারই মতো প্রশ্নাকুল চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমনই এক নির্জন প্রান্তরে—"

"এমন সময় হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন?"

"মনে হল যেন আমার ভিতর থেকেই বেরিয়ে এলেন। আমার সম্বন্ধে আপনার ঠিক এরকম মনে হয়েছে কি না জানি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কিন্তু হয়েছিল।"

ক্ষণকাল হতবাক থাকিয়া চার্বাক বলিল—"পিতামহকে দেখেছেন আপনি?"

"দেখেছি। আপনিও দেখবেন। তাঁকে ধ্বংস করবার ভারও নিতে হবে আপনাকে। আপনাকে সেই মহৎ কর্মে নিযুক্ত করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি আগে থাকতেই জানতাম। পরম পুরুষের নির্দেশ মতোই আমি এখানে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য।"

"তিনি নিজে এলেও তো পারতেন"—চার্বাক সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিল।

"সম্ভব হলে আসতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি আপনার নাগাল পাবেন না, আপনার বোধ-শক্তির সীমায় আসবার মতো স্থূলতা তাঁর নেই, তাই তিনি আমার সাহায্য নিয়েছেন। আমাকে প্ররোচিত করেছেন তিনি, আমি করছি আপনাকে। তাঁকে কে প্ররোচিত করেছিল জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি—পিতামহকে হত্যা করবার জন্যে অনাদিকাল থেকে যে ষড়যন্ত্র-খড়্গ প্রস্তুত হচ্ছে আমি তার একটি অংশ, আর তার সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।"

চার্বাকের সহসা মনে হইল বৈকালে দুই পাত্র মাধ্বী সুরা পান করিয়াছিলাম, এই সকল

অলীক ঘটনা পরম্পরা তাহারই ফল নয় তো! কিন্তু পরমুহূর্তেই কল্পনার কলহাস্য তাহাকে আশ্বস্থ করিল।

"মাত্র দু পাত্র মাধ্বী সুরা চার্বাককে বিচলিত করতে পারেনি। আপনি যা প্রত্যক্ষ করছেন তা অলীক নয়, সত্য।"

চার্বাক বিস্মিত হইল। জাদুকরী না কি?

বিস্ফারিত চক্ষে চার্বাক কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল নর্তকী সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতেও এমনই মোহিনীশক্তি ছিল। সুরঙ্গমা এখন কোথায়? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে সে বহুকাল পূর্বে মৃগয়ায় গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে সে এখনও হয়তো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া চার্বাক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

"পিতামহকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে? কোথায় পাব সে খড়্গ?"

"আপনাকেই আবিষ্কার করতে হবে সেটা। আগে পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোন, আসুন—"

চার্বাক এ আমন্ত্রণ আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সেই সুরভিত নিকুঞ্জ মধ্যে শ্যাম তৃণাস্তরণের উপর কল্পনা উপবেশন করিতেই তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিল। পরমুহূর্তেই কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিল সে। কল্পনার মুখের দিকে উদ্ভাসিত নয়নে চাহিয়া বলিল—"খড়্গের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি।"

"ও, করেছেন না কি? কি রকম সেটা?"

"সত্য। সত্যকে লাভ করলেই সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যাবে এবং তা জানা গেলে পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। তাঁকে চাক্ষুষ করবার তো প্রয়োজন নেই—"

কল্পনার নয়নযুগল হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"সত্যকে লাভ করবার কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন?"

"বৈজ্ঞানিক—"

"সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি বারম্বার পথ পরিবর্তন করে কিন্তু।"

"আমিও করব। নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ করা ছাড়া আর তো কিছু করতে শিখিনি।"

"বেশ, তাহলে আমি চললাম।"

"না, আপনি যাবেন না। ভাগ্যবশে আজ আপনার দর্শন পেয়েছি, ঘটনাচক্রে আকাশে বাতাসে আজ মাদকতা সঞ্চারিত হয়েছে, আপনার কণ্ঠস্বরের মূর্ছনায় আমার সমস্ত চেতনা আজ সম্মোহিত, আপনি যাবেন না!"

"বেশ, বসছি তাহলে—"

চার্বাক মুগ্ধনয়নে কল্পনার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আর বেশীক্ষণ কিন্তু আমাকে দেখতে পাবেন না, ওই দেখুন—"

চার্বাক দেখিল, বিরাট একটা কৃষ্ণমেঘ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইল, কল্পনাকে আর দেখা গেল না। ক্ষণকাল পরে চার্বাকের আকুল কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"ভদ্রে, আপনার পরিচয় দিন, বলুন আপনি কে।"

"আমি আপনার প্রেরণা।"

।। দুই ।।

অন্ধকারে ঝটিকা-বেগে বিভ্রান্ত হইয়া চার্বাক কোথায় যে নীত হইয়াছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল, যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে শক্তির অমিত প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। খরস্রোতে তৃণখণ্ডের মতো সে ঘটনাস্রোতে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সেই তন্বী রূপসীর কথা কিন্তু সে নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শেষ কথাগুলি দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাহার চিত্তলোকে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"চার্বাক, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই তোমার যাত্রা শুরু হল। আমার কোলে ক্ষণিকের জন্যও তুমি মাথা রেখেছিলে সত্যের পথ তাই আজ উন্মুক্ত হয়েছে। এর ভয়ঙ্কর ঝটিকাক্ষুব্ধ মূর্তি দেখে তুমি ভয় পেও না। অগ্রসর হও—"

চার্বাক অগ্রসর হইতেছিল না, বাহিত হইতেছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছিল বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তি বা যুক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। নিজের গতির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণশক্তি তাহার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইল। অবলুপ্ত হইবামাত্র কিন্তু আশ্বস্ত হইল সে। তাহার চতুর্দিক আর ভয়ঙ্কর রহিল না, সে যেন নূতন পরিবেশে নীত হইল। শুধু তাহাই নয়—তাহার দৃষ্টিগোচর হইল সে আর একক নহে, অদূরে এক ব্যক্তি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় নব পরিবেশে চার্বাক নূতন জীবন লাভ করিল, সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

....অদূরে যে ব্যক্তিটি বসিয়াছিল তাহার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চার্বাক উপলব্ধি করিল ব্যক্তিটি অদূরে নাই, বহুদূরে আছে। বহুক্ষণ হাঁটিবার পর চার্বাক তাহার সমীপবর্তী হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে চার্বাক লক্ষ্য করিল চতুর্দিকে শ্যামলতার কোনও চিহ্ন নাই, আকাশে সূর্যও নাই, চন্দ্রও নাই, অন্ধকারও নাই। অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। আকাশ নির্মেঘ, আকাশের বর্ণ নীল নহে, রক্তাভ। নিজেরই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যলোকে চার্বাক এই নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছিল। সে বাহ্যত অজ্ঞাত হইয়া গেলেও অন্তরের অন্তরতম সত্তায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তাহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্ধান করিতেছিল এই রক্তাভ আলোকের উৎস কোথায়, সূর্যচন্দ্রহীন এই দেশের নামই বা কি। উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চার্বাক আরও বিস্ময় বোধ করিল। ইহা সজীব মনুষ্য না প্রস্তরমূর্তি? এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি কোনও জীবন্ত মনুষ্যের হইতে পারে? কিন্তু কেশ চর্ম দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই তো ভ্রম হয়। চার্বাকের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিটি সহসা কথা কহিয়া উঠিল—"চার্বাক, তোমারই অপেক্ষায় আমি বসে আছি এখানে। আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে?"

চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লোকটির নয়নযুগল হইতে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

"আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।"

"আমার নাম কৌতূহল। তোমারই কৌতূহল আমি, তোমারই প্রেরণায় মূর্তি পরিগ্রহ করে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।"

"ও।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিল। তাহার নিজের প্রেরণা কিছুক্ষণ পূর্বে মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার নিজের কৌতূহল এখন আবার মূর্তিমান হইয়া কথা কহিতেছে। চার্বাকের আধিভৌতিক বুদ্ধির পক্ষে ব্যাপারটা একটু জটিল। কিন্তু জটিলতা দেখিয়া ভীত হইবার চরিত্র চার্বাকের নয়। বরং জটিলতাকে সরল করিবার প্রবৃত্তিই তাহাকে চিরকাল প্রবুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং সে সপ্রতিভভাবেই বলিল—"ও, বুঝেছি। কিন্তু এ কোন দেশে আমরা এসেছি বল তো? এখানে সূর্যচন্দ্র নেই কিন্তু আলো আছে। আকাশের রং নীল নয় রক্তাভ।"

"এর নাম সন্ধানলোক। তোমারই জন্য এ লোক তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ। এর কোনও ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। তুমি যে আলোকে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চাইছ তা চিরপ্রচলিত সূর্যচন্দ্রের আলোক নয়, তা তোমারই প্রতিভার আলো। তুমি বিভিন্ন, তুমি স্বতন্ত্র, তাই তোমার আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ। তা পীতাভ, শ্যামল বা বেগুনিও হতে পারে, কিন্তু নীল কখনও হবে না। এই সন্ধানলোকে তোমারই জন্য আমি সংবাদ সংগ্রহ করে অপেক্ষা করছি।"

"কি সংবাদ।"

"মৃতদেহটি নদীর পরপারে আছে এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। পিতামহ ব্রহ্মার কিছু খবর ওইখানেই পাওয়া যাবে। শুনেছি তাঁর সৃষ্টির কারখানাও ওই শবদেহের ভিতর আছে। তিনি নিজেও হয় তো আছেন।"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"নদীটি কত দূরে—"

"নদীটিই সমস্যা। ভাল করে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে বিরাটকায় শবদেহটি দূর প্রান্তরে শায়িত রয়েছে। দূরদিগন্তে ওটি পর্বত নয় ওটি শবের মুণ্ড। কিন্তু ওই শবদেহের সমীপবর্তী হতে চেষ্টা করলেই—এক দুকূল-প্লাবিনী নদী কোথা হতে আবির্ভূত হচ্ছে সহসা। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।"

চার্বাক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই যাহা আপাত-দৃষ্টিতে কঠিন প্রান্তর ভূমি ছিল তাহা তারল তরঙ্গিণীতে রূপান্তরিত হইল। ক্রমশ তাহার তরঙ্গমালা আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন কোনও অদৃশ্য ঝটিকা-বেগে এই সহসা-আবির্ভূতা স্রোতোস্বিনী বিক্ষুব্ধ হইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি এই মায়াবিনী নদীতে অবতরণ করিতে ইতস্তত করিত, কিন্তু চার্বাক অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি, সে বিনা দ্বিধায় নদীতে নামিয়া পড়িল। সে ভাবিল—ইহা যদি তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয়, স্পর্শশক্তি সে ভ্রম অপনোদন করিবে, আর ইহা যদি সত্যই নদী হয় তাহা হইলে সন্তরণ করিয়া নদীপারে যাওয়া অসম্ভব হইবে না। সন্তরণ করিয়া বহুবার বহু দুস্তর নদী সে অতিক্রম করিয়াছে। নদীতে নামিবামাত্রই কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। নদীর তরঙ্গমালা যেন রমণীর বাহুপাশের মতো তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নদীর কলধ্বনি আকুল প্রণয় নিবেদন করিল। চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল নদী মানবীর মতো কথা বলিতেছে।

"চার্বাক আমি নদী নই। তুমি অবগাহন করবে বলে আমি নদীরূপ ধারণ করেছি। তোমারই সৃষ্ট এই ঊষর সন্ধানলোকে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে বলে। আমি জানতাম তুমি আসবেই।"

"তুমি কে?"

"তুমিই তো আমার নামকরণ করেছ যুগে যুগে! আমি কে তা তুমিই জান, আমি জানি না। আমার বাপমায়ের দেওয়া একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু সে নাম কখনও মর্য্যাদা পায়নি তোমার কাছে। তপস্বী কচের নিকট তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল প্রণয়াতুরা দেবযানী। দেবযানী তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দেবযানীর মধ্যে যে চিরন্তনী নারী ছিল সে তুচ্ছ হয়নি। তাকে তুমি কামনা করেছ বহুরূপে বহু নামে। অশরীরী আমাকে কেন্দ্র করে তোমার কামনা যুগে যুগে অনেক রঙীন ফুল ফুটিয়েছে, কিন্তু যেই আমি শরীর ধারণ করে ধরা দিয়েছি, অমনি তোমার বিচক্ষণ বিশ্লেষণ আমাকে ম্লান করে দিয়েছে, পড়া পুঁথির মতো তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি দেখতে দেখতে। তাই আমি অশরীরী হয়েই অনুসরণ করছি তোমাকে। সুরঙ্গমার মধ্যে কিছুদিন আমি ভর করেছিলাম, কিন্তু আমাকে তুমি দেখেও দেখলে না। আমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, কিন্তু সুন্দরানন্দ যখন সুরঙ্গমাকে নিয়ে চলে গেল তখন তো তুমি বাধা দিলে না। তোমার অধ্যয়নস্পৃহা সুরঙ্গমার চেয়ে বড় হল তোমার কাছে। সুরঙ্গমার চোখের ভেতর দিয়ে আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। কিন্তু তুমি তখন সামান্য একটা পতঙ্গের গতিবিধি নিয়ে এমন তন্ময় হয়েছিলে যে আমার দিকে ফিরেও তাকালে না একবার!"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ চার্বাককে ঘিরিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল।

বিপন্ন হইলে চার্বাকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া ওঠে, চার্বাক প্রশ্ন করিল--"তোমার কথাই যদি সত্য হয়, আমি সত্যই যদি তোমাকে চিরকাল অবহেলা করে থাকি, তাহলে আবার তুমি আমার কাছে এসেছ কেন?"

"তোমাকে বা তোমার কৌতূহলকে ওই শবের কাছে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।"

"কেন?"

নদী কোনো উত্তর দিল না, কেবল তাহার কলধ্বনিতে অভিমান-আবদার অনুরোধ-অনুনয়ের সুর ফুটিয়া উঠিল। চার্বাকের মনে হইল একটা অস্ফুট রোদন-ধ্বনিও যেন শুনা যাইতেছে। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তাহার বিরাট কৌতূহল বিরাটতর হইয়াছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র কৌতূহল কহিল—"তপস্যা আরম্ভ কর। একনিষ্ঠ তপস্যা ভিন্ন এই কুহকিনীর মায়াজাল ছিন্ন করা যাবে না—"

"তপস্যা? এ অবস্থায় তপস্যা করা কি সম্ভব? অনুকূল পরিবেশ না হলে আমি একাগ্র হতে পারি না।"

"তা আমি জানি। কিন্তু এখন যদি তুমি অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশায় তপস্যা স্থগিত রাখ, নদীর স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওই শোন—"

নদীর কলধ্বনি আবার মানবীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

"চার্বাক, যুক্তিমার্গের কঙ্করে কণ্টকে জন্মজন্মান্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছ তুমি। তোমার বুদ্ধি তোমার কৌতূহল সত্য অনুসন্ধানের ছুতোয় তোমাকে ক্রমাগত বিপথে নিয়ে গেছে। অমৃতের সন্ধানে তুমি যাত্রা করেছ বিষবৃক্ষের অভিমুখে। শিথিলাঙ্গ হয়ে আমার তরঙ্গলীলায় আত্মসমর্পণ কর, তোমাকে আমি অমৃত-সাগরে নিয়ে যাব। তোমার মনে পড়ে কি বিশ্বামিত্র রূপে তুমি যখন পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলে, মেনকা-রূপে আমিই তোমাকে সে কঠোরতা থেকে রক্ষা করেছিলাম? আমার সঙ্গে যে দশ বর্ষ তুমি যাপন করেছিলে তাতে কি

অমৃতের আভাস পাওনি? শকুন্তলাকে আমি কেন ত্যাগ করেছিলাম জান? তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে বলে। একটা কথা কিন্তু তুমি জান না, শকুন্তলাকে আমি ত্যাগ করিনি, ত্যাগ করবার ভান করেছিলাম। যে শকুন্ত তাকে লালন করেছিল সে অন্য কেউ নয়, রূপান্তরিত মেনকাই। আমাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ, নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছ। আর বিপথে যেও না। তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাব—"

"আমি পিতামহকে চাক্ষুষ করতে চাই।"

"তার জন্য তো কোথাও যেতে হবে না। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান, ভাল করে চেয়ে দেখলেই তাঁকে দেখতে পাবে।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"হঠাৎ পিতামহকে দেখবার বাসনা হল কেন তোমার? পিতামহকে তুমি তো কোনোদিন কামনা করনি, কামনা করেছ আমাকে। আমাকে লাভ করবার জন্যই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তুমি তপস্যা করেছ, যুদ্ধ করেছ। গাধিনন্দন তুমি বিশ্বামিত্র হয়েছিলে আমার জন্য, পিতামহের জন্য নয়। আমিই কামধেনু শবলা, আমাকেই তুমি চেয়েছ চিরকাল, আজ হঠাৎ পিতামহকে কামনা করছ কেন, এ প্রচেষ্টা তো স্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক কহিল—"মায়াবিনি, জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য উদঘাটন করে তুমি আমাকে যা বলতে চাইছ তা আমার সহজবুদ্ধির কাছে প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। তোমার এই বিস্ময়কর আবির্ভাবও মনে হচ্ছে স্বপ্নবৎ। আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি তা-ও বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আমার মস্তিষ্ক হয়তো সুস্থ নয়, বিকারের ঘোরে হয়তো আমি অলীক বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। একটি বিষয়ে কিন্তু আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ; সৃষ্টিতত্ত্ব আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে, পিতামহ নামক পৌরাণিক উপকথাকে আমি সত্যের আলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেখতে চাই। তুমি যেই হও, তোমাকে অনুরোধ করছি আমার এ প্রেরণাকে মর্যাদা দাও, আমার অনুসন্ধানের পথে বাধাসৃষ্টি কোরো না।"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ কলহাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল।

"আমি জানি তোমার নবতম প্রেরণাটি সুন্দরী। সে সুন্দরী বলেই তার নির্দেশ তোমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ যে সৃষ্টিতত্ত্ব উদঘাটনের অজুহাতে তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্তিত হয়নি চার্বাক। তুমি নিত্য সব নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণ-জালে জড়িত হচ্ছ। আমি চিনি তোমাকে, আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না। এখনও আমার কথা শোন, ওই শবদেহের সমীপবর্তী হবার চেষ্টা কোরো না—ওতে আনন্দ নেই, আমার তরঙ্গদোলায় অঙ্গ বিস্তার করে দেখ কি আনন্দ।"

চার্বাক ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলের দিকে চাহিল।

কৌতূহল বলিল—"আর বিলম্ব কোরো না, তপস্যা শুরু কর।"

চার্বাক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

চার্বাকের ধ্যান যতই গভীর হইতে লাগিল, কৌতূহলের দেহ-আয়তন ততই কমিতে লাগিল। কমিতে কমিতে ক্রমশ তাহা বিলীন হইয়া গেল। তরঙ্গিনীও মরীচিকাবৎ অদৃশ্য হইল।

।। তিন ।।

চার্বাকের তপস্যা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। হয় তো তাহা কয়েক ঘণ্টা মাত্র, হয় তো তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী, কিন্তু সে তপস্যার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং পিতামহ বিচলিত হইলেন। চার্বাক যদি এসময়ে পিতামহকে চাক্ষুষ করিতে পারিত তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিত সন্দেহ নাই। এই কমনীয়কান্তি তরুণ যুবককে সে সৃষ্টিকর্তা পিতামহ বলিয়া চিনিতেই পারিত না। পিতামহ নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হইয়া ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় 'স্বৈরচর' নামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন বাস্তবে তাহাকে মূর্তিদান করা সম্ভব কি না। সহসা তাহার মনে হইয়াছিল বৃক্ষলতা পশুপক্ষী বা জড়কে এক একটি দেহ-পিঞ্জরে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। আর কিছুর জন্য না হোক, বৈচিত্র্যের জন্য অন্তত এমন একপ্রকার জীব সৃষ্টি করা উচিত যাহারা ইচ্ছামত দেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে পক্ষী বা ব্যাঘ্র বা অন্য কিছু হইতে পারিবে। ভেক সর্প, অথবা সর্প ময়ূরে রূপান্তরিত হইবে। কেবল ইচ্ছা করিলেই গাছের এক ঝাঁক ফুল, এক ঝাঁক প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাইবে, পর্বতস্তূপ মেঘস্তূপ হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। এই অপূর্ব কল্পনায় তিনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। অর্ধ-সৃষ্ট এই জাতীয় কয়েকটি জীব তাহার আশেপাশে পড়িয়াছিল। একটি গোক্ষুর সর্পের কিছু অংশ মানবীতে রূপান্তরিত হইয়া তরুণকান্তি পিতামহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল, প্রকাণ্ড একটি হীরকখণ্ড ধীরে ধীরে আঙুরগুচ্ছে রূপান্তরিত হইতেছিল, একটি পুষ্পের একটি পাপড়ি পতঙ্গের ডানার আকার ধারণ করিয়া দ্রুত স্পন্দনে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পিতামহের কল্পনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মূর্ত হইতে পারিতেছিল না বিশ্বকর্মার জন্য। সৃষ্টিব্যাপারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাই পিতামহের প্রধান সহায়। পিতামহ কল্পনা করেন, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেন বিশ্বকর্মা। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে পিতামহ নিজেই নিজের কল্পনাকে রূপ দিতেন, কিন্তু ক্রমশ এত অসংখ্য সৃষ্টি-কল্পনা তাঁহার চিত্তলোকে ভীড় করিয়া আসিল যে তিনি একজন সহায়কের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সৃষ্টি করিলেন বিশ্বকর্মাকে! অর্থাৎ বিশ্বকর্মার পিতা প্রভাস এবং মাতা যোগসিদ্ধাকে সম্ভব করিলেন। পিতামহই আদিতম স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিতে তাহার নিজের স্বাক্ষর কোথাও নাই। নিজেকে রহস্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়া পিতামাতাকেই সৃষ্টির কারণরূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে প্রকট করিয়া তিনি আনন্দ পান। প্রভাস-যোগসিদ্ধার মাধ্যমে তাই তিনি বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টি ব্যাপারে বিশ্বকর্মাই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। কিছুদিন হইতে তাঁহার কিন্তু একটা সন্দেহ হইয়াছে। মনে হইতেছে বিশ্বকর্মা তাঁহার সমস্ত কল্পনাকে যেন ঠিকমতো রূপ দিতেছেন না। পালনকর্তা বিষ্ণুর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বিশ্বকর্মা যেন তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নতুবা এই সকল অযথা বিলম্বের কারণ কি? কেন ওই গোক্ষুর সর্প এখনও সম্পূর্ণরূপে মানবীতে রূপান্তরিত হয় নাই? ওই আঙ্গুরগুচ্ছে এখনও কেন হীরকের কুচি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে? তাঁহার ইহাও মনে হইতেছিল এ বিশ্বকর্মা যদি তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি নূতন বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করিবেন। অর্ধপতঙ্গ পুষ্পটির দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তর করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। আহা, বেচারার উড়িবার কি আগ্রহ! এতদিন

ধরিয়া কত সহস্র সহস্র পুষ্প মৌন-আগ্রহে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ঝরিয়া গিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্কও হইয়া পড়িলেন।

"বিশু—"

"আজ্ঞে যাই।"

বিশ্বকর্মা আবির্ভূত হইলেন।

"এদের তুমি এমনভাবে অসম্পূর্ণ করে রেখেছ কেন বল তো? এদের সম্পূর্ণ কর। আরও অনেক কিছু করতে হবে যে—"

"আমি অবিলম্বে এদের সম্পূর্ণ করে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে উদিত হওয়াতে আমি ইতস্তত করছি—"

"কি কথা?"

"আপনার সৃষ্টিতে এতকাল যে শৃঙ্খলা বর্তমান আছে এই অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্ট হলে সে শৃঙ্খলা আর থাকবে না। এই স্বৈরচর নামক প্রাণী যখন যা খুশী হয়ে আপনার সৃষ্টিকে বিশৃঙ্খল করে তুলবে। ফুল যদি কখনও প্রজাপতি, কখনও পাখি, কখনও ভেক, কখনও বা অপর কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে সমস্ত প্রাণী সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হবে, সকলেই অস্থির হয়ে উঠবে—"

"উঠুক না, তোমার তাতে কি? তোমার বুদ্ধি মোটা বলে একটা কথা তুমি বুঝতে পারনি। সকলেই স্বৈরচর হতে চায়, হতে পারে না বলেই যত গোল। যত গোলমালের মূলই ওইখানে। সবাই সব হতে চায়। তোমার নিজের ব্যাপারেই দেখ না। তোমাকে সৃষ্টি করলাম মিস্ত্রী করে তুমি নিজের কাজ ছেড়ে আমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার দরকার কি? তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব, বড় জোর বিষ্ণু ঘামাতে পারে। কিন্তু তুমি ঘামাচ্ছ মানে—তুমিও ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু হতে চাও। আসলে তুমিও মনে মনে একটি স্বৈরচর। তোমারও অনেক কিছু হবার ইচ্ছেটি ষোল আনা আছে কিন্তু হবার সামর্থ্য নেই। দুনিয়া জুড়ে এই কাণ্ড চলেছে। সেইজন্যেই এত অশান্তি। তাই ঠিক করেছি সত্যি সত্যি এবার স্বৈরচর সৃষ্টি করব। তারা সব কিছু হয়ে দেখুক মজাটা কি। তুমি যদি চাও তোমাকেও ব্রহ্মা বানিয়ে দেব দিন কয়েকের জন্যে। এখন এই কাজগুলো শেষ করে দাও—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

মাথা চুলকাইয়া বিশ্বকর্মা বলিলেন—"আজ্ঞে না, আমি মাথা ঘামাইনি। বিষ্ণুই এ নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং বলছিলেন যে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।"

"ও, বলছিল বুঝি? আমি আগেই বুঝেছি তা। সৃষ্টি-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কথা বিষ্ণুরও নয়। কিন্তু ওর স্বভাবই হচ্ছে সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা। আচ্ছা, সে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করব এখন, তুমি কাজ শুরু করে দাও—"

বিশ্বকর্মা ইতস্তত করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু একটি গৈরিক-ধারিণী রূপসীর আকস্মিক অভ্যাগমে তিনি থামিয়া গেলেন।

পিতামহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কে?"

"আমি সাধনা।"

"এখানে কি চাই?"

"সিদ্ধি।"

"তাহলে গণেশের কাছে যাও। সিদ্ধি বিতরণ করবার জন্যে ওকেই ঠিক করে রেখেছি আমরা।"

"আমি আপনারই উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি, অন্য কোথাও যাবার আমার শক্তি নেই।"

"মুশকিলে ফেললে দেখছি! তুমি কার সাধনা?"

"তাতো জানি নে। আমি তাঁর চিত্তলোকে জন্মগ্রহণ করে আলোক বাহিত হয়ে আপনার উদ্দেশে আসছি। আমি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটি কম্পমান আলোক-তরঙ্গ মাত্র ছিলাম, আপনার দ্বারে এসে সহসা মূর্তি পরিগ্রহ করেছি, আমি এতক্ষণ ছিলাম মৌন-আকুতি, আপনার কাছে এসে ভাষা পেয়েছি। কিন্তু যাঁর চিত্তলোকে আমার জন্ম তাঁর কোনও পরিচয় আমি জানি না।"

পিতামহের নয়নযুগলে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুকাল পূর্বে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই যেন মূর্তিমতী হইয়াছে।

"বেশ তাহলে তুমি আবার আলোক-তরঙ্গ হয়ে তাঁর চিত্তলোকে ফিরে যাও, আমি দেখি কোথা থেকে তুমি এসেছ।"

গৈরিক-ধারিণী তরুণী সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্যোতির্ময় আলোক-রেখায় রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার মহাশূন্যপথে মর্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। পিতামহ এবং বিশ্বকর্মা উভয়েই একটু ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"ও, সেই ছোকরা—"

পিতামহের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কে বলুন তো।"

"আরে তুমিই তো তৈরি করেছ ওকে আমার কল্পনা অনুসারে। যুগে যুগে নূতন নূতন নামে নানা কীর্তি করেছে ও। আরও করবে—"

"ঠিক ধরতে পারছি না—"

"বিশ্বামিত্রকে মনে নেই? রাবণকে মনে নেই? আমার মানসপুত্র পুলস্ত্যের কীর্তি শোননি?"

"আজ্ঞে না, পুলস্ত্য? তিনি বোধহয় অনেক আগে জন্মেছেন, তাঁর কথা আমি জানি না।"

"পুলস্ত্য তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে গিয়ে তপস্যা করছিল। কিন্তু মুনিকন্যারা আর অপ্সরারা এমন বিরক্ত করতে লাগল তাকে—যে শেষ পর্যন্ত সে রেগে মেগে অভিশাপ দিলে, যে মেয়ে তার দৃষ্টির সম্মুখে আসবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে। কিছুদিন পরে পড়বি তো পড় তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভুই পড়ে গেল তার চোখের সামনে। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ ফলে গেল। তৃণবিন্দুর মাথায় হল বজ্রাঘাত। গর্ভবতী কুমারী মেয়ে নিয়ে সে যুগেও সমাজে বাস করা শক্ত ছিল। তৃণবিন্দু তখন ধরে বসল পুলস্ত্যকে—হবির্ভুকে বিয়ে করতে হবে। অন্যান্য মুনিঋষিরাও এসে ধরল। পুলস্ত্য একটু কাটখোট্টা রাগী গোছের লোক হলেও, লোক ছিল ভাল। হবির্ভুকে বিয়ে করলে সে। হবির্ভু গর্ভবতী ছিলই, সে প্রসব করলে বিশ্রবাকে। এই বিশ্রবাই রাবণগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ, কুবেরও এর ছেলে। এরা সকলেই তপস্বী কিন্তু সকলেই ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। এই ধরনের একদল লোক সৃষ্টি করেছিলাম আমি। এদের হঠকারিতায়, এদের

নাস্তিকতায়, এদের শৌর্যে বীর্যে আমার সৃষ্টিকাব্য বিচিত্র। হিরণ্যকশিপু, বিশ্বামিত্র—এরা সব ওই দলের। চিরকাল এরা বিদ্রোহ করে এসেছে। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে এদের, বুঝলে? এই চার্বাককে নিয়ে একটু রগড় করতে হবে। কয়েকদিন থেকে ওর ঝোঁক হয়েছে আমাকে ও উড়িয়ে দেবে। আমি নেই এই প্রমাণ করবার জন্যেও অহরহ আমার কথাই ভাবছে। ওর চিন্তার ধাক্কায় বিচলিত হয়ে সেদিন—না, থাক এখন, সব কথা ভাঙব না তোমার কাছে। তুমি যা মুখ-আলগা লোক, এক্ষুণি গিয়ে বিষ্ণুকে সব কথা বলে দেবে, আর সে এসে এই নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করবে। তুমি ওকে এখন ওই মায়ানদী পার হবার ব্যবস্থা করে দাও। ও বুঝুক যেন ওর তপস্যার জোরেই এটা হল–"

"স্বৈরচর এখন থাক তাহলে–"

"একটা সাঁকো করতে আর কতক্ষণ লাগবে। তারপর স্বৈরচরে হাত দিও। স্বৈরচর করতেই হবে—

বিশ্বকর্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ওই মায়ানদীটি কে—"

"ও হচ্ছে ওই চার্বাকেরই অবচেতন লোকের কামনা।"

"ওর ওপরে কি রকম ধরনের সাঁকো আপনি তৈরি করতে বলছেন।"

"মায়ানদীর উপর মায়াসাঁকো বানাও।"

"কি রকম হবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

তরুণকান্তি পিতামহ বিশ্বকর্মার নাসিকাগ্রে একটি টোকা দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমার নাকের ডগাটি তো খুব সূক্ষ্ম। বুদ্ধি এত মোটা কেন!"

বিশ্বকর্মা অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতামহ বলিলেন—"আচ্ছা এক কাজ কর। উপনিষদের এক ঋষির শ্লোককেই মূর্ত করে দাও। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া—মনে পড়েছে?"

"পড়েছে।"

"যাও তবে। বেশী দেরি কোরো না কিন্তু। স্বৈরচরদের তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে।"

"আচ্ছা।"

বিশ্বকর্মা অপসৃত হইলেন।

বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলে পিতামহ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহু-বর্ণের বিদ্যুৎকণা তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলকে বিচিত্র ও বহ্নিময় করিয়া তুলিল। মনে হইতে লাগিল, তরুণকান্তি পিতামহের দেহের আয়তন ক্রমশ উজ্জ্বলতর কিন্তু ক্ষীণতর হইতেছে। তাঁহার দেহই যেন ধীরে ধীরে অসংখ্য বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। পিতামহ নূতনতর সৃষ্টি-স্বপ্নের কল্পনা-লীলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। নূতনতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন সম্পূর্ণ আলোকময় জীবের সৃষ্টি সম্ভব কি না—যাহার দৈহিক স্থূলতা থাকিবে না—কিন্তু বুদ্ধি থাকিবে, প্রতিভা থাকিবে, গতি থাকিবে। অর্ধ-সমাপ্ত গোক্ষুরমানবী পিতামহের ভাবান্তর দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল–"পিতামহ, আমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে আপনি কোথায় অন্তর্হিত হচ্ছেন?"

পিতামহ উত্তর দিলেন—"ভবিষ্যৎ লোকে। ভয় পেও না, সেখানে তোমরাও থাকবে। কথা বলে আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।"

পিতামহের সর্বাঙ্গ হইতে আরও বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

।। চার ।।

মৃত্তিকা-বিদারণের শব্দে চার্বাকের তপস্যা ভঙ্গ হইল। চার্বাক চাহিয়া দেখিল মায়ানদী তখনও কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি তরঙ্গ তখনও যেন তরলিত আশ্লেষের ভঙ্গীতে তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, সুরঙ্গমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও তাহাতে যেন আভাসিত হইতেছে। পুনরায় মৃত্তিকা বিদারণের শব্দ হইল। চার্বাক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখভাগের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত ছুরিকা ভূতল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। চার্বাক রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই উদীয়মান ছুরিকাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল--কার্যের সহিত যখন কারণ অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত, এই বিস্ময়কর ঘটনারও নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। এই বৃহৎ ছুরিকা এ স্থানে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয় কেহ প্রোথিত করিয়া গিয়াছে। কেন? প্রোথিত ছুরিকাই বা কোন্ শক্তিবলে এই কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে? চার্বাকের যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের হেতু নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে হইল তপস্যা দ্বারা আত্মস্থ হইতে চাহিয়া তো কোনই ফল হয় নাই। অলৌকিক মায়ানদী তো তেমনই প্রবাহিত হইতেছে, উপরন্তু বৃহদাকার অদ্ভুত এই ছুরিকাটি কোথা হইতে আসিল? ইহা কি তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ? ক্ষীণভাবে মনে পড়িল—গত রাত্রে পিতামহ-বিষয়ক চিন্তা করিবার পর হইতেই এমন সব অলৌকিক ঘটনাবলী তাহার জীবনে ঘটিতেছে যুক্তির দ্বারা যাহাদের কারণ নির্ণয় করা শক্ত, প্রায় অসম্ভব। যে রূপসীটি নিজেকে তাহার প্রেরণা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল এ সব কি তাহারই কীর্তি? মেয়েটি কি সত্যিই জাদুকরী? সত্যিই কি জাদুশক্তি বলিয়া কোনোরূপ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি আছে? সম্ভবত নাই। কিন্তু জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও বোধশক্তি লইয়া অসীম সম্ভাবনার পরিমাপ করা কঠিন। হয়তো পরলোক, ব্রহ্মালোক, দেবলোক. স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেরই অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করিয়া কি চার্বাক তাহার জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবে? অসীম নিশ্চয়তা অপেক্ষা সীমাবদ্ধ নিশ্চয়তা কি বেশী স্বস্তিকর নহে? যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহাই কাম্য, সে সত্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, পরবর্তী নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় যদি সে সত্যের রূপান্তরও ঘটে তথাপি তাহাই কাম্য। নানাবিধ চিন্তা চার্বাকের মস্তিষ্কে ভীড় করিতে লাগিল।

.....ছুরিকাটি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও শ্লথগতি হয় নাই। চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল ছুরিকাটি কিছুদূর ঊর্ধ্বমুখে উঠিয়া ক্রমশ নদীর দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং পরপারে পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যাহা অলৌকিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহাও আর পরমুহূর্তে অলৌকিক বা অসম্ভব রহিল না,

দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া চার্বাককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, এখানে কি জন্য এসেছেন।"

চার্বাক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল—"আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্ন করব ভাবছিলাম। আপনি কে।"

"আমি পাতাল-নিবাসী রাজপুত্র কালকূট। এখানে এসেছি ওই শবদেহে প্রবেশ করব বলে। কিছুদিন পূর্বেও এসেছিলাম, কিন্তু এই ছলনাময়ী মায়ানদী আমাকে পার হতে দেয়নি। তাই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আবার পাতালে। আমার প্রেয়সী নাগকন্যা বর্ণমালিনী বললেন—তুমি আবার ফিরে যাও, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে মায়ানদীর উপর সাঁকো তৈরি করে দেব, তুমি তার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হয়ে যাও। ওটা ছুরিকা নয়, নাগকন্যা বর্ণমালিনীর জিহ্বা—"

"কিছু যদি না মনে করেন, তাহলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।"

"করুন।"

"আপনি ওই শবদেহে কেন প্রবেশ করতে চাইছেন।"

"শুনেছি, পিতামহ ব্রহ্মার ওইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উনি নিজের ওই কীর্তিমন্দিরে বাসও করেন এও শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব, তাই ওই শবদেহে প্রবেশ করতে চাই।"

"তাঁর কাছে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি।"

"তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।"

"কিসের বোঝাপড়া।"

"সে অনেক কথা। আমরা তাঁর পৌত্র কশ্যপের বংশধর। আমি জানতে চাই একই পিতার বংশধর কেউ দেব, কেউ দানব, কেউ নাগ হল কেন। একজনের স্থান স্বর্গে আর একজনের পাতালে কেন, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী বিশ্ববরেণ্যা অথচ আমার পত্নী বর্ণমালিনীকে কেউ চেনে না কেন। বর্ণমালিনী রূপে গুণে শচীদেবীর চেয়ে কম নন। তিনিও অনন্যা। তবে এ অবিচার কেন?"

চার্বাক লক্ষ্য করিল কালকূটের চক্ষু দুইটিতে নিষ্ঠুর ভুজঙ্গভাব প্রকটিত হইয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখও হয়তো এখনই ফণায় রূপান্তরিত হইবে।

চার্বাক বলিল—"আমিও পিতামহের দর্শনপ্রার্থী। আমিও শুনেছি যে পিতামহ ওই শবদেহে আছেন, এই মায়ানদী আমাকেও বাধা দিয়েছে ক্রমাগত। কিন্তু—"

চার্বাক থামিয়া গেল। যে কথাটা মনে জাগিয়াছিল তাহা কালকূটের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ হইল।

"কিন্তু কি, বলুন থেমে গেলেন কেন?"

"আমি পিতামহকে দেখতে চাই সত্যভাবে, একটা ভোজবাজির চমৎকৃতির ভিতর দিয়ে নয়। আমার মনে হচ্ছে কি করে জানিনা আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। যা আমি প্রত্যক্ষ করছি, মনে হচ্ছে অসম্ভব। কিন্তু এ অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেও পারছি না, প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করব কি করে?"

"আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়তো অভাবিত উপায়ে নূতন শক্তি অর্জন করেছে। সেই শক্তিবলে আপনি অভিনব জগৎ প্রত্যক্ষ করছেন, পুরাতন যুক্তি দিয়ে বিচার করছেন বলেই অসম্ভব মনে হচ্ছে। নূতন যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি কি অভাবিত উপায়ে এভাবে বদলে যেতে পারে? এই মায়ানদী,

বর্ণমালিনীর এই বিস্ময়কর জিহ্বা, ওই বিরাট শবদেহ, এ সমস্তই কি সত্য? পিতামহ কি সত্যই আছেন?"

"আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আপনার শৈশবে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরের জগৎকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করত, এখনও কি ঠিক সেই ভাবেই করে? এখনও কি অন্ধকার রাত্রে গাছকে ভূত বলে মনে করেন? মনোহরকান্তি সর্পের দিকে কি এখনও নির্ভয়ে হাত বাড়াতে পারেন? "বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার" অনেক ভ্রান্তি অপনোদিত হয়েছে মানছি। কিন্তু বৃক্ষের বৃক্ষত্ব বা সর্পের সর্পত্ব তখনও আমার কাছে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। আপনাকে আমি সর্পবংশজাত বলে মানতে প্রস্তুত নই। আমার মনে হচ্ছে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি।"

"মোহগ্রস্তই হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, আপনার যুক্তির অহঙ্কারই আপনার মোহ। আমাকে সর্পকুলজাত বলে মানতে প্রস্তুত নন আপনি? কেন? আমার আকৃতি মানুষের মতো বলে? দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন---"

দেখিতে দেখিতে কালকূট এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্পে রূপান্তরিত হইলেন এবং তর্জন করিয়া বলিলেন—"কিছুদিন পরে আপনার দেহ যে ভস্মে বা বায়বীয় আকারে পরিণত হবে সে তখন যা প্রত্যক্ষ করবে তা এখন কল্পনা করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি। যুক্তির শৃঙ্খলে কখনও নিজেকে বন্দী করবেন না, আপনার যুক্তি হবে আপনার সত্যনির্ধারণের উপায় স্বরূপ। তা যদি আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আপনি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সত্য উদ্ধার করতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আপনাদের মতো বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সম্বল, যদি কোনও কারণে, তা সে কারণ যত বড় যুক্তিযুক্তই হোক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ জন্মায়, তাহলেই আপনি দিশাহারা হয়ে পড়বেন। যা প্রত্যক্ষ করছেন তা আপনাকে মানতেই হবে।"

কালকূট পুনরায় মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"প্রত্যক্ষ সত্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই, অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র প্রদীপশিখার উপর নির্ভর না করে যেমন উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও বলছি ওটা খুব নির্ভরযোগ্য ব্যাপার নয়। আপনি পিতামহের দর্শনপ্রার্থী কেন তা জানতে পারি কি?"

চার্বাক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল—"কৌতূহল মাত্র। আমার ধারণা তিনি নেই, অনুসন্ধান করে দেখছি আমার এ ধারণা ঠিক না ভুল।"

"বেশ, তাহলে আসুন, বর্ণমালিনীর জিহ্বার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হওয়া যাক।"

"আপনার পত্নীর জিহ্বার উপর পদার্পণ করবার অধিকার আপনার হয়তো আছে কিন্তু আমার তো নেই।"

"সে অধিকার আপনাকে আমি দিচ্ছি। আপনার সাহস আছে কিনা সেইটে আপনি ভেবে দেখুন। বর্ণমালিনীর ওই জিহ্বা শুধু স্পর্শদ্বারা বিবর্ণকুলকে ধ্বংস করেছে—"

"আমি চার্বাক। সত্য নির্ধারণের জন্য যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত। আমার কিন্তু একটা খটকা লাগছে—সর্পের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত শুনেছি।"

"ঠিকই শুনেছেন। অধিকাংশ সর্পের জিহ্বাই দ্বিখণ্ডিত, কারণ তারা সমুদ্র-মন্থনের পর

অমৃতের লোভে কুশলেহন করেছিল। বর্ণমালিনীর পূর্বপুরুষ শৃঙ্গনাসা এ হীনতা স্বীকার করেননি, তাই তাঁর বংশধরদের জিহ্বা অখণ্ডিত আছে।"

চার্বাক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কি ভাবছেন?"

"ভাবছি ওই শবদেহের মধ্যে যে সম্ভাব্য সত্য আছে তার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিনা। বর্ণমালিনীর জিহ্বার বিষাক্ত স্পর্শে হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে, ভাবছি এই বিপদ বরণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা।"

"আপনি যদি বর্ণবিরোধী হন তাহলে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিবর্ণবাদীদের ধ্বংস করবার জন্যেই বর্ণমালিনী তপস্যা করে ওই বিশেষ রাসায়নিক শক্তি লাভ করেছিলেন—"

"আমি বর্ণবিরোধী নই।"

"তাহলে আপনি নির্ভয়ে আসতে পারেন। আসুন।"

কালকূট সেই ধনুকাকৃতি সাঁকোর উপর আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে পরপারে গিয়ে উপস্থিত হইলেন। চার্বাকও অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা তাহার নজরে পড়িল মায়ানদী অদৃশ্য হইয়াছে, নদীর খাতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে একদল আলেয়া। চার্বাক আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া সাঁকোর উপর আরোহণ করিল। কিছুদূর উঠিয়াও সে কিন্তু কালকূটকে আর দেখিতে পাইল না। চার্বাকের মনে হইল মায়ানদীর মতো কালকূটও কি তাহা হইলে মায়া? আর একটা কথাও চার্বাকের মনে হইতে লাগিল। বর্ণমালিনীর জিহ্বায় কোনও কোমলত্ব নাই কেন? ক্ষুরধার লৌহকঠিন এই বস্তুটি কি কোনও জীবন্ত প্রাণীর জিহ্বা হইতে পারে? জিহ্বা যদি না হয় তাহা হইলে ইহা কি? চিন্তা করিতে করিতে চার্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুরদার পথে অন্যমনস্ক হইয়া চলা কঠিন, চার্বাক স্খলিতচরণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু শূন্যপথে এক দ্যুতিমান বৃহদাকৃতি পতঙ্গ আবির্ভূত হইয়া কহিল—"চার্বাক, অন্যমনস্ক হোয়ো না। আমার উপর ভর দাও, আমি তোমাকে নির্বিঘ্নে পার করে দেব।"

"তুমি কে?"

"আমি তোমার মনীষা।"

চার্বাক পতঙ্গের উপর ভর দিয়া সেই ক্ষুরধার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

।। পাঁচ ।।

বিশ্বকর্মা পিতামহের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন যেসকল অর্ধসমাপ্ত স্বৈরচর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহারাও কেহ নাই। ইহাতে কিন্তু বিশ্বকর্মার বিস্ময় হইল না। কৌতুকী পিতামহের বহুবিধ কৌতুক-পরায়ণতার পরিচয় তিনি ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছিলেন। পিতামহ নিজেকে নানারূপে পরিবর্তিত করিয়া বহুবার তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছেন। এই তো সেদিনের কথা, যখন তিনি হিমালয় নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদা গভীর নিশীথে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে গিরিগাত্র বিদীর্ণ হইয়া নিদারুণ অগ্নি উদগত হইল, বৃক্ষলতা পশু পক্ষী দগ্ধ হইতে লাগিল, হিমালয়ের কিছু অংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল, ধরিত্রীর অন্তঃস্থল হইতে

গলিত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্র উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশপটে অভিনব জ্যোতির্ময় উৎস সৃষ্টি করিতে লাগিল, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বিশ্বকর্মা সৃষ্টিকার্য স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষামানসে পলায়নপর হইয়াছিলেন এমন সময় গর্জমান অগ্নিশিখার প্রচণ্ড গর্জন প্রচণ্ড হাস্যে রূপান্তরিত হইল। অগ্নিশিখার ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন—"ভয় পেলে না কি বিশু, ভয় পেও না, তোমার সৃষ্টি একটু বদলে দিলাম।"

বিশ্বকর্মা একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন।

"বদলে দিলেন মানে?"

"তোমার মাপজোক বড় নিখুঁত হচ্ছিল। সৃষ্টি ব্যাপারে অত জ্যামিতি-পরিমিতি মেনে চললে কি চলে? কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম, কোথাও ঊষর, কোথাও ধূসর, কোথাও শ্যামল, কোথাও রঙীন—খেয়াল খুশীর বৈচিত্র্য থাকা চাই; তুমি যা করছিলে তাতো একটা ঢিবি। এইবার দেখতো কেমন হল—"

আর একবার, বিশ্বকর্মা যখন গভীর সমুদ্রের তলদেশে সুক্তি সজ্জিত করিতেছিলেন বিশালকায় এক জীব আসিয়া তাঁহার সম্মুখে মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মস্তকের উভয় দিক হইতে তীব্র আলোকচ্ছটা নির্গত হইয়া সহসা সমুদ্রের অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, মনে হইতেছিল সমুদ্রের জলে বুঝি সহসা আগুন লাগিয়া গেল। সেবারও বিশ্বকর্মা ভয় পাইয়াছিলেন, সেবারও সেই ভীষণ জলজন্তু পিতামহের কমনীয় কান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। আমি ভাবছিলাম তোমার এই চমৎকার মুক্তোগুলো পাহারা দেবার জন্য ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ার সৃষ্টি করলে কেমন হয়? সুন্দরের ঠিক পাশেই ভয়ঙ্কর না থাকলে সুন্দর আর সুন্দর থাকবে না, খেলো হয়ে যাবে। কি বল?" পিতামহের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মাকে বহুবিধ সামুদ্রিক জীবও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বকর্মার মনে হইল পিতামহ সম্ভবত অনুরূপ কোনো কৌতুকে মত্ত হইয়া নূতন ক্রীড়ায় লিপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই শূন্য কক্ষেই পিতামহ অবস্থান করিতেছেন ইহা ধরিয়া লইয়া বিশ্বকর্মা বলিলেন—"পিতামহ, আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে চার্বাককে মায়ানদী পার করে দিয়েছি, কিন্তু আমি নিজের বুদ্ধিতে আর একটা কাজও করেছি, জানি না আপনি তা সমর্থন করবেন কিনা।"

শূন্য কক্ষের বায়ুস্তর কয়েকটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণে ক্ষণিকের জন্য চমকিত হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্তেই পিতামহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তুমি যা করেছ তা আমি জানি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে যা করেছ তাও আমার অজানা নয়, কারণ সে বুদ্ধি আমিই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। মুখরা বর্ণমালিনীর জিভটাকে তাক মাফিক খুব কাজে লাগানো গেছে। কালকূটের সঙ্গে চার্বাকের দেখা হওয়াতেও খুব ভাল হয়েছে। দুই গোঁয়ারে জুটে কি ভীষণ কাণ্ড করে দেখ না—"

"ভীষণ কাণ্ড করবে না কি।"

"নিশ্চয়। সুন্দ-উপসুন্দের কথা মনে নেই, যার জন্যে তোমাকে তিলোত্তমা বানাতে হল, যে তিলোত্তমাকে দেখতে গিয়ে আমি চতুর্মুখ হয়ে গেলাম, এরাও সেই সুন্দ-উপসুন্দের জাত। তুলকালাম করে তবে থামবে—"

বিশ্বকর্মা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"তাই না কি, কী করবে বলুন তো—"

"তা এখনও আমি ঠিক করি নি।"

কথাটা বিশ্বকর্মা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

পিতামহ বলিলেন—"ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। সেদিন যে নূতন দ্বীপটি সৃষ্টি করেছ তার জন্যে কয়েক অক্ষৌহিণী ক্যাঙারু তৈরি করগে যাও। বেশ বড় বড় ক্যাঙারু চাই—"

বিশ্বকর্মা ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"স্বৈরচর তৈরি তাহলে এখন স্থগিত রইল?"

"না, তাদের ভার আমি স্বয়ং নিয়েছি। তাদের নিয়ে আমি এখন বাস করছি ভবিষ্যৎলোকে।"

"ভবিষ্যৎলোকের সৃষ্টি আবার কবে হল?"

"হয়নি, হবে। তাই নিয়েই ব্যস্ত আছি আমি।"

"কোথায় আছেন আপনি?"

"ভবিষ্যৎলোকে।"

"ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার। যে লোক নেই সেখানে আপনি আছেন কি করে!"

"তাই যদি বুঝতে পারবে তাহলে তুমি বিশ্বকর্মা না হয়ে ব্রহ্মা হতে। তোমার যেটুকু বুদ্ধি আছে তা অতিশয় কুচুটে বুদ্ধি, নিজের কাজ না করে তাই তুমি বিষ্টুর সঙ্গে জুটে গোপনে আমার নামে যা তা আলোচনা কর।"

"আজ্ঞে না, যা তা আলোচনা তো কখনও করিনি। বিষ্ণুই বলছিলেন যে আপনি যদি সত্যিই স্বৈরচর সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টি আর থাকবে না—"

"এমনিতেই সৃষ্টি আছে না কি। বিষ্ণুকে বলে দিও যে আমি একদিন আমার সমস্ত সৃষ্টির হিসাব তার কাছে দাবী করব। সে হিসাব তিনি যদি নিখুঁতভাবে না দিতে পারেন তাহলে এমন এক স্বৈরচর তৈবি করব যে তাঁর বিষ্ণুত্বই লোপ করে দেবে সে। বিষ্ণুকে বলে দিও এ কথা—"

শূন্যকক্ষের বায়ুস্তরকে চিরিয়া সশব্দে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। বিশ্বকর্মা মুখব্যাদান করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না। সশব্দে আর একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সর্পাকারে প্রলম্বিত হইয়া চতুর্দিকে ফণা বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পিতামহের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। যা বললাম তা কর গিয়ে। তোমার যেমন খুশী তেমনি ভাবে কর, তোমাকে আমি আর বাধা দেব না, কারণ আমার বাধা দেবার সময় নেই! ভবিষ্যৎলোক নিয়ে আমি মহাব্যস্ত আছি। ঠিক করেছি ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করব নানা মাপের বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়ে, ওই তরঙ্গগুলোই হবে সেই লোকের নিয়ামক। সৃষ্টি ঠিক এমনিই থাকবে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হবে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রভাবে। নানা রকম বিদ্যুৎতরঙ্গের সম্ভাবনা আমি সৃষ্টি করছি মহাকাশে! তোমার সাহায্যের দরকার নেই এতে, কারণ কল্পনাই এ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তুমি ক্যাঙারু তৈরি কর গে যাও। আর বিষ্ণুকে বোলো আমার সৃষ্টির হিসাবটা যেন ঠিক করে রাখে, হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হব আমি। পালনকর্তা নিজের কর্তব্যটা কেমন ভাবে করেছেন দেখতে চাই। তুমি যাও—"

বিশ্বকর্মা বলিলেন—"পিতামহ, যদি অভয় দেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করবার এ অদ্ভুত প্রেরণা আপনি পেলেন কি করে?"

"প্রেরণা যোগাচ্ছে ওই চার্বাকের দল। ওদেরই জিজ্ঞাসায় বিচলিত হয়ে আমি নানারূপে বিবর্তিত হয়ে আত্মআবিষ্কার করছি। ওরা আমাকে ধরতে চাইছে, আর আমি নানা ছদ্মবেশে এড়িয়ে যাচ্ছি ওদের। এই লুকোচুরি খেলা চলছে, এই খেলাই আমার প্রেরণা—"

বিশ্বকর্মা নির্বাক হইয়া রহিলেন।

পিতামহ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন।

"অমন হাঁ করে আছ কেন? এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা অস্থির হচ্ছ কেন? এসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। যে যাতে আনন্দ পায়, তাই তার মাথায় ঢোকে। জোঁক তাই রক্ত বোঝে, ভ্রমর বোঝে মধু, আর বিশ্বকর্মা বোঝে মিস্ত্রিগিরি। এ নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—ক্যাঙারু তৈরী শেষ হলে।' তিমি বানিয়ে দিও কিছু। কিছুক্ষণ আগে উত্তর মেরুতে গিয়েছিলাম, দেখলাম তিমি খুব কমে গেছে। সেখানে এমন একদল মানুষ জুটেছে যে বড় বড় তিমিগুলোকে ধরে ধরে সাবাড় করে দিচ্ছে। এই মানুষগুলোকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়া গেছে, তছনছ করে ফেললে সব। ওই যে—সরো এসে গেছে, ওর জন্যই অপেক্ষা করছি, তুমি যাও এবার।"

একটা অপরূপ সুর দ্বারপথে প্রবেশ করিল। বিশ্বকর্মা বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রস্থান করিলেন না, তিনি দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেবী বীণাপাণির অভিনব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সুর ক্রমশ ঘনীভূত হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সহসা সুর থামিয়া গেল, আলোক বিকশিত হইল। বিশ্বকর্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন—সহস্রবর্ণ এক শতদল শূন্যে বিকশিত হইয়াছে, ক্রমশ দেবী বীণাপাণি তাহার উপর মূর্ত হইলেন।

পিতামহ পুলকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—"সরো, বড্ড বেশী ভড়ং করছ তুমি আজকাল। চার্বাককে ভোলাবার জন্যে এসব দরকার হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অতটা না-ই করলে। আচ্ছা সরো, ভবিষ্যৎ যুগেও চার্বাক থাকবে না কি।"

সরস্বতীর অধরে একটি মৃদু হাস্য কম্পিত হইতেছিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—'অনন্ত জিজ্ঞাসাই তো যুগে যুগে চার্বাকের রূপে মূর্ত হয়েছে পিতামহ। আপনারই প্রেরণা তো সৃষ্টি করেছে তাদের। ভবিষ্যৎ যুগেই বা সে থাকবে না কেন। জিজ্ঞাসার তো অন্ত নেই।"

পিতামহ হাসিয়া বলিলেন—"জিজ্ঞাসার অন্ত থাকলেও বা থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কোনও অন্ত নেই। তুমিই তো নাচাচ্ছ আমাকে। শুধু আমাকে কেন বিষ্টুকেও। মহাদেবকেও। যিনি সরস্বতী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই দুর্গা। তুমি কম না কি!"

পিতামহ আবেগভরে অগ্রসর হইয়া বীণাপাণিকে চুম্বন করিলেন।

"কি বলছেন পিতামহ, লক্ষ্মীর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া—"

"ওসব বাইরের মৌখিক ঝগড়া। আসলে তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা তিনজনেই এক। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরের জন্যে এককে ভেঙে তিন করতে হয়েছে। একটাকে নিয়ে তিন জনে তো আর কাড়াকাড়ি করা যায় না। ওঃ। এককালে কি মারপিটই করা গেছে—"

"কি হয়েছিল বলুন না।"

"সে অনেক কথা, অত কথা বলবার এখন সময় নেই।"

"একটু বলুন না—।"

"কি হবে সে সব শুনে। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক এস। ভাবীকালের চার্বাক কেমন হবে, তার পরিণতি কি হবে, তারই একটা আঁচ দাও বরং তুমি।"

"তা দেব। কিন্তু আপনি আগে ওই কথাটা বলুন।"

"কি মুশকিল! ছাড়বে না যখন শোন তবে। ডিম ফেটে আমি যখন বেরুলাম তখন দেখি কোথাও কেউ নেই। চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। ভাবলাম ভালই হয়েছে, আমাকে যখন সৃষ্টি করতে হবে তখন চারিদিকে ফাঁকা থাকাই ভাল। নিজের সৃষ্টি দিয়ে চারিদিক পরিপূর্ণ করে' তুলব। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চারিদিকে। ভাবতে লাগলাম প্রথমে কি সৃষ্টি করা যায়। অনেকক্ষণ ভেবে স্থির করলাম সৃষ্টির প্রাণ হচ্ছে রস। সুতরাং প্রথমে রসসৃষ্টি করতে হবে। যেমনি কথাটি মনে হওয়া আর অমনি চারিদিক জলে থৈ থৈ করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে ভাসতে ভাসতে বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কে হে। বিষ্ণু উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি বললাম—কি রকম, সৃষ্টিকর্তা তো আমি। আমার কথা শুনে বিষ্ণু এত চটে গেলেন যে চড়াৎ করে তাঁর কপালটা ফেটে গেল, আর সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলেন রুদ্র। ইনিই পরে মহাদেব হয়েছেন। এঁকেও জিজ্ঞেস করলাম—বাবাজি, তুমি কে। বাবাজি উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি তো অবাক! দু'জনকে দেখেই তখন অবাক্ হয়েছিলাম। তেত্রিশ কোটি তখনও জোটেনি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মহাশূন্য অতি মধুর কলহাস্যে শিউরে উঠল যেন! ঘাড় তুলে দেখি অপরূপ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি মহাশক্তি। আমাকে যিনি লাভ করতে পারবেন তিনিই হবেন সৃষ্টিকর্তা, কারণ আমার সহায়তা ভিন্ন কোনও সৃষ্টিই হতে পারে না।" তিনজনই তখন উদ্বাহু হয়ে ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। তিনিও ছোটেন, আমরাও ছুটি। কিছুদূর ছোটবার পর বিষ্ণু জাপটে ধরে ফেললে তাকে। তারপর আমি এসে দু'জনকেই জাপটে ধরলুম। ময়শা মোটা মানুষ, অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেও শেষকালে এসে আমাদের তিনজনকেই জাপটে ধরলে। চরম জাপটা-জাপটি চলছে জলের ভিতর, হঠাৎ আমার মনে হল এই ধস্তাধস্তিতে অমন সুন্দর মেয়েটি বোধহয় মারা গেল। আহা, ওকে যদি কোনরকমে সরানো যায়! আমার ক্ষমতা আছে, তোমরা বোধহয় জান না, আমি যক্ষুণি যা মনে করব তক্ষুণি তাই হয়ে যাবে। আমি মনে করবামাত্র মহাশক্তি অন্তর্ধান করলেন, কোথায় বা কি ভাবে তা আমি এখনও জানি না। তিনজনে মিলে বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে যখন আমরা গলদঘর্ম এবং পরিশ্রান্ত তখন বিষ্ণু সকাতরে মহাদেবকে বললেন—আপনি আমার পিঠের উপর থেকে নামুন, আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি সরে পড়েছে। মহাদেব আমাকে বললেন, আমার কোমরটা ছাড়ুন তাহলে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি সত্যিই মহাশক্তি নেই। বিষ্ণু আর কথাবার্তা না বসে চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে সরে পড়লেন। মহাদেব আমার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আপনি কে বলুন দেখি। বললাম—আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা! মহাদেব হেসে বললেন—তাই না কি। আপনিও সৃষ্টিকর্তা? আচ্ছা, আমার জন্যে বেশ নধর একটি ষাঁড় তৈরি করুন দেখি। আমি বললাম—কেন ষাঁড় নিয়ে কি হবে? মহাদেব বললেন—এই জলে ছপ ছপ করে কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। একটা ষাঁড় পেলে তার পিঠে চড়ে বেড়াতাম। আমি

বললাম—তুমি তো নিজেই সৃষ্টিকর্তা বাবাজি, নিজেই নিজের ষাঁড় সৃষ্টি করে নাও না। ময়শা কি বললে জান? বললে—আমি নিজের জন্যে কখনও কিছু সৃষ্টি করব না। যা কিছু করব পরের জন্যে। কি ধূর্ত দেখ। আসলে ও দেখতে চাচ্ছিল যে আমি সত্যি কিছু করতে পারি কি না। দিলাম একটা ষাঁড় সৃষ্টি করে। বিরাট এক ষাঁড়। ময়শা টপ করে চড়ে বসল তাতে। আমার দিকে ফিরে বললে—আমি চললুম, আবার দেখা হবে। পারেন তো আমার জন্যে একটা ভালো পাহাড় তৈরি করে দেবেন। আমিও কম ধূর্ত নই, সঙ্গে সঙ্গে বললাম—তোমার জন্যে তো ষাঁড় তৈরি করে দিলুম, তুমি আমার জন্যে কিছু একটা করে দিয়ে যাও। নিজের জন্যে কিছু করাটা সত্যিই ভাল দেখায় না। ময়শা বললে—বেশ, আপনি কি চান বলুন। আমি বললাম—আমার জন্য একটি হাঁস করে দাও বাপু। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র চলবে। ময়শার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। আকাশের দিকে চেয়ে তিনটি তুড়ি মারলে কেবল, আর পাখা ঝটপট করতে করতে বিশাল এক রাজহংস নেবে এল আকাশ থেকে। ময়শা ষাঁড়ে চড়ে চলে গেল। আমিও চড়ে বসলুম হাঁসের পিঠে। হাঁস উড়ে চলল মহাশূন্যে, অন্ধকার মহাশূন্যে. তখনও সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হয়নি, বাতাসও সৃষ্টি হয়নি। সেই নিবাত নিষ্কম্প অন্ধকারে হাঁসের পিঠে চড়ে আমি উড়ে চললুম। কতকাল যে চলেছিলুম তা জানি না। যে সৃষ্টি তখনও হয়নি, সেই সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ দেখলাম—খানিকটা অন্ধকার কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে। আর একটু কাছে যেতেই কথা শুনতে পেলাম। অন্ধকার মহাশূন্য বাণীর আবেগে কাঁপছিল। শুনতে পেলাম—কোথায় তুমি, আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে সফল কর, সৃষ্টির উল্লাসে আমাকে বিকশিত কর, অন্ধকারের অন্তরালে আমাকে সংহরণ করে রেখেছ কেন সৃষ্টিকর্তা। নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মুক্তি দাও আমাকে। আমার হাঁস মহাশূন্যে পক্ষ বিস্তার করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল—এরই উদ্দেশ্যে সে যেন উড়ে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম—কে তুমি? কাকে ডাকছ? উত্তর পেলাম—আমি মহাশক্তি। তোমাকেই ডাকছি। তোমারই কল্পনার নির্দেশে আমি এই অন্ধপুরীতে অজ্ঞাতবাস করছি। আমাকে মুক্ত কর, তুমি বললেই আমি মুক্তি পাব। তোমাদের তিনজনের কলহ-নিবারণের উপায়ও আমি ভেবে রেখেছি। আমাকে মুক্তি দাও, সব বলছি। অপরূপ এক কল্পনায় আমার চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে, আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে প্রকাশ কর। আমি বললাম—মুক্ত হও। অন্ধকারের আবরণ সরে যাক। তোমার সম্পূর্ণ মহিমায় তুমি প্রকাশিত হও। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি প্রকাশিত হলেন। মহাশূন্যের প্রগাঢ় অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আবার আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। আমি বললাম—কলহ নিবারণের কি উপায় ভেবেছ এইবার বল। মহাশক্তি বললেন—বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও সৃষ্টিকর্তা, ওঁদেরও বঞ্চিত করলে চলবে না, ওঁদের বঞ্চিত করলে তোমারই সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ঠিক করেছি আমি ত্রিধা-বিভক্ত হব। আমার এক একটি ভাগ এক একজনের কাছে থাকবে। আর একটি ব্যবস্থাও করতে হবে। তোমাদের তিনজনের কাজ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। তোমার অফুরন্ত সৃষ্টির কাজ যদি অনাদিকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও তাহলে তোমার এই বিশাল সৃষ্টির দেখাশোনা করবার ভার আর একজনকে নিতে হবে। তুমি নিজে যদি সে ভার নিতে যাও তাহলে তুমি বৈষয়িক হয়ে পড়বে—আর স্রষ্টা থাকবে না। আমার মতে বিষ্ণুকে তুমি পালনকর্তা করে দাও। আর মহাদেবকে কর সংহার-কর্তা, কারণ সৃষ্টিকে চিরনবীন রাখতে হলে পুরাতনকে অপসারিত

করতে হবে। মহেশ্বর সেই কাজ করুন। সৃষ্টি ব্যাপারকে অনাবিল অব্যাহত রাখতে হলে এই তিনটি জিনিসই দরকার। তোমরা তিনজন সৃষ্টিকর্তা এই তিনটি বিষয়ের ভার নাও, তাহলে তোমাদের ঝগড়াও থাকবে না, সৃষ্টিও নব নব বৈচিত্র্যে ভরে উঠবে। আমি বললাম—কল্পনাটি করেছ মন্দ নয়, কিন্তু এসব হবে কি করে। মহাশক্তি বললেন—তুমি ইচ্ছা করবামাত্রই হবে। তুমি বললেই আমি ত্রিমূর্তি হয়ে যাব। বলেই দেখ না। আমি বললাম—মহাশক্তি তুমি তিন রূপে আবির্ভূত হও। বলবার সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি অন্তর্হিত হলো। একটু পরেই দেখি তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছ—"

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"কি যা-তা বলছেন বানিয়ে বানিয়ে।"

"এসব তোমার বেদে-পুরাণে নেই। দু'একজন ঋষি তপোবলে খানিকটা খানিকটা জেনেছিলেন তাই বাড়িয়ে-কমিয়ে খাদ মিশিয়ে সাতকাহন করে লিখেছেন। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।"

"বেশ, তারপর কি হল বলুন।"

"তারপর আমি তোমার মুখের দিকে চাইলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ নীচু করলে। বুঝলাম আমাকেই পছন্দ হয়েছে তোমার। আমি আর কালবিলম্ব না করে বললাম—হৃদয়েশ্বরি, আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ কর। বলবামাত্রই কিন্তু তুমি যা করলে তা প্রত্যাশা করিনি। আমি কথাটা বলেছিলুম রূপক ছলে, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি এসে আমার হৃদয় জুড়ে বসে পড়লে। অর্থাৎ বাইরে তোমার আর কিছু রইল না। বহুকাল পরে নদীরূপে তোমাকে যখন ব্রহ্মাবর্তের সীমারেখা করে সৃষ্টি করেছিলাম তখন যেমন তুমি বালির মধ্যে ঢুকে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হয়েছিলে—আমার কাছে প্রথম যখন এলে তখনও তুমি একেবারে আমার অন্তর্লীনা হয়ে গেলে। আমার কল্পনায় ওতপ্রোত হয়ে বিরাজ করতে লাগলে—"

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটেছে তাতো তোমার অজানা নয়। তারপর থেকে আমি যা করেছি তোমারই প্রেরণাতে করেছি। লক্ষ্মী আর দুর্গার দিকে আমি নির্নিমেষে চেয়েছিলাম, তাই প্রথমেই সমুদ্র আর হিমালয় সৃষ্টি করতে হল।"

"কেন—"

"তুমি মনের ভিতর বসে খোঁচা দিতে লাগলে, আর কেন! ক্রমাগত বলতে লাগলে—ওদের সরাও চোখের সামনে থেকে। সমুদ্র সৃষ্টি করে লক্ষ্মীকে রেখে এস তার তলায়, আর হিমালয় সৃষ্টি করে দুর্গাকে পাঠিয়ে দাও সেখানে—"

সরস্বতীর নয়নযুগলে হাস্য টলমল করিতেছিল। তিনি আরও ক্ষণকাল পিতামহের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।"

"তোমার তো মনে থাকবার কথা নয়। তুমি আমার কল্পনায় ভর করে যা কিছু কর তা আমার মনে থাকে। তোমার থাকবে কি করে? তোমার কি তখন এই কুন্দেন্দুকান্তি দেহ থাকে, না মন থাকে? কখনও আলোর মতো—কখনও শিখার মতো—কখনও দেহ-হীন প্রেরণার মতো এসে আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ কর তুমি। তখন তোমার ভাবগতিক একেবারে অন্য রকম থাকে যে।"

"বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হল কবে।"

"মনে মনে তাঁদের আহ্বান করলুম। তাঁরা আমার মানসলোকে এসে হাজির হলেন। মশাই

ষাঁড়ে চেপে প্রথমে এল। আমার সব কথা শুনে বললে—বেশ, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, বিষ্ণুকে ডেকে একটা পরামর্শ করুন। কিন্তু তার আগে খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা দরকার যে। জলে ছপছপ করে কাঁহাতক ঘুরে বেড়ানো যায়। আমাকে যে কাজ দেবেন তাতেই আমি রাজি আছি। একটি বেশ উঁচু দেখে পাহাড় করে দিন আমাকে, আর আমি কিছু চাই না। এই বলে মহেশ্বর তো অন্তর্ধান করলেন। আমি তখন সেই বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে তেকোনা একটা স্থলভাগ সৃষ্টি করলাম, আর তার একদিকে করলাম একটা পাহাড়। তোমার ভারতবর্ষ আর হিমালয় গো। সেই তেকোনা জায়গায় বিষ্ণু একদিন ঠেকলেন এসে ভাসতে ভাসতে। মহাদেবও এলেন। সেই ত্রিভুজাকৃতি স্থানের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের তিনজনের চুক্তি—আমি হব সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হবেন পালনকর্তা এবং শিব হবেন সংহারকর্তা। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার কথা রইল যে, আমি যখন খুশী আমার সৃষ্টির হিসাব তার কাছে একদিন দাবি করতে পারব। বিষ্ণুও রাজি হল তাতে। এইবার বিষ্ণুর কাছে হিসাবটা একদিন দাবি করব ভাবছি। আগে ভবিষ্যৎলোকটা সৃষ্টি করে ফেলি, তারপর সেই ভবিষ্যৎলোকেই বিষ্ণুকে টেনে আনা যাবে একদিন।"

বিশ্বকর্মা এই পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যৎলোকে কিন্তু আর একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

"কি বল তো।"

"দেবসেনা এবং দৈত্যসেনা বলে আপনার দু'টি মুখরা পত্নী জুটবে।"

"তাতো জানিই। আসলে ও দু'টি স্বৈরচর। ওরা নানারকম হবে। অপ্সরী হয়ে দেবতাদের ভোলাবে, মাছ হয়ে সমুদ্রে-নদীতে সাঁতরে বেড়াবে, খেঁকি কুকুর হয়ে পথেঘাটে ঝগড়া করবে। শেষকালে কিছুদিনের জন্যে ওদের শখ হবে স্বয়ং ব্রহ্মার পত্নি হয়ে ব্রহ্মার উপর প্রভুত্ব করতে! তাই হবে।"

"তারপর ওদের পরিণতি কি হবে?"

"সে তো ঠিক করবে তুমি। চার্বাকের কাছে যে ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছ তাতো সাংঘাতিক। তাই যদি তোমার প্রাণের বাসনা হয়, তাহলে তাও পূর্ণ করতে আমি ইতস্তত করব না। তোমার বা তোমার চার্বাকদের ছুরির তলাতেই গলা বাড়িয়ে দেব।"

ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া দেবী বীণাপাণি বলিলেন—"আমি চার্বাকের কাছে কোনও ইচ্ছে তো প্রকাশ করিনি।"

"বাঃ, তাকে বলনি যে পিতামহকে হত্যা না করলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না?"

"বলেছি। বলা প্রয়োজন মনে করেছি বলে বলেছি। কিন্তু আপনি কি করে মনে করলেন যে ওটা আমারই প্রাণের ইচ্ছে? যান, আপনার কোনো ব্যাপারে আর আমি থাকব না।"

পিতামহের মুখমণ্ডলে হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বীণাপাণির কটিদেশ বেষ্টন করত পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন—"একটু রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় তাই একটু রাগিয়ে দিলুম। আমি কি তোমার মনের কথা জানি না? তোমারও কি আমাকে চিনতে বাকী আছে সখি? তোমার বীণার সুরই যে আমি, আর আমার বীণারও সুরই যে তুমি, আমরা পরস্পরকে বাজাচ্ছি, চিরকাল বাজাব। ভাবী যুগের চার্বাকের ছবি কি রকম এঁকেছ একবার একটু দেখাও—"

বীণাপাণি হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"মাঝে মাঝে একটু রাগের ভান না করলে আপনাকে কাছে পাওয়া যায় না। ভাবী যুগের চার্বাকের ছবি আঁকবে ভাবী যুগের কবি। সেই কবির কাছেই নিয়ে যাব আপনাকে।"

"কোথায় আছেন তিনি—"

"ভবিষ্যৎলোকে। সেখানে তিনি যে গল্পটা লিখবেন সেইটেই আপনি দেখে আসবেন মাঝে মাঝে গিয়ে।"

"বেশ।"

"তুমি যে ভবিষ্যৎলোকের কথা ভেবেছ, কত দূরে সেটা।"

"বেশী দূরে নয়।"

"অর্থাৎ স্বৈরচরদের তখনও প্রাধান্য হয়নি?"

"না, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে"

"কি রকম?"

"সে দেখবেন তখন।"

পিতামহ হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে বীণাপাণির মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দেহ হইতে একটা স্বচ্ছ সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই আলো দেখিতে দেখিতে বীণাপাণির সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পিতামহের অন্তরোৎসারিত প্রেম যেন সবুজ আলোর রূপ ধরিয়া বীণাপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছে। ক্রমশ দেবী বীণাপাণিও যেন সম্মোহিত হইয়া চিত্রার্পিতবৎ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর পিতামহ বলিলেন—"সরো, একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে?"

"কি বলুন।"

"তোমার কি বিশ্বাস সত্যি আমি আছি?"

"হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার মানে?"

"চার্বাকদের যুক্তি-টুক্তি শুনে মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয় যে আমি বোধ হয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হয় যে ওই চার্বাকদের বুদ্ধি যখন তুমিই যোগাচ্ছ, তখন তোমারও ধারণা বোধ হয় যে আমি নেই। আমরা পরস্পরকে বোধ হয় ঠকিয়ে চলেছি, আমরা কেউ বোধ হয় নেই—কিন্তু মনে করছি যে আছি।"

বীণাপাণির মুখমণ্ডল এক অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হইল। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"ওই মনে করাটাই যে থাকা। অস্তিত্বের আর কি প্রমাণ আছে বলুন—"

"তবে ওরা যে বলছে—"

"ওরা বলছে না, ওদের আমরা বলাচ্ছি, ওদের যুক্তির নিকষে আত্মপ্রকাশ করছি আমরা।"

পিতামহ পুনরায় আবেগভরে বীণাপাণিকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমাকে ঠকাবার জো নেই। একটু আগে ঠিক এই কথাই আমি নিজে বিশুকে বলছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে দেখে খুশি হলাম। যাক্, আমরা আছি তাহলে! আচ্ছা, শ্রীমান চার্বাককে মড়ার কাছে হাজির করেছ কেন বল দেখি? অমন বিরাটদেহ মড়া পেলেই বা কোথা থেকে তুমি।"

"আমি তো ওকে মড়ার কাছে নিয়ে যাইনি। ওর অবচেতন লোকের কৌতূহলই ওকে মড়ার কাছে নিয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে মানুষই যখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তখন সৃষ্টিকর্তার কিছু খবর ওর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই আমি ওদের অবচেতন লোকে শবদেহ শুইয়ে দিয়েছি একটা। কালকূটের অবচেতন লোকেও ঠিক ওই একই ঘটনা ঘটেছে কি না, সে-ও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—"

"অত বড় মড়া তুমি পেলে কোথায়—"

বীণাপাণি হাসিয়া বলিলেন—"ওটি আমার প্রণয়ী দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ, আমার অনুরোধে মড়া সেজে শুয়ে আছে—"

"বল কি! প্রণয়ী জোটালে কবে আবার?"

বীণাপাণি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"রোজই জুটছে অর্থাৎ আপনিই নানারূপে এসে জুটছেন আমার কাছে!"

"বাজে কথা। আমি দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হতে যাব কোন্ দুঃখে?"

বলিয়াই পিতামহ হাসিয়া ফেলিলেন এবং বীণাপাণির থুতনি ধরিয়া বলিলেন—"কত রঙ্গই না জান! আচ্ছা কালকূটের ব্যাপারটা কি বল তো। ও হঠাৎ ক্ষেপল কেন?"

"ও প্রমাণ করতে চায় যে বর্ণমালিনী কারো চেয়ে খাটো নয়, অন্তত মেঘমালতীর চেয়ে নয়।"

পিতামহ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"মেঘমালতী আবার কে?"

"কিছুদিন আগে আপনিই তো মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে ওই অপ্সরীটিকে সৃষ্টি করেছেন!"

পিতামহ অধিকতর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। কিন্তু সৃষ্টি করবামাত্রই তো ইন্দির তাকে শচী দেবীর সখী করে নিয়েছে, মানে গ্রাস করে বসে আছে; সে পাতালে গেল কি করে।"

"আপনারই চক্রান্তে।"

"আমার?"

"ভ্রমর সেজে যাননি তার কাছে?"

পিতামহের মুখমণ্ডল পুনরায় হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি কি করে টের পেলে বল দিকি?"

"কি মুশকিল, সেই ভ্রমরের কণ্ঠে যে গান ছিল তাতে আমিই তো সুর দিয়েছি। একটা কথা কিন্তু বুঝিনি, মেঘমালতীকে পাতালে পাঠালেন কেন। আপনার মনের ভাবকে আমি সুরে গেঁথে তাকে জানালাম বটে যে 'ওগো মেঘমালতী পাতালপুরীতে প্রবালশাখায় সোনার চাঁপা ফুটে আছে তোমারি অপেক্ষায়, তুমি যাও সেখানে, তাকে তুলে এনে তোমার কবরী অলঙ্কৃত কর—কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কেন তাকে পাতালে যেতে বলছেন—"

"কালকূটকে তাতাবার জন্যে—"

"তাতে লাভ।"

"কাব্য জমবে। মেঘমালতী শুদ্ধ ভাষায় কিন্তু বেশ ধাতানি দিয়েছিল ছোঁড়াকে। মনে আছে তোমার কথাগুলো—"

"আছে বই কি। কথাগুলো যে আমারই তৈরি। মেঘমালতী বলেছিল—'আমি সেই শচীদেবীর সহচরী যিনি ইন্দ্রাণী, যিনি অনন্যা, আমি স্বর্গের অপ্সরী, আমি দেবভোগ্যা। তোমার স্পর্শ পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারব না। নাগকন্যা বর্ণমালিনীকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক।' আপনার মনের ভাবকেই আমি ভাষা দিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি কেন আপনার মনে এ ভাব জাগছে।"

"সত্যি পারনি?"

"না।"

"আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধাক্কা মেরে বেড়াচ্ছি—কোথাও সাড়া মেলে কি না। অধিকাংশই নিঃসাড়। কালকূট, চার্বাক দু'জনেই কিন্তু সাড়া দিয়েছে, এইবার ওরা কি করে দেখা যাক। তুমি বলছ—চার্বাক আর কালকূট দু'জনের অবচেতনলোকেই কামনা-মায়ানদী আছে, শবদেহও আছে?"

"আহা, নিজে যেন কিছু জানেন না!"

"তোমার মুখ থেকে শুনলে বেশ নতুন নতুন ঠেকে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ তো এখন মড়া সেজে শুয়ে আছে, তারপর ওরা যখন গিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করবে তখন ও কি করবে?"

"দেখতেই পাবেন।"

"দানবটাকে পাকড়ালে কোথায়?"

"আপনারই খেলা-ঘরে, আপনারই প্রেরণায় সৃষ্টি করেছি ওই স্বৈরচরকে। প্রথমে ছিল ও একটা মশা, আমার কানের কাছে এসে গুন্ গুন্ করত আর মনে মনে ভাবত--আহা! আমি যদি দৈত্য হতাম একে বাহুপাশে বাঁধতে পারতাম। আপনারই মন্ত্রে দিলাম ওকে দৈত্য করে এবং নিজে হয়ে গেলাম মশা। ও তখন আমাকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, আর আমি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। এই সময়ে আপনি আমাকে স্মরণ করলেন চার্বাক আর কালকূটের জন্য। ওদের অবচেতনলোকে আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম শবদেহ। তখন মশকরূপে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের কানে কানে বললাম—তুমি ওদের অবচেতনলোকে গিয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাক, তাহলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

"ও বাবা, এত কাণ্ড করেছ তুমি, কিচ্ছু তো জানি না।"

পিতামহ বেশীক্ষণ কিন্তু ভান করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন—"আমিই যে মশা সেজে তোমার কানের কাছে গুন্‌গুন্ করছিলাম তা তুমি টের পেয়েছিলে?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বীণাপাণি সহাস্যে উত্তর দিলেন—"না, তা কি আর পেয়েছিলাম!"

"নিজে পট করে মশা হয়ে গিয়ে ভারী মুশকিলে ফেলেছিলে আমাকে। তোমাকে এঁটে ওঠা শক্ত।"

সহসা এক সুমিষ্ট মাদকগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতামহ বলিলেন—"ডাক এসেছে। এবার যেতে হবে।"

"কার ডাক।"

"পারিজাতের। ইন্দিরের বাগানে কাল এক পারিজাত কুঁড়িকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে তুমি ফুটলেই আমি আসব। আমাকে খবর দিও। খবর এসে গেছে, দুজনেই যাই চল।"

"পারিজাতকুঞ্জে কখন গিয়েছিলেন?"

"গভীর রাত্রে, শিশিরের রূপ ধরে। তুমি তখন তারায় তারায় আলোর গান গাইছিলে। চল. যাই।"

"চলুন। চার্বাক আর কালকূট কিন্তু শবের কাছাকাছি এসে পড়েছে।"

"আসুন না, আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে। প্রজাপতির রূপ ধরে যাই চল।"

"চলুন।"

দুইটি রঙীন প্রজাপতি বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

।। ছয় ।।

চার্বাক এবং কালকূট উভয়েই বিরাট শবদেহটিকে নীরবে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা সরিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে কালকূট চার্বাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার মনে হচ্ছে এমনভাবে পরিক্রমা করলে কোনও লাভ হবে না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। শবদেহের বহিরঙ্গে তো ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পাচ্ছেন কি?"

"না, আমিও পাচ্ছি না। আমার এ-ও মনে হচ্ছে যে শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করেও যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলেও ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাব না। আমার কৌতূহল আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। ব্রহ্মা কোথাও যদি থাকেন জীবন্ত পরিবেশের মধ্যেই থাকবেন, মৃতদেহের মধ্যে তাঁকে সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যা মৃত তার মধ্যে কেবল মৃত্যুই থাকা সম্ভব, জীবনের সন্ধান তার মধ্যে মিলবে কি?"

"মৃত্যুর মধ্যেই কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা একদিন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞরূপ মৃত্যু যখন তাঁদের কবলিত করেছিল, তখন সেই মৃত্যুর মধ্যেই তাঁরা বাঁচবার মন্ত্র লাভ করেছিলেন। সুতরাং এ মৃতদেহ মৃত বলেই তাকে তুচ্ছ করতে পারি না। হয় তো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এর মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন। এ শবদেহকে ছিন্নভিন্ন করেই দেখতে হবে।"

"বেশ, দেখুন। কিন্তু ছিন্নভিন্ন করবেন কি করে? আপনার কাছে কি কোনও অস্ত্র আছে?"

"আছে।"

কালকূট কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন।

চার্বাক বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি কার প্ররোচনায় এই শবদেহ লক্ষ্য করে এসেছেন? আমি তো এসেছিলাম আমার কৌতূহলের নির্দেশে। আপনি?"

"আমার নির্দেশ আমার অন্তরের মধ্যেই ছিল। বাল্যকালে আমি একবার সর্পদেহ ধারণ করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করছিলাম। সেই সময় একদিন এক চণ্ডাল আমার পিঠে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে দংশন করি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। চণ্ডালের যে মৃত্যু হবে তা আমি প্রত্যাশা করিনি। সুতরাং আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। অভিভূত হয়ে পাশের এক ঝোপে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম চণ্ডালের গতি কি হয়। কিছুক্ষণ পরে চণ্ডালপত্নী হাহাকার করতে করতে হাজির হল, চণ্ডালের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরাও এল। চণ্ডালকে তুলে নিয়ে গেল

তারা। আমিও কৌতূহলবশত তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা চণ্ডালকে নিয়ে গিয়ে এক নদীতে নিক্ষেপ করলে। শুনলাম, সর্পাহত ব্যক্তিকে না কি দগ্ধ করতে নেই। সে না কি সম্পূর্ণ মরে না, হয় তো আবার বেঁচেও উঠতে পারে এই জন্য তাকে দগ্ধ করা নিয়ম নয়। চণ্ডালকে নদীতে নিক্ষেপ করে সবাই চলে গেল—আমি কিন্তু যেতে পারলাম না, নদীর তীরের এক ঝোপের মধ্যে বসে আমি সেই ভাসমান শবের দিকে চেয়ে রইলাম। গ্রন্থকার যেভাবে তার প্রথম গ্রন্থের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে আমিও তেমনি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইলাম আমার প্রথম কীর্তির দিকে। নদীতীরেই যে শ্মশান ছিল তা আমি জানতাম না। কিছুক্ষণ পরেই লেলিহান অগ্নিশিখায় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জ্বলন্ত চিতা পূর্বে আর কখনও দেখিনি। ভীত হয়ে আরও দূরে সরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে চিতার আগুন নিবে গেল। শ্মশান কিন্তু অন্ধকার হল না। দেখলাম মশাল হস্তে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি চতুর্দিকে কি যেন অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। তার প্রদীপ্ত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কপালে সিন্দুর তিলক, এক হস্তে মশাল, আর এক হস্তে ত্রিশূল। আমি আরও ভীত হয়ে আরও দূরে সরে গেলাম। আমার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হল না। একটি বৃক্ষে আরোহণ করে আমি সেই মশালধারী ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যা দেখলাম তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি নদী থেকে সেই চণ্ডালের শবকে টেনে তুলছে, টেনে তুলে কাঁধে করে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাট একটি বটবৃক্ষ ছিল, সবিস্ময়ে দেখলাম কাপালিক শবদেহকে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের তলদেশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আর থাকতে পারলাম না, গাছ থেকে নেমে পড়লাম। বটবৃক্ষের সমীপস্থ হয়ে যা দেখলাম তা আরও অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই ভীষণদর্শন কাপালিক চণ্ডাল-শবের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। শবের মাথার দিকে মশাল জ্বলছে, আর পায়ের দিকে পোঁতা আছে ত্রিশূলটা। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বটবৃক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাখাপল্লবকে প্রকম্পিত করে মধ্যে মধ্যে একটা কর্কশকণ্ঠ পেচক চীৎকার করছে শুধু। আর কোনও শব্দ নেই। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বটবৃক্ষের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, সহসা কলহাস্যে সচকিত হয়ে দেখলাম চণ্ডালের শবদেহ থেকে অসংখ্য রূপসী নির্গত হচ্ছে, পচা মাংসপিণ্ড থেকে যেমন কীট নির্গত হয়, তেমনি সেই শবদেহ থেকে রূপসী নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে রূপসীর হাট বসে গেল কাপালিককে ঘিরে। তারা কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে, কেউ নৃত্য করছে, কেউ নানা দেহভঙ্গী করে কাপালিকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। সে রকম রূপসী আমি জীবনে কখনও দেখিনি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-শিখা যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। আমি স্বচক্ষে দেখলাম তারা সেই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বহির্গত হচ্ছে আবার সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হল ওই শবদেহ যেন অত্যন্ত রূপের আকর, অনন্ত সম্ভাবনার লীলাক্ষেত্র। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সেই রূপসীরা যখন কাপালিকের তপোভঙ্গ করতে পারলে না, তখন মরীচিকাবৎ তারা অন্তর্ধান করলে সহসা। যে অন্ধকার তাদের কলহাস্যে ছন্দিত হচ্ছিল সে অন্ধকার হঠাৎ আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকও নিঃশব্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। আমিও অভিভূত হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে হতে লাগল যে

আমার বিষই হয় তো ওই চণ্ডালকে অনন্ত সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকটা চীৎকার করে উঠল আবার। তারপর দেখতে পেলাম একটা রক্তাভ আলোয় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, আর সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। তার নির্নিমেষ চক্ষু দুটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো জ্বলছে। ক্রমশ দেখলাম তার দেহ থেকে দেহহীন মুণ্ড, মুণ্ডহীন কবন্ধ, বিকটদশনা প্রেতিনী, সিংহবদন কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একচক্ষু পিশাচ, বহুবাহু দানব প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাণী সকল নির্গত হতে লাগল। তাদের অট্টহাস্যে, অসংযত নৃত্যে, উদ্দাম কলরবে অন্ধকার শিউরে উঠতে লাগল বারম্বার। কর্কশকণ্ঠ পেচকটা উন্মাদের মতো চীৎকার করতে লাগল তাদের ছন্দ-তাল-হীন অনৈক্য তানের সঙ্গে সঙ্গে। কাপালিক কিন্তু নির্বিকার। ধীর স্থির ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন তিনি। মনে হল তিনি যেন অন্ধ এবং বধির, কিম্বা যেন একটা শবাসীন শব। এই ভীষণ দৃশ্যও অবলুপ্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণ পরে। আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, পেচকটা নীরব হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে। নূতন ঘটনা ঘটল আবার একটু পরেই। প্রচণ্ড একটা গর্জন হল, আবার রক্তাভ আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অন্ধকার। দেখলাম বিরাট একটা সিংহ কাপালিকের দিকে চেয়ে আছে! ক্রমশ সেই সিংহের চতুর্দিকে জুটল—ব্যাঘ্র, বৃক, শিবা, সারমেয়, তরক্ষুর দল। সবাই চিৎকার করতে লাগল। সেই চণ্ডালের শবদেহ থেকে আরও যে কত প্রাণী বার হতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ কীট, ভীষণদর্শন পতঙ্গ, রোমশ গুটিপোকা, আরও কত কি। কীটপতঙ্গের দল কাপালিকের সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে বেড়াতে লাগল, আর শ্বাপদকুল চীৎকার করতে লাগল তাঁর চতুর্দিকে। কাপালিক কিন্তু বিচলিত হলেন না একটুও। নিস্পন্দ নীরব হয়ে বসে রইলেন। আবার সব মিলিয়ে গেল, আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আমি আচ্ছন্নের মতো সেই বটবৃক্ষের একটি কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলাম। মনে হল কে যেন আমার কানে কানে বলতে লাগল—এইবার তুমি যাও, ওই কাপালিকের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধর, ওকে বিচলিত কর, তা না হলে দ্বার খুলে দিতে হবে ওকে, যে দ্বার আমি প্রাণপণে বন্ধ করে রেখেছি, সে দ্বার আমি কিছুতে খুলব না, সেই দ্বারে ও করাঘাত করছে, ওকে অন্যমনস্ক করতে না পারলে দ্বার খুলে দিতেই হবে। তুমি ওকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা কর, ওকে বেষ্টন কর, ওর মুখের কাছে ফণা বিস্তার করে তর্জন কর। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি। উত্তর পেলাম—আমি প্রকৃতি। মানুষ আমার রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনছ করে দিতে চায়। সহজে আমি সেখানে ঢুকতে দিই না কাউকে। কিন্তু একাগ্রচিত্তে কেউ যদি ক্রমাগত আমার দ্বারে আঘাত করে তাহলে আমাকে দ্বার খুলতেই হয়, নিরুপায় হয়ে খুলতে হয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের অন্যমনস্ক করে দেওয়া। এই লোকটা যে মুহূর্তে ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানে এসে চণ্ডালের শবদেহের উপর সমাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছে, সেই মুহূর্তেই ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সেই মুহূর্ত থেকে ওর করাঘাতে আমার রুদ্ধদ্বার ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হচ্ছে। তোমারই কীর্তি ওই শবদেহ। ওই শবদেহ না পেলে এ শক্তির পরিচয় ও দিতে পারত না, তুমিই আমাকে এই বিপদে ফেলেছ, তুমিই এখন আমাকে উদ্ধার কর। আমি বললাম—বলেন তো ওকেও গিয়ে দংশন করি। দংশন করবামাত্র ওর মৃত্যু হবে,

আপনিও নিরাপদ হবেন। প্রকৃতি আকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—না, না, ওর মৃত্যু আমি চাই না, ওকে অন্যমনস্ক করতে চাই। ওকে এরকম হীনভাবে হত্যা করে ফেলা আমার লক্ষ্য নয়, আমি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাই ওর দৌড়টা কতদূর, তুমি ওকে দংশন কোরো না, কেবল ভয় দেখাও। গভীর অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি কে, কোথায় আছেন, তাঁর আকৃতি কি রকম—কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে তিনি যদিও ওই কাপালিককে বিচলিত করবার বহুবিধ আয়োজন করছেন কিন্তু মনে মনে যেন উনি কাপালিককে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কাপালিক ওঁর রহস্যালোকে ঢুকে সব তছনছ করুক এতে যেন ওঁর আপত্তি নেই, উনি যেন কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কাপালিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কিনা এবং কতক্ষণে হবেন। আমি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে কাপালিকের দেহে সঞ্চরণ করে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। মনে হল প্রস্তরের উপর সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু একটু তফাত ছিল। প্রস্তর সাধারণত শীতল থাকে, কিন্তু কাপালিকের প্রস্তরবৎ দেহ ছিল উত্তপ্ত। আমি খানিকক্ষণ তাঁকে বেষ্টন করে বার কয়েক তর্জন করলাম। কিন্তু কোনই ফল হল না। কাপালিক নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন! আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না, কাপালিকের উত্তপ্ত দেহ ক্রমশ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে আমাকে নেবে পড়তে হল! তারপর আবার ঘনিয়ে এল নিবিড় অন্ধকার। আমি আবার ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলাম আমার কোটরের মধ্যে। কতক্ষণ যে বসেছিলাম তা জানি না, হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে সচকিত হয়ে দেখলাম যে সেই শবের মুণ্ডটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার মস্তকের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যেন আলোর ফোয়ারা উঠেছে। তারপর সবিস্ময়ে দেখলাম সে যেন হাসছে, তার চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে। মনে হল কাপালিককে সম্বোধন করে কি যেন বলছে সে। কি বলছে তা শুনতে পেলাম না, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলাম এক বিরাট পেচকে আরোহণ করে এক অপরূপ রূপসী আবির্ভূত হলেন। তিনি কাপালিককে সম্বোধন করে যা বললেন, তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। তিনি বললেন—তপস্বি, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এইবার বর গ্রহণ কর, কঠোর তপস্যা থেকে নিরত হও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন এখনই তোমার কাছে এসে স্তূপীকৃত হবে, তোমার তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ তুমি সেগুলি গ্রহণ কর। আর তপস্যা করো না। আমি লক্ষ্মী, আমি তোমাকে বরদান করছি, আর তোমার তপস্যা করবার প্রয়োজন নেই। এই বলে লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। শবমুণ্ডের জ্যোতিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক রকমের অদ্ভুত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সেই আলোকে দেখলাম কাপালিকের চতুর্দিকে মণি-মাণিক্য হীরা-মুক্তা স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি রূপসী। তারাও যেন প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন। তারা প্রত্যেকেই কাপালিককে অনুনয় করতে লাগল, হে তপস্বী এবার তুমি তপস্যা থেকে নিরত হও, আমাদের গ্রহণ কর। কাপালিক কিন্তু নির্বিকার, অচঞ্চল। মনে হল এসব কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করছে না। অনেকক্ষণ অনুনয় বিনয় করে রূপসীরা যখন দেখলেন যে কোনো ফল হচ্ছে না, তখন তাঁরা একে একে অন্তর্ধান করলেন ওই শবদেহের মধ্যে। ওই সব মণি-মুক্তা হীরা-মাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপও বিলীন হয়ে গেল ওই শবদেহেই। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই দিন থেকেই আমি জানি যে শব মৃত নয়, তা অনন্ত সম্ভাবনার আকর!"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"আপনার কাহিনী খুবই মনোজ্ঞ। শব এবং কাপালিকের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি হল?"

"শেষ পর্যন্ত কি হল, তা আমি দেখতে পারিনি। কারণ একটু পরেই দেখলাম গরুড়ে চড়ে স্বয়ং বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। গরুড় আমাদের চিরশত্রু, তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে স্থান ত্যাগ করতে হল আমাকে। কিন্তু সেই দিনই আমি বুঝেছিলাম যে মৃতদেহ অনন্ত সম্ভাবনাময়। এই শবটি খুবই অসাধারণ মনে হচ্ছে, আসুন আমরা দেখি এর মধ্যে কি আছে। আমি যদি কাপালিকের মতো তপস্বী হতাম তাহলে শবারূঢ় হয়ে তপস্যা করতাম এবং খুব সম্ভবত আমার তপস্যা প্রভাবে পিতামহকে টেনেও আনতে পারতাম। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই, আমি বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমি শবকে ছিন্নভিন্ন করে দেখতে চাই পিতামহের কোনও সন্ধান এতে পাওয়া যায় কি না।"

চার্বাক কিছুক্ষণ স্মিতমুখে কালকূটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যদি অনুমতি দেন সেটি ব্যক্ত করি।"

"অবশ্য ব্যক্ত করুন। এর জন্য অনুমতির প্রয়োজন কি।"

"প্রয়োজন এই জন্য যে প্রশ্নটি হয়তো আপনার কোনও গোপন অহঙ্কার বা বেদনাকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। আমিও বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমিও একটা বিশেষ কারণে পিতামহ ব্রহ্মার সন্ধানে বেরিয়েছি এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার হচ্ছে যে উক্ত কারণটি আমার কাছেই স্পষ্ট ছিল না এতক্ষণ, এখনই একটু আগে স্পষ্ট হয়েছে তা। সেই জন্যে মনে হচ্ছে যে আপনিও হয়তো অনুরূপ কোনও কারণবশত এই দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—"

"আপনার কি মনে হয়েছে বলুন।"

"আচ্ছা, আপনার এই অভিযান কি কোনও নারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?"

কালকূটের মুখমণ্ডলে বিস্ময় পরিস্ফুট হইল।

"এ কথা আপনার কেন মনে হচ্ছে বলুন তো।"

"মনে হচ্ছে, কারণ আমি নিজে একটি নারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি।"

"তাই না কি! যদি আপত্তি না থাকে আপনার কাহিনীটি আর একটু বিশদ করুন।"

"আসুন, তাহলে উপবেশন করা যাক।"

বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহের পার্শ্বে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। চার্বাক বলিল—"সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্তকীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমি কিছুকাল থেকে তার হৃদয় জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। হৃদয় জয় কথাটি কবিদের অনুকরণে আমি ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা 'হৃদয়-জয় না বলে' 'হৃদয় ক্রয়' বা 'হৃদয়-অর্জন' বললে ব্যাপারটি আরও সত্যভাবে ব্যক্ত হয়। কারণ উপযুক্ত মূল্য না দিলে কোনো পুরুষ বা রমণীর হৃদয় অধিকার করা যায় না। সাধারণত অর্থমূল্যেই নর বা নারীর হৃদয় বিক্রীত বা বিজিত হয়ে থাকে, কিন্তু সুরঙ্গমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। সুরঙ্গমা রাজ-নর্তকী, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা রক্ষিতা, অর্থের তার কোনও অভাব নেই। কুমার সুন্দরানন্দ তাকে বসনে-ভূষণে মণি-মাণিক্যে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছেন যে ও সবে তার আর রুচি নেই। রুচি থাকলেও কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি পারতাম না। সুতরাং আমি যে মূল্য দিয়ে

তার হৃদয় ক্রয় করবার প্রয়াস পেতে লাগলাম তা যদিও উজ্জ্বল বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের চেয়ে অধিকতর মহার্ঘ, কিন্তু তা বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের মতো স্থূল বস্তু নয়, তা সূক্ষ্ম চিন্তার বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধির প্রাখর্যে দ্যুতিমান। অর্থাৎ আমি আবেদন জানিয়েছিলাম তার বুদ্ধির কাছে।" তাকে বলেছিলাম—'সুন্দরানন্দ ভালবাসছে তোমার দেহটাকে তোমাকে নয়, তোমার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সে উদাসীন, তাই তোমাকে সে যে সব উপহার দিয়েছে তা দেহ-সজ্জারই উপকরণ, তোমার প্রদীপ্ত বুদ্ধিকে প্রদীপ্ততর করতে পারে এমন কিছুই সে দেয়নি। আমি তোমাকে তাই দিতে চাই। তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবন সম্বন্ধে আমি কম সচেতন নই, কিন্তু তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনই যে তুমি নও তা-ও আমি জানি। আমি এ-ও জানি যে তোমার যৌবন চিরস্থায়ী নয়, ওর গতি অধোমুখী, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে যদি সম্যক উপায়ে তাকে লালন কর। তোমার যৌবন যখন থাকবে না তখন তোমার ওই উজ্জ্বল বুদ্ধিই শ্রীমণ্ডিত করবে তোমার দেহকে নবরূপে, তখন যে আভরণে সে মহিমান্বিত হবে তা কোনও স্বর্ণকারের বিপণিজাত অলঙ্কার নয়, কোনও সুন্দরানন্দের মূল্যের অপেক্ষায় তা পরহস্তগত হয়ে থাকবে না, তা তোমার অন্তরোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রভা, তা কোনও দিন মলিন হবে না। আমি আমার সেই অন্তরতম সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, তারই কাছে আনতে চাই আমার অর্ঘ্যভার। আমি চাই আমার দর্শনে তুমি যেমন অপরূপ হয়েছো, তোমার দর্শনেও আমি যেন তোমার কাছে তেমনি অপরূপা হয়ে উঠি। শুধু আমি কেন, তোমার মানবী প্রকৃতি প্রত্যেক সমর্থ মানবকেই নূতন মহিমায় প্রত্যক্ষ করুক, নির্বাচন করুক, আহ্বান করুক। সুন্দরানন্দের কারাগারে তুমি বন্দিনী হয়ে থাকবে কেন?' আমারই এই বক্তৃতায় সুরঙ্গমার নয়নে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরিত হল। গ্রীবাভঙ্গী করে সে বললে—'মহর্ষি চার্বাক, প্রথমেই আপনার একটা ভ্রম অপনোদন করে দিতে চাই সুন্দরানন্দের ঐশ্বর্য-দেখে আমি মুগ্ধ হইনি, আমি মুগ্ধ হয়েছি তার শৌর্যে। ভল্লের এক আঘাতে তাকে বিশাল ব্যাঘ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি, তার সুনিক্ষিপ্ত খড়্গে ভীষণ খড়্গীকে নিপতিত হতে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তার উদারতা, নারীর প্রতি তার সৌজন্য। সে শক্তিমান সভ্য পুরুষ, ধনবান পশুমাত্র নয়।' তার এ কথা শুনে তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম—'আমার ভ্রম অপনোদিত হল। শুধু তাই নয় আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে কুমার সুন্দরানন্দের যে শক্তি তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিই নয়, তা মানসিক উৎকর্ষ। কিন্তু সুন্দরানন্দ কি তোমার মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন? তোমার লীলায়িত নৃত্যছন্দের নেপথ্যে যে শিল্পী নব নব সৃষ্টি স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হচ্ছে তাকে কি সুন্দরানন্দ পূজা করে? না, সে তোমার দেহটা নিয়েই বিভোর কেবল? হয়তো সে শিল্পী-সুরঙ্গমার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সুরঙ্গমার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তা কি সে জানে? সে সব সম্ভাবনাকে মূর্ত করবার চেষ্টা করেছে সে কি কখনও? সে নর্তকী সুরঙ্গমার দেহ-ছন্দকে উপভোগ করতেই অভ্যস্ত, তার মধ্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিককে দেখতে সে কি প্রস্তুত আছে? আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, প্রথমে অবশ্য তোমার দেহ দেখেই। কিন্তু আমি তোমার সমগ্রতাকেও সম্পূর্ণভাবে দেখতে চাই, জাগিয়ে দিতে চাই সেই সুরঙ্গমাকে যাকে কেউ কখনও দেখেনি'। আমার কথা শুনে সুরঙ্গমা বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে লীলাভরে হেসে বললে—'আমি কিন্তু জাগতে চাই না মহর্ষি। কুমার সুন্দরানন্দের নিকট যখন আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম তখন আমাকে তাঁর কুলদেবতা চতুরাননের সম্মুখে শপথ

করতে হয়েছিল যে সুন্দরানন্দ ছাড়া আর কোনও পুরুষের দিকে আমি চাইব না। সে শপথ যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আর জেগে লাভ কি বলুন।' সুরঙ্গমার মুখে যদিও এই ভাষা ফুটল কিন্তু তার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটল তা অন্যরকম। আমি বললাম—'দেখ সুরঙ্গমা. সুন্দরানন্দের পূর্বপুরুষরা প্রস্তরনির্মিত চতুরানন মূর্তির মধ্যে নিজেদের অন্ধ কুসংস্কারকেই মূর্ত করে রেখে গেছেন। তার সম্মুখে যদি কোনও শপথ করেই থাক—তাহলে সে শপথ রক্ষা করবার যে বিশেষ একটা যুক্তিযুক্ত দায়িত্ব আছে তোমার তা আমি মনে করি না। প্রস্তরনির্মিত চতুরাননের সম্মুখে শপথ করারই বা কি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে? তবে শপথটাকেই যদি তুমি মূল্যবান মনে করে তার মর্যাদা দিতে চাও সে স্বতন্ত্র কথা। চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়াননের সঙ্গে শপথকে জড়িত করছ কেন। তোমার শপথ তোমারই শপথ, তা রক্ষা করা না করা তোমারই ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন মানুষ একথা তো কোনো সময়ই ভুলে যাওয়া উচিত নয় সুরঙ্গমা'। সুরঙ্গমা বললে—'আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, আমি কিন্তু করি। আমি বিশ্বাস করি তিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সম্মুখে যে শপথ আমি করেছি তা ভঙ্গ করলে অপরাধ হবে আমার এবং সে অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তিভোগও করতে হবে, ইহজন্মে বা পরজন্মে। আমি বললাম—'তুমি যদি সাধারণ কোনও নারী হতে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে তা মনে হচ্ছে নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন-বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই; কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর এই ধারণাটা।' সুতরাং ও ধারণাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।' সুরঙ্গমা সুমধুর হেসে বললে—'আমি কিন্তু সত্যই চতুরাননের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আপনি কি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে চতুরানন নেই?' আমাকে তখন বলতে হল, 'নিশ্চয় পারি। কিন্তু সে প্রমাণ যদি তুমি সংগ্রহ করতে চাও তাহলে আমার কুটিরে তোমাকে আসতে হবে। তা কি পারবে? সুন্দরানন্দের বিলাসকক্ষের বাইরে যাবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? যদি থাকে এস, আমি ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করব।' তারপর থেকে সুরঙ্গমা প্রায়ই আমার কাছে আসত, তার সঙ্গে অনেক শাস্ত্র অনেক বিজ্ঞান আলোচনা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমি বিশ্বাস কবাতে পারিনি যে চতুরানন নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের সঙ্গে মৃগয়া-অভিযানে চলে গেল মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রবেশ করলাম চিন্তার অরণ্যে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে ব্রহ্মার অনস্তিত্ব আমি প্রমাণ করবই। তারপর থেকে কিন্তু যা যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব।'

কালকূট বলিলেন—"সুরঙ্গমা আপনার কুটীরে বারম্বার আসত তবু আপনি তার হৃদয় হরণ করতে পারলেন না?"

"হৃত বস্তুকে বেশী দিন ন্যায়ত অধিকার করে রাখা শক্ত। অর্জিত বস্তুকেই স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যায়। আমি সুরঙ্গমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করিনি, আমি তা অর্জন করতে চেয়েছিলাম। তাই আমি মনের দিকেই বেশী মন দিয়েছিলাম দেহের দিকে নয়। আমি জানতাম তার মনকে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রভাবিত করতে পারি তাহলে তার দেহ আপনিই এসে ধরা দেবে আমার কাছে। তাই আমি তাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, পক্ষীপতঙ্গদের

জীবনলীলার সত্য রূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছিলাম। তাকে এ-ও বোঝাতে চেয়েছিলাম যে প্রকৃতির এই সত্য রূপকে আচ্ছন্ন করে কতকগুলি ধূর্ত লোক রহস্যের ধূম সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এই ধূমের নাম শাস্ত্র, অন্ধ লোকাচার। জীবনের আলোকে মরণের কুহেলী দিয়ে আচ্ছন্ন করে অদ্ভুত সব প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে তারা। সুরঙ্গমাকে এই প্রহেলিকা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলাম আমি, এমন সময় হঠাৎ সুরঙ্গ-মা একদিন এসে বললে--'কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমাকে মধ্যপ্রদেশে মৃগয়ায় যেতে হবে। কুমারকে আমি বলেছিলাম যে আমি মহর্ষি চার্বাকের কাছে এখন বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছি। মৃগয়ায় গেলে সে পাঠ বিঘ্নিত হবে।' কুমার বললেন—'মহর্ষি চার্বাক পালাবেন না, কিন্তু যে কস্তুরী মৃগদলের সন্ধান পেয়েছি তারা হয়তো পালিয়ে যাবে। আর সদ্য ধৃত বন্য কস্তুরী মৃগ যদি তোমাকে অবিলম্বে উপহার দিতে না পারি তাহলে এই মৃগয়া অভিযানের সার্থকতাই বা কি। এখন আপনি বলুন আমার কি করা উচিত, আমি যাব, না থাকব?' আমি উত্তর দিলাম—'ভদ্রে, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।' সুরঙ্গমা চলে গেল। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমার মনে হল চতুরাননের কাছে ও যে শপথ করেছিল সেই শপথই ওকে টেনে নিয়ে গেল। আমি ওর বিশ্বাস টলাতে পারিনি। আমার সর্ববিধ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল আমি সত্যিই তো ওকে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ দিতে পারিনি। আমি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি সে সব যুক্তি সম্ভবত খণ্ডন করেছেন সুন্দরানন্দের কুলপুরোহিত আচার্য পর্বত-শিখর। আচার্য পর্ব্বত-শিখর ঘোর আস্তিক, তিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন, তাঁর ধারণা আমাদের অবিশ্বাসের মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার মূলে যে বিশ্বাস-প্রবণতা তা তিনি মানতে চান না। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমি পর্বত-শিখরের আশ্রমে গেলাম একদিন। ভাবলাম তাঁকে যদি আমি প্রভাবিত করতে পারি তাহলে সুরঙ্গমাও একদিন না একদিন প্রভাবিত হবেই। কিন্তু গিয়ে দেখলাম পর্বত শিখরে আরোহণ করা কঠিন। আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্যক্ত আত্মা, অব্যক্ত আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য কিন্তু দুরারোহ প্রস্তর-নিচয় তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে তাঁর যুক্তির নাগাল পাওয়া শক্ত। সেখানে গিয়ে কিন্তু আর একজনের নাগাল পেলাম, তাঁর কন্যা ধারামতীর। আমি নাগাল পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিনি, আমাদের আলোচনা শুনে সেই আকৃষ্ট হল আমার প্রতি। জ্যোৎস্নাকুল গভীর নিশীথে একদা আমি কিছু মাধ্বী সুরা এবং বন্য কুক্কুটের মাংস সহযোগে যখন উপলব্ধি করছিলাম যে আনন্দময় জীবনযাপন করার চেয়ে মহত্তর আর কি থাকতে পারে, থাকলেও তার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করবার প্রয়োজনই বা কি, তখন সহসা বল্কলবাসা ধারামতী আমার আশ্রমে এসে প্রবেশ করল। দেখলাম তার দুর্বার যৌবন বল্কলবাসের বাঁধন মানতে চাইছে না। যে শক্তি নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে নিখিল বিশ্বে সতত উন্মুখ তারই প্রকাশ তার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিতে দীপ্যমান। আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসি হেসে সে বললে—''ভগবন, আশা করি আমার আগমনে আপনার আনন্দ বিঘ্নিত হল না। কৌতূহল আমাকে এখানে টেনে এনেছে। পিতার সহিত আপনি এ কয়দিন যে সকল আলোচনা করেছেন তার সারবত্তা হয়তো তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যুগে সকলেই যখন অলীক কল্পলোকের স্বপ্নে আকুল তখন আপনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের ভূমিতে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যে সত্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে সত্যই আমি

মুগ্ধ হয়েছি।" আমি শুনেছিলাম ধারামতী শবরী-কন্যা। শবরী ভল্লুকীর গর্ভে ওর জন্ম। ভল্লুকী ছিল পর্বত-শিখরের পরিচারিকা। পর্বত-শিখরের আশ্রমেই ধারামতীর জন্ম হয়। ধারামতীর পিতা কে তা আমি ঠিক জানি না, অনেকে বলেন পর্বত-শিখরই ওঁর জন্মদাতা; ওঁর প্রবল আস্তিক্য-বুদ্ধি এবং নীতি-বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও ওঁর একবার না কি পদস্খলন হয়েছিল। সে যাইহোক ধারামতীকে যে উনি কন্যা স্নেহে লালন করেছিলেন তাতে কোনও সংশয় নেই, ওঁর বিদ্যা বুদ্ধি এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ওঁকে শিক্ষাও দিয়েছিলেন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, সুতরাং ধারামতীর কথা শুনে প্রথমে আমি বিস্মিত হলাম। সন্দেহ হল হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে। বললাম—"ভদ্রে, তুমি আসাতে আমার আনন্দ বিঘ্নিত হয়নি, কিন্তু তুমি আসাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তুমি যে পরিবেশে লালিত হয়েছ তোমার আচরণ ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না। তবু যখন এসেছ, বস।"

আমার কথা শুনে ধারামতী আমার পার্শ্বে উপবেশন করে হেসে বললে—"পর্বত স্থাণু হতে পারেন কিন্তু তার থেকে যে ধারা নির্গত হয় তা চঞ্চলা। সুতরাং পর্বতের স্বভাব দেখে ধারার বিচার করবেন না"। উপমাটি শুনে আমি খুব খুশী হলাম। বললাম—"তাহলে আপত্তি যদি না থাকে এই কুক্কুট মাংস এবং মাধ্বী সুরার অংশ গ্রহণ কর"। সেদিন সেই গভীর নিশীথে ধারামতীর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব'।

কালকূট ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যদি সম্ভব হয় আপনার কাহিনীটি একটু সংক্ষিপ্ত করুন। শেষ পর্যন্ত কি হল বলুন।"

"শেষ পর্যন্ত যা চিরকাল হয়ে থাকে, যা হওয়া উচিত, তাই হল। ধারামতীর যৌবনধারায় আমি অবগাহন করতে লাগলাম। কিন্তু সুরঙ্গমাকে ভুলতে পারলাম না আমি কিছুতে। সুরঙ্গমার অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আমার যুক্তি যে অবশেষে পরাজিত হয়েছে এই অপমানের ক্ষতটা প্রতিদিন যেন আমার হৃদয়ে গভীরতর হতে লাগল। আমার এ-ও মনে হতে লাগল যে ওর ওই অন্ধ বিশ্বাসটা হয়তো ভান, আমার যুক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার ছল মাত্র। আমার মনের এক অদ্ভুত অবস্থা হল। যুক্তির অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, কারণ ওরই ওপর আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, যে নারী সেই ব্যক্তিত্বকে বিচলিত করতে চায় তার সঙ্গ কাম্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি সুরঙ্গমাকেই কামনা করতে লাগলাম। ধারামতী আমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই আমাকে ভজনা করেছিল। প্রথম প্রথম আমিও তার অর্চনায় তুষ্ট হয়েছিলাম কিছুদিন, প্রতিরাত্রে সে যখন অভিসারে আসত আমি চন্দন-লিপ্ত দেহে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে সুরা মাংসের প্রাচুর্য নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম আমি মনে মনে সুরঙ্গমারই প্রতীক্ষা করছি, ধারামতীর সঙ্গে সম্পর্কটা নিতান্তই দৈহিক হয়ে উঠেছে ক্রমশ"

কালকূট অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবিস্ময়ে ভাবিতেছিলেন তিনিও বর্ণমালিনীর সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিতেছেন। বর্ণমালিনী যে নারী-শ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মার অনুসন্ধান করিতেছেন, কারণ তাঁহার আশা আছে যে স্তবে তুষ্ট হইয়া চতুরানন হয়তো তাঁহাকে মেঘমালতীরই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ করিবেন। হয়তো তিনি মেঘমালতীর মনোভাবই পরিবর্তন করিয়া দিবেন। এই দুরাশার বশবর্তী হইয়াই কি তিনি এই বিশাল শবদেহের সমীপবর্তী হন নাই? তিনি চার্বাকের একটি কথাও শুনিতেছিলেন না।

সহসা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, চার্বাক বলিতেছে—"হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটল একটা। সম্ভবত পর্বত-শিখরের নির্দেশ মতোই সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্‌ভ্রক আমাকে খবর পাঠালেন যে ধারামতীর সঙ্গে আমার ধারাবাহিক নৈশ ঘনিষ্ঠতার সংবাদ কারও অগোচর নেই। আমি যদি অবিলম্বে ধারামতীকে পত্নীত্বে বরণ করি তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হয়। না করলে ন্যায়ত আমাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আমি জিম্‌ভ্রককে গিয়ে বললাম যে ধারামতীর ইচ্ছানুসারেই তাকে আমি সম্ভোগ করেছি। সে যদি আপত্তি না করে তাহলে তাকে বিবাহও করব। ধারামতীকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। অর্থাৎ তাকে বললাম যে এখনও মনে মনে আমি সুবঙ্গমাকে আকাঙ্ক্ষা করছি, তাকে মানসলোক থেকে চ্যুত করবার বাসনা আমার নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ঘটেছে তা-ও কম আনন্দজনক নয়, জিম্‌ভ্রক বলছেন তোমাকে বিবাহ করে সে আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে। মানে, তিনি ভাবছেন যে বিবাহ হলে ইহজন্মে তো বটেই পরজন্মে এবং পরবর্ত্তী বহু জন্মেও তুমি আমার একাধিপত্য সহ্য করবে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। পতিকে ত্যাগ করে বহু বরনারী ইহজন্মেই পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পরজন্ম আছে কি নেই তা তো অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। কিন্তু একমত না হলেও তোমাকে বিবাহ করতে আমি অনিচ্ছুক নই। আমার হৃদয় তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করছি, সমস্ত জেনে শুনে তুমি যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও, কর"। ধারামতী কিছুক্ষণ অধোবদনে বসে রইল, তারপর বলল—"মহর্ষি আমি আপনার হৃদয়েশ্বরী হব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম, সে হৃদয়ে যখন সুরঙ্গমার মতো সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সমাসীনা তখন আমার কোনও আশা নেই। নিরাশ হৃদয়ে আপনার ক্রমশ ক্ষীয়মাণ দেহটাকে মাত্র সম্বল করে আমি আপনাকে সেবা করতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন"। রোরুদ্যমানা ধারামতীকে আমি কিছুতেই স্বমতে আনতে পারলাম না। আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম না অকপট সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করতে না পারলে পদে পদে দুঃখ পেতে হয় এবং সে দুঃখকে ঢাকবার জন্য পদে পদে আশ্রয় নিতে হয় ভণ্ডামির। ধারামতী কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত না করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সে গিয়ে মহর্ষি পর্বত-শিখরকে কিছু বলেছিল কি না এবং তা শুনে মহর্ষি পর্বত-শিখর সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্‌ভ্রককে প্ররোচিত করেছিলেন কি না তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু যখন সুন্দরানন্দের সেনাধ্যক্ষ কুলিশপাণি আমাকে এসে বললেন—"আপনি যদি অবিলম্বে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ না করেন তাহলে আপনাকে বন্দী করবার আদেশ জিম্‌ভ্রক আমাকে দিয়েছেন"। তখন কর্তব্য স্থির করতে আমার বিলম্ব হল না। কুলিশপাণিকে বললাম—"সুন্দরানন্দের রাজ্য বহুবিস্তৃত। অবিলম্বে তা ত্যাগ করা শক্ত। পদব্রজে সে রাজ্য ত্যাগ করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব"। কুলিশপাণি উত্তর দিলেন—"ভগবন, আপনাকে পদব্রজে যেতে হবে না। জিম্‌ভ্রক আপনার জন্যে একটি দ্রুতগামী অশ্বতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি তাতেই আরোহণ করুন"। তাই করতে হল। অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করলাম। দুই দিন দুই রাত্রি সেই অশ্বতর সংসর্গে বাস করে এই কথাই আমার বারম্বার মনে হল যে অধিকাংশ মানবই অশ্বতর সদৃশ। তারা সম্পূর্ণ অশ্বও নয়, নিখুঁত গর্দভও নয়। অর্থাৎ তারা অন্ধ সংস্কার-তাড়িত পশুও নয়, চক্ষুষ্মান বুদ্ধি-চালিত মানবও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণে তারা এমন এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে এমন এক অদ্ভুত

সমাজ সৃষ্টি করেছে যে সে সমাজে নির্বোধ পশু বা বুদ্ধিমান মানব কেউ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে না। তারা গাভীর দুগ্ধ সবলে অপহরণ করে তাকে করুণাময়ী জননী বলে পূজা করে যজ্ঞীয় পশুকে হত্যা করে কল্পনা করে যে সে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হল, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকের সহজ যুক্তি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উপেক্ষা করাই তাদের ধর্মনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়। এই ধরনের চিন্তা-পরম্পরা থেকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করতে করতে অবশেষে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্যসীমা অতিক্রম করলাম। যে রাজ্যে এসে পদার্পণ করলাম তা ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি বলিষ্ঠ-বীর্যের। আমি যখন সে রাজ্যে এসে প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পল্লীপথে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েছে। একটি পথিককেই কেবল দেখতে পেলাম এবং তাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে আমি বলিষ্ঠ-বীর্য্যের শাসনাধীন হর্ষনীড় নামক গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। মাত্র এইটুকু খবর দিয়েই পথিক নিজ গন্তব্যপথে চলে গেল, আমি নিবিড় অন্ধকারে ঝিল্লী-মুখরিত এক বিরাট বৃক্ষের সমীপে সেই অশ্বতর-পৃষ্ঠের উপর বসে চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় এখন আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। কোনও গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে যদি উপস্থিত হই তাহলে ভদ্রতাবশত সে হয়তো আমাকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু অযাচিতভাবে কারও আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। এ-ও মনে হল যে কোনও সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন গৃহস্থ যদি আশ্রয় দেবার পূর্বে আমার পরিচয় জানতে চান তাহলে হয় সে পরিচয় আমাকে দিতে হবে, নতুবা মিথ্যাচার করতে হবে। এর কোনোটা করবারই আমার ইচ্ছা হল না। মনে হল হর্ষ-নীড় গ্রামে যদি কোনও পান্থশালা থাকা কিছু শুল্কের বিনিময়ে সেইখানেই আমি রাত্রিবাস করব। আমার কাছে এক কপর্দকও ছিল না, কারণ জিম্ভ্রকের আদেশ অনুসারে একবস্ত্রেই আমাকে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল অশ্বতরটি বিক্রয় করে কিছু অর্থসংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। নিবিড় অন্ধকারে আমি পান্থশালার সন্ধানে হর্ষ-নীড় গ্রামের পথে পথে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। একটি গৃহেরও দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেলাম না। গ্রাম পার হয়ে গ্রামপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম অবশেষে। সেখানে দেখলাম একটি কুটির থেকে আলোক নির্গত হচ্ছে এবং দ্বারদেশে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়ে দেখলাম নারীটি বিগতযৌবনা কিন্তু সুসজ্জিতা। আমার দিকে কয়েকবার অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম নারীটি রূপজীবিনী। অশ্বতর থেকে অবতরণ করে বললাম—"ভদ্রে তোমার গৃহে রাত্রিবাস করার সৌভাগ্যলাভ করতে পারি কি?" নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দান করে আমাকে আহ্বান করলে এবং স্বীয় চেটিকা কর্পূরীকে আদেশ করলে পাদ্যঅর্ঘ্য আনতে। নীলোৎপলার গৃহেই আমি আশ্রয় পেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠেই পরিশ্রান্ত অশ্বতরটিকে বিক্রয় করে যে ক'টি মুদ্রা পেলাম তা নীলোৎপলাকে দিয়ে বললাম—"এই আমার যথাসর্বস্ব। এর বিনিময়ে তুমি কয়েকদিনের জন্য আমার আহার ও শয়নের ব্যবস্থা কর। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি উপার্জনের কোনও পন্থা আবিষ্কার করতে পারব আশা করি।" নীলোৎপলা বললে—"আপনার আহারের কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু শয়ন সম্বন্ধে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমার গৃহে জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। দিনের বেলাতেও অনেকে আসেন। সুতরাং শয়নের ব্যবস্থা আপনি অন্যত্র করুন। আমার পিছনের দিকে একটি ঘর আছে অবশ্য, তাতে আপনি শয়ন করতে পারেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে

হয়তো আপনার নিদ্রা বিঘ্নিত হবে।" আমি বললাম—"নিরুপায় ব্যক্তির নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া কঠিন। নিদ্রা বিঘ্নিত হলেও আপাতত আমি তোমার ওই পিছনের ঘরেই শয়ন করব যতক্ষণ না অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।" পরদিনই আমি এক কুম্ভকারের অধীনে একটি কর্ম সংগ্রহ করলাম। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেই মাটি দিয়ে কর্দম প্রস্তুত করবার ভার পেলাম। অপরাহ্নে ছুটি পেলে আমি গ্রামের বাহিরে গিয়ে নদীতে স্নান করে নীলোৎপলার বাসায় ফিরে আসতাম। নীলোৎপলা প্রতিদিনই আমাকে কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিত। আহারাদি শেষ করে আমি চলে যেতাম গ্রামপ্রান্তের একটি বিরাট প্রান্তরে। সেইখানেই পাদচারণা করতে করতে আমি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতাম কি উপায়ে প্রমাণ করব যে ব্রহ্মা নেই। কারণ সুরঙ্গমাকে আমি ভুলতে পারিনি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে তার অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি যুক্তির আঘাতে আমি শিথিল করবই। একদিন সন্ধ্যায় কিছু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।"

যে সব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে চার্বাক তাহাই কালকূটের নিকট বিশদ করিয়া বলিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া কালকূট কয়েক মুহূর্তনীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, কি আশ্চর্য, ইনি যদি ব্রহ্মাকে সত্যই দেখিতে পান আনন্দিত হইবেন না, হতাশ হইবেন। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাই আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না, কারণ মেঘমালতীর যে রোষ-বহ্নি আমার জীবন দগ্ধ করিতেছে, পিতামহের প্রসাদ লাভ করিলে তাহা নির্বাপিত করিতে পারিব এ আশা আমার আছে। আমরা উভয়ে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই শবদেহের সমীপবর্তী হইয়াছি!

"কি ভাবছেন আপনি"—চার্বাক প্রশ্ন করিল।

"ভাবছি আর কালবিলম্ব না করে শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু কারা উচিত।"

"বেশ করুন।"

"প্রথমে কোন জায়গাটা কাটব?"

"পেটটাই কাটুন।"

কালকূট পেটের মধ্যভাগটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ছুরিকাটি বাহির করিয়া যেই অস্ত্রোপচার করিতে যাইবেন অমনিই বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘ উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—

"আপনারা কে!"

"আমার নাম কালকূট। এঁর নাম আমি জানি না।'

"আমি চার্বাক।"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ একবার কালকূট এবং একবার চার্বাকের মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে বিজৃম্ভন করিল।

"আপনারা আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করলেন কেন।"

"আপনি কি ঘুমুচ্ছিলেন? আমরা ভেবেছিলাম আপনি মৃত।"

কালকূটই কথা বলিতেছিলেন, চার্বাক নীরবে বসিয়াছিল।

"মৃত্যুরই অপর নাম যে মহানিদ্রা তা কি আপনাদের জানা নেই? আমি মহানিদ্রা-ঘোরেই পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম, আপনারা কেন আমাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন বলুন তো।"

চার্বাক এইবার কথা কহিল।

"আমাদের ধারণা জীবনই সর্বপ্রকার আনন্দের উৎস। সেই আনন্দ উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই তো আমি মৃত্যু বলে মনে করি।"

"জীবন আনন্দের উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু ঝঞ্ঝাটেরও উৎস। জীবন মুখরা ঈর্ষ্যা-পরায়ণা স্ত্রীর মতো। স্বাধীনচেতা আনন্দকামীরা তার কবল থেকে দূরে পলায়ন করতে সতত উৎসুক থাকেন, কিন্তু সব সময়ে পলায়ন করতে পারেন না। জীবনের করাল আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আমি অনেক কষ্টে তা ছিন্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের স্পর্শ-প্রভাবে যা ছিন্ন ছিল তা আবার যুক্ত হয়ে গেল, আমি পুনরায় সেই মুখরার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হলাম। আপনারা এ কাজ করলেন কেন—"

কালকূট উত্তর দিলেন।

"আপনাকে বিব্রত করছি এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমার অন্তত ছিল না। আমি আপনার অঙ্গচ্ছেদ করতে এসেছিলাম সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে। এঁরও উদ্দেশ্য তাই ছিল—"

"সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে? তাঁকে বাইরে সন্ধান করছেন কেন, তিনি তো আপনাদের মধ্যেই আছেন। সূর্য যদি আলোর সন্ধানে চন্দ্র ব্যবচ্ছেদ করতে যান তাহলে তা যেমন হাস্যকর হবে, আপনাদের আচরণও ঠিক তেমনি হাস্যকর হচ্ছে।"

চার্বাক চুপ করিয়াছিল। এইবার কথা বলিল।

"আমাদের আচরণ যে হাস্যকর তা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে চাই। আপনি যা বললেন পুস্তকেও তা লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তা আমরা যাচিয়ে নিতে চাই।"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল চতুর্দিক যেন বজ্র গর্জনে সচকিত হইয়া উঠিল।

"দেখুন, কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করতে হলে চোখ থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের তা নেই।"

"কি করে এ অসম্ভব কথা মনে হল আপনার।"

"আমার মতো একজন জলজ্যান্ত মানুষকে আপনারা মড়া ভেবেছিলেন, এইটে কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

"চক্ষুষ্মান মনুষ্যেরও ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম আমরা অহরহই করে থাকি কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে আমাদের চক্ষু নেই? বলতে পারেন আমাদের দর্শন সব সময় নির্ভুল নয়, বলতে পারেন আমাদের চক্ষুর বোধশক্তি সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের চক্ষু নেই একথা বললে—"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল।

"ধরুন, আমি যদি মড়াই হতাম, আমাকে ছিন্নভিন্ন করে সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে কি তথ্য আপনারা আবিষ্কার করতেন, বলুন।"

"কি করে বলব! যা এখনও আবিষ্কার করিনি তার স্বরূপই তো অজ্ঞাত আমাদের কাছে।"

এমন সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের বিশাল দক্ষিণ চক্ষুর কালো অংশটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বাতায়নের মতো খুলিয়া গেল এবং সেই বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি রূপসী নারী চার্বাককে সম্বোধন করিলেন—

"আপনাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য আমি আপাত-মৃত ক্ষিপ্রজঙ্ঘকে পুনর্জীবিত করেছিলাম।

কিন্তু আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্ষিপ্রজঙেঘর শব-রূপের মধ্যেই আপনারা কোনও সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন আশা করে এসেছিলেন। আমি আপনাদের হতাশ করব না। আমি নিজেকে সংহরণ করছি। আপনারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোন। আমি কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকট হব ওর দেহে। আশা করি ততক্ষণে আপনারা আপনাদের অনুসন্ধান সমাপ্ত করতে পারবেন।"

চার্বাক আর বিস্মিত হইতেছিল না। তাহার বোধ শক্তি যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে নির্বাক হইয়া ক্ষিপ্রজঙেঘর অক্ষিবাতায়ন-বর্তিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কালকূট প্রশ্ন করিলেন—"ভদ্রে, আপনার এই পরমাশ্চর্য আবির্ভাবে আমি অতিশয় বিস্মিত হয়েছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পরিচয় দিন।"

"আমি ক্ষিপ্রজঙেঘর প্রাণ-লক্ষ্মী। আমি ওর দেহের অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছি অনাদিকাল থেকে, ওকে বিবর্তিত করছি, আনন্দিত করছি নানারূপে নানাভাবে"

"কিন্তু ক্ষিপ্রজঙেঘর কথা শুনে মনে হল আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই উনি নাকি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করছিলেন। আমাদের স্পর্শ প্রভাবে ওঁর মহানিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।"

"আপনাদের স্পর্শ দ্বারা আমি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি এ ধারণা আমিই ওঁর মধ্যে সম্ভব করেছি। আমাকে ত্যাগ করে উনি মহা-নিদ্রাঘোরে আনন্দ উপভোগ করছিলেন এ ধারণাও আমারই সৃষ্টি। ওঁর প্রতিটি কার্য আমিই নিয়ন্ত্রিত করছি। আপনারা ওঁর দেহকে ছিন্ন করে দেখুন আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ হোক, আমি কিছুক্ষণের জন্য সরে থাকছি।"

"কিন্তু ওঁর ছিন্নভিন্ন দেহে আপনি আবার প্রবেশ করবেন কি উপায়ে— "

"আমি তো কোথাও যাব না, আমি সরে থাকব, সংহরণ করব নিজেকে। আপনাদের মনে হবে ক্ষিপ্রজঙ্ঘ জীবন্ত নয়, মৃত, এতক্ষণ যেমন মনে হচ্ছিল—"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘ কি বরাবর জীবিতই ছিলেন?"

"ছিলেন এবং থাকবেন। আমি কখনও কোনো কারণেই ওঁকে ত্যাগ করে যাব না। ক্ষিপ্রজঙেঘর অথবা আপনাদের যখন মনে হবে যে ওর দেহটা শবদেহে ছাড়া আর কিছু নয় তখনও আমি থাকব। ওঁর দেহের সঙ্গে আমি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমরা দুজনেই বারবার রূপান্তরিত হব, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ কখনও ঘটবে না।"

"আমরা যদি ওঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করি বা ভস্মীভূত করি তাহলেও কি আপনার অস্তিত্ব নষ্ট হবে না?"

"সৃষ্ট বস্তু কখনও নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। তবে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ আছে। ক্ষিপ্রজঙেঘর দেহকে বেশী ছিন্নভিন্ন করবেন না। ওঁর দেহের বর্তমান রূপটি অবলম্বন করে নূতন রকম আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা আছে। এবার আমি সরে যাচ্ছি। আপনারা কার্য আরম্ভ করুন।"

অক্ষি-বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ শুইয়া পড়িল।

চার্বাক অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"অদ্ভুত!"

কালকূট বলিলেন—"মহর্ষি চার্বাক, এখন বিহ্বল হযে পড়লে চলবে না। আমরা যা করতে এসেছি তা করতেই হবে। এই শবদেহের মধ্যেই আমরা পরমাশ্চর্যময়ী প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব

ও তিরোভাব প্রত্যক্ষ করলাম। হয়তো ব্রহ্মাকেও প্রত্যক্ষ করব। কোন্ অঙ্গ থেকে আরম্ভ করি বলুন তো? আমার মনে হয় উদর ছিন্নভিন্ন করবার আগে হাতটা ব্যবচ্ছেদ করলে কেমন হয়?"

চার্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—"বেশ, তাই করুন।"

সাত

চন্দ্রালোকে সপ্তশিবা পর্বতের উপত্যকাটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কলস্বরা তটিনী তরঙ্গ-ভঙ্গে চতুর্দিক আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল মনে হইতেছিল সে যেন তটিনী নয়, সে যেন কোনও উচ্ছ্বসিতা কিশোরী, অশ্রান্ত কলকল স্বরে অন্তরের আনন্দকে ছন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই তটিনী-তীরবর্তী বিশাল বটবৃক্ষের গ্রন্থিল এক শাখায় বিচিত্রবর্ণ যে বিরাট বিহঙ্গমটি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল তাহার প্রতিবিম্ব জ্যোৎস্নালোকে তটিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল সেই প্রতিবিম্বকে কেন্দ্র করিয়াই বুঝি তরঙ্গিনীর তরঙ্গলীলায় আকুলতা জাগিয়াছে। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তরঙ্গাঘাতে প্রতি মুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করাতে তরঙ্গিনী যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে যেন প্রতিবিম্বের একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না, বুঝিতেছিল না যে তাহার নিজের অসংযত আগ্রহই প্রতিমুহূর্তে প্রতিবিম্বকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। উপত্যকার নৈশ নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া সেই বিচিত্রবর্ণ বিরাট বিহঙ্গম সহসা কথা কহিয়া উঠিল।

"অয়ি, নদী-রূপিণী বিনতা, তুমি বিচলিত হয়ো না। তোমার এই অধীরতাই বারম্বার তোমার কষ্টের কারণ হয়েছে। অধীরতাবশেই তুমি তোমার দ্যুতিমান পুত্র অরুণকে বিকলাঙ্গ করেছ, তার অভিশাপই তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছে। এখনও তুমি তোমার সপত্নী কদ্রুর সেবা করে চলেছ। এখনও তোমার দাসীত্ব মোচন হয়নি—"

নদী আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই কদ্রু, কোথা সে—"

"তোমার সপত্নী কদ্রুও রূপ পরিবর্তন করেছে। তুমি নদী হয়েছ, কদ্রু হয়েছে তোমার উভয় পার্শ্ববর্তী তটভূমি। তার গর্ভ-বিবরে এখনও সর্পকুল সঞ্জাত হচ্ছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ তাদের সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করতে পারেনি। আর তুমি তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার সপত্নী ও সপত্নী-সন্ততির সেবা করে যাচ্ছ। এখনও তুমি অভিশাপ মুক্ত হওনি।"

"বৎস গরুড়, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন।"

"আমি গরুড় নই। আমি তার মূর্ত স্মৃতি মাত্র।"

"কিন্তু আমি যে তোমার শ্বেত বদন, রক্ত পক্ষ, কাঞ্চনসন্নিভ দেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নেবে এস বৎস, জননীকে ছলনা কোরো না।"

"অধীর হয়ো না বিনতা। যে গরুড় গজকচ্ছপরূপী কলহপরায়ণ ধনলোভী ভ্রাতাদের আহার করেছিল, অমৃত অর্জনের জন্য যে গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হয়নি, সে গরুড় বহুকাল পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। একটি বিশেষ ব্রত উদযাপন করতে সে এসেছিল, ব্রত শেষ হয়েছে, সে চলে গেছে। যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছিল সেই শক্তিতে সে লীন হয়ে গেছে।

সে এখন বিষ্ণুর বাহন, তোমার কেউ নয়। তুমিও কি আর সেই বিনতা আছ? কশ্যপের পত্নী যে বিনতা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ সম্বন্ধে সপত্নী কদ্রুর সমক্ষে সত্য ভাষণ করেছিল সে বিনতা কোথায়? সে-ও আর নেই। সৃষ্টির বিশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে সে-ও রূপান্তরিত হয়েছে। একথা বিস্মৃত হয়ো না বিনতা যে আজ তুমি নবরূপে নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছ, নদীরূপে যে মহাসাগরের দিকে তুমি প্রধাবিত হচ্ছ সেই মহাসাগরই এখন তোমার উপাস্য, সেই মহাসাগরই কশ্যপ। তোমার মধ্যে স্বামীর নবরূপই এখন তোমাকে নবসম্পদে শক্তিশালিনী করবে। তুমি সেই সম্পদের জন্য প্রস্তুত কি না তাই নির্ধারণ করবার জন্যে আমি গরুড়রূপে নিজেকে তোমার মধ্যে প্রতিফলিত করেছি। দেখছি গরুড়ের সম্বন্ধে এখনও তুমি মোহাচ্ছন্ন। তুমি ভুলে গেছ যে কদ্রুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করাই তোমার উদ্দেশ্য, সেইজন্যেই তুমি পুত্র কামনা করেছিলে। কিন্তু দু'জন মহাবলশালী পুত্র লাভ করেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। তোমার অত্যধিক ব্যগ্রতা অরুণকে পঙ্গু করেছে, আর তোমার নিরর্থক তর্ক-প্রিয়তার ফলে তোমাকে যে দাসীত্ব বরণ করতে হয়েছিল গরুড়ের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তোমাকে সেই দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং তা করতে গিয়ে গরুড় হয়ে গেছে বিষ্ণুর ভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে তোমার দাসীত্ব মোচন হলেও প্রকৃতপক্ষে তুমি স্বাধীন হওনি। নবজন্মেও তুমি তটরূপিণী কদ্রুর সেবা করে চলেছ, তার নাগ সন্ততিদের লালন পালনে সহায়তা করছ। আমি জানতে এসেছি সত্যই কি তুমি স্বাধীনতা চাও?"

"নিশ্চয় চাই। কিন্তু আমি গরুড়কে চাই। সে মাকে ভুলেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না।"

"বিষ্ণুকে পেতে হলে মাকেও ভুলতে হয়।"

"তবে তার এ অশোভন বিস্মৃতি ভাঙতে হবে।"

"এইবার তুমি দক্ষ-কন্যার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তার এ বিস্মৃতি ভাঙতে হলে কি করতে হবে জান?"

"কি?"

"তাকে বিষ্ণুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।"

"তাই আনব যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হবে তাও বলে দাও।"

"নূতন শক্তি অর্জন করতে হবে।"

"কি করে?"

"প্রথমেই প্রবলভাবে ইচ্ছা করতে হবে। তোমার ইচ্ছার প্রাবল্যই তোমাকে শক্তি দেবে এবং সেই শক্তির আকর্ষণে আরও শক্তি সঞ্চারিত হবে তোমার মধ্যে। অমিত ইচ্ছা-শক্তিতে তুমি যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন তোমার ইচ্ছাই তোমাকে রূপান্তরিত করবে। সেই রূপান্তরিত তুমি গরুড়কে বিষ্ণুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে তখন।"

বিহঙ্গমের কথায় নদীরূপিণী বিনতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—"তুমি যদি সত্যই গরুড় না হও, তাহলে কে তুমি, আত্মপরিচয় দাও। তোমার বাহ্য রূপের সঙ্গে গরুড়ের সাদৃশ্য এত বেশী যে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি—"

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গরুড়মূর্তি অন্তর্হিত হইল। বিনতা সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"প্রভু, আপনি—"

"হ্যাঁ আমিই। সমুদ্রমন্থনের পরই সমুদ্রের মৃত্যু হয়েছিল। পিতামহের আদেশে আমি মৃতসমুদ্রে জীবন সঞ্চার করে জীবন্ত সমুদ্ররূপে দিগ্বিদিকে প্রসারিত ছিলাম। সহসা কাল তিনি আমাকে স্বৈরচর করে দিয়েছেন, আমি এখন যা খুশী হতে পারি। সেই শক্তিবলেই আমি গরুড় হয়েছিলাম। পিতামহের কৃপায় তুমিও স্বৈরচর হতে পার। স্বৈরচর হলে গরুড়ের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হবে না। তোমার অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধা তাহলে হয়তো তৃপ্ত হবে।"

"কি করে স্বৈরচর হওয়া যায়।"

"তোমার একাগ্র ইচ্ছার সঙ্গে পিতামহের ইচ্ছা সম্মিলিত হলে।"

"আমার তরঙ্গধারা যে আমাকে প্রতিমুহূর্তে বিক্ষিপ্ত করছে।"

"নিজেকে সংযত কর, সংহত কর। যে সমুদ্রের দিকে তুমি প্রবাহিত হচ্ছিলে আমি তা ত্যাগ করেছি, তুমি তোমার গতিবেগ রুদ্ধ কর এইবার। আমি চললাম। কদ্রুর দাসীত্ব থেকে যদি সত্যিই মুক্তি চাও তপস্যা কর। যদি স্বৈরচর হতে পার তাহলেই প্রকৃত মুক্তি পাবে।"

এই বলিয়া কশ্যপ বিরাট কূর্মে রূপান্তরিত হইলেন এবং সপ্তশিরা পর্বতের একটি শিরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সপ্তশিরা পর্বতের শীর্ষদেশে একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য প্রকট হইয়াছিল। সপ্তশিরার উচ্চতম শৃঙ্গ সহসা বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে এবং সেই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি বিশাল শ্বেতপদ্ম আরও সাতটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখিতেছিল। বস্তুত, মনে হইতেছিল ওই শ্বেতপদ্মগুলির অলৌকিক স্বপ্নই যেন জ্যোৎস্নারূপে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। মধ্যবর্তী বৃহৎ শ্বেতপদ্মটির মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছিল একটি প্রদীপ্ত ভ্রমর, মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না ও তুষারের সমন্বয়ে যেন তাহার দেহ গঠিত হইয়াছে। ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জনে স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে ঊর্মিমালা শিহরিত হইতেছিল, শ্বেতকমলগুলির সৌরভে বায়ু মন্থর হইয়া আসিয়াছিল, আকাশের নক্ষত্রকুল যেন অধীর আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত চরাচর যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছিল, একটা ভাষাহীন প্রতীক্ষাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল চতুর্দিকে। সহসা সেই প্রগাঢ় প্রতীক্ষাকে বিচলিত করিয়া বৃহৎ শ্বেতপদ্ম কথা কহিয়া উঠিল। ভ্রমরের গুঞ্জন বন্ধ হইয়া গেল। শ্বেতপদ্ম কহিতে লাগিল—"হে আমার মানসপুত্রগণ, এতকাল তোমরা আকাশে সপ্তর্ষিরূপে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করছিলে। ধ্রুবের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, ব্যক্ত কর। আমার মনে হল যে নক্ষত্ররূপে হয়তো আমি তোমাদের ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করেছি, হয়তো ধ্রুব সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল ম্রিয়মাণ হয়েছে, তাই আমি তোমাদের স্বৈরচর করে দিয়েছি। তোমরা যা খুশী হতে পার। ইচ্ছে করলে পুনরায় তোমরা আকাশে নক্ষত্ররূপেও ফিরে গিয়ে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করতে পার। আমি শুধু জানতে চাই—বিষ্ণুভক্ত ধ্রুব সম্বন্ধে তোমরা কে কি ধারণা করেছ? বালক ধ্রুব যখন তপস্যাবলে বিষ্ণুর হৃদয় হরণ করেছিল তখন বিষ্ণুর অনুরোধে আমি ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে ওই বালককে স্থির নক্ষত্ররূপে তার মধ্যস্থলে স্থাপিত করেছিলাম। তোমাদের আমি সপ্তর্ষিরূপে সৃষ্টি করেছিলাম ওই ধ্রুবের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। এইবার তোমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল ব্যক্ত কর।"

অত্রি কহিলেন—"আমার বিশ্বাস ধ্রুব স্থির নয় চঞ্চল। তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের সঙ্গে নয়, প্রবহমান স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"আমরা যে আপনার নির্দেশে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করেছি আমার কাছে এইটেই একমাত্র ধ্রুব বলে মনে হয়েছে। অরুন্ধতীরও তাই অভিমত।"

অঙ্গিরা ভিন্নমত পোষণ করেন দেখা গেল।

তিনি বলিলেন—"যে নামেই তাকে অভিহিত করুন, যে রূপেই তাকে প্রত্যক্ষ করুন একনিষ্ঠ তপস্যার ফলই যে ধ্রুব, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

পুলস্ত্য বলিলেন—"ভোগই ধ্রুব—তা সে সুখভোগ দুঃখভোগ যাই হোক। আমার মনে হয় তপস্যার লক্ষ্য যে মুক্তি তা-ও একপ্রকার ভোগ। সেজন্য মনে হয় ধ্রুব ভোগেরই প্রতীক।"

পুলস্ত্যের এই উক্তির পর একটা নীরবতা চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে পুলহ বলিলেন—"ধ্রুব ধ্রুবই, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রতুও তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি বলিলেন—"ধ্রুব সৃষ্টিকর্তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অসামান্য প্রতিভাশালী স্রষ্টার বলেই তা অনন্য, স্বতন্ত্র।"

মরীচি উত্তর দিলেন সর্বশেষে।

তিনি বললেন—পিতামহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। অনেক সময় তারা পরস্পরবিরোধী। আমার নিজের বংশেই সর্প ও সর্পশত্রু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি এইটেই উপলব্ধি করেছি, সৃষ্টির সর্বপ্রকার বিকাশের শেষ লক্ষ্য ধ্রুবলোক। ধ্রুবের মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। আমার বংশের শেষ নাগ ও গরুড় ধ্রুবলোকই সন্ধান করছে। ধ্রুব সর্ববিধ বৈচিত্র্যের মিলনতীর্থ।"

সপ্তর্ষিগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতপদ্মরূপী পিতামহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। তোমরা যে সকলেই এক একজন গুরুগম্ভীর ঋষি হয়েছ তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। একই রূপে একই পরিবেশে একই ধ্যানের কারাগারে বহু যুগ বন্দী থাকলে এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবও নয়, পাষাণের পক্ষে জলের সাবলীলতা বায়ুর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যেমন সম্ভব নয়। আমি তাই ইচ্ছা করেছি নূতন স্বৈরচর-বিশ্ব সৃজন করব। সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতাই হবে সে বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম যুগে তোমরা সাতজনই ছিলে আমার মানসপুত্র। তোমাদের মাধ্যমেই আমি সৃষ্টি-কল্পনাকে মূর্ত করেছিলাম। সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগবংশ, বালখিল্য, ঋষি-রাক্ষস সবই সম্ভব করেছ তোমরা। আমার নব-সৃষ্টিতেও তোমারই অগ্রণী হও—"

অঙ্গিরা কহিলেন—"পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো নিত্য নবায়মান। মানব-প্রতিভায় আপনি যে রুচি-সৃষ্টি করেছেন তা তো নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, তাহলে আবার—"

"বৎস, তুমি বহুকাল মানব সমাজচ্যুত হয়ে আকাশে বাস করছ। তুমি ভুলে গেছ অধিকাংশ মানবকে আমি পশু করেই সৃষ্টি করেছিলাম। তারা নানাভাবে তাদের পশুত্বকেই বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পশুর মতোই ভাবছে যে তারা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই হাস্যকর অহমিকার নানা রূপই এখন নানা দেশের মানব সমাজ। তারা স্রষ্টাকে ভুলেছে, কিম্বা মানতে চাইছে না। এদের মূঢ়তায় আমি নিজেই লজ্জিত। সেই জন্যেই মনে করেছি এ সব ছবি মুছে ফেলে এবার নূতন ছবি আঁকব...."

পিতামহের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহাকাশে এক প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল। সুমিষ্ট

হাস্য করিয়া পিতামহ বলিলেন—"সপ্তর্ষিদের আকর্ষণে যে সব নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সপ্তর্ষিরা অপসৃত হওয়াতে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে পরস্পরকে চূর্ণ করছে—"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"পিতামহ, ধ্রুবলোকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নীহারিকাকে বহুকাল ধরে আমরা কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। সেটিও কি বিনষ্ট হয়ে যাবে?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমি যখন বাঘ সৃষ্টি করেছিলাম তখন অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে ছাগকুল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহেশ ছাগবংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেননি। কিছু কিছু ছাগ আছে এখনও। স্বৈরচর সৃষ্টি করলে হয়তো তেমনি হবে। কেউ যাবে কেউ থাকবে। তোমাদেরই যদি ইচ্ছা হয় যে পূর্বরূপ ধারণ করে উক্ত নীহারিকার পরিণতি লক্ষ্য করবে স্বচ্ছন্দে তা করতে পার। যা খুশী হবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো দিয়েছি তোমাদের। এই পদ্মরূপ তোমরা ইচ্ছা করলেই পরিহার করতে পার।"

পদ্মরূপী পিতামহের অন্তর্নিহিত কৌতুক শ্বেতপদ্মের প্রতি পর্ণে ঝলমল করিতে লাগিল। প্রতিটি পর্ণ অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল পিতামহ তাঁহার নব-রূপ-ধারী মানসপুত্রগণের উপর তাঁহার উক্তির প্রভাব কি হইল জানিবার জন্য স-কৌতুক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, যেন তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইবার ঘটিবে। ঘটিতে বিলম্ব হইল না। সাতটি শ্বেতপদ্ম সাতটি বৃহৎ খদ্যোতে রূপান্তরিত হইয়া ধ্রুবলোকের উদ্দেশে উড়িয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশপটে পূর্বের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া ধ্রুবলোক পরিক্রমায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ তুষারশুভ্র যে ভ্রমরটি এতক্ষণ পিতামহ পদ্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়াছিল সে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

"পিতামহ, আপনার মানসপুত্র তো আপনার নব-সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না।"

"পুরাতনের মোহ ত্যাগ করা সহজ নয় সখি। নূতন অজানা পথে চলতে পারেন কেবল সৃষ্টিকর্তা নূতন সৃষ্টির আগ্রহে। এঁরা তো নিজেদের আগ্রহে স্বৈরচর হননি, আমি জোর করে কয়েকজনকে স্বৈরচর করে দিয়েছি কি হয় দেখবার জন্যে। এই ঋষির দল সব বিষ্টুর পক্ষে, যা আছে তাই আঁকড়ে থাকতে চান। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের দিকে যাবার সাহস এঁদের নেই। কশ্যপের হয়তো কিছুটা আছে বলে মনে হল। তাকেও স্বৈরচর করে দিয়েছি। সে আমাকে সাহায্য করতে পারে।"

"কিসে সাহায্য করবে।"

"বিষ্টুকে একটু জব্দ করতে চাই। সে আমার নূতন সৃষ্টিপ্রেরণাকে ব্যাহত করছে। বিশ্বকর্মাও জুটেছে ওর সঙ্গে। বিশু ভাবছেন স্বৈরচর সৃষ্টি হলে ওঁর নিজের শিল্প-কীর্তি সব লোপ পেয়ে যাবে। আর বিষ্ণু ভাবছেন যেহেতু তিনি পালনকর্তা সেই হেতু তিনি সর্বেসর্বা, আমাকেও ওঁর তালে তাল রেখে চলতে হবে।"

ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলিল—"বিষ্ণু পালন না করলে কিন্তু আপনার সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত।"

"দেবি ভারতি, এমনিতেই আমার সৃষ্টি শুধু লোপ নয়, লোপাট হয়ে যাচ্ছে। তারই হিসেব আমি নিতে চাই বিষ্টুর কাছ থেকে। কিন্তু এমনি হিসেব চাইলে ও কি দেবে? প্যাঁচে ফেলতে হবে ওকে। কশ্যপ আসছে না কেন। তার তো এখানেই আসবার কথা ছিল।"

"আমি কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না পিতামহ। আপনারও করা উচিত নয়। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের হাতখানাকে ওরা কাটতে আরম্ভ করেছে। একবার আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

"চল, তাহলে আমরাই এগিয়ে দেখি কশ্যপের কি হল। বিনতাকে পেয়ে পুরানো প্রেম উথলে উঠল না তো। ওরা যে হাত কাটতে শুরু করেছে তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি।"

"কশ্যপকে যদি খুঁজতে যান তাহলে দেরি হয়ে যাবে।"

"কিছু দেরি হবে না। এস এবার ভোল-পালটানো যাক।"

পিতামহ কমনীয়-কান্তি যুবকে রূপান্তরিত হইলেন। ভারতী ভ্রমর রূপ পরিহার করিয়া হইলেন একটি কিশোর বালক।

"তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে গেলে যে"

"আপনার ওই সব মুনিঋষিদের কাছে যুবতী-রূপে যাবার ইচ্ছে নেই"

পিতামহ বীণাপাণির নাকে ছোট্ট একটি টোকা দিয়া বলিলেন—"একটা কথা তুমি ভুলে যাও বারবার। নিজেকে তুমি কিছুতেই লুকোতে পার না। যে বেশই তুমি ধারণ কর না কেন—তোমার রূপ উথলে পড়ে তোমার সর্বাঙ্গ থেকে। তুমি যে প্রকাশের দেবতা, তুমি নিজেকে কি লুকোতে পার?"

সপ্তর্ষিরা পর্বত হইতে উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া বালক-রূপী বীণাপাণি সহসা বসিয়া পড়িলেন।

"এত ঢালু পাহাড় থেকে আমি নাবতে পাচ্ছি না।"

"পট করে পাখি হয়ে উড়তে শুরু কর।"

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"তা-ও হবার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে?"

বালকরূপী সরস্বতীর নয়নে দুষ্টামিভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি একটি শিশুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

"ও, বুঝেছি তোমার মতলব।"

পিতামহ শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন, শিশু তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটিয়া গেল। তাহার পর শিশু পিতামহের কানে কানে বলিল—"লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

"কোথায়।"

"কুবেরের অলকাপুরীতে।"

"সেখানে তুমি কি করতে গিয়েছিলে।"

"কুবেরের এক গণ্ডমূর্খ নাতিকে সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম করবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক দরিদ্র, অর্থলোভে অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজি হয়েছিলেন, এখন ব্যাপার দেখে আমাকে ডাকাডাকি করছেন ব্রাহ্মণ।"

"তুমি কি করলে।"

"মূর্খকে কি করে আপাত-বিদ্বান করা যায় তারই পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার স্বৈরচর-লোক স্থাপিত হলে হয়তো মূর্খরা ইচ্ছা করলেই বিদ্বান হতে পারবে, কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়। এখন—"

"যাক, ও কথা। লক্ষ্মী কি বললেন।"

"আপনি যে বিষ্ণুকে জব্দ করতে চান তা তিনি টের পেয়েছেন। কি করে পেয়েছেন তা জানি না। আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই কলহে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি।"

"তুমি কি বললে।"

"বললাম কলহ যদি বাধে আমি তাঁর পক্ষে থাকব।"

পিতামহের চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্মিতমুখে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"হাঁসের পক্ষ দুটি, কিন্তু যখন সে ওড়ে তখন তার গতি এক দিকেই হয়। তোমার গতি যে কোনদিকে হবে তা আমি জানি সুতরাং আমার ভয় নেই।"

পিতামহ 'উঃ' বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

"কি হল?"

"ওরা খুব জোর ছুরি চালাচ্ছে।"

"আপনার লাগছে না কি।"

"লাগছে না? তোমার?"

বীণাপাণির শিশু-অধরে একটি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল কেবল, তিনি ইহার কোনও উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কশ্যপের তো কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।"

"এখানেই তার আসবার কথা ছিল। সপ্তর্ষিরা যে এত শিগগির রণে ভঙ্গ দেবেন, তা ভাবিনি। সেই জন্য তাকে বলেছিলাম মধ্য রাত্রিতে আসতে। মধ্য রাত্রির আর বেশী দেরিও নেই, চল ওই বড় পাথরটার উপর বসে অপেক্ষা করা যাক। এই পথেই সে আসবে।"

অদূরে একটি গোলাকার বিরাট প্রস্তর ছিল। উভয়ে তাহার উপর উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল।

"এ কি।"

প্রস্তর কথা কহিল।

"আমি কশ্যপ। প্রস্তর রূপ ধারণ করে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

পিতামহ বীণাপাণিকে কোলে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন।

"কি আপদ! এত জিনিস থাকতে তুমি প্রস্তররূপ ধারণ করতে গেলে কেন?"

কশ্যপ উত্তর দিলেন—"সমুদ্ররূপে বহুকাল অশান্ত ছিলাম। প্রস্তরের সুনিবিড় স্থৈর্য খুব ভাল লাগছিল পিতামহ।"

"স্বৈরচর হওয়ার সুবিধাটা দেখ! যাই হোক বিনতা কি বললে।"

"তাকে স্বৈরচর করে দিলে গরুড়কে ঠিক টেনে আনবে। আমি গরুড় রূপ ধরে তার কাছে গিয়েছিলাম দেখলাম এখনও সে গরুড়ের জন্য উতলা।"

"সবাইকে তো আর চট করে স্বৈরচর করা যায় না। আগে দেখি তার দৌড়টা কতদূর।"

"সে তপস্যা করছে।"

"দেখা যাক।"

পিতামহ সানন্দে লক্ষ্য করিলেন কশ্যপের মুখমণ্ডলে একটা গদগদভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন। সম্মোহিত ভক্তকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। বিনতাপ্রসঙ্গেই আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল কিন্তু শিশু-রূপিণী বীণাপাণির নয়নের দিকে চাহিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। মনে হইল কশ্যপকে তিনি বোধহয় কিছু বলিতে চান।

পিতামহ কশ্যপকে বলিলেন—"কশ্যপ, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এই শিশুটিকে রেখে আসছি।"

বীণাপাণিকে কোলে করিয়া পিতামহ পুনরায় পর্বতারোহণ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদূর উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তেই পর্বতগাত্রস্থ শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যে দুইটি অপরূপ নৈশ বিহঙ্গম কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল তাহারাই যে পিতামহ ও সরস্বতী তাহা কল্পনা করা কশ্যপের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সরস্বতী কহিলেন—"আপনার কশ্যপকে একটু কাজে লাগাতে চাই পিতামহ।"

"স্বচ্ছন্দে। কি করতে হবে বল। ও যে রকম মুগ্ধ হয়েছে এখন যা করতে বলব তাই করবে। কি করতে হবে বল।"

"আপনি বললে হবে না, আমি বলব। আপনি একটু অন্তরালে থাকুন।"

"বেশ। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি বেশী বিলম্ব কোরো না। আমি বরং এক কাজ করি তারাকে নিয়ে আসি। তাকে একটু দরকার।"

"কোন তারা?"

"বৃহস্পতির বউ গো, চাঁদ যাকে নিয়ে পালিয়েছিল। বুধের মা।"

"বুঝেছি। আচ্ছা, যান।"

পিতামহ আলোক-রেখা-রূপে আকাশের দিকে চলিয়া গেলেন। বীণাপানি কশ্যপের সমীপবর্তী হইলেন শবরীর রূপ ধারণ করিয়া।

।। আট ।।

ক্ষিপ্রভ্রূভ্রেঘর হস্তের পেশীশিরাসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কালকূট অবশেষে চার্বাককে বলিলেন—"মহর্ষি, একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে। জানি না, আপনারও তা মনে হয়েছে কিনা।"

"কি বলুন।"

"আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। শিরা-উপশিরা পেশী অস্থির গঠন ও স্থাপন নৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন কোনও বিরাট নগরী প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু সে নগরীর নির্মাতাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তপস্যা করতে হবে, সেই কাপালিক যেমন করেছিল।"

"এই ছিন্নভিন্ন শবের কাছে চোখ বুজে বসে থাকবেন তার মানে?"

"থাকলে ক্ষতি কি।"

"সময় নষ্ট হবে, আর কিছু যদি না-ও হয়।"

"মহর্ষি, আপনি তো একাধিকবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপকাঠিতে অসম্ভব তা-ও সম্ভব হল। আপনি আমাকে সর্পে রূপান্তরিত হতে দেখলেন, এই শবের মধ্যে মূর্তমতী প্রাণ-দেবতাকে দেখলেন, তবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে—যা আমরা অসম্ভব বলে মনে করি তার হেতু আমাদের বুদ্ধির অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত?"

"বিশ্বাস হচ্ছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে যে এই অসম্পূর্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করাও তো নিরাপদ নয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে এইটে মেনে নিয়ে তাই আমি আপাতত চুপ করে থাকতে চাই, আপনি যদি তপস্যা করতে চান করুন!"

"আপনি কি চুপ করে বসে থাকবেন? আপনিও যদি তপস্যায় ব্রতী না হন তাহলে আপনার উপস্থিতি আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হবে এবং বলা বাহুল্য, আমার তপস্যাও বিঘ্নিত হবে তাহলে।"

"বেশ, আমি উঠে যাচ্ছি। চারদিকে ঘুরে দেখি দেশটা কেমন। আপনি তপস্যা করুন!"

"বেশ।"

কালকূট নয়নযুগল মুদিত করিয়া বদ্ধপাণি হইতেই চার্বাকের অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময় ও করুণার এমন একটা সমন্বয় হইল যাহা প্রকৃতই চার্বাকীয়। নীরব ভাষায় সে দৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল—'আহা, স্বল্পবুদ্ধি লোকগুলির কি দুর্দশা!' পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার মনে হইল, 'আমিও তো কিছুক্ষণ পূর্বে মায়ানদীর তীরে বসে অনুরূপ মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলাম! মানুষের কিসে কখন যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় কিছুই বলা যায় না। তীব্র সুরাই হয়তো আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করেছে, কে জানে!' চার্বাক উঠিয়া পড়িল এবং উপলবহুল পার্বত্য উপত্যকায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রূপসী সুরঙ্গমার অঞ্জন-সুন্দর খঞ্জন-নয়ন দুইটিও তাহার মানস প্রাঙ্গণে যেন কৌতুকভরে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। চার্বাক পুনরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'চতুরাননের অনস্তিত্ব আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছে তা কিছুক্ষণ পরে অপসারিত হবে নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে তখন আমি নিশ্চয় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব। সুরঙ্গমার বিশ্বাসকে বিচলিত করতেই হবে।' একটা ঝম্ ঝম্ শব্দে চার্বাকের স্বগতোক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। চার্বাক দেখিতে পাইল একটা বিরাটকায় শজারু তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সর্বাঙ্গের কণ্টক সমুদ্যত হওয়াতে তাহাকে এক চলমান বিরাট বিচিত্র কদম্ব ফুলের ন্যায় দেখাইতে ছিল। চার্বাক সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া রহিল।

"চার্বাক, আমি তোমারই অপেক্ষায় এখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"কে তুমি?"

"আমি তোমার কৌতূহল।"

"এ মূর্তি কেন তোমার।"

"আমি সংশয়-কণ্টকিত হয়েছি। শব-ব্যবচ্ছেদ করে বিশেষ কোনো লাভ তো হল না। কালকূটের তপস্যার ফলেও বিশেষ কিছু হবে—তা মনে হচ্ছে না ! তোমার এই সন্ধান-লোকে নূতন আর কি পাওয়া যেতে পারে? কিসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা?"

"ইচ্ছা করে তো আমি এখানে অপেক্ষা করছি না, আমাকে এখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ দেশের নাম সন্ধান-লোক না অদ্ভুতলোক তা-ও আমি জানি না। আমার কৌতূহল কি উপায়ে যে আমার দেহের বাইরে এসে মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে তা-ও আমার বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে যদি আমার মানসিক অবস্থা বোঝাতে হয়, তাহলে বলতে হবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি"

"আমি তাহলে এখন অন্তর্ধান করি।"

"তুমি বারবার রূপান্তরিত হচ্ছ কি করে।"

"তা জানি না। আমি আপনা-আপনিই বদলে যাচ্ছি, তুষার যেমন জল হয়। অনুভব করছি আবার একটা পরিবর্তন আসছে। এই দেখ—"

শজারু পিপীলিকায় পরিণত হইল।

"তুমি যতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবে ততক্ষণ আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমি চললুম।"

পিপীলিকা গর্তে প্রবেশ করিল। প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিলাসী চার্বাক অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "যে সব অনুমানবাদী বেদবিৎ পণ্ডিতদের আমি এতকাল উপহাস করেছি তাঁরা যদি এখন আমার দুরবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে আনন্দের কিছু খোরাক পেতেন নিশ্চয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি ক্রমশ। মনে হচ্ছে—কিন্তু না, আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। বিকারের ঘোরে অসম্ভব প্রলাপকে সত্য বলে মনে করছি। দেখি এই বিকার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কতদূর বিকৃত করতে পারে। নির্বিকার হয়ে সেইটেই যদি লক্ষ্য করতে পারি তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারব। কালকূটের কার্যকলাপই একটু অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করা যাক্ আপাতত। এ ছাড়া আর করবার তো কিছু নেই।"

চার্বাক পুনরায় সেই শবদেহের অভিমুখে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে কালকূট নিমীলিতনয়নে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। চার্বাক নিকটস্থ একটি ঝোপে আত্মগোপন করিয়া নীরবে কালকূটকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল বর্ণমালিনী যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্যে ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার রূপের তুলনা করিয়া ক্ষুব্ধ হওয়াই বা কেন। পাতালনিবাসী রাজপুত্র? পাতালে কি জনসমাজ আছে? কি রকম রাজ্যের রাজপুত্র ইনি? কালকূটকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ চিন্তা চার্বাকের মস্তিষ্কে আবর্তিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পূর্বে এক অদ্ভুত উর্ণনাভবে দেখিয়া তাহার মনে যে জাতীয় বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল সেইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চার্বাক ঘন ঝোপে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্রায়িত হইল, নয়নের প্রখর দৃষ্টিতে মূর্ত হইল কৌতুক ও করুণা।

।। নয় ।।

সপ্তর্ষিগণের সাময়িক অন্তর্ধানে অন্তরীক্ষে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়াছে। সুধাকর সোমদেবতার বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। নিজস্ব চন্দ্রলোকে তিনি নির্মল কৌমুদী বিস্তার করিয়া পুনরায় রোহিণীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয়ে ছায়াপাত হইল। মনে হইল যে জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালে তারা দেবী আত্মহারা হইয়া স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিলেন সেই শুভ্র মেঘখণ্ড সহসা গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত বিরাট এক মনুষ্যমুখে রূপান্তরিত হইয়া তারা দেবীর সহিত আলাপ করিতেছে। ঈর্ষ্যায় কলঙ্কীর মুখমণ্ডল আরও কালো হইয়া গেল। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন, বৃহস্পতি হয়তো কোনও দূত পাঠাইয়াছেন তারার কাছে। লোকটা এত অপমানিত হইল তবু ছাড়িবে না? হইতে পারে তারা তাঁহার ধর্মপত্নী, কিন্তু সে যখন তাঁহার কাছে থাকিতে রাজি নয়, সে যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত পলাইয়া আসিয়াছে, তখন ইহা লইয়া আর মাতামাতি কেন? তারার পুত্র বুধ যে আমারই পুত্র ইহা সর্বজনবিদিত। পিতামহ নিজে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরও বৃহস্পতি যদি....। চন্দ্রের চিন্তাধারা কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। সেই মেঘনির্মিত মনুষ্যমুখ তাহারই দিকে সবেগে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রদেব চমকিত হইলেন—একি, এ যে স্বয়ং পিতামহ!

পিতামহ নিকটস্থ হইয়া চন্দ্রদেবকে ঘিরিয়া অপরূপ শোভা সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর বলিলেন—ওহে চাঁদ, আমি তোমার তারা দেবীকে নিয়ে চললাম। মেঘের আড়ালে যেটা রইল, সেটা তারার মতোই দেখাবে বটে, কিন্তু সেটা ওর কঙ্কাল—ওটার সঙ্গে প্রেম করতে যেও না, সুখ পাবে না।"

চন্দ্র শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় নিয়ে চললেন।"

"মর্ত্যলোকে। পাতালের এক পাগল রাজপুত্রকে ভোলাতে।"

"ভোলাতে?"

চন্দ্র হতবাক হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিতামহ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, তোমার ভয় হচ্ছে, ও যদি নিজেই ভুলে যায় তাহলে তোমার দশা কি হবে। ভয় নেই, ও ভুলবে না। একটি পুরুষের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করে সারাজীবন তার দাসী হয়ে থাকার মতো মনোভাব এদের নয়। এদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম অভিনেত্রী করে। মোহিনী প্রেয়সীর অভিনয়ে এদের জোড়া নেই। তোমাকে কি ভাবে ভুলিয়েছিল মনে আছে তো? আমার বিশ্বাস পাতালের রাজপুত্র ওকে বাগাতে পারবে না। তোমার কাছেই ও ফিরে আসবে আবার। তুমি ওকে যথেষ্ট সুখে রেখেছ দেখছি—"

"কিন্তু পিতামহ, যদি না আসে—"

"তাহলে বৃহস্পতির যে দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে।"

"কিন্তু পিতামহ—"

"দক্ষ রাজার সাতাশটি মেয়েদের উপর তো একাধিপত্য করছ! তবু তোমার আশা মিটছে না? এদিকে শুনছি যক্ষ্মা হয়েছে—"

রোহিণী অপ্রত্যাশিতভাবে বলিয়া উঠিল—"তারাকে নিয়ে যান আপনি। ওর কথা শুনবেন না।"

বাকী ছাব্বিশ জন দক্ষ কন্যাও সমস্বরে সমর্থন করিল সে কথার। পিতামহ অন্তর্ধান করিতেছিলেন এমন সময় চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"একটা কথা শুধু বলে যান পিতামহ—"

"কি বল।"

"তারাকে কার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।"

"মেঘমালতীর।"

"সে আবার কে।"

"স্বর্গের একজন অপ্সরী।"

"কি করে তা সম্ভব হবে পিতামহ। তারা কি তারা ছাড়া আর কিছু হতে পারে?"

"ওকে স্বৈরচর করে দেব। ও যা খুশী হতে পারবে। আপাতত ওকে মেঘমালতী হতে হবে, আর প্রয়োজন মতো মাছিও হতে হবে মাঝে মাঝে।"

"মাছি?"

"হাঁ, কালকূটের সঙ্গে একা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মেঘমালতী সেজে থাকবে তারপর যেই তার বউ বর্ণমালিনীর সাড়া পাবে অমনি পট করে মাছি হয় যাবে।"

"কেন?"

"প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। নাগিনী বর্ণমালিনী নক্ষত্র-বধূদের মতো উদারচেতা নয়। সপত্নীর সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সে মনোহারিণী কিন্তু হিংসাবিষে পরিপূর্ণ, তার সুদীর্ঘ জিহ্বা ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ। যদিও নিজেকে সে বর্ণবিরোধী বলে প্রচার করে, যদিও মুখে সে বলে যে সমস্ত পৃথিবী একরঙা হয়ে যাক, কিন্তু নিজে সে বিচিত্রবর্ণা, কালকূটকে সম্পূর্ণভাবে সে নিজে অধিকার করে রাখতে চায়। সুতরাং তারাকে সাবধানে থাকতে হবে।"

"এ সব বিপজ্জনক জটিলতার মধ্যে কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন পিতামহ।"

পিতামহ স্মিতমুখে কিছুক্ষণ শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"দেখ, আমার নিজের তৈরি খেলাঘরে আমার নিজের পুতুল তোমরা। তোমাদের আমি যখন যেখানে খুশী রাখব, যখন যেমন খুশী সাজাব। তোমরা খেলাটাকে খেলার মতোই উপভোগ কর—তাহলে যেটাকে বিপজ্জনক জটিলতা মনে হচ্ছে, তাতেই আনন্দ পাবে। ওগো—তোমরা এই ছেলেমানুষটাকে একটু ভোলাও-তো!"

পিতামহের কথা শুনিয়া সাতাশটি নক্ষত্রের সর্বাঙ্গে নব নব দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বাতী হাসিয়া বলিল—"আপনি যান, আমরা ওকে সামলাব।"

"আমার একটা নালিশ আছে পিতামহ।"

রোহিণী আগাইয়া আসিল।

"কি হল তোমার আবার।"

"কিছু হয়নি, কিন্তু আপনি মানুষ নামক যে জীব সৃষ্টি করেছেন তাদের এত বোকা করেছেন কেন বলুন তো?"

"কেন, কি করেছে তারা তোমার।"

"একজন মানুষ জ্যোতিষী নাকি বলেছে যে আমার চেহারা ষাঁড়ের মুখের মতো।

দেখুনদিকি কাণ্ড! অশ্বিনীকে বলেছে ঘোড়ামুখো, শতভিষাকে কুম্ভ, ধনিষ্ঠাকে মৃদঙ্গ—! আপনি ওদের বুদ্ধিটাকে একটু ঘষে মেজে ঠিক করে দিন।"

"আমাকেই ওরা চতুর্মুখ বানিয়ে দিয়েছে! ওদের কাছে কি ঘেঁষবার জো আছে। ওরা নিজেদের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর শক্তি দিয়ে নিজেদের মতো জগত সৃষ্টি করে তাতে মশগুল হয়ে আছে। ওদের কিছু করা যাবে না। ওরা নিজেদের পথ নিজেরাই বদলাবে ক্রমশ।"

"আমরা কিছু করব না?"

"আমরা মজা দেখব।"

নক্ষত্র-রূপসীদের নয়নে অধরে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

চন্দ্রদেব পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন—"পিতামহ, আমি কি তাহলে আর তারার দেখা পাব না?"

"যদি মাছি হয়ে পাতালে যেতে পার তাহলে পাবে। তারা যখন মাছি-রূপ ধারণ করবে, তখন তুমি মাছি-রূপে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারবে—"

"তা কি করে সম্ভব।"

"খুবই সম্ভব। এর নজীরও আছে অনেক। অশ্বিনীকুমারদের জন্মের ইতিহাসটা স্মরণ কর না। মনে নেই?"

"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই শুনিনি। বাইরের কোনো খবর রাখবার অবসর পাই না।"

"পাবার কথাও নয়। সাতাশটি পত্নী, উপরিও দু' একটা আছে। ঘটনাটা শোন তবে। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার বিয়ে হয়েছিল সূর্যের সঙ্গে। দুটি ছেলে—বৈবস্বত মনু আর যম এবং একটি মেয়ে যমী হবার পর সংজ্ঞা কাবু হয়ে পড়ল। মার্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রেম সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে তখন তার এক দাসী ছায়াকে পতিদেবতার কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়ল বনে তপস্যা করবার জন্যে এবং সম্ভবত সূর্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু সহস্রাক্ষ সূর্যের দৃষ্টি এড়ান সহজ কথা নয়! সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করে হাজির হলেন তার কাছে গিয়ে! ফলে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম হল। ইচ্ছা কর তো তুমিও মক্ষিকারূপ ধারণ করে তারার কাছে যেতে পার।"

চন্দ্রদেব নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মক্ষিকা? তা পারব না পিতামহ।"

"তাহলে বিরহ ভোগ কর কিছুদিন। আমি চললুম। আপত্তি না কর তো তোমার প্রেয়সীদের অধর সুধা চেখে যাই একটু।"

"না, না, আপত্তি আর কি।"

পিতামহ সাতাশটি নক্ষত্রকে একে একে চুম্বন করিয়া সূক্ষ্ম আলোক রেখা-রূপে পুনরায় মর্ত্যের দিকে নামিয়া গেলেন।

"দেখ, দেখ, কত বড় উল্কাপাত হল একটা!"

ভরণী দেবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

"ওটা উল্কা নয়। শ্রীমতী তারা পিতামহকে অনুসরণ করছেন। কত ঢঙই যে জানেন!"

চন্দ্রদেব ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন, তাহার পর রোহিণীর দিকে ফিরিয়া যথারীতি প্রণয় নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

।। দশ ।।

কালকূট তপস্যা করিতেছিলেন। প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করিতেছিলেন যে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, ঝোপের অন্তরালে চার্বাক নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ছিন্নভিন্ন হস্তকে ঘিরিয়া কতকগুলি রক্তলোভী মক্ষিকা ভনভন করিতে লাগিল কেবল। নিমীলিত নয়নে কালকূট মক্ষিকাদের গুঞ্জন কলরবই শুনিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল মক্ষিকাগুঞ্জনের অন্তরালে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। বহুদূর হইতে কে যেন বলিতেছে—ভয় নাই, আমি আসিতেছি। কালকূট একাগ্রচিত্তে সেই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং পিতামহই বুঝি মক্ষিকাগুঞ্জনের ভিতর দিয়া বার্তা প্রেরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মক্ষিকাগুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল। কালকূট চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহও উঠিয়া বসিল এবং তাহার অক্ষিবাতায়নে সেই রূপসী আবির্ভূতা হইলেন। কালকূটকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"আপনার অনুসন্ধান কি সমাপ্ত হয়েছে? আপনি এর হস্তের শিরা উপশিরা পেশী স্নায়ু ছিন্নভিন্ন করে কোনো রহস্যের সন্ধান পেলেন কি? যে হস্ত গুরু খড়্গ ধারণ করে নৃশংস হত্যায় সহায়তা করে, যে হস্ত নিপুণ বিলাসে লঘু তুলিকা চালনা করে মনোরম চিত্র অঙ্কন করে, যে হস্ত এক মুহূর্তে পেলব পল্লবতুল্য—পরমুহূর্তে কঠিন বর্তুলবৎ হতে পারে, যে হস্ত বরদান করে, ভিক্ষাদান করে, যে হস্ত সেবা করে, চপেটাঘাত করে, যে হস্ত কখনও মৌন কখনও ভাষাময়, কখনও লুণ্ঠক কখনও দাতা, সে হস্তের প্রকৃত রূপ কি আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাহলে অনুমতি দিন আমি অন্যান্য প্রার্থীদের বাসনা চরিতার্থ করবার আয়োজন করি। আপনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন তখন একদল প্রার্থীর বাসনা আমি পূর্ণ করেছি—"

কালকূট উত্তর দিলেন—"দেবি, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহে আপনার যেমন প্রয়োজন ছিল, আরও অনেকের তেমনি প্রয়োজন আছে, সকলকেই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে তাদের প্রয়োজনও মেটাব। আপনাদের প্রয়োজনের বৈচিত্র্যেই আমি আনন্দিত। এখনই একদল মক্ষিকা ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ক্ষতস্থানে বসে আমাকে প্রচুর অনন্দ দান করে গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহব্যবচ্ছেদ করে আপনি যে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন তাতেও আমি কম আনন্দিত হইনি। ওই দেখুন, আর একদল প্রার্থী বসে আছে—"

কালকূট দেখিলেন অনতিদূরে কয়েকটি শৃগাল বসিয়া রহিয়াছে।

"ওই শৃগালদের মুখে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন?"

"আত্মসমর্পণ করেই আমি যে কৃতার্থ।"

"দেবি, আমি কিন্তু এখনও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিনি।"

"কি ধরনের সিদ্ধি আপনি লাভ করতে চান বলুন। হস্ত ব্যবচ্ছেদ করে আপনি কি পেলেন?"

"আমি যা পেয়েছি তা সবই প্রত্যাশিত। আমি আশা করেছিলাম অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে—"

"সে প্রত্যাশাও আপনার সফল হবে হয়তো। এই মানবদেহ অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ।

ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ব্যবচ্ছেদিত হস্তের মধ্যবর্তী শিরাটি লক্ষ্য করুন। শিরাটি কি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে না?"

কালকূট অবিলম্বে শিরাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে সত্যই তাহা ক্রমশ স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা রজ্জুবৎ হইয়া উঠিল, তাহাতে বহুবর্ণের শল্ক সমাবিষ্ট হইল অবশেষে তাহা আর শিরা রহিল না, সর্পে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই সর্প মুহূর্তমধ্যে ফণা বিস্তার করিয়া কালকূটকে সম্বোধনও করিল—"কালকূট; তুমি স্পষ্ট ভাষায় বল তুমি কি চাও। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব তুমি কামনা করছ কেন? তাঁর একটা বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ করাই কি তোমার উদ্দেশ্য? না, আর কোনও উদ্দেশ্য আছে? সত্যভাষণ যদি কর তাহলে আমি তোমাকে সহায়তা করব।"

"আপনি কে?"

"আমি তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ! পিতামহের আদেশে আমি তোমার প্রকৃত মনোভাব জানতে এসেছি। তুমি যদি তোমার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত কর তাহলে তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন।"

"তিনি কি আমার মনোভাব জানেন না?"

"তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবই জানেন। কিন্তু তোমার মুখ থেকে তিনি তোমার অভিলাষ আমার মাধ্যমে শুনতে চান। তুমি নাগপুরী পাতাল পরিত্যাগ করে এসেছ কেন? সেখানেও তো তপস্যার উপযোগী বহু স্থান ছিল।"

কালকূট কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—"আমার পত্নী বর্ণমালিনীর অগোচরে আমি এ তপস্যা করতে চাই, নাগপুরীতে তা সম্ভব নয়।"

"বর্ণমালিনী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এই প্রমাণ করতে তুমি বেরিয়েছ, বর্ণমালিনীকে এই কথা তুমি বলেও এসেছ, তা কি তাহলে মিথ্যা?"

কালকূট বলিলেন—"আমি যা বলব তা বর্ণমালিনী টের পাবে না তো?"

"না। তুমি নির্ভয়ে সত্যভাষণ কর।"

"হ্যাঁ, তা মিথ্যা। আমি তাকে প্রতারণা করেছি।"

"কেন?"

"আমি যা কামনা করেছি তা সফল হলে বর্ণমালিনী ক্ষেপে যাবে। ক্ষিপ্তা বর্ণমালিনীর প্রকোপে আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে তাহলে।"

"আমি তো শুনলাম তুমি পিতামহের দর্শন কামনা করছ। পিতামহ যদি তোমাকে সত্যই দেখা দেন তাহলে বর্ণমালিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে একথা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পিতামহকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয় বর্ণমালিনীই বা না হবে কেন। তুমি কি তাহলে পিতামহকে দর্শন করতে চাও না?"

"পিতামহকেই আমি দর্শন করতে চাই।"

"তাহলে বর্ণমালিনী রাগ করবে কেন বুঝতে পারছি না। বৎস কালকূট, তুমি সরলভাবে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।"

"আপনি আমার আদিপুরুষ পরম পূজনীয় কশ্যপ। আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছি—"

"আমার শারীরিক সান্নিধ্যই কি তোমার লজ্জার কারণ হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, আমি অশরীরী হচ্ছি। তুমি স্পষ্ট করে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।"

সর্প অন্তর্হিত হইল।

কালকূট শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি মেঘমালতীকে চাই, তাই আমার এ তপস্যা। পিতামহ অসম্ভবকে সম্ভব কর। শবদেহের মধ্যে একদিন আমি অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তাই আমি শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, মর্ত্যের মায়ানদীর পারে অবস্থিত সন্ধানলোকে আমি বিরাটকায় এক শবের সন্ধান পাব যদি আমি সেই মায়ানদী পার হতে পারি। বর্ণমালিনীর জিহ্বার সাহায্যে আমি সে নদী পার হয়েছি, বর্ণমালিনী জিহ্বা বিস্তার করে সহায়তা করেছে, কারণ তাকে বলেছি যে ত্রিভুবনে তারই রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই আমার তপস্যা। কিন্তু তুমি তো জান, পিতামহ, আমার তপস্যা মেঘমালতীর জন্য, তুমি আমার এ বাসনা চরিতার্থ কর। যতক্ষণ আমি সিদ্ধিলাভ না করি ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, হে অসম্ভব-সম্ভবকর্তা আদিজনক, তুমি প্রসন্ন হও—"

মহাশূন্যলোকে একটি শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিতেছিল, মনে হইতেছিল একটি প্রসন্ন শুভ্র হাস্য যেন মেঘরূপ ধরিয়াছে। সহসা তাহার উপর স্বর্ণালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্ণালোককে সম্বোধন করিয়া শুভ্র মেঘখণ্ড বলিল—"সরো, শুনলে তো?"

"শুনলাম।"

"মানে, ও ক্রমাগত জ্বালাতন করবে। খেলনাটা না পাওয়া পর্যন্ত ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকবে ক্রমাগত। চল, আর দেরি করে কি হবে? নেবে পড়ি। তুমি বায়ুরূপে বহন কর আমাকে।"

"বহন করে কোথায় নিয়ে যাব।"

"সেই পদ্ম সরোবরে। তারা সেখানে পদ্মের পরাগ মাখছে ভ্রমরীর বেশ ধরে।"

"চলুন।"

বায়ুর বেগ বর্ধিত হইল। শুভ্রমেঘ লীলায়িত গতিতে ধীরে ধীরে চক্রবাল রেখার পরপারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কালকূটের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক কালো হইয়া গেল। সূর্য্যলোক অবলুপ্ত হইল না, কেবল তাহা কৃষ্ণাভ হইয়া হিংস্র হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন অভূতপূর্ব উপায়ে কোনো ক্রূর বিষধরের নয়নেয় দৃষ্টি মূর্ত হইয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই কৃষ্ণাভ আলোকে কশ্যপ পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কালকূট কশ্যপকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি সর্পরূপে আসেন নাই, নীলাভ জ্বলন্ত শিখার রূপে আসিয়াছিলেন। সেই শিখা যখন কথা কহিয়া উঠিল তখনই কালকূট বুঝিতে পারিলেন। শিখা বলিল—"বৎস কালকূট, তোমার অকপট মনোভাব জ্ঞাত হয়েছি। এখনই পিতামহের নিকট গিয়ে তা আমি ব্যক্ত করব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। আমি লজ্জিত হয়েছি। নাগবংশের কুলতিলক শেষ-নাগ কেন যে সহোদরদের সংসর্গ বর্জন করে তপস্যায় দেহপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা এখন আমি বুঝতে পারছি। নাগ বংশীয়েরা ক্রূর ও খল; তারা কুলাঙ্গার ও মন্দস্বভাব, তাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, তাদের তপস্যা তুচ্ছ বরলাভের জন্য। আমি সুর, অসুর, দৈত্য, দানব,

নাগ, পশুপক্ষী সকলেরই জনক, তাদের আচরণের নিন্দা বা গৌরব আমাকেই বহন করতে হয়, তাই আমি কঠিনপৃষ্ঠ কূর্মরূপ ধারণ করে থাকি। বৎস, তোমার এই কদর্য আচরণের জঞ্জালস্তূপও আমি বহন করব। কিন্তু বৎস, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি পরিচ্ছন্ন হও, সত্যকে কামনা কর, সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে ধ্রুবকেই সন্ধান কর—"

কালকূট বলিলেন—"বর্ণমালিনী এবং মেঘমালতীর মধ্যে কে ধ্রুব—"

জ্বলন্ত শিখা ইহার কোনো উত্তর দিল না। সহসা তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া পরমুহূর্তে নির্বাপিত হইয়া গেল। কালকূট সবিস্ময়ে দেখিল এক পর্বতাকার বিরাটকায় কূর্ম দিগ্বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিশাল পৃষ্ঠে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ। সে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণিমাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, আবর্জনা, কঙ্কাল, কর্দম, সুদৃশ্য খাদ্য, বহুবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার—একটা বিরাট জগৎ যেন। কালকূট বিস্ফারিত নয়নে সেই চলমান পর্বতের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেখিতে পাইল কূর্মপৃষ্ঠস্থ একটি নরকঙ্কাল ক্রমশ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহা মেঘমালতীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালকূটের মনে হইল মেঘমালতী হস্তসঙ্কেতে যেন তাহাকে আহ্বানও করিতেছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে অনুসরণ করিতে লাগিল।

।। এগারো ।।

আকাশ যেখানে গিয়া কল্পলোকে মিশিয়াছিল সেখানে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই ছিল না, বাতাসেও ছিল না, আলোক তো ছিলই না। কল্পলোকের প্রগাঢ় অন্ধকার তথাপি স্পন্দিত হইতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন একটি সুর সেই অন্ধকার জগতকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন সেই অদৃশ্য সুরেই সেই অন্ধকার লোক বিধৃত হইয়া আছে; তাহার অণুপরমাণু যেন সেই সুরস্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। ক্রমশ একটি সুর ভাঙিয়া দুইটি হইল, একই যেন দুই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মনে হইতে লাগিল দুইটি সুর-রেখা সমান্তরালে যেন অদৃশ্যলোকের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বাঙ্ময় হইল।

"হে স্রষ্টা, তুমি আর একবার বল, কিসে তুমি প্রকৃত আনন্দ পাও।"

"সৃষ্টিতে।"

"সৃষ্টির অর্থ কি।"

"অয়ি ছলনাময়ি, তুমিই তো আমার সর্ব সৃষ্টির বাণী। সৃষ্টির অর্থ কি তোমার জানা নেই? না, এটা তোমার ছলনা।"

"যদি ছলনাই হয় তাহলে তা-ও আপনার সৃষ্টি। কারণ আমি আপনারই বাণী। আমি আপনার সৃষ্টি-প্রেরণার ভাষা। কিন্তু সৃষ্টি মানে কি তা আমি জানি না।"

"যা ছিল না তাই সম্ভব করাই সৃষ্টি। এতেই আমার আনন্দ।"

"সৃষ্টি-রক্ষায় আপনার আনন্দ নেই?"

"সৃষ্টি-রক্ষা বিষয়ে আমি উদাসীন।"

"তাহলে আপনি বিষ্ণুকে সৃষ্টির হিসাব দাখিল করতে বলেছেন কেন?"

"তাতেও একটা সৃষ্টি হবে।"

"কি রকম সৃষ্টি।"

"রস-সৃষ্টি।"

সহসা দুইটি বিভিন্ন সুরের কলহাস্যে অন্ধকার আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পর একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল কল্পলোকের সেই নিবিড় অন্ধকার যেন তপস্যা-মগ্ন হইয়া গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার যেন নিবিড়তর হইতেছে, যুগ যুগান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সহসা সেই মহাশূন্য আবার বাঙ্ময় হইয়া উঠিল।

"বাণী, কোথা তুমি?"

"এই যে।"

"আমাকে আর তুমি স্রষ্টা বলে সম্বোধন কোরো না।"

"কেন?"

"কারণ আমি স্রষ্টা নই। মানুষই স্রষ্টা। মানুষই তোমাকে-আমাকে সৃষ্টি করেছে। তাদের কল্পনা আমাদের সৃষ্টি করছে, তাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের ধ্বংস করছে। আমি সেই সংশয়াচ্ছন্ন সত্য-সন্ধানীকে—তোমার-আমার স্রষ্টাকে, যেন দেখতে পাচ্ছি। সে ধন চায় না, মান চায় না, স্তুতিনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না, চায় শুধু সত্য—অর্ধ-সত্য নয়, সম্পূর্ণ সত্য। তার সত্য সন্ধানের খেলাঘরে আমরা তারই তৈরী খেলনা মাত্র। আমাকে স্রষ্টা বলে আর ডেকো না তুমি।"

"আপনি কি চার্বাক কালকূটদের কথা ভাবছেন?"

"ওরা সত্য চায় না, ওরা চায় আত্মপ্রসাদ। সেই আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে ওরা সব অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের মধ্যেই সেই সত্য-সন্ধানী আছে যে দ্রষ্টা যে স্রষ্টা—"

"আমি আপনি কেউ নই তাহলে—"

"আমি ওদের প্রেরণা, আর তুমি ওদের ভাষা। ওরা যেমন বদলাবে আমরাও তেমনি বদলাব। ওরাই কবি, আমরা ওদেরই সৃষ্টি—"

"কিন্তু আপনি যে স্বৈরচর সৃষ্টি করলেন—"

"তা ওদেরই কবির প্রেরণায়, ওদেরই প্রেরণাকে আমি রূপ দিয়েছি কল্পলোক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষ হয়তো থাকবে না, আমরাও তখন থাকব না—"

"মানুষ থাকবে না কেন?"

"যারা একান্তভাবে সত্যকে চায় তারা একদিন সত্যেই লীন হয়ে যায়, তাদের আলাদা অস্তিত্ব আর থাকে না। সত্য সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না, বাণীরও প্রয়োজন নেই তার।"

"এ অবস্থায় পৌঁছতে মানুষের কত দেরি আছে।"

"অনেক দেরি। হয়তো কোনও দিনই কেউ পৌঁছবে না। কিন্তু সম্ভাবনা আছে ওদেরই—"

"যতদিন না পৌঁছচ্ছে ততদিন—"

"ততদিন এস আমরা খেলা করি দেব-দৈত্য দানব-মানবদের কামনা নিয়ে। ভবিষ্যৎ যুগের এক চার্বাকের ছবি তুমি দেখাবে বলেছিলে—"

"চলুন তাহলে নিয়ে যাই আপনাকে ভবিষ্যৎ যুগের কবির মানসলোকে, "কিন্তু উপস্থিত যে চার্ব্বাকটি ঝোপের ভিতর বসে আছে তার গতি কি হবে"

"তাতো আমি এখনও জানি না। ওর নব প্রেরণায় যে নবব্রহ্মা সৃষ্টি হবে সেই চালিত করবে ওকে—"

সহসা সেই কল্পলোকে এক আর্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—'পিতামহ, পিতামহ, গরুড় আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছে, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি, আমাকে রক্ষা করুন—"

পিতামহ বলিলেন—"চল! নাটক করা যাক্—"

।। বারো ।।

পিতামহের কল্পলোকের মহাশূন্যে বর্তমান সহসা ভবিষ্যতে পরিণত হইল! সেই সহসা-সৃষ্ট ভবিষ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে যে লীলানাটক তাঁহার মানস-লোকে মূর্ত হইল তাহার অসম্ভব অবাস্তবতায় তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সত্যই যদি এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিতেন—কি অদ্ভুত কাণ্ডই না হইত! কিন্তু তিনি জানেন সৃষ্টিকর্তাও স্বাধীন নহেন, তিনিও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। সুদক্ষ জাদুকরের মতো স্বৈরচর সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে বিস্মিত করিতে পারেন, বীণাপাণিকে আনন্দিত করিতে পারেন, নিজের কল্পনা-বিলাসে বিভোর হইয়া অসম্ভব-সৃষ্টি-সম্ভাবনায় মগ্ন থাকিতে পারেন, কামনাতুর চার্বাক-কালকূটদের ভোজবাজি দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিতে পারেন, কিন্তু সত্যই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন না। করিতে পারেন না বলিয়া কিন্তু পিতামহের দুঃখ হইতেছিল না। বরং তাঁহার মনে হইতেছিল বাস্তব-অবাস্তবের প্রভেদ তো অনুভূতির তারতম্য মাত্র। চক্ষুহীনের চেতনায় আলোক অবাস্তব, বর্ণসমারোহ অর্থহীন। তাঁহার মানস-লোকেই যদি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন, সত্যই যদি অমূর্ত মূর্ত হইয়া ওঠে, বস্তুলোকের মানদণ্ডে তাহার মহিমা নাই বা ধরা পড়িল। তিনি নিজে আনন্দিত হইতেছেন ইহাই তো যথেষ্ট।

....নাটক সুতরাং জমিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ সত্যই পিতামহ সাজিয়া বসিয়াছিলেন। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, আস্কন্ধ বিলম্বিত পক্ব কেশদাম, শুভ্র উত্তরীয়, নিষ্কলুষ কাষায় বস্ত্র তাঁহাকে সনাতন পিতামহের মহিমা দান করিয়াছিল। তাঁহার বামপার্শ্বে ছিল রত্নখচিত অহিফেনের কৌটা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল সুবর্ণনির্মিত বৃহৎ একটি গড়গড়া। দুগ্ধধবল বিরাট তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পিতামহ নিমীলিতনয়নে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। গলা খাঁকারির শব্দ পাইয়া তিনি চক্ষু খুলিলেন। দেখিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন।

বিষ্ণু। পিতামহ, অতিশয় বিপন্ন হয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমার বাহন গরুড় সহসা মানব-মূর্তি পরিগ্রহ করে তার জননীর কাছে ফিরে গেছে। হর্ষনীড় নামক গ্রামে বাস করছে তারা। আপনি হয় আমাকে আর একটি বাহন সৃষ্টি করে দিন, না হয় গরুড়কে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে আদেশ করুন। আপনার কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

পিতামহ। আমি কিছু করব না। আমি চটেছি। বহুকাল থেকে তুমি তোমার কাজে ফাঁকি দিচ্ছ। গরুড়ের পিঠে চড়ে কমলিকে বাঁ পাশে নিয়ে তুমি আকাশে আকাশে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ কেবল। কাজকর্ম কিছুই করছ না।

বিষ্ণু। আপনার মুখে একথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অহোরাত্র আমি ব্যস্ত। এক মুহূর্ত আমার বিশ্রাম নেই।

পিতামহ। (অধীরভাবে) ওসব একদম বাজে কথা। তোমার অক্ষমতা ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়ছে বিষ্টু। কথা ছিল আমি সৃষ্টি করব, তুমি রক্ষা করবে। তা কি তুমি করছ?

বিষ্ণু। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পিতামহ।

পিতামহ। এর নাম চেষ্টা করা? আদিম যুগে আমি যে সব বিশাল সমুদ্র, বিরাট পর্বত, দিগন্তপ্রসারী তুষারপ্রান্তর সৃষ্টি করেছিলাম তার চিহ্ন পর্যন্ত আছে আর?

বিষ্ণু। আপনি একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন পিতামহ। আপনি নিজেই যে নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে দিলেন হঠাৎ একদিন। সব উলটে পালটে গেল, মহেশ্বর তাই সুবিধে পেলেন।

পিতামহ। কিন্তু তুমি কি করছিলে? মহেশ্বরকে রুখলে না কেন তুমি? তোমার পালন করবার কথা না?

বিষ্ণু। ন্যায্য কারণ ঘটলে মহেশ্বরকে রোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই যে পিতামহ। আপনি নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে না দিলে—

পিতামহ। (ধমক দিয়া) আরে, কি বিপদ! বড় শিল্পী মাত্রেই নিজের রচনায় একটু আধটু অদল-বদল করে থাকে; তাই বলে সব উড়িয়ে দিতে হবে! গোড়ার যুগে আমি যে সব অপূর্ব উদ্ভিদ, অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলাম সব উপে গেল ওই জন্যে? ওসব কিছু শুনতে চাই না। হিসেব দাখিল কর তুমি!

বিষ্ণু। কোন যুগের হিসেব চাইছেন আপনি? প্রোটারোজোয়িক না আর্লি প্যালিয়োজোয়িক?

পিতামহ। কি বললে?

বিষ্ণু। প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক। মানে—

পিতামহ। ওসব আবার কি কথা!

বিষ্ণু। মানুষেরা আপনার বিভিন্ন যুগের সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ করেছে কিনা!

পিতামহ। মানুষেরা! তাই না কি! কি রকম, কি কি নাম শুনি!

বিষ্ণু। অ্যাজোয়িক, প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক, লেটার প্যালিয়োজোয়িক, ক্যাইনোজোয়িক—

[বিষ্ণু দ্বারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উর্বশী আসিয়া প্রবেশ করিল]

উর্বশী। [মধুর হাসিয়া] অর্ধ-স্ফুট পারিজাতের নব পরাগে প্রতি প্রভাতে যে ললিত সুষমা জাগে, তাকেই আজ মূর্ত করেছি একটি রাগিণীতে। শুনবেন পিতামহ?

পিতামহ। কাজের কথা হচ্ছে, ভ্যান ভ্যান কোরো না এখন, যাও।

[উর্বশী বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপসৃতা হইল]

পিতামহ। মানুষ কোন যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক যুগে। মানুষ আবার নিজের যুগকে নূতন নানা নামে ভাগ করেছে। আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। দৈত্যরা কোন যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজেয়িক।

পিতামহ। দেবতারা?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িকই বলতে হয়।

পিতামহ। রাম রাবণ চার্বাক প্রহ্লাদ সব্বাইকে এক গোয়ালে পুরেছে। ধাষ্টামো যত।

বিষ্ণু। স্তন্যপায়ী জীবমাত্রকেই ওরা এক যুগে ধরেছে। কিন্তু সভ্যতার প্রগতি হিসেবে ওই যে বললাম, আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক।

পিতামহ। ধাষ্টামো, ধাষ্টামো, সব ধাষ্টামো। তুমি এই সব বাজে খবর সংগ্রহ করে সময় নষ্ট করেছ খালি। তোমার আসল কর্তব্য ছিল সৃষ্টি রক্ষা করা, সেইটিই করনি কেবল।

বিষ্ণু। যথাসাধ্য করেছি বই কি পিতামহ।

পিতামহ। কিচ্ছু করনি।

বিষ্ণু। এ কথা বলছেন কেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো এখনও আছে—

পিতামহ। আমি যে সব মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলাম, কোথায় সে সব? বহু যোজনব্যাপী বিশাল-দেহ সরীসৃপ, দ্বীপাকৃতি কূর্ম, দিগন্তবিস্তৃত পক্ষধারী বিহঙ্গম, পর্বতপ্রমাণ রোমশকায় হস্তী, কোথায় তারা? গোটাকতক ছুঁচো ফড়িং আর চামচিকে বাদে সব তো লোপাট হয়ে গেছে।

বিষ্ণু। তার জন্যে আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। আমি চেষ্টার কসুর করেছি কি? কিন্তু কিছুতেই রাখা গেল না; কি করব বলুন। আপনার মহাকাব্যগুলি যে বড় বেশী রকম অমিত ছিল পিতামহ। বিরাট পাখি, বিরাট তার ঠোঁটের ভিতরও আবার বড় বড় দাঁত—

পিতামহ। আমি কি তোমার ফরমাশ অনুযায়ী সৃষ্টি করব না কি!

বিষ্ণু। আজ্ঞে না, আমি তা বলছি না।

পিতামহ। তবে ও কথা বলবার মানে?

বিষ্ণু। মানে, আমি বলছি কিছুতেই রাখা গেল না ওদের। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে গেল কিছু, কিছু গেল প্রাকৃতিক প্রভাবে—

পিতামহ। কিন্তু তুমি করছিলে কি! তোমার কর্তব্য ছিল তাদের রক্ষা করা।

বিষ্ণু। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। প্রত্যেকবার অবতার হয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছি আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে। কূর্ম মৎস্য বরাহ রূপ ধারণ করে অসীম কষ্ট সহ্য করেছি কাদায়, জলে, বনে-বাদাড়ে। সে যে কি অসহ্য কষ্ট—

.পিতামহ। মজাও কম লোটনি। কৃষ্ণলীলার অজুহাতে বৃন্দাবনে তুমি যে রকম স্ফূর্তি উড়িয়েছ (সহসা) অথচ যদুবংশটাকে রাখতে পারলে না। একটি মুষল জুটিয়ে—আঃ। একটু দুরন্ত দামাল কিছু হলেই অমনি মহেশটাকে ডেকে ধ্বংস আর ধ্বংস! ওই এক শিখেছ [চিৎকার করিয়া] ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করেছ তুমি—

[বিষ্ণু কাতরভাবে পুনরায় দ্বারের দিকে চাহিলেন। যে সিনেমা-তারকাটি মর্ত্যলোক অন্ধকার করিয়া সম্প্রতি দেবলোকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রবেশ করিলেন। ভাত-খেকো ভুঁড়িদার চেহারা। বিষ্ণুর বিশ্বাস ছিল আধুনিকা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে পিতামহের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, বিশ্বাস কিন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল।]

পিতামহ। [রুক্ষকণ্ঠে] তুমি এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?

সিনেমা-তারকা। [সসঙ্কোচে] আপনার আপিঙের কৌটতে আপিঙ আছে কি না দেখতে এসেছি। ভাবলুম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

পিতামহ। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও এখান থেকে। ফক্কড় কোথাকার—

[সিনেমা-তারকা মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন]

বিষ্ণু। আপনার অহিফেন-সেবনের সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে পিতামহ।

পিতামহ। ওসব চালাকি রেখে দাও। হিসেব চাই আমি।

বিষ্ণু। হিসেব কি করে দোব তা তো বুঝতে পারছি না।

পিতামহ। তা বুঝতে পারবে কেন! [সগর্জনে] আমি আজ পর্যন্ত যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তার পাই-পয়সা নিখুঁত হিসেব চাই।

বিষ্ণু। এ যে অসম্ভব কথা বলছেন পিতামহ। আপনার সৃষ্টি অনন্ত—

পিতামহ। শুধু অনন্ত নয়, অপরূপ, বিচিত্র, বিস্ময়কর। তুমি আর ময়শা মিলে গোল্লায় দিয়েছ সব। আবার না কি যুদ্ধ বাধবে শুনেছি। ময়শা আবার না কি লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। হিসেব দাও। তোমার উপর রক্ষা করবার ভার দিয়েছিলাম, পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দাও আমাকে।

বিষ্ণু। কি মুশকিল। হিসেব কি করে দোব বলুন। নানা বিবর্তনে—

পিতামহ। হিসেব দিতে তুমি বাধ্য।

[বিষ্ণু কি যে বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না]

পিতামহ। কথার জবাব দিচ্ছ না যে।

বিষ্ণু। সেদিন একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁকেই না হয় ডেকে আনি, তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক খবর বলতে পারবেন।

[পিতামহকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন এবং হেকেলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন]

পিতামহ। এ কে?

বিষ্ণু। ইনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক; (হেকেলকে) বলুন—

হেকেল। (সবিনয়ে) আমি অবশ্য খুব বেশী জানি না। ফসিলে মিসিং লিংক্সের যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম তার থেকে আমি মানুষ আর অ্যানথ্রোপয়েডস্‌দের একটা যোগসাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম।

পিতামহ। (বিষ্ণুকে) বাজে ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ?

বিষ্ণু। আজ্ঞে ধাপ্পা নয়, ফসিলেই আপনার সৃষ্টির ইতিহাস নিহিত আছে।

পিতামহ। ফসিল? সে আবার কি!

হেকেল। ভূস্তরে মৃত প্রাণীদের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম ফসিল। কোথাও হয়তো একটা দাঁত পাওয়া গেছে, কোথাও বা মাথার খুলির খানিকটা, কোথাও হয়তো পায়ের এক টুকরো হাড়, কোথাও—

পিতামহ। [যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন] অ্যাঁ, আমার সৃষ্টির এই দুর্দশা হয়েছে না কি। কোথাও একটা দাঁত, কোথাও একটা মাথার খুলি, আর তাই শোনাচ্ছ আমাকে এসে।

হেকেল। এই সব থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে—

পিতামহ। [সহসা ফাটিয়া পড়িলেন] বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরিয়ে যাও

[হেকেল দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন]

বিষ্ণু। পিতামহ, ধৈর্য রক্ষা করুন। শুনুন—

[পিতামহ এতক্ষণ একমুখ ছিলেন, সহসা চতুর্মুখ হইয়া গেলেন]

পিতামহ। (চতুর্মুখ একসঙ্গে) মূর্খ, ভণ্ড, ক্রুর, শঠ।

বিষ্ণু। শুনুন।

পিতামহ। অস্পৃশ্য, নারকী, দুরাত্মা, দুর্মতি।

বিষ্ণু। পিতামহ, পিতামহ।

পিতামহ। দুঃশীল, পাপাশয়, নীচমনা, বিভীষণ।

বিষ্ণু। [অতিশয় শশব্যস্তে] শুনুন, শুনুন পিতামহ—

[অতঃপর পিতামহ প্রাকৃত ভাষা শুরু করিলেন]

পিতামহ। জালিয়াত, ধড়িবাজ, লম্পট, স্বার্থপর—

[পিতামহের অষ্ট নয়নে ক্রোধবহ্নি ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় বিষ্ণু শেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও পিতামহের দুই পত্নী দেবসেনা, দৈত্যসেনাকে ডাকিয়া আনিলেন]

দৈত্যসেনা। ভীমরতি হয়েছে মুখপোড়ার—

দেবসেনা। [বিষ্ণুকে] আমরা পেরে উঠব না। ডাক্তার ডাক। দু'জন বিলেত-ফেরত ডাক্তার স্বর্গে এসেছেন সম্প্রতি, তাঁদেরই ডেকে আন। বেশ ছেলে দুটি—

পিতামহ। (সগর্জনে) দূর হও, ধুমসি, মুটকি, ধ্যাদ্ধেড়ে, ধুকড়ি—

[দেবসেনা দৈত্যসেনা চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু ত্বরিত-গতিতে গিয়া ডাক্তার দুইজনকে ডাকিয়া আনিলেন]

প্রথম ডাক্তার। এখানে টেরামাইসিন পাওয়া যাবে কি।

দ্বিতীয় ডাক্তার। সালফানিলামাইড ট্রাই করলেও মন্দ হয় না।

পিতামহ। [ক্ষিপ্ত হইয়া] গুণ্ডা, গাড়োল, উল্লুক, গাধান্ড

প্রথম ডাক্তার। এ রাঁচির কেস মশাই। টেরামাইসিন দিলে—

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমি কিন্তু একটা এনকেফালটিসে সালফানিলামাইড দিয়ে বেশ উপকার পেয়েছিলাম। ও মশাই, খড়ম তোলে যে চলুন চলুন—

সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার দুইজন সরিয়া পড়িলেন। গালাগালি দিতে দিতে পিতামহের চতুর্মুখ ফেনময় হইয়া গেল। নিরুপায় বিষ্ণু তখন যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ডাকিয়া আনিলেন। সকলেই আসিলেন কিন্তু কেহই কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। সকলেই অবশ্য পিতামহকে প্রশমিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ দূরে সারিবদ্ধ হইয়া কেহ মধুর হাস্য, কেহ বা কটাক্ষ দ্বারা মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন। কিন্নরদল গান গাহিতে লাগিলেন। স্বয়ং পবন আসিয়া চামর হস্তে লইলেন, বরুণ শীকর-স্নিগ্ধতা সৃজন করিলেন। বীণাপাণিও আসিয়া ছিলেন, তিনিও বীণায় ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অতিশয় মধুর একটি রাগিণী আলাপ করিতে করিতে পিতামহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পিতামহের চতুর্মুখ হইতে সমবেগে চারচারটি করিয়া গালি একসঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

বিষ্ণু। [সকাতরে] শুনুন পিতামহ—

পিতামহ। দমবাজ, বদমাস, বেইমান, জোচ্চর—

[সহসা বিষ্ণু করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন এবং অন্য সকলকে তাহাই করিতে ইঙ্গিত করিলেন]

পিতামহ। জঘন্য, অন্ত্যজ, পাপী, পাজিন্ড

সকলে। সমস্বরে হে ব্রহ্মা, হে পিতামহ, হে কমলযোনি চতুরানন, তুমি সর্বতোমুখ বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

পিতামহ। ফক্কড়, ফাজিল, ডেঁপো—

সকলে। হে কবি, সৃষ্টিকর্তা, সূর্য যেমন প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করত কুজ্ঝটিকাকুল পদ্মবনকে পুলকিত করে, তুমিও তেমনি আলোকশুভ্র প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া দিশাহারা আমাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত কর—

পিতামহ। নির্লজ্জ, নচ্ছার—

সকলে। [দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্বরে] হে আদিকারণ, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই বিদ্যামান ছিলে। হে অজ, সলিলগর্ভে একদা যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব-সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মারূপী, হে গুণাকর, হে অনন্ত সৃষ্টিনিধান, হে পিতামহ—

পিতামহ। যতো সব—

সকলে। [সমস্বরে] হে জগৎপতি; তুমি ঋষি, তুমি সুখ, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি যুবাশ্রেষ্ঠ, তুমি অমিতবল, তুমি অমৃত, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমিই সর্বোত্তম, তুমিই পরিত্রাণস্থান, সর্বপ্রকার কল্পনার আকর, হে আদীশ্বর তোমা ভিন্ন কাহারও গতি নাই, হে দেবোত্তম, হে মূলাধার—

[এই ভাবে সকলে তারস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ প্রার্থনা চলিবার পর দেখা গেল পিতামহের চতুরাননে হাসি ফুটিয়াছে এবং তিনি আফিঙের কৌটা খুলিতেছেন।]

বিষ্ণু। [করজোড়ে] পিতামহ, গরুড়কে ফিরিয়ে দিন

পিতামহ। এদের সবাইকে চলে যেতে বল, তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করবার আছে—

[বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সমাগত দেবদেবীরা অন্তর্ধান করিলেন]

বিষ্ণু। কি বলুন।

পিতামহ। আমরা কোথায় আছি জান?

বিষ্ণু। স্বর্গলোকে।

পিতামহ। কবিদের কল্পনায়। কবিরাই আমাদের স্রষ্টা। সম্প্রতি একদল যুক্তিবাদী ঋষি পদে পদে সেই কবিদের অপদস্থ করছে। কবিরা যদি লোপ পায়, তাহলে আমরাও লোপ পাব। সুতরাং কবিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বৈদিক ঋষিরা একদা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্নির জ্বলন্ত শিখায় পবিত্র হবিঃ দান করে দেবতাদের মূর্ত করেছিলেন। সেই বৈদিক ঋষিরা আজকাল বিপন্ন হয়েছেন চার্বাক নামক এক অর্বাচীন যুবকের যুক্তিজালে। বীণাপাণি চেষ্টা করেছিলেন তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে। কিন্তু সফল হননি। অলৌকিক নানারকম

দৃশ্য দেখে চার্বাক বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তিভ্রষ্ট হয়নি। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে তার যুক্তি আঁকড়ে বসে আছে। শক্তিশালী-গরুড়কে তাই লাগিয়েছি এবার। চার্বাককে কাবু করতেই হবে। তা না করতে পারলে আমরা গেলাম। তুমিও লেগে পড়, মহেশকেও ডাক।

বিষ্ণু। আমাদের কি করতে হবে।

পিতামহ। চার্বাকের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। হর্ষনীড় গ্রামে গরুড়কে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি. তোমরাও যাও।

বিষ্ণু। আর আপনি?

পিতামহ। আমি তো যাবই। কিন্তু আমি আড়ালে থাকব।

বিষ্ণু। দেবী বীণাপাণি চার্বাককে কি ভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন?

পিতামহ। দেবী বীণাপাণির আজকাল নূতন একটা বাই চেগেছে। তিনি মানুষের অবচেতনলোকে ঢুকে কি সব যেন করেছেন। চার্বাকের অবচেতনলোকেও তিনি নানারকম কারিকুরি করেছিলেন, কিন্তু কিচ্ছু হয়নি, তার নাস্তিক্যবুদ্ধি বেশ টনটনে আছে। ওসব সূক্ষ্ম কারিকুরির মর্ম চার্বাক বুঝবে না। ওর কাছে স্থূল ব্যাপারের অবতারণা করতে হবে। অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলে ও কোনোদিনই মানবে না, সে শক্তিই ওর নেই। ধরবার ছোঁবার মতো একটা বাস্তবিক কিছু হাজির করতে হবে ওর কাছে। সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্তকীকে ভোলবার জন্যে ও মনে মনে ব্যগ্র হয়ে আছে। সেই রন্ধ্রপথে ঢুকে দেখ যদি কিছু করতে পার—

বিষ্ণু। বেশ, সেই চেষ্টাই করি তাহলে।

পিতামহ। হ্যাঁ, যাও।

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-পাত হইল।

ক্ষণপরেই দেখা গেল মর্ত্যের এক গহন কান্তারে বিশাল এক ময়ূর পেখম বিস্তার করিয়া একটি তন্বী ময়ূরীকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

।। তেরো ।।

প্রখর সূর্যালোকে চার্বাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া প্রথমেই সে দেখিতে পাইল আলুলায়িত-কুন্তলা নীলোৎপলা ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নীলোৎপলাই প্রথমে কথা কহিল।

"আপনি যে ঘরে শয়ন করেন সেই ঘরের কোণে একটি ভাণ্ডে সুরা ছিল, তা কি আপনি পান করেছেন?"

চার্বাক সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গেল। এতক্ষণ সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল তাহা যে সুরা-জনিত অলীক স্বপ্ন নিমেষের মধ্যে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে আত্মস্থ হইল, সূর্যালোক-স্পর্শে কুজ্ঝটিকার রহস্যলোক যেন বিলীন হইয়া গেল।

নীলোৎপলা অধীর ভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বলুন, আপনি কি তা পান করেছেন?"

"করেছি। ওই ভাণ্ডে আমি নিজের জন্য পানীয় জল রাখতাম। কাল দেখলাম জলের

পরিবর্তে সুরা রয়েছে। মনে হল আমার শ্রান্তি অপনোদন করবার জন্যে তুমিই হয় তো তাতে সুরা রেখে দিয়েছ। নারীরা স্বভাবতই করুণাময়ী, আর তুমি তো নারী-শ্রেষ্ঠা—"

"আমিই আপনার জলভাণ্ডে সুরা রেখেছিলাম। কিন্তু ঠিক করুণাবশত রাখিনি। আমার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। কাল আপনি যখন রাত্রে ফিরলেন না তখন বড় ভাবনা হয়েছিল আমার। নিজেই তাই আজ সকালে আপনার সন্ধানে বেরিয়েছি, আপনাকে জীবিত দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি। আপনি কি সমস্ত রাত এই মাঠেই পড়েছিলেন?"

"আমার দেহটা হয় তো ছিল, কিন্তু আমার মন–"

সহসা চার্বাক উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইল, নীলোৎপলার দুই হস্ত ধরিয়া প্রদীপ্ত নয়নে কহিল,—"ভদ্রে, গতরাত্রে আমি এক আশ্চর্য জীবন যাপন করেছি।"

"কি রকম।"

"কাল সমস্ত রাত্রি আমি এমন এক রূপকথালোকে বিচরণ করেছি যেখানে অসম্ভব সম্ভব হয়, যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে কোনও প্রভেদ নেই, যেখানে অলীক এবং বাস্তব অভিন্ন। প্রভেদ নির্ণয় করবার উপায় নেই। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল হয় তো পাগল হয়ে গেছি—"

চার্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলার মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ তাহলে মিথ্যা ভাষণ করেননি দেখছি। যে সুরা তিনি আমাকে দিয়েছেন তা প্রকৃতই তাহলে আশ্চর্য ফলপ্রদ। আপনার উপর ওই সুরার প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্যই আমি আপনার জলভাণ্ডের জল ফেলে দিয়ে তাতে সুরা রেখেছিলাম। আপনার বিশেষ কোনও কষ্ট হয়নি তো? চলুন, স্বহস্তে আমি আপনাকে আজ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করে দেব! আহারাদি করে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আজ আর আপনাকে মাটি কাটতে যেতে হবে না।"

"ভদ্রে, আমার সঞ্চিত অর্থ তো কিছু নেই। প্রতিদিন পরিশ্রম না করলে—"

"আজ অন্তত আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার আজকের পারিশ্রমিক আমিই দেব। আর ওই সুরা-প্রভাবে যদি ধনকুবের মহাশকুন্তকে সম্মোহিত করতে পারি তাহলে কোনোদিনই হয়তো আপনাকে আর অর্থোপার্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না।"

"ধনকুবের মহাশকুন্ত ব্যক্তিটি কে?"

"তিনি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠী একজন।"

"সুরা-প্রভাবে তাকে সম্মোহিত করতে হবে কেন। তোমার সান্নিধ্যই কি যথেষ্ট নয়?"

"মহাশকুন্ত ধনকুবের কিন্তু জরাগ্রস্ত স্থবির।"

"ও—"

"চলুন সব কথা বলছি আপনাকে। বাড়ি চলুন।"

নীলোৎপলা বলিতেছিল—"কোনও নির্ভরযোগ্য পুরুষকে বিবাহ করে গৃহস্থালি স্থাপন করাই সাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরাপদ পথ। যারা তা করতে পারে তারা ভাগ্যবতী। কিন্তু আমি দুর্ভাগিনী, তাই আমাকে নিত্য নব-পুরুষের মনোরঞ্জন করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়। বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ আমার এখানে আসেন মাঝে মাঝে। তিনি আমার দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি সহস্র খদ্যোতের নির্যাস, রক্তকমলের মধু, মহুয়া ও আরও নানাপ্রকার

উপকরণ দিয়ে এই অদ্ভুত সুরা প্রস্তুত করে আমাকে দিয়েছেন। বলেছেন এই সুরা প্রভাবে আমি নিজের পছন্দমত যে কোনও ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারব।"

"কেন, এ সুরার বিশেষ গুণ কি—"

"এতে মানুষের কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। এ সুরা পান করলে দুর্বলও নিজেকে সবল মনে করে। ভাবে তার দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হচ্ছে। মনে মনে সে যা হতে চায় এ সুরা প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্যে তা হতে পারে।"

নীলোৎপলার কথা শুনিতে শুনিতে চার্বাক সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি আমার ছিল কোনোদিন? বৈদিক পণ্ডিতদের অলৌকিক কাব্যকাহিনী আমার মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই হয়তো সুরা প্রভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যিই কি আমি....চার্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। নীলোৎপলা তাহার ব্যর্থজীবনের কাহিনী বলিয়া চলিয়াছিল, তাহার কথা চার্বাকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল বটে কিন্তু হৃদয়-স্পর্শ করিতেছিল না। সহসা নীলোৎপলার একটি প্রশ্নে চার্বাকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"আমি আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি। আমার একটি কাজ করে দেবেন আপনি?"

"বল কি কাজ।"

"আমার একটি আলেখ্য এবং লিপিকা মহাশকুন্তের কাছে পৌঁছে দিন।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"নবীনা গ্রামে। যে প্রান্তরে আপনি কাল সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তরের পশ্চিম দিকে একটি পথ আছে। সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গেলে আপনি একটি তরুবীথিকা দেখতে পাবেন। বকুল, চম্পক এবং কৃষ্ণচূড়া ছাড়া আর কোনও গাছ সেই বীথিকায় নেই। সেই বীথিকা অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হলেই আপনি শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হর্ম্য দেখতে পাবেন। সেই হর্ম্যের শিখরদেশে দেখবেন বিরাট এক সুবর্ণ কলস শোভা পাচ্ছে। চিনতে কষ্ট হবে না আপনার—"

একজন বার-বনিতার প্রণয়-দৌত্য করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে আত্মসম্মান-হানিকর কি না এ প্রশ্ন চার্বাকের বিবেককে বিব্রত করিল না। অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

"এ উপকারটি করবেন আমার?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ করিল নীলোৎপলা।

"ভদ্রে, তোমার নিকট এ অঞ্চলের অনেক লোক তো প্রত্যহ আসে। তাদের কাউকে নিয়োগ না করে আমাকে তুমি নির্বাচন করছ কেন বুঝতে পারছি না।"

"আমার নিকট যারা আসে তারা দরিদ্র হলেও আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তাদের কারো কাছে এ প্রস্তাব করা অসম্ভব আমার পক্ষে। কথাটা তাদের কাছ থেকে আমি গোপনই রাখতে চাই। আপনার সঙ্গে আমার সে রকম কোনও সম্পর্ক নেই; তাছাড়া যদিও আমি আপনার সম্যক পরিচয় জানি না কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কোনোরূপ অবস্থা

বিপর্যয়ে পড়ে আমার আশ্রয় নিয়েছেন। সেজন্য মনে করি আপনি যদি ভার নিতে সম্মত হন আমার কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।"

চার্বাক হাসিয়া উত্তর দিল—"তোমার কথা শুনে তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেলাম। সত্যিই আমি অবস্থা বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছি। তুমি যে কাজ করতে আমাকে অনুরোধ করছ তা আমি করব। আমি খুশী হব, যদি তুমি আমাকে এর জন্য দশটি সুবর্ণ মুদ্রা দাও। দশটি সুবর্ণ মুদ্রা পেলে আমি আবার ভদ্রভাবে কোথাও গিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারব।"

নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। ক্ষণ পরে সে দশটি সুবর্ণ মুদ্রা, হস্তীদন্তের উপর নিপুণভাবে অঙ্কিত একটি আলেখ্য এবং পুষ্পরেণু সুবাসিত একটি লিপি চার্বাকের হস্তে দিয়া বলিল—"আপনার দৌত্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মহাশকুন্তকে যদি বশীভূত করতে পারি আপনার ভবিষ্যতের ভাবনাও থাকবে না—"

"আমি এখানে বেশী দিন থাকব না ভদ্রে। তোমার এ কার্যটি সম্পন্ন করে অন্যস্থানে যেতে হবে আমাকে। যে অর্থের অভাবে আমি যেতে পারছিলাম না সে অর্থ তুমি আমাকে দিয়েছ। আর আমার এখানে থাকবার বাসনা নেই। তবে তোমার কাজটি আমি সুসম্পন্ন করে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তোমার লিপিটি বেশ দীর্ঘ মনে হচ্ছে—"

নীলোৎপলা আনত নয়নে বলিল—"কবি শশাঙ্কের মিলনোৎকণ্ঠা নামক কবিতাটির ভাবানুবাদ করে দিয়েছি আমি নিজের ভাষায়।"

"আমার পরামর্শ যদি শোন, তাহলে তুমি নিজের ভাষায় নিজের ভাবই ব্যক্ত কর। আর সেটা কর সংক্ষেপে। মহাশকুন্ত সত্যই যদি স্থবির হয়ে থাকেন দীর্ঘপত্র ক্লান্তিজনক হবে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া কবি শশাঙ্কের কবিতাটি তিনি যদি পড়ে থাকেন তাহলে তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা হবে না তাঁর—"

চার্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

"আমি কি লিখব তাহলে বলে দিন।"

"শুধু লেখ, শুনেছি আপনি সুরসিক, তাই আপনার কাছে পাঠাচ্ছি শিল্পের সামান্য নিদর্শন। যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হব। আরও কৃতার্থ হব, যদি কোনোদিন আলাপের সুযোগ দেন—ইতি নীলোৎপলা"

"ওইটুকু লিখলেই হবে?"

"হবে। ইঙ্গিতময়ী রমণীরাই তো বিজয়িনী হয়। মনের কথা সম্পূর্ণভাবে খুলে বলতে নেই। তার আভাসমাত্রই ফলপ্রদ।"

"বেশ, তাহলে আপনি যা বলছেন তাই করি।"

নীলোৎপলা পাশের ঘরে গিয়া পুনরায় লিপিরচনায় মনোনিবেশ করিল।

।। চোদ্দ ।।

ঘন নীল মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মৃদু মৃদু মেঘগর্জন দূরাগত মৃদঙ্গধ্বনির মতো শুনাইতেছে। গহন কান্তারের ঘনশ্যাম শোভা ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। যে ময়ূরটি এতক্ষণ

পেখম বিস্তার করিয়া তন্বী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত ছিল সে সহসা উচ্ছ্বসিত কেকারবে কানন-কান্তার মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই কেকাধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্টিকর্তর আনন্দ মূর্ত হইয়া উঠিল যেন। মনে হইল সেই ধ্বনির স্পন্দনে স্পন্দনে যেন সৃষ্টি প্রেরণার উল্লাস তরঙ্গিত হইতেছে। তাহারই সংঘাতে যেন নবোদিত নীল জলধরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, কদম্ব-কেশরে শিহরন জাগিল।

ময়ূররূপী পিতামহ কহিলেন—"সখি এই তো আনন্দ...কিন্তু..."

তন্বী ময়ূরী এতক্ষণ অন্যমনস্কতার ভান করিয়া শস্যকণা আহরণ করিতে ছিল। পিতামহের কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার অপাঙ্গে এক ঝলক হাসি ঝিকমিক করিতে লাগিল কেবল। সে ভাষায় কিছু বলিল না, তাহার হাস্যদীপ্ত অপাঙ্গ দৃষ্টিতেই যেন তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

"কথা বলছ না কেন বাণী।"

"বলবার তো কিছু নেই।"

"আমি এতক্ষণ কি করছিলাম জান?"

"জানি।"

"কি বলতো।"

"নিজের খেয়ালে মত্ত ছিলেন।"

"মত্ত নয়, উন্মত্ত ছিলাম। আমি কি কল্পনা করছিলাম জান?"

"বলুন, শুনি—"

"আমি কল্পনায় এমন সব কাণ্ড করেছিলাম যে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বকর্মাকে বরখাস্ত করে নিজেই স্বৈরচর সৃষ্টি করতে লেগে পড়েছিলাম। বিষ্ণুকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলাম, গরুড়কে মানুষ করে পাঠিয়েছিলাম হর্বনীড় গ্রামে, মাতাল চার্বাকটা মদের ঘোরে যে সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিল আমি তা কল্পনা করছিলাম—তুমি বুঝি তার অবচেতনলোকে ঢুকে তাকে ওই সব স্বপ্ন দেখাচ্ছ, এ নিয়ে কল্পনায় তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছি। কশ্যপ, বিনতা, সপ্তর্ষি সবাইকে স্বৈরচর বানিয়ে নানারকম আজগুবি স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম—"

"এখনও হয়তো আছেন"

"ঠিক ধরেছ! কল্পনার আমার অন্ত নেই। একটা কথা কিন্তু বুঝতে পারছি—একবার যা সৃষ্টি করে ফেলেছি, তার বেশী আর কিছু করা যাবে না। মনে মনে কতই কল্পনা করি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তাই নানাভাবে বিকশিত হচ্ছে। সবাই মনে করছে নূতন সৃষ্টি হচ্ছে বুঝি, কিন্তু আমি জানি সব পুরাণো। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আর আনন্দ পাচ্ছি না কোনো। তাই আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি। কিন্তু আজগুবি কল্পনা নিয়েই বা কতকাল থাকা যায়। কি করি বলতো—"

ময়ূরীর নয়নে আর এক ঝলক হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

ময়ূরী বলিল—"আপনি আপনার প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ বপন করেছেন। অনন্ত সম্ভাবনার মনেই কি অনন্ত অভিনবত্বের সূচনা নিহিত নেই? ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা সুপ্ত আছে। সে মহীরুহের জীবন-যাত্রায় যে অসংখ্য উত্থান-

পতন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব আপনি সূচিত করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কি আপনি জানেন?"

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানলেও—"

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন যে আপনার পুরাতন সৃষ্টি চিরনূতন। আপনার যে কোনও একটি সৃষ্টির প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করেন তাহলেই আনন্দ পাবেন।"

"কিন্তু আমি আনন্দ পাই সৃষ্টি করে। অন্য আর কিছুতে আমার আনন্দ নেই।"

"আপনার একটি সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই আপনি কল্পনা করুন—তার কি কি পরিণতি হতে পারে, তার পর মিলিয়ে দেখুন—সত্যি সত্যি তা হল কি না। আপনার প্রতিটি সৃষ্টি নানা সুরে প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। তাদের এই নিরন্তর অনুসন্ধানই আবার পরস্পরকে ব্যর্থও করে দিচ্ছে। শার্দূলের আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে হরিণের প্রচেষ্টাকে। হরিণ আবার তৃণদলের প্রকাশ-লীলাকে বিঘ্নিত করছে, তৃণদল বাধা দিচ্ছে মহীরুহদের, কিছুতেই তাদের বীজকে ভূমিস্পর্শ করতে দিচ্ছে না। বিশ্ব জুড়ে এই চলছে—"

"তুমি এই সব লক্ষ্য করেছ?"

"আমি যে সকলেরই আত্মপ্রকাশের ভাষা"

"ও, তুমি যে বাণী! সব সময়ে মনে থাকে না কথাটা। যা বলছ তা মন্দ নয়। কাকে লক্ষ্য করা যায় বল তো।"

"আপনার ওই চার্বাককেই করুন না।"

"বেশ। তুমি চললে কোথায়।"

"ওই মেঘলোকে। ও অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে আমাকে।"

ময়ূরী পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মেঘলোকে বিলীন হইয়া গেল।

।। পনেরো ।।

শ্রেষ্ঠী মহা শকুন্তের হস্তে নীলোৎপলার লিপি এবং আলেখ্য সমর্পণ করিয়া চার্বাক প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। শ্রেষ্ঠী যে নীলোৎপলার আমন্ত্রণে পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাব দেখিয়াই চার্বাক অনুমান করিতে পারিয়াছিল। নবীনা গ্রামে দুই চারিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া চার্বাক ইহাও শুনিয়াছিল যে মহাশকুন্তের প্রথমা পত্নী বহুকাল পূর্বে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর মহাশকুন্ত আরও চারবার বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পত্নী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, একটি পত্নী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে, চতুর্থী পিতৃগৃহে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং মহাশকুন্ত আর্থিক জগতে সমৃদ্ধিশালী হইলেও মানসিক জগতে অতি দরিদ্র। কোনও রমণী যদি তাহার এই আন্তরিক বুভুক্ষাকে শান্ত করিতে পারে তাহা হইলে মহাশকুন্ত যে তাহার নিকট ক্রীতদাসবৎ থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুরা-প্রভাবে নীলোৎপলা সত্যই যদি

এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেইই মহাশকুন্তের এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। নীলোৎপলার বাক্যগুলি পুনরায় চার্বাকের মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে তাহার মনস্কাম যদি পূর্ণ হয় তাহা হইলে চার্বাকের জীবনের অর্থ সমস্যাও সে সমাধান করিয়া দিবে। চার্বাককে আর কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইবে না। চার্বাক চিন্তা করিতেছিল—কি করা উচিত? নীলোৎপলার নিকট ফিরিয়া যাওয়াই কি সঙ্গত হইবে? স্বার্থের দিক দিয়া ভাবিলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু চার্বাকের ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যে বর্ণ সমারোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা যেন বর্ণের অবর্ণনীয় ভাষায় তাহাকে বলিতেছিল, তোমার নিকট তো দশটি সুবর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, তবে আবার কেন ওই কুৎসিত উপযাচিকার নিকট যাইতে চাহিতেছ, তোমার মানসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর, মধ্যপ্রদেশ কত দূর?

চার্বাক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণচূড়ার শিখরে শিখরে কামনার লেলিহান শিখা জ্বলিতেছে, স্বর্ণকান্তি চম্পকের উগ্র গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত, বকুল তরুর নিম্নে সহস্র সহস্র বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া পাপিয়া সারা আকাশকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এক অনির্বচনীয় রসে চার্বাকের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি যদি সুরঙ্গমার হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে তাহা হইলে সে যুক্তির মূল্য কি? সুরঙ্গমাকে কাছে পাইলে....সহসা সে দেখিতে পাইল চক্রবালরেখালগ্ন পথ বাহিয়া শকটশ্রেণী চলিয়াছে। তাহার মনে হইল ওই শকটচালকগণ নিশ্চয়ই দেশের পথঘাটের সহিত পরিচিত, কোন পথে গেলে মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায় এ খবর উহারাই হয়তো দিতে পারিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া চার্বাক শকটশ্রেণীর উদ্দেশ্যে পদচালনা করিল। সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। নির্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্য জ্বলিতেছে। উপল-বহুল প্রান্তর অমসৃণ ও বন্ধুর। চার্বাকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল, তাহার সমস্ত সত্তা একাগ্র হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে বকুলচম্পকের গন্ধে, কৃষ্ণচূড়ার বর্ণ-মহিমায়, নীলাকাশে প্রতিফলিত স্বচ্ছ স্বর্ণকিরণ জালে, পাপিয়ার আকুল সঙ্গীতধারায় যাহা সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার জীবনের আনন্দময় রূপ পরিগ্রহ করিবে—যদি সে সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিতে পারে এবং কিছুদিন যদি সুরঙ্গমার নিকটে থাকিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহার অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চয়ই সে আলোকপাত করিতে পারিবে এবং আলোকপাত করিলেই.....।

শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া চার্বাক ছুটিতে লাগিল।

চার্বাকের মাথার উপর দুইটি চিল চক্রাকারে উড়িতেছিল। প্রথম চিল দ্বিতীয় চিলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"পিতামহ, ছুটন্ত চার্বাককে দেখে কি বুঝতে পারছেন যে এর পর ও কি করবে?"

"না, ঠিক পারছি না। ভৃগু হয়তো পারতো। যে রকম ছুটছে ভয় হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে না যায়—বা। বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে—"

"আমি তো বলেছিলাম আপনার যে কোনও সৃষ্টির প্রতি মুহূর্তের বিকাশ যদি লক্ষ্য করতে পারেন, তা কাব্যের মতো মনোরম হবে—"

"দেখ, দেখ, বেশ বড় একটা গর্ত ও একলাফে পার হয়ে গেল। বাহাদুর আছে ছোকরা।"

"লক্ষ্য করে দেখলে আপনার প্রত্যেক সৃষ্টিই নানা রসের আধার।"

"কিন্তু নিজের সৃষ্টির পিছনে দৌড়াদৌড়ি করতে বেশীক্ষণ ভাল লাগবে কি! বিশেষ করে এই চড়চড়ে রোদে—"

"চলুন, এই বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক—পাতার আড়ালে বসে বসে লক্ষ্য করা যাক কি করে ও—"

শাখাপত্র-নিবিড় এক বিশাল মহীরুহের উচ্চ-শিখরে উপবেশন করিয়া পিতামহ বলিলেন—"এখানে মন্দ লাগছে না। ছোকরা এখনও ছুটে চলেছে দেখছি—"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পিতামহ পুনরায় বলিলেন—"কিন্তু তুমি যাই বল বাণী, ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খানিকটা সময় কাটানো যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল আনন্দ কল্পনায়—"

"বেশ তো কল্পনা করুন না আপনি।"

"বেশ আমি কল্পনা করছি তুমি তাতে ভাষা দাও। এ রকম একঘেয়ে বসে থাকতে ভাল লাগবে না বেশীক্ষণ।"

"বেশ। কল্পনা করুন, আমি তাদের ভাষা যোগাই—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"দেখ, কয়েকদিন আগে আমি কল্পনা করেছিলাম তুমি যেন আমাকে ভবিষ্যৎ যুগের চার্বাকের গল্প শোনাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। ওই কল্পনাটাই রং দিয়ে ফলাও করা যাক, কি বল।"

"করুন।"

"ভবিষ্যৎ যুগের চার্বাকরা কি রকম হবে বল দেখি—"

"বৈজ্ঞানিক হবে। যন্ত্র আবিষ্কার করবে নানারকম—"

"কি করে বুঝলে—?"

"ওই যে চার্বাক এখন মাঠ ভেঙে ছুটছে আমিই যে তার মনের ভাষা। ও চাইছে ওর শক্তি শতসহস্র গুণ বর্ধিত হোক। যে সীমা ওর চলচ্ছক্তি, দৃষ্টিশক্তি আবদ্ধ করে রেখেছে সেই সীমাকেও লঙ্ঘন করতে চায়। সুরঙ্গমাকে দেখবার জন্যে যে কামনা ওকে উতলা করেছে সেই কামনাসিদ্ধির যত রকম বাধা আছে বুদ্ধিবলে তা ও নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়—"

"ও বাবা!"

"আশ্চর্য হচ্ছেন কেন এতে। আপনি যে সীমা সৃষ্টি করেছেন সে সীমা লঙ্ঘন করবার বুদ্ধি এবং শক্তিও যে আপনি সৃষ্টি করেছেন!"

"তাতো করেছি। কিন্তু সব রকম সীমা লঙ্ঘন করে ওরা গিয়ে থামবে কোথায় শেষটা।"

"ওরাও থামবে না, আপনার কল্পনাও থামবে না।....."

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"আমি একটু আগে কালকূট নামে এক পাতালনিবাসী নাগবংশীয় রাজপুত্রকে কল্পনা করেছিলাম—সে তার প্রেয়সীকে পায়নি, কেবল দূর থেকে তার আভাস পেয়েছিল। তাকেও ভবিষ্যযুগের কল্পনায় আনব কি?"

"ক্ষতি কি। ভবিষ্যযুগেও ওরকম লোক থাকবে—"

"বেশ। আরম্ভ করা যাক তাহলে—"

"করুন।"

শকটশ্রেণীর সমীপবর্তী হইয়া চার্বাক দেখিল যে প্রত্যেক শকটে বৃহদাকৃতি কলস সজ্জিত

রহিয়াছে। একজন শকট চালককে সম্বোধন করিয়া সে বলিল—"ভাই, আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের শকটে একটু স্থান পেতে পারি কি।"

"পিছনের কোনো শকটেই স্থান নেই। প্রথম শকটে আমাদের নায়ক আছেন, সেখানে স্থান আছে। তিনি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর কাছে যান, তিনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন।"

"এ সব কলসে কি আছে—"

"ঘৃত।"

"এত ঘৃত কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?"

"কুমার সুন্দরানন্দ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, তাতেই এই সব ঘৃত লাগবে—"

"কোথায় যজ্ঞ হবে?"

"তা আমি ঠিক জানি না। আমরা শ্রৌণী গ্রামে এই কলসগুলি পৌঁছে দেব। সেখান থেকে আর এক দল শকট এগুলিকে বহন করবে। কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না, আমাদের নায়ক হয়তো জানেন।"

চার্বাকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমাদের নায়কের নাম কি?"

"গুণপতি।"

আর বাক্যালাপ না করিয়া চার্বাক প্রথম শকটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চার্বাককে দেখিবামাত্র গুণপতি হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন—"আসুন, আসুন, মহর্ষি চার্বাক, আপনাকে এখানে দেখব প্রত্যাশা করিনি। কোথায় চলেছেন?"

"শ্রৌণী গ্রামে যাব।"

"আমরাও তো সেখানে চলেছি। সুন্দরানন্দের মহাযজ্ঞে আপনিও একজন ঋত্বিক না কি—"

"আপনার শকটে একটু স্থান হবে কি—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন—"

চার্বাক শকটে আরোহণ করিল। পূর্বপরিচিত গুণপতিকে দেখিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও তাহার মুখমণ্ডলে সে ভাব প্রকটিত হইল না।

গুণপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি যজ্ঞে যোগদান করতে যাচ্ছেন।"

চার্বাক মৃদুহাস্য করিয়া কহিল—"যজ্ঞে যোগদান করাই তো প্রচলিত রীতি"

"নিশ্চয়। এ যজ্ঞটিও একটু নূতন ধরনের হচ্ছে। শুনছি বিদেশ থেকে এক ম্লেচ্ছ রাজা এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে সুন্দরানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, বন্ধুত্বও হয়েছে। তিনিই নাকি সুন্দরানন্দকে এই যজ্ঞ করতে উৎসাহিত করেছেন।"

"এ যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক কে?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি যে মহর্ষি পর্বত ও তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ অশ্ববাহিত রথে কয়েকদিন পূর্বে যাত্রা করেছেন। আপনিও নিশ্চয় নিমন্ত্রিত হয়েই যাচ্ছেন?"

চার্বাক গুণপতি মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল গুণপতি ব্যঙ্গ করিতেছেন কি না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখা গেল না যাহা সন্দেহজনক।

"না আমি নিমন্ত্রণ পাইনি। আমি তো ছিলাম না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?"

"দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি।"

"ও!"

এইবার কিন্তু গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা ধরা পড়িল। চার্বাক বুঝিতে পারিল যে গুণপতি সমস্ত খবরই জানেন। চার্বাক নীরব হইয়া রহিল।

গুণপতি বলিলেন—"তাই আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার দেখা পাইনি।"

চার্বাক নীরব হইয়াই রহিল। কারণ—ঠিক ইহার পরই যে প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা হইতেছিল তাহা প্রীতিকর তো নহেই, বর্তমান মুহূর্তে অসুবিধাজনকও।

গুণপতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"অবশ্য এটা আমি জানি যে আমার টাকা মারা পড়বে না। যেদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেইদিনই আপনি ঘিয়ের দামটা দিয়ে দেবেন।"

চার্বাক বুঝিল—বিস্মৃতির দোহাই না পাড়িলে মানরক্ষা হইবে না।

"আপনি ঘিয়ের দাম পাবেন নাকি আমার কাছে? আমার মনেই নেই।"

"তাতে কি হয়েছে। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তো আপনাদের মনে থাকবার কথাও নয়। কত বড় বড় দার্শনিক ব্যাপার নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন আপনারা—"

গুণপতির অতিবিনীত ভাষণে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহাতে চার্বাক বিশেষ বিব্রত বোধ করিল না। এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গ ও রূঢ়তর ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। মনে মনে সে চিন্তা করিতে লাগিল গুণপতির সহিত কিরূপ আচরণ এখন সঙ্গত অর্থাৎ সুবিধাজনক হইবে। বৎসরাধিকাল গুণপতি তাহাকে ধারে উৎকৃষ্ট ঘৃত সরবরাহ করিয়াছে। সমস্ত মূল্য যদি এখনই শোধ করিতে হয় অন্তত দুইটি সুবর্ণ-মুদ্রা খরচ হইয়া যাইবে। খরচ করিতে চার্বাকের আপত্তি ছিল না, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়াই সে শঙ্কিত হইতেছিল। মাত্র দশটি সুবর্ণমুদ্রাই তাহার সম্বল. তাহার পঞ্চমাংশ যদি ঋণ-শোধ করিতেই চলিয়া যায় তাহা হইলে—। সহসা চার্বাক ভীত হইয়া পড়িল। সুন্দরানন্দের রাজত্বে কেবল গুণপতির নিকটেই যে সে ঋণী তাহা নয়, অনেকেই তাহার নিকট টাকা পাইবে। সুরা-বিক্রেতা সুসেনও কি সুন্দরানন্দের যজ্ঞ দেখিতে যাইতেছে না কি! তাহার নিকট যে অনেক ধার! ব্যাধ গম্ভীরের নিকটও অনেক মৃগমাংস ও বন্যকুক্কুটের মূল্য বাকী আছে। ইহাদের সকলের সহিত যদি সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে তো সে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে! কিন্তু—। সহসা সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। সুরঙ্গমার নিকট যখন যাইতে হইবে তখন গুণপতিকে খুশী না করিয়া উপায় নাই।

"কত পাবেন আপনি?"

"বেশী নয়। মাত্র পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা—"

"আমার কাছে কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা আছে।"

"বেশ, আমি ভাঙিয়ে দেব।"

চার্বাক সুবর্ণমুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।

।। ষোলো ।।

চিল রূপে পিতামহ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি হইতে লাগিল। সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাণী, ছোঁ মারতে ইচ্ছে করছে। ওই যে লোকটা ঠোঙায় করে তেলে-ভাজা নিয়ে যাচ্ছে—"

চিল-রূপিণী বাণী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"ওই সব দিকে যদি আপনার মন যায়, তাহলে আর গল্পে মন দেবেন কি করে।"

"তা বটে। কিন্তু তেলে-ভাজাও নিতান্ত খারাপ জিনিস কি?"

"তাহলে তেলে-ভাজা নিয়েই থাকুন। ভবিষ্যযুগের চার্বাকের গল্প থাক তাহলে।"

"না, না—ওটা শুনতেই হবে। তাহলে এক কাজ করি এস, এই চিল-রূপ পরিত্যাগ করি। কারণ যতক্ষণ চিল থাকব ছোঁ মারতে ইচ্ছে করবে খালি। হাঁস হতে আপত্তি আছে?"

"আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু হাঁস হলে একটা বিপদ আছে। হাঁস হলে অনেক শিকারীর লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা অবশ্য মরব না, কিন্তু গল্পটা বিঘ্নিত হবে।"

"গল্প তৈরি হয়ে গেছে নাকি।"

"অনেকক্ষণ! বাইরে আপনি তেলে-ভাজার দিকে নজর দিলেও আপনার মনের আকাশ যে অনেক আগেই কল্পনার রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে।"

"কি করে বুঝলে।"

"বাঃ! আমি বাণী, আমি বুঝব না?"

"সঙ্গে সঙ্গে গল্পও বানিয়েছ?"

"গল্পটা কিন্তু শুনতে হবে একজন কবির মারফত। ঠিক শুনতে নয়—দেখতে হবে।"

"দেখতে হবে? তার মানে—"

"সে লিখে যাবে, আর তার মনের ভিতর বসে আপনি দেখবেন। আপনার একটা অংশ তার মনকে কল্পনাবিষ্ট করবে—আর একটা অংশ তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখবে সে কি লিখছে।"

"আর তুমি কোথা থাকবে।"

"তার লেখনীর মুখে।"

"বুদ্ধিটা মন্দ করনি! চল, তাহলে হাঁসই হওয়া যাক। নীল রঙের হাঁস হলে কেউ আমাদের আর দেখতে পাবে না। আকাশের সঙ্গে মিশে যাব আমরা।"

"বেশ"

"চার্বাক সামনের গাড়িতে বসে বেশ খোশগল্প জমিয়েছে দেখছি। আচ্ছা এত গাড়ি কোথা চলেছে? বড় বড় সব কলসী রয়েছে প্রত্যেক গাড়িতে। ব্যাপারটা কি।"

"মনে হচ্ছে ওগুলো ঘৃতপূর্ণ। কোথাও যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে বোধ হয়। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি, দেখতেই পাব সব।"

ক্ষণকাল পরে ঊর্ধ্বে ঘন-নীল-বর্ণ হংস-মিথুন শকটশ্রেণীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপরে নিঃশব্দে পাখা ঘুরিতেছে। নিঃশব্দে জ্বলিতেছে বৈদ্যুতিক

আলোটা। মনে হইতেছে যেন এক বিচিত্রবেশী বৃহৎ পতঙ্গ কবির টেবিলের উপর নীরবে বসিয়া আছে, অপরূপ-জ্যোতিতে তাহার সর্বাঙ্গ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন সবিস্ময়ে দেখিতেছে কবি লিখিতেছেন।

ভবিষ্যযুগের কবি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার প্রেরণার মূলে যে সৃষ্টিকর্তা পিতামহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ভাবকে ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং বাণী যে লেখনীমুখে প্রচ্ছন্নরূপে আসিয়াছেন—এসব কথা কবির সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি নিজেই বুঝি স্রষ্টা। কথা ও কাহিনী সবই বুঝি তাঁহার নিজস্ব।

আবেগভরে লিখিতেছিলেন তিনি।

'যা চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে গেছে তাকে, মানে, তার দেহটাকে—অভিমান-ভ্রূভঙ্গী-হাসির ঝলক যে তন্বী দেহটাকে ক্ষণে ক্ষণে স্থূলতার সীমা পার করে নিয়ে যেতে চাইত কিন্তু পারত না এবং সেই পারা-না-পারার দ্বন্দ্ব আরও অপরূপ করে তুলত যাকে—সেই দেহটাকে, আলিঙ্গন-পাশে বাঁধবার সম্ভাবনাটুকুও যখন অবলুপ্ত হল তখন তাকে নূতন রকমে যে আবার পাওয়া যেতে পারে এ আশা আমার মনে জাগেনি কোনোদিন। কল্পনায় তাকে পাচ্ছিলাম অবশ্য অহরহ, নানা রূপে, নানা বেশে, নানা ভঙ্গীতে—আমার চেয়ে ঢের বেশী রূপবান, তাকে বিয়ে করেছে এ জেনেও ক্ষণকালের জন্য তাকে পর ভাবতে পারিনি, আমি নিজেও বিয়ে করেছি একজন অনবদ্যা সুন্দরীকে, কিন্তু আমার মানসলোক পূর্ণ করে রেখেছিল আলেয়া—হ্যাঁ, মনে মনে তাকে পাচ্ছিলাম অহরহ, কিন্তু বাস্তবেও যে তাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পেয়ে যাব, পাওয়া যে সম্ভব, একথা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। পেয়ে গেলাম কিন্তু অভিনব উপায়ে। আপিসের ছুটি ছিল সেদিন। বড়বাজার স্ট্রীটে বোর্ডিং হাউসে থাকতাম তারই ছাতে উঠে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম। মনের মধ্যে অসংখ্য মধুকর যেন গুঞ্জন করছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কোন বসন্তের আগমনী গাইছে ওরা? একটা খামখেয়ালী এলোমেলো হাওয়া চারদিক তোলপাড় করছিল। কোলকাতা শহরের হট্টগোলও যেন মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছিল সেই হাওয়ার তোড়ে....অসংখ্য মধুকর গুঞ্জন করে চলেছিল আমার মনে ...এমন সময়, বসন্ত নয় হঠাৎ বর্ষার সম্ভাবনা সূচিত হল ঈশান কোণে। মুগ্ধ নেত্রে উদীয়মান নব জলধরের দিকে চেয়ে রইলাম। আকাশ পরিব্যাপ্ত করে মদমত্ত ঘনকৃষ্ণ হস্তীযূথ ছুটে আসছে! সেই কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটা সাদা বাড়ি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতিপূর্বে সাদা বাড়িটা একাধিকবার আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু ওর বিশিষ্ট রূপটা ইতিপূর্বে দেখিনি। কালো মেঘের পটভূমিকায় সেদিন প্রথম দেখতে পেলাম। মনে হল যেন বাড়ি নয়, অহল্যা, অভিশপ্তা-পাষাণী, বুক-ভরা তৃষ্ণা, মুখে ভাষা নেই, নবোদিত মেঘের দিকে চেয়ে আছে অবরুদ্ধ মৌন প্রত্যাশায়। তারপরই ঠিক....নবোদিত মেঘে তখনও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়নি......আমার সমস্ত দেহে, শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। ওই পাষাণ অট্টালিকার ক্ষুধিত আত্মাকে যেন মূর্ত দেখলাম। ছাতের উপর আলসে ধরে চেয়ে আছে মেঘের দিকে, নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে, নীলাম্বরীর আঁচলটা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে, মনে হচ্ছে তার মৌন অধীরতা যেন ভাষা পেয়েছে ওই উড়ন্ত অঞ্চলপ্রান্তে, যেন ওর সমস্ত সত্তা,

উড়ে যেতে চাইছে অসীম আকাশে ওই কালো মেঘের দিকে......হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথার কাপড়টা সরে গেল, আলেয়াকে চিনতে পারলাম। আলেয়া? এত কাছে আছে? নিরুপমবাবু এলাহাবাদ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন নাকি! এর পর খানিকক্ষণ আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক কি করেছিলাম, কি ভেবেছিলাম মনে নেই। ঘণ্টাখানেক পরে আপাদমস্তক জলে ভিজে দূরবীণটা কিনে যখন বাসায় ফিরলাম তখন আলেয়া ছাত থেকে নেমে গেছে। তখন তাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তারপর থেকে অনেকবার দেখেছি। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন ঘটনার আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যে বহুবার কাছে পেয়েছি তাকে। অনেক দূরে নাগালের বাইরে যে বীণাটা বাজছিল ওই দূরবীণের সহায়তায়, তার নানা আলাপ নানা ঝঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ করে তুলেছে আমার ক্ষুধিত চিত্তকে। বস্তুত, ওই দূরবীণটাই শেষে হয়ে উঠল আমার অবসর-বিনোদনের একমাত্র সঙ্গী এবং এই দূরবীণের মাধ্যমেই আমি শিখর সেনকেও আবিষ্কার করলাম।

আমি শিখর সেনের গল্পটাই লিখতে বসেছি। আমার কথাটা এসে পড়ল প্রসঙ্গত। শিখর আমার বাল্যবন্ধু। তাকে কিন্তু আমি চিনিনি। আমার জীবনে যেমন মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটেছে তার জীবনেও যে তেমনি ঘটেছিল তা আমি অনেকদিন জানতামই না। শিখর স্বল্পভাষী লোক ছিল, তাছাড়া অনেকদিন ছাড়াছাড়িও হয়েছিল আমাদের। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই চাকরি নিতে হয়েছিল আমাকে, শিখর গিয়েছিল কলেজে। পিতৃমাতৃহীন শিখরকে মানুষ করেছিলেন তাঁর বিপত্নীক মামা। তিনিই তাকে এম. এস-সি. পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। শিখরের খবর আমি মাঝে মাঝে পেতাম চন্দ্রমোহনের কাছে। চন্দ্রমোহন আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল। একই গ্রামে বাস ছিল তাদের। তাই মাঝে মাঝে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে যখন দেখা হত তখন শিখরের খবর পেতাম। চন্দ্রমোহন লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কিন্তু ব্যবসা করে প্রচুর উন্নতি করেছে সে। বাড়ি কিনেছে কোলকাতায়। ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই আসতে হয় তাকে এবং যখনি আসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তার মুখেই শিখর সেনের অনেক খবর পেয়েছি। শিখর সেন প্রথম যৌবনে যে ডায়েরি লিখত সেই ডায়েরিটাও হস্তগত করেছিল চন্দ্রমোহন। বলেছিল, শিখর সেন যখন মামার সঙ্গে কলহ করে চলে আসে তখন তার মামা শিখরের সমস্ত বই খাতা বিক্রি করে দেন এক মুদিকে। সেই মুদির দোকান থেকে সে উদ্ধার করেছিল ডায়েরিটা। এই ডায়েরির পাতাতেই শিখরের প্রথম যৌবনের প্রণয় কাহিনীটা লিপিবদ্ধ আছে। এ কাহিনী আমি জানতাম না। তার জীবনের দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ মামার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কোলকাতায় সে যে জীবনযাপন করেছে সেই জীবনের খানিকটা, আমি শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে। কিছু কিছু আমি নিজেও দেখেছি স্বচক্ষে। অর্থাৎ শিখর সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তার সবটা আমার প্রত্যক্ষ নয়। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি, কল্পনাও করেছি কিছুটা। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কি এই তিনের সমন্বয় নয়? আমার নিজের জীবনের সঙ্গে ওর জীবনের অদ্ভুত রকম একটা মিল আছে বলেই ওর কাহিনীটা লিখতে বসেছি। দূরবীণের ভিতর দিয়ে আমার আলেয়ার অপরূপ আবির্ভাব দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেলাম শিখর সেনকে, এক নূতন শিখর সেনকে, যাকে আমি চিনতাম না। দেখলাম সে-ও অনুসরণ করছে আর এক আলেয়াকে। মনে হল সে শিখর সেন নয়, পতঙ্গ, আমারই মতো পতঙ্গ, প্রদক্ষিণ করে চলেছে এক জ্বলন্ত শিখাকে, যে শিখা শেষে তাকে—কথাটা মনে হলে

এখনও আমি শিউরে উঠি। উমেশ মামার (আমার সেই আত্মীয় পুলিশ অফিসারটির) কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ভয় হয়, আমারও ওই পরিণাম হবে না কি! মাঝে মাঝে লোভও হয়, মনে হয় আহা সত্যিই যদি ওরকম পরিণাম, ওরকম নাটকীয় পরিণাম, আমার জীবনেও হত, ওরকম একটা তীব্র জ্বালাময় আনন্দময় দৃশ্যের শেষে আমার জীবনেও সত্যি যদি যবনিকা-পাত হত, কি ক্ষতি ছিল তাতে? শিখর সেনকে ঈর্ষা হয়। নিজের আদর্শ থেকে সে চ্যুত হয়নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সত্যকেই আঁকড়ে ছিল।...''

এই পর্যন্ত লিখিয়া লেখক থামিয়া গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কাহিনীর গঠন-কৌশল কিরূপ হইবে সেই চিন্তায় তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, সীমাহীন কল্পনালোকে দিশাহীন হইয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা কাহিনীর সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু টেবিল-ল্যাম্পকে দেখিতেছিলেন না। তিনি উৎসুক নেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন যাহা সহজে দেখা যায় না, যাহা মাঝে মাঝে সহসা দেখা দেয়। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া অবশেষে তিনি যে অধ্যায়টি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার নামকরণ করিলেন—'কমল-কিশোরের আত্মকথা'। তাহার পর আর একটি ছোট কাগজে লিখিয়া রাখিলেন—'শিখর সেনের কলিকাতা প্রবাসের ডায়েরি'। তাঁহার মনে হইল এই দুই অংশে গল্পটি বলিলে সম্পূর্ণভাবে গল্পটি বলা হইবে।

অগণিত নক্ষত্রের আলোকে আকাশ ঝলমল করিতেছে। অস্তাচল-চূড়াবলম্বী শুক্লা তৃতীয়ার শশী দিগন্তরেখায় মোহাচ্ছন্ন মানসে স্বপ্নলোক সৃজন করিতেছে। আলো-আঁধারের প্রহেলিকায় মহাকাশ রহস্যমগ্ন, ছায়াপথের নীহারিকা-লোকে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা আহত বীণাতন্ত্রীবৎ কম্পিত হইতেছে। পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে নীল হংসমিথুন।

পিতামহ বলিলেন—''কমল-কিশোরই কালকূট হয়ে উঠল না কি শেষে।''

বাণী উত্তর দিলেন—''স্রষ্টার কল্পনায় যা একদা কালকূট ছিল তাই যদি এখন কমল-কিশোর হয়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পঙ্কই তো পঙ্কজে রূপান্তরিত হয়—''

''এক্ষেত্রেও তা হচ্ছে কি? কালকূটই কি কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হচ্ছে? বিশ্বাস কর বাণী, আমি যখন সৃষ্টি করি তখন বুঝতেই পারি না যে ছাই পাঁশ কি হচ্ছে! একটা অদ্ভুত আনন্দ-স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে যা দেখি বা অনুভব করি, তাই আমার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কি যে হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না তুমি যতক্ষণ না তাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দাও। আমার ভাবের তুমিই ভাষা। তাই তোমাকে জিগ্যেস করছি, কালকূটই কি কমল-কিশোর হয়ে ফুটেছে?''

''ঠিক বুঝতে পারছি না। কালকূটের কামনা ওর মধ্যে ফুটেছে; কিন্তু সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখনও।''

পিতামহ আর কোনো কথা বলিলেন না।

নীল হংস-মিথুন পুনরায় উড়িয়া চলিল। তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, অস্তগামী চন্দ্র তাহারা বুঝি কিছু বলিবে, তাই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গিয়াছে।

কবি পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

''শিখর সেন সত্যই শেষ পর্যন্ত সত্যকে আঁকড়ে ছিল। Everything is fair in war

and love—এই বিদেশী প্রবচনের নির্দেশ মানেনি সে। সে মেনেছিল বিবেককে। বিবেকের বাঁধনে সে নিজেকেও বেঁধেছিল, অবন্ধনাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। অবন্ধনা কিন্তু বাঁধা পড়েনি। শিখর সেনের ক্ষণিকের দুর্বলতার ছিদ্র দিয়ে সেই যে সে পালিয়েছিল আর ধরা দেয়নি। তাকে কাছে পেয়েও আর অধিকার করতে পারেনি শিখর। তার ধারণা হয়েছিল—ভুল ধারণাই হয়েছিল—যে অবন্ধনা যে পাপ-পথে নেবেছে সে পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনতে পারলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়ে যায়নি, অত সহজে কিছুই ঠিক হয়ে যায় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবন্ধনাকে শিখর ভালবাসেনি ঠিক অর্থাৎ ভালবেসে অন্ধ হয়ে যায়নি। যে ভালবাসা অন্ধ করতে পারে না সে ভালবাসার জোর কতটুকু? সে যে অন্ধ হয়নি অবন্ধনা তা বুঝেছিল। আমার মনে হয় সেই জন্যেই সে ধরা দেয়নি, পাপ-পথ থেকেও নড়েনি একচুল। অবন্ধনার বাবা অদ্ভুত লোক ছিলেন শুনেছি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যান, সন্ন্যাসী হয়ে নয়, জাহাজের নাবিক হয়ে। অবন্ধনার তখন জন্মও হয়নি। যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, 'যদি মেয়ে হয় নাম রেখ অবন্ধনা, আর যদি ছেলে হয় তাহলে রেখ মহাকাল। মহাকাল মুখোপাধ্যায়, মন্দ শোনাবে না।' তাঁর নিজের নাম ছিল নীলাম্বর। তিনি আর ফেরেনইনি। ফিরলে হয় তো শিখর সেনের জীবন-কাহিনী অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু আমার মনে হয় এতই গতানুগতিক হত তা যে, 'কাহিনী' কথাটার পুরো স্বাদ পাওয়া যেত না তাতে। নীলাম্বর মুকুজ্যে ফিরলে শিখর সেনের জীবনের এই সমুজ্জ্বল মর্মান্তিক পরিণতি আমরা দেখতে পেতাম কি না সন্দেহ। বিদ্রোহী নীলাম্বর জাতের গণ্ডী অনায়াসেই ডিঙিয়ে যেতেন, শিখরের সঙ্গে অবন্ধনার বিবাহের কোনো বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাহিনীটা জমবে বলেই অবন্ধনাকে জন্মাতে হল তার দূরসম্পর্কীয় পিসেমশাইয়ের আশ্রয়ে, গোঁড়া গাঙুলী পরিবারে। সে পরিবারের কর্তা কয়াধুনাথ গাঙুলীকে গ্রামের রসিক ছোকরারা বলত কয়েদী গাঙুলী, এত রকম আচার-বিচারের শৃঙ্খলে তিনি নিজেকে বন্দী করে রাখতেন। আমি দেখেছি ভদ্রলোককে। শীর্ণ-কান্তি লোকটি, শ্যামবর্ণ, বেঁটে, কপিশ বর্ণের গোঁফ-দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, চোখ দুটি ছোট ছোট রক্তবর্ণ। কয়াধুনাথের পিতা ভবতোষ গাঙুলী ম্লেচ্ছাভাবাপন্ন নাস্তিক ছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের চেয়ে দৈত্যদের তিনি নাকি শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তাই ছেলের ওই রকম অদ্ভুত নামকরণ করেছিলেন। বিদ্রোহী হিরণ্যকশিপুকে বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল হিরণ্যকশিপু একজন খাঁটি ভারতীয় বীর ছিলেন, বিজয়ী আর্য রাজাদের অনুগ্রহলালিত পুরাণকারেরা বিদ্বেষবশত তাঁর গায়ে মিথ্যা কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেছে। তিনি বলতেন পরবর্তী যুগেও এ ঘটনা ঘটেছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট বাঙালি বীর শশাঙ্ককে হেয় করতে কুণ্ঠিত হননি। কয়াধুনাথ নিজ পুত্রের নাম যদি প্রহ্লাদ রাখতেন বেশ মানানসই হত—কিন্তু তিনি সুর আর একটু চড়িয়ে ছেলের নাম রাখলেন জগন্নাথ। ভবতোষ ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক, কয়াধুনাথ হলেন গোঁড়া আস্তিক। জগন্নাথ হয়েছেন গোঁড়া কেরানী, আস্তিক্য নাস্তিক্য কোনো কিছুরই ধার ধারেন না

এই কয়াধুনাথের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নীলাম্বর-দুহিতা অবন্ধনা যে ইতিহাস সৃষ্টি করল তা চিরন্তন ইতিহাস। একজন ধনীর ড্রয়িংরুমে আমি একবার এই চিরন্তন ইতিহাসের অপরূপ নজির দেখেছিলাম মনে পড়ছে। সুদৃশ্য টবে একটি বিদেশী ফুল ফুটেছিল। ড্রয়িংরুমের জানলাগুলো বন্ধ ছিল কাচের দরজা দিয়ে তবু কিন্তু সেই বন্দিনী বিদেশিনীর বর্ণমদির গন্ধ-

সুষমা ব্যর্থ হয়নি সেদিন। ওই বদ্ধ ঘরের ভিতরও ভ্রমর এসেছিল দু'একটি, গুঞ্জন করছিল ফুলটিকে ঘিরে। যে গোঁড়ামির প্রাচীর দিয়ে কয়াধুনাথ তাঁর পরিবারকে ঘিরে রাখতেন সে প্রাচীর লঙ্ঘন করতে অবন্ধনারও যে বিলম্ব হয়নি—তার জীবন-কাহিনীই তার প্রমাণ। নীলাম্বর মুকুজ্যে আর ফেরেনি, কিন্তু তার দুঃসাহসী কবি-প্রকৃতি ফিরে এসেছিল তার কন্যার চরিত্রে। নীলাম্বরের স্ত্রী মৃন্ময়ী ছিলেন অতিশয় কোমল-হৃদয়া, কন্যাকে শাসন করতে পারতেন না, কয়াধুনাথের শাসন থেকেও বাঁচাতে চেষ্টা করতেন তাকে যথাসাধ্য। অবন্ধনার কোনও দুষ্কৃতিই কয়াধুনাথের কর্ণগোচর হত না। দৃষ্টিগোচর হবারও উপায় ছিল না, কারণ কয়াধুনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত শাস্ত্রসম্মত পরলোকের দিকে। ঠাকুরঘরেই অধিকাংশ সময় কাটত তাঁর জপতপ নিয়ে। কয়াধুনাথের পত্নী ষোড়শী ইচ্ছে করলে হয়তো অবন্ধনাকে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও সে ইচ্ছে করেননি, কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথই অবন্ধনার চিত্তকে বহুমুখী করেছিল। জগন্নাথই প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে আমবাগানে ঘুরে বেড়াত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত। স্বামীর কাছে অবন্ধনার দুষ্কৃতি কীর্তন করতে গেলে জগন্নাথেরও করতে হয়। পুত্রবৎসলা ষোড়শী তা করতে ভয় পেতেন, কারণ স্বামীকে চিনতেন তিনি। সুতরাং অবন্ধনা সত্যিই অবন্ধনা হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। শিখর ছিল জগন্নাথের প্রতিবেশী এবং সহপাঠী। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই অবন্ধনার সঙ্গে শিখরের পরিচয় ঘটেছিল। শিখর, জগন্নাথ, চন্দ্রমোহন এবং আমি—আমরা সব এক স্কুলেই পড়তাম। কিন্তু অবন্ধনাকে আমি কখনও দেখিনি, দেখবার সুযোগেই হয়নি। কারণ আমি আসতাম ভিন্ন গ্রাম থেকে। অন্য দিকে মন দেবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না আমার, কারণ তখন থেকেই......ওই বোধহয় আলেয়া এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়....নীলাম্বরীখানা পরেছে মনে হচ্ছে.....ও কি জানে যে আমিই ওকে রোজ দেখি....”

কবি তদগত চিত্তে লিখিয়া চলিয়াছিলেন। সম্মুখের আলোকিত শুভ্র দেওয়ালে দুইটি বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতি আসিয়া পাশাপাশি বসিল। তাহাদের সর্বাঙ্গ হইতে অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কবি কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, তিনি নূতন একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

শিখর সেনের ডায়েরি

১৭-৬-৩৪

ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল্‌স্' পড়লাম। অদ্ভুত বই। মাঝে মাঝে অনেক জায়গা বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছিল যেন জঙ্গলে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলছি। অচেনা কথার জঙ্গল, ঘটনার জঙ্গল, মানব মানবীর জঙ্গল। সমস্তই অচেনা, সমস্তই অপরিচিত। এই অচেনা অপরিচিতের ভীড়ে একটুও ভয় করছিল না কিন্তু, আনন্দ হচ্ছিল। এদেরই মধ্যে চেনা এবং পরিচিতের অভাব পাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এরা আমার চেনা লোকই, অনেকদিনের চেনা, কিন্তু কোথায় কি যেন সব অদলবদল হয়ে গেছে বলে চিনতে পারছি না। খুব ভাল লাগল জ্যাভার্টকে। মনে হল যেন খাঁটি একটি আর্যচরিত্র মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। আমাদের দেশে পুলিশের লোককে লোকে ঘৃণা করে কেন? এদেশে কি জ্যাভার্টের মতো পুলিশ অফিসার নেই?...এ দেশে আমাদের ক্লাসের জগুর বোন অবু আজও এসেছিল দক্ষিণপাড়ার বাগানে। নিজের সম্বন্ধে মেয়েটির ধারণা খুব উচ্চ বলে মনে হল। তার ধারণা সে যদি নিজের মুখে কোনও জিনিস চায় তাহলে তাকে তা দিতেই হবে। তার দাবীকে কেউ

অগ্রাহ্য করতে পারবে না। অনায়াসেই আমাকে বলে বসল ওই উঁচু ডাল থেকে আমাকে পেয়ারাটা পেড়ে দাও না। পেয়ারা অবশ্য আমি পেড়ে দিলাম, কিন্তু ওরকম বলাটা কি ওর উচিত হয়েছে? একটু পরেই দেখি বিশাই বাগদির ছেলে নব্‌নে এক ঝাঁক পদ্মফুল এনে হাজির। অবুর আদেশেই না কি সে-ও সাপে-ভরা পালংদীঘিতে নেবেছিল পদ্মফুল জোগাড় করতে। একটা আধফোটা পদ্ম নিজের মাথায় গুঁজতে গুঁজতে এমন ভাবে সে চাইলে আমার দিকে, যার অর্থ—দেখলে? তুমি আমাকে সামান্য একটা পেয়ারা পেড়ে দিতে ইতস্তত করছিলে—নবনে প্রাণ তুচ্ছ করে পদ্মফুল আনতেও দ্বিধা করেনি! বেশ একটু অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে অবু। জগন্নাথকে তো সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না দেখলাম। অথচ জগন্নাথ ওর দাদা। অন্তত চার পাঁচ বছরের বড়। আগে তুমি বলত, এখন তো তুই-তোকারি করে। চাকরের মতো ফরমাস করে, আর জগন্নাথটা ওর ফরমাস খেটে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। সে সামান্য একটা অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক বুঝতে পারে না, তার কি কোনো পদার্থ আছে...''

প্রথম প্রজাপতি দ্বিতীয় প্রজাপতিকে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ''বাণী, ভিক্টর হুগো লোকটি কে? আমিই অবশ্য সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না—''

''ভিক্টর হুগো একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি।''

''ও। আচ্ছা, অ্যালজ্যাব্রা জিনিসটা কি বল তো।''

''গণিত শাস্ত্রের একটা শাখা।''

''ও।''

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রথম প্রজাপতি বলিল—''গল্পটা ভাল লাগছে বাণী?''

''আমি শুধু অপ্রকাশকে প্রকাশ করছি। আমার ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার কথা আমি ভাবছি না, কোনো কালেই আমি ভাবি না। ভবিষ্যৎ যুগে মানুষের মনীষা যে মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টি করবে সে-ও ভাববে না—''

''হেঁয়ালী ছাড়। এখনি আর একটা মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলুম, বুঝলে—''

''কি?''

''কালকূটকে দেখতে পেলুম। দেখলুম পর্বতপ্রমাণ কূর্মপৃষ্ঠ থেকে যে কঙ্কাল মেঘমালতীর রূপ ধারণ করে কালকূটকে ইঙ্গিতে ডাকছিল সে যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ছে—আর কালকূট ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তার পিছু পিছু।.....''

''আপনি ওই সব ভাবছেন তাই কবির লেখাও থেমে গেছে দেখুন। উনিও ভাবছেন বসে বসে—''

''ভাবুক একটু। চল আমরা একবার চার্বাকের খবরটা নিয়ে আসি।''

প্রজাপতি-যুগল বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

।। সতেরো ।।

নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নিগূঢ় মহিমা আছে। সন্ধ্যাকালে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে গভীর রাত্রে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। সেই আত্মপ্রকাশের ছন্দ অত্যন্ত মৃদু, অতিশয় প্রচ্ছন্ন,

অতীব নিগূঢ়। তাহাতে কোনও ঝনৎকার নাই। নিদ্রিত পৃথিবীর বুকে তাহা স্বপ্নের মতো অতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। জ্যোৎস্নাকুল নিশীথ রাত্রিতে যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারা প্রথমে বুঝিতে পারে না যে তাহারা রূপ-লোকের ঐশ্বর্য পরিবৃত হইয়া অরূপলোকের কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রি গহন মর্ম হইতে যে নীরবতা নিখিল বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করে তাহাও যে ভাষাময়, তাহারও যে গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে চিন্তাশীল দ্রষ্টার নিকট তাহা বেশীক্ষণ অজ্ঞাত থাকে না। স্বকীয় চিন্তার শত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহার চিন্তাধারা জ্যোৎস্নাপ্লুত হইয়া যায়। তাহাতে তীক্ষ্নতা থাকে না, সীমারেখা থাকে না। চার্বাকেরও ছিল না। অজানা গ্রাম-প্রান্তবর্তী এক প্রান্তরে চার্বাকও জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিল। সুরঙ্গমার কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু সে চিন্তাধারায় যে নূতন সুর বাজিতেছিল তাহা আর কখনও বাজে নাই। তাহার মনে হইতেছিল, যুক্তি দ্বারা কি সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করা সম্ভব? সুরঙ্গমা শুধু রূপসী নয়, সে বুদ্ধিমতীও। চার্বাক যে সব যুক্তি তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, একথা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তবু সে অনায়াসে চলিয়া আসিল কেন? সে কি কুমার সুন্দরানন্দের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না? বলিতে পারিত না মৃগয়া-অভিযানে যোগদান করিবার তাহার অভিরুচি নাই? যেরূপ তৎপরতার সহিত সাগ্রহে সে চলিয়া গেল তাহাতে এই কথাই মনে হয় যে চার্বাকের যুক্তিগুলি যতই সুচিন্তিত হউক না কেন তাহা সুরঙ্গমার হৃদয়স্পর্শ করে নাই। চতুর্মুখ ব্রহ্মাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং সেই বিকট দানবের প্রতিমূর্তির সম্মুখে একটা সে যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা যে অলঙ্ঘনীয় এ ধারণা তো চার্বাক কিছুতেই অপনোদন করিতে পারে নাই। কেন? যুক্তি তো নির্ভুল, চার্বাকের বাক্‌পটুতাও অসাধারণ, সুরঙ্গমাও বুদ্ধিমতী—তবে—কেন এ অসাফল্য? আর একটা কথাও চার্বাকের মনে হইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সে-ই বা সুরঙ্গমার অনুসরণ করিতেছে কেন! তাহার কুসংস্কার দূর করাই কি উদ্দেশ্য? তাহা তো নয়। তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিজের পৌরুষ চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার নিকট নাস্তিক্য-যুক্তিজাল বিস্তার করার আর কোনই অর্থ নাই বা ছিল না। সে জালে ধারামতী ধরা দিল, তাহাকে শেষে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, কিন্তু সুরঙ্গমা তো অবলীলাক্রমে তাহা এড়াইয়া গেল! "গেলেই বা"—চার্বাক নিজেকেই প্রশ্ন করিল—"তুমিই বা তাহার জন্য এত উতলা কেন? অঙ্গনা-আলিঙ্গনই যদি পৌরুষ হয় তাহা হইলে যে কোনও অঙ্গনাই তো তাহার জন্য যথেষ্ট। একটি বিশেষ অঙ্গনার জন্য তুমি ব্যস্ত কেন? নিছক দৈহিক মাপকাঠি দিয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে শবরীকন্যা ধারামতী কি সুরঙ্গমা অপেক্ষা অধিক লোভনীয়া ছিল না? তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুরঙ্গমার ধ্যান করিতেছ কেন? সুরঙ্গমার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য তুমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছ।"

চার্বাক জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের অযৌক্তিক আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চার্বাকের চিন্তাধারা কিন্তু বিঘ্নিত হইল।

"জেগে আছেন দেখছি। ঘুম হচ্ছে না—নাকি। বিদেশ বিভুঁয়ে ঘুম হওয়া কঠিন। আমি এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিলাম, ঘুমের দেখা নেই।"

"শ্রৌণী গ্রামে কতক্ষণে পৌঁছব আমরা?"

"কাল সন্ধ্যা নাগাদ।"

"সেখান থেকে যজ্ঞস্থল কতদূর?"

"শুনেছি বেশীদূর নয়। হেঁটে যদি যান প্রহর দুই লাগবে। তবে আমার বিশ্বাস হাঁটতে হবে না আপনাকে। হাতী, ঘোড়া, নিদেন গরুর গাড়িও পেয়ে যাবেন একটা। ঘোড়ায় চড়তে পারেন তো?

"পারি।"

"তবে আর ভাবনা কি, ঘোড়া অনেক থাকবে। আর আপনাকে দেখতে পেলে ওঁরা সাদরে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন। আপনি তো আর যে-সে লোক নন আমাদের মতো। আমি তো আশা করেছিলাম যে আপনি হোতা বা উদগাতা বা ওই রকম কিছু একটা হোমরা-চোমরা গোছের হয়ে যাচ্ছেন, দেশে থাকলে যেতেনও, কুমার সুন্দরানন্দ আপনাকে যেরকম খাতির করেন শুনেছি তাতে মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে একই রথে আপনাকে নিয়ে যেতেন তিনি।"

চার্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। দেখিতে পাইলেন গুণপতির চক্ষুযুগল হইতে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বলিলেন—"মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে একরথে আমার স্থান নেই, হতে পারে না। ওঁরা ব্রাহ্মণ নন, মহর্ষি তো ননই—ওঁরা ক্রীতদাস। আমি স্বাধীন মানুষ, নিজের মতে নিজের পথে চলি। ওঁদের সঙ্গে একাসনে আমার স্থান নেই। ওঁরাও আমাকে সহ্য করতে পারবেন না, আমিও ওঁদের সহ্য করতে পারব না"

গুণপতির আনন ইষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"তাই নাকি! আমরা মূর্খ মানুষ। কিছুই বুঝি না তো। আমরা জানি, আপনিও মহর্ষি; উনি ক্রীতদাস একথা তো জানতাম না! শবরী ভল্লুকীকে নিয়ে একটা কানাঘুষো শুনতাম বটে, কিন্তু উনি ক্রীতদাস? সুন্দরানন্দের পিতার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কেনার ঝোঁক ছিল শুনেছি। আমার পিতামহ ধনপতি তাঁর জন্যে বাহ্লীক থেকে, শ্যাম থেকে, সিংহল থেকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কিনে আনতেন—বাবার মুখে শুনেছি এসব গল্প। আপনি তাহলে অনেক খবরই জানেন। ক্রীতদাস উনি!"

"হ্যাঁ। শুধু সুন্দরানন্দেরই নয় কুসংস্কারেরও। উনি মনে করেন বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সমস্ত বিধিনিষেধ উনি অভ্রান্ত বলে মনে করেন, ওঁর ধারণা সুর করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে আগুনে ঘি ঢালতেই অন্তরীক্ষবাসী দেবতারা কাম্য ফল দেবেন। উনি অন্ধ, আমি চক্ষুষ্মান। আমি বিচার করি, উনি বিশ্বাস করেন।"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চার্বাকের কথা শুনিতেছিলেন, চার্বাক থামিতেই বলিলেন—"বটে! আমি মূর্খ মানুষ কিছুই বুঝি না। আচ্ছা, মহর্ষি, বেদই বা কি, আর ব্রাহ্মণই বা কি। যখন সুযোগ পেয়েছি তখন জেনেইনি কথাটা।"

"বেদে শুধু মন্ত্র আছে, আর ব্রাহ্মণে আছে সেই মন্ত্রের প্রয়োগবিধি। এসব বাজে কথা জেনে কিছু লাভ নেই। বেদ এবং ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জ্ঞানই যথেষ্ট।"

"সেটি কি?"

"সেটি হচ্ছে এই যে, ওসব ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওসব সরল বিশ্বাসী গৃহস্থদের ঠকিয়ে জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। যজ্ঞের নামে সারা দেশ জুড়ে যে অপচয় হচ্ছে, যে

ভণ্ডামি চলছে, সহজ বুদ্ধিবৃত্তির সুস্থ-বিকাশের পথে যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তা ভাবলে কষ্ট হয়। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ নেই। সমস্ত দেশকেই অন্ধ করে দিয়েছে ওরা।"

গুণপতি হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিলেন। মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই, কিন্তু এটুকু আমি বলব যে আমি অন্তত অন্ধ হইনি। আমার গৃহিণীর অবশ্য দেব-দ্বিজে প্রবল ভক্তি, কিন্তু আমি যাকে তাকে ভক্তি করতে পারি না—কি রকম যেন পারিই না।"

"তা না পারুন, কিন্তু যজ্ঞের বিরোধিতা করতে আপনি পারবেন কি? পারবেন না। এর সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘি বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গুণপতি নীরবে দন্তগুলি বিকশিত করিয়া চার্বাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা যাবে! উফ, মাথা বটে আপনার। ঠিক বলেছেন। যজ্ঞ বন্ধ হলে ঘিয়ের ব্যবসা তুলেই দিতে হবে আমাকে। তবে একটা কথা আছে মহর্ষি, এরকম ফলাও ব্যবসা আছে বলেই আমরা আপনাদের মতো সজ্জনকে ধারে ঘি খাওয়াতে পারি। তা না হলে কি পারতুম? আপনাদের কাছে দাম দু'চার ছ'মাস পড়ে থাকলেও গায়ে লাগে না আমাদের"

চার্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনি প্রসঙ্গান্তরে এসে হাজির হলেন। আমাকে ধারে ঘি খাওয়ান–এটা কি যজ্ঞের স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি হল?"

গুণপতি জিভ কাটিয়া বলিলেন—"ছি ছি, তা কি হয় কখনও! সে কথা আমি বলছি না। মন্দ জিনিসেরও যে একটা ভাল দিক থাকতে পারে সেই কথাটাই আমি বলছি শুধু। সুমন্ত্রও উঠেছে দেখছি—ওহে সুমন্ত্র, এদিকে শোন—মহর্ষি যজ্ঞের খবর জানতে চাইছেন, বল দিকি ওঁকে—সব যা জান"—তাহার পর চার্বাকের দিকে ফিরিয়া—"সুমন্ত্র অনেক খবর রাখে—"

চার্বাক বুঝিল, চতুর গুণপতি কৌশলে আলোচনাটার মোড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যজ্ঞ-বিরোধী বিপজ্জনক আলোচনায় তিনি আর নিজেকে সম্ভবত লিপ্ত রাখিতে চান না, অথচ সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। যজ্ঞের সংবাদ জানিবার কিছুমাত্র আগ্রহ চার্বাকেরও ছিল না, কিন্তু সে কথা সে-ও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। প্রধান শকট-চালক দীর্ঘকায় সুমন্ত্র নিকটবর্তী হইতেই গুণপতি বলিলেন—"চাঁদের আলোর ধমকে তোমারও ঘুম ভাঙল বুঝি?"

সুমন্ত্র—"আমি ভাবছি—বেরিয়ে পড়ি চলুন, মাঠে আর সময় নষ্ট করে কি হবে? ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমার আর আপত্তি কি। আমারও ও-কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি চুপটি করে আছি । আমি বললেই তোমরা ভাববে—লোকটা কি চণ্ডাল, রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত দেয় না । ঠিক কি না আপনিই বলুন মহর্ষি। ওহে সুমন্ত্র, মহর্ষিকে যজ্ঞের খবর বল তো—যা জান।"

সুমন্ত্রের দেহের আয়তন যে অনুপাতে বিশাল, কণ্ঠস্বর সেই অনুপাতেই উচ্চ। কথা কহিলে মনে হয় ধমক দিতেছে। চার্বাকের দিকে একনজর চাহিয়া বলিল—"আপনি কি নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন?"

"না।"

"তাহলে আপনাকে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে কি না সন্দেহ!"

"কেন?"

"লোকচক্ষুর আড়ালেই নাকি এ যজ্ঞ হবে। সেই জন্যেই কুমার গভীর অরণ্যের মাঝখানে যজ্ঞ-ভূমি নির্মাণ করিয়েছেন—"

"এ রকম করার উদ্দেশ্য?"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে শুনেছি!"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে!"

"দিকপাল তো তাই বললে।"

"দিকপাল কে?"

গুণপতি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দিকপাল হচ্ছে গুপ্তচর। সুমন্ত্রর আপন ভগ্নীপতি। তার কাছ থেকেই সুমন্ত্র খবর জোগাড় করে।"

চার্বাক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"কুমার সুন্দরানন্দকে এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কে প্ররোচিত করলে! এ যে অবিশ্বাস্য, এ যে নরহত্যা—"

"ম্লেচ্ছ পণ্ডিত নীল-চক্ষু মির্মির কুমারকে এই যজ্ঞে উৎসাহিত করেছেন শুনেছি। তিনি শুধু পণ্ডিতই নন, শুনেছি তিনি একজন বড় শিকারীও। নদীপথে, সমুদ্রপথে তিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। নর্মদা তীরে কুমারের সঙ্গে না কি তাঁর প্রথম আলাপ হয়। সেই আলাপ এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে এবং তার ফলেই এই যজ্ঞ হচ্ছে। অবশ্য আমি সুমন্ত্রর মুখে যেমন শুনেছি তেমনি বলছি। এর কতটা ঠিক কতটা বেঠিক—তা সুমন্ত্রই জানে। সুমন্ত্রকে সামনে সামনে ডেকে এনে তাই সব কথা আপনাকে ভেঙে বললাম এখন, আগে বলিনি, বলতে সাহস হয়নি।"

গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা হৃষ্ট চতুরতা ঝলমল করিতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গুণপতি পুনরায় বলিলেন—"সুমন্ত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন এ খবর ঠিক কিনা।"

সুমন্ত্র যেন ধমকাইয়া উঠিল, "ঠিক।"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"অনিমন্ত্রিত কোনও লোককে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে না এ সংবাদও কি ঠিক?"

"ঠিক।"

"যজ্ঞটা হচ্ছে কোথায়?"

গুণপতি বলিলেন—"শ্রৌণী গ্রামের নিকট কোনও গভীর অরণ্যে, এইটুকু শুধু জানি। এর বেশী আমরা কিছু জানি না। জান না কি হে সুমন্ত্র। জান তো মহর্ষিকে বল না খবরটা।"

"জানি না।"

গুণপতি বলিলেন—"আমরা কেউ কিছু জানি না; আমাদের উপর কেবল আদেশ হয়েছে ঘিয়ের কলসীগুলি নিরাপদে শ্রৌণী গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে কুমার সুন্দরানন্দের সেনাপতি সসৈন্যে উপস্থিত থাকবেন। তাঁরই হাতে এই পাঁচ শত কলস ঘি আমাকে দিয়ে আসতে হবে।"

"সেনাপতি মানে কুলিশপানি?"

"সম্ভবত। তিনিই তো এখন কুমারের দক্ষিণ হস্ত।"

"মন্ত্রী জিমভ্রকও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়?"

"থাকা তো উচিত—"

"এ যজ্ঞে কারা ঋত্বিক হয়ে যাচ্ছেন জান?"

সুমন্ত্র উত্তর দিল, "জানি। ব্রহ্মা হয়েছেন মহর্ষি পর্বত, উদ্গাতা মহর্ষি ডম্বরু, অধ্বর্যু চন্দ্রচূড়, আর হোতা হচ্ছেন স্বয়ং সুন্দরানন্দ।"

"যে নরটিকে বলি দেওয়া হবে সেটি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে?"

"সে খবর কেউ জানে না। এমন কি দিকপালও না।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক বলিল, "আমাকে তাহলে শ্রৌণী থেকেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, শ্রৌণী পর্যন্ত তো যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে।"

"কুলিশপানি তো আপনাকে খুব খাতির করেন শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি হয়তো কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

কুলিশপানির আদেশেই যে চার্বাককে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেকথা তাহার মনে পড়িল। নির্বাক হইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল--যাহার আশায় আমি এই দুরূহ বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াইয়াছি তাহার দেখা মিলিবার কোনো সম্ভাবনাই তো নাই। সৈন্য-পরিবৃত যজ্ঞস্থলের নিকটবর্তী হইবার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। তবে যাইতেছি কেন? এখান হইতেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। সহসা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। চার্বাক মনে মনে যেন পাখি হইয়া উড়িতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—পুরাণের গরুড় পক্ষীর মতো বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া সে যেন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বহু উর্ধ্বে উড়িয়া চলিয়াছে। ......সুরঙ্গমা যেন অলিন্দে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে এই বিরাট পক্ষীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। বাজ বা চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্রতর পশুপক্ষীকে তুলিয়া লয়, সে-ও যেন তেমনি ভাবে সুরঙ্গমাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। সুরঙ্গমা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠিক ইহার পরই চার্বাকের কল্পনা-বিলাস ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সুরঙ্গমার আর্ত চীৎকার যেন একটা ন্যক্কারের শব্দে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। চার্বাক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—কিছুদূরে গুণপতি মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। দুইটি অঙ্গুলি মুখ-বিবরে ঢুকাইয়া সম্ভবত তিনি জিহ্বা পরিষ্কার করিতেছেন, তাহাতেই ন্যক্কারের শব্দ হইতেছে। সুমন্ত্র বা অন্যান্য শকট-চালক কেহই কাছে নাই। ইহারা কখন যে চলিয়া গিয়াছে, চার্বাক জানিতেও পারে নাই। চার্বাক রীতিমত বিস্মিত হইল। সজ্ঞানে বসিয়া বসিয়া সে নিজের আজগুবি কল্পনায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে ইহারা কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা টেরও পায় নাই। নীলোৎপলার কথা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ যে সুরা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন, সে সুরা-প্রভাবে দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হয়। যে যাহা হইবার কামনা করে কিছুক্ষণের জন্য তাহা সে হইতে পারে। তাহার মনে হইল এখনই সে তো পাখি হইয়া উড়িতে চাহিতেছিল। ওই সকল অসম্ভব হাস্যকর কল্পনাও তাহা হইলে তাহার মনের কোনও স্তরে নিহিত আছে না কি। সুরা-প্রভাবে সে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা কল্পনায় পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তাহার মানসপটে ছায়াছবির ন্যায় সেই সুন্দরী মোহিনী, বিরাটকায় কৌতূহল, বিচিত্র সন্ধানলোক, মায়বিনী নদী, পাতালনিবাসী কালকূট, বর্ণমালিনীর ক্ষুরধার

জিহ্বা-নির্মিত সাঁকো একে একে মূর্ত হইয়া আবার একে একে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল সে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাহার মন আর সচেতন রহিল না। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে তাহার দিশাহারা বুদ্ধি উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। একথাও সে অনুভব করিল যে তাহার মন সম্ভব-অসম্ভবের সূক্ষ্ম বিচার করিতে আর প্রস্তুত নহে। দুই আর দুই যোগ করিয়া পাঁচ হয় একথাও সে মানিতে প্রস্তুত আছে—যদি তাহা মানিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি কেহ কোনো মন্ত্রবলে সত্যিই তাহাকে তীক্ষ্ণ নখচঞ্চু-সমন্বিত বিরাট পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারে সে মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করিতে হয়তো সে আর দ্বিধা করিবে না। সহসা তাহার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন সে নিজেকে এত অবনত করিতেছে? কেন? ধীরে ধীরে সুরঙ্গমার মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি যেন নীরব ভাষায় বলিল, 'আমার জন্য'। অন্তরীক্ষ হইতে যেন এক তরঙ্গিণীর কল্লোলধ্বনি কলস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই মায়া নদী যেন পুনরায় বলিল, "তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্তিত হয়নি চার্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্যে নিত্য নব নব ঋণজালে জড়িত হচ্ছ—!"

চার্বাকের সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল যে ঋণজাল যতই জটিল হোক না কেন, নিত্য নব নব ঘৃত পান করিবার বাসনা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, করিতে পারিবে না, কারণ উহাই তাহার ধর্ম। যত বিপদই হোক, সুরঙ্গমার সহিত দেখা করিতেই হইবে।

গুণপতির সহিত চার্বাক পদব্রজেই পথ অতিবাহিত করিতেছিল। শকটের শ্রেণী আগাইয়া গিয়াছিল। গুণপতির গাড়িটি কেবল দেখা যাইতেছিল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে গাড়িতে চড়িবেন এই অভিপ্রায়ে গুণপতি গাড়িটিকে বেশী আগাইয়া যাইতে দেন নাই। চার্বাক যখন তাঁহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা পরামর্শ করতে চাই—" তখন তাঁহাকে বলিতে হইল—

"তাহলে হেঁটেই যাব চলুন কিছুদূর। আমার বিদ্যাধর গাড়োয়ান অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক, তবু কাজ কি, জ্যোৎস্নায় হাঁটতে ভালও লাগবে"

ঠিক কিভাবে প্রসঙ্গটার অবতারণা করিবে চার্বাক ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর গুণপতি বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি।"

"ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে যে আপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে হয় তো অদ্ভুত ঠেকবে।"

"আরম্ভই করুন না, শোনা যাক। আমার বিদ্যের দৌড় অবশ্য বেশী দূর নয়, আপনাদের মতো পণ্ডিতদের কথাবার্তা আমার না বুঝতে পারারই কথা, তবু চেষ্টা করি, বলুন আপনি।"

চার্বাক কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন, আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মাত্র আছে। ওই আমার যথাসর্বস্ব, কিন্তু তা-ও আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব—বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটি উপকার করেন।"

"দেখুন মহর্ষি, আমি ব্যবসায়ী লোক, আপনাদের তুলনায় মূর্খ লোকও বটে, কিন্তু উপকার আমি বিক্রয় করি না। যদি আপনার মতো একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের উপকারে লাগতে পারি তাহলে আমি নিজেকেই ধন্য মনে করব। ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।"

"আমি সুন্দরানন্দের যজ্ঞস্থলে যেতে চাই।"

"যাবেন কি করে! সুমন্ত্রের মুখে তো শুনলেন যে অনিমন্ত্রিত কোনো লোককে সেখানে যেতে দেবে না। তবে শ্রৌণীতে যদি কুলিশপাণির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তিনি আপনাকে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"আমার নেই। কুলিশপাণির আদেশেই আমাকে কিছুদিন পূর্বে সুন্দরানন্দের রাজত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল।"

"বলেন কি!"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"একথা তো অনেকেই জানে, আপনারও জানার কথা।"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করবার অর্থ কি তাও তো বুঝতে পারছি না।"

"কারণ আমি জ্ঞান-মার্গের পথিক, ওঁরা অন্ধ বিশ্বাসী।"

"বটে!"

উভয়ে আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিলেন। কিছুকাল পরে গুণপতি বলিলেন, "ওঁদের সঙ্গে যখন আপনার মতেরই মিল নেই, তখন ওঁদের যজ্ঞস্থলে যেতেই বা চাইছেন কেন?"

"যে মানুষটিকে ওঁরা যজ্ঞের নামে খুন করতে চাইছেন তাকে বাঁচাতে চাই।"

"বাঁচাতে চান? বলেন কি!"

গুণপতি সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চার্বাকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—"পারবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই পারব।"

"কি করতে হবে বলুন।"

"আপনার ঘিয়ের জালাগুলি বেশ বড় বড়। আমি অনায়াসেই একটির মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে পারি।"

"একটা জালার ঘি তাহলে ফেলে দিতে বলছেন?"

"ফেলে দেবার দরকার কি? কাল ভোরে নূতন একটা জালা কোথাও থেকে কিনুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি এবং আপনি তার বাইরে ঘি মাখিয়ে সেটাকে ঘি বলে চালান করে দিন। জালা কি পাওয়া যাবে না?"

"পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায়।"

"পয়সা দিতে তো আমি প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।"

"ব্যাপারটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। ভেবে দেখুন।"

"একটা জঘন্য নরহত্যা নিবারণ করবার জন্যে আমি যে কোনও বিপদকে বরণ করতে রাজি আছি।"

গুণপতি মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি তো আছেন, কিন্তু বিপদ যদি হয় তাহলে আমিও যে জড়িয়ে পড়ব। আমরা ছাপোষা লোক, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখুন মহর্ষি।"

"আপনার গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"কি করে?"

"আমি যদি ধরা পড়ি তাহলে আপনার নাম করব না। বলব যে গুণপতি যখন নিদ্রিত ছিল তখন আমি একটি ঘিয়ের জালা সরিয়ে তার স্থানে একটি খালি জালা রেখেছিলাম এবং সেই জালার ভিতরে ঢুকে বসেছিলাম। এর জন্য গুণপতি একেবারেই দায়ী নয়।"

"এত বড় মিথ্যা ভাষণটা আপনি করবেন?"

"করব। মিথ্যা ভাষণ করে যদি একটা নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচান যায় তাহলে তা করতে আমার আপত্তি নেই! স্বার্থের জন্য মিথ্যাভাষণকে আপনি নিন্দা করতে পারেন, কিন্তু পরার্থে মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় নয়।"

"আমি মূর্খ মানুষ, স্বার্থটাই বুঝি। আমাকে যদি এতে জড়িয়ে না ফেলেন তাহলে আপনার আদেশ পালন করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। বলব?"

—"বলুন"

"আপনি মিথ্যাভাষণ করতে রাজি আছেন তা না হয় মানলাম, কিন্তু আপনার কথা মানা না-মানা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা! আমরা যে ষড়যন্ত্র করে এ কাণ্ড করতে পারি তা কল্পনা করা কুলিশপাণির পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। লোকটা দেখতে একটু হোঁৎকাগোছের, কিন্তু অবসর পেলেই কবিতা লেখে শুনেছি....."

"মিথ্যাটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কি করে হবে সেটা?"

"ভেবে দেখি একটু।"

"ভাল করে ভাবুন। জীবন-মরণ সমস্যা তো।"

চার্বাক কোনো উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে গুণপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি যদি ভয় পান, তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব না আর। সত্যই এটা জীবনমরণ সমস্যা। আমার এই প্রচেষ্টায় যদি আপনার অন্তরের সায় না থাকে তাহলে আপনাকে এতে জড়াতেই চাই না। যজ্ঞের নামে দেশ জুড়ে এই যে অনাচার চলেছে—আমি বরাবর তার প্রতিবাদ করেছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে করব। আমার এই কাজে যদি আপনার আন্তরিক সমর্থন থাকে আসুন আমাকে সাহায্য করুন, যদি না থাকে আপনাকে জোর করব না। আমি নিজেই যেমন করে পারি সেখানে গিয়ে হাজির হব।"

এই কথায় গুণপতি এক মুখ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখুন মহর্ষি, আমি ভীতু মানুষ। আমার অন্তরের কথাও আমি নিজে জানি না ঠিক। সত্যি বলছি, মাত্র দুটি জিনিসই আমাকে চালিত করেছে সারাজীবন। স্বার্থ আর ভয়। আপনি একজন তপস্বী লোক; আপনাকে চটাতেও ভরসা পাচ্ছি না। ভাবছি কি জানি মহর্ষির অন্তরে কষ্ট দিলে যদি কিছু অনিষ্ট হয়ে যায় শেষকালে! ব্রহ্মশাপে অনেক কিছু হতে পারে—"

"আমি আপনাকে শাপ দেব না, আর দিলেও যে তা ফলবে এ বিশ্বাস আমার নেই।"

"আমার কাছে। আমি ছাপোষা লোক, পারতপক্ষে ব্রাহ্মণকে চটাতে চাই না। আপনি যদি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

"কিছুক্ষণ চিন্তার পর চার্বাক বলিল, 'আপনার শকটচালক বিদ্যাধর কি বিশ্বাসী লোক?"

"খুব।"

"আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করে দেবে না তো?"

"না। প্রাণ গেলেও না। ওর সমস্ত পরিবারকে আমি পালন করি, আমার বিপদে ওরও বিপদ যে—"

"বেশ, তাহলে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে শুনুন"

"কি বলুন।"

"আপনি আপনার প্রধান শকটচালক সুমন্ত্রকে গিয়ে বলুন যে আপনি আরও জালা কিনে আরও ঘি কেনবার জন্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাচ্ছেন বিদ্যাধরকে নিয়ে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আপনি প্রকাণ্ড একটি জালা কিনে তার বাইরেটা ঘৃত-সিক্ত করে ফেলুন, আমি তার ভিতর ঢুকে বসে থাকি। তারপর আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করে শুয়ে পড়ুন। বিদ্যাধর আপনার অজ্ঞান দেহটাকে গাড়িতে তুলে ছুটতে ছুটতে এসে বাকী সকলকে খবর দিক যে আমি আপনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে টুঁটি টিপে হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে সফলকাম হইনি—উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছি। তারপর জ্ঞান ফিরে আসুক। আপনি আমাকে নিয়ে শ্রৌণী গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসুন। তারপর আমি নিজের পথ নিজে ঠিক করে নেব।

গুণপতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চার্বাকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাথা বটে আপনার! তাহলে তাই করি চলুন। কিছু অর্থ তাহলে দিন আমাকে। ঘি কিনতে হবে, জালা কিনতে হবে, বিদ্যাধরকেও দিতে হবে কিছু। বিদ্যাধর এমনি খুব বিশ্বাসী, তার ওপর কিছু পুরস্কার দিলে, বুঝলেন না।"

চার্বাক স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া দিল।

শিংশপা-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক বিরাট সরোবরে নীল হংস মিথুন ভাসিতেছিল। পাশাপাশি ভাসিতেছিল কেবল—এই ভাসাটাকেই তাহারা একাগ্র হইয়া উপভোগ করিতেছিল যেন। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত—শিংশপা বৃক্ষের শাখায় আত্মগোপন করিয়া একটি পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া ডাকিতেছিল। তাহার সহিত মিলিতেছিল ঝিল্লীর ঝনৎকার। মনে হইতেছিল যেন কোনো অদৃশ্য সেতারী এবং গায়ক এই জ্যোৎস্নালোকে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে।

পিতামহ কথা কহিলেন।

"বাণী, মনে হচ্ছে ভাগ্যে ওই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম তাইতো এত আনন্দ পেলাম। ভৃগুটা আমাকে দাম্ভিক বলে উপহাস করেছিল, সে বুঝতে পারেনি আমাকে। আমার আনন্দের প্রকাশকে, আমার স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসকে সে দম্ভ বলে ভুল করেছিল, করবেই তো, যত বড় তপস্বীই হোক, মানুষ তো—"

"চুপ করুন।"

"ও, আচ্ছা।"

আবার উভয়ে নীরবে ভাসিতে লাগিলেন।

"একঘেয়ে ভাসতে কিন্তু আর ভাল লাগছে না বাণী। এই বাধাহীন স্বাধীনতায় জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলছি যেন। বন্দী সিংহটাকে আমার হিংসে হচ্ছে—"

বাণীর দৃষ্টিতে চাপা হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"শিখর সেনের গল্পটা বন্ধ থাক তাহলে।"

"চল একটু মুখ বদলে আসা যাক। অনেকক্ষণ হাঁস হয়ে আছি।"

"ক্রমাগতই তো মুখ বদলাচ্ছেন।"

"তুমিই আমার কল্পনার ভাষা, তুমিও বুঝতে পারছ না কেন বদলাচ্ছি। সৃষ্টি মানেই পরিবর্তনের লীলা যে। ওই লীলার আবেগেই কয়লা হীরে হয়, গাছে ফুল ফোটে, শিশু বড় হয়, বুড়োরা মরে! রূপ থেকে রূপান্তরই সৃষ্টি, চার্বাক থেকে শিখর সেন। শিখর সেনের গল্প অনেকক্ষণ তৈরি হয়ে গেছে, যথাকালে সেটা তোমার কবির মনে সঞ্চারিত করা যাবে। এখন বেচারাকে ঘুমুতে দাও না একটু, পাশের ঘরে ওর বউটা একা ছটফট করছে।"

"কুমার সুন্দরানন্দ যে সিংহটাকে বন্দী করে রেখেছে আপনি ঠিক সেই রকম সিংহ হতে চান।"

"হ্যাঁ। তোমাকে হতে হবে সেই সিংহের খাঁচা! নিজে কারাগার হয়ে আমাকে বন্দী কর তুমি, আর আমি গর্জন করব তার মধ্যে বসে। চমৎকার হবে! চল—"

"চলুন।"

জ্যোৎস্নালোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া হংসমিথুন উড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে এক নিবিড় অরণ্যের পশু-পক্ষীকে সচকিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল দুর্দান্ত এক সিংহ। পশু-পক্ষীরা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা জানিতে পারিল না যে এ সিংহ বাণী-কারাগারে বন্দী, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে এ গর্জন নয়, আনন্দিত স্রষ্টার অট্টহাস্য।

শ্রৌণী গ্রামে যথাসময়ে গুণপতির শকটশ্রেণী উপস্থিত হইল। স্বয়ং কুলিশপাণিই ঘৃত-কুম্ভগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। জালার ভিতর বসিয়া চার্বাক অনুমান করিতেছিল যে অনেক অশ্বারোহীও বোধহয় সঙ্গে আসিয়াছে। কারণ অশ্বের হ্রেষা এবং ক্ষুর-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইতেছিল। অনেকগুলি ঘণ্টার শব্দও পাওয়া যাইতেছিল। চার্বাকের মনে হইল ওগুলি সম্ভবত গরুর গলার ঘণ্টা। কুলিশপাণি ঘৃত-কুম্ভগুলিকে লইবার জন্য বোধহয় নূতন শকট আনিয়াছেন। সহসা চার্বাক শুনিতে পাইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতি কথা বলিতেছেন। সে যে জালাটির ভিতর বসিয়া আছে ঠিক তাহার পাশে দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন। কথাবার্তার ধরনে মনে হইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতির হৃদ্যতা আছে। থাকিবারই কথা, গুণপতির মতো উৎকৃষ্ট ঘৃতসরবরাহকারী ও অঞ্চলে আর নাই। ও প্রদেশের সমস্ত যজ্ঞের আজ্য গুণপতিই সরবরাহ করেন। চার্বাকের মনে হইল হয় তো তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই গুণপতি কুলিশপাণিকে এই জালাটির নিকট আনিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। চার্বাক রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। গুণপতি কহিলেন—"আর্য, কুমার সুন্দরানন্দ আরও তো অনেকবার যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু এমন গোপনতার আশ্রয় নিতে তাঁকে তো ইতিপূর্বে দেখিনি। সত্যি বলছি ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড়ই কৌতূহলী হয়েছি।"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। এ যজ্ঞ একটি অসাধারণ যজ্ঞ হচ্ছে। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হলে দুর্বল-চিত্ত লোকদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, তাই কুমার এটার অনুষ্ঠান লোক-চক্ষুর বাইরে করেছেন।"

গুণপতির কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না।

"অসাধারণ যজ্ঞ মানে?"

"এতে নরবলি হবে। ঠিক নর নয়, নারী।"

"বলেন কি।"

"নারীটির নাম শুনলে আপনি আরও চমকে যাবেন।"

"কি রকম?"

"নারীটি অপর কেউ নয়, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা নর্তকী সুরঙ্গমা।"

জালার মধ্যে চার্বাক শিহরিয়া উঠিল।

।। আঠারো ।।

১৯-৮-৩৪

কবি পুনরায় লিখিতেছিলেন

"শিখর সেনের যে ডায়েরিটা আমি চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেয়েছি, যার থেকে দু' একটি অংশ উদ্ধৃতও করেছি ইতিপূর্বে সেই ডায়েরিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে।

হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে আজ বকুনি খেয়েছি। বকুনির জন্য তত দুঃখ হয়নি, 'হোম্‌টাস্‌ক' করে না নিয়ে গেলে বকুনি খেতেই হবে, আমার দুঃখ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলেছি বলে। আমি টাস্‌ক করতে পারিনি আমার মাথা ধরেছিল বলে নয়, আমি টাস্‌ক করতে পারিনি অবুর জন্যে। আমার পড়ার ঘরের জানলায় ও রোজ আসবে লুকিয়ে—আর খালি বকর বকর করে সময় নষ্ট করে দেবে আমার। আমি কাল বলেছিলাম, 'তুই এমনভাবে বকর বকর করলে আমি 'হোম্‌টাস্‌ক' করব কি করে। তার উত্তরে ও বললে, 'তোমার জানলার নীচে তো একদল ছাতার পাখিও সব সময় কচর-কচর করছে তাতে তো তোমার পড়ার বাধা হয় না। আমি কি ছাতারে পাখিরও অধম না কি! যাও আর আসব না।' ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফের এল একটু পরে। আমি জিগ্যেস করলাম, ফের আবার এলি যে। বললে, আমার কান্না পাচ্ছে। বল, তুমি আমার ওপর রাগ করনি। বলেই ফিক করে হেসে ফেললে। এরকম জ্বালাতন করলে কি হোম্‌টাস্‌ক করা যায়?

এর থেকে মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার আগেই শিখর অবন্ধনার প্রেমে পড়েছিল। ডায়েরির আরও দু'একটা জায়গা থেকে তা বেশ বোঝা যায়। আলেয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নানাবর্ণে রঙীন হয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে পরিপ্লুত করে রেখেছিল বলে আমি ব্যাপারটা টের পাইনি। অথচ প্রত্যহই তখন ওর সঙ্গে দেখা হত। একটা কথা আমি আবিষ্কার করেছি সম্প্রতি। আমরা যখন চোখ খুলে থাকি তখন যদিও বহুবিধ জিনিস আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু আমাদের অন্তরনিবাসী দ্রষ্টা দর্শন করেন শুধু একটি জিনিসকেই। কারণ তিনি শুধু দর্শনই করেন না তিনি তন্ময়ও হয়ে যান। তিনি যখন যা দেখেন তখন তা তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা যেন অশেষ হয়ে ওঠে, কিছুতেই তার মহিমা শেষ হতে চায় না, নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে তা যেন অনন্ত রূপের আকর হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিতে। আমি

তখন আলেয়ার নিত্য নূতন মহিমা প্রত্যক্ষ করছিলাম, যতটা প্রত্যক্ষ করছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করছিলাম, তাই শিখর সেনের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করতে পারিনি। শিখর সেনের ডায়েরি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে অবন্ধনা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেনি। অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও আসেনি। এই ঘটনাটা আমার মনে হিংসার উদ্রেক করেছে মাঝে মাঝে। মনে হয়েছে তার প্রেম আমার প্রেমের চেয়ে পবিত্রতর, আবার বিয়ে করে হয়তো আমি আমার প্রেমের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছি। কিন্তু ক্ষুণ্ণ যে করিনি, তা আমার অন্তর্যামী জানেন। আলেয়াকে ভালবাসবার পরও আমি অপর একজনকে বিয়ে করেছিলাম কেন—এ প্রশ্ন আমি নিজেকে করেছি অনেকবার। আগে করেছি, এখন আর করি না। এখন বুঝেছি, কিছু করবার বা না-করবার মালিক আমি নই। যে শক্তি পাহাড়কে সমুদ্রে রূপান্তরিত করে, কুসুমের কোমল হৃদয়ে কীটের সংস্থান করতে ইতস্তত করে না, দেবতাকে পিশাচ এবং পিশাচকে দেবতায় পরিণত করতে যার এতটুকু দ্বিধা নেই, যে শক্তি এক বৃন্তে একটি ফুল ফুটিয়ে রূপ সৃষ্টি করে, একাধিক ফুল ফুটিয়েও রূপ সৃষ্টি করে, ফুলকে ফলে উত্তীর্ণ করে বা অকালে ঝরিয়ে দিয়ে যে সমান কৃতিত্ব এবং রসবোধের পরিচয় দেয়—আমি সেই শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তারই প্রেরণায় আমি আলেয়াকে ভালবেসেছি, বিয়েও করেছি আর একজনকে। দুটো কাজই আমি করেছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছি, তবু কিন্তু কোনোটার উপরই আমার হাত ছিল না যেন। গাছের শাখায় কুসুমের সূচনা যে স্রষ্টার খেয়ালে হয়, সেই স্রষ্টাই সেই কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। কুসুমের হয়তো মনে হয় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সজ্ঞানে ফুটছে! শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানীরা যাকে অদৃষ্টবাদী বা ভগবৎবিশ্বাসী বলেন আমি ঠিক সে জাতীয় লোকও নই, কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমি নির্ভর করেছি নিজের চেষ্টায় এবং বুদ্ধির উপর। নিজের আচরণের স্বপক্ষে ওকালতি করবার জন্যও আমি এসব যুক্তির অবতারণা করছি না—সত্যি সত্যি আমার যা মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। বিয়ে করেছিলাম আমি মায়ের অনুরোধে, মায়ের কথা রাখবার জন্য। বাবা আমার শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন, আমি মানুষ হয়েছিলাম মায়ের কাছে। সুনন্দার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের আলাপ হয়েছিল কাশীতে এবং আমার বয়স যখন দশ বছর এবং সুনন্দার তিন বছর তখনই মা সেই তীর্থস্থানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সুনন্দাকে পুত্রবধূ করবেন। মায়ের এ প্রতিশ্রুতির উপর আমার কোনও হাত ছিল না, এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা লঙ্ঘন করে সস্তা বিদ্রোহের নিশান ওড়াবার প্রবৃত্তিও আমার হয়নি। আলেয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে বলে মাকে অপমানের কালিমায় লাঞ্ছিত করতে হবে এ যুক্তি আমার মনে স্থান পায়নি। মাকেও আমি কম ভালবাসতাম না। তা ছাড়া আর একটা কথাও তখন মনে হয়েছিল। আলেয়াকে বিয়ে করে কাছে পাবার কোনো আশাই আমার ছিল না, সুনন্দাকে বিয়ে না করলে আমাকে মায়ের মনস্তাপের কারণ হয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। সে শক্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম—স্বপ্নলোকের প্রিয়াকে বাস্তবের ধূলিধূমের মধ্যে ঠিক মতো পাওয়া যায় না, স্বপ্নলোকের নিষ্কলুষ বর্ণ-বিচিত্রার মধ্যেই তাকে মানায় ভাল, তার সঙ্গে কল্পনাবিহার করেই তৃপ্তি পেতে হবে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো যোগই থাকবে না—এসব যদি মানতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে বাস্তবের জন্য বাস্তবিক-সঙ্গিনীও একজন চাই। যেমন আমার কোথাও যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর

প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সঙ্গতি বা উপায় যদি না থাকে, তাহলে নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী অন্য কোনও শ্রেণীর টিকিট কিনতে হয়। আমি যে টিকিট কিনেছি তা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। সুনন্দাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না। আমি যদি আলেয়াকে না দেখতাম হয়তো তাকে প্রথম শ্রেণীতেই ফেলতাম। ভেবেছিলাম কোনো বিরোধ বাধবে না। কল্পলোকে থাকবে আলেয়া, আর মর্ত্যলোকে সুনন্দা। কেউ কারও আভাসটুকু পর্যন্ত জানতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। আজ এক নূতন দৃষ্টি লাভ করে অনুভব করছি যে মর্ত্যলোক আর কল্পলোক অভিন্ন নয়। শতদল কমলের মূল যেমন আলোকহীন পঙ্কস্তরে, কল্পলোকের মূলও তেমনি মর্ত্যের মৃত্তিকায়। শুধু তাই নয়, এক লোকের বার্তা রহস্যময় বেতার যোগে বাহিতও হয় অপরলোকে। সুনন্দা কেমন করে জানি না টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমার মন তাকে নিয়েই কৃতার্থ নয়, অন্য কোথাও সে আশ্রয় খুঁজছে। লাটাইটা তার হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘুড়িটা উড়ছে আকাশে। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হত সুতোটা যদি কেটে যায়! তার এই আশঙ্কা বাঙ্ময় হয়ে আমাকেও চঞ্চল করে তুলত। আমি তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারিনি যে তার সন্দেহটা অলীক। তার বাঁকা হাসি, তির্যক চাহনি, তার নানাবিধ কুটিল প্রশ্ন আমাকে যেন একটা অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিত অহরহ। শেষে একদিন সে আমাকে বললে, "আলেয়া বুঝি মেয়েটির নাম?" আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"তুমি কি করে জানলে!" মুচকি হেসে সুনন্দা বললে, "কাল স্বপ্নে সোহাগ করছিলে যে তাকে। সব শুনেছি আমি!" আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। ভয়ে নয়, আনন্দে। স্বপ্নের কথা আমার মনে ছিল না। স্বপ্নে যে আলেয়াকে আমি কাছে পেয়েছিলাম, আদর করেছিলাম—এর এ অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দিত হয়ে উঠল। সুনন্দাকে বোঝালাম যে আলেয়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, তাই বোধহয় স্বপ্নের ঘোরে এলোমেলো কিছু বলে থাকব। তারপর মুচকি হেসে বললাম, "তোমাকেই বারবার মনে পড়ছিল প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে। তোমার চাল-চলন, ধরন-ধারণ আলেয়ারই মতন তো। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দাও না! —যদি সোহাগ করে থাকি, তোমাকেই করেছি!" মেয়েরা কত সহজে ভোলে! আমার এই কথায় সুনন্দার চোখে-মুখে হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় পড়েছিলে প্রবন্ধটা আমাকে দেখিও তো।"

"লাইব্রেরিতে। আচ্ছা, নিয়ে আসব আজ—"

কথাটা মিছে নয়। সত্যিই লাইব্রেরিতে একখানা মাসিকপত্র ওলটাতে ওলটাতে 'আলেয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ একটা নজরে পড়েছিল একদিন। 'আলেয়া' নাম দেখে প্রবন্ধটা পড়েও ফেলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। সেই প্রবন্ধটা এনে দেখিয়ে দিলাম সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা এতে উচ্ছ্বসিত হল না, মুচকি হেসে চুপ করে রইল। বুঝতে পারলাম যে এতবড় যোগ্য একটা প্রমাণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না যদিও সে, কিন্তু মনের অবিশ্বাস তার ঘোচেনি। যে প্রমাণ অন্তর্যামীর বিশ্বাসযোগ্য, সে প্রমাণ আমি হাজির করতে পারিনি। এই ভাবেই চলছিল। আমি সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে স্বপ্নের ঘোরে আবার কিছু বেফাঁস বলে ফেলি, মনে হচ্ছিল কোনও উপায়ে যদি সুনন্দার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারি তাহলে হয়তো এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ একটা। বাড়িতেই বসেছিলাম এতদিন, কোনও চাকরি কিম্বা ব্যাবসাতে

ঢুকতে পারিনি। ভাল চাকরি পাওয়ার মতো ডিগ্রি বা মুরুব্বির জোর ছিল না, ব্যবসা করবার মতো টাকাও ছিল না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করা, আর বন্ধুবান্ধবদের কিছু একটা জোগাড় করে দেবার জন্যে চিঠি লেখা ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্য আর কোনো সজ্ঞান চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনও হয়নি, কারণ মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান ছিল বাড়িতে। হঠাৎ বাল্যবন্ধু চন্দ্রমোহনের চিঠি পেলাম একটা। আমার চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল, ভাই কমল-কিশোর, তুমি যদি কোলকাতায় এসে থাক তাহলে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমি নিজে যে ব্যবসাটা বছর কয়েক আগে ফেঁদেছিলাম সেটার উন্নতি হয়েছে কিছু। আমি একা আর সেটাকে সামলাতে পারছি না, আমাকে প্রায়ই বাইরে বেরুতে হয়। কোলকাতার কাজকর্ম দেখবার জন্য আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক খুঁজছি। তুমি যদি এসে সে ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। দেনা-পাওনার কথা সাক্ষাতে আলোচনা করব। তুমি একবার পার তো চলে এস। আমি অবিলম্বে চলে গেলাম। চন্দ্রমোহন আমাকে মাসিক দেড়শ টাকা বেতন দিয়ে কর্মচারী বাহাল করতে চেয়েছিল। আমি তাতে রাজি হইনি। মনে হল—বন্ধুর অধীনে চাকরি করলে বন্ধুত্বও থাকে না, চাকরিও থাকে না। আমি তাকে বললাম, তোমার ব্যবসা আমি যথাসাধ্য দেখব, কিন্তু তার জন্য মাইনে নেব না। তুমি যদি আমাকে রোজকারের অন্য কোনও উপায় দেখিয়ে দিতে পার তাহলেই যথেষ্ট হবে। চন্দ্রমোহন তাতেই রাজি হল, তারই সুপারিশে এবং চেষ্টায় অনেক দালালির কাজ পেয়েছি, ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইনসপেক্টর হয়েছি। চন্দ্রমোহনই আমাকে বউবাজারের এই বাসাটা দেখে দিয়েছে। সুনন্দার সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে বিস্মিতও হয়েছি একটু। কোলকাতায় এসেই সুনন্দাকে লিখেছিলাম—"মানুষের প্রতিভাকে যদি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে এই কোলকাতা শহরকে সেই ব্রহ্মার একটা সেরা সৃষ্টি বলতে হবে। সেই সেরা সৃষ্টির মাঝখানে বসে সেই সৃষ্টিকর্তাকে আমার অন্তরাত্মা যে প্রশ্ন করতে চাইছে তা যদি তোমাকে লিখে জানাই তুমি হেসে ঠিক উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বিশ্বাস কর সত্যিই আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—'আমার সুনন্দা কি রূপেগুণে কোনও নারীর চেয়ে কম? তা যদি না হয় তাহলে তোমার সেরা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী বলে সে অভিনন্দিত হচ্ছে না কেন! কেন সে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে?' সেই সৃষ্টি-কর্তাকে যদি সামনে পেতাম ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতাম তাকে। এই জন্যেই তার এই সেরা সৃষ্টিটির মধ্যে তাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি অহরহ। আমি উপার্জন করার জন্যে এখানে এসেছি বটে, আপাতদৃষ্টিতে ওইটেই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু আসলে আমি সন্ধান করছি সেই স্রষ্টাকে—যিনি যোগ্যতমকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেননি। দেখা পেলে আমি তাঁর জবাবদিহি চাইব। একটা মুশকিলে পড়েছি কিন্তু। তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে বসেও সে সৃষ্টির মর্মলোকে পৌঁছতে পারছি না আমি। একটা অদৃশ্য নদী এসে যেন উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে আমার পথরোধ করছে। আমি কিছুতেই ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে পৌঁছতে পারছি না, যেখানে পৌঁছলে আমার আশা আছে সেই সৃষ্টিকর্তার দেখা পাব। আধুনিক যুগে সৃষ্টিকর্তা কারা জান? আধুনিক যুগের মনীষীরা। পৌরাণিক চতুর্মুখ ব্রহ্মা এ যুগে লক্ষ-মুখ হয়ে বহুধা হয়েছেন। তাই এ যুগের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে যেতে হবে সেই সব মনীষীদের কাছে। কিন্তু আমি যেতে পারছি না। আমার দ্বিধা, আমার সঙ্কোচ, আমার মানসিক দৈন্য, এক কথায় আমার সর্ববিধ দারিদ্র্য এক

বিরাট নদীরূপে এসে আমার পথরোধ করছে। আমি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভীষণ নদীর তীরে। জানি না কোনো-দিন নদী পার হতে পারব কি না.....।" যে মনোভাব আমাকে এই চিঠি লিখতে প্রণোদিত করেছিল তা যদি কেউ প্রতারকের মনোভাব বলে মনে করেন আমি আপত্তি করব না। তাঁকে শুধু একটি জিনিস মনে রাখতে অনুরোধ করব যে পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু ও ভাব যেমন একাধিক উপাদানের সমন্বয়লীলা, আমার এই মনোভাবটিও তেমনি। আমি কথার পরে কথা গেঁথে সুনন্দাকে ঠকাতেই চাইনি কেবল, আমার অন্তরের একটা সত্য উপলব্ধিকেও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। বিচিত্র কোলকাতা শহরের বৃহত্ত আমাকে শুধু অভিভূতই করেনি, কৌতূহলীও করেছে, লজ্জিতও করেছে। কৌতূহলী হয়েছি এ যুগের স্রষ্টাদের—ব্রহ্মাদের পরিচয় লাভ করবার জন্য। বারম্বার মনে হয়েছে এই শহরের বিশালত্বের মধ্যেই আছেন তাঁরা। আমার সর্ববিধ দারিদ্র্য-জনিত অযোগ্যতাই তফাত করে রেখেছে আমাকে তাঁদের সান্নিধ্য থেকে। আমি যেন একটা দুস্তর নদীর এক তীরে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি অপর তীরের। পার হতে পারছি না। আমার এই সত্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ওই চিঠির ভাষায়। তবে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য যে যদি কোনো-দিন নদী পার হয়ে স্রষ্টাদের দেখা পাই তাহলে তাদের সুনন্দার কথা জিজ্ঞাসা করব না। আমি জিজ্ঞাসা করব, যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম তাকে পেলাম না কেন? তোমাদের চক্রান্তেই কি এই নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে? এ অন্যায়ের সুবিচার কি কোথাও আছে? আমার আলেয়া কি চিরকালই অন্ধকারের বুক আলো করবে? সত্যের দিবালোকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ কি কোনোদিনই সে পাবে না? হে আধুনিক যুগের সৃষ্টিকর্তারা, সত্যিই কি এর কোনো প্রতিকার নেই? তোমাদের যদি কোনও ক্ষমতা থাকে, আলেয়াকে আমার কাছে এনে দাও। এর জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে প্রস্তুত আছি আমি....।

বিস্মিত হলাম যখন আমার শ্যালক শণ্টু এসে হাজির হল একদিন। বলল—"দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে এই চিঠিটা আর এই পার্শেলটা দিয়েছেন।"

"পার্শেলে কি আছে?"

মুচকি হেসে শণ্টু বললে—"কোনো খাবার-টাবার করে পাঠিয়েছেন বোধ হয়। আমি কোলকাতা হয়ে কাশী যাব শুনে বললে তোর জামাইবাবুকে এটা দিয়ে যাস তাহলে। আমি আর দাঁড়াব না। আমার ট্রেন একটু পরেই।"

শণ্টু আর দাঁড়াল না।

চিঠিটা খুলে দেখলাম সুনন্দা লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি লিখেছ, ভাল করে বুঝতে পারিনি সবটা। 'দারিদ্র্য' কথাটা অবশ্য বুঝেছি। আমার সোনার হারটা আর অনন্ত দুটো তাই পাঠালাম শণ্টুর হাতে। ওসব পরবার শখ আমার মিটে গেছে। তোমার যদি উপকার হয় বিক্রি করে দিও...."

চিঠিটা পড়ে আর গয়নাগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সুনন্দা আমার চেয়ে অনেক বড়। মনে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তার গয়নাগুলো বিক্রি করেছি; সেদিন যে অত টাকা দিয়ে দূরবীণটা কিনে আনলাম তা ওই গয়না বিক্রির টাকাতেই!

কল্পলোকের মানসী দূরবীক্ষণের কাচের মধ্যে এসে ধরা দিলে অবশেষে। দূর এবং নিকটের

একটা অদ্ভুত সম্মিলন আমাকে দার্শনিক করে তুলল যদি বলি. তাহলে কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার ঠিক বর্ণনা দেওয়া হবে না। কারণ দার্শনিকরা তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যকে যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করেন আমার তা ছিল না। আমি নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করছিলাম. কিন্তু অবিচলিত থাকতে পারছিলাম না। অধীর হয়ে পড়ছিলাম। আলেয়াকে নানারূপে নানাভঙ্গীতে সুখদুঃখের বেশ-বিন্যাসের নানা আবেষ্টনীতে রোজই দেখা যেত আর রোজই মনে হত দূরবীণের মধ্যে দিয়ে যাকে পাচ্ছি সে তো আলেয়া নয়, সে তো আলেয়ার ছবি মাত্র, সিনেমার ছবির মতো আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত হলেও ওটা ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। একথা মনে হলেই কেমন যেন একটা অতৃপ্তি হত। এই অতৃপ্তিতে হঠাৎ একদিন নূতন রঙ লাগল। মনে হল আমার এই চোখ দুটোও তো দূরবীণের মতই যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্রের মাধ্যমে এতদিন আলেয়ার যে রূপ দেখেছি সেটাও তো ছবি। চক্ষু-দৃষ্ট ছবিটা যদি আমাকে তৃপ্ত করে না থাকে দূরবীক্ষণ দৃষ্ট ছবিটাই বা করবে না কেন? হঠাৎ মনে হল সতিাই কি আলেয়াকে দূর থেকে দেখে তৃপ্ত হয়েছিলাম? হইনি। আমি চেয়েছিলাম...যা চেয়েছিলাম তা এতই আদিম কামনা যে আধুনিক সমাজে তা উচ্চারণ করাও পাপ! দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট আলেয়ার ছবিতে আমার এই কামনার রঙ লেগে, আমার অতৃপ্তির সঙ্গে আমার বাসনা যুক্ত হয়ে—আমার কল্পনা আমাকে যে জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল সেখানে বউবাজার স্ট্রীট ছিল না. ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, ছিল সোনারকাঠি-রূপোরকাঠি, স্বর্ণলঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে সীতার জন্য রাম-বাবণের যুদ্ধ, আরও অনেক কিছু ছিল।....

সুতরাং শিখর সেনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কার মুখে যেন শুনেছিলাম যে সে এম.এস-সি. পাশ করেছে। বাল্য বন্ধুদের সম্বন্ধে এই ধরনের টুকরো-টাকরা খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অনেক সময়। শিখরের সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই ছিল না আমার। হঠাৎ চন্দ্রমোহন একদিন এসে বললে, "শিখরকে মনে আছে তোর?"

"আছে বই কি।"

"শুনছি তার মামা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ। আমি গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গিয়ে দেখলাম, মোহন মুদির দোকানে কেমিস্ট্রির ভাল ভাল বই সাজানো রয়েছে। অবাক হলাম একটু। জিগ্যেস করাতে মোহন মুদিই বললে যে শিখরবাবুকে তার মামা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বইগুলো এবং আরও অনেক খাতাপত্র সব শিখরবাবুর। তাঁর মামা আমাকে পুরাণো কাগজের দরে বিক্রি করে দিয়েছেন। শুনে আমার একটু কৌতূহল হল, আমি তার খাতাপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে তার পুরানো ডায়েরি পেলাম একখানা। সেইটে নিয়ে এসেছি—"

"শিখরের মামা তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন।"

"এ 'কেন'র উত্তর ওই 'ডায়েরি'তেই পাবে। কাল দিয়ে যাব খাতাগুলো তোমাকে।"

এর পরের অংশটুকু শিখরের জবানীতেই শুনুন।

তার ডায়েরি পাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিকেই আমি জীবন-যাত্রায় বাহন করেছি। পুরনো সেকেলে নড়বড়ে কুসংস্কারের গো-শকটে চড়ে যাঁরা অতি-আধুনিক মডেলের মোটরকারকে

গাল পাড়েন, তাঁরাই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছেন আমার জীবনপথের সঙ্গী। তাঁদের গালাগালি স্মিতমুখে আমি সহ্য করে যেতাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেঙে পড়ল। অবন্ধনাকে আমি কেন ভালোবেসেছি এর কোনো জবাব নেই। সকালে সূর্য ওঠে কেন, গাছে ফুল ফোটে কেন, সূর্য-ওঠা বা ফুলফোটা আমার মায়ের বা কয়েদী গাঙুলীর সম্মতি অনুসারে হচ্ছে না কেন, এসবেরও কোনও জবাব নেই। আশ্চর্যের বিষয় ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর অনিবার্য আবির্ভাব মা এবং কয়েদী গাঙুলী মেনে নিয়েছেন, আমার সঙ্গে অবন্ধনার প্রণয় ব্যাপারটা তাঁরা মানতে পারলেন না। যে অবন্ধনার সঙ্গে আমি একসঙ্গে কুলগাছে উঠেছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, খেয়েছি, শুয়েছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি, সেই অবন্ধনাকে আমি যখন বিয়ে করতে চাইলাম তখন আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। জাতের মিল নেই—বিয়ে হবে কি করে! অবন্ধনার অবশ্য বদনামও ছিল অনেক। কোনও সুন্দরী মেয়ে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁষা হয়, চটকদা শাড়ি পরে ছিমছাম হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় তাহলে তার আর ক্ষমা নেই। অবন্ধনা সত্যিই কাউকে গ্রাহ্য করে না। অবলীলাক্রমে সে বেড়িয়ে বেড়ায় নবীন দুলের সঙ্গে ঘাটে-মাঠে বনে-বাদাড়ে। আমি যখন ছুটিতে বাড়ি আসি, নিত্য নূতন শাড়ি পরে বেড়ায় আমার চোখের সামনে। আমার শোওয়ার ঘরের কাছে যে বেলগাছটা আছে তার উপর চড়ে গভীর রাত্রে আমার শোওয়ার ঘরে চলে আসতেও দ্বিধা করেনি সে কখনও। একদিন কানে দুটো চমৎকার দুল পরে এসে হাজির! হেসে বললে, "দুল পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো।"

"চমৎকার! কে দিলে দুল—"

"কেউ দেয়নি। আমি পিসীমার দুল জোড়া চুরি করে পরে এসেছি তোমাকে দেখাব বলে। বেশ মানিয়েছে, না?"

"চমৎকার মানিয়েছে।"

"কাল নবনে পদ্মপাতার পাপড়ি দিয়ে সুন্দর একটা টায়রা করে দিয়েছিল আমাকে। আবার করে দেবে বলেছে, তুমিও এস না কালিন্দীতে, অজস্র পদ্ম ফুটেছে সেখানে, কাল দুপুরে যেও, কেমন?"

"যাব—"

মাকে একদিন বললাম যে আমি অবন্ধনাকে বিয়ে করতে চাই। সংবাদটা যে তাঁর কর্ণে মধুবর্ষণ করল না, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

বললেন—"ওই ভাবুনে মেয়েকে বিয়ে করবি! বলিহারি তোর পছন্দকে! তা ছাড়া ওরা বামুন—বিয়ে দেবে কেন ওরা!"

"সে ঠিক ওর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব। তুমি মত দাও।"

মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে যা নীরব ভাষায় ব্যক্ত হল তা এই—এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করলাম, তুই শেষে আমার বুকে এত বড় শেল হানবি! মায়ের এ দৃষ্টি কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে পারল না। আমি কয়াধুনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। ভাবলাম, ওঁকে যদি রাজি করাতে পারি, মা-ও রাজি হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে কথাটা শুনে কয়াধু বোমার মতো ফেটে পড়বেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না তিনি। আমার সমস্ত কথাগুলি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে আগাগোড়া

শুনলেন। তাঁর কটা গোঁফদাড়ির জঙ্গলে সামান্য একটু চাঞ্চল্য জাগল শুধু। তার পর ধীরকণ্ঠে বললেন—"তোমার মতো সুপাত্রের হাতে ওকে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তুমি অব্রাহ্মণ, অবু কুলীন নীলাম্বর মুকুজ্যের মেয়ে। তোমাদের বিয়ে হওয়া তো সম্ভব নয়—"

বললাম—"আপনি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। শাস্ত্র ঘাঁটলে দেখতে পাবেন শাস্ত্রকাররা যে গান্ধর্ব-বিবাহ সমর্থন করেছেন তাতে জাতকুলের বিচার নেই।"

কয়েদী গাঙুলীর গোঁফ-দাঁড়িতে আর একবার ঢেউ খেলে গেল। বললেন—"আমরা গন্ধর্ব নই, গন্ধর্বলোকে বাসও করছি না, গান্ধর্ব বিবাহের কথা ভাবতেই পারি না আমরা। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের আইন মেনে চলতে হবে আমাদের—শাস্ত্রের এই উপদেশ।"

সবিনয়ে বললাম—"কিন্তু শাস্ত্রের চেয়ে কি মানুষ বড় নয়? আমি যখন অবুকে চাই, আর অবুও যখন আমাকে চায়—"

কয়াধু বাধা দিলেন এইখানে।

বললেন—"তুমি যে অবুকে চাও, তা তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি। কিন্তু অবু যে তোমাকে চায় একথা বুঝব কি করে?"

"অবু আমাকে বলেছে। আপনি তাকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন—"

কয়াধুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হল, গোঁফ-দাড়িগুলো নড়ে উঠল আর একবার।

বললেন—"বেশ, ভেবে দেখব। তুমি যাও এখন—"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অবু এসে হাজির আমার শোওয়ার ঘরে। রাত্রি তখন দেড়টা। দেখি তার শাড়ি ছিঁড়ে গেছে। গা ছড়ে গেছে সম্ভবত বেলের কাঁটায়।

বললাম—"এ কি—!"

"পালাই চল।"

"পালাব? তার মানে—"

"না পালালে পিসেমশাই মেরে ফেলবে আমাকে। এই দেখ—"

পিঠের কাপড় তুলে দেখালে সে। দেখলাম, কালো কালো দাগে সমস্ত পিঠটা ভরতি।

"কি এ?"

"বেত মেরেছে। কাল থেকে আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে বলেছে। পালাই চল।"

"কোথায় পালাব এখন।"

"যেদিকে দু' চোখ যায়। চল, ওঠ, আর দেরি কোরো না—"

আমি চুপ করে রইলাম।

"দেরি করছ কেন, ওঠ না।"

"এরকম ভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মানে—"

"আমি তাহলে চললুম।"

পরমুহূর্তেই বেরিয়ে গেল সে। পরদিন সকালে শোনা গেল নবীন দুলেও অন্তর্ধান করেছে।

১২-৮-৪০

গ্রামে কলেরা লেগেছে। চারদিকে লোক মরছে, মানুষ নয় যেন মাছি। নবীন দুলের মা বাবা ভাই বোন সব মরে গেল। কায়স্থ পাড়াতেও দু'জনের হয়েছে শুনলাম। আতঙ্কে থমথম

করছে চারদিক। কয়েদী গাঙুলী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন। বিলাসদের চণ্ডীমণ্ডপে অষ্টাপ্রহরব্যাপী কীর্তন শুরু হয়েছে। যেদিন মাকে অবুর সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলাম, সেদিন থেকে মা আর বাক্যালাপ করেননি আমার সঙ্গে। কাল থেকে শয্যা নিয়েছেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কেবল বলছেন, 'মা রক্ষা কর' 'মা রক্ষা কর'। আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। অবু কোথায় গেল? নবীন দুলের সঙ্গে পালিয়ে গেল? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গিয়ে ভালই করেছে। যা কলেরা লেগেছে চারদিকে....। কিন্তু গেল কোথায় সে! নবীন দুলের সঙ্গে....?

১৪-৮-৪০

কাল রাত্রে মা মারা গেছেন। মনে হল, কলেরার হাতে ইচ্ছে করে সঁপে দিলেন নিজেকে। নিজে হাতে আমি, যে খাবার জল রোজ ফুটিয়ে রাখি সে জল একদিনও স্পর্শ করেননি। পুকুরের জল খেতেন। মৃত্যুকালে তাঁর মুখে জল দিতে গেলাম, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য দেশে জন্মেছি। ভালবেসেছি—এই অপরাধে অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। ভালবাসার চেয়ে এখানে জাত বড়, জাতের পাঁচিল মা আর ছেলের মাঝখানেও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। অথচ এই দেশের লোকই আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমে গদগদ। সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে এ দেশে লেখা-পড়া শেখা বৃথা, মনে হচ্ছে আমি এদেশের কেউ নই.....

২০-৮-৪০

কাল রাত্রে মামা আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে জন্মের মতো আমাকে চলে যেতে হবে। তিনি আর আমাকে বাড়িতে স্থান দিতে পারবেন না। বললেন, আমাদের অনাচারেই নাকি গ্রামে এই ভয়ঙ্কর মহামারি শুরু হয়েছে। এ বিধাতার অভিশাপ। অবু গেছে, আমি না গেলে রুষ্ট বিধাতা তুষ্ট হবেন না। আজ একটু পরেই চলে যাব। এখান থেকে কিছুই নিয়ে যাব না। এমন কি এই ডায়েরির খাতাখানা পর্যন্ত নয়। এ খাতা মামার পয়সায় কেনা। একটি জামা, একটি কাপড় এবং জুতো জোড়াটি পরে বেরিয়ে যাব শুধু। স্বোপার্জিত অর্থে নিজের জামা-কাপড়-জুতো যখন কিনতে পারব, তখন ওগুলোও ফিরিয়ে দেব মামাকে। কোথায় যাব? কোলকাতাতেই একমাত্র স্থান, যেখানে রোজগার করবার সম্ভাবনা! অবুকেও খুঁজব। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে। মাপ চাইতে হবে তার কাছে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সে যখন আমার সাহায্য চেয়েছিল, আমি তাকে সাহায্য করিনি। ধিক্ আমার পৌরুষকে। অবুকে খুঁজে বার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য হবে এখন। ভাবছি—অবুর সন্ধানের সঙ্গে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাকে খাপ খাওয়াব কি করে? পুলিশে চাকরির চেষ্টা করলে কেমন হয়!

আমার এক সহপাঠীর দাদা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড় চাকরি করেন। ভাবছি তার সঙ্গে গিয়েই দেখা করব।.....

এইখানেই শিখরের ডায়েরি শেষ হয়েছে। কলেরার খবরটা জানতাম। কারণ কলেরা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবার কাশীতে চলে যায়; সুনন্দার বাপের বাড়ি কাশীতে। শিখরের খবর কিন্তু আর পাইনি। চেষ্টাও করিনি খবর নেবার। অথচ শিখরের সঙ্গে সত্যিই আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল, 'প্রগাঢ়' বিশেষণ দিয়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। কিন্তু

গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর তার সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহটা কেমন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মনের স্বভাব অতি বিচিত্র। কত তুচ্ছ জিনিস সে নিজের ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে, আবার কত বৃহৎ জিনিসকেও ফেলে দেয়। যে মানদণ্ড দিয়ে সে বাছাই করে তা অতি সূক্ষ্ম। নিজেও সব সময়ে বুঝতে পারি না তার মর্ম। আর একটা জিনিসও জীবনে লক্ষ্য করেছি। যাকে ভুলে গেছি সে অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আবার দেখা দেয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবটা যেন মৌন ব্যঙ্গের সুরে নীরব ভাষায় বলতে থাকে—'এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল!'....ফুরিয়ে যাওয়াটাই জীবনের ধর্ম। একটা জিনিসকে নিয়ে বেশীক্ষণ সে থাকতে চায় না; কারণ যা সে চায় একটা জিনিসের মধ্যে তাকে পায় না, সে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনুসন্ধান করে বেড়ায় তার কাম্যকে, আমরণ চলে এই অনুসন্ধান, মরণের পরও হয়তো চলে। আলেয়াও ফুরিয়ে যাবে না কি একদিন? মনে হয়, যাবে না। কারণ আমার অনুসন্ধানের নাগালের মধ্যে সে ধরাই দেবে না কখনও। তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল চির-উৎসুক থাকবে, সাধকের যেমন থাকে আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে। শিখরের ডায়েরিটা যেদিন চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেলাম, সেদিন শিখরই যেন নবরূপে আবির্ভূত হল আবার। তার সঙ্গে একটা একাত্মতাও অনুভব করলাম যেন। মনে হল আমরা দু'জনেই একপথের পথিক। একটু লজ্জাও হল। শিখর প্রেমের জন্য গৃহহারা হয়েছে, মায়ের স্নেহ হারিয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে অবন্ধনার খোঁজে।....আমি কি করেছি। নিজেকে আমি বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, প্রয়োজন হলে আমি ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম। প্রয়োজন হয়নি, তাই করিনি। কিন্তু আমার যুক্তি আমার কাছেই খেলো মনে হয়েছে বারবার। সুনন্দার মুখখানাও মানসপটে ফুটে উঠেছে, তার ভ্রূভঙ্গিতে চোখের চাহনিতে জেগেছে স-বিদ্রূপ প্রশ্ন "সত্যিই কি পারতে?".....স্বীকার করতে হয়েছে পারতাম না। আমি সুবিধাবাদী; শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখতে চেয়েছি।.....আমি শিখর সেনকে এর পর থেকে কিছুদিন যে রূপে কল্পনা করেছি, তা সন্ন্যাসীর রূপ। মনে হয়েছে মহাদেবের মতো অদৃশ্য সতীর শব বহন করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষময়। শোকোন্মত্ত দেবতার বেদনায় ত্রিভুবন কেঁপে উঠেছিল, শিখর সেনের শোক কাউকে বিচলিত করবে না। অন্তর্হিতা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করেছে একান্ন পীঠস্থান, অসংখ্য পূজারী আজও অর্ঘ্য বহন করে নিয়ে চলেছে সতীর স্মৃতিপূত পুণ্যতীর্থে, তাদের প্রণয়-কাহিনী আজও ধ্বনিত হচ্ছে সাহিত্যে, ধর্মে, তর্পণের বিবিধ মন্ত্র গাথায়। অবন্ধনাকে কিন্তু কেউ মনে করে রাখবে না। বিস্মৃতির অতলে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে, চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। সমাজেও তার স্থান হয়নি, মানুষের মনেও তার স্থান হবে না। তার আত্মীয়-স্বজনদের মনে একটা কুৎসিত ঘায়ের মতো সে দগ্‌দগ করবে কিছুদিন, লজ্জায় সেটাকে ঢেকে রাখবে সবাই, তারপর তা-ও আর থাকবে না। থাকবে শুধু একটা চিহ্ন, গৌরবের নয়, লজ্জার। শিখর সেনের মনের মন্দিরেই হয়তো তা জ্বলছে পবিত্র হোমশিখার মতো। গৃহহারা শিখর সেন কোথায় এখন....? শিখর সেনকে যতটুকু আমি দেখেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে যতটুকু খবর আমি পেয়েছিলাম, ততটুকুই আমার সম্বল ছিল। ওইটুকুকে কেন্দ্র করেই আমার কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল। অপ্রত্যাশিত কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। গুটি থেকে প্রজাপতির আবির্ভাব, বা ফুল থেকে ফুলের পরিণতি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হত—যদি না আমরা তা প্রত্যক্ষ করতাম। যে

শিখর সেনকে কল্পনায় শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম, তার খাকি হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা মূর্তি দেখে তাই চমকে গেলাম একদিন। আমার এক পিসতুতো ভাই শৈল পুলিশের চাকরি করত, সেই একদিন পরিচয় করিয়ে দিলে রাস্তায় হঠাৎ। শিখর সেন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছে। অবন্ধনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না! সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

।। উনিশ ।।

নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার আর সিংহ-গর্জনে কম্পিত হইতেছিল না। যে স্থানে বাণী-কারাগারে সিংহরূপী পিতামহ গর্জন করিতেছিলেন, সে স্থান অসংখ্য খদ্যোত-আলোকে খচিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন স্রষ্টার অন্তরের অনন্ত আকুতি অসংখ্য কিরণ-কণিকায় স্পন্দিত হইতেছে, অনির্বচনীয় বুঝি আলোকের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সহসা সেই আলোক-বিন্দুগুলি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। পিতামহ কহিলেন—"বাণী, তোমার অনুরোধ আমি বারবার লঙ্ঘন করে ফেলছি। আমি কিছুতেই আমার পুরাতন সৃষ্টির প্রতি-মুহূর্তের বিবর্তনকে অনুসরণ করতে পারছি না। আমার কল্পনা কেবলই আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। সুন্দরানন্দ যে সিংহটিকে বন্দী করে রেখেছে, তাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বন্দিত্বের বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ তর্জন-গর্জনের মধ্যে তার প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির যে নিষ্ফল আক্রোশ, তা নিজের মধ্যে অনুভব করলে বুঝি অভূতপূর্ব কিছু একটা পাব। কিছুই পেলাম না, মনে হচ্ছে সময় নষ্ট হল খালি। কেন এরকম হল বল তো?"

কেহ কোনও উত্তর দিল না।

"বাণী, তুমি কোথা গেলে।"

নিবিড় অরণ্যের বনস্পতিকুল যেন জাগিয়া উঠিল। তাহাদের শাখায় পল্লবে পত্রে-কিশলয়ে মৃদু মর্মরধ্বনিও শোনা গেল। বাণী বাঙ্ময়ী হইলেন।

"কোথাও যাইনি।"

"আমি যা বললাম শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"উত্তরে কিছু বললে না যে!"

"আসল সিংহের নিদারুণ বন্দিত্ব—আর নকল সিংহের বন্দিত্বের অভিনয় কি এক হতে পারে কখনও। আপনি খেলা করছিলেন। এ খেলার শখ যদি মিটে থাকে, চলুন আর একটা খেলায় মাতা যাক।"

"মনে হচ্ছে চটেছ। কিন্তু আমি বন্দী-সিংহ সাজতে চেয়েছিলাম কেন তা বোধহয় বুঝতে পারনি! স্বৈরচর সৃষ্টি করবার কল্পনাটা এখনও মাঝে মাঝে উতলা করছে আমাকে। মনে হচ্ছিল ওই সিংহটার যদি মশা হবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি ওকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারে? সিংহ সেজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম, সত্যি সত্যি কতটা কষ্ট ও ভোগ করছে। কিন্তু কিছুই তো অনুভব করতে পারলাম না। আমার বরং বেশ মজা লাগছিল।"

"তা তো লাগবেই। আপনি যে অভিনয় করছিলেন। তা ছাড়া আপনার মনও কি এখানে ছিল সব সময়? আপনি শিখর সেনের গল্পটা কেমন লেখা হচ্ছে তা জানবার জন্য বারবার চলে যাচ্ছিলেন যে—"

"তুমি টের পেয়েছ সেটা তাহলে—"

"পাব না? আমিও যে যাচ্ছিলাম।"

"সত্যি কথা বলব তাহলে? শুধু কবির মনে নয়, বহু স্থানে গিয়েছিলাম আমি। কিশলয়-কোরকে, ফুলের কুঁড়িতে, ফলের সম্ভাবনায় শিল্পীর স্বপ্নে—যেখানে যত সৃষ্টির স্বপ্ন মূর্ত হচ্ছে, সেখানেই গিয়েছিলাম আমি।"

"সব জানি।"

"তুমি জানবে না? অথচ ধমকাচ্ছ আমাকে, কি আশ্চর্য!"

অরণ্যের মর্মরধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। অরণ্যের প্রান্তে অন্ধকারের বুকে একটি মনোহর আলেয়া মূর্ত হইল সহসা। অরণ্যপ্রান্ত হইতে ক্রমশ তাহা সরিয়া যাইতে লাগিল। খদ্যোতকুল আকুল হইয়া উঠিল।

"তুমি কোথায় চলেছ বাণী?"

"চলুন সুন্দরানন্দের আসল সিংহটাকে দেখে আসা যাক। চার্বাকের খবরটাও পাওয়া যাবে।"

"সে তো জালার ভিতর বসে আছে। জালা থেকে বেরুক আগে।"

"এখুনি বেরুবে।"

"চল তাহলে।"

সুন্দরানন্দ যে অরণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন সেখানে কোনও প্রাসাদ তো ছিলই না—সুরক্ষিত কোনও গৃহও ছিল না। প্রথমে অরণ্যের কিছু অংশ পরিষ্কৃত করাইয়া মৃগয়ার জন্য কয়েকটি শিবির ফেলা হইয়াছিল মাত্র। বহুকাল পূর্বে যে বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে নর্মদাতীরে সুন্দরানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, কুম্ভীর শিকারে যাঁহার অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে সিংহের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং পুনরায় যে তাঁহার সহিত দেখা হইয়া যাইবে, তাহা সুন্দরানন্দ প্রত্যাশা করেন নাই। গ্রীস দেশের সেই রাজপুত্র যে কিরাতের বেশে একটি হরিণ ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা সত্যই তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিরাতের দলে কিরাতের বেশে মির্মিরকে প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। একটি বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় কিরাতের অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং নীলচক্ষু তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল মাত্র, বিস্মৃতির কুয়াশা কাটে নাই। সহসা মির্মির যখন পালক-নির্মিত উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যখন তাঁহার কুঞ্চিত তাম্রবর্ণ কেশদাম ললাটে স্কন্ধদেশে আলুলায়িত হইয়া পড়িল, সকৌতুক হাসিতে যখন তাঁহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সুন্দরানন্দ মির্মিরকে চিনিতে পারিলেন।

"বিদেশী, আপনি এখানে হঠাৎ!"

"হঠাৎ নয়, অনেক দিন হল এসেছি এক সিংহের সন্ধানে।"

"সিংহের সন্ধানে?"

"হ্যাঁ। রাজপুতানার মরুভূমিতে প্রথমে তাকে দেখি, তারপর থেকে তার অনুসরণ করছি, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না! মনে হচ্ছে—সে যেন আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে—"

"এই অরণ্যে এসেছে সে সিংহ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার লক্ষ্য তো অব্যর্থ। এখনও তাকে আপনি মারতে পারেননি?"

"আমি তাকে মারতে চাই না, বন্দী করতে চাই।"

"ও।"

সুন্দরানন্দ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ পোষবার শখ আছে নাকি?"

"আমি আর কখনও সিংহ পুষিনি। এই প্রথম শখ হয়েছে পোষবার। শুধু পোষবার নয়, তাকে নিয়ে অবসর-বিনোদন করবার। আমার জীবনে অবসর প্রচুর, সে অবসরটাকে আনন্দময় করাটাই আমার জীবনের প্রধান সমস্যা। আগে অনেক কিছু করেছি, এবার নতুন কিছু করে দেখি। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন কুমার। আপনার সাহায্য না পেলে এ সিংহকে আমি ধরতে পারব না।"

"কি করতে হবে বলুন।"

"এই কিরাতদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে বাস করছি। তাদের মুখেই শুনলাম তারা আপনাকে কয়েকটি হরিণ ধরে দিয়েছে। আমার অনুরোধ—অন্তত একটি হরিণ আমাকে দিন।"

"হরিণ নিয়ে কি করবেন?"

"টোপ স্বরূপ ব্যবহার করব।"

"বেশ তো, সে আর বেশী কথা কি। আজই নেবেন। আর একটা কথা, আমি যখন এসে গেছি তখন আপনি আর কিরাতদের মধ্যেই বা থাকবেন কেন, আমারই আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"কিরাতদের মধ্যে আমি আনন্দেই আছি কুমার। তবে আপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার স্পর্ধা আমার নেই।"

মির্মির সেইদিনই আসিয়া কুমার সুন্দরানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারের শিকার-শিবিরে সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিল না, সুতরাং সুরঙ্গমার সহিত মির্মিরের আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না। আলাপটা কুমারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করাইয়া দিয়াছিলেন।

"ইনি আমার অবসর বিনোদনের উপলক্ষ। মানুষের রুচি বিভিন্ন, আপনার পছন্দ সিংহ, আমার পছন্দ অপ্সরী—"

"আমারও অপ্সরী ছিল কুমার। এখনও সে আছে, কিন্তু বাইরে নেই। ইন্দ্রিয়লোক থেকে তাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি।"

"বিসর্জন দিয়েছেন? মানে?"

"ত্যাগ করেছি।"

"ও।"

সুরঙ্গমার নয়নে একটি অর্থপূর্ণ হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। সুন্দরানন্দের অধরেও মৃদু

হাস্য ফুটিয়া উঠিল। যে সুবিদিত কারণে নারীকে পুরুষেরা সাধারণত ত্যাগ করে, তাহাই উভয়ে চিত্তকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া মির্মির কহিলেন—"আমার অপ্সরীকে আমি কেন ত্যাগ করেছি তার ইতিহাস আপনাদের আর একদিন শোনাব। এখন নয়। একদিন গভীর রাত্রে সে কথা বলব। গভীর রাত্রেই আমরা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারি। দিবসের দৃশ্যমান জগত তাকে আবৃত করে রাখে, দিবালোকে নিখিলের মর্মবাণী আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, তখন আমাদের মনে হয় যে আহরণই বুঝি পরমার্থ, আমরা তখন ভুলে যাই যে ত্যাগ মানেই আহরণ। তাই এখন সে কথা বলব না, বলব গভীর রাত্রে।"

মির্মিরের স্তান-গম্ভীর কথা শুনিয়া সুরঙ্গমা ও সুন্দরানন্দ শুধু বিস্মিত নয়, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"বেশ, তাই হবে। এখন আপনার সিংহ ধরবার জন্য কি কি আয়োজন করতে হবে বলুন।"

"সিংহটা কোন্ অঞ্চলে আছে তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে।"

"তা তো ঠিকই। কি করে নির্ণয় হবে সেটা?"

"গর্জন শুনে।"

"আমরা তো কোনও গর্জন শুনিনি কোনও দিন।"

"আমি শুনেছি। গভীর রাত্রে মেঘগর্জনের মতো সে গর্জন। একদিন মাত্র শুনেছিলাম, তাই কোন অঞ্চলে সে আছে ঠিক করতে পারিনি। ঠিক করতে দেরী হবে না। ফাঁদটা আর খাঁচাটা আগে তৈরী হয়ে যাক, তারপর তাকে ডেকে আনব এখানে।"

"ডেকে আনবেন?"

"হ্যাঁ। সিংহের ডাক ডাকতে পারি আমি। সিংহিনীর ডাক ডাকতে হবে, তাহলেই সে ছুটে আসবে।"

মির্মিরের মুখমণ্ডল হাস্যমণ্ডিত হইয়া গেল।

সুরঙ্গমা সলজ্জ দৃষ্টিতে সুন্দরানন্দের দিকে চাহিতেই সুন্দরানন্দ বলিলেন—"মানুষই প্রিয়ার ডাকে আসে জানি, সিংহও আসে না কি?"

"সিংহই আসে, মানুষই বরং না আসতে পারে। সিংহের না এসে উপায় নেই, তাকে আসতেই হবে।"

"কেন?"

"কারণ সে পশু। স্বাধীনভাবে চলবার তার শক্তি নেই। ভয়ঙ্কর কিছু দেখলে তাকে ভয় পেতেই হবে, ক্ষুধিত হলে সে খাদ্য অন্বেষণ করবেই, ঘুমোবার সময় তাকে ঘুমোতেই হবে, জাগবার সময় তাকে জাগতেই হবে, সিংহিনীর প্রণয়-আহ্বান শুনলে তাকে আসতেই হবে ছুটে। মানুষের মতো যা খুশী করবার ক্ষমতা নেই তার। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তো তফাৎ।"

সুরঙ্গমা বলিলেন—"মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে বলছেন?"

"কেউ যুক্তি মেনে চলে, কেউ আবার খেয়াল অনুসারেও চলে। পশুর মতো বাঁধাধরা একই পথে সবাই চলে না।"

"চলে বই কি। তা না হলে সমাজ টিকে আছে কি করে। সবাই নিজের মতে চললে কি সমাজ টিকত?"

"এটা ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু তবু আপনাকে মানতে হবে যে মানুষই যা-খুশী করতে পারে, পশু পারে না। মানুষের সামাজিক নিয়মও বদলাচ্ছে বারবার, কারণ নিয়ম বদলাবার ক্ষমতা মানুষেরই আছে, পশুর নেই।"

"কিন্তু সে ক্ষমতার ব্যবহার কি মানুষ করে? আমি যা-খুশী করছি, এই ধারণার মোহই তাকে অন্ধ করে ফেলে না কি?"

মির্মির মুগ্ধদৃষ্টিতে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সুন্দরানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইনি শুধু দেহে নন, মনেও রূপসী। অনেক ফুলের রূপ থাকে কিন্তু সুগন্ধ থাকে না, আবার রূপ নেই সৌরভ আছে এমন ফুলও বিরল নয়। কিন্তু রূপে গুণে সমান এমন ফুল দুর্লভ। দেবতার নির্মাল্য হবার উপযুক্ত এ ফুল। কুমার সুন্দরানন্দ, আপনি ভাগ্যবান।"

কুমার সুন্দরানন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন ক্ষণকাল, তাহার পর বলিলেন—"নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে করছি আপনার মতো একজন রসিকের সান্নিধ্যলাভ করে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার 'মির্মির' নামটা কি আপনার স্বদেশী নাম?"

"না। আমার স্বদেশী নাম হেরোডোটাস। মির্মির নামটা আমি নিজে গ্রহণ করেছি সব দেশে ঘুরে বেড়াবার সুবিধা হবে বলে।"

"ওটা কি সংস্কৃত শব্দ?"

"কোনও ভাষা থেকে শব্দটা আমি বাছিনি। হয় তো ওর কোনো মানেই নেই। কথাটা নিজেই আমি বানিয়েছি। হঠাৎ আমার নামের কথাটা আপনার মনে জাগল কেন কুমার?"

"শব্দটার কোনও অর্থবোধ হচ্ছিল না বলে মনে হল, হয় তো ওটা বিদেশী শব্দ।"

মির্মির হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন,—"না, ওটা কোনো ভাষারই শব্দ নয়। ও শব্দ আমারই সৃষ্টি এবং ওর অর্থ আমি। কিন্তু বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। ফাঁদটা তৈরি করবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলম্ব হলে সিংহ পালাবে।"

"কি করব বলুন—"

"প্রকাণ্ড গভীর একটা গর্ত খুঁড়তে হবে। আর সেই গর্তটাকে ঘিরতে হবে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে, বেশ মজবুত করে। তারপর সেটার উপর লতাপাতা খড় দিয়ে চাল তৈরি করতে হবে একটা। দরজাও থাকবে। অর্থাৎ দূর থেকে মনে হবে যেন একটা ঘর। ঘরই হবে সেটা, কেবল তার মেঝেটা হবে প্রকাণ্ড গহ্বর। আর সেই গহ্বরের তলায় থাকবে মোটা দড়ির তৈরি জাল একটা। জালের খুঁটিগুলো থাকবে উপরে অর্থাৎ আমাদের আয়ত্তাধীন। হরিণটাকে ঘরের ভিতরে একটা দেওয়ালে এমন ভাবে আমরা বাঁধব যেন মনে হবে সেটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শিং, পা, আর পিঠ সবই বাঁধতে হবে দেওয়ালের সঙ্গে। এমন জায়গায় বাঁধতে হবে যেন হরিণটাকে দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় বাইরে থেকে। দরজার একটা কপাটও থাকবে, আর সেটা ঝুলে থাকবে ওপর থেকে, যে দড়ি থেকে ঝুলে থাকবে সেটাও থাকবে বাইরে অর্থাৎ আমাদের নাগালের মধ্যে। সিংহ ঘরের ভিতর ঢুকলেই দড়িটা কেটে দেব আমরা—আর কপাটটা বন্ধ হয়ে যাবে।"

"সিংহটা ঢুকবে হরিণের লোভে?"

"নিশ্চয়। আর আসবে সিংহিনীর ডাক শুনে। অর্থাৎ লোভ আর কাম এই দুই রিপুই তাকে বন্দী করবে, আমরা উপলক্ষ মাত্র—"

মির্মিরের চক্ষুদুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে দৃষ্টি তিনি সুরঙ্গমার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

সুন্দরানন্দ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"বেশ, কাল থেকেই লোক লাগাচ্ছি। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ফাঁদ তৈরি হয়ে যাবে।"

কুমার সুন্দরানন্দের আদেশে এবং মির্মিরের তত্ত্বাবধানে কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহের ফাঁদ প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার পর প্রায় প্রতি রাত্রেই মির্মির গভীর রাত্রে বাহির হইয়া যাইতেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া সিংহিনীর ডাক ডাকিতেন। সত্যই মনে হইত যেন একটা আকুল কামনা নিবিড় অরণ্যের অন্ধকারে গভীর নিশীথিনীর বুক চিরিয়া আর্তনাদ করিতেছে। সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া প্রতিরাত্রেই মির্মির ফিরিয়া আসিতেন এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেন প্রত্যুত্তরে সিংহের ডাক শোনা যায় কি না। উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি কিছুই শোনা গেল না।

সেদিন গভীর রাত্রে মির্মির উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন' সমস্ত অরণ্য মুখরিত করিয়া ঝিল্লীধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মাঝে মাঝে বন্য-পেচকের কর্কশ চীৎকার, আকাশচারী দ্রুতগামী হংসদলের সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত কলকণ্ঠ-নিনাদ, জম্বুকণ্ঠের ক্ষণস্থায়ী ঐক্যতান ঝিল্লী ঝঙ্কারকে মাঝে মাঝে বিঘ্নিত করিতেছিল বটে, কিন্তু বিঘ্নিত করিয়াই যেন তাহাকে আরও স্পষ্ট, আরও জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল, উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহা যেন আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। এই ঝিল্লী ঝঙ্কারের সহিত মিশিতেছিল মৃদু বীণার ঝঙ্কার। পাশের ঘরে বসিয়া সুরঙ্গমা মালকোষ আলাপ করিতেছিল। মির্মির মনে মনে উৎকর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া তাহা মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। কুমার সুন্দরানন্দ সকৌতুকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কুমার মির্মির, আপনি কি সিংহ-গর্জন শোনবার জন্যই অতটা একাগ্র হয়েছেন?"

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—"না। সিংহগর্জন এত স্থূল যে তা শোনবার জন্য একাগ্র হতে হয় না। সে গর্জন বিরাট হাতুড়ির মতো এসে চেতনার উপর আঘাত করবে। আমি ঝঙ্কারময়ী নিশীথিনীর অন্তরের ভাষা শুনছিলাম।"

"ও! কি রকম সে ভাষা! আমি একটু জানতে পারি কি?"

"আত্মসমর্পণের ভাষা। সমস্ত পৃথিবী থেকে অহোরাত্র এই ভাষা উঠছে আকাশের দিকে। দিনের বেলা সেটা ভাল বুঝতে পারি না। গভীর রাত্রিতে একটু চেষ্টা করলে সেটা বোঝা যায়।"

"ও, আপনি একদিন বলেছিলেন বটে এই ধরনের একটা কথা। আপনার অপ্সরীকে কোথায় কেন ত্যাগ করেছিলেন সে কাহিনীও শোনাবেন বলেছিলেন একদিন গভীর নিশীথে। শোনাবেন নাকি এখন—"

"তা শোনাতে পারি। কিন্তু তার আগে মনটাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। না নিলে এর মাধুর্য, এর মহিমা ঠিক বোঝা যাবে না।"

"আপনিই মনটাকে প্রস্তুত করে দিন। সুরঙ্গমাকে ডাকব?"

"ডাকুন—"

বীণা হস্তে সুরঙ্গমা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিতেই মির্মির বলিলেন—"আপনি কুমারের পাশে বসে বীণায় মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিন। তাহলে আমার বক্তব্যের পটভূমিকাটা আরও মনোরম হবে।"

কুমার সুন্দরানন্দের মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হইল, সুরঙ্গমাও হাসিমুখে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

মির্মির বলিতেছিলেন—"তার নাম ছিল তানে। আমার ভৃত্য আবাস তাকে কিনে এনেছিল সিরিয়ার হাট থেকে। আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা থিওনি মারা যাবার পর একটি পরিচারিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, আবাসকে তাই সিরিয়ার হাটে পাঠিয়েছিলাম। পঞ্চদশী তানেকে কিনে নিয়ে এল সে। রজনীগন্ধার শুভ্রতা, সৌরভ আর তনিমার সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মদিরতা মেশালে যা হয়, তানে তাই ছিল। দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম, মনে হল ওলিম্পাসের কোনও দেবী বুঝি ছলনা করতে এসেছেন আমাকে, হয় তো আফ্রোদিতে নিজেই এসেছেন। আবাসকে বললাম—তোমার রসবোধের উপর আমার আস্থা ছিল, তুমি যে ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য রজনীগন্ধার ডাল নিয়ে আসবে, তা কল্পনা করিনি। আবার বললে—ওকে দেখে ভাল লাগল তাই, নিয়ে এসেছি। কাফ্রী ওথাকেও এনেছি, সে-ই পরিচারিকার কাজ করবে। প্রশ্ন করলাম—তানে করবে কি? আবাস মৃদু হেসে বললে—ও বিশেষ কিছু করবে না, ও আশে-পাশে থাকবে খালি, যদি আদেশ করেন গান করতে পারে মাঝে মাঝে। তানের রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, গান শুনে আত্মহারা হলাম। তারপর একবছর, দু'বছর, তিন বছর কোথা দিয়ে দিয়ে কেটে গেল স্বপ্নের মতো। মনে হল ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ, হারিয়ে ফেলছি নিজেকে, তারপর আবার সহসা একদিন অনুভব করলাম অবসাদ এসেছে। আবিষ্কার করলাম, তানের পদশব্দ শোনবার জন্যে আর আমি উৎকর্ণ নই, তার তন্বী দেহকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধবার আগ্রহ আর আমার নেই। অপসৃয়মান রঙীন মেঘের মতো তানে ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তানেও সেটা অনুভব করেছিল সম্ভবত। সে একদিন বললে এসে—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই। মাকে অনেকদিন দেখিনি, দেখে আসি। তানের মা-বাবা আছেন কিনা, কোথায় তাঁদের বাড়ি, যে মেয়েকে তাঁরা হাটে বিক্রী করে দিয়েছেন, তার প্রতি তাঁদের স্নেহ অটুট আছে কি নেই—এসব কোনও প্রশ্নই আমি করলাম না। তাকে ছুটি দিলাম। সে যখন চলে গেল তখনই যেন তাকে আবার পেলাম, তার স্বপ্ন, তার অভাব, তার অনবদ্য রূপের শত সহস্র প্রকাশ আমার চিত্তকে আকুল করে তুলল। মনে হতে লাগল, সে যখন কাছে ছিল তখন তাকে এমন ভাবে পাইনি। সেই সময় ঠিক আর একটা জিনিসও আমার চোখে পড়ল। চোখের সামনে সেটা চিরকালই ঘটছিল, কিন্তু দেখতে পাইনি...."

মির্মির নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, মনে হইল তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা নবদৃষ্টিলাভ করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, যেন মনে মনে তাহাই আবার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্ধকার অরণ্যের ঝিল্লীকুল আকুল ঝঙ্কারে যেন সেই দর্শনের পটভূমিকা সৃজন করিতেছে।

কৌতূহলী সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল—"কি চোখে পড়ল আপনার?"

"শেফালী ফুলের গাছ একটা। আমি যে ঘরে বসতাম, সেই ঘরের জানালা দিয়ে সম্পূর্ণ গাছটা দেখা যেত। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম গাছের তলায় অজস্র ফুল পড়ে রয়েছে। রোজই পড়ে থাকে, কিন্তু সেদিন তাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম। মনে হল ওই শেফালী তরুটি যে ফুলগুলিকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত শত শত বৃন্ত বন্ধনে সাগ্রহে বেঁধে

রেখেছিল. সেগুলিকে কত সহজে ত্যাগ করেছে। এই যে ওর এতগুলি সন্ততির শবদেহে ওর পদপ্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, এর জন্য ওকে তো শোকাকুল মনে হচ্ছে না, ওর শাখাপত্রগুলি তো অবনমিত হয়নি! বাতাসের হিল্লোলে ও আগেও যেমন আন্দোলিত ছিল, এখনও তেমনি আছে। তারপরই লক্ষ্য করলাম ওর শাখায় শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি রয়েছে, একটু পরেই সেগুলি ফুল হয়ে ফুটবে। মনে হল রহস্যটা যেন বুঝলাম একটু, ত্যাগ করতে পারে বলেই গাছ নূতন ফুলের স্বপ্নে আকুল হতে পারে। পুরাতন ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে পারত না। যে ফুলগুলোকে ও ত্যাগ করতে পেরেছে তারাই আবার ফিরে আসছে ওর নবমুকুলের স্বপ্নে, নবকুসুমের বিকাশে। পুরানো ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে এসব হত কি? বিচ্ছেদ না থাকলে কি মিলন মধুর হয়? ত্যাগ না করলে কি ভোগের আনন্দ পাওয়া যায়? শেফালী তরুর ভিতর আমি সেদিন যে সত্যের ইঙ্গিত পেলাম, তা নিজের মধ্যেই আমি স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করছিলাম তানের বিরহ-বেদনার নিগূঢ়-নিবিড় অনুভূতিতে। বুঝতে পারছিলাম তানে দূরে চলে গেছে বলেই আরও নিকটে পেয়েছি তাকে....''

পুনরায় মির্মির নীরব হইলেন। ঝিল্লী-ঝনৎকার সহসা যেন বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল অন্ধকারের নিবিড়তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একদল উন্মত্ত সুর আকুলভাবে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে, যাহা খুঁজিতেছে তাহা না পাইলে বুঝি তাহাদের জীবনান্ত ঘটিবে। সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, মির্মিরের নয়ন দুইটি ক্রমশ নিমীলিত হইতেছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিমীলিত নয়নে তিনিও আকুল ঝিল্লীঝঙ্কারের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিতেছেন; তাঁহারা সোৎসুকে মির্মিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মির্মির অবশেষে অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন. "সেদিনকার রাত্রিও এমনি ঝিল্লী-মুখরিত ছিল....."

"কি ঘটেছিল সে রাত্রে?"—সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"একবাহু ঋষির দেখা পেয়েছিলাম। গোড়া থেকে ঘটনাটা বলতে হবে। তানের বিচ্ছেদে যখন আমি অধীর হয়ে উঠেছি, তখন সে হঠাৎ ফিরে এল একদিন, আরো মনোহারিণী হয়ে ফিরে এল। মনে হতে লাগল অপূর্ব স্ফটিক পাত্রটি এতকাল শূন্য ছিল, এবার পূর্ণ হয়েছে, সুরায় না অমৃতে, তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল সুরায়, কিন্তু পরে সে ভুল ভেঙেছিল। পরে বুঝেছিলাম তানে মানবী নয়, দেবী। তার উৎফুল্ল যৌবন যে মাধুর্যরসে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল তা মদিরা নয় অমৃত। তানে আসবার কিছুদিন পরেই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম তাকে নিয়ে। বাল্যকাল থেকেই দেশভ্রমণ করা আমার নেশা। আর তোমাদের দেশ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে আমাকে বাল্যকাল থেকে। অশ্ববাহিত রথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা দু'জনে। স্থলপথ শেষ হয়ে গেল, শুরু হল জলপথ। সমুদ্রতীরে কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর অর্ণবপোত পাওয়া গেল একটা। শুনলাম সেটা সিরিয়া যাবে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। তাতেই চড়ে বসলাম। তানে বললে, সিরিয়া থেকে একটা স্থলপথ পারস্য অভিমুখে গেছে। সে পথে ইচ্ছা করলে আমরা পারস্যে যেতে পারি। পারস্য থেকে গান্ধার হয়ে আর্যাবর্তে যাওয়া যাবে। তাই হল। পথে যে কত কি দেখলাম, কত কি অনুভব করলাম, কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে আর তানেকে আবিষ্কার করলাম তার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই আমার। সে চেষ্টাও করব না, কারণ আমার মানস কাননে যে সব স্মৃতি অপূর্ব ফুলের মতো ফুটে আছে সেখান থেকে তাদের তুলে এনে বাইরে ঘাঁটাঘাঁটি করবার প্রবৃত্তি নেই। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে কখনও

পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও শকটে, কখনও দোলায়, কখনও উষ্ট্রবাহিত হয়ে; কখনও নৌকায়, পথে-প্রান্তরে-মরুভূমিতে, অরণ্যে-কাননে, নদীতে-সমুদ্রে আমরা দু'জনে যে অমৃত অন্বেষণ করেছিলাম তার ভাণ্ডার আজও অক্ষয় হয়ে আছে, কখনও নিঃশেষ হবে না। শেফালী গাছের শাখায় শাখায় রূপের স্বপ্ন যেমন নিঃশেষ হয় না....''

মির্মির আবার নীরব হইলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

''অবশেষে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলাম আমরা। হিমালয়ের এক উপত্যকাতেই শবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। তখন থেকেই আমি ভালবেসেছি এই বন্য ব্যাধদের। তাদের সরল সাহস, অকপট আতিথেয়তায় আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। এখানে এসে তাই ওদেরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। হিমালয়ের বনাকীর্ণ উপত্যকায় পশু চর্মে আর পাখির পালকে দেহ আবৃত করে ধনুর্বাণ দিয়ে পশুপক্ষী শিকার করে, পাহাড়ি ঝরনায় স্নান করে, শিখর থেকে শিকারান্তরে ভ্রমণ করে আমি আর তানে যে উদ্দাম বন্যজীবন যাপন করছিলাম তাতে সহসা একদিন ছেদ পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা বাঘের সন্ধান করছিলাম আমরা— আমি আর তানে। আমার হাতে ছিল ভল্ল, তানের হাতে ছিল ধনুর্বাণ। তানেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেবী আরটেমিস সশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন—''

''আরটেমিস কি ধরনের দেবী?''—উৎসুককণ্ঠে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

''আরটেমিস? ঠিক ও ধরনের দেবী আপনাদের মধ্যে আছে কিনা জানি না। আরটেমিস জীব হনন করেন, জীব পালনও করেন। তিনি রূপসী, তাঁকে দেখে তাঁর প্রণয়ে পড়ে অনেকে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও প্রণয়-পাশে বাঁধা পড়েননি। কেউ কেউ বলে—তিনি ঘুমন্ত এনডিমিয়নকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আমারও মনে হয় ওটা ঠিক নয়। আরটেমিস চিরযৌবনা, চিরকুমারী, চিরপ্রদীপ্তা, কানন কান্তারের বিজয়িনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এইরূপেই তাঁকে কল্পনা করতে ভাল লাগে। তানেকে দেখে আমার মাঝে মাঝে আরটেমিসের কথা মনে হত। কিন্তু সেটা আমার ভুল, তানে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল আমার কাছে।....''

পুনরায় মির্মির নীরব হইলেন। সুন্দরানন্দ কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে দিলেন না।

''তারপর কি হল। বাঘের অনুসরণ করতে করতে কোথায় গিয়ে পড়লেন আপনারা—?''

''অনুসরণ ঠিক নয়, সন্ধান করছিলাম আমরা বাঘটার। একটা ঝরনার ধারে একটা বন্য মহিষকে মেরেছিল বাঘটা। আমরা আশা করেছিলাম সে আশেপাশে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমরা দু'জন কাছাকাছি এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম যেখান থেকে মৃত মহিষটাকে দেখা যাবে। কিছুদূরে একটা টিলার শীর্ষদেশে সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ দেখতে পেলাম, সেইটের উপরই চড়ে বাঘের প্রতীক্ষা করব এই ঠিক করে সেই দিকেই এগিয়ে গিয়ে তার উপরই আরোহণ করলাম আমরা। জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল, গাছের উপর থেকেও মৃত মহিষটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু গাছের উপর চড়ে এমন আর একটা জিনিস দেখতে পেলাম যা শুধু বিস্ময়কর নয়, আতঙ্ক-জনকও।....''

মির্মির চুপ করিলেন।

''কি দেখলেন?''

"দেখলাম যা, তা অদ্ভুত। আমরা যে ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরে বৃক্ষশাখায় বসেছিলাম ঠিক তার অপর পার্শ্বে ছিল আর একটা উপত্যকা। সেই উপত্যকার অন্যপ্রান্ত থেকে আবার পর্বতশ্রেণী উঠেছিল। উপত্যকাটি ছোট, তাই আমরা দেখতে পেলাম একটি গুহার সম্মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর তার সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক দীর্ঘকায় পুরুষ বসে আছেন। তাঁর একটি বাহু নেই, অবশিষ্ট বাহুটিও তিনি আগুনের শিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন, যে ভাবে আমরা উনুনে কাঠ দিই, সেই ভাবে! মাঝে মাঝে আবার বার করেও নিচ্ছেন হাতটা। আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আবার সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে। তানে বললে লোকটা হয়তো পাগল, কিম্বা কোনও তান্ত্রিক যাদুকর। চল দেখে আসি ব্যপারটা কি। গেলাম দু'জনে। কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটি সত্যিই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গোঁফ দাড়ি আর অবিন্যস্ত কেশভারে মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। চোখ দুটি অঙ্গারের মতো জ্বলছে। কিন্তু সে দীপ্তিতে দাহ নেই, প্রশান্তির স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন বিকীর্ণ হচ্ছে তার থেকে। আমাদের দিকে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তারপর একটু হেসে সংস্কৃত ভাষায় বললেন,—স্বাগতম্। আমি আর তানে একটু একটু সংস্কৃত শিখেছিলাম, আলাপ করতে খুব বেশী অসুবিধা হল না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি করছেন আপনি। তিনি বললেন, যজ্ঞ করছি। আর্যাবর্তে খুব যজ্ঞ হয় একথা শুনেছিলাম, কিন্তু তা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা কল্পনা করিনি। আমাদের দেশেও দেবতার উদ্দেশ্যে এরকম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাতে পশুমাংস অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হত। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি আর একটু হেসে বললেন—যজ্ঞ মানে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক। আমার প্রিয়তম ছিল হাত দুটি, সেই দুটিই দেবতাকে দেব। একটি দিয়েছি, আর একটি দিচ্ছি। আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। আমাদের দিকে আরও ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি বললেন—আপনাদের দৃষ্টি থেকে অনুকম্পা ক্ষরিত হচ্ছে। অনুকম্পার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন। তানে বললে—হাত দুটিই আপনার সবচেয়ে প্রিয়? ঋষি উত্তর দিলেন—সবচেয়ে প্রিয়। এই হাত দিয়ে আমি না করেছি কি? শিকার করেছি, বীণা বাজিয়েছি, ফুল তুলেছি, মূর্তি গড়েছি, ছবি এঁকেছি, কবিতা লিখেছি দেবতার জন্য নির্মাল্য রচনা করেছি। আমার হাতের কিছু কীর্তি এখনও আমার গুহার মধ্যে সঞ্চিত আছে। যদি কৌতূহল হয় কাল সকালে এসে দেখে যাবেন। এখন আপনারা যান। আপনারা থাকলে আমার আরাধনা বিঘ্নিত হবে। কাল সকালে আসবেন ওই গুহায়, আমি থাকব। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে আমরা দু'জনে সেই দেবদারু বৃক্ষশীর্ষে পাশাপাশি বসে রইলাম। কারও মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না। পারিপার্শ্বিক আর পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম না কেউ। একদিকে সেই বন্য মহিষের শবটা পড়েছিল, আর একদিকে দেখা যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই যাজ্ঞিককে, মাঝে মাঝে হাতটা তুলে অগ্নিশিখার ভিতর দিচ্ছেন আবার বার করে নিচ্ছেন। চতুর্দিকে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা, উদ্দাম ঝিল্লীধ্বনি মন্থর হয়ে এসেছে অরণ্যের জটিলতায়, নিষ্ঠুর শার্দুলের আগমন প্রতীক্ষায় থম থম করছে চারিদিক, আকাশের জ্যোৎস্নাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের সানুদেশে, উপত্যকার নৈশ রহস্য ঘনতর হচ্ছে। আমরাও দু'জনে ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তানে

বসেছিল আমার বাম উরুর উপর, আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে। সে কি ভাবছিল তখন আমি জানতে পারিনি, পরে জেনেছিলাম। আমি ভাবছিলাম ওই অদ্ভুত যাজ্ঞিকের কথা। 'দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক...আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন...।'—তাঁর এই কথাগুলি আমার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কেবল, সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করছিল এক অভূতপূর্ব অনুভূতির অদ্ভুত রসে। সেই শেফালী গাছটার ছবি ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছিল চোখের সামনে...অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে আর ঝরাচ্ছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই ওর সাধনা। আমি কি করছি? আমার চোখের ঠিক সামনেই দেবদারুর একটা বক্র শাখা ছিল, সেটা মৃদু হাওয়ায় দুলতে লাগল, আমার মনে হল আমার প্রশ্নটাই বুঝি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে ওই কুটিল কৃষ্ণ শাখায়, যেন দুলে দুলে আমাকে প্রশ্ন করছে, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ....? হঠাৎ তানে বললে—মহিষটা তো আর দেখতে পাচ্ছি না। দেখলাম সত্যিই মহিষটা নেই। বাঘ যে কখন নিঃশব্দে এসে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা আমরা টের পাইনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম—পূর্বাকাশ ঊষারাগরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হল এবার গাছ থেকে নেমে শবর-পল্লীতে ফিরে যাওয়াই উচিত। যন্ত্রাচালিতবৎ নামলাম, যন্ত্রচালিতবৎ চলতে লাগলাম। কারও মুখ দিয়ে কথা বেরুল না একটিও, অথচ...ঠিক আপনারাও বুঝতে পারছেন কি না জানি না—আমার সমস্ত সত্তা তখন এক অনির্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ, সে ভাবের ঘোরে আমি এমনি বিভোর যে তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলাম না, করলেও ভাষা খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। পোশাক পরিবর্তন করে শবর পল্লী থেকে যখন ফিরছি তখন তানে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে?"

"তুমি।"

কথাটা শুনে নীরব হয়ে গেল সে। তার দিকে চেয়ে দেখলাম অপূর্ব একটা জ্যোতি ঝলমল করছে তার চোখের দৃষ্টিতে। আমিও আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। নীরবে একটা খাড়াই অতিক্রম করতে লাগলাম দু'জনে। খাড়াইটার পর ছিল একটা উৎরাই—তারপর উপত্যকা। উপত্যকার অপর প্রান্তে আবার পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাড়ে সন্ন্যাসীর গুহা। গুহায় পৌঁছে দেখলাম, সন্ন্যাসী তাঁর অর্ধদগ্ধ বাহুতে পনীর মাখাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন—আপনারা দু'জনেই কি কাল রাত্রিতে এসেছিলেন? উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার আচরণে এবং আলাপে যা পেয়েছি তাতে কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। সন্ন্যাসী কিছু না বসে দগ্ধ ক্ষতস্থানগুলিতে পনীর লেপন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর একটু হেসে বললেন—'গুহার ভিতর প্রবেশ করে আমার দক্ষিণ হস্তের কীর্তিগুলি যদি দেখেন তাহলে আরও আশ্চর্য হবেন।' গুহায় প্রবেশ করলাম। সত্যিই বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কনের এমন নিদর্শন আর কখনও দেখিনি। বেরিয়ে আসতেই সন্ন্যাসী বললেন—'ওগুলো সৃষ্টি করেছিলাম আনন্দের প্রেরণায়, এখন যে প্রেরণায় হাত দুটোকে বিসর্জন দিচ্ছি তা আরও মহৎ, আরও সূক্ষ্ম—' তাঁর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সসম্ভ্রমে চুপ করে রইলাম, প্রশ্ন করতে সাহস হল না। আমার মনের কথা কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—"আমার হাত দুটো আমার প্রিয় ছিল, কারণ আমার অহঙ্কারকে ওরা তৃপ্ত করত। এরকম অহঙ্কারে একটা আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু মাদকতাও আছে। সমস্ত মাদক

জিনিসের মতো এই অহঙ্কারের আনন্দও মনকে অবশেষে অবসন্ন করে। নূতন খোরাক না পাওয়া পর্যন্ত অবসন্ন হয়েই থাকে সমস্ত চিত্ত। আর নিত্য নূতন খোরাকের সন্ধান করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। কারণ খোরাকের সন্ধান করাটাই মুখ্য হয়ে পড়ে, তখন আনন্দটা হয়ে যায় গৌণ। একদিন গভীর রাত্রে এই সত্যের উপলব্ধি হল। বুঝলাম কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করলেই দুঃখ। কারণ চিরকাল কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকা যায় না। জরা মরণ কাউকে খাতির করে না। নিজের প্রিয় বস্তুকে স্বেচ্ছায় দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করলেই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ দেব-চরণে সমর্পিত বস্তু অমরত্ব লাভ করে কল্পলোকে, নব নব রূপে তা বিকশিত হয় অবস্তু লোকের অমরায়, জরা মরণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মনে পড়ল উপনিষদের বাণী—যতশ্চোদতি সূর্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি—যাঁর ভিতর থেকে সূর্য উদিত হয়, যাঁর ভিতরে আবার সূর্য অস্ত যায় তাঁর মধ্যেই আমার প্রিয় বস্তুকে সমর্পণ করলে তা নিরাপদ থাকবে, কারণ সেই স্থানেই জরা-মরণবিহীন স্থান। এই উপলব্ধি হবার পর থেকে আমি যজ্ঞের আয়োজন করে আমার হাত দুটিকে দেবতার চরণে সমর্পণ করছি—"

প্রশ্ন করলাম—"কে আপনার দেবতা?"

"চরাচরে প্রত্যক্ষ-কল্পনায় যিনি প্রকট, তিনিই আমার দেবতা। তিনি সত-অসত্য সুখ-অসুখ জ্ঞান-অজ্ঞান বাস্তব-অবাস্তব সবই। কোনও একটি সংজ্ঞায় তাঁকে বোঝানো যাবে না। তিনি নানারূপে প্রকাশিত, নানা আলোকে প্রদীপ্ত। অগ্নি তাঁর হুতবহ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার প্রশ্ন করলাম—বস্তুত প্রশ্ন করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল আমার। প্রশ্ন করলাম—"ক্ষতস্থানে পনীর লেপন করছেন কেন? জ্বালা করছে?"

তিনি উত্তর দিলেন—"জ্বালা অবশ্য করছে। কিন্তু সেটাকে আমি আমল দিচ্ছি না। আমি এতে পনীর লাগাচ্ছি পনীর অগ্নির প্রিয় খাদ্য বলে। আমার এই হাত শুষ্ক মাংসমেদহীন, বিস্বাদ। পনীর লাগিয়ে সেটাকে একটু সুস্বাদু করবার চেষ্টা করছি—"

তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে গেল।

আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, ইচ্ছে করলে যে কোনও লোকই কি যজ্ঞ করতে পারে?"

"প্রত্যেক লোকই যজ্ঞ করছে, কিন্তু সে কথা তারা জানে না। দেবতার উদ্দেশ্য ত্যাগ মানেই যজ্ঞ, তার সদ্য ফল আনন্দ। প্রত্যেক মানুষই আনন্দলাভের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ করছে। কারণ ত্যাগ না করলে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায় না। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—কথাটা মিথ্যে নয়। আপনারা সবাই যজ্ঞ করছেন, কিন্তু জানেন না সে কথা"—তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"আপনিও করছেন। কিন্তু খুব ভালভাবে করছেন না। মন যেদিন বৃহৎ আনন্দের দাবী করবে, ভূমা যখন সীমার প্রান্ত-রেখার পরপারে আভাসিত হবে, তখন আপনিও তার মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, প্রিয়তমকে যজ্ঞের বলি করতে আপনিও তখন আর ইতস্তত করবেন না, বুঝতে পারবেন যে প্রিয়তমকে চিরন্তন করতে হলে তাকে ত্যাগ করতে হয়"—আর একটু থেমে তানের দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি আপনার কে হন—"

"আমার প্রিয়তমা"

"হয় তো এঁকেই তা হলে যজ্ঞের বলি হতে হবে একদিন।"

আমি আর তানে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।....

মির্মির পুনরায় নীরব হইয়া গেলেন। অরণ্য স্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া অসংখ্য প্রকার ধ্বনি অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহসা সুন্দরানন্দের কর্ণে বেদমন্ত্রের মতো ধ্বনিত হইল। মনে হইল অসংখ্য অদৃশ্য উদ্‌গাতা যেন সামবেদ গান করিতেছেন। তিনি একাধিকবার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ অনুভূতি তাঁহার আর কখনও হয় নাই। তাঁহার এই অনুভূতি রহস্যময় মির্মিরের অন্তরেও সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন—"শুনছেন কুমার, বসুন্ধরার আত্মনিবেদনের ভাষা? সমস্ত নিখিল বিশ্ব জুড়ে যজ্ঞ চলছে, সবাই দিতে চাইছে, সবাই ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের ক্ষণিক খোলস ছেড়ে শাশ্বত লোকে যেতে চাইছে। তানেও চেয়েছিল। সবাইকে চাইতে হবে একদিন—"

"তানের কি হল তারপর?" সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"তানে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে উঠে আমাকে বললে, শুনছ হেরোডোটাস? শুনতে পাচ্ছ কিছু?"

সেদিন এমনি ঝিল্লীধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত ঝঙ্কৃত করছিল। ঝিল্লীধ্বনি ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে কথা বললাম তাকে।

তানে বললে—"কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?"

"কই না—"

"ভাল করে শোন—"

শুনতে পেলাম না কিছু।

তখন তানে বললে—"কচি ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?"

"কচি ছেলের কান্না? কই না।"

"আমি পাচ্ছি।"

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে নিজেও কাঁদতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কিছু, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেঁদে তানে বললে—"একটা কথা তোমাকে এতদিন বলিনি, আজ বলছি। তোমার কাছে আসবার আগে আমার একটি ছেলে হয়েছিল। সে কিন্তু বেশী দিন বাঁচেনি। তারই কান্না আজ ক'দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে সে কোথাও যেন আছে, কোথাও যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। দেহের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি বলে যেতে পারছি না আমি তার কাছে। খাঁচাটা আমার ভেঙে দাও তুমি।" শুধু সেদিন নয়, প্রতি রাত্রেই সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসত, উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনত খানিকক্ষণ, তারপর বলত—"ওই সন্ন্যাসীর মতো তুমিও যজ্ঞের আয়োজন কর, আর সে যজ্ঞে বলি দাও আমাকে। আমিই তো তোমার প্রিয়তমা, আমাকেই উপহার দাও, দেবতার উদ্দেশ্যে আমাকেই উৎসর্গ কর অগ্নিমুখে...."

মির্মির চুপ করিলেন।

"তারপর?"—

"তাই করতে হল অবশেষে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-গর্জনে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মির্মির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে গিয়া অনুরূপ আর একটা গর্জন করিলেন। নিবিড় অন্ধকার হইতে

সিংহের প্রত্যুত্তর আসিল। মির্মির তাহার উত্তরে এমন একটা শব্দ করিলেন—যাহা আদেশ, অনুনয় এবং গর্জনের অদ্ভুত সমন্বয়—তাহা যেন ক্ষুধার বাঙ্ময়ী রূপ...। পরমুহূর্তেই খুব কাছেই সিংহটা আবার গর্জন করিয়া উঠিল। মির্মির ভিতরে আসিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন-করত সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গর্জন।

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ বন্দী হল—"

তারপর সহসা সুন্দরানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কুমার আপনি একটা যজ্ঞের আয়োজন করুন। যে পশু-শক্তির উন্মাদনায় আমরা অহঙ্কৃত, অথচ যে শক্তি সামান্য কামের বা সামান্য লোভের ছলনায় তুচ্ছ হয়ে যায়—সেই পশু-শক্তির প্রতীক এই পশুরাজকে সেই যজ্ঞে বলি দিন।"

সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন—"আপনিই তো এখনি বললেন যা প্রিয়তম, তাই দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হয়। সিংহ আমার প্রিয়তম নয়। আপনার তানের মতো আমার যদি কেউ থাকত তাহলে করতাম—"

"আপনারও তো আছে।"

মির্মির সুরঙ্গমার দিকে চাহিলেন।

সুন্দরানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তানের মতো সুরঙ্গমা কি আত্ম-বিসর্জন দিতে রাজি হবে। ওর এখন ভরা যৌবন—"

অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরঙ্গমা বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় রাজি হব, করুন আপনি যজ্ঞের আয়োজন। জীবনে অনেক ভোগ করেছি, এখন আর মরতে আপত্তি নেই! সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে ডুবে যাওয়াই তো ভাল, দুঃখ কখন কি মূর্তিতে দেখা দেবে জানি না তো। আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন। আমি সানন্দে সেই যজ্ঞের বলি হব।"

"চমৎকার—চমৎকার—"

মির্মির সহর্ষে হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

কুমার সুন্দরানন্দের মুখভাবে যদিও বিষাদের ছায়া পড়িল কিন্তু তাঁহাকে বলিতে হইল—"বেশ তো—"

বিদেশী মির্মিরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া কি চলে? সুন্দরানন্দের মনে হইল নিজের দুর্বলতার জন্য আর্যাবর্তের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। সত্য সত্যই যজ্ঞের আয়োজন শুরু হইয়া গেল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইহা যেন পুরাতন চাঁদ নয়। মনে হইতেছিল বিধাতার গোপন শিল্প-নিকেতন হইতে ইহা যেন সদ্য বাহির হইয়া আসিয়াছে বিনিদ্র নিশাচর নিশাচরীদের নয়নে নূতন স্বপ্ন সৃজন করিবে বলিয়া। নিস্তব্ধ গভীর রজনীর মর্মলোকে সত্যই নূতন স্বপ্ন অপরূপ মহিমায় মূর্ত হইতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত নিবিয়া গেল। দুই দিক হইতে কালো মেঘ অসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল।

প্রথম মেঘ অধীরভাবে বলিল—"ভাল করে একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে চাই, তাই আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকার না হলে ভাবা যায় না ভাল করে—"

দ্বিতীয় মেঘ প্রশ্ন করিল—"কি ভাবতে চান—"

"ভাবতে চাই যে আমরা দুজনে সেই অনাদিকাল থেকে করছি কি।"

"খেলা।"

"খেলাটাও কি সত্যি? না ওটাও ছলনা।"

"কাকে আমরা ছলনা করব বলুন।"

"নিজেদের।"

"নিজেদের ছলনা করতে যাব কেন।"

"আমরা যে কিছু করছি না এই সত্যটাকে নিজেদের কাছ থেকেই যথাসম্ভব সরিয়ে রাখবার জন্য।"

"তাই বা করবার দরকার কি আমাদের।"

"সত্যটা যে অতন্ত পীড়াদায়ক। আমি কিছু করছি না—এই ধারণাটা কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায় বল। তোমার কি বিশ্বাস আমরা সত্যি খেলাই করছি?"

"আমি যা উত্তর দেব, তা তো আপনার মনেই আছে। ভাষায় সেটা শুনতে চান?"

প্রথম মেঘের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হইল। পরমুহূর্তে বজ্রগর্জনে ধ্বনিত হইল—"চাই। আমার মনের অতলে কি যে আছে তা জানি না। তাকে ভাষা দাও—"

"আপনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেকেই খুঁজছেন।"

"অন্ধকারটাই বা কি, আমিই বা কে—"

"অন্ধকার অনিশ্চয়তা, আপনি জিজ্ঞাসা। অন্ধকার পতিত ভূমি আপনি হলায়ুধ কৃষক। আপনি যাচাই করছেন নিজের শক্তিকে, রূপ দিতে চাইছেন অনন্ত কল্পনাকে! সংক্ষেপে নিজেকেই খুঁজছেন আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে—"

"চার্বাকদের বিরুদ্ধে আমার রাগটা তাহলে মেকি বল!"

"আপনার রাগ অনুরাগ বিরাগ কিছু নেই। আপনি নির্বিকার স্রষ্টা। নিজেকে নিয়ে খেলাই করছেন কেবল অনাদিকাল থেকে। খেলনাগুলো আপনার খেলার উপলক্ষমাত্র, কখনও সেগুলো সাজাচ্ছেন, কখনও আবার অবহেলাভরে ফেলে দিচ্ছেন। কখনও গড়ছেন, কখনও ভাঙছেন—"

"কিন্তু সত্যিই কি কিছু গড়ে উঠছে, না ওটাও আমার কল্পনার ফাঁকি—"

"কোনটা ফাঁকি, কোনটা ফাঁকি নয়—কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব তা নিয়ে মাথা ঘামাক অ-কবিরা। আপনি যা করছেন তাই করুন—"

যে মেঘ কিছুক্ষণ পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎগর্ভ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা জ্যোৎস্না-মণ্ডিত মনোহর হইয়া উঠিল। ক্রমশ তাহারা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইল। অনাবৃত চন্দ্র-কিরণে যখন দিগদিগন্ত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে তখন দেখা গেল দুইটি পক্ষী দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালন করিয়া দিগ্বলয়ের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা উচ্চ-কাকলীতে যাহা বলিতেছিল তাহা পক্ষী ভাষায় হয়তো অন্য অর্থ বহন করে, কিন্তু মনে হইতেছিল যেন তাহারা বলিতেছে—'তাই-করি-চল, তাই-করি-চল, তাই-করি-চল।'

জালার ভিতর হইতে চার্বাক যখন সন্তর্পণে বাহির হইল তখনও চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন। চার্বাকের সমস্ত অন্তরও স্বপ্নাচ্ছন্ন। নীলোৎপলার সুরা-পান করিয়া সে যে স্বপ্ন

দেখিয়াছিল তাহাই যেন নূতনরূপে তাহাকে অভিভূত করিল। স্বপ্নে যে সুন্দরীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যে রূপকথালোকে প্রবেশ করিয়াছিল সে সুন্দরী সুরঙ্গমারূপে যেন তাহার নব-স্বপ্নালোকে আসিয়া তাহাকে বলিতেছিল—"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মতো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়। তাহার নাস্তিক্যবুদ্ধি তর্ক করিতে উদ্যত হইলে সুরঙ্গমা ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাহাকে শাসন করিতেছিল। বলিতেছিল "তুমিই ভণ্ড কালকূট। বর্ণমালিনী তোমারই চাকচিক্যময়ী প্রতিভা, তার ভয়ে তুমি ত্রস্ত, তাঁকে তুমি তুষ্ট রাখতে চাও! অথচ তারই সহায়তায় তুমি লাভ করতে চাও অসম্ভবা মেঘমালতীকে, মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে যে মূর্ত হয়ে আছে কবির কল্পনালোকে, তোমার নাগালের বাইরে। তাকেই পাবার জন্য তুমি উদ্বাহু হয়ে আছ। তোমার কামনা নদীরূপ ধারণ করে তোমাকে যা বলেছিল তাই তোমার সত্য পরিচয়। তুমি যুক্তিবাদী কিন্তু কামনার প্ররোচনায় তুমি তোমার যুক্তিকেও লঙ্ঘন করতে ইতস্তত কর না। যুক্তিবাদ তোমার জীবন-দর্শন নয় তোমার কামনা-উপভোগের একটা ওজুহাত মাত্র. প্রয়োজন হলে এ অজুহাত পরিত্যাগ করতে তোমার আপত্তি নেই।" কল্পনায় সুরঙ্গমার ভ্রূভঙ্গী-মনোহর মুখের দিকে চার্বাক চাহিয়াছিল, সিংহ-গর্জনে সহসা চমকাইয়া উঠিল। কিসের গর্জন এ? এদিক ওদিক চাহিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর কিছুদূরে বিরাট পিঞ্জরটা তাহার চোখে পড়িল। ভীত-বিস্মিত-চিত্তে গাছের ছায়ায় ছায়ায় সেদিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। গহ্বর হইতে জালবদ্ধ সিংহকে তুলিয়া মির্মির তাহাকে একটি সুদৃঢ় লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়াছিলেন। চার্বাক সেই পিঞ্জরের সমীপবর্তী হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল রহিল। সত্যই বিরাটকায় একটা সিংহ পিঞ্জরের মধ্যে পদচারণ করিতেছে! সহসা সিংহটা পিঞ্জরের অন্ধকার দিকটায় গর্জন করিয়া আগাইয়া গেল এবং সেইখানেই থাবা গাড়িয়া বসিল। একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া সে দিকটা অন্ধকার হইয়াছিল তবু কিন্তু চার্বাক দেখিতে পাইল, সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামুর্তির মতো কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। চার্বাকের ভয় হইল। যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চার্বাক সরিয়া যাইতে ছিল কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাতে তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। ছায়ামূর্তি মধুরকণ্ঠে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। মনে হইল সিংহকে গান শোনাইবার জন্যই যেন সে এই গভীর রাত্রে গভীর অন্ধকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চার্বাক উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আর সন্দেহ রহিল না। ওই ছায়ামূর্তি সুরঙ্গমা ছাড়া আর কেহ নয়। অমন সুমিষ্ট-কণ্ঠস্বর কি আর কাহারও হইতে পারে? চার্বাক ছায়ামূর্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"সুরঙ্গমা।"

"কে? "

"আমি চার্বাক।"

"মহর্ষি চার্বাক! আপনি এখানে!"

"তোমার জন্য এসেছি।"

"আমার জন্য? কেন!"

চার্বাকের ইচ্ছা হইল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করে, কিন্তু পারিল না। ক্ষণকাল নীরব

থাকিয়া সংযতকণ্ঠে বলিল—"তোমাকে বাঁচাতে। সুন্দরানন্দের যজ্ঞের কথা আমি শুনেছি। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমি হতে দেব না—"

সিংহটা গর্জন করিয়া উঠিল

"এ সিংহ কোথা থেকে এল?"

"আমরা ফাঁদ পেতে ধরেছি।"

"কেন?"

"সুন্দরানন্দের একজন বন্ধু এসেছেন, তাঁর শখ হয়েছে সিংহ ধরার।"

ক্ষণকাল নীরবতার পর সুরঙ্গমা বলিল—"আপনি কি করে এখানে এলেন?"

"লুকিয়ে—"

"লুকিয়েই চলে যান তাহলে। আপনার এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

"কেন—"

"মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে তাঁর কন্যা ধারামতী এখানে এসেছে। সে অন্তঃসত্ত্বা। ধারামতী সুন্দরানন্দের কাছে যা ব্যক্ত করেছে তা আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয়। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে বন্দী করে আনতে। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে আপনার কঠোর শাস্তি হবে। মহর্ষি পর্বতের কন্যার সতীত্ব নষ্ট করা সামান্য অপরাধ নয়। আপনি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন! আমি আপনার আগমনবার্তা কারো কাছে প্রকাশ করব না।"

"কিন্তু আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। কতকগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত পশু যে যজ্ঞের নামে তোমাকে হত্যা করবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না।"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি ফুটিল।

"কি করবেন আপনি? ওরা আপনার চেয়ে বেশী শক্তিমান। ওদের সঙ্গে কি পারবেন?"

"ওরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিমান হতে পারে, কিন্তু বেশী বুদ্ধিমান নয়। বলে না পারি, ছলে বা কৌশলে আমি তোমাকে উদ্ধার করব এ বিশ্বাস আছে বলেই এত কষ্ট করে এখানে এসেছি—"

এমন সময় অরণ্যের অন্ধকারে একটা খসখস শব্দ পাওয়া গেল।

"কেউ আসছে এদিকে। আপনি সরে যান এখন এখান থেকে—"

"আমি এই অরণ্যেই লুকিয়ে থাকব। কাল রাত্রে আবার আসব, তোমার দেখা যেন পাই।"

"আচ্ছা—"

চার্বাক অরণ্যের অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দও থামিয়া গেল। সুরঙ্গমা কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে-ও চলিয়া গেল। সিংহটা থাবা পাতিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—এইবার সে গর গরর্, গর গরর্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল আবার, মনে হইল তাহার হৃদয় বুঝি শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিদীর্ণ হইবার কথা, কারণ তাহার খাঁচার ঠিক বাহিরেই এক শশক-দম্পতি আসিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল এবং স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। পশুরাজের পক্ষে এ ধৃষ্টতা সহ্য করা অসম্ভব।

সুরঙ্গমা অরণ্যের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া মির্মিরের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মির্মির

চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন, সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই চক্ষু উন্মীলিত হইল, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"গান শুনে সিংহ শান্ত হল—একটু—?"

"হচ্ছিল, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না ওখানে, বড় মশা আর দুর্গন্ধ—"

"গান সাপকে মুগ্ধ করে জানি, সিংহকেও করে কি না জানবার কৌতূহল ছিল...আচ্ছা, কাল আবার একবার চেষ্টা করবেন। ঘুমুবেন না কি এখনই—"

"ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু...."

সুরঙ্গমা ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, আজ রাতটা যদি আপনার শয়নকক্ষে কাটাই আপনি আপত্তি করবেন?"

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—'ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, যদি কুমারের আপত্তি না থাকে—"

"আপনারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুমার আমাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করছেন। যে মুহূর্তে স্থির হয়ে গেছে যে আমি যজ্ঞের বলি হব, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন। আপনি তো জানেন তিনি আমার গানও আর শোনেননি, আমাকে আর নৃত্য করতেও আদেশ দেননি। আপনিই অনেকদিন পরে আজ বললেন সিংহকে গান শোনাতে। সেটাও আপনার এক বিশেষ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। আপনারা দু'জনেই আমাকে ব্যবহার করে নিজ নিজ তৃপ্তি সন্ধান করেছেন। করুন তাতে আমার আপত্তি নেই। পুরুষদের খেয়ালের স্রোতে গা ভাসিয়েই সারাটা জীবন কেটেছে আমার। নিজেরও নানারকম খেয়াল, নানারকম কৌতূহল জীবনে মিটিয়েছি আমি। এখন হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছে মরবার আগে আপনার স্বরূপটা ভাল করে দেখে যাব। আপনি অনুমতি দেন আজ আপনার সঙ্গেই রাতটা কাটাই।"

মির্মির হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি আমার স্বরূপ জানতে পারবেন?"

সুরঙ্গমার নয়নের দৃষ্টিতে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে মধুর হাসিয়া সে বলিল—"পারব। পুরুষের স্বরূপ জানতে মেয়েদের দেরী হয় না।"

"অধিকাংশ পুরুষের বললে কথাটা ঠিক হত হয়তো। যে পথ দিয়ে আপনারা সাধারণত পুরুষের স্বরূপ সন্ধান করেন আমার সে পথ আমি তানের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছি। তানের দেহ যখন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল আমিও তখন উপবেশন করেছিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের উপর। পৌরুষের শারীরিক চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেছে আমার।"

সুরঙ্গমার নয়ন আনত হইল। অধরে চাপা একটি হাসি স্ফুরণোন্মুখ হইয়া উঠিল। মির্মিরের দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া সে বলিল—

"আপনার শরীর সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, আমার আগ্রহ আপনার মনের স্বরূপ জানবার—"

"আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি তা জানতে পারবেন?"

"বিশ্বাস আছে পারব। আপনিই তো সেদিন বলছিলেন রাত্রির নিবিড়তায় এমন অনেক সত্য জানা যায় যা দিনের আলোয় জানা সম্ভব নয়।"

মির্মিরের নয়নদ্বয় আবার নিমীলিত হইল। মনে হইল অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি কি যেন সন্ধান করিতেছেন। সহসা চক্ষু খুলিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, তানে মানা করছে"

"তানে? সে কোথায়—"

"এইখানে।"

মির্মির নিজের বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"তাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছি বলেই সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি।"

সুরঙ্গমা মুহূর্তকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া মন স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল—"কুমারও বোধহয় তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন সম্পূর্ণরূপে পাবেন বলে—? আহা, আমারও যদি উপায় থাকত—"

"উপায় আছে বই কি।"

"আমি সামান্যা নর্তকী। আমাকে কুমার অনায়াসে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করে ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু আমি কি কুমারকে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করবার কথা ভাবতেও পারি।"

"ইচ্ছে করলে তুমি কুমারকে এই মুহূর্তে চিরকালের মতো ত্যাগ করে যেতে পার। সে স্বাধীনতা তোমার আছে বই কি।"

"কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছায় কথা দিয়েছি যে, কুমারের যজ্ঞে আত্মবলি দেব। সামান্যা নর্তকী হলেও আমার কথার মূল্য আছে।"

"মহর্ষি পর্বত কাল বলছিলেন, শাস্ত্রে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তোমার বদলে আর কাউকে বলি দিলে শাস্ত্রমতে কোনও অন্যায় হবে না। কুমার পশু না দিয়ে মানুষও যদি দিতে চান তাও কিনতে পাওয়া যাবে।"

"মহর্ষি পর্বত এ নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"তোমার সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে লক্ষ্য করেছি। তিনি বলছিলেন সুরঙ্গমার মতো অমন একজন অনবদ্যা রূপসীকে পুড়িয়ে মারার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে অন্য মানুষ দিলেও চলে—"

"কুমার শুনেছেন?"

"শুনেছেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর মির্মিরের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিংহের পিঞ্জরের সম্মুখে যে শশকদম্পতী উবু হইয়া বসিয়া সম্মুখের পদযুগল দ্বারা গুম্ফ-পরিচর্যায় নিরত ছিল, সহসা তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

প্রথম শশক দ্বিতীয় শশককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"খুব জমেছে, কি বল।"

"খুব।"

"সুরঙ্গমা কি করবে বলতো—"

"তা তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন।"

"জানি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। ওরা মানুষ কি না, ওদের একটা স্বাধীন বুদ্ধি দিয়েছিল, ওদের সেই স্বাধীন বুদ্ধি যে কখন কি করে বসে বলা শক্ত। সেইজন্যেই তো স্বৈরচর

করবার কল্পনা আপাতত ত্যাগ করেছি। মানুষ স্বৈরচর হলে তচনচ করে ফেলবে সব। মানে নিজেরই কল্পনা-সমুদ্রে নিজেকেই তখন হাবুডুবু খেতে হবে, নাকানি চোবানির আর শেষ থাকবে না। কথা বলছ না যে—"

শশকী গোঁফ-চোমরানো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া বলিল—"বলবার কিছু নেই বলেই চুপ করে আছি। তাছাড়া আমার মনটা পড়ে আছে কবির কলমের ডগায়।"

"কোন কবির?"

"যিনি শিখর সেনের কাহিনী লিখছেন।"

"কেমন লাগছে গল্পটা?"

শশকী পুনরায় গোঁফে মন দিল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"আমি কি উত্তর দেব। আপনিই বরং বলুন আপনার সৃষ্টিকে আমি ঠিক ভাষা দিতে পারছি কি না।"

পুনরায় গোঁফে মন দিল।

সিংহ-গর্জনে আর একবার চতুর্দিক প্রকম্পিত হইল।—"ভারী হাল্লা করছে সিংহটা। চল কবির কাছেই যাওয়া যাক। তার বাতির উপরকার ঢাকনাটি চমৎকার। সেই খানেই বসি চল খানিকক্ষণ। এদের গল্পটা ততক্ষণ জমুক খানিকটা—

শশক-দাম্পতী অন্তর্হিত হইল। ক্ষণকাল পরে দুইটি ছোট ছোট পতঙ্গ আসিয়া কবির কক্ষে বিদ্যুৎ বর্তিকার নীল আবরণের উপর বসিল। কবির মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

।। কুড়ি ।।

কবি সত্যই তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"পুলিশের কর্মচারী শিখরের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমার চোখের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় অশোভন রূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চোখের দিকে চেয়ে শিখর মৃদু হেসে বললে—"অমন করে দেখছিস কি!"

"তোকে ! তুই যে শেষটা পুলিশের লোক হয়ে উঠবি তা ভাবতেই পারিনি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে সত্যি।"

শিখর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। সেই কয়েক সেকেন্ডেই আমি তাকে আবার ফিরে পেলাম যেন, সেই কিশোর শিখরকে, যার চোখের চাহনি অবাক বিস্ময় আভাসিত হত মাঝে মাঝে, মর্ত্যলোক ছেড়ে সহসা স্বপ্নলোকে পাড়ি দিতে পারত যে এক নিমেষে। আবার ফিরে আসত, মুখে অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠত, মুচকি হেসে আড়চোখে চেয়ে দেখত তার এই আকস্মিক স্বপ্ন-প্রয়াণ আমরা লক্ষ্য করেছি কি না।

আমার কথার উত্তরে সে হেসে বললে—"বাইরে হয়তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আমি বদলাইনি। যা ছিলাম ঠিক তাই আছি—"

"আমাদের কারবার বাইরেটা নিয়েই। সেইটে বদলেছে বলেই অদ্ভুত লাগছে। তোর ভিতরের একটা খবর অবশ্য পেয়েছিলাম—"

কথাটা শেষ করলাম মুচকি হেসে।

"সে খবরটাও অবশ্য খবর, কিন্তু আসল খবর নয়।"

"আসল খবরটা কি তাহলে"

"আসল খবর আমি উৎসুক, আমি কৌতূহলী!—"

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল সে।

"ওরে বাবা, ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠেছিস দেখছি। পুলিশের কোন ডিপার্টমেন্টে তুই আছিস?"

"আই. বি।"

"আমাদের অঞ্চলে আগমন কোনও ফেরারীর উদ্দেশ্য না কি।"

"একটা কালোবাজারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

আমার বাসার সামনে যে বিরাট বোর্ডিং হাউসটা ছিল সেইটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—"আমার পরিচয় কিন্তু কাউকে বোলো না যেন। আমাকে যে চেন তা-ও প্রকাশ কোরো না কারো কাছে। ওই বোর্ডিংয়ের তিনতলায় একটা রুম নিয়ে আমি থাকব ভাবছি। এখানে আমার নাম হবে—এস. কে. দাস. হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট। যদি আমাকে কোনও কারণে প্রয়োজন হয় ওই নামেই আমার খোঁজ কোরো। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায়"—কত সামান্য কারণে মানুষের মনে আঘাত লাগে। শিখরের এই কথায় কেমন যেন আহত হলাম একটু। মনে হল যেন ওর কথায় একটা পুলিশী মনোভাব ব্যক্ত হল, একটা আদেশ যেন অনুরোধের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যাপারটা ভাল করে বিশ্লেষণ করে এখন বুঝছি ওটা মর্জাগত ঈর্ষ্যারই একটা ছদ্মবেশ। শিখর যে জীবনে উন্নতি করছে সহসা সেটা অবিষ্কার করে আমার অনুন্নত সত্তাটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেদনাতুর করেছিল মনকে, শিখরের ব্যবহারে কোনো দোষ ছিল না।

...দিন কয়েক পরেই দেখলাম ত্রিতলের একটি ঘরে শিখর এসে আড্ডা গেড়েছে। শিখরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না আমার, দূর থেকেই তার গতিবিধির সব খবর রাখতাম। আমার কাছে দূরবীন ছিল।.....

..ভক্ত যেমন নিয়মিত ভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করে আমি ঠিক তেমনি ভাবে রোজ দেখতাম আলেয়াকে। ওটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখনই হাতে কাজ থাকত না তখনই আমি দূরবীনটি নিয়ে জানালার কাছে বসতাম। এমন ভাবে বসতাম যাতে আশপাশের বাড়িতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে। আমি যে দূরবীন নিয়ে জানলার ধারে বসে আছি তা দেখতেই পেত না কেউ বাইরে থেকে। জানলার কপাট দুটো প্রায় বন্ধ থাকত, সামান্য একটু ফাঁক রাখতাম দূরবীনটির জন্যে শুধু। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিচ্ছু। আলেয়াকে অবশ্য রোজ দেখতে পেতাম না। এমন অনেক দিন গেছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দেখতে পাইনি। এর ফাঁকে ফাঁকে শিখর সেনকেও দেখতাম। দিনের বেলা প্রায়ই দেখা যেত না তাকে। প্রায়ই চোখে পড়ত তালা ঝুলছে তার ঘরের সামনে। একদিন দেখতে পেলাম দোতলার একটা কোণের ঘর থেকে ছিমছাম ফিটফাট একটি মেয়ে বেরুচ্ছে।

মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, তার চোখে মুখে এমন একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পরদাপ্রথা উঠে গেছে আজকাল। পথে ঘাটে আজকাল অনেক রূপসী দেখা যায়, মনে হয় চেষ্টা করলে তাদের নাগালও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় ও যেন উল্কা, ওকে কোনও দিন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গট গট করে নেবে এল দেখলাম। তারপরই দেখতে পেলাম বেশ দামী একটা মোটর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে এসে চড়তেই গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরুল সেই ঘরের বদ্ধদ্বারের উপর দূরবীক্ষণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তারপর। দেখলাম দ্বারের পাশেই একটা নাম লেখা প্লেট, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিস এ মুখার্জি—নার্স। এই এ মুখার্জি যে অবন্ধনা মুখার্জি তা কল্পনা করতে পারিনি। পারলে যে আনন্দ আমি সে কদিন উপভোগ করেছিলাম তার তীব্রতাটা যে অনেক কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করেছিলাম যে শিখর মেয়েটির সঙ্গে বেশ মেলামেশা শুরু করেছে। রাত্রে প্রায় ওর ঘরে গিয়ে বসে, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে দু'জনে। দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। একনিষ্ঠ প্রেমিক শিখরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে মনে মনে বড় কুণ্ঠিত ছিলাম আমি। মনে হত বিয়ে করে আমি যেন অনেক নেমে গেছি, আলেয়ার প্রতি অবিচার করেছি। প্রেমের জন্য গৃহত্যাগী শিখরের একনিষ্ঠতার কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করত, পীড়িতও করত। সেই শিখরকে এখন নিজের দলে দেখে ভারী আনন্দ হল সত্যি। মিস এ. মুখার্জি যে অবন্ধনা এ খবর পেলে আমার আনন্দ অনেকটা কমে যেত। অবন্ধনাকে আমি চিনতে পারিনি, কারণ তাকে আমি দেখিনি কখনও। এই বোর্ডিং-এ শিখরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটা আমি জেনেছি অনেক পরে। তার ডায়েরি থেকে। চন্দ্রমোহন যে ডায়েরি দিয়েছিল সে ডায়েরি থেকে নয়। এই দ্বিতীয় ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম উমেশ মামার কাছ থেকে। উমেশ মামা শিখর সেনের সহকর্মী, তিনিই তার জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই ডায়েরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ডায়েরি থেকে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি।

"দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে আমাদের দেশের দার্শনিক সমাজে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন অমোঘ দৈবের কাছে পুরুষকার নিষ্প্রভ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়, শত চেষ্টা করেও মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। আর একদলের মতে যা আমরা দৈব বলে মনে করি তা আমাদের কল্পনাবিলাস মাত্র, পুরুষকার দ্বারাই মানুষ নিজের ভাগ্য গঠন করে। আমরা যে অপ্রত্যাশিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি তার কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না সত্য। কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির দৃষ্টির এবং সীমাবদ্ধতা, এর জন্যে একটা কাল্পনিক দৈবশক্তির খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার সুখদুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার পুরুষকারেরও ফলাফল নয়, আরও অনেকের কর্মধারা আমার সুখদুঃখ প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ আরও অনেক লোকের পুরুষকার আমার পুরুষকারকে কখনও আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার অজ্ঞাতসারে সফল বা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের অপ্রত্যাশিত সুখদুঃখের এ-ও একটা কারণ। এর জন্যে দৈব নামক একটা অযৌক্তিক ব্যাপারকে আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তৃতীয় আর একদল বলেন পুরুষকারই সব! এজন্মে যেটা আমরা দৈব বলে মনে করছি সেটা পূর্বজন্মের পুরুষকারের ফল। বীজ বপন করবামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফলফুল শোভিত গাছ

জন্মে না, তেমনি কোনও সুকর্ম বা দুষ্কর্ম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরজন্ম পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এইটেকেই আমরা দৈব বলে মনে করি।

উপরোক্ত তত্ত্ব আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে বিস্ময়ে কল্পনায় অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে, কিন্তু সে ভালবাসার যথার্থ মূল্য দেবার শক্তি ছিল না আমার। নির্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল আমি সভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। বীর্যবান প্রেমিকের মতো তাকে বলতে পারিনি—ভয় নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তুমি। তাই সে চলে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার ভীরুতার ফল ভোগ করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আগুনে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আমি যে তাকে চেয়েছিলাম, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম—তার ফল কি এতদিনে ফলল? যেটাকে দৈবাৎ বলে মনে হচ্ছে সেটা কি আমার পুরুষকারেরই ফল!

গভর্নমেন্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘুষ খেয়ে অনেক অন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা তাঁকে ঘুষ দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন না কি এই বোর্ডিংয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। তাঁরই গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি আমি। এখানে অবন্ধনার দেখা পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল। তিনতলায় একটা ঘরে আছি আমি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে দোতলার একটা ঘরে অবন্ধনা আছে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে। আমি নাবছিলাম, সে উঠছিল। আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। সেই দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে।

"শিখরদা! তুমি এখানে হঠাৎ?"

"অবু?"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যে অবন্ধনাকে চিনতাম এ ঠিক সে নয়। এর শাড়ির পারিপাট্যে, ফাঁপানো চুলের কায়দায়, এর গালের রঙে, চোখের কাজলে, এর ভ্যানিটি ব্যাগে আর শৌখীন স্যান্ডালে যে পরিচয় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত দামাল সেই কিশোরী অবন্ধনার কোনও মিল নেই। কিন্তু অমিলটাই আমাকে যেন পুলকিত করে তুলেছিল ক্ষণিকের জন্য। মনে হয়েছিল সেই পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত মেয়েটা আমার নাগালের বাইরে ছিল, এই কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব হবে না। ওর পোশাক পরিচ্ছদে, ওর প্রসাধনে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ আভাসিত হচ্ছে যেন! তখন বুঝতে পারিনি যে অবন্ধনা চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার প্রশ্নে একটা শাণিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবন্ধনার চোখে। "হ্যাঁ, আমি অবু। ঠিক অবু নই, মিস এ. মুখার্জি।"

"কি রকম?"

"তুমি এখানে এলে কি করে!"

"আমি তেতলার একটা ঘরে থাকি যে।"

অবন্ধনা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল ক্ষণকাল।

"এই বোর্ডিং-এর তেতলার ঘরে?"

"হ্যাঁ—"

"কোন নম্বরে"

"বাইশ। সমস্ত ঘরটাই আমি নিয়েছি।"

"কোলকাতায় কি করছ।"

"চাকরি। তুমি কি করছ এখানে?"

"আমিও এখানে থাকি। দোতলায় সাত নম্বরে। একেবারে কোণের ঘরটা—"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি এখানে কেন—"

"আমি নার্স হয়েছি। মিডওয়াইফারিতে প্র্যাকটিস করি।"

"ও। তা এই বোর্ডিং-এ কেন?"

"অন্য কোথাও ভাল বাসা পাইনি! এখানে ভালই আছি। তুমি ক'দিন এসেছ এখানে?"

"পরশু।"

"কি করছ এখানে।"

"চাকরি।"

"কি চাকরি।"

আমি যে পুলিশের লোক তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। বললাম—"মার্চেন্ট আপিসে কেরানীগিরি করি।"

"আমার ঘরে যাবে? এস না।"

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল এখন ওর সঙ্গে ওর ঘরে গেলে ছদ্ম আবরণটা খুলে পড়বে। নিজেকে সামলাতে পারব না হয় তো।

"একটু দরকারি কাজে বেরুচ্ছি। পরে আসব এখন। দোতলায় সাত নম্বর তো?"

"সন্ধ্যের পর এস তাহলে।"

"আচ্ছা—"

সেই বোর্ডিং-এ শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম রোজ। বস্তুত রাত্রি দশটার পর ওই আমার একমাত্র কাজ ছিল। শিখরেরও বোধহয় একমাত্র কাজ ছিল, রাত্রি দশটার পর ওর ঘরে গিয়ে গল্প করা। গল্পটা যে নিছক প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছু নয় এই মনে করে আমি পুলকিত হতাম। আগেই বলেছি মেয়েটি অবন্ধনা জানলে পুলকের বদলে আমার মনে ঈর্ষাই জাগত। কিন্তু ওদের আলাপের সুর যে ঠিক কি ছিল তা আগে টের পাইনি, এখন পাচ্ছি শিখরের ডায়েরি থেকে।

শিখর লিখছে—"এতদিন পরে অবন্ধনাকে যে আবার ফিরে পাব সত্যিই তা আমার কল্পনাতীত ছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই দিনই রাত্রে গেলাম তার ঘরে। গিয়ে দেখি সে খুব ডগমগে রঙের একটা নাইট গাউন পরে নিবিষ্টচিত্তে একটা বিলিতি সিনেমা-মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের টেবিলে একটা 'অ্যাশ ট্রে'তে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা। তাকে নার্সের বেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এই বেশে দেখে বিস্ময় সীমা অতিক্রম করল। খানিকক্ষণ আমি কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

"খুব অবাক লাগছে, না? সত্যি আমি অনেক বদলে গেছি শিখরদা।"

"সত্যি বদলেছ। তুমি নিজের পরিচয় না দিলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না বোধহয়, এত বদলেছ।"

"আমার মুখটাও খুব বদলেছে কি ! দেখ তো ভাল করে; আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। দেখ তো—"

মুখটা উঁচু করে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখলাম মুখটা সত্যি বেশী বদলায়নি; অনেক দিন পরে চিবুকের পাশের ছোট কালো তিলটি চোখে পড়ল আবার। আর একটা কথাও মনে হল, মুখের গড়নটা বদলায়নি বটে কিন্তু রূপটা বদলেছে। তরলমতি কিশোরী সে আর নেই, পরিণতি লাভ করেছে আত্মসচেতন যুবতীতে।

"না, মুখটা বেশী বদলায়নি। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে চিনতে পারতাম।"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন"

চেয়ারটা টেনে বসলাম। অ্যাশট্রেটা দেখিয়ে বললাম, "সিগারেট খায় কে, তোমার বন্ধুরা বুঝি?"

"আমিই খাই। বন্ধুদের মধ্যেও খায় দু'একজন। খাবে তুমি?"

দামী কাজকরা একটা রুপোর সিগারেট কেস সে এগিয়ে ধরল আমার দিকে। স্প্রিংটা টিপতেই ডালাটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল একটা সাপ ফণা তুলল যেন।

"তুমি সিগারেট খাও?" মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল আমার।

"আমি এখন অনেক কিছুই করি। ওই দেখ।"

ঘরের যে অংশটি তার প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হত সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে সে। প্রকাণ্ড একটা দামী আয়নার আশেপাশে ছোট বড় কয়েকটা শেলফে নানা আকৃতির সুদৃশ্য শিশি আর কৌটো সাজানো রয়েছে দেখলাম।

"কি ওগুলো?"

"স্নো, পাউডার, লোশন, লিপস্টিক, কাজল, ডেপিলেটরি, এসেন্স, আতর—কত কি। যে অবু আমগাছে উঠত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত, তোমার পড়ার ঘরে জানলার ধারে উঁকি মারত সে মরেছে। তার দেহটার ভিতর বাস করছে এখন অন্য লোক, একে চিনতে তোমার দেরী হবে। হয়ত পারবেই না।"

"ভিতরের আসল মানুষটা বদলায় না অত সহজে।"

"বিদ্বান লোকেরা তাই বলেন শুনেছি। কিন্তু বাইরের পোশাক পরিচ্ছদে মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করে যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"

অবন্ধনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একজন পাকা দার্শনিকও বোধহয় এমন করে গুছিয়ে মানুষের আপাত-পরিবর্তনের রহস্য বর্ণনা করতে পারত না। একথা অবশ্য বললাম না তাকে।

বললাম—"তোমাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করতে পারব। সে ভরসা আমার আছে—"

"আমার নেই।"

অবন্ধনার চোখে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল সে। গম্ভীরভাবে সিগারেট বার করে নিপুণ ভাবে ধরালে সেটা।

"নেই? কেন!"

"পিসেমশায়ের হাতে নির্যাতিত হয়ে যখন তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, যখন আমার বাইরের সব আবরণ ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারনি। তার মানে আমার আসল মানুষটাকে তুমি চিনতে পারনি, পারলে নিশ্চয়ই দিতে।"

অবন্ধনার কথার বাঁধুনি দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

"চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার বাধা ছিল অনেক। তাই একটু ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার তর সইল না। নবীন দুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেলে! আচ্ছা, নবীন দুলের সঙ্গে গেলে কেন?"

"কারণ ওই ঠিক আমাকে চিনেছিল।"

নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললে—"নবীন দুলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে খুব কুৎসা রটিয়েছ বোধহয় তোমরা।"

"কুৎসা তো রটবেই।"

"তোমার কি মনে হয়েছিল?"

চুপ করে রইলাম। বড় কঠিন প্রশ্ন। অবন্ধনার চোখের পাতা পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে আমার উত্তরটা শোনবার জন্য।

"আমার? নবীন দুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেছ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হল।"

"বিশ্বাস করলে আমি নবীন দুলের প্রণয়িনী হয়েছি?"

চুপ করে রইলাম। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল অবন্ধনা।

"আশ্চর্য তোমাদের বুদ্ধি? আমি বিপদে পড়ে যদি একা একটা নৌকো করে নদী পার হয়ে যেতাম, তাহলেও তোমরা বোধহয় ভাবতে যে নৌকোটার সঙ্গেই আমার নিশ্চয় কিছু ঘটেছে গোপনে গোপনে!"

আমি চুপ করেই রইলাম! অবন্ধনার হাসিটাও থেমে গেল হঠাৎ। তার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সহসা অন্য কথা পাড়লে সে।

"একটু চা খাবে?"

"দোকানের চা?"

"না, আমি নিজে করে দেব। সব ব্যবস্থা আছে আমার।"

ঘরের আর এক কোণে দেখলাম ছোট একটি টেবিলে সত্যিই সব ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি ছোট একটি ইলেকট্রিক স্টোভ পর্যন্ত।

অবন্ধনা চা করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর উঠে তার বিছানার ধারে যে বইয়ের শেল্‌ফটা ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ইংরেজি বইই বেশী।

"ইংরেজি পড়তে শিখেছ নাকি!"

"আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি।"

"ও। এত সব করলে কোথায়?"

"বম্বেতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে বুঝলাম যে স্বাধীনভাবে নিজের ভরণপোষণ করবার

যোগ্যতা না হলে আত্মসম্মান থাকে না, এমন কি বিয়ে করেও না। সেদিন ভাগ্যিস তুমি আমাকে আশ্রয় দাওনি শিখরদা। দিলে পরের মুখ-ঝাম্‌টা খেতে খেতেই সারা জীবনটা কাটত—"

আমি শেলফের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নাবিয়ে নাবিয়ে দেখছিলাম—কি ধরনের বই অবন্ধনা পড়ে। দেখলাম সস্তা প্রেমের উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পই বেশী রয়েছে। নার্সিংয়ের বইও আছে দু' একখানা। বইগুলোর পিছন থেকে ছোট একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। লেবেলে লেখা রয়েছে দেখলাম—পোটেশিয়াম সায়নাইড। ভীষণ বিষ! এ জিনিস এখানে কেন!

"পোটেশিয়াম সায়ানাইড রেখেছ কেন—"

"ওটা বার করলে কোথা থেকে?"

"এই বইগুলোর পিছনে ছিল।"

"একজন রোগীর জন্যে দরকার ওটা। বাজারে পায়নি সে, তাই আনিয়ে রেখেছি আমি।"

"রোগীর জন্যে? এ তো ভয়ানক বিষ। কোন অসুখে লাগে সায়ানাইড।"

"ডাক্তার হলে বুঝতে। ডকটর সেন প্রেসক্রাইব করেছেন একটা ক্যানসার রোগীর জন্যে। দাও—"

আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশিটা। রোগীর কথাটা যে মিথ্যে তা তার চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম শিশিটা নিয়ে আবার বইগুলোর পিছনেই রেখে দিলে সেটা। সায়নাইড রেখেছ কেন? প্রশ্নটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল মনে। কিন্তু তখন তা নিয়ে আর আলোচনা করা হল না, আলোচনা করবার অবসরই দিলে না অবন্ধনা।

"চা'টা খেয়ে দেখ দিকি কেমন হল। আমি কড়া চা পছন্দ করি। তুমি?

"আমিও।"

"তাহলে ভালই লাগবে বোধ হয়। চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না দেখ।"

এক চুমুক খেয়ে বললাম—"চমৎকার হয়েছে—"

সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। অবন্ধনা নিজের জন্যও বানিয়েছিল এক পেয়ালা। একটা ছোট টুলে বসে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল সে। চোখ দুটি থেকে অদ্ভুত একটা হাসি উপচে পড়তে লাগল।

"শিখরদা, কোথায় কি চাকরি কর তুমি।"

"আমি দালালি করি। ঠিক চাকরি নয়, সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম।"

"কিসের দালালি?"

"নানা রকম জিনিসের। বাড়ি গাড়ি থেকে আরম্ভ করে দেশলাই ছুঁচ পর্যন্ত।"

মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে বলে গেলাম। আমি যে পুলিশের গুপ্তচর এ কথাটা অবন্ধনার কাছে বলতে পারলাম না। মনে হল কথাটা শুনলে আমার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আসবে একটা। 'স্পাই'কে সবাই ঘৃণা করে এটা কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

"দালালিতে রোজগার হয় বেশ?"

"চলে যাচ্ছে।"

"বিয়ে করেছ?"

"না।"

"করবে না?"

"একদিন ঠিক করেছিলাম করব না। কিন্তু এখন ভাবছি করলে হয়।"

অবন্ধনার চোখ থেকে যে হাসির আলোটা উপচে পড়ছিল সেটা নিবে গেল হঠাৎ।

"কনে' ঠিক হয়ে আছে না কি?"

"অনেক আগে থেকেই।"

"কেমন মেয়েটি, কোথায় বাড়ি?"

"দেখতে ইচ্ছে করছে না কি?"

"করবে না?"

"আয়নার সামনে দাঁড়াও গিয়ে তাহলে।"

অবন্ধনার চোখের আলো নিবে গিয়েছিল, মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল আবার। কিন্তু জোর করে হেসে সে বললে—

"তা আর হয় না শিখরদা।"

"কি হয় না।"

"আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারি না।"

"কেন?"

"লগ্ন বয়ে গেছে।"

"পাঁজিতে বিয়ের লগ্ন কি একটাই থাকে?"

"পাঁজিতে যত লগ্নই থাক, আমার বিয়ের লগ্ন একবারই এসেছিল—আর আসবে না।"

"কবে এসেছিল—"

"মনে নেই? বহুদিন আগে রাত দুপুরে? তুমি তো তখন আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমার সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন তোমার পিসেমশাই। এসব কারণেই আমি চট্ করে মত দিতে পারিনি তখন—"

"আমি তা জানি। আমি রাগও করছি না, কিন্তু লগ্ন বয়ে গেছে। তখন যা হতে পারত এখন তা আর হয় না।

"হয় না কেন। তুমি আমি দুজনেই এখন স্বাধীন, আমাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই তো।"

"আছে বই কি।"

"কে?"

"আমার বিবেক।"

কথাটা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম ক্ষণকালের জন্য। নবীন দুলের ঘটনাটা পরমুহূর্তে মনে পড়ল।

বললাম—"নবীন দুলের সঙ্গে তোমার কি ঘটেছিল জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস কর তার জন্যে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই—"

"তোমাকেও একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। করবে কি—"

সিংহিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"কি বল।"

"আজ পর্যন্ত যত পুরুষের সংস্রবে এসেছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মল নিষ্পাপ চরিত্র মাত্র একটি লোককেই দেখেছি—সে হচ্ছে ওই নবীন দুলে। সে ইচ্ছে করলে আমাকে নষ্ট করতে পারত কিন্তু করেনি। তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"বিশ্বাস করলাম। নবীন দুলে কোথা এখন।"

"জাহাজের খালাসী হয়ে সে চলে গেছে।"

"কবে।"

"আমরা যখন বম্বে পৌঁছলাম তার মাসখানেক পরে।"

"তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল।"

"আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে গেল।"

"কোথায়?"

"এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।"

"কি করতে সেখানে?"

"দাসীবৃত্তি।"

"তার পর?"

"তার পর ডাক্তারবাবুর সুনজরে পড়লাম। তিনি আবিষ্কার করলেন একদিন যে, 'নহি আমি সামান্যা রমণী'। তাঁরই অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলাম, নার্সগিরি শিখলাম।"

অবন্ধনার চোখে মুখে অদৃশ্য একটা আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠল যেন।

"লেখাপড়া তিনিই শেখালেন?"

"একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে দিলেন। অনেক করেছিলেন ভদ্রলোক আমার জন্যে। আমাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হতে পারলুম না।"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত ছিলেন না কি।"

"স্ত্রী তাঁর আত্মহত্যা করেছিলেন।"

"কেন?"

"আমারই জন্য।"

মুচকি হেসে আমারই দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল যেন নিজের একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমার প্রশংসা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"তবু বিয়ে করলে না ভদ্রলোককে।"

"সেই জন্যই করলাম না। আমাকে যত বোকা তোমরা ভেবেছ তত বোকা আমি নই। ততটা হৃদয়হীনও নই"

"আমি তোমাকে কোনোদিনই বোকা ভাবিনি। তবে তুমি হৃদয়হীন কি না তা জানতে বাকী আছে এখনও আমার। তার পর কি হল? তোমার জীবন-কাহিনী বেশ লাগছে—"

"বেশ লাগছে? খেলো উপন্যাসের মতো?"

"ভাল উপন্যাসের মতো।"

"আশ্চর্য তো।"

"আশ্চর্য হবার কি আছে?"

"উপন্যাসে যা তোমাদের ভাল লাগে বাস্তব-জীবন তা কি তোমরা সইতে পার? কুন্দনন্দিনী, কিরণময়ীদের তোমরা তো দূর করে দিয়েছ। তারা হয় মরেছে না হয় আশ্রয় নিয়েছে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। আজকাল অবশ্য সিনেমা-আকাশে তারকা হয়ে জ্বলছে অনেকে। আমিও হয়তো জ্বলতাম, ঠিক দামটা দিতে পারলাম না।"

"কিসের দাম?"

"তারকা হতে হলে যে দাম দিতে হয়।"

আবার চুপ করে গেল সে। মুচকি হেসে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে-ই কথা কইলে আবার।

"আচ্ছা, শিখরদা তুমি বরাবরই সৎপথে চলে ঠিক আগেকার মতো ভাল ছেলে আছ?"

উত্তরে আমিও মুচকি হেসে চাইলাম তার দিকে। তারপর বললাম—

—"নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করতে নেই। আমার জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমি প্রতীক্ষা করছি।"

"কার—"

"তোমার।"

অবন্ধনা একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"এই সিগারেটখোর মেয়েটার? মিছে কথা বলো না শিখরদা। তোমাকে সত্যবাদী বলে শ্রদ্ধা করে এসেছি বরাবর।"

"সিগারেট খেয়ে বা রং মেখে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে এটা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে চেননি তুমি।"

হঠাৎ অবন্ধনা খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সিগারেটটা পড়ে গেল তার ঠোঁট থেকে।

"চিনিনি? পুরুষদের চিনতে বাকী থাকে নাকি কোনো মেয়ের?"

সিগারেটটা তুলে আবার টানতে লাগল।

অনেক রাত পর্যন্ত অবন্ধনার সঙ্গে গল্প করলাম। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিলে না সে! 'প্রহেলিকা' কথাটা দিয়েও ঠিক বর্ণনা করা যায় না তাকে। তাকে যে আমি বুঝতে পারছিলাম না একথা ঠিক নয়। সে যেভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল আমি সে ভাবে বুঝতে চাইছিলাম না। সেদিন তার কাছ থেকে এসে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে হল অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে। কোনও অতি-পরিচিত লোকের নাম মনে না পড়লে যে ধরনের অস্বস্তি হয় এ অনেকটা সেই ধরনের অস্বস্তি। অবন্ধনাকে চিনেও চিনতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম সে বদলেছে, নীতিবিদরা যা অধঃপতন বলে অভিহিত করেন তা-ও হয়তো তার ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তবু তার সম্বন্ধে আমি মোহ-মুক্ত হতে পারছি না কেন। তাকে কলঙ্কিত বলে সন্দেহ হচ্ছে, তার আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা মোটেই ভদ্র নয় কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে সে সত্যিই মন্দ। মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারলে শুধু যে সুখী হব তা নয় কৃতার্থ হয়ে যাব। এই অনুভূতি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার বিবাহের প্রস্তাব অবন্ধনা বারম্বার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু আমার অন্তরের

অন্তস্থলে আমি উপলব্ধি করছি অবন্ধনা আমাকে চায়। তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক, নিগূঢ় অভিমানের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অনুভব করছি সে আমাকে চায় বলেই না-চাওয়ার ভান করছে। ওটা ভান মাত্র। কিন্তু এ ভান কেন? নারীর ছলনা? কিন্তু যে সত্য নির্ণয় করবার জন্যে নারীরা সাধারণত ছলনার আশ্রয় নেয় সে সত্য কি এখনও অজ্ঞাত আছে অবন্ধনার? সে কি জানে না যে আমি তাকেই সারাজীবন চেয়েছি, তাকেই সারাজীবন চাইব? না, কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে। অবন্ধনাকে চিনতে পারছি না...''

শিখর সেনের ডায়েরির খানিকটা অংশ লিখিয়া কবি লেখনী-সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবার কি লিখিবেন।

ছোট ছোট পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে উড়িয়া গেল। কিছুদূর উড়িয়া গিয়া তাহারা যুবক যুবতীতে রূপান্তরিত হইল; একেবারে আধুনিক যুগের যুবক যুবতী। যুবতীর দিকে চাহিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল—''তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে বাণী! আমাকে?''

''বেশ চমৎকার।''

''চল একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক। একটা সমস্যা উদয় হয়েছে মনে—''

''চলুন। নদী এখান থেকে কতদূরে?''

''ঠিক জানি না। খুঁজে দেখি চল। আছেই নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোনও নদী.....''

উভয়ে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। তাহাদের ঘিরিয়া নৈশ অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। ঘন কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নক্ষত্রকুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, সঞ্চরমান শ্বাপদকুল গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে এই যুগলযাত্রীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ঝিল্লীকণ্ঠে নূতন রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, পেচক দম্পতী বিশ্রম্ভালাপ স্থগিত রাখিয়া বিস্ফারিত-নয়নে এই সহসা আবির্ভূত অপরূপ মানবদম্পতীকে কি ভাষায় অভিনন্দিত করিবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকদূর হাঁটিয়াও কিন্তু নদীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

''কই নদী তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।''

''সামনে ওটা কি—''

''প্রকাণ্ড মাঠ একটা।''

''মাঠ? ঠিক দেখতে পাচ্ছ তুমি? বড্ড অন্ধকার, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।''

যুবক উর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিল। মধ্যগগনে বীণা-মণ্ডলে অভিজিৎ নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। পিতামহের দৃষ্টিপাতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। জ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত এক আলোক-রেখা অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া প্রান্তরকে আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই অম্বরাগত দিব্য নক্ষত্র-আলোকে দেখা গেল প্রান্তরের অপর-প্রান্তে এক খরস্রোতা কল্লোলিনী প্রবাহিত হইতেছে।

''ওই তো নদী! চল, ওরই পাড়ে গিয়ে বসা যাক।''

বাণী হাসিয়া বলিল—''এত কাছে যে নদী ছিল তা তো বুঝতে পারিনি—''

''মনুষ্যের রূপ ধারণ করেছি কি না, বুদ্ধিটা তাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে আলো না এলে অধিকাংশ ব্যাপারই বোঝা যাবে না এখন''

"ওই নদীটা এখানে ছিল অথচ বুঝতে পারিনি?"

"ছিল কি ছিল না এ সবই আপেক্ষিক কাণ্ড। ওর মধ্যে ঢুকো না। যখন নদী পাওয়া গেছে, চল ওর পাড়ে গিয়ে বসা যাক, আর যে কথাটা মনে হয়েছে তাই নিয়ে একটু সময় কাটানো যাক। আমরা অমর, আমাদের কাছে সময় কাটানোটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে কি না—"

পিতামহ ও বাণী নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল নদীতীরে একটি সুদৃশ্য মর্মর-বেদীও রহিয়াছে। বেদীর উপর উভয়ে উপবেশন করিলেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নদীর তরঙ্গমালায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাণী প্রশ্ন করিলেন—"কি আলোচনা করবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন?"

"যে কাণ্ডটা করলাম সেটা তোমার ভাল লাগল কিনা।"

"লাগল বই কি।"

"এটা কিন্তু সেকেলে রূপকথার কাণ্ড। এর তুলনায় ভবিষ্যযুগের কবি যা লিখে যাচ্ছে সেটা খুব খেলো হচ্ছে না?"

"আপনিই তো তাকে লেখাচ্ছেন—"

"তা লেখাচ্ছি কিন্তু লিখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি না। সত্যি সত্যি যা ঘটে সেইটেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কি? দুটো ছোঁড়া প্রেমে পড়ে ছটফট করে মরছে আর কাতরাচ্ছে এই ঘটনাটা হুবহু নকল করে দেওয়াটা কি সৃষ্টির পর্যায়ে যাবে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আমি যখন কেঁচো কৃমি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলাম তখনও তাতে অনন্যতা ছিল, ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাতে। আমার কালকূটের কল্পনাটাও নিতান্ত খারাপ হয়নি। নিজের স্ত্রীর জিবের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা প্রণয়িনীর সন্ধানে অ্যাঁ কি বল!"

বাণী মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"এরাও অনন্য। এদের জোড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকায় দূরবীন কিনে আলেয়াকে দেখছে যে কমল-কিশোর সে-ও কম নয়।"

পিতামহ সহসা খুশী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি ঝলমল করিতে লাগিল।

"তোমার ভাল লেগেছে কমলকিশোরকে?"

"লেগেছে। শিখর সেনকেও লেগেছে। তবে ওকে পুলিশের গুপ্তচর করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যৎ যুগের চার্বাক আঁকবার কথা ছিল—"

"আমার মনে হল সন্দিগ্ধচিত্ত চার্বাকরাই ভবিষ্যৎ যুগে পুলিশের গুপ্তচর হবে।"

"ও তাই বুঝি।"

"দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা। কিন্তু সে যাই হোক, গল্পটা তোমার ভাল লাগছে কি না বল। আমার নিজের কেমন পানসে পানসে ঠেকছে। এটার চেয়ে চার্বাকের গল্পটা যেন বেশী জমাট হয়েছে।"

"কেন ওতে বনজঙ্গল, সিংহ এই সব আছে বলে? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি শিখর সেনের চারদিকেও বনজঙ্গল সিংহ আমদানী করেছেন। জঙ্গলটা অবশ্য সমাজের জঙ্গল আর সিংহটাও মনুষ্যরূপী সিংহ—"

"বাঃ ঠিক ধরে ফেলেছ তো—"

সহসা যুবক-রূপী পিতামহ যুবতী বাণীকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। নদীর তরঙ্গ-

কুলও নাচিতে লাগিল। বাণী লক্ষ্য করিলেন অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরী আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নয়নে মাণিক্য-দ্যুতি, গ্রীবাদেশে নীলার সৌন্দর্য, পক্ষদ্বয়ে মুক্তা-মালা এবং প্রসারিত পুচ্ছমণ্ডলে অসংখ্য পান্না প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত পক্ষী বাণী আর কখনও দেখেন নাই।

"ময়ূর তো রাত্রে নাচে না! এমন ময়ূরও তো দেখিনি কখনও।"

একটি ময়ূরই উত্তর দিল—"আমরা রাতের ময়ূর, রাতেই নাচি।"

"কোথায় থাক তোমরা।"

"কোথায় থাকি জানি না ঠিক। হয়তো তোমার মনেই আছি।"

"কবিতায় কথা কও না কি তোমরা?"

ময়ূরের দল ইহার কোনো উত্তর দিল না, মুচকি হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বাণীও নৃত্যপরা হইলেন। চরাচর নৃত্যময় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন—"চল এবার কবির কাছে যাওয়া যাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছে।"

আবার দুইটি পতঙ্গ কবির বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত ইলেকট্রিক বাতির সুদৃশ্য ডোমের উপর উপবেশন করিল। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দুইটির আগমন বা নির্গমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। পতঙ্গ দুইটি আসিয়া বসিবার পর পুনরায় তাঁদের মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, পুনরায় তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এরকম লুকোচুরি কতদিন চলেছিল তা বলা শক্ত। কারণ শিখর সেনের ডায়েরীতে অবন্ধনার কথা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ নেই। আছে সেই কালোবাজারীটার কথা যার খোঁজে এই বোর্ডিংএ এসে সে বাসা বেঁধেছিল। একদিনের ডায়েরীতে দেখছি এই বিশেষ বোর্ডিংটাতে কালোবাজারীটার আকর্ষণ কোথায় তা সে আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।"

শিখর লিখছে—"এমন একটা ঘটনা ঘটেছে আজ আমার জীবনে যা হয়তো আমার জীবনের গতিকেই পরিবর্তিত করে দেবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা আর কখনও এমনভাবে বিচলিত হয়নি। যে লোকটার জন্যে এই বোর্ডিংএ এসে বাসা বেঁধেছি সে লোকটাকে এই বোর্ডিংয়ে ঢুকতে এবং বেরুতে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কেন সে আসে এখানে তা নির্ণয় করতে পারিনি। এ বিষয়ে কাউকেও প্রশ্ন করতে ভরসা পাইনি, পাছে কেউ আমাকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করে। দোতলার একটা ঘরে গণেশবাবু নামে একজন দালাল আছেন, আমার সন্দেহ ছিল তার সঙ্গেই হয়ত কোনোরকম যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু স্বচক্ষে কোনও দিন তার ঘর থেকে তাকে বেরুতে দেখিনি, তার ঘরে ঢুকতেও দেখিনি। এইটে স্বচক্ষে দেখবার জন্যে অনেক সময় আমি সমস্ত দিন কোথাও যাইনি, কিন্তু সেদিন সে আসেইনি বোর্ডিংএ। এইভাবেই চলছিল। আশা ছিল একদিন না একদিন তাকে হাতে-নাতে ধরবই। আজ সন্ধ্যের একটু আগেই সিঁড়ি দিয়ে নামছি এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সেই লোকটারই সঙ্গে। সে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া নিয়ে উপরে উঠছিল। আমি তাকে দেখিয়ে গট গট করে নেমে গেলাম বটে কিন্তু সে উঠে যেতেই তৎক্ষণাৎ ফিরলাম। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন ঘরে সে ঢুকছে। যা দেখলাম তাতে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। দেখলাম লোকটা অবন্ধনার

ঘরে ঢুকল! ফুলের তোড়া নিয়ে অবন্ধনার ঘরে ঢোকার মানে? কি করব ভাবছি এমন সময় অবন্ধনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

"কোথা যাচ্ছ এমন অসময়ে"—জিজ্ঞাসা করতে হল।

"কলে বেরুচ্ছি। আমাদের আবার সময়-অসময় আছে না কি—"

মুচকি হেসে সপ্রতিভ ভাবে নেমে গেল।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দামী একটা মোটরকারও দাঁড়িয়ে আছে নীচে। অবন্ধনাকে নিয়ে লোকটা মোটরে চড়ল। আমিও দ্রুতবেগে নেমে এলাম নীচে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিটাকে বললাম ওই মোটরটাকে অনুসরণ করতে।

......অবন্ধনা সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেছি তা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তা লিখতেও ভয় করছে। অবন্ধনা না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তাহলে আজই তাকে অ্যারেস্ট করতাম। যে সব পদস্থ গভর্নমেন্ট অফিসার অর্থের বশীভূত নয় কামের বশীভূত, ওই কালোবাজারীটা অবন্ধনাকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের ভোলাবার জন্যে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, অথচ আমি বেঁচে আছি—"

এইভাবে আরও কয়েক পাতা লিখেছে শিখর। অবান্তর বোধে সবটা আর উদ্ধৃত করলাম না। ঠিক এর পরের তারিখে কিন্তু আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে শিখর যা এ কাহিনীর পক্ষে মোটেই অবান্তর নয়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

শিখর লিখেছে—'ছেলেবেলায় আমি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতাম। উঠে বেড়িয়ে বেড়াতাম বাড়ির সামনের বাগানটায়। রাত্রে কুঁড়ি কি করে ফুল হয় তা জানবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার। আশ্চর্য লাগত সন্ধ্যাবেলার ছোট্ট কুঁড়ি কয়েক ঘণ্টায় কি করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে যায়! ঘুমের ঘোরে উঠে দেখতে যেতাম তাই। আমার মা অনেকদিন আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায়। অনেক সময় খাটের সঙ্গে হাত-পা-ও বেঁধে দিতেন। ডাক্তাররা বলেন ওটা নাকি এক প্রকার অসুখ। অনেক দিন এরকম আর হয়নি। বোর্ডিংয়ের চাকরটা কিন্তু কাল রাত্রে সিঁড়ি থেকে আমাকে ধরে এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল, আমি নাকি ঘুমের ঘোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলাম। অন্তর-নিহিত প্রবল কৌতূহল ছেলেবেলায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত। কাল কোন কৌতূহলের টানে উঠেছিলাম? সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছিলাম? অবন্ধনার ঘরের দিকে না কি—!"

ডায়েরির এই অংশটা পড়ে মনে হচ্ছে আহা শিখরের মতো আমারও যদি ওই অসুখটা থাকত। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে সত্যিই যদি যেতে পারতাম আলেয়ার কাছে। আজ বিকেলে আলেয়া জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। কি ভাবছিল? মনে করতে ইচ্ছে করে যে আমার কথাই ভাবছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সত্যটা কি করে জানি না প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ও আমার কথা ভাবছিল না....

প্রথম পতঙ্গ চুপি চুপি দ্বিতীয় পতঙ্গকে বলিল—"চল, চার্বাক-সুরঙ্গমার খবরটা নেওয়া যাক এবার। এদের ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগছে না আর—"

"চলুন—"

পুনরায় পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

।। একুশ ।।

অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে চার্বাক আশ্রয় লইয়াছিল। বিশাল বিশাল বনস্পতিবেষ্টিত যে নির্জন স্থানটি সে নির্বাচন করিয়াছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা-মুখ ছিল। চার্বাক স্থির করিয়াছিল—যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। সুরঙ্গমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সমস্ত রাত্রি সে একটি বৃক্ষের উপরই যাপন করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নূতন আশ্রয়টি সে আবিষ্কার করিয়াছে। কতদিন যে অরণ্যবাস করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুরঙ্গমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই, সুতরাং গুহার ভিতরটা নিরাপদ কিনা তাহা দিবালোকেই স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য সে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া গুহার ভিতর সেগুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল কোনো জন্তু বা সর্প বাহির হইয়া আসে কি না। সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পরও যখন কোনও প্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, চার্বাক তখন চিন্তা করিতে লাগিল এইবার গুহার ভিতরে প্রবেশ করা সমীচীন হইবে কি না। ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল, হইবে না। অগ্নি সংযোগ করিবার পরও যদি কোনও প্রাণী বাহির না হয় তাহা হইলেই ওই অন্ধকারে অপরিচিত গুহায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু অগ্নি কোথায় পাওয়া যাইবে? অরণ্যের মধ্যে শবর-পল্লী থাকা সম্ভব, সেখানে গেলে শুধু অগ্নি নয়, হয় তো আশ্রয়ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শবর-পল্লীতে যাওয়াও কি সমীচীন? কুমার সুন্দরানন্দের সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তাহারা রাজভক্তির আতিশয্যবশত তাহাকে ধরাইয়াও দিতে পারে। সুতরাং শবর-পল্লীতে গমন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। সহসা মনে হইল এই অরণ্যে সন্ধান করিলে অরণি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। কিছু ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। চার্বাক উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, সে ঠিক করিয়া ফেলিল এই গভীর অরণ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। আকাশ-চুম্বী বনস্পতি শ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে হাসিয়া ফেলিল। মনে হইল গুরুগম্ভীর ধর্মগ্রন্থগুলির আপাত-পবিত্রতার মধ্যে সে যেমন ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই; স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইলে এই গম্ভীরা বনভূমিও তেমনি শেষে হাস্যকর নগণ্য কিছুতে পরিণত হইয়া যাইবে না তো! কিন্তু পরমুহূর্তে তাহার মনে হইল, না হইবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার দর্শন কখনই নগণ্য হইতে পারে না, তাহাই একমাত্র সত্য। চার্বাক গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

।। বাইশ ।।

যজ্ঞের জন্য আজ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ত্রিবেদজ্ঞ মহর্ষি পর্বত ব্রহ্মা-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বয়ং সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কুমার সুন্দরানন্দ। মহর্ষি পর্বত কুমারকে বলিলেন, "দেখুন, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার কেমন যেন মন খুঁত খুঁত করছে। মনে হচ্ছে সুরঙ্গমাকে বলি দেওয়া চলবে না।"

"কেন—"

"প্রথমত, কোনো নারী-পশুকে বলি দেওয়ার বিধি কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, বলির পশুটি যতদূর সম্ভব হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। নর্তকী সুরঙ্গমা পেলব লতার মতো, তন্বী। ওর শরীরে কিছু নেই। তৃতীয়ত, বলির মাংস খেতে হয়। সুরঙ্গমার মাংস কি খেতে পারবেন? সুতরাং যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে নির্বাচন করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে। সুরঙ্গমার মতো একজন রূপসী শিল্পীর এমনভাবে জীবনাবসান হবে, এটাও কি শোভন? সুরঙ্গমার মতো নর্তকী দুর্লভ। তাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে কেন চাইছেন?"

"দুর্লভ বলেই চাইছি। আমি যতদূর বুঝেছি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করলেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুরঙ্গমাকে ভাল করে পাব বলেই তাকে ত্যাগ করতে চাই। সে নিজেও তাতে রাজী আছে। সে যদি অসম্মত হত, তাহলে আমি এ যজ্ঞের আয়োজন করতাম না।"

মহর্ষি পর্বত ক্ষণকাল কুমার সুন্দরানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ মির্মির আপনাকে যা বুঝিয়েছে, তাই আপনি বুঝেছেন। নর-বলির প্রথা এককালে এদেশেও প্রচলিত ছিল। শুনঃশেফের গল্প নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই। বলি দেওয়ার কথা ছিল রোহিতকে, কিন্তু শুনঃশেফকে তার বদলে কিনে আনা হল। সেই শুনঃশেফকেও শেষকালে দেবতারা ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে যা ইঙ্গিত আছে তাতো স্পষ্ট।"

কুমার সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "মহর্ষি, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার অবাধ্য হওয়ারও কল্পনা আমি করতে পারি না। একটি বিষয়ে শুধু আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নর-বলির সঙ্কল্প নিয়েই আমি এই গভীর বনে যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমার এ সঙ্কল্প দেবতার অগোচর নেই। এখন যদি আমি প্রতিশ্রুত বলি অগ্নিমুখে সমর্পণ না করি, দেবতা কি অপ্রসন্ন হবেন না? আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, সমস্ত দায়িত্ব আপনারই—আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করব।"

মহর্ষি পর্বত কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহলে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। সুরঙ্গমার বদলে আর কাউকে বলি দেওয়া হোক।"

"সুরঙ্গমা স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিল। আর কেউ কি রাজী হবে?"

"চেষ্টা করলে হয় তো হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে নিষাদ-পল্লী বা শবর-পল্লী থেকে কোনও বালক পাওয়া অসম্ভব নয়—"

"কিন্তু সে বালক কি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজী হবে? কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই আমার, মহর্ষি।"

"সুরঙ্গমাও কি স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"আপনি তাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন, কুমার। নারী-চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা, সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।"

"বেশ, আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

।। তেইশ ।।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুমার সুন্দরানন্দ কিন্তু সুরঙ্গমার সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুরঙ্গমার দাস-দাসীরা বলিল, "কাল রাত্রে তিনি আহারাদির পর বললেন, 'আমি কিছুক্ষণ একা একা বনে বনে ভ্রমণ করতে চাই, তোমরা সবাই শুয়ে পড়, আমার অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই।' এখনও পর্যন্ত তো তিনি ফেরেননি।"

কুমারের নয়নযুগল হইতে ক্রোধ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। দাস-দাসীদের ভর্ৎসনা করিবার উপায় ছিল না; তিনি নিজেই তাহাদের আদেশ দিয়াছিলেন সুরঙ্গমার কোনো আচরণে যেন তাহারা বাধা না দেয়।

মির্মিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মির্মির একটি অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ এক শুক-দম্পতীকে তিনি ফলাহার করাইতেছিলেন। সুন্দরানন্দ এরূপ অদ্ভুত শুক আর কখনও দেখেন নাই। তাহাদের পক্ষদ্বয়ে মরকত, বৈদূর্য, নীলা ও মুক্তার বর্ণ-দ্যুতি যে অপূর্ব সমন্বয়ে রূপায়িত হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর। তাহাদের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত মাণিক্যর মতো জ্বলিতেছিল।

"এমন অদ্ভুত শুকপক্ষী আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন—"

"এরা নিজেই এসেছে। আজ সকালে উঠে দেখি, আমার বাতায়নের ধারে পাশাপাশি বসে আছে দু'জনে। ধরতে গেলাম, ধরা দিলে না। কিন্তু পালিয়েও গেল না। সরে সরে বসছে। ফল দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছি, আমার জন্যে প্রচুর ফল আপনি কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা দু'জনে প্রায় তা নিঃশেষ করেছে। বাকী আছে এই আঙ্গুরগুলি—

মির্মিরের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি শুক ঘাড় নাড়িয়া সুমিষ্ট স্বরে কি যেন কহিল। পক্ষী-ভাষায় কি তাহার তাৎপর্য তাহা মির্মির সম্যক বুঝিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অবশিষ্ট আঙ্গুরগুলি শুক-দম্পতীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারাও ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মির্মির কহিলেন, "সুরঙ্গমাকে ডেকে আনুন। এদের দেখলে তিনি খুশী হবেন।"

"তাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি এখানে এসেছিল?"

"আজ তো আসেনি। কাল রাত্রে এসেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এসেই চলে গেল।"

"কোন্‌দিকে গেল—"

"তা তো লক্ষ্য করিনি—"

"কোথায় গেল সে তাহলে। দেখি—"

শুক-দম্পতীর দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমার সুন্দরানন্দ বাহির হইয়া গেলেন। সুরঙ্গমার অন্তর্ধানে তিনি কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়তো প্রাণভয়ে সুরঙ্গমা পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিয়াছে? মহর্ষি পর্বতের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"নারীচরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।...." কুমারের মুখ সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি বেশ্যাপল্লীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া রাজরানীর মর্যাদা দান করিয়াছেন,

সে তাহাকে এভাবে প্রতারণা করিবে? মির্মিরের নিকট হইতে বাহির হইয়া কুমার গেলেন কুলিশপাণির কাছে।

"কুলিশ, সুরঙ্গমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে খোঁজ। তাকে না পাওয়া গেলে যজ্ঞই পণ্ড হয়ে যাবে—"

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া রাজাদেশ গ্রহণ করিলেন।

সুরঙ্গমা পলায়ন করে নাই। শাখা-পত্র-বহুল এক বিরাট মহীরুহে আরোহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সে আত্ম-বিশ্লেষণে নিরত ছিল। একটি কথাই বিশেষভাবে সে চিন্তা করিতেছিল। এই যজ্ঞে সে আত্মাহুতি দিতে সম্মত হইল কেন? মির্মিরের কথায় সত্যিই কি সে বিশ্বাস করিয়াছিল কুমার তাহাকে যজ্ঞে বলিদান দিয়া তাহারই ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি সত্যই কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবেন বলিয়াই এমনভাবে ত্যাগ করিতেছেন? মির্মির তানেকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন কি না, পাইয়া নারী-লোভ-মুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে মির্মিরের সহিত রাত্রিবাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত অতিশয় ধূর্ত, কৌশলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মির্মির তানেকে যজ্ঞে ত্যাগ করিয়াই সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন, কুমারও কি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইবেন? কুমারের বলিষ্ঠ যৌবন, প্রবুদ্ধ কল্পনা, অগাধ ঐশ্বর্য কি কেবল তাহার স্মৃতি মাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবে? সহসা তাহার নিরালার কথা মনে পড়িল। সুরঙ্গমা আসিবার পূর্বে নিরালাই ছিল রাজনর্তকী। সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল! কুমার তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নিরালার অপরূপ নৃত্য-নৈপুণ্য, অপূর্ব কণ্ঠ-সঙ্গীত কুমারকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, কুমার তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, 'ছন্দ-কিন্নরী'। পুরাতন পরিচারিকা শারী তাহাকে বলিয়াছিল নিরালা তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার যেদিন বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন, সেই দিনই সে মরিল। সুরঙ্গমার মনে হইল সে-ও যদি মরে, কুমার কি তাহাকে মনে রাখিবেন? ছন্দ-কিন্নরীকে কি তিনি মনে রাখিয়াছেন! কই, তাহার কথা একদিনও তো সে কুমারের মুখে শোনে নাই! কুমারের আচরণে তাঁহার পূর্ব-প্রণয়ের কথা একবারও তো আভাসিত হয় নাই; পুরুষ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সুরঙ্গমার কি আজও ভ্রান্তি আছে? সে কি জানে না যে পুরুষ মাত্রেই শিশু-প্রকৃতির, নূতন ক্রীড়নক পাইলেই পুরাতনের কথা বিস্মৃত হয়? তবে সে এমন করিয়া আত্মবিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কেন! সত্যই কি যজ্ঞে তাহার আস্থা আছে? সত্যই কি সে বিশ্বাস করে যে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বিদেহী আত্মা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে? যদি করেই, তাহাতেই বা কি! যে দেহটা লইয়া তাহার কারবার, সেই দেহই যদি না থাকে, স্বর্গের প্রয়োজন কি চার্বাকের কথা সহসা মনে হইল। কিছুদিন পূর্বে ব্রহ্মা-প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হইয়াছিল, তখন চার্বাক যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল। চার্বাকের প্রফুল্ল প্রদীপ্ত নয়নযুগল তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফুটিয়া উঠিল যেন। চার্বাকের কথাগুলি আবার যেন সে শুনিতে পাইল—"তুমি যদি সাধারণ কোনো নারী হতে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না! কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে মনে হচ্ছে তা নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন-বিশিষ্ট কোনোও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি

বিশ্বাস করছ এই ধারণাটা।...." সেদিন সুরঙ্গমা চার্বাককে বলিয়াছিল, "আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি.... " সত্যই কি সে করে? সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে সেও ইহলোক ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না, কখনও করে নাই। তবে সে চার্বাকের কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল কেন! করিয়াছিল চার্বাককে নিরস্ত করিয়া আরও উতলা করিবার জন্য। ঈশারায় ইঙ্গিতে এই কথাই সে বলিত চাহিয়াছিল— 'তুমি ভাবিয়াছ তোমার বুদ্ধির দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসাইয়া দিবে? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে যুক্তির জাল দিয়া ধরা যায় না। প্রেম-ডোর ছাড়া অন্য কোনও ডোরে আমাকে বাঁধা সম্ভব নয়। কুমারের প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়াই তাহার কাছে আছি, তাহার চতুরানন বিগ্রহকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তোমার প্রেমে যদি পড়িতাম তাহা হইলে তোমার নাস্তিক্য-বাদকেও মানিয়া লইতাম। আমার কাছে যুক্তি আস্ফালন বৃথা। আমি জলের মতো। যখন যে পাত্রে থাকি, সেই পাত্রের আকার ধারণ করি। সহসা তাহার নজরে পড়িল যুপকাষ্ঠটা পোঁতা হইতেছে। মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরন যেন বহিয়া গেল। ওই যুপকাষ্ঠমূলে সুরঙ্গমা শেষ হইয়া যাইবে? হায়, হায়, কেন সে এই সর্বনাশা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে রাজী হইয়াছিল? কেন? নিগূঢ় কারণটা হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল। সে আশা করিয়াছিল কুমার প্রতিবাদ করিবে, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কুমার কিছুতেই এ নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দিবে না। কিন্তু কুমার তো কিছুই করিল না। যজ্ঞের আয়োজন তো মহাসমারোহে চলিতেছে। ওই সিংহটা যেমন কামের প্ররোচনায় বন্দী হইয়াছে সে-ও তেমনি অহঙ্কারের প্ররোচনায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের কি কোনও ভিত্তি নাই? কুমার কি সত্যই তাহাকে বলিদান দিবেন? মনে হইল পুরুষদের চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈরাগ্য সে লক্ষ্য করিয়াছে যাহা দুর্ভেদ্য যাহা দুর্বোধ্য, যাহা রহস্যময়, আতঙ্কজনক। অন্যমনস্ক সুন্দরানন্দকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করিয়াছে। যেন কোনো সীমাহীন সাগরে তাহার মন ছিন্ন-বন্ধন তরীর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে তাহার দেহটা, সে নাই। রাজ্য, ঐশ্বর্য, সুরঙ্গমা সকলকে পিছনে ফেলিয়া তাহার মন পাড়ি দিয়াছে অজানার উদ্দেশে। আর একটা কথাও তাহার মনে হইল, পুরুষদের অহঙ্কারও কম নয়। নিজেদের কথার মর্যাদা রাখিবার জন্য তাহারা অপরের সর্বনাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। মনে পড়িল রামের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা। রাম কি সীতাকে কম ভালবাসিত? তবু বিসর্জন দিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র কি শৈব্যাকে কম ভালবাসিত? তবু তাহাকে ভিখারিণী করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। পুরুষরা সব পারে। শিবি নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, দধীচি অস্থিদান করিয়াছিল। পুরুষদের অসাধ্য কিছু নাই। সহসা চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া বন্দী সিংহটা গর্জন করিয়া উঠিল। পৌরুষের দম্ভ সিংহ-গর্জনে যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিকই বলিয়াছ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও পৌরুষ নিজের মহিমা ঘোষণা করে। জাগ্রত পৌরুষকে কোনো মায়া অভিভূত করে না, কোনো বন্ধনই বাঁধে না। কোনও বাধা তাহার কাছে দুস্তর নয়, কোনও বিপদ ভয়ঙ্কর নয়। যে পৌরুষ নিজেকে জানিয়াছে সে নির্ভীক, সে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে, পিছন ফিরিয়া চায় না। সুন্দরানন্দের কি এই পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছে? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে সুরঙ্গমার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথ ধরিল। সুন্দরানন্দের এই পৌরুষকেই তো সে ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ সেই পৌরুষের আর একটা রূপ দেখিয়া ভয় পাইতেছে কেন! কিন্তু ভয় তাহার করিতেছিল। প্রোথিত যূপকাষ্ঠটার দিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল। নির্বিকার, শুষ্ক-প্রাণহীন কাষ্ঠ—মানুষ, মহিষ, ছাগ-

শিশু তাহার কাছে সব সমান! সহসা সুরঙ্গমা চমকাইয়া উঠিল। শাখা-পত্রের মধ্যে কথা কহিতেছে কে! উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

"বাণী, বৃহদারণ্যক বলে একটা উপনিষদ আছে, জান?"

"জানি। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশই বৃহদারণ্যক। কেন—"

"তাতে একটা মজার কথা আছে। কোনো এক ঋষি তাতে আমাকে ক্ষুধা বলে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন ক্ষুধা মানে মৃত্যু—এই মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ আমি। তাই বোধ হয় এত ক্ষিধে পাচ্ছে আজ। ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মির্মিরের সমস্ত ফলগুলো নিঃশেষ করেছি তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে ফেলি। সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাক, নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হবে তারপর। চুপ করে আছ যে—"

"তাই করুন—

"চার্বাক আর শিখর সেনের ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। করতেই হবে একটা কিছু। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে মনে, মৃত্যুরূপী ক্ষুধা অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরাতনকে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে—"

"এবার স্বৈরচর সৃষ্টিতে মন দেবেন?"

"কি করব জানি না। উপাদান আর ইচ্ছা দুই-ই আমার মনের ভিতর আছে। দুটোর সমন্বয়ে কি যে গড়ে উঠবে তা আমিও জানি না। বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথমে ছিলাম ক্ষুধা, তারপর হল জল, তারপর পৃথিবী, তারপর সূর্যনক্ষত্র, তারপর কাল। আমার প্রেরণা যে কি রূপ নেবে তা আমিও জানি না। এখন এই গল্প দুটো শেষ করা যাক। এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে, সে জ্ঞান ওর নেই। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু বাণী, কি খাই বল তো। পক্ষীরূপ তো বড় সাংঘাতিক রূপ, সর্বদাই মনে হচ্ছে কি খাই, কি খাই—"

"বনে অনেক ফল আছে, চলুন খুঁজে দেখা যাক।"

"তাই চল।"

সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে দেখিল বৃক্ষশিখর হইতে দুইটি অপরূপ শুকপক্ষী উড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে সে তাহাদের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল, অতি শৈশবে মাতামহীর নিকট সে এক রূপকথা শুনিয়াছিল, সে রূপকথায় এক পক্ষীদম্পতী মনুষ্য-ভাষায় কথা কহিত। ইহারাই কি তাহারা? কি বলিল কিছু বোঝা গেল না তো। বৃহদারণ্যক কি? বাণীই বা কে। একটি কথা কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সেই কথাটাই তাহার কানে বাজিতে লাগিল—"এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই।" কোন্ মেয়েটার কথা বলিল উহারা! তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল কি? সিংহটা আবার গর্জন করিয়া উঠিল সহসা। সুরঙ্গমা চাহিয়া দেখিল সিংহটা উর্ধ্বমুখে তাহাকেই দেখিতেছে। মনে হইল সে-ও যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে বসিয়া পড়িল এবং সামনের থাবার মুখটা রাখিয়া উর্ধ্ব দৃষ্টিতে এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ—অমন নাগালের বাহিরে বসিয়া আছ কেন। আর একটু নামিয়া এস না। সুরঙ্গমা মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার আমন্ত্রণের উত্তর দিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। খাচার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সিংহটাও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং

উন্মুখ আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, আর গর্জন করিল না কেবল তাহার কণ্ঠস্বর হইতে সম্ভবত তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা গর-গর গর-গর শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মাংস খাবার ইচ্ছে না কি? আমি কি ভেড়া হরিণের মতো সাধারণ পশু? কাল রাত্রে তো গান শুনেছ। আজ নাচ দেখবে? দেখ—" সুরঙ্গমা সিংহের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার কেশ আলুলায়িত হইল, বেশবাস বিস্রস্ত হইল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে নাচিয়া চলিল। উন্মাদিনীর মতো নাচিতে লাগিল।

সহসা তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল শুধু সিংহ নয়, স্বয়ং কুমারও একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিতেছেন। কুমারকে দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল এতক্ষণ সে যাহা ভাবিতেছিল তাহা ভুল, কুমারের চোখের দৃষ্টি হইতে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে ঔদাসীন্যের কোনও চিহ্ন নাই—তাহা অনুরাগপূর্ণ। কুমার আগাইয়া আসিলেন।

"সুরঙ্গমা, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি চারিদিকে।"

"ভয় হয়েছিল না কি যে আমি পালিয়ে যাব? আমি ছাগল বা ভেড়ার মতো সাধারণ পশু নই কুমার, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আমি পালিয়েও যাব না, আপনার সুখের জন্যে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও ইতস্তত করব না।"

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার পুষ্পিত দেহ-লতার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগলে কৌতুকদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ—"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম চারিদিকে। মরবার আগে পৃথিবীটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম একবার।"

"সিংহটার সামনে নাচছিলে দেখলাম।"

"ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে চাইছে। কিন্তু আমার দেহটা তো দেবতার উদ্দেশে আগেই নিবেদন করেছি, তাই ওকে নাচই দেখাচ্ছিলাম শুধু। গানও শুনিয়েছি কাল রাত্রে—"

সুন্দরানন্দের চোখের দৃষ্টি আরও কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"একটা হিংস্র পশুর প্রতি এ পক্ষপাত কেন বুঝতে পারছি না ঠিক—"

মুচকি হাসিয়া সুরঙ্গমা বলিল—"সম্ভবত ও নিছক পশু বলেই। চলুন, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক এবার। যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে—"

"কাল—"

"আজ কি আমাকে উপবাস করে থাকতে হবে?"

"আমি ঠিক জানি না। মহর্ষি পর্বত কিন্তু তোমাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে চাইছেন না।"

"কেন—"

"তিনি বলছেন নারী-পশু যজ্ঞে বলিদান দেওয়ার রীতি নেই। তিনি বলছেন নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে—"

"নিষ্ক্রয় ব্যাপারটা কি?"

"তোমার বদলে আর একটি মানুষ বলি দিতে। মহর্ষি বলেছেন, যথোচিত মূল্য দিলে মানুষ পাওয়া যাবে।"

"আপনি এ ব্যবস্থায় রাজী হয়েছেন?"

"এখনও হইনি। কাউকে টাকার জোরে বশীভূত করে তারপর তাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিল বলেই এ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। তোমারই অনুরোধে করেছিলাম। মির্মিরের কথার উত্তরে তুমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলে—যজ্ঞের আয়োজন করুন, আমিই তাতে আত্মাহুতি দেব! জানি না এ কথা কেন বলেছিলে তুমি—"

"কেন বলেছিলাম তা যদি না বুঝতে পেরে থাকেন, তাহলে বুঝিয়ে বলবার দরকারও নেই। ঠিক বোঝানও যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি আত্মাহুতি দিতে এখনও রাজী আছি, আমার মত এতটুকু বদলায়নি। তবে মহর্ষি পর্বত যদি আমাকে অমনোনীত করেন, সে আলাদা কথা—"

"তুমি যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেই চাইছ কেন।"

"আপনাকে ভালবাসি বলে। ওই ম্লেচ্ছ মির্মির যে তার তানেকে বিসর্জন দিতে পেরেছে বলে আপনার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাঁকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমিও তাঁর তানের চেয়ে কিছু কম নই। আর আপনিও তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নন।"

"কিন্তু আমি ভাবছি—"

কুমার সুন্দরানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেলেন।

"কি ভাবছেন—"

সুরঙ্গমা সোৎসুকে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভাবছি মির্মিরের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তোমাকে চিরকালের মতো হারানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

"ম্লেচ্ছ মির্মির কিন্তু তানেকে হারিয়েই চিরকালের মতো পেয়েছে, আপনিও হয়তো পাবেন আমাকে, সেই ভরসাতেই যজ্ঞের আয়োজন করেননি কি?"

"না। আমি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম আমার দেশের মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু এখন ভাবছি ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিছুক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি—"

সুরঙ্গমার কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরন বহিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরানন্দ বলিতে লাগিলেন—"তাছাড়া, স্পর্ধা করে কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। তার বৈশিষ্ট্য বিনয়ে, নীরব-সাধনায়, নম্রতায়। তোমাকে যজ্ঞে যদি আহুতি দিতেই হয়, তা তোমার এবং আমার প্রয়োজনের জন্য দেব। তার সঙ্গে মির্মিরের সম্পর্ক কি? তুমি ভেবে বল তোমার অভিপ্রায় কি? যা বলবে তাই হবে—"

সুরঙ্গমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি যদি এখন আত্মাহুতি দিতে রাজী না হই, আপনি কি যজ্ঞ বন্ধ করে দেবেন? এত আয়োজন করেছেন।"

"যজ্ঞ বন্ধ করব না। মহর্ষি পর্বত যা ব্যবস্থা করবেন তাই করব। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, তাঁর আদেশই পালন করতে হবে। শুধু একটি অনুরোধ তাঁকে করব, টাকা দিয়ে কিনে এনে তিনি জোর করে কাউকে যেন বধ না করেন—"

"কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ কি প্রাণ দিতে রাজী হবে! কোনও উপায়ে তাকে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই।"

"তুমি তো স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজী হয়েছিলে—"

"আমি তো অনেক আগেই আপনার বশীভূত হয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য, আপনার সম্মান রক্ষার জন্য, আমি সমস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখনও আমি আত্মাহুতি দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি।"

"না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, চল, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—"

সিংহটা আর একবার গর্জন করিয়া উঠিল।

"ও বেচারীর আর একটু নাচ দেখবার ইচ্ছে আছে। আপনি ওই পাথরটার উপর বসুন না, ওকে আর একটু নাচ দেখাই।"

সুন্দরানন্দ সহসা সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তাহার পর প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়া বসিয়া বলিলেন, "নাচবার আগে মাথায় কিছু ফুল পরে নাও। ওই যে লতায় থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে, দাঁড়াও পেড়ে দিই আমি—"

নিকটেই একটা বন্যলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছিল, সুন্দরানন্দ উঠিয়া গিয়া কিছু ফুল পাড়িয়া আনিলেন এবং সুরঙ্গমাকে সাজাইতে লাগিলেন। ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া সুরঙ্গমা নাচিতে লাগিল। মনে হইল কোনও অপ্সরী বুঝি নাচিতেছে।

।। চব্বিশ ।।

রাত্রির ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহটা সহসা গর্জন করিয়া উঠিল। যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব অন্ধকারকে শব্দ-খচিত করিয়া একটা অদৃশ্য জগত সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রচণ্ড গর্জনে তাহা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন। সেই নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, পাখা ঝটপট করিয়া একদল বাদুড় উড়িয়া গেল। একটি বৃক্ষতলে চার্বাক নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল। অরণ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত দিন যে দুরূহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলে তাহার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামিয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল-সে। সিংহের প্রচণ্ড গর্জনে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কি আকাশ-লোকে বসিয়া আছে? চতুর্দিকে এত নক্ষত্র কেন! শব্দটা কি বজ্রের? কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাহার এ ভ্রম ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিল জোনাকী-পরিবৃত হইয়া সে বসিয়া আছে, গর্জনটা সিংহের, বজ্রের নয়। সুরঙ্গমা কখন আসিবে? আসিবে কি না? সিংহটা সহসা গর্জন করিয়া উঠিল কেন? কাছাকাছি কেহ আসিয়াছে কি? গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করা সমীচীন হইবে কি না, এই ধরনের চিন্তা তাহার মনে পর পর জাগিতে লাগিল। কিন্তু একটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, চার্বাক গাছের তলার ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ভাবিল সুরঙ্গমা যদি সত্যই আসে, কোনো না কোনো সংকেত দ্বারা সে নিশ্চয়ই আপনার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু চার্বাক বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না।

পার্শ্ববর্তী একটা ঝোপের ভিতর হইতে কোঁক্ কোঁক্ শব্দ হইতে লাগিল। চার্বাকের মনে হইল সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বিষধর সর্পের এত নিকটে বসিয়া থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। গাছের নীচে অন্ধকার সূচীভেদ্য ছিল, বাহিরে আসিয়া চার্বাক অনুভব করিল—আকাশের অগণিত নক্ষত্র অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিয়াছে। স্বল্পালোকিত অন্ধকারে সিংহের খাঁচাটা দেখা যাইতেছে। জমাট অন্ধকার আত্মগোপন করিয়া চার্বাকের ব্যক্তিত্বও যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল বটে, কিন্তু অতঃপর কি করা কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্বস্তিও ভোগ করিতে লাগিল। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে সে? অপেক্ষা করাও কঠিন। রাত্রি যত বাড়িতেছে, গভীর অরণ্য তত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। তাছাড়া অসংখ্য মশা। কোথাও সুস্থির হইয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার উপায় নাই। এত কষ্ট সত্ত্বেও কিন্তু চার্বাক অবিচলিত ছিল। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা তাহার একবারও হয় নাই। বরং কষ্ট যতই বাড়িতেছিল ততই তাহার সমস্ত হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিবার আগ্রহ তো তাহার ছিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল এই বেদ-পন্থী ভণ্ডদের যজ্ঞটা পণ্ড করিয়া দিবার। সুরঙ্গমাকে সে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া আগ্রহটা হয়তো তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল, কিন্তু সুরঙ্গমা না হইয়া অন্য কোন নর বা নারী যদি যজ্ঞীয় পশু-রূপে মনোনীত হইত, তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যও চার্বাক অনুরূপ কষ্ট-স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইতে না। শুধু প্রেমের জন্য নহে, একটা বিশেষ আদর্শের জন্য কষ্ট সহ্য করিতেছিল বলিয়া চার্বাকের আনন্দও হইতেছিল। সিংহের পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল। চার্বাক পুনরায় ঘনতর অন্ধকারে জন্য গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় গাছের উপর হইতে সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"মহর্ষি, আপনি এসেছেন না কি? আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কোথায় তুমি?"

"গাছের উপর।"

"নেমে এস।"

সিংহ পুনরায় গর্জন করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"অনেকক্ষণ।"

"আমিও অনেকক্ষণ এসেছি।"

"সিংহটা কি তোমাকে দেখেই গর্জন করছে।"

"হ্যাঁ। ও, আমার নাচ দেখতে চায়। চলুন, এখান থেকে সরে যাওয়া যাক।"

"কোথায় যাওয়া যায় বলতো। এই জঙ্গলে তো সুস্থির হয়ে কোথাও বসবার দাঁড়াবার উপায় নেই।"

"আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।"

"আমার সাহসের অভাব নেই। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারি।"

"মৃত্যুর মুখেই যেতে হবে, যদি যান।"

"কোথা যেতে হবে বল!"

"যজ্ঞের জন্য অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে অনেক ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সব ঘরগুলো কাজে লাগেনি। পশ্চিমদিকে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়ার বিপদ আছে, যদি কেউ এসে আপনাকে হঠাৎ চিনে ফেলে, তাহলে আপনাকে বন্দী করবে। আপনার অপরাধ প্রমাণ করা শক্ত হবে না, ধারামতী মহর্ষি পর্বতের সঙ্গেই এসেছে এ কথা তো আগেই জানিয়েছি আপনাকে।"

"তার চেয়ে চল না এখনই এ অরণ্য ত্যাগ করি। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে, রাত্রির অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না—"

"মাপ করবেন মহর্ষি, তা আমি পারব না। আমি সামান্যা নর্তকী হতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ আমি করব না। কুমারকে না জানিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পালাতে পারব না। তবে আপনার বক্তব্য আমি শুনব—"

"কিন্তু তা শুনে লাভ কি—যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে বসে থাক? তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, এইটেই হল আমার বক্তব্যের মূল কথা—"

"আপনার বক্তব্য শুনে যদি মনে হয় যে আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু কুমারকে বলে যাব। লুকিয়ে পালিয়ে যাব না—"

"কিন্তু কুমার কি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন?"

"তিনি তো চিরকালের মতোই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এ যজ্ঞে তো আমাকেই বলিদান দেওয়া হবে। কুমার তো আপত্তি করেননি। আমি যদি চলে যেতে চাই, তাহলেও আপত্তি করবেন না।"

"তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কি তোমাকে বলিদান দেওয়া হচ্ছে?"

"হ্যাঁ—"

"তোমার এরকম ইচ্ছা করার মানে?"

"মানে একটা আছে বই কি! সব কথা শুনতে যদি চান তাহলে চলুন পশ্চিম দিকের একটা খালি ঘরে গিয়েই ঢোকা যাক। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।"

"চল—"

অরণ্যের অন্ধকারে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিংহটা পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল।

বিচিত্র-পক্ষ শুকপক্ষীদ্বয় সেই অরণ্যমধ্যে বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় পাশাপাশি বসিয়া ছিল।

প্রথম শুকপক্ষী দ্বিতীয় শুকপক্ষীকে বলিল, "মানুষের ভাষায় এখন কথা কইব না। এ গাছে অনেক পাখি আছে, তারা ভয় পাবে। তুমি শুকের ভাষায় উত্তর দিও। আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে খুব। সরলভাবে উত্তর দিও। তোমার কি আনন্দ হচ্ছে?"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"হচ্ছে। আপনার আনন্দ হলে আমার হবে না?"

"আমার আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি সেটা?"

"পারছি বই কি—"

"সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি চিরকাল, কত কোটি কল্প এল আর গেল, এ আনন্দের আর শেষ নেই। সৃষ্টির আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। জানি না পালন করে বিষ্ণু এ আনন্দ পাচ্ছে কি না। পাচ্ছে নিশ্চয়। ধ্বংস করে ময়শাও কি আনন্দ পাচ্ছে?"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর কি আলাদা?"

"আলাদা নয়, কিন্তু আলাদা করে ভাবতে ভাল লাগছে! যে-আমি সৃষ্টি করছি, সেই-আমি আবার অন্যরূপে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছি, একথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ওই চার্বাক-সুরঙ্গমা শিখর-অবন্ধনা কেউ থাকবে না জানি, কিন্তু আমি নিজেই ওদের ছবি এঁকে আবার নিজেই ছবি মুছে ফেলেছি—ভাবতে কি রকম লাগছে। নিজেকে এতটা ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না বাণী।"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"তা না দিতে পারি। কিন্তু আসলে আপনি একটি খামখেয়ালী শিশু।"

"সত্যি?"

কথাটা বলিয়া প্রথম শুক শুকপক্ষীদের ধরনে খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

পঁচিশ

কবি তন্ময় হইয়া শিখরের গল্প লিখিতেছে

"সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। যে আলেয়াকে আমি স্বর্গের দেবী ভেবেছিলাম, যাকে কল্পনা-কাননের অপ্সরী-রূপে চিত্রিত করেছিলাম মানসপটে, সেই আলেয়াই আমার সমস্ত স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে সেদিন। একটা তাজমহল যেন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল, রূপান্তরিত হয়ে গেল ইট-চুন-সুরকির স্তূপে। ঘটনাটা ঘটল যখন, আমি বিচলিত হইনি, এমনকি বিস্মিতও হইনি। আমার মনের মধ্যে যে নির্বিকার দ্রষ্টা আছেন তিনিই বোধহয় দেখছিলেন তাকে তখন, নিতান্ত প্রত্যাশিত ঘটনারূপেই দেখছিলেন। মনের মধ্যে এই দ্রষ্টার অস্তিত্ব সব সময়ে টের পাই না আমরা, জীবনে বৃহৎ বিপর্যয় যখন আসে, তখনই আত্মপ্রকাশ করেন তিনি, সত্তার যে অংশটা সুখদুঃখে বিচলিত হয়, সেটাকে আড়াল করে ফেলেন কিছুক্ষণের জন্য। সার্জনরা বড় বড় অপারেশন করবার সময় ক্লোরোফর্ম দেয় যেমন, অনেকটা তেমনি। ক্লোরোর্ফম কিন্তু চৈতন্যকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে না, নির্বিকারও বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারি না; পরে আমি বিচলিতও হয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম, আলেয়ার সান্নিধ্য লাভ করবার একটা পথ পেয়ে পুলকিতও কম হইনি। কিন্তু স্বর্গের দেবী মানবীতে রূপান্তরিত হওয়াতে এখন কেমন যেন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি; মনে হচ্ছে আমি নিজেই যেন কোনো স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছি, নাগালের বাইরে দূরবীণের ভিতর দিয়ে যে আলেয়াকে দেখতাম, সে আলেয়া যেন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, আর তাকে পাব না।"

শিখরের ডায়েরিতে শিখরের জীবনের যে মর্মান্তিক পরিণতি দেখছি, আমার জীবনেও তেমনি কিছু ঘটবে না কি! আশা এবং আশঙ্কার দোলায় দুলছে মনটা। লোভ হচ্ছে, ভয়ও

হচ্ছে। শিখর অবন্ধনাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে যেমন কাছে পেয়ে গিয়েছিল, আলেয়াকে আমিও তেমনি পেয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আলেয়া যে আমার কপাটে করাঘাত করে আমার ঘরে এসে হাজির হবে একথা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু হাজির হল যখন—তখন আমি বিস্মিত হইনি, আমার সপ্রতিভতা আলেয়াকে বিস্মিত করেছিল কি না কে জানে। কপাট খুলেই যখন দেখলাম আলেয়া দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সাজসজ্জা করে তখন খুব সপ্রতিভভাবেই আমি বলেছিলাম—"ও, তুমি। তারপর, কি খবর—"

এমনভাবে বললাম যেন আমার ঘরে তার আগমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার একটা। আলেয়া হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

"আমার ভয় হচ্ছিল আপনি হয়তো আমাকে চিনতেই পারবেন না।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে মৃদু হেসে বললাম—"না, তোমাকে ভুলিনি। কোনও দরকারে এসেছ না কি? না, এমনি দেখা করতে। সব—"

আমার ইজিচেয়ারটায় বসল আলেয়া, যে ইজিচেয়ারে বসে জানলার ফাঁক দিয়ে দূরবীণ-সহযোগে রোজ আমি তাকে দেখতাম, সেই ইজিচেয়ারটাতেই বসল সে। মনে হল অসম্ভব সম্ভব হল, দূর নিকটে এল, অসীমা ধরা দিলে বুঝি সীমার মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটা ভাঙল।

আলেয়া বললে—"আপনি যে এত কাছে আছেন তা জানতাম না। জানলে আগেই আসতাম আপনার কাছে। কাল হঠাৎ দেখতে পেলাম আপনি ফুটপাথ থেকে এই বাড়িটাতে ঢুকছেন। খবর নিয়ে জানলাম এই বোর্ডিং-এ-ই আছেন আপনি অনেক দিন থেকে।"

"দরকার আছে কোনো—?"

"আছে বই কি। প্রথমেই একটা কথা জিজ্ঞেস করছি কিছু মনে করবেন না—আপনি কি লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়েছেন?"

"না।"

"তাহলে আমার কম্পানিতে কিছু করুন। অন্তত দশ-হাজার—"

এই বার আমি একটু অবাক হলাম।

"তোমার কম্পানিতে, মানে?"

"আমি আজকাল ইনসিওরেন্সের দালালী করছি যে!"

বলেই চক্ষু আনত করে শাড়ির একটা খুঁট পাকাতে লাগল, আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি হাসলে একটি।

"নিরুপমবাবু কোথা?"

"তিনি এলাহাবাদেই আছেন।"

আলেয়ার মুখভাব কঠিন হয়ে গেল সহসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল। আলেয়া তাড়াতাড়ি জানলার কাছে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—"আসছি এখুনি, এক মিনিট—" তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "ফর্ম নিয়ে আসব ওবেলা? শুধু নিজে ইনসিওর করলেই হবে না, আমাকে সাহায্যও করতে হবে একটু! আপনার তো অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা—"

কণ্ঠস্বরে আবদারের সুর বাজল একটু। চোখের দৃষ্টিতে চকমক করে উঠল বিদ্যুৎ—যদিও মিনতির বিদ্যুৎ, নিঃশব্দে বজ্রপাতও হল যেন একটা।

বললাম, "আচ্ছা—"

"চলি তাহলে—"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম।

দেখলাম বোর্ডিংয়ের সামনে বেশ দামী বড় মোটর দাঁড়িয়ে আছে একখানা। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন তাতে বলিষ্ঠ একটি ভদ্রলোক। মোটর চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল না। আশ্চর্য!

এ ঘটনার পর দূরবীণের প্রয়োজনটা আরও বেড়ে গেল। কাজ থেকে ফিরে এসে সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি জানলার ফোকরে চোখ লাগিয়ে বসে থাকতাম। আলেয়াকে দেখবার জন্যে নয়; তার সঙ্গীটিকে দেখবার জন্যে। এই সময় শিখর সেনকেও লক্ষ্য করেছিলাম তার অজ্ঞাতসারে। লক্ষ্য করে যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না বোধহয়। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারিনি। যা দেখেছিলাম তা শিখরকেই বলেছিলাম একদিন রহস্যভরে। সে রহস্যের এ পরিণাম যে হবে তা কে জানত!

শিখর সেনের ডায়েরি থেকে, এবার উদ্ধৃত করছি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে তাহলে।

"নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনার সম্বন্ধে যে সব ভয়ানক খবর সংগ্রহ করেছি, সে সবের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আর কারো সম্বন্ধে যদি এ সব খবর পেতাম তাহলে সে এতক্ষণ জেলের বাইরে থাকত না, নিশ্চয়ই থাকত না। অবন্ধনা কিন্তু আছে। পুলিশ অফিসার হিসাবে নির্মম হয়ে আমি এতদিন কর্তব্য পালন করে এসেছি, আইনের সীমাকে এতটুকু লঙ্ঘন করিনি, ভিক্টর হুগো'র অমর চরিত্র জ্যাভার্টই এতদিন আমার আদর্শ ছিল, কিন্তু এখন আমি সে আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছি। অবন্ধনাকে আইন-সিংহের কবলে নিক্ষেপ করতে ইতস্তত করছি। গীতা পড়েছি। একবার নয়, অনেকবার। শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বলেছিলেন, "নির্বিকার অবিচলিত থেকে তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, তুমি ভাবছ আত্মীয়স্বজনকে বধ করব কি করে? ওটা তোমার অহংকার। তুমি কাউকে বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। সে ক্ষমতা তোমার নেই! এই দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা আগে থাকতেই মরে আছেন.....।" এসব শ্লোক কণ্ঠস্থ আছে আমার। কিন্তু কার্যকালে কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অবন্ধনা পাপীয়সী, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার ফাঁসি হবে। আমার বিবেকের একটা অংশ বলছে তার ফাঁসি হওয়াই উচিত, কিন্তু আর একটা অংশ বলছে, যে সমাজ তাকে পাপীয়সী করে তুলেছে সেই সমাজেরই ফাঁসি হওয়া উচিত, ওর কোনো দোষ নেই, সমাজের বিধি ব্যবস্থার দোষেই ওই অম্লান কুসুমের গায়ে ধুলো-কাদা লেগেছে। ধুলো-কাদা পরিষ্কার করে দিলেই আবার ও অম্লান হবে। তাই কর। এই দ্বিধাবিভক্ত বিবেক নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। কি করি? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলাম তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করব, যদিও বিবেকের জ্যাভার্ট-ভক্ত অংশটি বারবার বলতে লাগল, অন্যায় করছ।

....বোর্ডিংয়ের বাৎসরিক সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। চুনকাম হয়ে গেছে, রং লাগানো হচ্ছে দরজা-জানলায়। এসব না করলেও নয়, অথচ কি বিরক্তিকর।

অবন্ধনার কাছে সেদিন সন্ধ্যার পর যখন গেলাম, দেখলাম সে বোর্ডিংয়ের ম্যানেজরের সঙ্গে কথা কইছে।

"আমার ঘরে কাল হাত দেবেন বলছেন? বেশ, আমি জিনিস-পত্তর সরিয়ে রাখব। আর একটা কাজও কিন্তু করতে হবে—"

"কি বলুন—"

"দেখছেন না, ঘরে ঢোকবার দরজাটার সামনে কি হয়ে আছে! মেঝেটা ফেটে সুরকি বেরিয়ে পড়েছে একেবারে। ওটা ঠিক করিয়ে দিন—"

"দেব। ভাল করে সিমেন্ট করিয়ে দেব।"

ম্যানেজার আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চলে গেলেন। অবন্ধনার সম্বন্ধে ম্যানেজারের হৃদয়েও একটু 'কোমল কোণ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'সফ্‌ট কর্নার, আছে বলে সন্দেহ হল। ম্যানেজার চলে যাবার পর অবন্ধনার চেহারা বদলে গেল যেন। নূতন লোক হয়ে গেল সে। হেসে বললে, "তোমার উপর রাগ করেছি।"

"কেন?"

"কাল পরশু দু'দিন আসনি কেন?"

"কাজে ব্যস্ত ছিলাম—"

"রাত্রেও ফেরনি?"

"ফিরেছিলাম অনেক রাত্রে। তখন আর তোমার ঘরে আসাটা উচিত মনে হল না। ঘুমিয়েও পড়েছিলে হয়তো—"

আমার দিকে একটা বক্র কটাক্ষ করে অবন্ধনা বললে—"তোমার উচিত-অনুচিত বোধটা এখনও বেশ টনটনে আছে দেখছি। আশ্চর্য মানুষ তুমি—"

সিগারেট কেস থেকে বার করে একটি সিগারেট বেশ নিপুণভাবে ধরালে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, হেসে বললে—"আমাকে খুব ঘেন্না কর, নয়?"

তার চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল একটা। মনে হল সত্য উত্তরটা শোনবার জন্য সে কৌতূহলী, অথচ তার সঙ্গে স্পর্ধার ভাবও রয়েছে একটা—"তুমি ঘেন্না করলে বয়েই গেল আমার"—এই গোছের একটা ভাব।

বললাম, "ঘেন্না করলে তোমার কাছে আসতাম না।"

"আস ভদ্রতার খাতিরে। ছেলে-বেলার কথা মনে করে। তাছাড়া আমি সত্যই তো তোমার শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্তও নই।"

তারপর হঠাৎ হেসে বললে—"বুঝি গো বুঝি, সব বুঝতে পারি আমি। আমাকে যতটা বোকা তুমি মনে কর, ততটা বোকা আমি নই।"

তার হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম একটু। মনের অবচেতনলোকে হয়তো ভাবছিলাম—ওই কালোবাজারীটা একে ইন্ধন করে কত লোকের কত কামনার আগুনই না জানি জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বললাম, "বোকা তুমি মোটেই নও, বরং একটু বেশী চালাক, আর সেই জন্যেই বোধহয় মাত্রা ঠিক রাখতে পারছ না। অতি-বুদ্ধিটা বিপজ্জনক।"

"মানে—"

তার মুখের হাসি নিবে গেল হঠাৎ।

খানিকক্ষণ আমাদের দু'জনের কারো মুখ দিয়েই কোনো কথা বেরুল না। আমার মনে হল এইবার কথাটা পাড়াই ভাল। বললাম—"তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনছি।"

"কি শুনছ—"

বললাম সব। শুনে আবার সে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ক্রমশ তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আগুন। কিন্তু সে কোনও উত্তর দিলে না। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শেলফ থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে তার বিছানার শিয়রের দিকে যে টেবিলটা ছিল তারই উপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বইগুলোর পিছন দিকে সায়ানাইডের যে শিশিটা লুকোনো ছিল সেটাও বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে একটা বইয়ের আড়ালে রেখে দিলে সেটা। তারপর চাকরটা ঢুকল একগ্লাস জল হাতে করে।

"কোথা রাখব মা এটা—ওখানে বই রাখলেন যে।"

"এরই একপাশে রেখে দে।"

চাকরটা জলের গ্লাস টেবিলে রেখে একটি বই দিয়ে জল ঢাকা দিয়ে চলে গেল। অবন্ধনা রোজ রাত্রে উঠে জল খায়। টেবিলের উপর প্রত্যহ একগ্লাস জল ঢাকা-দেওয়া থাকে। আমি হাত-ঘড়িটা দেখলাম। প্রায় দশটা বাজে। অবন্ধনার দিকে চাইলাম, দেখলাম সে একটা বই খুলে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি বইগুলো শেল্ফ্ থেকে নামিয়েছে। এগুলো না নামালেও চলত, নিজের নামাবারও দরকারও ছিল না, চাকর যখন রয়েছে।

বললাম—"আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো। তোমার সম্বন্ধে যা যা শুনেছি, তা কি সত্যি?"

বইয়ের পাতা ওলটালে খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললে—"সত্যি।"

"সত্যি হলে তো ভয়ানক কথা! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। এ রকম করার মানে?"

"না করে উপায় নেই।"

"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর পরিণতি এর তা জান?"

"জানি।"

"সব জেনেও এরকম করা কি উচিত?"

অবন্ধনার মুখে একটা হাসি ফুটল। অদ্ভুত হাসি।

"একটা বলকে ঢালুর মুখে গড়িয়ে দিয়ে তারপর সেটাকে থামতে বললে যে রকম শোনায়, তোমার উপদেশটাও সেই রকম শোনাচ্ছে!"

উপমাটা ভাল লাগল।

বললাম, "বল হয়তো থামতে পারে না, কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে পারে। বলকে কেউ যদি থামিয়ে দেয় তাহলে বলও গড়াতে পারে না।"

"আমাকে থামিয়ে দেবে এমন কেউ নেই, এক মৃত্যু ছাড়া।"

বইটা মুড়ে রেখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বললাম—"আমি আছি। আমি তোমাকে থামিয়ে দিতে পারি, থামিয়ে দিতে চাই।"

"কি করে?"

"বিয়ে করে।"

"বলেছি তো, তা আর হয় না!"

দুজনেই চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর সে হেসে বললে—"আমার বিষয়ে এত সব শোনবার পরও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তোমার?"

"হয় বই কি। আমার সোনার হাত-ঘড়িটি হঠাৎ সেদিন নালীতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করছি। এই দেখ, একটুও কাদা লেগে নেই আর।"

"আমি হাত-ঘড়ি নই, মানুষ। আমাকেও অত সহজে পরিষ্কার করা যাবে না।"

"নিশ্চয় যাবে। হাত-ঘড়িকে জল দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তোমাকে পরিষ্কার করব ভালবাসা দিয়ে।"

'আমাকে এখনও ভালবাস তুমি? আশ্চর্য!

"রাজী হও তুমি অবু। চল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি—"

"না, সে হয় না।"

"কেন হয় না?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল সে আমার দিকে।

"আমি যতই খারাপ হই, আমি হিন্দুর মেয়ে, উচ্ছিষ্ট জিনিস দিয়ে দেবতার ভোগ সাজাতে পারি না।"

"কি যে পাগলের মতো বকছ তুমি। মানুষ দেবতাও হতে পারে না, উচ্ছিষ্টও হতে পারে না।"

"পারে—"

"কি করে বুঝলে সেটা।"

"স্বচক্ষে দেখছি।"

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পেয়ে দুজনেই ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম ম্যানেজার এসেছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

"মিস্ মুখার্জি, কাল রাজমিস্ত্রি লাগাতে পারব না। কাল তাদের কি পরব আছে, আসতে রাজী হচ্ছে না। পরশু দিন আসবে। কাল চুনকামটা হয়ে যাক।"

"বেশ।"

ম্যানেজার চলে গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম, সুরটা কেমন যেন কেটে গেল।

"চলি তবে আজ। পাগলামি কোরো না, যা বলছি শোন সেটা। তোমার ভালর জন্যেই বলছি—"

"আমার ভাল করবার ক্ষমতা তোমারই ছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সে ক্ষমতা তুমি ব্যবহার

করনি। গোড়া কেটে গেছে, এখন আগায় জল ঢেলে কোনো লাভ নেই। যাও শোওগে যাও, অনেক রাত হল। আমাকে এখনি একটা 'কলে' বেরুতে হবে হয়তো।"

"কি 'কল'—"

"একটা লেবার কেস।"

কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। বারান্দাতেই দেখা হল সেই কালোবাজারীটার সঙ্গে। হাতে ফুলের তোড়া, বগলে হুইস্কির বোতল। নিঃশব্দে নেমে গেলাম। একবার মনে হল লোকটাকে আজই হাজতে পুরে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হয়নি, সুতরাং এ ইচ্ছাকে দমন করতে হল। হাজতে পুরেই বা লাভ কি? অবিলম্বে জামিনে খালাস পেয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াবে আবার, জজসাহেবেরা হয়তো রায় দেবেন লোকটা নির্দোষ। আমার ঘাড়েই উলটো চাপ পড়বে শেষে!

....একটু পরেই লক্ষ্য করলাম লোকটার সঙ্গে অবন্ধনাও নেমে গেল। নেমে গিয়ে চড়ল মোটরকারটায়। আমিও আবার তাদের অনুসরণ করলাম একটা ট্যাক্সিতে।

দেওয়ালের উপর যে দুইটি প্রজাপতি নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিল। প্রথমে একটি প্রজাপতির পাখা দুইটি কাঁপতে লাগিল। সে কম্পন ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। মনে হইল কম্পনের ভাষায় সে যেন দ্বিতীয় প্রজাপতিটিকে কিছু বলিতেছে। কম্পনের ভাষায় দ্বিতীয় প্রজাপতিও উত্তর দিল, তাহারও পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কম্পনের ভাষাকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিলে নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়।

প্রথম প্রজাপতি বলিতেছিল, "পিতামহ, মনে হচ্ছে আপনার এই নবতম কাহিনী দুটিও আপনার প্রাচীনতম কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি হবে। মহেশ্বরকে মুখে আপনি যতই গাল দিন, মনে মনে তাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন মনে হচ্ছে।"

দ্বিতীয় প্রজাপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি করে বুঝলে—"

"আপনার সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের তো তাঁর হাতেই সমর্পণ করছেন!"

"করছি তো। করবও চিরকাল। মহেশ্বর আর আমি আলাদা না কি! কতকগুলো কুঁদুলে বামুন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করেছে তোমাদের মনে—"

"যাই বলুন, সব নায়ক-নায়িকাদের এমনভাবে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে ভাল লাগে না।"

"কিন্তু ওইটেই তো খেলা। মৃত্যুতেই খেলার পরিণতি। পঞ্চভূতের কাছ থেকে মালমশলা ছিনিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি জীব দেহ-ধারণ করেছে, পঞ্চভূত সেই অপহৃত জিনিসগুলি পুনরধিকার করতে চাইছে—জীবরা তা ফিরে দিতে চাইছে না। যুদ্ধের খেলা জমেছে সুতরাং। পঞ্চভূত শেষ পর্যন্ত জিতবেই, কারণ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, একটা জীব-দেহে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারে না, ওরা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবেই। জীবেদের ইচ্ছে অন্য রকম। তারা ওদের দেহ-পিঞ্জরে চিরকাল আটকে রাখতে চায়। কিন্তু তা কি পারে কখনও?"

"আপনার কৃতিত্ব তাহলে কোথায়—"

"এই একরঙা গল্পটাকে নানা রঙে রঞ্জিত করে নানা রসে রসিয়ে ফুটিয়ে তোলা। রাবণের মৃত্যুবাণ তার নিজের হাতে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার বুদ্ধিতে এমন একটি পাক লাগিয়ে দিলাম যে সেই বাণটি সে একটি স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দিলে। তারপর সীতা হরণ করে

বসল। ফলে হনুমান ছদ্মবেশে এল, মৃত্যুবাণটি মন্দোদরীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ল, রাবণের মৃত্যু হল। হিরণ্যকশিপুকে মহর্ষি কশ্যপের ছেলে করে সৃষ্টি করলুম। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বর দিলুম যে সে জীবজন্তু ও অস্ত্রে অবধ্য হবে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিনে বা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তবু তাকে মরতে হল। তাকে মারবার জন্য স্তম্ভ ভেদ করে বার করতে হল নর-সিংহকে, সে তাকে জানুর উপরে রেখে দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে নখ দিয়ে চিরে ফেললে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। মারতে হবেই। জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে ছন্দ যোজনা করাই তো কবির কাজ। এই দ্বন্দ্বের অসংখ্য রূপ, অসংখ্য সম্ভাবনা, ছন্দও নানারকম।"

"এসব কথা আমিই তো বলেছিলাম আপনাকে একদিন।"

"বলেছিলে না কি! তা হবে। তোমার কথা আমি চুরি করছি, আবার আমার কথা তুমি প্রকাশ করছ। এই চলছে চিরকাল। চলবেও, সূর্যের আলো পড়বে কুঁড়ির ওপর, ফুল ফুটবে, পড়বে চাঁদের উপর, জ্যোৎস্না হাসবে, পড়বে মরুভূমির উপর মরীচিকা জাগবে। এই হচ্ছে—"

"চলুন, এই কবিতার ভাবে তন্ময় হয়ে ঘুরে আসি একটু—"

"চল—"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়াই রূপান্তরিত হইল খদ্যোতে। তাহার পর পেচক-দম্পতিরূপে তাহারা অন্ধকারকে মুখরিত করিয়া চলিল। তাহার পর সহসা মহাশূন্যে উড়িয়া গেল। একটু পরে দেখা গেল দুইটি উল্কা অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

।। ছাব্বিশ ।।

সুরঙ্গমা বলিল—"দেখুন, দেখুন, কি আশ্চর্য দু'টি উল্কা—"

চার্বাক আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। সত্যই উল্কা হইলে বিস্ময়কর। পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে।

বলিল—"সম্ভবত উল্কা নয়, ফানুস।"

"ফানুস? তা হতে পারে। কিন্তু এরকম ফানুসও দেখিনি কখনও। ঠিক পাশাপাশি উড়ে চলেছে, যেন দু'টি আলোর পাখি।"

"চল, বাইরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, বিপদে পড়ে যেতে হবে।"

"চলুন। আপনার প্রাণের ভয় বড্ড বেশী দেখছি—"

"বেশী নয়, যতটুকু স্বাভাবিক, ততটুকু। তোমাদের উপনিষদের ঋষিও বলেছেন ভয়ের তাড়নাতেই সমস্ত পৃথিবী চলছে। সূর্য তাপ দান করছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ইন্দ্র নিজ কর্তব্য করছে, এমন কি মৃত্যুভয়ে ধাবমান—"

"কার ভয়ে—"

"ওঁরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, যিনি উদ্যত বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর—"

"আপনার ব্রহ্মে বিশ্বাস নেই বুঝি।"

চার্বাক হাসিয়া বলিল—"তুমি যদি ব্রহ্মের প্রকাশ হও তাহলে বিশ্বাস আছে। কিন্তু অনাদি অনন্ত অখণ্ড অজ্ঞাত অমৃত অব্রণ, অকায় এই সব বিশেষণ বিশিষ্ট যে আজগুবি ধাঁধার সৃষ্টি করে ওঁরা বোকা লোকদের ভোলাচ্ছেন তাতে বিশ্বাস নেই।"

সুরঙ্গমার চোখের কোণে চাপাহাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"চলুন তাহলে ঘরের ভিতরই ঢোকা যাক।"

ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় গাদা করা রহিয়াছে। চার্বাক ইহা দেখিয়া খুশী হইল।

"চল, ওর উপর উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসা যাক—"

"আপনি বসুন।"

"তুমি?"

"আমি দুয়ারের কাছে বসছি। যদি কেউ এদিকে আসে, আপনাকে সাবধান করতে পারব।"

"তুমি ভিতরে এসে কপাটে খিল বন্ধ করে দাও।"

"তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ধরা পড়লে দু'জনেই মারা যাব।"

"ধরা পড়বার সম্ভারনা আছে কি?"

"আছে বই কি। কুলিশপাণি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

"বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে কাছে পেলে আমার বক্তব্যের যুক্তিটা আরও জোরালো হত।"

সুরঙ্গমার নয়নে আবার হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক তুলিল। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল—"যুক্তি যদি কিছু থাকে, কম জোরালো হলেও তা আমি মানব। বলুন কি বলবেন—"

চার্বাক খড়ের গাদার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বলিল—"আমার বক্তব্য তো আগেই বলেছি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।"

"কেন—"

"এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য।"

"মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে! মৃত্যুই তো আমাদের স্বাভাবিক পরিণাম।"

"কিন্তু অকালমৃত্যু কি স্বাভাবিক?"

"অকালমৃত্যুও তো ঘটে। কত শিশু শৈশবেই মারা যায়, তা কি শোনেননি?"

"সে সব অকালমৃত্যুও স্বাভাবিক। তা কারও ইচ্ছাকৃত নয়। তুমি যে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছ তা হত্যার নামান্তর।"

"আত্মহত্যা বলতে পারেন, কিন্তু হত্যা নয়। কেউ জোর করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মারবার চেষ্টা করেনি। আমি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—"

"কেন?"

"কুমার সুন্দরানন্দের মান বাঁচাবার জন্যে।"

"তোমার মৃত্যু হলে তাঁর মান বাঁচবে কি করে?"

সুরঙ্গমা তখন মির্মিরের কাহিনী বিবৃত করিল। করিয়া বলিল—"তাতে যদি মির্মিরের

পারমার্থিক আনন্দের জন্য আত্মবলিদান দিতে পারে, তাহলে কুমারের জন্য আমিও পারি। তাছাড়া এও আমার মনে হল দেহটা যজ্ঞের আগুনে ছাই করে দিয়ে তানে যদি মির্মিরের অন্তরে চিরস্থায়িনী হয়ে থাকে, আমিই বা কুমারের অন্তরে হব না কেন? আমিই কুমারকে তাই যজ্ঞের আয়োজন করতে উৎসাহিত করেছি। কুমার আমাকে জোর করে বধ করছেন—আপনার এ ধারণাটা ভুল।"

চার্বাক চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার যুক্তি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, ভাবিয়া পাইল না কি উপায়ে সে এই স্বেচ্ছাচারিণীর গতি-রোধ অথবা মতি-পরিবর্তন করিবে। তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত শক্তি কিন্তু একাগ্র হইয়া উঠিল, যেমন করিয়া হোক ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। শেষে শিশু যে সুরে আবদার করে সেই সুরে সে সুরঙ্গমাকে বলিল—"আমার ধারণা হয়তো ভুল। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তুমি আর থাকবে না, তোমাকে আর কখনও দেখতে পাব না—এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।"

সুরঙ্গমা হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনার ব্যক্তিগত সুখের জন্যই তাহলে আমাকে বাঁচতে বলছেন, এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আপনার আর কিছু নেই?"

"'আমি চাই' এর চেয়ে জোরালো যুক্তি পৃথিবীতে আর আছে কি? আমাকে আর আমার চাওয়াকে কেন্দ্র করেই তো সংসার—"

সুরঙ্গমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল। তাহার পর বলিল—"মাপ করবেন মহর্ষি, যা বলছি তা হয়তো রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তা না বলেও পারছি না। হয়তো চাওয়াটাই সংসারে বড় যুক্তি, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? দাম না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি একজন সামান্যা নটী, আমাকেও কুমার অনেক দাম দিয়ে তবে পেয়েছেন! আপনি আমাকে চাইছেন, কি দাম দেবেন বলুন।"

ব্যাপারটা দর-দস্তুরের স্তরে নামিয়া আসিবে চার্বাক তাহা কল্পনা করে নাই। একটু বিব্রত হইয়া সে বলিল—"অর্থের দিক দিয়ে সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না তা আমিও জানি, তুমিও জান। তাই কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ? এটা কি তুমি জান না যে আলো, বাতাস-ফুল, পাখির গানের মতো তুমিও অমূল্য? ধনীরা অর্থ ব্যয় করে আলো, বাতাস, ফুল, পাখির গান উপভোগ করেন, কিন্তু দরিদ্ররা কি তা বলে বঞ্চিত হয়?"

সুরঙ্গমা পুনরায় হাসিমুখে উত্তর দিল—"আলো, বাতাস, ফুল, পাখির গানের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ওরা স্বাধীন, আমি পরাধীন, সীমাবদ্ধ। বাজারের পণ্য আমি, ক্রেতাই আমার ভাগ্য নির্ণয় করে। যে মহত্ত্বের আমি অধিকারী নই, তা আমার উপর আরোপ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না মহর্ষি?"

চার্বাক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল—"কত অর্থের বিনিময়ে তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? দেখি চেষ্টা করে সংগ্রহ করতে পারি কি না। অবন্তীনগরের রাজপুত্র আমার অনুরাগী, সে হয়তো আমায় সাহায্য করবে।"

"আমি অর্থ চাই না। কুমার আমাকে এত অর্থ, এত মণি মুক্তা অলঙ্কারাদি দিয়েছেন যে ও-সবের সম্বন্ধে আমার আর মোহ নেই। আপনার যদি প্রয়োজন থাকে আমার কাছ থেকেই নিতে পারেন কিছু। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, যদি অভয় দেন বলি—"

"বল—"

"রাগ করবেন না তো?"

"তোমার কোনও কথাতেই রাগ করব না। তোমার উপর রাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী, ঢের বেশী গুণবতী নারী অনেক আছে। যে অবন্তীনগরের আপনি নাম করলেন, সেই অবন্তীনগরেই অপূর্বা নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে-ও নটী। প্রচুর অর্থ পেলে সে আপনার কাছে এসে থাকবে। কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতের প্রণয়িনী হবার আকাঙ্ক্ষা তার অনেকদিন থেকে। আমি আপনাকে অর্থ দিচ্ছি, একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। তার কাছেই যান আপনি।"

চার্বাক স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি তোমাকেই চাই।"

"আমার প্রতি এ পক্ষপাত কেন?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বদলে অন্য কারও কথা চিন্তাও করতে পারি না আমি।"

ঠিক এই সময়ে দূরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুরঙ্গমা নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি ওই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। আমি উঠে গিয়ে দেখি কে আসছে।"

সুরঙ্গমাকে বেশীদূর যাইতে হইল না। একটু দূর গিয়াই সে কুলিশপাণিকে দেখিতে পাইল। কুলিশপাণিও আগাইয়া আসিয়া অভিবাদন করিল।

"আপনি এখানে। অথচ আপনার সন্ধানে আমি সমস্ত বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি।"

"কেন—"

"কুমারের আদেশে। তিনি আপনাকে খুঁজে না পেয়ে অধীর হয়ে উঠেছেন। কোথা গিয়েছিলেন আপনি?"

"কাছাকাছিই ছিলাম—কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।"

"দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ—"

"তাহলেই তো মুশকিল।"

কুলিশপাণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

"কিসের মুশকিল—"

"আপনি অন্তর্ধান করুন এইটেই আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আপনাকে খুঁজছিলাম বটে কিন্তু এতক্ষণ আপনাকে না পেয়ে—একটুও দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ফাঁদের কবল থেকে হরিণী সত্যিই বুঝি পালাল....."

এই পর্যন্ত বলিয়া কুলিশপাণি সহসা থামিয়া গেল, আড়চোখে একবার সুরঙ্গমার দিকে চাহিয়া, পুনরায় গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করিল। সুরঙ্গমার নয়নের মোহিনী দৃষ্টি কুলিশপাণির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আরও মোহিনী হইয়া উঠিল।

"আমি দুর্বলা নারী, আপনাদের কবল থেকে পালাবার শক্তি কি আমার কাছে? তাই আত্মসমর্পণ করেছি—"

কুলিশপাণি নির্নিমেষ নয়নে সুবঙ্গমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনি দুর্বলা নন। আপনি শক্তির উৎস। কুমার সুন্দরানন্দের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তাই তিনি এই নৃশংস যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারি—

" কি করে—?"

"এখুনি চলুন আপনি আমার সঙ্গে। কাছেই গাছতলায় আমার ঘোড়া বাঁধা আছে। আপনাকে অবিলম্বে আমি স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারি। মহেশপুর গ্রামে আমার পরিচিত পরিবার আছে একটি, সেখানে আপাতত আপনি থাকতে পারেন। যাবেন? আসুন তাহলে?"

সুরঙ্গমা আনতনয়নে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"ইতস্তত করছেন কেন? আমি আশ্বাস দিচ্ছি ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

"আমি আমার ভয়ের কথা ভাবছি না। আমি তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই হয়ে আছি। আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনি কেন এতবড় দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন? আপনার স্বার্থ কি!"

কুলিশপাণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বার্থ তুমি। 'আপনি' সম্বোধন করে তোমাকে আমার সম্বন্ধে আর ভুল ধারণা করবার সুযোগ দেব না। তোমাকে আমি ভালবাসি সুরঙ্গমা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই ভালবেসেছি। এতদিন একথা তোমাকে বলবার সাহস হয়নি, কারণ জানতাম তুমি কুমারের প্রিয়তমা। এখন সে ভুল ধারণা ভেঙেছে। এখন দেখছি সামান্য পশুর মতো কুমার তোমাকে বলিদান দিতেও ইতস্তত করছেন না। তোমাকে দূর থেকে দেখেও এতদিন যে আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দও আর পাব না। তাই তুমি পালিয়েছ শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। কুমারের আদেশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ঠিক করেছিলাম তোমার-নাগাল পেলে কোনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব তোমাকে।"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি কম্পিত হইতে লাগিল। নয়ন যুগলে যে কৌতুক-ছটা বিকীর্ণ হইল তাহা অপরূপ।

"আপনার অদম্য সাহস, অসীম শক্তি যে আমার মতো সামান্যা একজন নর্তকীর জন্য উদ্যত হয়েছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যাব না। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনার মতো মহানুভব বীরকে বিপন্ন করতে চাই না।—"

"আমি বিপন্ন হব কেন। আমি কুমার সুন্দরানন্দ হয়তো নই, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার আছে। আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও রাজপুত্র। কুমারের অধীনে সেনানায়কত্ব করছি অভাবের তাড়নায় নয়, শিক্ষার জন্য। আমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার বানপ্রস্থে যেতে চান। কিছুদিন পরে আমাকে গিয়ে রাজ্যভার নিতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তোমার মর্যাদার কোনও হানি হবে না। আমার দেহ মন সম্পত্তি সমস্তই তোমার সুখ-সম্পাদনে সর্বদা উৎসুক থাকবে।"

"কোন্ দেশে আপনার বাড়ি? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"আমি পৌণ্ড্র রাজকুমার। কুলিশপাণি আমার স্বয়ং-গৃহীত নাম। আমাদের দেশে চল, তোমার পূর্ণ পরিচয় পাবে।"

"কুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কলহের সম্ভাবনা কি নেই? আমাকে কেন্দ্র করে, দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ বাধুক এ আমি চাই না। আমি ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, যা হবার তাই হোক।"

"কলহের কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি যে তোমাকে নিয়ে গেছি এ কথা কুমার জানবে কি করে? কুমার জানুক, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছ। তারপর কিছুদিন কেটে গেলে তোমার সম্বন্ধে কুমারের সম্ভবত ঔৎসুক্যই আর থাকবে না। তুমি যেমন এসে নিরালার স্থান অধিকার করেছ, আর কেউ এসে তেমনি তোমার স্থান অধিকার করবে।...কুমার হৃদয়হীন। দেখছ না, তোমাকে যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করছেন? আমি তোমাকে মাথায় করে সসম্মানে রাখব। সুরঙ্গমা, তুমি চল আমার সঙ্গে।"

সুরঙ্গমার নয়নের কৌতুক ছটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"কথা বলছ না যে—"

"আমাকে ভাববার একটু সময় দিন।"

"দেবার মতো সময় তো আর নেই—"

"আপনি এখন যান। আমি যদি আপনার সঙ্গে যাওয়া স্থির করি তাহলে শেষ রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে যাব। শয়নকক্ষের দ্বারটি খুলে রাখবেন—"

কুলিশপাণির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

"এখন আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে—?"

"আছে। কুমারকে আমি কথা দিয়ে এসেছি না বলে কোথাও যাব না।"

"যিনি যজ্ঞের নামে তোমাকে পশুর মতো বধ করতে চাইছেন—"

"ওটা ভুল ধারণা। তিনি আমাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে চান না। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন।"

"পরে শোনবার ধৈর্য আমার নেই। আমি তোমাকে চাই সুরঙ্গমা। আমার আশা সফল হবে কিনা তা আমি এখনই শুনতে চাই।"

"আমার দেহটা পেলেই আপনি যদি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তা এখুনি পেতে পারেন; সামান্যা নর্তকীর দেহটাকে অনেকেই নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন কিছুদিন, কুমারও একথা জেনেই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, এখনও যদি তিনি শোনেন যে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেনাপতি কুলিশপাণি আমার দেহটা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তাহলে তিনি রাগ করবেন না। একটু কৌতুকবোধ করতে পারেন হয়তো। কিন্তু আপনি আমাকে যদি চান, যে আমি আমার দেহ থেকে স্বতন্ত্র, তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

কুলিশপাণি নীরবে কিছুক্ষণ গুম্ফপ্রান্ত পাকাইল।

তাহার পর বলিল—"অপেক্ষাই করব। কবে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।"

"আজই শেষ-রাত্রে।"

"আমার শয়নকক্ষের দ্বার খুলে রাখব?"

"রাখবেন।"

কুলিশপাণি চলিয়া গেল।

সুরঙ্গমাও পুনরায় চার্বাকের ঘরে প্রবেশ করিল।

সুরঙ্গমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল চার্বাক খড়ের গাদার উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

"নেমে পড়লেন কেন?"

"তোমরা কি কথা বলছ তা শোনবার জন্যে। কুলিশপাণি এসেছিল, না?"

"হ্যাঁ। ওর প্রস্তাব শুনলেন তো।"

"শুনেছি।"

"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বক্তব্যটাও শুনব।"

চার্বাক নীরবে তবু দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোনও কথা জোগাইল না।

"আমার বক্তব্য তোমাকে তো বলছি। আমি তোমাকে চাই।"

"আমাকে অনেকেই চেয়েছে, এখনও অনেকেই চায়। তাই আমি ঠিক করেছি—সর্বোচ্চ মূল্য যে দেবে তার কাছেই যাব আমি—"

"কুলিশপাণি তোমাকে যে মূল্য দিতে চাইছে তা কি তোমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না?"

"তার আগে একটা প্রশ্ন আপনাকে করি। আমি যদি কুলিশপাণির সঙ্গে চলে যাই তাহলে কি আপনি খুশী হবেন?"

"না।"

"কেন, হওয়া তো উচিত। কুলিশপাণিও আমাকে বাঁচাতে চাইছেন। আমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য তাঁর আছে। আপনিও তো বললেন—আমাকে এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আপনি এসেছেন এখানে। কিন্তু ওঁর মতো সামর্থ্য আপনার নেই। আমাকে বাঁচানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কুলিশপাণির সঙ্গে যেতে দিতে আপত্তি কি?"

সুরঙ্গমার নয়নে অধরে যে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল, অন্ধকারে চার্বাক তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে যে হাসির তরঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাতে চার্বাক বুঝিতে পারিল—সুরঙ্গমা ব্যঙ্গ করিতেছে।

"আপত্তি কি তা কি বুঝতে পারনি এখনও? আমি অসহায়, আমাকে ব্যঙ্গ কোরো না সুরঙ্গমা।"

"আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে ব্যঙ্গ করবার স্পর্ধা আমার নেই, মহর্ষি। আপনি নিজেকে অসহায় বলে বর্ণনা করছেন কেন? আপনার অসহায় অবস্থা কি আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল?"

"বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"আপনি কি অনুকম্পা চান? অসহায় মানুষকে দেখে লোকের মনে অনুকম্পা জাগে, প্রেম জাগে না।"

"প্রেমেই আমাকে অসহায় করেছে সুরঙ্গমা।"

"আমি যতটুকু বুঝি— প্রেম মানুষকে অসহায় করে না, শক্তিমান করে, প্রেমে পড়লে মানুষ সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন কি জীবনকেও। আমি সুন্দরানন্দকে ভালবাসি বলেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আপনি অসহায় এ-বোধ সত্যিই যদি আপনার মনে জেগে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আপনি প্রেম নয়—অন্য কোনো কিছুর প্রকোপে পড়েছেন।"

"আমি তোমার প্রেমেই পড়েছি সুরঙ্গমা। কিন্তু বুঝতে পারছি না—কি করে সেটা প্রমাণ করব তোমার কাছে, তাই অসহায় বোধ করছি।"

"মহর্ষি, আপনার মতো পণ্ডিতের নিশ্চয়ই একথা জানা আছে যে একটি মাত্র কষ্টিপাথরেই প্রেমের যাচাই হতে পারে এবং তা সকলেরই আয়ত্তাধীন।"

"কি সে কষ্টিপাথর?"

"ত্যাগ।"

কিন্তু ত্যাগ করবার মতো আমার তো কিছুই নেই। সুন্দরানন্দ বা কুলিশপাণির ত্যাগ করবার মতো অর্থ আছে, কিন্তু আমি দরিদ্র।"

"কিন্তু যে জিনিস সকলেরই আছে তা আপনারও আছে, তার তুলনায় অর্থ অকিঞ্চিৎকর।"

"কি সে জিনিস।"

"আপনার প্রাণ, আপনার জীবন।"

"আমাকে প্রাণত্যাগ করতে বলছ? আমি মরে গেলে তোমাকে পাব কি করে? মরে গেলে তো সব শেষ হয়ে গেল—"

"আমাদের এই ধারণা আছে বলেই তো প্রাণত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ।"

চার্বাক কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমাকে ভুল বুঝো না সুরঙ্গমা। আমি প্রাণত্যাগ করতে ভীত নই, প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই আমি তোমার সন্ধানে এসেছি। কিন্তু আমি ইহলোককেই বিশ্বাস করি, পরলোকে আমার আস্থা নেই। আমি ইহজীবনেই তোমাকে পেতে উৎসুক, প্রাণত্যাগ করেও তোমাকে ইহজীবনে পাবার সম্ভাবনা যদি থাকত, মানে—এ অসম্ভব যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করতাম। তোমাকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখানে এসেছি।"

"কিন্তু আমাকে পেতে হলে এখানে এলেই শুধু হবে না, মূল্য দিতে হবে—"

"যে মূল্য আমার কাছে তুমি দাবী করছ, কুমার সুন্দরানন্দের কাছে তা কি দাবী করেছ কখনও?"

"দাবী করবার দরকার হয়নি। আমার সুখের জন্য আমাকে বাঁচাবার জন্য, স্বেচ্ছায় অনেকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। এই সেদিনই তিনি আমাকে জীবন্ত কস্তুরী-মৃগ স্বহস্তে ধরে দেবেন বলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি আছে জেনেও প্রবেশ করেছিলেন, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে এ আশঙ্কা তাঁকে নিবৃত্ত করেনি—"

"আমারও তো যে কোনও মুহূর্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে তবু আমি তোমার জন্যে এসেছি—"

"আপনি এসেছেন নিজের স্বার্থে। আমার সুখের জন্য নয়, নিজের সুখের আশায়—"

"তুমি যদি একান্তভাবে আমার হও তাহলে আমি বারম্বার তোমার জন্য জীবন বিপন্ন করে কৃতার্থ হব। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, চল আমার সঙ্গে—পরীক্ষা করে দেখ।"

"ক্ষমা করবেন মহর্ষি, মূল্য না পেলে আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু যে মূল্য তুমি চাইছ, তা আমি দেবই বা কি করে? আত্মহত্যা করব?"

"আপনি আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন—এর নিঃসংশয় প্রমাণ পেলেই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হব—"

চার্বাক চুপ করিয়া রহিল।

সুরঙ্গমা বলিল—"প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেই সব সময় প্রাণ যায় না। যুদ্ধে সব সৈন্যই মরে না। আপনিও হয়তো বেঁচে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ চাই।"

"আমার মুখের কথায় তোমার সংশয় যদি না ঘোচে কি করে ঘুচবে, বল—"

"এই যজ্ঞে আপনি আত্মাহুতি দিতে রাজী আছেন? যদি রাজী থাকেন, আমি বেঁচে যেতে পারি! মহর্ষি পর্বত নাকি বলেছেন আমার বদলে অন্য কেউ যদি আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয়, আমাকে তিনি ছেড়ে দেবেন।"

"কিন্তু তুমি তো বলছ স্বেচ্ছায় তুমি যজ্ঞের বলি হয়েছ।"

"হয়েছি। কিন্তু মহর্ষি পর্বত যদি আমাকে মনোনীত না করেন, তা হলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা।"

মহর্ষি পর্বত আমাকে মনোনীত করবেন?"

"না-ও করতে পারেন। যদি না করেন আপনি বেঁচে যাবেন।"

"যদি বেঁচে যাই তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে?"

"আসব।"

"কুমার তোমাকে ছেড়ে দেবেন?"

"দেবেন। তিনি আমার কোনো কাজেই বাধা দেন না কখনও।"

চার্বাক কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। তাহার মনে হইল যজ্ঞীয় পশুর যে সব খুঁত থাকিলে তাহা যজ্ঞীয় পশুরূপে নির্বাচিত হয় না, সে-সব খুঁত তাহার শরীরে আছে। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহর্ষি পর্বত যজ্ঞের বলি হিসাবে তাহাকে নির্বাচন করিবে না। কিন্তু মুশকিল হইবে ধারামতীর ব্যাপারটার জন্য।

"তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছি! এ-সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কেবল তোমার জন্যে আমি এতে রাজী হচ্ছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি গোপনে দেখা করতে চাই একবার, ধারামতীর সম্পর্কে আমার নামে যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব একটু। আমার বিশ্বাস সব শুনলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল।

"কুমারকে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। কুমারকে যা বলতে চান তা আমাকেও বলতে পারেন, আমি কুমারকে গিয়ে তা এখনই জানিয়েও দিতে পারি।"

"আমি কুমারকে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ধারামতী নিজে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। কিছুদিন পরে অনিবার্যভাবে যা ঘটল, তার জন্যে আমি তাকে বিবাহও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে সে রাজী হয়নি। এর জন্য কুমার আমাকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাঁর সে আদেশ আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। আমি

কেবল জানতে চাই আর কতকাল আমাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে? সারাজীবন কি রাজরোষ থেকে আমি অব্যাহতি পাব না?"

"মহর্ষি পর্বত যদি যজ্ঞীয় বলি হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করেন, তাহলে কুমারের সঙ্গে এ-সব আলোচনা কি নিরর্থক নয়?"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন একথাটা না জানলে মরেও আমার শান্তি হবে না।"

"আপনার মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো সব শেষ হয়ে যায়। তখন তো শান্তি-অশান্তি কিছুই থাকবার কথা নয়।"

চার্বাক পুনরায় অনুভব করিল, সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর লাগিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল—"আমার মত তাই বটে। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা জানি না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ধারামতী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যটা কুমারকে আমি জানিয়ে দিতে চাই। ক্ষমা করা-না-করা অবশ্য তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কথাটা তাঁকে বলতে পারলে আমি তৃপ্তি পাব। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু যে পরলোকে বিশ্বাস করে না, তার কাছে ওই কিছুক্ষণেরই মূল্য অনেক"

"বেশ আমি যাচ্ছি তাহলে। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করবেন কি?"

"আর কোথায় যাব।"

"কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন তাহলে।"

চার্বাক ভিতর হইতে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল।

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলেন। সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?"

সুরঙ্গমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"অভিসারে। আমি আশা করিনি যে এত রাত্রে আপনি আসবেন।"

কুমারের গম্ভীর মুখও হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ জানতে পারি কি?"

"আপনি যদি জানতে চান, নিশ্চয় জানাব। কিন্তু একটি অনুরোধ আছে—"

"বল, তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"তাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"তুমি যাকে কৃপা করেছ আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি! নিশ্চয়ই ক্ষমা করব। কে তিনি?"

"মহর্ষি চার্বাক।"

"বল কি! তিনি এখানে এলেন কি করে?"

সুরঙ্গমা তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া সুন্দরানন্দ অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—

"মহর্ষি পর্বতের কন্যা ধারামতীও তো এখানে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখা কি উচিত নয়—চার্বাক যা বলছেন তা সত্য কি না।"

"তাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহর্ষি চার্বাক যা বলছেন তা সত্য। মহর্ষি

চার্বাক সত্যিই ধারামতীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, ধারামতীও মহর্ষি চার্বাককে এখনও ভালবাসে।"

"তাহলে বিবাহ না হওয়ার কারণ কি"

"কারণ আমি। ধারামতীকে মহর্ষি চার্বাক অকপটে বলেছিলেন যে তাকে বিবাহ করতে চাইছেন কর্তব্যবোধে, কিন্তু তিনি ভালবাসেন আমাকে।"

"সত্যিই তিনি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী?"

"সত্যিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন। অবশ্য, মহর্ষি পর্বত যদি তাকে নির্বাচন করেন।"

"মহর্ষি পর্বত বলি দেবার জন্য শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটি সুলক্ষণ বন্য বালককে কিনে এনেছেন। সে বালক এবং তার পিতামাতা এতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে। তাদের সঙ্গে একটু আগে নিজে কথাবার্তা বলেছি। এই খবরটা তোমাকে দেবার জন্যেই এত রাত্রে এসেছি তোমার কাছে। ব্যাপারটা বেশ সরল হয়ে এসেছিল, মহর্ষি চার্বাক আসাতে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আবার। মহর্ষি চার্বাক তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হতে পারেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার মনের অবস্থাটা কি—তুমিও কি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী?"

সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"আপনার কি মনে হয়?"

"নারী-চরিত্রের জটিলতা ভেদ করবার সামর্থ্য আমার নেই। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—কবির এ কথা আমি মানি। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম "তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তোমার স্মৃতিটুকু নিয়েই ধন্য হয়ে থাকব। তোমাকে বোঝাবার চেষ্টাও করব না, তোমাকে বাধাও দেব না। প্রহেলিকাকে প্রহেলিকা বলে স্বীকার করাই ভালো"

সুরঙ্গমা সহসা সুন্দরানন্দের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—"না, আপনি আমাকে বাধা দিন, আমাকে বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি প্রহেলিকা নই—সুরঙ্গমা, আপনারই সুরঙ্গমা—"

আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চার্বাকের মুণ্ডপাত করবার ব্যবস্থা করি তাহলে—? তুমি যা চাও তাই হবে।"

"আমি আমার কথা রাখতে চাই। উনি আমাকে বাঁচাবার জন্য যজ্ঞের যূপ্রকাষ্ঠে গলা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, আমি দেখতে চাই মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও ওঁর এ মনোভাব বদলায় কি না। সম্ভবত মহর্ষি পর্বত ওঁকে মনোনীত করবেন না, কিন্তু আমি দেখতে চাই উনি ওঁর প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন কি না।"

"ধর যদি থাকেন—"

"তাহলে আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাব!"

"তার পর?"

"তার পর ফিরে আসব আবার। কিছুক্ষণ পরেই উনি বুঝতে পারবেন আমাকে সঙ্গিনীরূপে পাবার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই কিছুক্ষণ ছুটি দিতে হবে আমাকে।"

"গোড়াতেই তো বলেছি, তুমি যা চাও তাই হবে। তোমার এ খেয়াল হল কেন হঠাৎ।"

সুরঙ্গমা মুচকি হাসিয়া বলিল—"শক্তসমর্থ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগে। মির্মির সিংহকে ফাঁদে ফেলে যে মজা দেখছেন, মানুষকে সেই রকম ফাঁদে ফেলে আমি ঠিক সেই রকম মজা দেখতে চাই। আপনি আমাকে মৃগ, পারাবত, শুক অনেক উপহার দিয়েছেন। কিন্তু শক্তসমর্থ বিদ্বান প্রেমিক পুরুষ উপহার দেননি কখনও। সেই উপহার আমি নিজেই জোগাড় করেছি আজ। আপনি অনুমতি দিন তাকে নিয়ে খেলা করি একটু।"

সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বহুবার চুম্বন করিলেন। তাহার পর বলিল—"অনুমতি দিলাম। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।"

যে উল্কা দুইটি পাশাপাশি দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বলিল—"চার্বাক এইবার সম্পূর্ণ বিগলিত হয়েছে। চল, এইবার দেখা যাক, ওর বিশ্বাস অটল আছে কি না—"

দ্বিতীয় উল্কা বলিল—"কি বিশ্বাস।"

"চতুরাননবিশিষ্ট কোনও দেবতা নেই—এই বিশ্বাস। বুদ্ধির প্রাখর্য আস্ফালন করে ও সুরঙ্গমাকে ভোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি সুরঙ্গমাই ওকে ভুলিয়েছে। যজ্ঞের হাড়কাঠে ও গলা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজী হয়েছে। এখন চল দেখা যাক চতুরানন দেবতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসটার অবস্থা কি রকম—"

"কি করে দেখবেন সেটা—"

"তুমি কৃপা করলেই হয়। তুমি সুরঙ্গমা সেজে চল ওর কাছে। আমি অদৃশ্যরূপে তোমার সঙ্গে থাকি।"

কিন্তু আসল সুরঙ্গমা যদি এসে পড়ে?"

"সে এখন আসবে না। সুন্দরানন্দের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে সে এখন সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। তার পরে সেখান থেকে নেবে সে যাবে কুলিশপাণির ঘরে। কুলিশপাণি দরজা খুলে বসে আছে—"

"বেশ চলুন—"

উল্কা দুইটি বনভূমি লক্ষ্য করিয়া নামিতে লাগিল।

চার্বাক অন্ধকারে একা বসিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সুরঙ্গমাকে যদি জীবনের মূল্যেই কিনিতে হয়, তাহাকে পাইবার পরেই যদি জীবনাবসান ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যু-নামক যে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাহাকে অচিরাৎ উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহার স্বরূপ কি প্রকার হওয়া সম্ভব। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের দেহ নির্মিত—ইহা ছাড়া আর কিছু নাই, এতকাল ইহাই সে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর দৈহিক পঞ্চভূতের সমন্বয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রকৃতির বিরাট পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এই ধারণার স্বপক্ষেই সে এতকাল নানাযুক্তি আহরণ করিয়া আসিয়াছে, এই যুক্তিরই নির্দেশে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করাই জীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই পুরুষকার, এই ধর্ম আচরণই স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভের উপায়। এই মর্ত্যেই স্বর্গ নরক বর্তমান। কামনার পরিতৃপ্তিই স্বর্গ। অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা-কামনার যন্ত্রণাই

নরক। যেমন করিয়াই হোক ক্ষুধা ও কামনাকে তৃপ্ত করিতে হইবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা অবিধেয় নহে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া এতকাল সে চলিয়াছে। এই পথে চলিতে চলিতেই সে আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া আজ সহসা যেন বলিতেছে, আমরা বিভিন্ন নহি, আমরা পরস্পরের পরিপূরক, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করিবার জন্য মৃত্যুকেই বরণ করিতে হয়, সুরঙ্গমা মায়াবিনী রাক্ষসী নহে, সে তোমার প্রেয়সীও নহে, সে তোমার গুরু। তুমি এতকাল জীবনকেই একমাত্র সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলে, সুরঙ্গমা আজ তোমার এই মহাভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছে, সে তোমাকে আজ অর্ধ সত্য হইতে পূর্ণ সত্যে উত্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ জীবন ত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে হয়, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর। সুরঙ্গমা আনন্দ-স্বরূপ। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তাই সে তোমাকে মৃত্যুর অনির্দিষ্ট বৃহত্ত্বে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহাকে বাধা দিও না।

চার্বাক ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া ভাবিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। সুরঙ্গমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে তাহার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনে পড়িল। অদ্ভুত সুরা-পান করিয়া সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, গুণপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ, জালার ভিতর প্রবেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন, অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান, বন্দী সিংহ, অসংখ্য মশক.....একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে জীবন সে যাপন করিয়াছে, তাহাকে কোনোমতেই সুস্থ জীবন বলা চলে না। তবে কি সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? প্রেমকে অনেক কবি ব্যাধি আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রেম-ব্যাধিই কি তাহার চিন্তাশক্তিকে হরণ করিয়া তাহার দুর্বল কল্পনায় প্রলাপের মোহ সৃজন করিতেছে? সুরঙ্গমা বলিয়াছিল সে সুন্দরানন্দের কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাহার এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করিবার জন্য যে যুক্তি-জাল সে বিস্তার করিযাছিল সে জালে সুরঙ্গমা ধরা পড়ে নাই, সে নিজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রিত চেতনা যে বিচিত্র স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রভাব সে যেন কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছে, স্বপ্নে জাগরণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব যে একেবারে অসম্ভব, একথা বলিবার মতো মনের জোর তাহার যেন আর নাই। সুরঙ্গমার মতো রূপসী রসিকা প্রণয়ের প্রতিদানে তাহাকে যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলিদান দিতে চাহিতেছে—ইহার অপেক্ষা চতুর্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব কি বেশী অসম্ভব? সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। যুক্তি, চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা সব যেন জট পাকাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। কেবল একটি কথাই মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—যেমন করিয়া হোক, যে মূল্যেই হোক, সুরঙ্গমাকে পাইতেই হইবে।

চার্বাক যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সেই বদ্ধদ্বারের বাহিরে নিঃশব্দ চরণে একটি পরম রূপবান যুবক ও পরম রূপবতী যুবতী আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাহিরে তখন গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে।

যুবক বলিলেন—"বাণী, সূক্ষ্মদেহ ধারণ কর। আমি তোমার মধ্যে ঢুকি।"

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উভয়েই স্বচ্ছ আলোক-শিখায় রূপান্তরিত হইলেন। একটি

আলোক-শিখা আর একটি আলোক-শিখায় মিশিয়া গেল। মিলিত আলোক-শিখাটি পুনরায় মানবী-মূর্তি পরিগ্রহ করিল। সুরঙ্গমার মূর্তি।

দ্বারে করাঘাত শুনিয়া চার্বাক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কে—"

"কপাট খুলুন। আমি এসেছি।"

"কে সুরঙ্গমা?"

"কপাট খুললেই দেখতে পাবেন। দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি খুলুন।"

চার্বাকের মনে হইল সুরঙ্গমাই আসিয়াছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সেই রকমই মনে হইতেছে। তবু দ্বিধা হইল।

"সুন্দরানন্দ কি বললেন।"

"তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু একটি শর্ত আছে।"

"কি শর্ত?"

"কপাট খুলুন, বলছি।"

চার্বাকের আর সন্দেহ রহিল না। সে কপাট খুলিয়া দিল। যে মানবী মূর্তিটি প্রবেশ করিল সে যে সুরঙ্গমা নয়, এ সংশয় তাহার মনে জাগিল না। জাগিলেও সংশয় নিরসনের উপায় ছিল না, কারণ ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করে নাই। অন্য কোনও আলোও ছিল না।

"কি শর্তে কুমার সুন্দরানন্দ আমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছেন?"

"আপনাকে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্পষ্ট স্বীকার করতে হবে যে তাঁর কুল-দেবতা চতুরানন ব্রহ্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন।"

চার্বাক কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"শুধু মুখে ওই কথা বললেই হবে?"

"শুধু মুখে বললেই হবে না। চতুরানন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আপনাকে বিশ্বাসও করতে হবে।"

"কিন্তু আমি যদি মিছে কথা বলি তিনি তা টের পাবেন কি করে? প্রাণভয়ে অনেকেই যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, একথা নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত নেই।"

"নিশ্চয়ই নেই। আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেই কিন্তু তিনি জানতে পারবেন। একজন ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, তিনি এখানেই আছেন। তাঁর গণনা অভ্রান্ত। তিনি বলে দিতে পারবেন আপনি সত্য কথা বলছেন কিনা। তিনি যদি বলেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভল্লের আঘাতে আপনার মস্তক বিদীর্ণ হবে। সুন্দরানন্দ এই আদেশ দিয়েছেন।"

চার্বাক পুনরায় কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হইয়া গেল। তাহার পর বলিল—"হঠাৎ কোনো কিছুকে বিশ্বাস করবার শক্তি তো আমার নেই। যে দেবতাকে কখনও দেখিনি, যার অস্তিত্বের কল্পনা মনে হাস্যোদ্রেক ছাড়া আর কোনও ভাবের উদ্রেক করেনি, তাকে হঠাৎ সত্য বলে মেনে নি কি করে? আমাকে মানিয়ে সুন্দরানন্দের লাভই বা কি হবে তা বুঝতে পারছি না।"

"আপনি কি জ্যোতিষ গণনায় বিশ্বাস করেন?"

"না—"

"তাহলে তো ওই ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর গণনাকে আপনি নির্ভয়ে তুচ্ছ করতে পারেন। আপনি

মুখেই তাহলে বলুন—আপনি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, আমি সেই খবর নিয়ে যাই, ফলাফল কি হয় দেখা যাক।"

"আমি যদি বলি ব্রহ্মার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, তাহলে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?"

"না। তাঁর মতে যারা নাস্তিক তারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই উচিত।"

চার্বাক চুপ করিয়া রহিল।

"কি ঠিক করলেন?"

"কিছু ঠিক করতে পারছি না।"

"আপনি সত্যিই কি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না? ভাল করে ভেবে দেখুন, চেয়ে দেখুন মনের গহনে।"

"যা চোখে দেখিনি, যুক্তি দিয়ে যার অস্তিত্বের কল্পনাও করতে পারি না, তাকে বিশ্বাস করি বলব কি করে।"

"চোখে দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন?"

"করব। প্রত্যক্ষ দর্শনকেই বিশ্বাস করে এসেছি চিরদিন।"

"দেখুন তাহলে।"

এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেই অন্ধকার ঘর এক দিব্য আলোকে আলোকিত হইল। চার্বাক সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার সম্মুখে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে সত্যই চতুরানন, তাঁহার সর্বাঙ্গ দ্যুতিময়, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের আভায় সমস্ত ঘর রক্তিমাভ হইয়াছে। চার্বাক ভয় পাইয়া গেল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

"সুরঙ্গমা, তুমি কোথা গেলে? ইনি সত্যই কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, না তুমি আমাকে কোন ভোজবাজী দেখাচ্ছ?"

সুরঙ্গমার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অষ্টনয়নের হাস্যময় দৃষ্টি নীরবে যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—অবিশ্বাস করিও না, আমি আছি। মানব মাত্রেই অসহায়, প্রেম ও বিশ্বাসই তাহার একমাত্র আশ্রয়। সুরঙ্গমার প্রেম যদি লাভ করিতে চাও, বিশ্বাস কর। একমুখ বিষ্ণু, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ মহেশ্বর কেহই অলীক নহে। তোমার অন্তরলোকে তাহারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তুমি কেবল বিশ্বাস কর।

চার্বাক মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই জীবন্ত বিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহের মধুর হাস্য, স্নিগ্ধ প্রশান্তি, দিব্য জ্যোতি তাহাকে ক্রমশ সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া হাত জোড় করিয়া, এই বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সম্মুখে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বসিয়া পড়িল। পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন।

চার্বাক তথাপি বসিয়া রহিল।

কুলিশপাণি সুরঙ্গমার অপেক্ষায় দ্বার খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহার ধৈর্য যখন সীমা অতিক্রম করিতেছে, তখন দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শোনা গেল। কুলিশপাণি সাগ্রহে উঠিয়া আগাইয়া আসিল,

কিন্তু দ্বারপ্রান্তে সুরঙ্গমাকে দেখিতে পাইল না। পাইল কিরাতবেশী দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ব্যক্তিকে, তাহার পর তাহার নজরে পড়িল ছায়ার অন্ধকারে একটি নারীমূর্তিও রহিয়াছে।

"কে আপনারা?"

পুরুষটি উত্তর দিলেন।

"আমরা নাগদম্পতি। আমার নাম চিত্রক, ইনি চিত্রিকা। আপনার নাম কি কুলিশপাণি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাকে একটি সংবাদ দিতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন নিবেদন করি। আপনার হিতার্থেই এসেছি আমরা। আপনারা রাজারাজড়া লোক, তাই সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার করছি। সহজ চলতি ভাষাতেই আমরা অভ্যস্ত।"

"সহজ চলতি ভাষাতেই বলুন। কি সংবাদ—?"

"আপনি কি সুরঙ্গমাকে নিয়ে ভাগতে চান?"

প্রশ্ন শুনিয়া কুলিশপাণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর একবার ভাল করিয়া সেই কিরাতবেশী বিরাট পুরুষের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। ইহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু এই লোকটি তাহার এই গোপন কথাটি জানিল কি করিয়া? সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য কেহ তো একথা জানে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটির কাছে সত্য স্বীকার করা সমীচীনও নহে। সুন্দরানন্দের কানে গেলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্থির করিল অকপটে উত্তর দেওয়া উচিত হইবে না। বলিল—"আপনার সংবাদটি অদ্ভুত। কোথা থেকে শুনলেন?"

"আপনারই মুখ থেকে।"

"আমার মুখ থেকে! কি রকম?"

"কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরঙ্গমাকে বলছিলেন—কাছেই আমার ঘোড়া বাঁধা আছে চল তোমাকে নিয়ে পালাই—তখন চিত্রিকা আপনার খুব কাছেই ছিল। স্বকর্ণে সে আপনার কথাগুলি শুনেছে।"

কুলিশপাণি চিত্রিকার দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে সে ভাল করিয়া তাহাকে দেখে নাই; চিত্রিকাকে দেখিয়া খানিকক্ষণের জন্য বিস্ময়ে সে নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল মানবীতে এত রূপ সম্ভবে না। চিত্রিকা আনত নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কুলিশপাণির সন্দেহ হইল, মেয়েটি যেন তাহার মনের কথা টের পাইয়াছে। তাই একটু জবাবদিহির সুরেই বলিল—"সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

পুরুষটিই পুনরায় উত্তর দিলেন।

"না, দেখেননি। যে রূপে আমাদের দেখছেন নিজেদের সে রূপ আমরাও কখনও দেখিনি। সেকথা যাক। যা বলছিলাম, চিত্রিকা স্বকর্ণে আপনার কথাগুলি শুনেছে। আপনি যখন সুরঙ্গমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ও যদিও আপনার খুব কাছেই ছিল, তবু দেখেননি, কারণ দেখা সম্ভব ছিল না। ও তখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় একটা গর্তে ঢুকেছিল—"

কুলিশপাণির দেহে একটা শিহরন বহিয়া গেল। সে বিস্ফারিত নয়নে চিত্রিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সত্যই মনে হইতে লাগিল, যে বসনে চিত্রিকার দেহ আবৃত রহিয়াছে তাহা যেন সর্প-চর্মের মতোই চিক্কণ ও চিত্র-বিচিত্র।

পুরুষটি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"গোড়াতেই তো বলেছি আমরা নাগদম্পতি। মহাদেবের বরে আমরা যে কোনও রূপ ধারণ করতে সমর্থ। তাই মনুষ্যবেশে আপনার কাছে এসেছি। আমরা আপনার হিতৈষী। আপনি অকপটে আমাদের সব কথা বলতে পারেন। আপনার যাতে অনিষ্ট হয় সেরকম কাজ কখনও আমরা করব না—"

কুলিশপাণি জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া পড়িল।

"মহাদেব আমার কুলদেবতা। আপনারা যখন তাঁর বরে বলীয়ান তখন আপনাদের অবিদিত কিছু নেই। আমার মনের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এ অবস্থায় কি করব উপদেশ দিন।"

পুরুষটি হাসিয়া বলিলেন—"সেই জন্যই তো এসেছি। চিত্রিকা যখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় গর্তে ঢুকেছিল, আমি তখন অন্যত্র একটা গেছো-ব্যাঙের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সময় কানে এল সুরঙ্গমা চার্বাকের সঙ্গে পালাবে পরামর্শ করছে।"

"চার্বাকের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। যে চার্বাক পর্বতকন্যা ধারামতীর সর্বনাশ করেছে সেই সুরঙ্গমাকে নিয়ে পালাবার তালে আছে!"

"চার্বাক কোথায়?"

"এই বনেই আছে কোথাও নিশ্চয়। এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না।"

"আপনি এ খবর শুনলেন কোথা?"

"আমি যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার কানে এল সুরঙ্গমা চার্বাককে বলছে—"আপনি যদি আমাকে আমার সর্বোচ্চ মূল্য দেন, আমি আপনার কাছেই যাব"। চার্বাক দেখলাম তাতেই রাজী! তার কিছুক্ষণ পরে চিত্রিকার সঙ্গে দেখা হল, চিত্রিকা বললে তুমিও নাকি সুরঙ্গমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সরে পড়তে চাও। সুরঙ্গমাও নিমরাজি-গোছ হয়েছে। তখন আমাদের মনে হল চার্বাকের খবরটা তোমাকে বলে যাওয়া উচিত। তুমি যখন শিব-ভক্ত, তখন তুমি আমাদের নিজেদের লোক। খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম, এখন তুমি যা ব্যবস্থা করবার কর।"

কুলিশপাণি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কটিনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—"চার্বাক যদি এ বনে কোথাও থাকে তাহলে আগামী কল্য তাকে আর সূর্যোদয় দেখতে হবে না। আজ রাত্রিই তার জীবনের শেষ রাত্রি। নাগদম্পতি, আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না জীবনে। আশীর্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—"

কুলিশপাণি পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল—"সত্য আশীর্বাদ করুন আমাকে। সুরঙ্গমাকে না পেলে জীবন আমার মরুভূমি হয়ে যাবে"

পুরুষটি স্মিতমুখে কুলিশপাণির দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন—"আমি আশীর্বাদ করি না কাউকে।"

"কেন?"

"ফলে না।"

কুলিশপাণি এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। বলিল—"কি ফলে তাহলে।"

"তা-ও জানি না।"

"কিছু উপদেশ দিন অন্তত। তাতেও আমার অনেক উপকার হবে। আপনারা শিবের বর পেয়েছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন।"

"ওটা ভুল ধারণা কেউ অসাধ্য-সাধন করতে পারে না। আগে উপদেশ দিতাম, কিন্তু এখন তা-ও আর দিই না।"

"কেন?"

"দিলে কেউ শোনে না।"

"আমি শুনব।"

"শুনবে?"

"তাহলে একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। হোঁৎকামি কোরো না। করলে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না কোনও—"

বাহিরে একটা পেচক কর্কশশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুরুষটি বলিল—"ডাক এসেছে। এবার আমরা চললাম।"

"কার ডাক?"

কুলিশপাণি এ প্রশ্নের উত্তর পাইল না। কারণ নাগদম্পতী সহসা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরঙ্গমার জন্য অপেক্ষা করিবে, না, চার্বাকের সন্ধানে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবে—তাহা স্থির করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় লাগিল। অবশেষে সুরঙ্গমার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করাই তাহার সঙ্গত মনে হইল। একটি বেত্রাসন বাহির করিয়া বাহিরে বারান্দায় সে উপবেশন করিয়া কিরাতবেশী নাগদম্পতীর রহস্যময় আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। দেব-দেবী-মাহাত্ম্যে কুলিশপাণির অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাদেবের কৃপা হইলে সর্প যে ইচ্ছানুসারে যে-কোনও মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে ইহা তাহার নিকট মোটেই বিস্ময়জনক মনে হয় নাই। সে ভাবিতেছিল এই নাগদম্পতি এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া যে উপদেশ তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে দিয়া গেলেন, সে উপদেশের তাৎপর্য কি! চার্বাককে খুজিয়া বাহির করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবার যে বাসনা তাহার মনে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি অন্যায়, না অসঙ্গত? ওই ধূর্ত লোকটার ওই তো উচিত শাস্তি। আবার তাহার মনে হইল,' ব্রহ্মহত্যা করাটা উচিত হইবে কি? ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু এই মহাপাপের স্বপক্ষে যুক্তিসংগ্রহ করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। প্রথমত তাহার মনে হইল ওই বিবেকহীন ব্যভিচারী লোকটা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ও চণ্ডালেরও অধম। দ্বিতীয়ত মনে হইল—সে তো হত্যা করিবে না, দণ্ডবিধান করিবে। সুন্দরানন্দের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে অধিকার তাহার আছে। দুষ্টের দমন তাহার কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও সে কিন্তু মনে মনে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ওই সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত পুরুষ তাচ্ছিল্যভরে চলিত ভাষায় তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গেল, তাহার কি অর্থ হইতে পারে! চার্বাককে হত্যা করিলে কি দেবরোষে পতিত হইতে হইবে? কিন্তু....সহসা তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। একটি সঞ্চারমান বর্তিকা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আর সন্দেহ রহিল না, কুলিশপাণি বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমাই আসিতেছে। সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরও একটু পরে শোনা গেল।

"আপনি জেগে আছেন নাকি?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ। শুধু জেগে নেই, অধীর আগ্রহে জেগে আছি। তারপর কি ঠিক করলে, বল। যাবে আমার সঙ্গে?"

"যাওয়ার আর দরকার হবে না। মহর্ষি পর্বত আমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করতে চাইছেন না। সুতরাং আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে আর নিজেকে বিপন্ন করতে হবে না। আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। আপনি যে আমার মতো একজন সামান্যা নর্তকীর জন্য এতটা করতে রাজী হয়েছিলেন, এর জন্য আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।....."

সুরঙ্গমা বর্তিকাটি বারান্দায় রাখিয়াছিল। বর্তিকালোকে কুলিশপাণি সুরঙ্গমার পূর্ণ শ্রী দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ অন্ধকারের পটভূমিকায় এই তন্বী রূপসীকে পুনরায় সে যে মহিমায় অলঙ্কৃত দেখিল, তাহাতে তাহার বিবেক আবার নব-মোহে আচ্ছন্ন হইল, শুভাশুভ জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া গেল, তাহার সমস্ত চেতনায় একটি বাসনাই শিখার মতো উন্মুখ হইয়া উঠিল—সুরঙ্গমাকে চাই। কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখে কোনও কথা সরিল না। যখন সরিল তখন সে বলিল—"আমি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা চাইনি, সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম।"

সুরঙ্গমা হাসিয়া বলিল—"এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি। আমার দেহটা হয়তো আপনাকে দিতে পারি—তা-ও সুন্দরানন্দের অনুমতি নিয়ে তা দিতে হবে, কারণ আমার এই দেহটা তাঁরই সম্পত্তি—কিন্তু আপনি যা চাইছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নিজেরও নেই। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দাতা এবং গ্রহীতার অনেকদিনের মেলা-মেশার ফলে হয়। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার কথা।"

কুলিশপাণি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া কেবল উষ্ণশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সে বর্তিকাটি তুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

"তুমি যা যুক্তিযুক্ত তাই সহজ ভাবে বলেছ। তোমার বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তা বলতে পারছি না, তা যুক্তিযুক্তও নয়। আমার অব্যক্ত কথা তুমি বুঝতে পারবে কি না জানি না। আমি একটি কথা কেবল জানতে চাই, আশা করি সত্য উত্তর পাব।"

"বলুন—"

"চার্বাক কি এখানে এসেছেন?"

"এসেছেন।"

"কোথায় আছেন?"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"তা জানতে চাইছেন কেন?"

"কর্তব্যের জন্য। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন তাকে বন্দী করতে।"

"বন্দী করবার দরকার হবে না আর। সুন্দরানন্দ সব কথা শোনার পর ক্ষমা করেছেন তাঁকে। আপনি সম্ভবত একটু পরেই কুমারের নূতন আদেশ পাবেন।"

কুলিশপাণি যেন আকাশ হইতে পড়িল।

"চার্বাককে কুমার ক্ষমা করেছেন? তুমি এ কথা শুনলে কোথা থেকে?"

"কুমারেরই মুখ থেকে।"

"চার্বাকের কথা উঠল কি প্রসঙ্গে?"

"প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। চার্বাক আমারই মাধ্যমে ক্ষমার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।"

"তোমার সঙ্গে চার্বাকের দেখা হয়েছে তাহলে।"

"হয়েছে বই কি।"

"চার্বাক কোথায় আছে"

সুরঙ্গমা পুনরায় মৌন হইয়া গেল। তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন সেনাপতি। আমি মহর্ষি চার্বাককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাঁর অবস্থান গোপন রাখব।"

"এ রকম অন্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থ?"

কুলিশপাণির কণ্ঠস্বরে কঠোরতার আভাস পাইয়া সুরঙ্গমার মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"পুরুষদের সকল প্রকার দুর্বলতাকে চিরকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। ওটা আমার দুর্বলতা। অনেক বড় বড় রথী-মহারথীরা আমার এ দুর্বলতাকে ক্ষমা করেছেন। আশা করি আপনিও করবেন?"

সুরঙ্গমার এই তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি শুনিয়া কুলিশপাণি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল সুরঙ্গমার এ দুর্বলতা না থাকিলে তাহার অবস্থা কি হইত? যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া সে উত্তর দিল।

"তোমার মতো রূপসীদের চিরকালই সাত খুন মাপ। এ নিয়ে আমি মাথাই ঘামাতাম না, কিন্তু একটু আগে যে সাংঘাতিক সাংবাদটি আমি শুনেছি তাতে সত্যিই একটু বিচলিত হয়েছি।"

"কি সংবাদ?"

"সংবাদটি বলবার আগে আমি একটি অনুরোধ করব। অকপটে বোলো সংবাদটি সত্য কি না।"

"এ অনুরোধ করার দরকার ছিল না সেনাপতি। রূঢ় সত্যের উপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাই আমি মিথ্যাচরণ করতে পারি না। করলেও সে মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। বলুন, আপনি কি সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়েছেন?"

"শুনলাম তুমি চার্বাককে নাকি বলেছ, 'আপনি যদি আমাকে আমার সর্বোচ মূল্য দেন তাহলে আমি আপনার কাছে যাব। আর চার্বাক তাতে নাকি রাজীও হয়েছে।"

সুরঙ্গমা একটু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে-মুখে সে বিস্ময় প্রতিভাত হইল না। সহজভাবে হাসিয়া সে বলিল—"যা শুনেছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, সংবাদটি আপনি পেলেন কি করে।"

"তোমরা যখন আলাপ করছিলে, তখন যিনি তা আড়াল থেকে শুনেছিলেন তিনিই আমাকে বলে গেলেন।"

সুরঙ্গমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ঠিকই বলে গেছেন তিনি।"

"জানতে পারি কি—চার্বাক তোমাকে কি মূল্য দিতে চান?"

"আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবেন।"

"সত্যি?"

"বলেছেন দেবেন। শেষ পর্যন্ত দেবেন কি না জানি না।"

কুলিশপাণি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহসা সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

"ভোর হয়ে এল বোধহয়। এবার আমি যাই।"

"কোথা যাচ্ছ?"

"নিজের ঘরে। ঘুমোব এখন।"

সুরঙ্গমা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া কুলিশপাণি চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বর্তিকালোক যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন সে-ও ঘরের ভিতর ঢুকল। তাহারও ঘুম পাইয়াছিল।

নাগ-দম্পতি পেচক-দম্পতিতে রূপান্তরিত হইয়া একটি সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের শাখায় তৃতীয় একটি পেচকের ভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল।

তৃতীয় পেচক শুদ্ধ ভাষায় বলিতেছিল—"হে পিতামহ, তুমি আর বাণী নিজেদের আনন্দে মত্ত হইয়া সৃষ্টির পর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। সে সৃষ্টি বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের এই সুমহতী সৃষ্টিকে বিধৃত করিবার জন্য আমিও নিজেকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে, তোমাদের সৃষ্টিও রূপ হইতে রূপান্তরে বিবর্তিত হইতেছে। মানব-কবিরা অনন্ত বিশেষণে ভূষিত করিয়া সে সৃষ্টিকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতার সীমা-রেখা পার করিয়া দিয়াছেন। তোমাদেরও খেয়াল নাই, তোমরা সৃষ্টির আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমার মনে হয় এইবার তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি আর নিজেকে কত প্রসারিত করিব।"

তৃতীয় পেচক নীরব হইল। নীরব হইবামাত্র একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দিক যেন নিমজ্জিত হইয়া গেল। মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে সৃষ্টি সত্যই অবলুপ্ত হইয়া গেল বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্তেই বহুবিধ আরণ্য শব্দ—ঝিল্লীধ্বনি, বৃক্ষমর্মর, শ্বাপদের চীৎকার—সে নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। কোটি কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

প্রথম পেচক বলিল—"মহাকাল, শুদ্ধ ভাষায় উচ্চারিত তোমার বক্তব্য শুনলাম, এইবার আমার বক্তব্য শোন। নূতন সৃষ্টি বহুকাল পূর্বেই থেমে গেছে। কিন্তু সেই পুরাতন সৃষ্টির যে সব ফ্যাঁকড়া বেরিয়েছে, আর শ্রীমতী বাণী তা যেমনভাবে ব্যক্ত করছেন, তাতে আমারই তাক লেগে যাচ্ছে। চার্বাক যে শিখর সেন হয়ে যাবে, কালকূট যে কুলিশপাণি বা কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হবে, এতো কল্পনা করিনি আমি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখছি—হচ্ছে, অবিশ্বাস করবারও উপায় নেই। তুমি আর একটু বাড়—"

তৃতীয় পেচক। আমি অসমর্থ—

প্রথম পেচক। চেষ্টা কর—ওই তো—

তৃতীয় পেচকের দেহায়তন ক্রমশ বর্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা বিশাল

মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল প্রাবৃটের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ জলধরকে বিদীর্ণ করিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎমালা মুহুর্মুহুঃ অন্ধকারকে শিহরিত করিয়া তুলিল। বজ্রগর্জনে দশদিক চমকিত হইল।

প্রথম পেচক। [দ্বিতীয় পেচককে] ময়শার কাণ্ডটা দেখেছ! ও ভেবেছিল আমাকে হকচকিয়ে দেবে। কিন্তু ওর ধাপ্পায় ভোলবার ছেলে নই আমি। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল—আমার সৃষ্টিকে তুমি বিধৃত করনি—ধ্বংস করেছ, কল্পনায় বিষ্ণুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে কথা বলেওছিলাম একদিন—কিন্তু—

দ্বিতীয় পেচক। কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৃথক নন। একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ওঁরা—

প্রথম পেচক। ঠিকই শুনেছ প্রেয়সি।

দ্বিতীয় পেচক। তাহলে আবার ওদের গাল দিচ্ছেন কেন! ওতে তো নিজেকেই গাল দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম পেচক। নিজেকে গাল দিতেও বেশ লাগে মাঝে মাঝে। ওকে যখন ভাল লাগে, যখন মনে হয় যে ও আমারই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ, তখন ওকে মহেশ্বর, পঞ্চানন বলে সুখ পাই, আবার ওকে যখন শত্রু মনে করি তখন ওকে ময়শা, পেঁচো বলতেও মন্দ লাগে না। দুটো ব্যাপারেই বেশ রস আছে! রসই আসল। বাস্তবেও রস আছে, স্বপ্নেও রস আছে। যেখান থেকেই হোক রসাস্বাদন করাই হল লক্ষ্য, তাতেই আনন্দ। ময়শাকে মনের আনন্দে বেশ গাল দিচ্ছিলাম, হঠাৎ তুমি রস-ভঙ্গ করে দিলে—এখন কি করা যায় বল তো—

দ্বিতীয় পেচক। [হাসিয়া] তা কি আর আমাকে বলে দিতে হবে?

প্রথম পেচক। তোমার থ্যাবড়া মুখে বাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসিটি মন্দ লাগছে না। এদিকে একটু সরে বসলেই তো ভাল হয়।

পেচকদম্পতি পরস্পরের চঞ্চুচুম্বনে রত হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে আকাশে যে ভয়ঙ্কর ঘনঘটা চরাচরকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইল, জ্যোৎস্না-কিরণে কানন-কান্তার পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

প্রথম পেচক। [সহসা] একটা খবর জান?

দ্বিতীয় পেচক। কি?

প্রথম পেচক। কুলিশপাণিকে আমরা ভুলিয়েছি, কিন্তু চার্বাককে পারিনি। ও চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখে হতভম্ব হয়েছিল, কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি। ওই দেখ, ঘর থেকে বেরিয়ে ও চলে যাচ্ছে—! লোকটা খাঁটি লোক।

সেই পর্ণকুটীরে চতুরাননের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব চার্বাককে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিদারুণ ভয়ের আঘাতেই তাহার মোহগ্রস্ত মন প্রকৃতিস্থও হইল। সে বুঝিতে পারিল কত নীচে সে নামিয়াছে। কি আশ্চর্য, একটা নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া সে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ওই নর্তকী একটু আগে ভোজবাজির সহায়তায় তাহাকে যে ব্রহ্মামূর্তি দর্শন করাইল, আর একটু হইলে সে তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপনও করিত। ছি, ছি, ছি—দার্শনিক চার্বাকের এ কি শোচনীয় অধঃপতন। একটা ভোজবাজিকে সে

সত্য বলিয়া মনে করিল! ভয় পাইয়া মূর্ছা গেল! নীলোৎপলা তাহাকে অদ্ভুত একটা সুরাপান করাইয়া অদ্ভুত স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছিল। সুরঙ্গমা এ কি করিল! তাহার সমস্ত যুক্তিকে, মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া তাহার শবদেহের উপর নৃত্য করিবে—এই অস্বাভাবিক বাসনা তাহাকে পাইয়া বসিল কেন, আর সেই বাসনাকে সে প্রশ্রয় দিল কোন্ বুদ্ধিতে!

.....অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার পর স্থির করিল—মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে হইবে। রূপসী সুরঙ্গমাকে লাভ করিতে পারিলে তাহার পৌরুষ সার্থত হইত, কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল্যে সে সার্থকতা লাভ করা অর্থহীন। সে সুরঙ্গমাকে জয় করিতে চাহিয়াছিল; কিছুতেই তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুঠির ত্যাগ করিল। স্থির করিল, যত শীঘ্র সম্ভব সে এই বনস্থলী ত্যাগ করিবে। অন্ধকারে অরণ্যপথে তাহার গতি দ্রুত হইল না, কিন্তু তথাপি ত্বরিত চরণেই সে পথ অতিবাহন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে অরণ্যেই রাত্রিবাস করিতে হইবে। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নহে। সম্মুখেই শাখাপত্রবহুল একটি বৃক্ষ ছিল। তাহাতেই সে আরোহণ করিল।

প্রথম পেচক। নাটক আর একটু পরে জমবে।

দ্বিতীয় পেচক। সুরঙ্গমা আসছে বুঝি?

প্রথম পেচক। ওই যে। শুধু আসছে না, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে ও আকুল হয়ে উঠেছে। ঘোরতর কিছু একটা ঘটবে।

দ্বিতীয় পেচক। ওদিকে শিখর আর অবন্ধনার ব্যাপারও ঘোরতর হয়ে উঠছে নিশ্চয়।

প্রথম পেচক। নিশ্চয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এই হচ্ছে। প্রথমে ফিকে, তারপর ঘোর, তারপর ঘোরতর। চল ওদের খবর নিয়ে আসা যাক, সুরঙ্গমা চার্বাককে খুঁজে বার করুক ততক্ষণ—

পেচকদম্পতি উড়িয়া গেল।

একটু পরেই দেখা গেল, সুরঙ্গমা বর্তিকা-হস্তে চার্বাককে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার প্রদীপ্ত-নয়নে স্ফুরিত-অধরে দোদুল্যমান কৃষ্ণবেণীর নিবিড়তায় চিরন্তনী নারীর কৌতূহল মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুরঙ্গমা বর্তিকাহস্তে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে চার্বাককেই সন্ধান করিতেছিল। জালবদ্ধ শিকার জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিলে ব্যাধের যে মনোভাব হয়, সুরঙ্গমার সেরূপ মনোভাব হয় নাই। চার্বাক চলিয়া যাক ইহাই সে মনে মনে কামনা করিতেছিল। যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া এই জ্ঞানী পণ্ডিতের জীবন-নাশ করিবার বাসনাও তাহার ছিল না, সে কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহার জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। অর্থাৎ দার্শনিকের অনমনীয় বিবেকের সহিত কামনার দ্বন্দ্বে কামনাই জয়ী হয় কি না। তাহার পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। যিনি যজ্ঞবিরোধী, যিনি পরলোকে বিশ্বাস করেন না, ইহলোকের সুখ-ভোগই যাঁহার একমাত্র কাম্য, তিনি একজন নটীর মোহে পড়িয়া যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতেই সম্মত হইয়াছিলেন শেষে। তাঁহার অসহায় মুখচ্ছবিটা সুরঙ্গমার মানসপটে বারম্বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। বিজয়িনীর আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ হইয়া

সে এই মানব-পশুটাকে লইয়া একটু খেলা করিবে ভাবিয়াছিল, খেলা করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এ কি হইল! লোকটা সহসা অন্তর্ধান করিল কেন? কোথায় গেল! কুলিশপাণির কবলে পড়িল না কি! চার্বাকের যতটুকু পরিচয় সুরঙ্গমা পাইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন একথা সুরঙ্গমা ভাবিতেই পারিতেছিল না। একবার প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলে সহজে আত্মস্থ হওয়া যায় না—ইহাই সুরঙ্গমার অভিজ্ঞতা। তবে একথাও সত্য যে, চার্বাকের মতো কোনও মহর্ষি ইতিপূর্বে তাহার প্রেমে পড়ে নাই। তাহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া যে ব্যক্তি এত সহজে পলায়ন করিতে পারে, সে নিঃসন্দেহে অসাধারণ ব্যক্তি। এ সম্ভাবনা সুরঙ্গমাকে আরও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যটা কি জানিবার জন্য তাই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে। একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলে নিজেই সে বুঝিতে পারিত তাহার এ কৌতূহলের মূলে আছে তাহার অহঙ্কার। তাহাকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবে এমন পুরুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা অসম্ভব তাহার পক্ষে। মহর্ষি চার্বাকের মধ্যে সে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কি না তাহাই যাচাই করিবার জন্য তাহার আকুলতা, তাই সে বর্তিকাহস্তে অন্ধকারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়াও কিন্তু সে চার্বাকের দেখা পাইল না। হতাশ চিত্তেই ফিরিতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল চার্বাক একটি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে। সুরঙ্গমা দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া চার্বাক তাহারই দিকে দ্রুতপদে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

"ও, সুরঙ্গমা তুমি! আমি ভাবছিলাম বুঝি আর কেউ!"

"আপনি কোথা গিয়েছিলেন! আমি আপনাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

সুরঙ্গমা বর্তিকাটি ভূমিতে স্থাপন করিল।

"আমি তোমার আশা ত্যাগ করে চলে যাব ঠিক করেছি। ওই গাছের উপর উঠেছিলাম—অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে। ঠিক করেছিলাম ভোরেই বন ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। মনে হল এমন ভাবে যদি পালিয়ে যাই, তোমার ধারণা হবে আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছি। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে দিতে চাই না। তাই ঠিক করেছি কুমার সুন্দরানন্দের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা বলে আত্মসমর্পণ করব। তা ছাড়া আমি সত্যাশ্রয়ী, চিরকাল সত্যকেই সন্ধান করবার চেষ্টা করছি, প্রাণভয়ে সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হব না। আমাকে সুন্দরানন্দের কাছে নিয়ে চল।"

"কুমার তো আপনাকে ক্ষমা করেছেন।"

"আমি তাঁর কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না—একথা জানবার পরও ক্ষমা করেছেন?"

"আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করবেন কেন তিনি!"

"কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলে গেলে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। ভোজবাজির সহায়তায় চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে মূর্তও করে তুললে তুমি আমার মনে। ক্ষণিকের জন্য আমি বিহ্বলও হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে ঘোর কেটে যেতে দেরি হয়নি আমার—"

"এ সব কি বলছেন আপনি! আমি তো আপনার কাছে আসিনি—"

"তুমি সুন্দরী, ছলনাই তোমার ভূষণ। আমি তোমার উপর রাগ করছি না। কিন্তু আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই!"

"আপনি ভুল করছেন মহর্ষি। সত্যিই আমি আপনার কাছে আসিনি। আমার অপেক্ষায় বসে বসে আপনি হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেই তন্দ্রার ঘোরে সম্ভবত স্বপ্ন দেখেছেন আপনি—"

"তুমি যখন বলছ তখন তাই ঠিক। আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা আমি জেগেই ছিলাম। যাক, এখন ওসব আলোচনা করে লাভই বা কি! কুমার সুন্দরানন্দের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তিনি আমার সম্বন্ধে যা ঠিক করবেন তাই আমি মেনে নেব।"

"আপনি আশা করি, যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে এখনও প্রস্তুত আছেন?"

"না। স্বেচ্ছায় আমি যূপকাষ্ঠে আর গলা বাড়িয়ে দেব না। তবে কুমার যদি জোর করে আমাকে বধ করেন সে আলাদা কথা।"

"কিন্তু একটু আগে তো আপনি প্রস্তুত ছিলেন।"

"সেজন্য আমি লজ্জিত। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছিল।"

চার্বাক ও সুরঙ্গমা কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

চার্বাক সহসা বলিল—"আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি সুরঙ্গমা। এখনও চাই তোমাকে—"

"কিন্তু—"

সুরঙ্গমা আর কিছু বলিতে পারিল না। অঞ্চলপ্রান্ত তুলিয়া নয়ন দুইটি আবৃত করিল।

"কাঁদছ নাকি— !"

সুরঙ্গমা মুখ হইতে অঞ্চলপ্রান্ত সরাইয়া দিল। চার্বাক লক্ষ্য করিল সত্যই তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র।

"কাঁদছ কেন সুরঙ্গমা হঠাৎ।"

"হঠাৎ নয়, চিরকালই কাঁদছি। কান্নার উপর হাসির যে মুখোশটা পরে থাকি, সেটা মাঝে মাঝে সরে যায়। এখনও গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে প্রকৃত প্রেমিকের দর্শন পেয়েছি, কারণ আমাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আপনি, কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যা, সব ভুল—"

চার্বাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিকই ধরেছ, সব মিথ্যা, সব ভুল। আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখ—বুঝতে পারবে, সব সত্য, সব ঠিক। সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন।"

"বুঝতে পারছি না আপনার কথা। আমি মূর্খ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

"আমি তোমার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম—মহর্ষি পর্বত আমাকে যজ্ঞীয় বলি-রূপে মনোনীত করবেন না, আমার শরীরে অনেক খুঁত আছে! এখন অকপটে স্বীকার করছি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতে পারব, হয়তো তোমাকে নিয়ে চলে যেতেও পারব—এ দুরাশা আমার হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও মনে হয়েছিল মহর্ষি পর্বত যজ্ঞীয় বলি-রূপে আমাকে মনোনীত না করলেও তাঁর কন্যার প্রণয়ীরূপে আমার জীবনান্ত ঘটাতে পারেন। তাই তোমাকে সুন্দরানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলাম জানতে যে তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা। আমার এ বিশ্বাসও ছিল তুমি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু তুমি যখন ফিরে এসে বললে যে

ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না, অদ্ভুত ভোজবাজি দেখিয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেও তুমি যখন হাজির করলে আমার সামনে—"

সুরঙ্গমা আবার প্রতিবাদ করল।

"বিশ্বাস করুন মহর্ষি, আমি ওসব কিছুই করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ওটা। কুমার আপনাকে ক্ষমা করেছেন এই কথাটা বলবার জন্য আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন?"

"হ্যাঁ। আর একটি সুসংবাদও আছে—মহর্ষি পর্বত আমাকে বলির পশুরূপে নির্বাচন করেননি। যজ্ঞের জন্য একটি কিরাত বালককে কিনে আনা হয়েছে—"

"ও—"

চার্বাক কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার তাহলে তো আর কুমারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, গোপনতারও প্রয়োজন নেই। কোথাও রাতটা কাটিয়ে সকালেই ফিরে যাব।"

সুরঙ্গমার মুখটা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"আমাকে ফেলে চলে যাবেন?"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে? যদি যাও আমি কৃতার্থ হব।"

"রাজনর্তনীকে এমন ভাবে হরণ করে নিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ?"

"তোমার জন্য বিপদ বরণ করতেও আমি প্রস্তুত।"

"চলুন তাহলে ভেবে দেখি।"

"কোথা যাব?"

"আমার সঙ্গে আসুন।"

"কোথা নিয়ে যাচ্ছ আগে বল।"

"আমার শয়নকক্ষে।"

"সেখানে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো—"

"বিপদ বরণ করতে তো আপনি প্রস্তুত!"

"কুমার কোথা আছেন?"

'তিনি নিজের ঘরে আছেন। আমার ঘরে তিনি যদি এসেও পড়েন, আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।"

"চল—"

সুরঙ্গমা ভূমি হইতে বর্তিকাটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। চার্বাক তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই।

হঠাৎ সুরঙ্গমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সিংহটা গর্জন করিতেছে। একটু থামিয়া পুনরায় গর্জন করিল। গর্জনের পর গর্জন হইতে লাগিল। তাহার পর চতুর্দিক নীরব হইয়া গেল। সুরঙ্গমা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চার্বাক অঘোরে ঘুমাইতেছে, সন্তর্পণে সে

শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। সিংহের প্রচণ্ড গর্জনে চতুর্দিক পুনরায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গর্জন হইল, মনে হইল যেন দুইটা সিংহ ডাকিতেছে। পর পর দুইটা ডাক দুই রকম। সুরঙ্গমার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মির্মির সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া ওই পুরুষসিংহকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন, সিংহিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া ওই প্রবল-প্রতাপ বলিষ্ঠ পশুরাজ বন্দী হইয়াছিল। মির্মির কি পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে? সুরঙ্গমা দ্রুতপদে মির্মিরের গৃহের দিকে আগাইয়া গেল। দেখিল তাহার ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। পুনরায় গর্জন হইল। পর পর দুইবার—একটা আহ্বান আর একটা উত্তর। সুরঙ্গমা বাহির হইয়াছিল কুমারের সন্ধানে। যে নূতন ক্রীড়নকটিকে লইয়া খেলা করিতে তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন, সেটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল। নিদ্রামগ্ন দুর্ধর্ষ চার্বাককে দূর হইতে দেখাইবার জন্য সে কুমারকে ডাকিতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সিংহের গর্জনে সে ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মির্মির লোকটা পাগল না কি! মির্মিরের শূন্যকক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুরঙ্গমা আবার বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া সুন্দরানন্দের গৃহের উদ্দেশেই আবার পদচালনা করিল সে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। কাননের পক্ষীকুল সহসা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। তাহার পর আবার থামিয়া গেল।

....কুমার সুন্দরানন্দের গৃহের সম্মুখে একটি শিবিকা দেখিয়া সুরঙ্গমা বিস্মিত হইল। শিবিকায় কে আসিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরঙ্গমা আরও বিস্মিত হইল। দেখিল একটি বিগত-যৌবনা রমণী কুমারের সহিত আলাপ করিতেছে। তাহার নয়নে অশ্রু। সুরঙ্গমাকে দেখিয়া সে নীরব হইল এবং অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

কুমার হাসিয়া বলিলেন—"এই যে সুরঙ্গমাও এসে পড়েছ দেখছি। ভাল সময়েই এসেছ, বস।"

সুরঙ্গমা একটি আসনে উপবেশন করিয়া নবাগতার দিকে কয়েকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুমার তাহার পরিচয় দিলেন।

"এই ভদ্রমহিলা জানি না কি করে খবর পেয়েছেন যে আমি যজ্ঞে জোর করে একটি নারী বলিদান দিচ্ছি। উনি এ খবরও পেয়েছেন, যদি অন্য কোনও নারী আমার এ যজ্ঞে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে প্রথম নারীটি অব্যাহতি পাবে। সেজন্য উনি নিজেকে যূপকাষ্ঠে সমর্পণ করতে এসেছেন এবং আমাকে অনুরোধ করছেন প্রথমা নারীটিকে মুক্তি দিতে।"

সুরঙ্গমা নির্বাক বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কুমার সুরঙ্গমাকে দেখাইয়া বলিলেন—'ইনিই সেই নারী যিনি যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে চাইছিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্বত এঁকে মনোনীত করেননি। কোনও নারীকেই তিনি নির্বাচন করবেন না। অন্য ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আপনি পথশ্রান্ত হয়েছেন নিশ্চয়, একটু বিশ্রাম করুন। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার দ্বারা আপনার যদি কোনও উপকার হয় তা আমি নিশ্চয় করব।"

এইবার মহিলাটি সুন্দরানন্দের মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "মহারাজ,

আমি মহৎ নই, আমি অতি নগণ্য, সামান্য রূপোপজীবিনী মাত্র! জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার যজ্ঞের কথা শুনলাম। তখন মনে হল আমার এই তুচ্ছ জীবন যজ্ঞে সমর্পণ করলে যদি কোনও নিরীহ রমণীর প্রাণরক্ষা হয় তাহলে তাই করা উচিত। সেইজন্যই আমি এসেছি। আমার জীবনে সুখের লেশমাত্র নেই, অনেক সন্ধান করেও সুখের নাগাল আমি পাইনি, তাই আমি জীবন বিসর্জন করতে চাই, আমাকে মহৎ বলে মহত্ত্বের অপমান করবেন না। আমি মহৎ নই, হতভাগিনী।"

কুমার একথায় বিচলিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"হর্ষ-নীড় থেকে।"

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কি?"

"নীলোৎপলা।"

কুমার বলিলেন, "বেশ, আপনি যতদিন খুশী আমার কাছে থাকুন। আপনি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।"

যে ভৃত্যটি বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল, সুন্দরানন্দ তাহাকে আদেশ দিলেন নীলোৎপলার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। প্রণাম করিয়া নীলোৎপলা ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেল।

কুমার সুরঙ্গমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবাই প্রাণ বিসর্জন করতে চায়। কেবল চার্বাক নয়, নীলোৎপলাও। মহর্ষি কোথায় এখন?"

"আমার শয়নকক্ষে দেখবেন চলুন।"

"সেখানে কি করছেন তিনি? প্রাণ-বিসর্জন দেবার মহড়া দিচ্ছেন না কি!"

"না, ঘুমুচ্ছেন। উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি ঘুম হয়নি মহর্ষির।"

"সত্যি কি তোমার জন্য প্রাণ-বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন উনি?"

"হয়েছিলেন, এখন কিন্তু মত পরিবর্তন করেছেন। বলছেন, মোহগ্রস্ত হয়ে উনি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন বলে লজ্জিত।"

"এখন মোহমুক্ত হয়েছেন বুঝি।"

"না, মোহমুক্ত হবার বাসনাই ওঁর নেই। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ উনি আর করবেন না। আমি সুলভ নই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ফিরে যেতে চাইছিলেন, আমি জোর করে ওঁকে ফিরিয়ে এনেছি।"

"কেন?"

"আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। এতক্ষণে লোকটিকে ভাল লেগেছে—"

কুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কেন লেগেছে বুঝেছি।"

"কেন বলুন তো?"

সুরঙ্গমার নয়নে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"তুমি যে দুর্লভ—এই সত্যটা ওঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে বলে।"

"আমি দুর্লভ একথা আপনিও বলবেন?"

"সত্যি কথা বললে তাই বলতে হয়। আমি সত্যই তোমাকে লাভ করেছি কি না ঠিক জানি না এখনও।"

সুরঙ্গমা উঠিয়া আসিয়া সুন্দরানন্দের কণ্ঠলগ্না হইল।

"জানেন, নিশ্চয় জানেন। বলুন জানেন—"

সুন্দরানন্দের অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই হাসিকে সুরঙ্গমার বড় ভয়। এই হাসি নীরব ভাষায় যেন বলে—আমাকে চেন না? আমি পুরুষ। আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছি, যে-কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারি।

"বলুন—"

"যা অনেকদিন থেকে জান, তা আবার নতুন করে শুনতে চাইছ কেন। তার চেয়ে চল, তোমার নূতন প্রণয়ীটির সঙ্গে আলাপ করে আসি"

"প্রণয়ী বলছেন কেন। খেলনা বলুন। আপনিই তো দিয়েছেন।"

"বেশ খেলনাই। চল আলাপ করি। একটু কিন্তু ভয় ভয় করছে।"

"কেন?"

"লোকটি শুনেছি অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিত লোকের কাছে কি বলতে কি বলে ফেলব—"

"আপনি কুমার সুন্দরানন্দ। আপনি যা বলবেন তাই সুন্দর, যা করবেন তাই আনন্দজনক"

সুরঙ্গমা আবেগভরে তাহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। তাহার পর উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া কুমার দেখিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রী জিমভ্রক দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। গতিরোধ করিতে হইল। মন্ত্রী মহাশয় প্রায় ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কুমার, সর্বনাশ হয়ে গেছে। সিংহটা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। মির্মির কাছের একটা ঝোপে ছিলেন। সিংহের কবলে পড়েছেন তিনি। সিংহটা তাঁকে এতক্ষণ নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমাদের ভয় হচ্ছে আর কিছু না করে। অনেকে এ খবর জানেই না। বিশ্বনাথ নামে কর্মচারীটি ছুটে এসে খবরটি দিলে আমাকে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার।"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি তীক্ষ্ণমুখ ছোরা এবং ধনুর্বাণ সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সুরঙ্গমার হস্তে ধনুর্বাণ দিয়া বলিলেন—"তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। সাহসও আছে। তুমিই চল আমার সঙ্গে। মন্ত্রীমশায়, আপনি এখানে থাকুন।"

"কোথা যাচ্ছেন আপনারা? হঠকারিতা করবেন না। মনে রাখবেন এ কস্তুরী মৃগ নয়, সিংহ।"

কুমারের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিল।

বলিলেন—"রাখব।"

সিংহের খাঁচার নিকট গিয়া দেখা গেল খাঁচাটি সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছে, একটা গাছের গুঁড়ি হেলিয়া পড়িয়াছে।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি বলিল—"একটু আগে উনি সিংহটাকে সেই রকম শব্দ করে উত্তেজিত করছিলেন, আমি নিজে শুনেছি।"

নিকটে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল।

সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চল, এইটেতে ওঠা যাক। দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়!"

গাছে উঠিয়াই বীভৎস দৃশ্যটি সুন্দরানন্দ দেখিতে পাইলেন। গাছের নীচেই একটি ঝোপের ধারে বসিয়া সিংহটি মির্মিরকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, "আমি তীর ছুঁড়ব?"

"না, দরকার হলে পরে ছুঁড়ো—"

এই কথা বলিয়া কুমার বৃক্ষশিখর হইতে বিদ্যুৎবেগে লম্ফ দিয়া সিংহের উপর গিয়া পড়িলেন এবং প্রকাণ্ড ছোরাটি তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বসাইয়া দিলেন। সিংহের গর্জনের সহিত সুরঙ্গমার চীৎকারও মিশিল, কারণ সুরঙ্গমাও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সুন্দরানন্দ লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন সিংহের পিঠের উপর, সুরঙ্গমা পড়িল তাহার ব্যায়ত মুখের সম্মুখে। সুন্দরানন্দ যদি ত্বরিত গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সুরঙ্গমাকে সরাইয়া না লইতেন, সুরঙ্গমারও সেদিন মৃত্যু হইত। ছোরার আঘাতে সিংহের মেরুদণ্ড এবং হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে গর্জন করিতেছিল বটে, কিন্তু উঠিতে পারিতেছিল না। কুমার সুরঙ্গমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইলেন, সুরঙ্গমার মৃণাল বাহু কুমারের বলিষ্ঠ গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। সুরঙ্গমা কাঁপিতেছিল। কুমার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"কাঁদছ নাকি—"

"না।"

সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের বুকে মুখ লুকাইয়াছিল।

"কই দেখি—"

সুরঙ্গমা কুমারের মুখের দিকে চাহিল। কুমার দেখিলেন, তাহার নয়নপল্লব আর্দ্র, কিন্তু মুখে হাসি। সিংহ পুনরায় একটা গর্জন করিয়া নীরব হইল।

কুমার বলিলেন, "চল, এইবার তোমার নূতন খেলনাটা দেখে আসি। তারপর মির্মিরের শেষকৃত্য করা যাবে।"

।। সাতাশ ।।

প্রজাপতিযুগল কবির ঘরে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। কবি তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন না, কারণ তাহারা এবার টেবিল-বাতির শেডের উপর বসে নাই, কবির ঠিক মাথার উপর ছাতে বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল, পাশাপাশি যেন দুইটি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র আঁকা আছে। কবি কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"যে আলেয়াকে কেন্দ্র করে আমার স্বপ্নজীবনে ও বাস্তবজীবনে সত্য-মিথ্যার বিচিত্র লীলা মূর্ত হয়েছে, দূরবীণের পরকলার ভিতর দিয়ে যার কাছে দৃষ্টির দূত পাঠিয়েছি দিনের প্রখর আলোকে, রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেও—সেই আলেয়া দেখতে দেখতে সামান্য কেরোসিনের ডিবে হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, আমার ঘরের ভিতরে এসে দুর্গন্ধ এবং ধূমও বিকীরণ করতে লাগল সে যখন তখন। নিঃসংশয়ে বুঝলাম সে তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছে, আত্মদান করেছে ওই নিত্য-নূতন মোটর-বিহারী লোকটার কাছে, প্রেমের জন্য নয়,

অর্থের জন্য। আলেয়ার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি ভাবি, কিন্তু দেখি কিছু সংশয় থেকেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমি এখনও ধরতে পারিনি—যা....অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে মোহ গিয়েও যেন থেকে যাচ্ছে। আমি নিজে লাইফ ইনসিওরেন্সের দালাল, ওকে আমার কোম্পানীর এজেন্ট করে নিয়েছি, যা কাজ পাই তার অর্ধেক ওকেই দিই। প্রায় রোজই আসে ও আমার কাছে, ওর জন্যে অপেক্ষাই করি রোজ, কিন্তু সুখ পাই না, ন্যাগালের মধ্যে পেয়েও মনে হয় পাইনি, নীচে সেই বলিষ্ঠ ছোকরা স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকে, কখনও হিলম্যান, কখনও ফোর্ড, কখনও বা অস্টিন। মনে মনে ভাবি, ছি ছি, আলেয়া কতখানি নেবে গেছে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারি না। আলেয়া সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কৃতার্থ হয়ে গেছি। শেষে একদিন আমাকেও নাবতে হল। যা এতদিন আভাসে-ইঙ্গিতে ঠারে-ঠোরে বলবার চেষ্টা করছিলাম, তা স্পষ্ট করে বলে ফেললাম একদিন।

"আলেয়া, তুমি একদিন ট্যাক্সি করে একা এস। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দেব। ও লোকটাকে সঙ্গে করে এন না!"

আলেয়া মুখ টিপে একটু হেসে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—"হঠাৎ এ অনুরোধ?"

"তোমাকে আমি চাই। নীচে একজন পাহারাদার বসে থাকলে তোমাকে পেয়েও যেন পাই না"

আলেয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে চাইলে একবার, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার মুখের মৃদু হাসিটা নিবে গেল!

"আসবে?"

আমার দিকে ফিরে আবার কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মনে হল মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"কথা বলছ না কেন? আসবে? আজই রাত্রে এস, এগারোটার পর অপেক্ষা করে থাকব।"

"আপনার কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি।"

একটা রূঢ় সুর ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে।

"আমি বহুকাল ধরে তোমাকে চাইছি। তোমার বিয়ের আগে থেকে। তোমার যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন—"

আবেগভরে সমস্ত কথা বললাম, মনে হল বললাম, কিন্তু কি যে বললাম তা মনে নেই। সমস্ত শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল আলেয়া।

"আসবে? এস, বুঝলে—"

"ভেবে দেখব।"

উঠে দাঁড়াল সে।

"তোমার জন্য অপেক্ষা করব আজ রাত্রে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে নেমে গেল। একটু পরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেলাম, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড দামী মোটরখানা চলে যাচ্ছে।

সেদিন সত্যিই অপেক্ষা করেছিলাম তার জন্যে। দূরবীন হাতে নিয়ে বসেছিলাম জানলার কাছে। হঠাৎ কি মনে হল, দূরবীণ দিয়ে অবন্ধনার ঘরটাও দেখতে লাগলাম। অবন্ধনার ঘর প্রায়ই দেখতাম রাত্রে বসে, যতক্ষণ না আলো নিবে যেত। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত শিখর সেন আসার পর থেকে। বারান্দার আলোটা জ্বলছিল সেদিন কেন জানি না। রাজমিস্ত্রী এসে অবন্ধনার দরজার সামনে কি যেন করছিল দিনের বেলা। কাঁচা সিমেন্টে পাছে কেউ পা দিয়ে দেয়, তাই বোধহয় আলোটা জ্বেলে রেখেছে...অবন্ধনার ঘরের কপাট খোলা....ঘরে আলো জ্বলছে না। তারপরই তাকে দেখতে পেলাম যে অবন্ধনাকে খুন করেছে.....চুপি চুপি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। তখন ভাবতেই পারিনি যে ও অবন্ধনাকে খুন করবার জন্য ঘরে ঢুকছে। অবন্ধনা যে মারা গেছে তা-ও আমি জেনেছিলাম অনেক পরে, কারণ একটু পরেই আমাকে কোলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।...টং করে ঘড়িতে একটা বাজল। মনে হল আলেয়া আর আসবে না, শোওয়ার যোগাড় করছি, এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল আমার বাসার সামনে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। আলেয়াই এসে ঘরে ঢুকল। দেখলাম সে-ও কাঁপছে।

"আমাকে বাঁচান আপনি—"

আমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি তুলে সোফায় বসালাম।

"কেন, কি হয়েছে—"

"উনি এসেছেন।"

"উনি মানে?"

"আমার স্বামী। এলাহাবাদ থেকে সোজা চলে এসেছেন মোটরে—"

"কে, নিরুপমবাবু?"

"হ্যাঁ—"

"তারপর? বিক্রমবাবু কোথা।"

"তিনি নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে আসব বলে। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছিলাম, এমন সময়ে কে যেন হুড়মুড় করে বিক্রমবাবুর ঘরে ঢুকল। কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি। আমি আর দাঁড়ালাম না, সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। আপনি বাঁচান আমাকে—"

"নিশ্চয় বাঁচাব, ভয় কি?"

"আমাকে কোলকাতার বাইরে নিয়ে চলুন। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। উনি হয় তো খোঁজ পেয়ে এখানেও চলে আসবেন।"

"এলেই বা। এটা কি মগের মুলুক। অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"ওঁর হাতে একটা বন্দুক দেখলুম। না, না, কমলবাবু, বড্ড ভয় করছে আমার। চলুন, পালাই এখান থেকে। এখুনি চলুন—"

"এখুনি? কোথায় যাব। কোলকাতার বাইরে গিয়ে থাকব কোথায়? হোটেলে থাকাটা কি ভাল দেখাবে?"

"বিক্রমবাবুর মধুপুরে বাড়ি আছে একটা। সেখানকার মালী চেনে আমাকে, একবার গিয়েছিলাম। সেইখানে যাই চলুন।"

"আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আবার কিছু বলবে না তো?"

"কে কি বলবে। চলুন, এই ট্যাক্সিতেই বেরিয়ে পড়ি।"

একটু ইতস্তত করছিলাম তবু।

আলেয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে অনুনয় করতে লাগল, "চলুন, চলুন, আর দেরী করবেন না।"

যেতে হল। অবন্ধনার খবর রাখবার অবসরই পেলাম না।

ফিরলাম এক মাসেরও পরে। আলেয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফিরলাম। আলেয়া একটা ইঁদারার ভিতর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। এসে শুনলাম অবন্ধনাও মারা গেছে। হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল সব। রাত্রি প্রভাত হল, না দিবস রাত্রিতে উত্তীর্ণ হল, স্বপ্ন বাস্তব হল, না বাস্তব স্বপ্নে হারিয়ে গেল—তা জানি না। সব বদলে গেল কিন্তু। মনও। দূরবীণটা বিক্রি করে দিলাম। নূতন একটা দূরবীণ পেলাম নিজের অন্তরে। সে দূরবীণ দিয়ে দেখতে লাগলাম আলেয়াকে নয় সুনন্দাকে। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম অবন্ধনার রহস্যময় মৃত্যুর কারণটা পুলিশ এখনও নাকি আবিষ্কার করতে পারেনি। অনুসন্ধানের ভার পড়েছে না কি শিখর সেনের উপর। প্রথমটা বিস্মিত হলাম, তারপর মনে একটু কৌতুক জাগল। শিখর সেন? মনের অবস্থা যদি পূর্বের মতো থাকত, তাহলে হয় তো চেষ্টা করে শিখর সেনের সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু মনের সে অবস্থা ছিল না, শিখর সেনের সঙ্গে পথেও যদি দেখা হত তাহলেও হয় তো বলতাম, কিন্তু যোগাযোগ হল না। তখন শিখর সেনের মানসিক অবস্থা কি ছিল তা জানতে পারছি তার ডায়েরী থেকে। শিখর সেন লিখছে—'সমস্ত দিন দ্বন্দ্ব করেছি নিজের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মনের মধ্যে যে নির্মম বিচারক বসে আছেন, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে চান না। তাঁর সিদ্ধান্ত অবন্ধনার মৃত্যু হওয়া উচিত। ওই পাপীয়সীকে মৃত্যুদণ্ড না দিলে অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে ও। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই কোনো বিচারে। তিনি যেন সমস্তক্ষণ আমার কানে কানে বলছেন—শিখর সেন, বিচলিত হয়ো না। সমাজের রক্ষক তুমি, যারা অসহায়, যারা অন্যায়ভাবে পীড়িত, তারা তোমার উপর বিশ্বাস করে আছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে? এর জন্যেই কি মাইনে খাচ্ছ তুমি? এই নির্মম বিচারকের সঙ্গে তর্ক করছিল আমারই মনের আর একটা অংশ। ঠিক তর্ক করছিল না, দর্শনের উচ্চ শিখরে বসে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিল। সে বলছিল, তুমিও কত দোষে-দুষ্ট মানুষ, বিচার করবার কি অধিকার আছে তোমার? মানুষ কেন পাপের পথে পা বাড়ায় তা কি তুমি জান না? সে জ্ঞান তোমার যদি হয়ে থাকে তাহলে কি তুমি শাস্তি দিতে পার? তুমি ভালবাসতে পার, ক্ষমা করতে পার—শাস্তি দিতে পার না; অবন্ধনা নিজেই হয় তো নিজেকে শাস্তি দেবে একদিন। সায়ানাইডের শিশিটা কি দেখনি সেদিন? নির্মম বিচারক বললেন, ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই আমার। আমার কর্তব্য আইন-অমান্যকারীকে আদালতে হাজির করে দেওয়া। নিতান্তই তা যদি না পারি, এমন ব্যবস্থা করা যাতে ও আর বে-আইনী কাজ না করতে পারে। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই এতে। ব্যক্তিগত ঘৃণা ভালবাসার প্রকোপে যে মানুষ কর্তব্য থেকে বিচলিত হয় সে মানুষ নয়, অমানুষ। নির্বিকার কর্তব্যপরায়ণ মানুষই মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।.....সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে

বেড়িয়েছি....চোখের সামনে সেই সায়ানাইডের শিশিটাও মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার, আর মাথার শিওরে টেবিলের উপর রাখা সেই জলের গ্লাসটা। সমস্ত দিন পরে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন ফিরছিলাম, তখন ভাবতে ভাবতে আসছিলাম অবন্ধনাকে আবার একবার বোঝাব ভাল করে। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। নীচে দেখলাম সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে, অবন্ধনা নেমে এল, আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।....বোর্ডিংয়ের জানলা কপাটে রং দিচ্ছে, সিঁড়ির রেলিংয়ে রং দিয়েছে.....উঠতে গিয়ে হাতে রং লেগে গেল। অবন্ধনার মুচকি হাসিটা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, রাতে কিছু খেলামও না, খাবার প্রবৃত্তিও হল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে চাকরটা দেখলাম জাগাচ্ছে আমাকে। সাধারণত কেউ আমাকে জাগায় না, একটু অস্বাভাবিক মনে হল। বিরক্তও হলাম।

"কিরে, ডাকছিস কেন—"

"ওপরে যে নার্স মাইজি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন? বলিস কি—"

উঠে বসলাম তড়াক করে। চাকরটা বললে—"ওঁর ঘরের কপাট তো খোলাই থাকে, আমি রোজ ভোরে গিয়ে ওঁকে চা করে দিয়ে আসি। আজও চা করে ওঁকে ডাকলাম, কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পেলাম না, কি করব ভাবছি, একটা দমকা হাওয়ায় ওঁর মুখের পাতলা চাদরটা উড়ে গেল, মুখ দেখে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি গেলেন; গিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—"মারা গেছেন আপনাকে খবর দিতে বললেন। ম্যানেজারবাবু হাউ হাউ করে কাঁদছেন বসে। চলুন আপনি—"

গিয়ে দেখলাম অবু সত্যি মারা গেছে। কি রকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সঞ্চারিত হল। নির্মম বিচারক বললেন—আপদ গেছে। কিন্তু আমার আর এক 'আমি' হায় হায় করতে লাগল। অবু, আমার অবু, আর তাকে দেখতে পাব না? আর সে কথা কইবে না?

আমার আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে গেল, তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। অবন্ধনার মাথার কাছে যে জলের গ্লাসটা আছে, সেটার ঢাকা খোলা, তাতে আধ-গেলাস মাত্র জল রয়েছে, গ্লাসের গায়ে সবুজ রঙের দাগ—যে সবুজ রং বোর্ডিংয়ের চতুর্দিকে লাগানো হচ্ছে সেই রং। পাশেই সায়ানাইডের শিশিটা খোলা, তাতেও রং। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপও উঠেছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট পায়ের দাগ। অবন্ধনার ঘরের চৌকাঠের সামনে খানিকটা জায়গায় কাল বিকেলে সিমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সেই সিমেন্টের উপর পায়ের স্পষ্ট দাগ রয়েছে।

অবন্ধনার মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত করবার ভার আমিই পেয়েছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে, সায়ানাইড খেয়েই ওর মৃত্যু হয়েছে। ও কি নিজে ইচ্ছে করে সায়ানাইড খেয়েছে? তাহলে সে কথাটা কি ও লিখে যেত না? কাচের গ্লাসের গায়ে কার আঙুলের ছাপ রয়েছে? অবন্ধনার ডান হাতে সামান্য একটু রং ছিল বটে, কিন্তু ওর আঙুলের

ছাপের সঙ্গে গ্লাসে যে ছাপ পাওয়া যাচ্ছে তার কিছুমাত্র মিল নেই। তাছাড়া ওই পায়ের দাগটাই বা কার? বোর্ডিংয়ের অনেকেরই আঙুলের ছাপ আর পায়ের ছাপ নিয়ে পাঠিয়েছি বিশেষজ্ঞের কাছে, যারা যারা অবন্ধনার ঘরে আসত সকলেরই—ম্যানেজারের, চাকরটার, আরও তিনজনের, সেই কালোবাজারীটাকে অ্যারেস্ট করেছি, তারও আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছে........

রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ লিখছেন—যে পায়ের ছাপ সিমেন্টের উপর পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে একজনেরও পায়ের ছাপ মেলেনি। আঙুলের ছাপও নয়।

আশ্চর্য, কার ছাপ তাহলে ওগুলো! একটা লোক, না একাধিক লোক ছিল? রহস্যের সমাধান কিন্তু করতেই হবে। অবন্ধনা আত্মহত্যা করেনি। কেনইবা ওর খাবার জলের সঙ্গে কেউ সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। কে সে? কেনই বা দিলে? ঘর থেকে একটি জিনিস তো চুরি যায়নি। প্রণয়ঘটিত ঈর্ষা? প্রতিহিংসা? হতে পারে। অবন্ধনা যে সমাজে ঘুরে বেড়াত সে সমাজ ভদ্রসমাজ নয়। লোকটাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করবই।......

শিখর সেন যে আমারই সহায়তায় শেষকালে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবে, তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ডায়েরির যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত করেছি, ঠিক তার পরেই আমার সঙ্গে শিখরের দেখা হয়ে গেল রাস্তায়।

"তারপর, কি খবর, অনেকদিন দেখা হয়নি তোর সঙ্গে—"

শিখর দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ তার চোখের দিকে তাকাইনি, তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। অমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখিনি। আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলল না।

"কি করছিস আজকাল—"

"আমি? কি আবার করব!" একটু হেসে উত্তর দিলে সে—"চাকরী করছি। না, আজকাল চাকরীর চেয়ে বেশী কিছু করছি! অবন্ধনা মারা গেছে শুনেছিস তো? সেই যে নার্স একটি তেতালার ঘরে থাকত— সে কে জানিস? অবু—"

"জানি, সব শুনেছি। যে রাত্রে সে মারা যায়, সেই রাত্রেই আমি কোলকাতার বাইরে চলে যাই। তার মৃত্যুর একটু আগেই বোধহয় তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, না?"

"আমি? না, সেদিন ওর ঘরে আমি যাইনি তো। এসেই শুয়ে পড়েছিলাম।"

"কিন্তু সেদিন রাত এগারোটার পর আমি আমার ঘরের জানলায় দূরবীণটা নিয়ে বসেছিলাম। দেখলাম তুই অবন্ধনার ঘরে ঢুকছিস। স্পষ্ট দেখলাম।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শিখর সেনের মুখটা। তারপর সামলে নিয়ে বললে—"ভুল দেখেছিস। আমি সেদিন তেতালায় উঠিইনি—"

তারপর হেসে বললে, "পাগল না কি! রাত্রি এগারোটার পর ওর ঘরে আমি ঢুকতে যাব কেন!"

বলেই ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, মনে হল যেন নূতন আলোকপাত হল ওর মনে। তারপর হন্ হন্ করে চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইলে না আর।

এর দিন সাতেক পরে দেখা হল উমেশ-মামার সঙ্গে। উমেশ-মামাও পুলিশে চাকরী

করতেন। তিনি যা বললেন—তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। সেদিন যখন শিখর হন্ হন্ করে গেল, তখন আমি মনে করলাম আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে বেচারা, আর হয়তো জীবনে আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু উমেশ-মামা বললেন, ও নাকি নিজে গিয়ে ধরা দিয়েছে। নিজের পায়ের ছাপ আর আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের কাছে নিজেই পাঠিয়েছিল, সিমেন্টের ওপর আর গ্লাসের ওপর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে নাকি হুবহু মিলে গেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"শিখর আছে কোথায় এখন?"

"হাজতে, পুলিশের হেপাজতে। ও নিজেই ইচ্ছে করে নাকি জেলে গিয়ে ঢুকেছে। বলেছে, আমার মানসিক অবস্থা এমন যে, যে-কোনও মুহূর্তে আমি আবার খুন করতে পারি। আমাকে জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়।"

আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ হতে লাগল। একটা কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও নিজেই যদি অবন্ধনার জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে থাকে, তাহলেও অন্য লোকের পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ নিয়ে বেড়াচ্ছিল কেন? লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে? নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরীতে এ-সব লেখার কি দরকার ছিল তাহলে? লোকের চোখে ধুলো দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে কি সে নিজেই নিজের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ, পরীক্ষা করাতো? আমার যা মনে হচ্ছিল তা উমেশ-মামাকে বললাম।

উমেশ-মামা বললেন—"ও বলেছে, 'আমি যা করেছি তা ঘুমের ঘোরে করেছি। সজ্ঞানে করিনি।'

ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে ও আগেও নাকি উঠে যেত! ওটা একটা অসুখ, সম্‌নাম্‌বুলিজম্, নাকি একটা বিদঘুটে নাম ও অসুখের।"

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম।

মাস দুই পরে খবর পেলাম শিখরের ফাঁসী হয়ে গেছে। শিখর নিজের স্বপক্ষে কোনও উকিল নিযুক্ত করেনি। সে কেবল বলেছিল—"অবন্ধনার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। ওর অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্য আমি ওর মৃত্যুকামনা করেছিলাম। সজ্ঞানে ওকে মারবার সাহস বা ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই ঘুমের ঘোরে আমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।".....

চুপ করে বসে বসে ভাবছিলাম। শিখরের কথা নয়, আলেয়ার কথা। আলেয়ার মৃত্যুর জন্যও কি আমি দায়ী নই? বাগানবাড়ির পিছনে সেই প্রকাণ্ড ইঁদারাটা কি আমিই তাকে দেখিয়ে দিইনি? আমি কি তাকে বলিনি—'অপমানে জর্জরিতা হয়ে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক যুগের সীতাদের যদি পাতাল-প্রবেশ করতে হয়, তাহলে ইঁদারায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, জননী বসুন্ধরা তাকে নেবার জন্যে পাতাল থেকে সিংহাসন পাঠাবেন না"—বলেছিলাম অবশ্য রসিকতা করে। স্বপ্নেও ভাবিনি যে রসিকতা এমন মর্মান্তিক সত্য হয়ে উঠবে।...কল্পনা করছিলাম দূর আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে, বিক্রমবাবু পাইলট, আলেয়া যাত্রিণী, আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে.....

হঠাৎ দুয়ারের কড়া নড়ল। উঠে কপাট খুলে দিলাম। দেখলাম, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন।

"আপনার নাম কি কমলকিশোরবাবু?"

"হ্যাঁ, কেন।"

"আপনাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি। এই দেখুন ওয়ারেন্ট। মধুপুরে আপনি কি আলেয়া দেবীর সঙ্গে ছিলেন?"

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল কেবল।

গল্প লেখা শেষ করিয়া কবি বাতায়নের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কেমন যেন দুঃখ হইতেছিল। যে চরিত্রগুলি এতক্ষণ তাঁহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। নিজেই তিনি সব শেষ করিয়া দিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, দুইটি অপূর্ব প্রজাপতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্বেই তাহারা বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

।। আঠাশ ।।

মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি পর্বতের তত্ত্বাবধানে সামান্যতম ত্রুটি ঘটিবারও অবকাশ ছিল না। অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, প্রতি-প্রস্থাতা এবং মৈত্রী-বরুণ—এই ছয়জন ঋত্বিক অভিনিবেশ সহকারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আহবণীয় অগ্নি পূর্বদিকে যথারীতি পাশুক বেদি এবং পাশুক বেদির উপর উত্তর বেদি নির্মিত হইয়াছিল। অধ্বর্যু উত্তর বেদির নাভিতে নূতন আহবণীয় অগ্নি স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। পুরাতন আহবণীয় হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রক্ষিত হইয়াছিল, দুইজন মন্ত্রপাঠ করিয়া অরণি ঘর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পশু বন্ধনের জন্য অষ্ট-কোণ কাষ্ঠ-নির্মিত যূপ ইতিপূর্বেই প্রোথিত হইয়াছিল, যূপের মস্তকে চষাল নামক মুকুটটি শোভা পাইতেছিল, যূপকাষ্ঠকে ঘৃতলিপ্ত করিয়া যূপাঞ্জন কর্মও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। যে বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে মহর্ষি পর্বত মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সে কখনও নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিল, কখনও বা সরবে ক্রন্দন করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করিতেছিলেন না। সুন্দরানন্দের ধর্মপত্নী সর্বশুক্লা দেবী যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি না আসিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হইত। সুন্দরানন্দ ও সর্বশুক্লা যথাস্থানে বসিয়া ঋত্বিকগণের আদেশ পালন করিতেছিলেন। যজ্ঞের কর্ম যথাবিধি চলিতেছিল। বালকের রোদন, মন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি, উদার সামগান যজ্ঞমণ্ডপে এক অদ্ভুত বাঙ্ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘৃতাহুতির ধূমে যজ্ঞাগ্নির শিখায়, বিবিধ উপচারসম্ভারে ঋত্বিক গণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে যেন যুগপৎ আশা ও আশঙ্কা সূচিত হইতেছিল। একটা অসম্ভব কিছু এখনই বুঝি সম্ভব হইবে।

সর্বশুক্লা দেবী প্রথমে শুনিয়াছিলেন এই যজ্ঞে নর্তকী সুরঙ্গমাকে নাকি আহুতি দেওয়া হইবে। সংবাদটি তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রৌণীগ্রামে তাঁহার শিবিকা যখন প্রবেশ করিল, তখন কুলিশপাণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কুলিশপাণি

তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে তিনি শুনিলেন, মহর্ষি পর্বত সুরঙ্গমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করেন নাই। এক অসহায় শবর-বালককে সেজন্য না কি কিনিয়া আনা হয়েছে। কুলিশপাণির সহিত এ বিষয় তাঁহার কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। এ সংবাদে তাঁহার মনের ভিতরে কি হইতেছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না, তাঁহার মুখভাবেও কোনো পরিবর্তন কেহ লক্ষ্য করেন নাই। রাজকুলবধূর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীর পার্শ্বে যজ্ঞস্থলে তিনি শান্তমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সীমান্তের সিন্দুররাগ, তাঁহার ক্ষৌম বসনের দ্যুতি, তাঁহার অনবদ্য গম্ভীর সৌন্দর্য যজ্ঞস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

একাদশ দেবতার উদ্দেশে একাদশটি প্রযাজ দিতে হয়। প্রথম দশটি প্রযাজে আহুতির উপকরণ আজ্য অর্থাৎ ঘৃত। একাদশ প্রযাজে আহুতির উপকরণ নিহত পশুর বপা অর্থাৎ উদরের অভ্যন্তরস্থিত চর্বি। দশম দেবতা বনস্পতির উদ্দেশে হোতা যখন আপ্রী পাঠ করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাহিরে পশুবধের আয়োজন চলিতেছিল। শমিতা (পশুঘাতক) মশাল হস্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। এমন সময় অতিশয় দ্রুতবেগে, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে, কুলিশপাণি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন—"কুমার কোথায়—?"

"যজ্ঞস্থলে আছেন। বনস্পতির আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এইবার হোতা আমাকে এসে পশুবধে নিয়োগ করবেন। কুমারও সঙ্গে থাকবেন। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি— ?"

"অতিশয় শোকাবহ। কুমারের সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অধ্বর্যু, অগ্নীৎ, মহর্ষি পর্বত এবং কুমার যজ্ঞস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কুমার একটি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

"দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ—"

"নর্তকী সুরঙ্গমা মারা গেছে।"

"সুরঙ্গমা মারা গেছে? কি করে?"

কুলিশপাণি বলিলেন—"আপনারা যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন, আমি বনের উত্তর-পূর্ব কোণে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। খবর পেয়েছিলাম শবর-পল্লী থেকে কিছু শবর-যুবক এসে এই যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ঝোপের অন্তরালে কি যেন নড়ছে। আশঙ্কা হল হয়তো কেউ লুকিয়ে আছে। কাছে একটা গাছ ছিল। লক্ষ্য করবার সুবিধা হবে বলে সেই গাছে উঠলাম। উঠে দেখলাম—যা দেখলাম তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষত এ সময়ে—"

কুলিশপাণি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কুমার বলিলেন—"নষ্ট করবার মতো সময় হাতে নেই। যা বলতে চাও অবিলম্বে বলে ফেল।"

"দেখলাম সুরঙ্গমা চার্বাকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আর চার্বাক মাঝে মাঝে

তাকে চুম্বন করছে। চার্বাককে জীবিত বা মৃত ধরে আনবার আদেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আমার সঙ্গে খুব তীক্ষ্ণ একটা ছোরা ছিল। চার্বাককে লক্ষ্য করে সেটা নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু সেটা লাগল গিয়ে সুরঙ্গমার বুকে। সুরঙ্গমা আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। লাফিয়ে পড়বামাত্র চার্বাক ব্যাঘ্র-বিক্রমে এসে আমাকে আক্রমণ করলে। সুতরাং তাকেও হত্যা করতে হল।"

মহর্ষি পর্বত বলিলেন—"বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

সর্বশুক্রাও স্বামীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার অধরে ও নয়নে ক্ষণিকের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কুলিশপাণি আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কেবল সুন্দরানন্দের মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। তিনি প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

।। উনত্রিশ ।।

এক নির্জন ঊষর প্রান্তর প্রখর সূর্যালোকে দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন এক ক্ষুধার্ত দীপ্তি চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোনো শব্দ নাই, কোমলতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, দুঃসহ উজ্জ্বলতা ছাড়া আর কিছুই যেন নাই। আকাশে বাতাসে সেই নির্মম স্বর্ণ-দীপ্তির সমুজ্জ্বল প্রদাহ যেন নিঃশব্দ জ্বালা রূপে জ্বলিতেছিল।

ধীরে ধীরে আকাশ হইতে যুগল দেবতা অবতীর্ণ হইলেন। একজন রূপবান পুরুষ, আর একজন রূপবতী নারী। মনে হইল মণি আর কাঞ্চন যেন মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ কেহই কোনো কথা বলিলেন না। কিন্তু একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। তাঁহাদের চরণস্পর্শে সেই ঊষর প্রান্তর ধীরে ধীরে শ্যামল হইয়া উঠিল।

পুরুষটি তখন বলিলেন—"বাণী, ঊষর প্রান্তরের মৃত্যু হল, জাগল শ্যামলতা, জন্ম নিল নূতন লোক। এই ঊষরতার তৃষিত মর্মলোকে বসে তুমি এতদিন যে আবির্ভাব কামনা করেছিলে তাই হয়তো মূর্ত হল। হল কি?"

বাণীর নয়নের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। মণি হইতে যেন আলোক বিচ্ছুরিত হইল।

"হল না।"

"জানি হল না। কোনো দিন হবেও না বোধহয়। তাই এই শ্যামল প্রান্তরকে মরতে হবে আবার, জন্ম নিতে হবে আবার নূতন লোকে।"

"যাদের নিয়ে আমরা এতক্ষণ ছিলাম তাদের কি হল?"

"ওরাও নব-জন্মলাভ করতে চলেছে নূতন লোকে, নূতন পথে। ওই দেখ—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"সূর্যটাকে নিবিয়ে দিই তাহলে খানিকক্ষণের জন্য।"

পিতামহ একমুষ্টি ধূলি তুলিয়া লইয়া সূর্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল।

পিতামহ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওই দেখ, ওরা সব

চলেছে ছায়াপথ ধরে। ওই নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল একক নক্ষত্রটি চার্বাক, আর তাকে ঘিরে আছে যে নীহারিকা-পুঞ্জ তা হচ্ছে ওর স্বপ্ন, ওর কৌতূহল, ওর নাস্তিকতা, ওর অবচেতন মানসের কামনারাশি। বাঁদিকে যে নক্ষত্রগুচ্ছটি দেখতে পাচ্ছ, ওরা কে জান? মেঘমালতী, বর্ণমালিনী, সুরঙ্গমা, ধারামতী, নীলোৎপলা, তানে, অবন্ধনা আর আলেয়া। ওরা পরস্পর কেউ কাউকে চেনে না, একজনের কাছ থেকে আর একজনের দূরত্ব বহুকোটি যোজন, কিন্তু ওদের লক্ষ্য এক, তাই ওরা একগুচ্ছে ধরা পড়েছে। ওই দেখ সপ্তর্ষির নীচে কদ্রু, বিনতা আর গরুড়কে। কদ্রুর সর্প-সন্তানরাও নব-রূপ ধরেছে ওই দেখ। ওদের ডান দিকে একটু নীচেই শুরু হয়েছে নূতন আকাশ-গঙ্গা, তার তরঙ্গে ভেসে চলেছে সুন্দরানন্দ, কুলিশপাণি, কালকূট, কমল-কিশোর, শিখর সেন আর বিক্রম। আর একটু দূরে ওই দেখ নিরুপম, মহাশকুন্ত আর গুণপতি। ওরা গঙ্গার স্রোতে ভাসেনি, ভাসতে পারেনি, তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে শুধু। আর একটু দূরে ওই ছোট নক্ষত্রটিকে চিনতে পারছ? শিখরের মামা কয়াধুনাথ। তার পাশে দপ দপ করে জ্বলছে আগামী যুগের কবি। সব আছে, কেউ হারায়নি, কেউ হারায় না। ওদের নূতন-নাটকের নূতন দৃশ্য আবার রচনা করতে হবে আমাদের। চল—"

সহসা তাঁহারা দুইটি অপরূপ বিহঙ্গমে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশের দিকে পক্ষ-বিস্তার করিলেন। তাঁহাদের মিলিত-কণ্ঠে আনন্দিত কাকলী ধ্বনিত হইল। সে কাকলী যেন বলিতে লাগিল—শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।.......

পক্ষীমিথুন

প্রথম পক্ষীর কথা

গল্পের প্লটের জন্য কল্পনার মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে বসিয়াছিলাম। চোখে পড়িল রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে একটি লোম-ওঠা কুকুরও আমার গেটের সামনে ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছে। দুর্গন্ধ 'ডাস্টবিন্', কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সন্দেহ হইল কুকুরটাও লেখক নাকি, কিন্তু আমার গেটের সামনে ও ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছে কেন। আমার বাড়ি তো কল্পনা-মন্দির নহে। কল্পনা দেবী বাস করেন অলক্ষ্যালোকে, আমার এই বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁহার কৃপা-কণা বর্ষিত হয় তাহা সত্য, কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না। কল্পনা দেবী কোথায় থাকেন তাহা আমিও জানি না...হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, কুকুরটা ওখানে কেন মাটি কামড়াইয়া অহোরাত্র পড়িয়া আছে। তাহার আরাধ্য কল্পনা দেবী নহে, তাহার লক্ষ্য শ্রীমতী জিমি, আমার শৌখিন টেরিয়র কুকুরীটা। জিনি বারান্দার উপর শিকলে বাঁধা থাকে, তাহাকে বাজে কুকুরের সহিত মিশিতে দিই না। সহসা মনে হইল আমার কুকুরের জন্য এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি কিন্তু ছেলের জন্য তো করি নাই। সে তো স্বচ্ছন্দে একটা চামারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার যুবতী কনিষ্ঠা কন্যাটিও যেরূপ সাজিয়া গুজিয়া, শাড়ির রংয়ের সহিত স্যান্ডাল ও দুলের রং মিলাইয়া জলসায় জলসায় পার্টিতে পার্টিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেও যে একদিন কি করিয়া বসিবে কে জানে। আমি আমার কুকুরের সম্বন্ধে এত সচেতন অথচ—। না, আমাকে দোষ দিবেন না। আমি ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধেও সচেতন, কিন্তু আমি নিরুপায়। কুকুরকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পারি না।

এই ধরনের এলোমেলো চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম এমন সময় যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর। কল্পনা দেবীর কৃপাতেই সম্ভবত দিব্যকর্ণ লাভ করিলাম। শুনিলাম সেই লোম-ওঠা ধূলিশায়ী খেঁকি কুকুরটা চমৎকার বাংলা ভাষায় কথা বলিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া আরও অবাক হইয়া গেলাম যখন বুঝিলাম কথাগুলি সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, দেখিলাম সে আমার মনের কথাও কোনও নিগূঢ় উপায়ে টের পাইয়াছে। সত্যই বড় আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

লোম-ওঠা কুকুর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ভদ্রপুঙ্গব, তোমার মনের কথা আমি টের পেয়েছি। টের পেয়ে কৌতুক অনুভব করছি। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ আমি শ্রীমতী জিমির প্রণয়াসক্ত। জিমি শুধু কুক্কুরী নয়, কুক্কুরীশ্রেষ্ঠা। তাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি ভাবছ এ লোম-ওঠা কুকুরটার আস্পর্ধা তো কম নয়, এই নীচবংশীয় বামনটার জিমি-রূপ চন্দ্রকে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা কেন! তোমার মতিভ্রম দেখে সত্যিই বড় কৌতুক অনুভব করছি। তুমি তোমার বড় মেয়ের বেলায় কি করেছিলে তা কি ভুলে গেছ? ওই গবেট মেয়েকে বি. এ. পাস করাবার জন্যে তুমি না করেছ কি। পরীক্ষকদের ঘুষ পর্যন্ত দিয়েছ। বিয়ের বাজারে যেখানে লাখ টাকা কোটি-টাকার ছাপ-দেওয়া হাঙ্গর কুমীররা ঘুরে বেড়ায়

সেখানে ডিগ্রীটা বড় টোপ। যথাসর্বস্ব বাঁধা রেখে পণও তুমি যোগাড় করেছিলে। তারপর চাই রূপ আর বংশ। বিউটি পারলার আর প্রসাধনের কল্যাণে তোমার মেয়ের শ্যামবর্ণটা ঢাকা পড়েছিল আর তোমার মিথ্যাভাষণের জোরে চাপা পড়েছিল তোমার বংশ-পরিচয়টা। তোমার বংশে যে দু'জন পাগল, দু'জন হাঁপানি-গ্রস্ত আর একজন যক্ষ্মারোগী ছিল এ খবর তুমি চেপে গিয়েছিলে। যে বংশে যে ছেলের সঙ্গে তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ তাকে যদি চন্দ্র বলা যায়, তাহলে তুমি বামনের চেয়েও ছোট। তুমি যখন বামন হয়ে চাঁদে হাত দিয়ে পেরেছ তখন আমিই বা পারব না কেন। বর্তমান যুগে এই-ই তো নিয়ম, সবাই বামন কিন্তু সবাই চন্দ্র-লোলুপ। শুধু আমাকে দোষ দিও না।"

কুকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। দেখিলাম কুকুর শুধু ভালো বক্তা নয়, ভালো জ্যোতিষীও। তা না হইলে আমার এত কথা সে জানিল কি করিয়া। দেখিলাম কুকুরের মুখে যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি বিচ্ছুরিত হইতেছে। মনে হইল কল্পনা দেবীও সম্ভবত আমার আরাধনায় তুষ্ট হইয়াছেন। এই কুকুরই বুঝি আজ মূর্তিমান প্লটরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

কুকুর আবার কথা কহিল।

"আমাকে তুমি যত নীচ বংশের মনে করছ আমি কিন্তু তা নই। আশা করি তুমি মূর্খ নও। ঋগ্বেদ পড়েছ কি? মহাভারত? বহ্নিপুরাণ? ওগুলি পড়া থাকলে তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আমি মহৎ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি। দেবকুক্কুরী দেবশুনি সরমা আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তিনি সামান্য কুক্কুরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষকন্যা এবং কশ্যপ-পত্নী। ইন্দ্র এঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। অসুরেরা যখন বৃহস্পতির গাভী চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল তখন এই সরমাকেই ইন্দ্র প্রেরণ করেছিলেন সে গাভী উদ্ধার করবার জন্য। আমাদের এই মহৎ উত্তরাধিকার এখনও আমরা সগর্বে বহন করছি। এখনও তোমরা, তথাকথিত সভ্য মানবরা আমাদের সাহায্যেই চোর ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা কর, আমাদের সাহায্যেই পলাতক চোর ডাকাত বা খুনীকে গ্রেপ্তার কর। তোমাদের তথাকথিত সভ্য বললাম তার কারণ তোমরা প্রকৃত সভ্য নও, সভ্যতার একটা মুখোশ পরে আছ মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের আদর্শ অভ্রান্ত ভাবে অনুসরণ করি, সে আদর্শ আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তোমাদের হয়েছে কি? শুনি তোমরা কেউ ভরদ্বাজ, কেউ বশিষ্ঠ, কেউ কশ্যপ, কেউবা আর কোন মহাতপা ঋষির বংশধর, তোমরা তাঁদের আদর্শ অনুসরণ কর কি? আমি জানি কর না। তুমি কোনো ঋষিবংশের কুলতিলক তা আমার জানা নেই, কিন্তু তোমাকে দেখে কোনো ঋষিবংশধর বলে মনে হয় না। মনে হয় তোমার পূর্বপুরুষ কোনো চোর ছ্যাঁচড় বা দাগাবাজ ছিলেন, তোমার মুখে কোনও দেব বা ঋষি-ভাব নেই, কোনও উচ্চভাবও নেই। তুমি লেখক কেন হয়েছ তা-ও আমি বুঝতে পারছি না। কি লিখবে তুমি? নিজের স্বার্থ আর কামের কাহিনী? সেইটিকে রাজনীতি আর প্রেম-কথা বলে চালাবে? এ ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা তোমার আছে বলে তো মনে হয় না। তোমাকে এসব কটু কথা বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমাকে দেখে তোমার চোখের দৃষ্টিতে যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে তা আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না। আমাকে ঘৃণা কোরো না। আমার জীবনকাহিনী যদি মন দিয়ে শোন তাহলে তোমার লেখার কিছু উপাদান হয়তো তুমি পাবে এবং একথাও তোমার হয়তো মনে হবে যে আমি তোমার জিমির অযোগ্য প্রণয়ী নই—"

বেচারা কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। একটা বলিষ্ঠ কুকুর আসিয়া তাড়া করিতেই ল্যাজ গুটাইয়া পলায়ন করিল। বলিষ্ঠ কুকুরটা পাড়ারই কুকুর। খাঁটি দেশী কুকুর। কান খাড়া, কালো রং, চোখের উপর বৃত্তাকার দুইটি হলদে দাগ, জিলাপির মতো পাকানো ল্যাজ। কাহারও কথা শোনে না, কাহারও বাধ্য নয়। যথেচ্ছাচারী খাঁটি দেশী প্রাণী। এ-বাড়ি ও ও-বাড়ি খাইয়া বেড়ায়, কিন্তু কাহারও বাড়ির সে নয়। সে সকলের, অথচ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে না। তু করিয়া ডাকিলে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়ে, বুঝিবার চেষ্টা করে এ ডাকা সার্থক না নিরর্থক। যদি খাবার দাও গপ্ করিয়া আসিয়া খাইয়া যাইবে। বাস্, সম্পর্ক ওইখানেই চুকিয়া গেল। এই পাড়ারই আরও কয়েকটা কুকুর জুটাইয়া একটা দলও পাকাইয়াছে সে। সম্ভবত দলটার ওই দলপতি। দলের প্রধান কাজ পরস্পরের সহিত ঝগড়া করা আর অন্য পাড়ার কোনও কুকুর এ পাড়ায় আসিলে তাহাকে তাড়া করিয়া যাওয়া। অন্য পাড়ার কুকুরের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা উহাদের উত্তরাধিকার। সব কুকুরই ইহা করে। আমাদের প্রাদেশিক আইনগুলিও বোধ হয় এই কুকুর-নীতিরই অনুকরণ। ওই লোম-ওঠা কুকুরটা এ পাড়ার প্রাণী নহে, তাই তাহাকে তাড়া খাইয়া সরিয়া পড়িতে হইল। আর একটা কারণও ছিল, সেইটাই বোধ হয় প্রধান কারণ। ওই বলিষ্ঠ কুকুরটাও আমার 'জিমি'র প্রণয়ী। শুধু ও কেন, এ পাড়ার সব পুং-কুকুরই জিমির দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করে। তাহারা আগন্তুক লোম-ওঠা কুকুরকে বরদাস্ত করিবে কেন? মানুষের আইন-অনুসারেই ও ট্রেসপাসার। সুতরাং ও যে গেটের বাহিরে দূর হইতে প্রিয়া-মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে এ সুযোগটুকুও বেচারাকে উহারা দিবে না। কিন্তু ওই লোম-ওঠা কুকুরটাকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। যদিও ও আমাকে গালাগালি দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে, তবু উহার কথাবার্তা খুব ভালো লাগিয়াছিল আমার। মনে হইয়াছিল ও যেন কল্পনা দেবীরই কোনও দূত। কুকুর নয়, রূপক। কতগুলো বাজে কুকুরের তাড়ায় ও পাড়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার যখন উহাকে ভালো লাগিয়াছে তখন উহাকে আমার গেটের নিকট হইতে কে তাড়াইবে? কখনই তাহা হইতে দিব না। দেখিলাম বলিষ্ঠ কুকুরটা গেটের সম্মুখে বসিয়া জিমির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

আমার চাকর ভিখনকে ডাকিলাম।

"এই কুকুরটাকে এখান থেকে মেরে তাড়িয়ে দে। অন্য কোনো বাজে কুকুরকেও এখানে আসতে দিস না। সেই লোম-ওঠা কুকুরটা যদি আসে তাকে কেবল কিছু বলিস না। ও বেচারা যদি গেটের সামনে বসতে চায় বসতে দিস। খেতেও দিস কিছু।"

ভিখন একবার তির্যক্ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। বুঝিলাম আমার আদেশের মর্ম সে ঠিক গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি স-লোম বলিষ্ঠ কুকুরটাকে দূর করিয়া দিয়া একটা লোম-ওঠা খেঁকি কুকুরকে কেন সমাদর করিতেছি তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। কিন্তু সে ইহার প্রতিবাদও করিল না। ভোজপুর-নিবাসী বলিষ্ঠ ভিখন কথাবার্তা ক্বচিৎ বলে। প্রভুর আদেশ পালন করাই তাহার অভ্যস্ত স্বধর্ম। সে নিজের তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিটি বাহির করিয়া আস্ফালন করিতেই বলিষ্ঠ কুকুরটা সরিয়া পড়িল।

ভিখন গেট খুলিয়া বাহিরে গিয়াও দেখিল কাছে-পিঠে আর কোনও কুকুর আছে কি না। সম্ভবত ছিল, কারণ সে একটা ঢিল কুড়াইয়া দূরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। লোমওঠা কুকুরটাও আর আসিল না। ইতিমধ্যে আমার জীবনকাহিনীটা শুনুন। আমার জীবনকাহিনীতে বৈশিষ্ট্য বা

বিশেষত্ব কিছুই নাই। আমিও প্রথম জীবনে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ছিলাম ও আপনাদের জীবন যেমন, আমার জীবনও তেমনি থোড়-বড়ি-খাড়ার সমন্বয় মাত্র ছিল। হয়তো কখনও থোড়ের বদলে মোচা বা কচু জুটিত, খাড়ার বদলে কখনওবা পুঁইশাক বা কাঁচকলা আবির্ভূত হইত, ব্যাপারটা কিন্তু মোটামুটি একই প্রকার ছিল। আমিও আপনাদের মতো প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলাম। যদিও পিতামাতার নির্দেশে, তাঁহাদেরই নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেন জানি না, বিবাহের পর হইতেই পিতামাতার স্নেহ-তরঙ্গিণীতে ভাটার টান দেখা দিল। নানা ছুতায় আমার মা আমার স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই তিরস্কার-কলহকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে একটা তিক্ত আবহাওয়া প্রায়ই ঘনাইয়া উঠিত। ক্রমশ আর একটা জিনিসও বোঝা গেল। আমার ভাই নিজের দোষেই আজ বিপন্ন। ছাত্রজীবনে ভালো করিয়া পড়াশোনা করে নাই। মনুষ্যত্ব মর্যাদা বিসর্জন দিয়া অনেকের খোশামোদ করিয়া তাহার একটি চাকরিও জুটাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা রাখিতে পারে নাই। চুরি এবং মিথ্যাভাষণের অপরাধে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমি জানিতাম কর্তৃপক্ষ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, আমার বাবা মাও সেকথা জানিতেন। আমার ছোট ভাইটি সত্যই চোর এবং মিথ্যাবাদী, আমার ঘড়িটি সে-ই চুরি করিয়াছিল ইহার প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু বাবা মার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সেকথা বলিতে পারি নাই। আমার বাবার আংটিও কিছুদিন পরে চুরি গেল। বাবা মা দুজনেই আমাদের পুরাতন ভৃত্য গণেশকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। আমি জানি গণেশ নিরীহ। অনেক ভদ্রলোকের অপেক্ষা তাহার চরিত্র বেশী ভদ্রতাপূর্ণ। ওই আংটিও আমার ভাই চুরি করিয়াছিল। কিন্তু সেকথাও প্রকাশ্যে বলা গেল না। চোর অপবাদ লইয়া ভদ্র গণেশকে বিদায় লইতে হইল। বাবা মা আমার ভাইয়েরও বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বধূকে নির্বাচন করিয়াছিলেন সে ছিল অশিক্ষিতা। শুধু নিরক্ষর নয়—অনেক নিরক্ষরা নারীর স্বভাব ভদ্রতার এবং মনুষ্যত্বের মাধুর্যে পরিপূর্ণ থাকে তাহা জানি—উহার স্বভাব কিন্তু অত্যন্ত অমার্জিত ছিল। কদর্য ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে অভব্য কথাবার্তা বলিত, ভদ্রতাজ্ঞান মোটে ছিল না। আমার স্ত্রীকে একটা ভালো গহনা বা শাড়ি পরিতে দেখিলে হিংসায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। আমার স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ভালো গহনা বা শাড়ি কিনিয়া দিবার সাহস আমার ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। যখন সামর্থ্যে কখন-সখনও কুলাইত, তখন বেনামীতে আমার স্ত্রীকে কিছু কিনিয়া দিতাম। বলিতাম, আমার অমুক বন্ধু আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমি আমার স্বোপার্জিত অর্থে আমার স্ত্রীকে কিছু কিনিয়া দিয়াছি একথা জানিতে পারিলে আমার বাবা মা দুইজনেরই মুখ ভার হইয়া যাইত। আমার শ্বশুর বড়লোক ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীকে দামী শাড়ি পাঠাইতেন। আমার বাবা একবার বলিলেন, 'বাড়িতে আর একটা বউ রয়েছে, তোমার শ্বশুরের উচিত ছিল তার জন্যও ওই রকম একখানা শাড়ি পাঠানো। তিনি যখন পাঠাননি, তুমিই কিনে দাও।' আমার হাতে তখন পয়সা ছিল না, কিনিয়া দিতে পারি নাই। ইহাতে বাবা মা দুইজনেই অসন্তুষ্ট হইলেন। মা এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন, 'ও শাড়িটা ছোট বউই পরুক, বড় বউয়ের তো অনেক শাড়ি আছে।' আমার স্ত্রী শাড়িখানা ছোট বউকে দিয়া দিল। মায়ের কথা মানিতেই হইল। পরে শুনিয়াছিলাম ছোট বউ নিজের বন্ধুবান্ধব মহলে সেই শাড়িখানা দেখাইয়াই নাকি বলিয়াছিল যে তাহার বাবা নাকি শাড়িটা তাহাকে পাঠাইয়াছে। আমার ভাইয়ের আর চাকরি জোটে নাই। শুনিলাম সে 'বিজনেস' করিতেছে। একদিন বাবার

হাতে নগদ একশত টাকা আনিয়া দিল। তাহার সংসারের বোঝা টানিয়া আমাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, সে টাকাটা কিন্তু আমার কোনো সাহায্যে আসিল না। বাবা মা তাহা দিয়া গরদ তসর প্রভৃতি কিনিলেন এবং বড়গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নাদু খুব বুদ্ধিমান ছেলে। ও যেরকম সদ্বিবেচক এবং চৌকশ, দেখতে দেখতে ও জীবনে উন্নতি করে ফেলবে।' উন্নতি করিতেও লাগিল। তাহার চকচকে স্যুট বুট, তাহার দশ-আনা ছ'-আনা চুলের ছাঁট, মুখের লম্বা চওড়া কথা শুনিলে সত্যই মনে হইত সে যেন অনেক টাকা রোজগার করিতেছে। মুখে লাখ দু'লাখ ছাড়া কথাই ছিল না। ফ্রেন্ড হিসাবে যাহাদের নাম উল্লেখ করিত তাহারা সকলেই ধনী লোক। নাদু একদিন বাবাকে বলিল, 'তোমরা যেরকম ন্যাস্টি (nasty) বাড়িতে আছ আমার বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনতে লজ্জা হয়। দাদার উচিত একটা ডিসেন্ট (decent) বাড়ি ভাড়া করা। আমি তখন স্কুল মাস্টারি এবং অবসর সময়ে সাহিত্য-চর্চা করিয়া যাহা উপার্জন করিতাম তাহাতে ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইত না। আমি তখন যে বাসায় থাকিতাম তাহার মাসিক ভাড়া ছিল ত্রিশ টাকা। খান তিনেক ঘর, একটা ফালি বারান্দা, রান্নাঘব আর ভাঁড়ার ঘর। ভাগ্যে বাড়ির সামনে ছোট একটি মাঠের মতো ছিল। মাঠে কদমগাছও ছিল একটি। সকালে সেখানে ছায়া থাকিত। আমি খুব ভোরে উঠিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া লেখাপড়া করিতাম। বাড়ির ভিতর বসিবার উপায় ছিল না। আমার মা, আমার স্ত্রী এবং নাদুর স্ত্রী, এই তিনজনের মধ্যে উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদ এত উচ্চগ্রামে উঠিত যে কাছে-পিঠে কাক চিল বসিতে পারিত না। এই শান্তির নীড়ে উভয়েরই শিশুসন্তানেরাও ক্রমশ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাদের ঐকতানে কণ্ঠ মিলাইল। আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপায় ছিল না। একদিন শুনিলাম আমার ভাই নাকি গভীর রাত্রে মদ খাইয়া বাড়িতে ফেরে। বাবাকে সে কথা বলিলাম। মা-ও কাছে বসিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহারা কথাটা জানেন। বাবা বলিলেন, 'ওকে আজকাল নানারকম পার্টিতে যেতে হয় তো। সেখানে মদ খাওয়াই রেওয়াজ। নাদু ভালো ছেলে বলেই যতটা পারে সামলে থাকে। ও কিছু নয়। ও কিছু নয়। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো রোজগার করছে, ও ঠিক উন্নতি করবে।' নাদু যে ভালো রোজগার করিতেছে এ খবর প্রায়ই শুনিতাম। কিন্তু আমি নিজে তাহার কোনো প্রমাণ কোনদিন পাই নাই। তাহার পরিবারের সমস্ত খরচ আমিই বহন করিতাম, আমাকে কিন্তু সে একদিনও একটি পয়সা দেয় নাই। আমার আর এক আতঙ্কের কারণ ছিল আমার বোনেরা। আমার চারটি বোন, চারটিরই বিবাহ বাবা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহপরবর্তী ঝামেলাগুলি আমাকে পোহাইতে হইত। অন্য সময়ে তাহারা আমার কোনো খবর লইত না। আমাকে তাহাদের মনে পড়িত তত্ত্বের সময়। পূজার এবং জামাইষষ্ঠীর পূর্বে তাহারা চিঠি লিখিত। তাহাতে প্রায় প্রতিবারই উল্লেখ থাকিত তত্ত্ব যেন ভালো করিয়া করা হয়, তা না করিলে শ্বশুরবাড়িতে তাহাদের মানরক্ষা হইবে না। প্রতিবারই কর্জ করিয়া তাহাদের মানরক্ষা করিবার জন্য আমাকে টাকা পাঠাইতে হইত। আমাদের বাঙালী সমাজে আরও সব অদ্ভুত নিয়ম আছে। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে কেহ মরিলে তাহাদের ঘাটে উঠিবার জন্য কাপড় বাপের বাড়ি হইতে আসিবে। অনেকবার ঘাটে উঠিবার জন্য কাপড়ের মূল্য পাঠাইয়াছি। মূল্য তাহাদের মনোমত না হওয়ায় রূঢ় ভাষায় চিঠি লিখিয়া অনেক সমালোচনাও তাহারা করিয়াছে। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-পথে যে অসংখ্য নিষ্ঠুর কুশাঙ্কুর প্রত্যহ সকলের পদকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিতেছে, আমাকেও তাহারা রেহাই দেয়

নাই। আমি মাত্র দুই-একটা উদাহরণই দিলাম, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। উদাহরণের ফর্দ দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন অধিকাংশ চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্র মধ্যবিত্ত-সন্তানের মতো আমিও রক্তাক্ত চরণের নিদারুণ ব্যথা গোপন রাখিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছি। আমি অন্যায়কে অন্যায় বলিতে পারি নাই, অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস আমার ছিল না। ছিল না, কারণ যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব তাহারা আমার নিতান্ত আপন লোক। তাহাদের সহিত প্রকাশ্যে কলহ করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের পতাকাও আস্ফালন করিবার সাহস ছিল না আমার। যাহাদের আমরা ছোটলোক বলি তাহাদের আছে। তাহারা খোলা রাস্তায় দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে কোলাহল করিয়া ঝগড়া করে। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধেই গলাবাজি করিয়া প্রতিবাদ জানাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর হয়তো কর্কশ, বলিবার ভঙ্গীও হয়তো মনোরম নয়, কিন্তু তাহাদের বক্তব্যে অসার কিছু নাই। আমি কিন্তু ভদ্রলোক, বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ খুলিতে পারি নাই। সহ্য করিয়াছি। সহ্যের সীমা বারবার অতিক্রান্ত হইয়াছে, তবু সহ্য করিয়াছি। প্রথম জীবনটা বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। স্কুল মাস্টার, অতি সামান্য বেতন পাইতাম। লিখিয়াও তখন কোনো টাকা পাওয়া যাইত না। লেখা ছাপা হইলেই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতাম। বাবা মাঝে মাঝে বলিতেন, 'ওসব বাজে লেখা না লিখে প্রাইভেট টিউশনি কর। তা করলে দুটো পয়সার মুখ দেখবে।' কিন্তু উপদেশ দিয়া নেশা ছাড়ানো যায় না। সাহিত্য-চর্চা করা আমার নেশা। উহাই আমার জীবনের একমাত্র আকাশ যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে ডানা মেলতে পারি।

আমি গভর্নমেন্টের চাকরি করিতাম। কিছুদিন পরে ভগবান আমার উপরে দয়া করিলেন। আমি চাকরিতে কিছু উন্নতি লাভ করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়া গেলাম।

বাবাকে বলিলাম, "নাদু যখন এখানে বিজনেস করছে তখন ও এই বাসাতেই থাক, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ফ্রি কোয়ার্টার্স পেয়েছি।"

"এখানকার সংসার খরচ কে চালাবে?"

"নাদু যখন রোজগার করছে নাদুই চালাক।"

"আর আমরা?"

"তোমরা যা খুশি করতে পার। এখানে থাকতে চাও এখানেই থাক, কিংবা আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চল আমার সঙ্গে।"

আমি যেখানে বদলি হইয়াছিলাম সেখান হইতে গঙ্গা বহুদূর। তিন দিনের পথ।

মা বলিলেন, "আমি গঙ্গাহীন দেশে যাব না।"

আমার বাসাটি গঙ্গার ধারে ছিল। মা সেটি ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। আমি একাই একদিন সপরিবারে আমার নূতন কর্মস্থলে যাত্রা করিলাম। জীবনে সেই প্রথম নিজের পরিবার (অর্থাৎ আমার স্ত্রী এবং পাঁচটি সন্তান) লইয়া দূর বিদেশে আমার আলাদা সংসার শুরু হইল। ভাবিয়াছিলাম সুখী হইব। কিন্তু সুখী হই নাই। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তো ছিলই, তাহাই আসল কারণ।

আমি আসিতে না আসিতেই বাবার একটি পত্রও আমার পিছু পিছু আসিয়া হাজির হইল। তাহাতে যদিও স্পষ্টভাবে তিনি তেমন কিছু লেখেন নাই কিন্তু তাঁহার চিঠির ভাবে বুঝিলাম মাসে মাসে তাঁহার এবং মায়ের হাত-খরচের জন্য আমি যদি কিছু কিছু পাঠাই তাহা হইলে

তিনি সুখী হইবেন। পিতামাতাকে সুখী করা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্তব্য। আমি প্রত্যেক মাসে তাঁহাদের কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতাম। তাঁহারা আমার দিকটা দেখেন না কেন এ-ভাবিয়া মাঝে মাঝে দুঃখ হইত, কারণ আমার বোনেদের তত্ত্ব প্রভৃতির ভারও আমাকে তাঁহাদের নির্দেশে বহন করিতে হইত। বাবা লিখিয়াছিলেন নাদু যাহা রোজগার করে তাহাতে সংসারই নাকি ভালোভাবে চলে না। সে খুব সদ্বিবেচক এবং দূরদর্শী বলিয়া রোজগারের অধিকাংশ টাকাই নাকি ব্যবসায়েতেই নিয়োগ করিয়াছে। অনেক পরে অবশ্য জানিয়াছি ''ফপরদালালি' করাই তাহার প্রধান 'বিজ্‌নেস্' ছিল। একটা ধনী মাড়োয়ারি কন্ট্রাক্টারের মোসায়েব হইয়াছিল সে। সেই তাঁহাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা বখশিস হিসাবে দিত, সেই তাহার রোজগার। শেষে সে কোথায় একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহার বউটার তখনও কিছু রূপ-যৌবন ছিল, সেও একদিন তাহার ছেলে-মেয়েদের ফেলিয়া এক মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। এ আঘাত মায়ের বুকে সহিল না, অল্পদিন পরেই তিনি মা-গঙ্গার শীতল জলে তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইলেন। বাবা সব ছাড়িয়া কাশী চলিয়া গেলেন। শেষ জীবনে তিনি প্রায় নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছে ছোট একটা ঘর ভাড়া লইয়া থাকিতেন। নানা মন্দিরের প্রসাদই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। আমার নিকট তিনি আর টাকা চাহেন নাই। তবু আমি তাঁহাকে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মনিঅর্ডার ফেরত আসিল। কয়েকদিন পরে বাবার একটি চিঠিও পাইলাম। লিখিয়াছেন, 'আমার আর টাকার প্রয়োজন নাই। আমি যে পেন্সন পাই তাহাতেই আমার কুলাইয়া যাইবে। তোমার বোনদেরও আর তত্ত্বের জন্য প্রতিবছর টাকা পাঠাইতে হইবে না। আমি তাহাদের লিখিয়া দিয়াছি যে আমি অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি আর তোমাদের টাকা পাঠাইতে পারিব না। যতদিন তোমার মা বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পাঠাইয়াছি, না পাঠাইলে তিনি মনে কষ্ট পাইতেন। তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করিতেছি, যদি পার সুশীলাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাইও। সে সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। শ্বশুরের অবস্থা ভালো নয়, রোজগেরে স্বামী মরিয়া গেল। বৈধব্য-যন্ত্রণার উপর দারিদ্র্য-যন্ত্রণা তাহাকে পিষিয়া ফেলিতেছে। বাবা, তাহাকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিও। বিশ্বেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।' বাবার আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিয়াছি। বাবাকে বার বার আমার কাছে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আর আসেন নাই। কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কী শোচনীয় সে মৃত্যু! কখন কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কেহ জানিতে পারে নাই। আমরা সভ্য মানুষ, সমাজ গড়িয়া বাস করি বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর খবর লওয়া প্রয়োজন মনে করি না। আমার বাবার মৃতদেহ ঘরে তিন দিন পড়িয়াছিল। যখন পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল তখন তাঁহার প্রতিবেশীর টনক নড়িল। তিনি বাবার ঘরের কপাট ভাঙিয়া শবদেহ আবিষ্কার করিয়া কি করিলেন জানেন? সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন না, নিজের গা বাঁচাইবার জন্য পুলিশে খবর দিলেন। আইনত হয়তো তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী আইন ছাড়া অন্য আইন কি তাঁহার জানা ছিল না? আমার ঠিকানালেখা চিঠি বাবার ঘরে ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে কি আমাকে টেলিগ্রাম করিতে পারিতেন না? তিনি শিক্ষিত বাঙালী ব্রাহ্মণ, এই সামান্য সৌজন্যটুকু কি তাঁহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না? কিন্তু না, সে সৌজন্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। পাছে বিপদে পড়েন এই ভয়ে কেবল পুলিশে খবর দিয়াছিলেন। পুলিশও কর্তব্যে ত্রুটি করে নাই। বাবার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া অবশেষে ডোমের হাতেই তাহারা সেটাকে সমর্পণ করিয়া

আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। আমি বার বার বাবাকে চিঠি লিখিয়া এবং অবশেষে টেলিগ্রাম করিয়া যখন কোন জবাব পাইলাম না তখন নিজে গেলাম। গেলাম তাঁহার মৃত্যুর এক মাস পরে। সেখানে গিয়া নিদারুণ সংবাদটা শুনিলাম। তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি কিন্তু একটি সৎকার্য করিয়াছিলেন। তিনি বাবার ট্রাঙ্কটি নিজের ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবা ট্রাঙ্কে কখনও চাবি দিতেন না। আমিও গিয়া খোলা ট্রাঙ্কই পাইলাম। ট্রাঙ্কে একটিও জামা-কাপড় ছিল না। কিছু পুরানো চিঠিপত্র ছিল আর ছিল মায়ের একখানা বিবর্ণ ফোটো। মায়ের বধূবেশ। মায়ের এ ফোটো আগে কখনও দেখি নাই। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম—একটি কমবয়সী মেয়ে হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছে, অঙ্গে বধূবেশ, চক্ষে অনন্ত আশা। এই সুন্দরী বালিকা যে আমার মা তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু বাবা ফোটোর পিছনে মায়ের নাম এবং ফোটো লইবার তারিখটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আরও লিখিয়াছিলেন, 'বিবাহের ঠিক পরদিন এ ফোটো তোলা হইয়াছিল।' এ ফোটো আমরা কখনও দেখি নাই। মায়ের কোনো ফোটোই আমাদের বাড়িতে ছিল না। সেকালে ফোটো তোলানো একটা লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। সন্দেহ হইল বাবা সম্ভবত বিবাহের পরদিন গোপনে এ ফোটো তোলাইয়াছিলেন। একটা অদ্ভুত মাধুর্যে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ প্লাবিত হইয়া গেল। ফোটোটার দিকে অনেকক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

"ফোটোটি কার?"

চমক ভাঙ্গিল, দেখিলাম সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক আমাকে স্মিতমুখে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

"আমার মায়ের।"

"ও, বাক্সের ভিতর ছিল বুঝি!"

হঠাৎ নজরে পড়িল ভদ্রলোকের গায়ে বাবারই একটা কোট রহিয়াছে। কালো খদ্দরের কোট। কোটটা আমিই তাঁহাকে করাইয়া দিয়াছিলাম। নির্বাক হইয়া গেলাম। সহসা যেন ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল।

"নমস্কার। চললুম।"

বাক্সটা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

"আমারও ওই রকম ব্যাপার হইয়াছিল। আমার বাবার খবর অবশ্য আমি জানতাম না, এখনও জানি না, মাকে চিনতাম। আমার শৈশবে মা-ই আমার সব ছিল।"

দেখিলাম সেই লোম-ওঠা কুকুরটা আবার গেটের সামনে আসিয়া বসিয়াছে।

চাকরটা সোৎসুকে আমার দিকে চাহিল। ভাবটা, এটাকে সত্যই ওখানে বসিতে দিব না কি? তাহার নীরব দৃষ্টির অর্থ বুঝিলাম।

"ওকে তাড়াসনি। ও থাক ওখানে। দেখিস অন্য কুকুর যেন না আসে। আর দেখ, ভিতর থেকে কিছু খাবার এনে ওটাকে ভিতরেই ডেকে নিয়ে আয় বরং।"

ভিখন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। তাহার চোখ-মুখে একটা হাসির আভাসও ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। কিন্তু সে প্রভুভক্ত ভৃত্য, একটি কথা কহিল না। বাড়ির ভিতর হইতে খান দুই রুটি আনিয়া গেট খুলিয়া কুকুরটাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, কুকুরটা আসিল না।

আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি রাস্তার খেঁকি কুকুর, আমি রাস্তাতেই থাকব। গেট দিয়ে তোমার খোঁয়াড়ে ঢোকবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। আমি তোমার 'জিমি'র প্রণয়ী বটে, সত্যিই আমি তাকে অহরহ প্রেম নিবেদন করছি। কিন্তু আমি আমার প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য তোমার ওই প্রাসাদরূপী জেলখানায় ঢুকতে রাজী নই। আমার প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে ওই জিমিই নেমে আসবে আমার কাছে পথের ধূলায়। তোমাদের আধুনিক উপন্যাসে তো এ কাণ্ড হরদম হচ্ছে আর সে সবের সিনেমা দেখে তোমরা বাহবা বাহবাও করছ। আমার বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। তোমার ও খাবারও আমি তোমার গেটের মধ্যে ঢুকে খাব না। শহরে অনেক ডাস্টবিন আছে তার কোনটা না কোনটা থেকে আমার আহার জুটিয়ে নিতে পারব। এখন অবশ্য আমার ক্ষিধেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, তোমার রুটি দুটো পেলে ভালো হত। কিন্তু তোমার ও গেটে আমি ঢুকছি না, যদি সত্যিই দিত চাও, ছুঁড়ে দিতে বল।"

আমি ভিখনের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম সে কুকুরের একটি কথাও বুঝিতে পারিতেছে না। কল্পনা দেবীর কৃপাতেই সম্ভবত আমি এ শক্তি লাভ করিয়াছি।

"রুটি দুটো ছুঁড়েই দে। ও ভিতরে আসবে না।"

রুটি দুইটা ছুঁড়িয়া দিতেই সে গপ গপ করিয়া খাইতে লাগিল। সেই ষণ্ডা কুকুরটা বোধহয় আশেপাশেই ছিল, রুটি ছুঁড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া স-বিক্রমে খেঁকিটাকে তাড়া করিয়া গেল। কিন্তু ভিখন থাকাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারিল না। ভিখন একটা ইট তুলিয়া তাহাকে কাছে আসিতে দিল না।

"ওটাকে তাড়িয়া দে এখান থেকে।"

ভিখন লাঠি উঁচাইয়া কুকুরটাকে পাড়া-ছাড়া করিল। লাঠি দেখিয়া লোম-ওঠা খেঁকি কুকুরটা কিন্তু একটুও বিচলিত হইল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে আমি তাহার রক্ষক।

রুটি দুখানা শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ। মনে হইল তাহার চোখের দৃষ্টিতে শাণিত ব্যঙ্গ চকমক করিতেছে।

"আমাকে দুখানা রুটি দিয়েছ বলে মনে কোরো না যে আমি তোমার মন রেখে কথা বলব। আমি জীবনের সব চেয়ে নীচু ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি, এর পর জীবনের আর কোনো ধাপ নেই, এর পরই মৃত্যু। সুতরাং কারো মন রেখে চলবার আর আমার প্রয়োজন নেই। চরম দুঃখকে বরণ করে আমি পথের ধূলার সিংহাসনে বসেছি। এখানে আমি রাজা। সুতরাং রাজার মতো স্পর্ধিত সুরেই কথা বলব। একটু আগে তুমি তোমার বাবার শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবছিলে, সে কথা আমি টের পেয়েছি। কি করে পেয়েছি তার বিবরণ দিতে আমি অক্ষম। তোমরা রেডিও খুলে অনেক দূরের খবর শোন। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে তেমনি একটা রেডিও আছে, তার সাহায্যে আমরা অনেকের মনের কথা টের পাই। যে যত দরিদ্র তার মনের রেডিওটা তত ভালো। আমি দরিদ্রতম তাই আমার মনের রেডিওটা নিখুঁত। তোমার মনের সব কথা আমি টের পাচ্ছি। তোমার বাবার কথা শুনে আমারও মায়ের কথা মনে পড়ল। আমার বাবার খবর আমি জানি না, কারণ আমার বাবা কে ছিল তাই আমার জানা নেই। সেজন্য লজ্জিতও নই আমি। তোমাদের সমাজেরও অনেক বড়লোকের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। তোমরা সেজন্য লজ্জিত নও, অনেক সময় তাদের মহিমায় তোমরা গৌরবান্বিত। শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও তোমাদের সমাজের অনেক আলোক-প্রাপ্তা নারীরাও জারজ সন্তান প্রসব করেন। এসব সন্তানকে মৃত

অবস্থায় অনেক সময় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি। দু'একটাকে আমি খেয়েওছি। এ ধরনের অনেক জারজ সন্তান অনাথালয়েও মানুষ হচ্ছে। আর এক ধরনের জারজ সন্তান আছে যারা আসলে জারজ হলেও তাদের পিতৃপরিচয় একটা আছে। তোমাদের সমাজে নপুংসক গর্দভের অভাব নেই, তারা নিজেদের স্ত্রীকে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে আর স্ত্রীর গর্ভের জারজদের পিতা বলে সমাজে পরিচিত হয়। আমাদের সমাজে এসব ভণ্ডামি নেই। বিয়ের নলচে আড়াল দিয়ে আমরা প্রেমের তামাক খাই না। আমরা যা করি খোলাখুলিই করি। সব কুক্কুরীই স্বয়ংবরা। শুনেছি মানবসমাজে কোথাও কোথাও আমাদের নীতিই চলছে এখন। তোমাদের বড় বড় কবি—যেমন শেলী, বায়রনও আমাদের দলের লোক। ওঁরা অবশ্য প্রেমের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন শুনেছি, কিন্তু ওসব কবিতা আমরা বুঝি না, কার্যত ওঁরা যা করেছেন তার সঙ্গে মোটামুটি আমাদের মিল আছে এই ভেবেই আমরা পুলকিত। তুমি হয়তো ভাবছ আমি সামান্য খেঁকি কুকুর হয়ে এত কথা জানলাম কি করে? জানব না? তোমাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরে আছি যে আমরা। তোমাদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। সম্রাট যুধিষ্ঠির কুকুরকে ছেড়ে স্বর্গে পর্যন্ত যেতে রাজি হননি, সে কি এমনি? কুকুর যে কত মহৎ প্রাণী তা চিনেছিলেন তিনি। হ্যাঁ, কথায় কথায় অন্য কথায় এসে পড়েছি আমি। আমার মায়ের কথা বলছিলাম। এক বস্তিতে এক মুচির বাড়ির পিছনে একটা পোড়ো খোলার ঘরের নীচে আমার মা আমাদের প্রসব করেছিলেন। আমরা তিন ভাই দু বোন একসঙ্গে হয়েছিলাম। যতদিন চোখ ফোটেনি ততদিন সুখেই ছিলাম আমরা। মায়ের কোলের কাছে জড়াজড়ি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতাম। মা মাঝে মাঝে আমাদের ছেড়ে উঠে যেতেন, বোধহয় খাবারের সন্ধানে। মাঝে মাঝে বাইরে মায়ের আর্ত চীৎকার শুনতে পেতাম। সভ্য মানুষ অচেনা কুকুরকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না, ঢুকে পড়লে তাকে মেরে দূর করে দেয়, এই তোমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা। যাকে পাঁচপাঁচটা শাবককে দুধ দিয়ে পালন করতে হয় তার ক্ষুধা যে কত সর্বগ্রাসী তা বিচার করে দয়ালু হবার প্রবৃত্তি তোমাদের নেই। স্বার্থ ছাড়া আর কোনো জিনিসটাই বা তোমরা দেখতে পাও। অথচ শুনেছি তোমাদের বেদান্তে নাকি আছে সর্বজীবেই এক ব্রহ্ম বর্তমান। একথা কি তোমরা মান? এই নীতি অনুসারে তোমরা কি নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত কর? আমি জানি কর না। আমাদের মতো তোমরা খেয়োখেয়ি করতেই ভালোবাস। স্বার্থ এবং হিংসার তাড়নায় তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মতো লোককেও নাস্তানাবুদ করতে ছাড়নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব জানি। লোম-ওঠা কুকুর হলেও তোমাদের সব খবর রাখি। পরের হাঁড়ির খবর রাখা এবং পরচর্চা করা যদি সভ্যতা হয়, তাহলে আমিও তোমাদের চেয়ে কম সভ্য নই। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এখন আমাকে লোম-ওঠা দেখছ, কিন্তু বরাবর আমি লোম-ওঠা ছিলাম না। আমার বাবা সম্ভবত স্প্যানিয়েল বংশজাত কোনও ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর আভিজাত্যের কিছু চিহ্নও আমার অঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ আমারও গায়ের লোম একটু বড় [illegible] এবং ঈষৎ কোঁকড়ানো ছিল, কানও ঝোলা ছিল একটু, পুচ্ছপ্রান্তেও ঝালরের মতো বাহার [illegible] দেখতে খুব খারাপ ছিলাম না আমি। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন অনেক কুক্কুরী সুন্দরীর [illegible]রিয়ে দিয়েছি। শুধু কুক্কুরী নয়, অনেক মানুষও আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সে আর এক ম[illegible] ইতিহাস। ওরে বাবাঃ, এ কি—"

কুকুরটা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। দেখিলাম কয়েকটা ছোঁড়া গুলতি লইয়া কুকুরটার পিছু পিছু ছুটিতেছে। ভিখনও লাঠি উঁচাইয়া আগাইয়া গেল।

"এই লোণ্ডা সব, বাবুকা কুত্তা হে, নেই মারো।" (এই ছোঁড়ারা, বাবুর কুকুর, মেরো না।)

একটা ছোঁড়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, "মারব না? নিশ্চয়ই মারব। ওই হতভাগা কুকুরটা কাল রাত্রে আমাদেব হাঁড়ি খেয়েছে। বাসী মাংস ছিল সমস্ত সাফ করে দিয়েছে চেটেপুটে। আর পালাতে ওস্তাদ কি রকম, বাঁই বাঁই করে ছুটল ব্যাটা—"

ছোঁড়াটাকে ডাকিয়া বলিলাম, "কত মাংস কিনেছিলে তোমরা।"

"আধ সেব কিনেছিলাম, তিনজনে খেয়েছি। আরও খানিকটা ছিল, আজ সকালে ভাত দিয়ে খেতাম। কিন্তু ঐ শ্লা কুকুর সব খেয়ে গেছে।"

হাফপ্যান্ট-পরা ছেঁড়া-গেঞ্জি-গায়ে ছেলেটাকে চিনিতাম। আমাদেরই পাড়ার আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছেলে। তার মুখে 'শ্লা' আর দন্ত্য 'স'-এর সংস্কৃত উচ্চাবণ শুনিয়া একটু দমিয়া গেলাম। কিন্তু সে ভাবটা গোপন করিতে হইল। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ও, তাই না কি'! ভারী পাজী কুকুর তো। যাই হোক কুকুরটাকে মেরো না। ওর নানা পোজের ফোটো তুলছি আমি। ওকে আমার গেটের সামনে বসিয়ে রাখা দরকার।"

"ওই লোম-ওঠা কুকুরের ফোটো তুলছেন কেন?"

"কাগজে পাঠাব।"

"ওর ফোটো কাগজে ছাপবে?"

"ছাপবে।"

"ওর ফোটো কাগজে ছাপিয়ে কি লাভ! ও নেতাও নয়, ফিলিম স্টারও নয়, স্পোর্টস্‌ম্যানও নয়, লেখকও নয়। ওই ছিঁচকে খেঁকি কুকুরের-ফোটো ছাপিয়ে কি হবে?"

"কিছু পয়সা হবে আমার।"

"কিন্তু ও যে আমাদের মুখের গ্রাসটুকু চুরি করে খেয়ে ফেলল, তাব কি—"

"তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহলে তোমাদের খাওযার জন্য একসেব মাংসের দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

হ্যাংলার মতো লোলুপ হইয়া উঠিল ছেলেটা।

"আপনি দেবেন? সত্যি বলছেন?"

"দেব।"

"ভাল মাংসের সের কিন্তু চার টাকা করে আজকাল।"

"তাই দেব।"

"আরও এক টাকা দিতে হবে। ঘি মসলা-টসলা লাগবে তো। এক টাকায় হবে কি না সন্দেহ—"

"বেশ, আরও দু'টাকাই দেব। এই নাও—"

পকেট হইতে ছয়টি টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিলাম।

"ও কুকুরটাকে কিন্তু তোমরা মেরো না। ওকে আমাব গেটের কাছে বসতে দিও। আর একটা কাজ যদি করতে পার তাহলে আরও ভালো হয়।"

"কি বলুন।"

"এ পাড়ার কুকুরগুলো ওকে তাড়া করে আসছে। তোমাদের হাতে তো গুলতি রয়েছে, সেগুলোকেও যদি ঠেকিয়ে রাখতে পার—"

"নিশ্চয় পারব। সব শ্লাকে এখুনি দূর করে দিচ্ছি। ওরে ঘোঁতা, তোদের মোষটাকে বেঁধে রাখিস—"

"মোষ কি কুকুরের নাম?"

ঘোঁতা বলিল, "হ্যাঁ। মোষের মতো ঘুমোয় বলে খুড়িমা ওর নাম মোষ রেখেছেন। এদিকে খুব তেজী, কোনো কুকুরকে পাড়ায় ঘেঁষতে দেয় না। আমি ওর নাম শের রেখেছিলাম। কিন্তু কাকাবাবু ভয়ানক গোঁড়া কিনা, বললেন, ও সব মুসলমানী নাম চলবে না। আমি বাঘা রাখতুম, কিন্তু পাশেব বাড়ির কুকুরটার নাম বাঘা। খুড়িমা বললেন, ওর নাম 'মোষ' থাক। বেঁধে দিতে বলছিস, কিন্তু বাঁধলে ভয়ানক চেঁচাবে। তাছাড়া আমাদের চেনও তো নেই। দড়ি দিয়ে বাঁধলে ছিঁড়ে ফেলবে। আচ্ছা, এক কাজ করব, আমাদের পিছনের বাড়িটার ভাড়াটে উঠে গেছে, সেইখানে ওটাকে বন্ধ করে শেকল তুলে দেব বাইরে থেকে। আমাদের মাংসের ভাগ দিতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে নগদ ছয় টাকা হাতে পাইয়া ছেলের দল উল্লসিত হইয়া চলিয়া গেল। আপনারা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন আমি এমন ভাবে ফট্ করিয়া ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিলাম কেন। শুনিয়া রাখুন, আমি এখন বড়লোক হইয়াছি, টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারি। প্রথম জীবনটা খুব কষ্টে কাটিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আমার বেশ পয়সা হইয়াছে। কি করিয়া হইল তাহা পরে বলিতেছি। ওই লোম-ওঠা কুকুরটা আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। উহার সব কথা আমাকে শুনিতেই হইবে। এজন্য আমাকে যদি কিছু পয়সা খরচ করিতে হয় আমি করিব। আমার পয়সা হইয়াছে একথা শুনিয়া আপনারা বোধহয় আশ্চর্য হইলেন। এক হিসাবে আশ্চর্য হইবার কথাই, আমার মতো স্কুলের মাস্টারের আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে যুগের মানদণ্ড লইয়া হিসাব করিতেছেন সে যুগও নাই, সে মানদণ্ডটাও বদলাইয়াছে! সে মানদণ্ডকে আঁকড়াইয়া থাকিলে আমি বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। আমি সাধু, আমি চরিত্রবান, আমি সনাতন ভারতবর্ষের শুভ্র আদর্শকে আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি এই সত্য কথাটুকুও লোকের মনে থাকিত না। লোকের উপহাস কুড়াইয়া, মাথায় গ্লানির বোঝা বহিয়া আমি নিঃশব্দে হয়তো নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। অনেকে হয়তো তাহাই বরণীয় মনে করিবেন, কিন্তু আমি পারি নাই। যেদিন চিকিৎসা-বিভ্রাটে আমার ছোট কন্যাটি অকালে মারা পড়িল সেদিনই বুঝিতে পারিলাম কোন্ যুগে বাস করিতেছি। দরিদ্র স্কুল মাস্টারের পক্ষে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করানো অসম্ভব। ডাক্তারবাবু অবশ্য ফী লইতেন না। কিন্তু ঔষধের যে প্রেসক্রিপশন লিখিতেন তাহার দাম প্রেসক্রপশন-পিছু প্রায় আট-দশ টাকা। মাসাবধিকাল ঋণভাবে জর্জরিত হইয়া তবু চিকিৎসা চালাইয়া যাইতেছিলাম। একদিন একটা ইন্জেকশন দিবার পরই আমার মেয়েটি মারা গেল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, ও ইন্জেকশনে মারা যাইবার কথা নয়। সম্ভবত উহাতে ভেজাল আছে। ডাক্তারবাবু আমাকে দিয়া আর এক শিশি উক্ত ঔষধ কিনাইয়া তাহা কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য সরকারি ল্যাবরেটরিতে পাঠাইলেন। কিছুই হইল না। রিপোর্ট আসিল ঔষধ ঠিকই আছে।

শুনিলাম ঔষধ-বিক্রেতা খুব ধনী লোক, কয়েকখানি মোটর এবং বাড়ি আছে তাঁহার, দেশের গণ্যমান্য প্রভাবসম্পন্ন অনেক ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তাও আছে, সুতরাং তিনি অনায়াসে দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন করিতে পারেন। টাকার মুদ্গরে সত্য-শিব-সুন্দরকে জখম করিয়া অবাধে স্বেচ্ছাচার চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা তিনি অর্থবলে অর্জন করিয়াছেন। আমরা গরীবরা দূর হইতে তাঁহাদের সেলাম করিয়া ধন্য হইতে পারি, আর কিছু করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ যে সমাজে বাস করিতেছি সে সমাজে টাকাই ক্ষমতা, টাকাই মান, টাকাই যশ, টাকাই প্রতিভার নিদর্শন।

দিন কয়েক পরে একটা সুযোগও জুটিয়া গেল। আমাদের স্কুলে এক ধনীসন্তান আমার ছাত্র ছিল। ওরূপ 'গবেট' এবং সব বিষয়ে বখা ছেলে দেখা যায় না সাধারণত। তাহার বাবা একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি ছেলেটির টিউশনির ভার নিন। যা মাইনে চান দেব, আব ছেলেটিকে যদি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেব।"

অবাক হইলাম।

"আপনি ও ছেলেকে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করাতে চাইছেন কেন? ওর লেখাপড়া করে লাভই বা কি, আপনার অতবড় ব্যবসাতেই ওকে বসিয়ে দিন না—"

"আরে সে তো দেবই। লেখাপড়ার দরকার নেই, ডিগ্রীর দরকার। আসল কথা তবে খুলে বলি। এক কোটিপতির একমাত্র মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করছি। মেয়ের বাবা বলেছে আমাব জামাই অন্তত বি. এ. পাস হওয়া চাই। আপনি ম্যাট্রিকের বেড়াটা তো পার করে দিন, তারপর বাকিটা আমি ঠিক কবে নেব। আর আপনিই যদি সে ভার নেন তাতেও আমি রাজি। কত টাকা নেবেন সেটাও ফয়সালা করে নিন। আমি এক কথার মানুষ; হিমালয় নড়তে পারে কিন্তু আমার কথা নড়বে না। কথা নড়লে এত টাকার কারবারকে চালু রাখতে পারতাম না।"

বলিলাম, "মেয়েব বাপ কি অতদিন অপেক্ষা কববে? বি. এ. পাস করতে আরও বছর পাঁচেক লাগবে অন্তত। প্রতি বছরই যদি পাস করে অবশ্য।"

"মেয়ের বয়স এখন দশ বছর। মা-মরা মেয়ে। বাপের একটি মাত্র সন্তান। বাপ আর বিয়ে করেনি। তার ইচ্ছে শিক্ষিত একটি ছেলের হাতে মেয়েটিকে দিয়ে ছেলেটিকে তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করবে। আমার ছেলের চেহারাটি তো দেখেছেন-- কন্দর্পকান্তি রাজপুত্র। মেয়ের বাপের ভারি পছন্দ হয়েছে ওকে। আমাকে বলেছেন ও যদি লেখাপড়াতেও ভালো হয়—অন্তত বি.এ. টাও পাস করে তাহলে ওর সঙ্গেই আমি রূপুর বিয়ে দেব। আমি পাঁচ ছ' বছর অপেক্ষা করতে রাজী আছি। সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম, এখন আপনি যদি ওর বি. এ. পাসের গ্যারান্টি দেন আমি নিশ্চিন্ত হব। কত টাকা চান বলুন—"

সেই প্রথম অধঃপতনের (আধুনিক বিচারে উন্নতিও বলিতে পারেন) প্রথম ধাপে পা দিলাম। সাধারণ বাঘ মানুষ-খেকো বাঘে রূপান্তরিত হইল। যত ধরনের এবং যত রকমের জুয়াচুরি করা সম্ভব সবই করিতে লাগিলাম। প্রশ্নপত্র বলিয়া দিলাম, খাতা বদলাইয়া দিলাম, বন্ধু পরীক্ষকদের অনুরোধ করিয়া নম্বর বাড়াইয়া দিলাম। আমাব দলেও কয়েকজন শিক্ষক এবং পরীক্ষক জুটিয়া গেলেন। যৌথভাবে আমাদের কারবার চলিতে লাগিল। শুধু একটি ছাত্রকে নয়, অনেক ছাত্রকে আমরা এইরূপে ডিগ্রী-ভূষণে মণ্ডিত করিলাম। তাহার মধ্যে অনেকে এখন

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অনেকে বড় ব্যবসায়ী, অনেকে স্কুল কলেজের শিক্ষক। সকলেই আমার কাছে কৃতজ্ঞ, সকলেই আমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। ইহাদের সাহায্যেই আমার জীবন-পথের সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় আমার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটাও আশ্চর্যরকম বদলাইয়া গিয়াছে। এখন অন্যায়কেই ন্যায় বলিয়া গণ্য করি, ন্যায়বানকে মূর্খ নির্বোধ বলিয়া মনে হয়।

পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার অভিজাত-পল্লীতে একটি বাড়ি তুলিয়া ফেলিলাম। শিক্ষক হিসাবে আমার সুনাম রটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং রিটায়ার করার পরও ছাত্রের অভাব হইল না। বাড়িতে বসিয়াই অনায়াসে মাসে চার পাঁচ শত টাকা উপার্জন করিতে লাগিলাম।

আমার সাহিত্য-চর্চাও ছাড়ি নাই। সাহিত্য-চর্চা করিয়াও কিছু কিছু রোজগার করিতাম। কিন্তু সে রোজগার যৎসামান্য।

হঠাৎ নজরে পড়িল সেই লোম-ওঠা কুকুরটা আবার আসিয়া গেটের সামনে বসিয়াছে। আর আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। তাহাতে স্পর্ধা, ব্যঙ্গ, ক্ষোভ, ধিক্কার সবই যেন মিশিয়া আছে। মনে হইল একটু অনুকম্পাও যেন আছে।

"আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে তুমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ, তার জন্যে তোমাদের শাস্ত্র অনুসারে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার ঠিক উলটোটা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমিই ধন্যবাদার্হ কারণ আমি তোমার গেটের সামনে বসে তোমাকে তোমার লেখার খোরাক জোগাচ্ছি। এখানে বসার আমারও একটা গরজ আছে বটে, আমি আশা করে আছি অদম্য অধ্যবসায় বলে আমি হয়তো তোমার জিমির হৃদয়-হরণ করতে পারব। কিন্তু সে গরজটা গৌণ। কারণ আমি তোমাদের কাব্য-বর্ণিত রোমিও, জগৎসিংহ বা ওসমানের মতো একনিষ্ঠ প্রণয়ী নই। এখন আমার প্রেমের জগতে জিমিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নয়—হালদার পাড়ার টুনি আছে, তোমার গলির ওপাশে বুলি আছে, সাহেব পাড়ায় (মানে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়ায়) খাঁটি আইরিশ টেরিয়ার ক্লিওপেট্রা আছে, তা ছাড়া রাস্তায় ঘাটে নামহীনা অনামিকার দল এত আছে যে তোমাদের বড়লোকদের মতো যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি মস্ত একটা হারেমই বানিয়ে ফেলতাম। কিন্তু তা করিনি, কারণ শুধু যে আমার ক্ষমতা নেই তা নয়, ওসব প্রবৃত্তিও নেই। হারেম বানিয়ে কি হবে? ওরকম একটা বিদঘুটে ঝঞ্ঝাট কাঁধে বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয়? তবে একথাটাও তোমার কাছে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে তোমার জিমিকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে। ওকে পেলে সত্যিই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম, কথায় কথায় প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। আমার মায়ের কথাটা শোন। তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় very interesting. আমি আমার মায়ের কাছে বেশী দিন থাকিনি। একটু বড় হতেই আমার মা আমাদের ফেলে চলে যেতেন, আর আমরা ব্যাকুলভাবে তাঁর পিছু পিছু ছুটতাম। হাসছ? তোমাদের সমাজেও কি এ রীতির প্রবর্তন হয়নি আজকাল? ছেলেমেয়েদের ফেলে মায়েরা আজকাল কি প্রজাপতির মতো সেজে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছেন না? তোমরা বল সায়েবদের কাছ থেকে তোমরা এটা শিখেছ। কিন্তু আমাদের সমাজে এ রীতি তো অনাদিকাল থেকে প্রচলিত। আর সায়েবদের সংস্পর্শে আসবার অনেক আগে তোমরা আমাদের সংস্পর্শে এসেছ।

কে জানে হয়তো আমাদেরই নকল করেছ তোমরা। আর একটা জিনিসও প্রচলিত হয়েছে তোমাদের সমাজে। সুখের বিঘ্ন বলে অনেক মা আজকাল ছেলেমেয়েদের মেরেই ফেলছেন। তোমাদের খবরের কাগজে এসব খবর ছাপাও হচ্ছে। আশ্চর্য তোমাদের খবরের কাগজগুলো, তাতে তোমাদের মহত্ত্ব, বীরত্ব, মহানুভবতার খবর কম বেরোয়, বেশী বেরোয় কেচ্ছা আর কেলেঙ্কারির খবরগুলো। কাল হিনুবাবুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঙা চাটতে চাটতে খবরের কাগজের আলোচনা শুনছিলাম। হিনুবাবুর দোকানে বহু বেকার ছোঁড়া এসে জোটে বিনাপয়সায় খবরের কাগজ পড়বে বলে। তারা দেখলাম তোমাদের সমাজের নানারকম কেচ্ছা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। সেখানেই শুনলাম একজন ভদ্রনারী নাকি সুখের সন্ধানে ছেলে মেয়ে স্বামী সবাইকে হত্যা করে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছেন। খুব ফলাও করে ছেপেছে খবরটা। আমাদের সমাজেও এরকম ঘটে। আমরা যখন মায়ের পিছু পিছু ছুটতাম তখন মা মাঝে মাঝে খ্যাক্ খ্যাক্ করে আমাদের কামড়ে দিত। পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা ক্রমাগত টেনে তার দুধ খাচ্ছে, মেজাজ কখনও ঠিক থাকে? বাচ্চাদের খেয়ে ফেলেছে এরকম খববও শুনেছি। সেই অসামান্যা কুক্কুরটির সঙ্গে আমার আলাপ এবং প্রেম দুইই হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'বাচ্চা না খেয়ে করব কি। তখন যাঁর বাড়িতে থাকতাম তিনি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। পাছে আমার বাচ্চাগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে চারিদিক নোংরা করে ফেলে এই ভয়ে আমাকে আর আমার বাচ্চাগুলোকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। শিকল তুলে দিয়েছিলেন বাইরে থেকে। আমাকে খাবার দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবত আমার অসতীত্বে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমাকে পুষেছিলেন বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু ধর্মাত্মা ছিলেন তো, আমি রাস্তায় বেরিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করি এটা মোটেই পছন্দ করতেন না। আমি কিন্তু তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার বেরিয়েছিলাম একদিন, এবং কিছুদিন পরে তিনটি বাচ্চাও উপহার দিয়েছিলাম তাঁকে। সম্ভবত এই জন্যেই আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে শেষে আমি আমার বাচ্চাগুলোকেই খেয়ে ফেললাম। কি করি! অনাহারে তো মরতে পারি না। কথায় কথায় আবার অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। আমার মায়ের কথাটা বলাই হচ্ছে না। আমার মায়ের কথা অবশ্য খুব বেশী আমি জানি না। কারণ ছেলেবেলাতেই মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আমাদের সমাজে খুব ছেলেবেলা থেকেই আমরা স্বাবলম্বী হই। মা যতদিন দুধ দিতে পারে ততদিনই তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন। দুধ বন্ধ হলে আমরাও বন্ধনহীন, মায়েরাও স্বাধীন! সে স্বাধীনতা এত উদার যে তার কোনো আব্রু নেই, দিগন্ত নেই, 'যা-খুশি-করতে-পার'-মার্কা স্বাধীনতা, তোমাদের শুদ্ধ ভাষায় বলতে পারি, অবাধ। এত অবাধ যে সে স্বাধীনতায় মায়ের সঙ্গে ছেলের প্রেম করবারও কোনো বাধা নেই। এমন কি যৌন-সম্পর্কও চলতে পারে। মায়ের সঙ্গে ছেলের বা বাপের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক আমাদের সমাজে একমুখী নয়, বহুমুখী। মিথ্যা বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে তাকে আমরা সীমাবদ্ধ করিনি। তোমরাও যখন সভ্য ছিলে, অর্থাৎ ভণ্ডামির আবরণ যখন তোমাদের কুৎসিত কদর্য, অস্বাভাবিক করে তোলেনি, অর্থাৎ তোমাদের সেই আদিম অকৃত্রিম বন্য সভ্যতায়, যার নামকরণ তোমাদের বৈজ্ঞানিক মহাপণ্ডিতেরা স্বর্ণযুগ না করে প্রস্তরযুগ করেছেন, সেই যুগে তোমাদের মতিগতিও আমাদেরই মতো ছিল। তোমার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটু ঘৃণার আভাস দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে তুমি যেন মনে মনে বলছ কি জঘন্য, কি কুৎসিত, কি অকথ্য অশ্রাব্য কথাই না বলছে কুকুরটা। তাহলে আর একটা কথা বলি শোন,

তোমাদের আদিম প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে মরেনি। তোমাদেরই অনেক বিজ্ঞানী একথা প্রমাণ করেছেন। ইডিপাসের গল্প তো তোমাদের সমাজে উচ্চাঙ্গের কাব্য বলে গণ্য, আর ইডিপাস কম্‌প্লেকসের বৈজ্ঞানিক তথ্য বার করে তো তোমাদের বিজ্ঞানীরা ধন্য। তোমাদের অনেক নামজাদা লেখকও তো এই নিয়ে গল্প লিখে নিজেদের অনন্যতা জাহির করেছেন আর তোমরা তাঁদের ঘিরে বাহবা বাহবা করেছ। তোমরা ভুলে গেছ যে তোমাদের ওই অনন্যতাটা আসলে অনন্যতা নয়, আসলে ওটা আমাদেরই নকল। আমাদের অর্থাৎ যাদের দেখে তোমরা পশু বলে নাক সেঁটকাও তাদেরই নকল করে তোমাদের যত বাহাদুরি। একটু আঁশটে গন্ধ না থাকলে তোমাদের গল্প কাহিনী জমে না। তোমাদের রামায়ণে মহাভারতে পুরাণেও এ আঁশটে গন্ধ আছে সুতরাং তোমার চোখের ওই ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি আমার কাছে হাস্যকর। তোমরা আমাদের চেয়েও খারাপ। একটা কথা বিশ্বাস করবে কি না জানি না। আমার মায়ের সঙ্গে আমার ওরকম সম্পর্ক কখনও হয়নি। এর জন্য আমি কোন প্রশংসা দাবি করছি না, হয়নি তার কারণ আমি সুযোগ পাইনি। আমার খুব ছেলেবেলাতেই আমার কোঁকড়ানো গায়ের লোম আর বাহারে ল্যাজের জন্য আমাকে মায়ের কাছ-ছাড়া হতে হয়েছিল। প্রথমেই পাড়ার একটা ছোঁড়া আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা দড়ি দিয়ে আমাকে নিজেদের বাড়ির উঠোনে বেঁধে ফেলেছিল। দু'দিনের বেশী অবশ্য সেখানে থাকিনি। নিজের শক্তিবলেই উদ্ধার পেয়েছিলাম সেখান থেকে। তুমি হয়তো ভাবছ ছোট কুকুর বাচ্চার আবার কতটুকু শক্তি থাকতে পারে? ছিল, চেঁচাবার শক্তি। ওই দুদিন আমি এমন তারস্বরে এবং এত বিচিত্র রকম বিশ্রী সুরে চীৎকার করেছিলাম যে বাড়ির কর্তার মাথার শির ছিঁড়ে পক্ষাঘাত হয়ে গেল। তাঁর নাকি ব্লাডপ্রেসার ছিল। ডাক্তার এসে বললেন আমার চীৎকারই নাকি এর কারণ। সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে আমাকে দূর করে দিলেন কর্তার বড় ছেলে। রাস্তার কুকুর আবার রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। মায়ের কথা একবার মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু মায়ের কাছাকাছি যাবার আর সুযোগ পাইনি। একটু পরেই আর একজনের পাল্লায় পড়লাম। একটা লিক্‌লিকে কালো গোছের ছোঁড়া এগিয়ে এল আমার দিকে। 'আ বাচ্চু আ আ' বলে পট করে সে আমাকে তুলে বগলদাবা করে ফেলল একেবারে। ফেলেই ছুটল পিছু দিকে চাইতে চাইতে। এ রাস্তা সে রাস্তা, এ গলি সে গলি পার হয়ে সে অবশেষে গিয়ে পৌঁছল শহরের শেষ প্রান্তে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়িতে।

"কে রে ভুতো এলি—"

নারী-কণ্ঠে কে যেন বললে ভিতর থেকে।

"হ্যাঁ মা, দেখ কি এনেছি। আসল স্প্যানিয়ালের বাচ্চা। বেচলে ভালো দাম পাওয়া যাবে। সে কুকুরটা কোথা?"

"সেটা হরিবাবুর ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি বাবা। অনেক করে চাইছিল, হাজার হোক ওদের বাড়িতে চাকরি করি তো, 'না' বলতে পারলাম না।"

ভুতোর চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। ধপাস করে আমাকে উঠোনে ফেলে সে তেড়ে গেল মাকে। একেবারে দৌড়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে ফেলল তার।

"হারামজাদি, পরের ধনে পোদ্দারিগিরি করতে কে বলেছিল তোমাকে। ওটা কি কুকুর জানিস? আসল গ্রে-হাউন্ডের বাচ্চা। ছুঁচলো মুখ, সরু ল্যাজ। সায়েব-পাড়া থেকে হাতিয়েছিলুম। তুই অমনি দানছত্তর খুলে বসলি?"

"ছাড় ছাড়, লাগে। দশটা টাকা দেবে বলেছে।"

"মাত্র দশ টাকা? অন্ততপক্ষে পঁচিশ টাকার মাল। পেডিগ্রি জোগাড় করতে পারলে আড়াইশ তিনশ' টাকা। তুই দশ টাকায় দিয়ে দিলি, তা-ও ধারে।"

আর একটা হেঁচকা টান দিলে চুলের গোছায়। ভূতনাথ শেষ পর্যন্ত কি করতেন তা জানি না; কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না তিনি।

"হো-ই ভুত্থো, ঘর মে হ্যায়—বাহার নিকলো।"

ভুতো মাকে ছেড়ে তড়াক করে বেরিয়ে গেল পাঁচিল ডিঙিয়ে।

কনেস্টবল প্রবেশ করল উঠোনে।

"ভুত্থো কাঁহা—"

"সে তো পরশু দিন মামার বাড়ি গেছে।"

"ঠিকানা বোলো।"

"কেন—"

"আব্ শ্বশুরাল যাবে।"

তারপর কনেস্টবল বললে যে ক্যানিং স্ট্রীটে একজন বড়লোকের পকেট মারা গেছে। ল্যাংড়া বলে একটা 'পাকিট মার' ধরাও পড়েছে। ল্যাংড়া নাকি বলেছে যে তার সঙ্গে 'ভুত্থো'ও ছিল। মানিব্যাগটা নাকি ভুতোই পেয়েছে। এর পর কি হল আমি জানি না। কারণ দরজাটা খোলা পেয়ে আমি আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল এইবার বুঝি স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না। তোমাদের সমাজে বেওয়ারিস কোনো সুন্দর জিনিস বেশীক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকতে পায় না, তা কুকুর, মেয়েমানুষ, ঘড়ি, আংটি, খেলনা যা-ই হোক না কেন। তোমরা স্কুলে শেখ পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়েই পরদ্রব্য হস্তগত করবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে ঘুরে বেড়াও। কেউ হ্যাংলার মতো, কেউ চোর হয়ে, কেউবা আবার চোখ রাঙিয়ে। তোমাদের গুণের শেষ নেই। কিছুদূর যেতে না যেতেই আমি আর একজনের পাল্লায় পড়লাম। 'আঃ চু, চু, চু' বলে একটা ছোট ছেলে এগিয়ে এল। খুব ছোট ছ সাত বছরের বেশী হবে না। ছেলেটিকে খুব ভালো' লাগল আমার। মনে হল যেন আমার সমবয়সী। আমি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলুম। ভুতোর মতো সে আমাকে টপ করে তুলে নিয়ে বগল-দাবা করলে না। সে কেবল তার ছোট্ট হাতখানি নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল আমাকে—আঃ আঃ, চু, চু, চু। আমিও তার পিছু পিছু গেলুম। কিছুদূর গিয়ে ছেলেটা এক ছুটে কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর আবার পিছু ফিরে ডাকতে লাগল আমাকে। আমিও যেতে লাগলাম তার পিছু পিছু। আমার ভয় হতে লাগল ভুতো আবার এসে আমাকে তুলে না নেয়। কিন্তু ভুতো আর আসেনি। সে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল সম্ভবত। ছেলেটার পিছু পিছু অনেক দূর গেলাম। গিয়ে ঢুকলাম ছোট্ট একটা বাড়িতে।

"মা, মা, দেখ কেমন সুন্দর কুকুর বাচ্চা পেয়েছি একটা রাস্তায়।"

"ওমা, কি সুন্দর।"

একটি সুন্দরী বিধবা বেরিয়ে এলেন। ও রকম মাতৃমূর্তি আমি দেখিনি কখনও জীবনে। তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না কিন্তু আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে সর্বজীবেই মাতৃমূর্তির প্রকাশ এক এবং সুন্দর। আমার মা দুঃখে কষ্টে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের

কামড়ে দিত বটে কিন্তু তবু তার মুখে মাতৃমূর্তির যে অপরূপ ছবি আভাসিত হত তাই যেন পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ দেখলাম ওই বিধবাটির চোখে মুখে সেদিন। মনে হল উনিই যেন আমার মা। তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন, আর তাঁর চোখ মুখ থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল আমার মনে হল তা যেন অনবদ্য স্নেহের পরম প্রকাশ। আমি ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লুম তাঁর পায়ের কাছে।

"ছুঁয়ে দিলি তো, ছুঁয়ে দিলি তো। আবার স্নান করতে হবে দেখছি। দেখি মুখখানি কেমন।"

আমাকে বুকে তুলে নিলেন আর আমার মুখটা নিজের মুখের কাছে এনে দেখলেন হাসিমুখে ভুরু কুঁচকে।

"খুব দুষ্টু দুষ্টু চেহারা দেখছি। ওমা গোঁফ পেকে গেছে দেখছি এর মধ্যে।"

ছেলেটি বললে, "পাকেনি। গোঁপের রংই ওইরকম। কালোয় শাদায় রং যে ওর। তাই কিছু চুল কালো, কিছু শাদা। ও তো বাচ্চা, এরই মধ্যে গোঁফ পাকবে কি।"

খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। এত ভালো লাগছিল আমার। ওদের কথা এত বেশী করে বলছি কারণ ওদের মতো অত ভালো লোক খুব বেশী দেখিনি। দু'চারজন বড় লোকের সংস্পর্শেও এসেছি। তাঁরা ধনী লোক, সত্যিকার বড় লোক নন। তোমরা ধনীদের কেন যে বড় লোক বল তা আমার মাথায় এখনও ঢোকেনি। সত্যিই কি তাঁদের হৃদয় বড়? সত্যিই কি তাঁরা মানুষ হিসাবে বড়? না, না, ভুল বলছি। হ্যাঁ, একটি ধনী লোক দেখেছিলাম বটে, তিনি তোমাদের রাজা জনকের মতো ছিলেন। শুধু গায়ে শুধু পায়ে থাকতেন। শুনতাম লক্ষপতি লোক। অনেক দান ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর ছেলেটা ছিল বাপের ঠিক উলটো। ওরকম মূর্তিমান শয়তানও বড় বেশী দেখিনি। মাতাল চরিত্রহীন ছিল! মদ খেলে আর একটা ভয়ংকর প্রবৃত্তি জেগে উঠত তার মনে। জীবন্ত প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পেত। শুনেছি তার রক্ষিতাদের চাবকাতো শংকরমাছের চাবুক দিয়ে! আমি যখন সামনে পড়ে যেতুম আমাকেও নির্যাতন করত ভয়ংকর। বেঁধে বেদম প্রহারও করেছে কতবার। ভাগ্যে তার চাকরটা চোর ছিল তাই নিস্তার পেয়েছিলাম তার হাত থেকে। সে চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছিল আমাকে আর এক জায়গায়। ভাগ্যে দিয়েছিল, তা না হলে মরেই যেতাম। ওই দেখ, আবার কথায় কথায় অন্য কথায় এসে পড়েছি। ওটা আমার একটা বদ স্বভাব! সেই বিধবাটির কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে ছুঁলে স্নান করতেন বটে, কিন্তু ভালোবাসতেন খুব একটা অদৃশ্য আশীর্বাদের মতো সেটা যেন আমার সমস্ত মনকে মুগ্ধ করে রাখত। একটা আশ্চর্য কথা শুনবে? তাঁর বাড়িতে তো মাছ-মাংস ঢুকত না, আমাকেও তিনি নিরামিষ খাবার খেতে দিতেন। এক হাতা দুধ আর কলা দিয়ে ভাত মেখে দিতে আমাকে। তাঁর কাছে থেকে সবরকম ফলমূল খেতে শিখেছিলাম। এমন কি, ছোলাভিজে আর গুড়ও খেতাম। খেতে ভালো লাগত। অকৃত্রিম ভালবাসার পরিবেশে সবই ভালো লাগে। কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইল না। একদিন রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাই ঘটল যা মানুষের সমাজেই ঘটা সম্ভব, যা মানুষের সমাজেই সদাসর্বদা ঘটে থাকে, যার খবর তোমরা খবরের কাগজে পড়তে পড়তে মেকী উৎকণ্ঠার সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ কর, যা তোমাদের ঘোঁট করবার উপাদান সরবরাহ করে, কিন্তু যা তোমাদের কখনও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে না। রাত্রে আমি বারান্দার কোণে অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলাম, কিন্তু উৎকর্ণ হয়েছিলাম পাশের বাড়ির ঘড়ির আওয়াজ শোনবার জন্য। পাশের বাড়িতে একটা ঘড়ি ছিল

তাতে নানারকম বাজনা বাজত। অত্যন্ত ভালো লাগত আমার আওয়াজটা। মনে হত ওই আওয়াজটা যেন আমাকে কোন অজ্ঞানা দেশ থেকে ডাকছে। ওই জলতরঙ্গ বাজনাটা শুনলে আমার সমস্ত মন আকুল হয়ে উঠত। সেদিন ওই বাজনাটার প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু বাজনার বদলে এল বজ্র। একটা মোটর থামার শব্দ হল। তারপর কে যেন দুয়ারে কড়া নাড়তে লাগল। অনেক রাত্রি তখন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দুটো বাজল। কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বিধবাটির, আমিও ঘেউ ঘেউ করে উঠলাম।

"কে—"

"তার হ্যায়—"

কে একজন পরুষকণ্ঠে বলল বাইরে থেকে। কপাট খুলে দিতেই কিন্তু টেলিগ্রাফ পিওন ঢুকল না, ঢুকল একদল গুণ্ডা। তারা এসেই বিধবাটির মুখ বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে, আর তারপর যা করল তার বর্ণনা ভদ্রভাষায় দেওয়া যায় না। তার ছেলেটা একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওই একবার মাত্র। শাণিত হোরার ঘায়ে পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বেচারা। সম্ভবত চিরকালের জন্য। খানিকক্ষণ পরে বিধবার অর্ধনগ্ন দেহটা টানতে টানতে তারা বাইরে নিয়ে গেল। আমিও পিছু পিছু গেলাম। দেখলাম বাইরে একটা বড় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই তারা টেনে তুলল তাঁকে। মোটর চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ অবাক হয়ে। আমাদের তোমরা পশু বল, আমাদের দেখে ঘৃণা বা অনুকম্পা প্রকাশ করতে তোমরা অভ্যস্ত কিন্তু এরকম বীভৎস কাণ্ড আমাদের সমাজে হয় না, তোমাদের সভ্যসমাজেই হয়।

একবার আমার ইচ্ছে হল ঘরের ভিতর সেই ছেলেটি কি অবস্থায় আছে দেখে আসি। কিন্তু সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে আর প্রবৃত্তি হল না। আমি বুঝতে পারছিলাম সে আর বেঁচে নেই। তার জীবন্ত মুখটাই আমার চোখে ভাসছিল। সেই স্মৃতিটুকুকে সম্বল করে আমি চলে গেলাম সেখান থেকে। আমার জীবনের কাহিনী বিপুল এবং ঘৃণ্য। কিন্তু তার সবটা বললে তো মহাভারত হয়ে যাবে আর একখানা। আর সেসব কাহিনী প্রায়ই একঘেয়ে, কুকুরের উপর মানুষের অবিচার অত্যাচারের কথা, মাঝে মাঝে একটু-আধটু রকমফের আছে বটে, কিন্তু মোদ্দা কথাটা ওই। অবশ্য আমার সব কথা তুমি যদি টুকে নিতে পার তাহলে হয়তো সুবিধে হবে তোমার, ঢাউস বড় বই বাজারে বের করতে পারলে তোমাদের নাকি বেশী নাম হয়, বেশী টাকা হয়। এলাচ, আঙুর, আপেল ফেলে আজকাল তোমাদের পাঠক-পাঠিকারা নাকি লাউ কুমড়োর বৃহদাকৃতি দেখে মুগ্ধ হন বেশী। কিন্তু তবু আমার সব কথা আমি তোমাকে বলব না। কারণ তুমি স্বীকার করবে কি না জানি না, আমিও একজন শিল্পী। আমার শিল্পকর্মকে আমি বাজারের পণ্য করিনি, তাই তোমাদের চেয়ে বড় শিল্পী আমি। অবশ্য তুমি বলতে পার আমার শিল্পকর্মকে পণ্য করবার উপায়ও নেই আমার, আমি লিখতে পারি না, কিন্তু তোমাদের সব শিল্পীরাই কি লিখতে পারে? অনেক বড় বড় লেখক লেখা টোকায়। তুমি যেমন এখন আমার কথা টুকছ। কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তিই নেই। রসিকের দেখা পাই না, সবাই সবজান্তা ফড়ে। কি হবে তাদের কাছে রস পরিবেশন করে। কিন্তু দেখ, যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সে কথাটা আবার ভুলেছি। কথায় কথায় বার বার অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। আমার মায়ের কথাটা আগেই বলে নিই। আমি তখন রাখাল কশাইয়ের দোকানের কাছে ধর্ণা দিয়ে

বসে থাকতুম এক-আধ টুকরো হাড়ের আশায়। পাশেই ছিল হাড়কাটা গলি। সেখানে থাকত 'মরবি ছুঁড়ি'। তার আসল নাম কি ছিল তা জানি না, কিন্তু ওই নামেই সবাই ডাকত তাকে। দু'তিন ঘণ্টা অন্তর তার কাছে লোক আসত, তোমাদের সভ্য সমাজের লোক সব। আমি রাত্রে 'মরবি ছুঁড়ি'র বাড়িতে শুতে যেতাম। সেখানে কামুক মাতাল বাবুদের কৃপায় প্রায়ই এঁটো মাংস বা মাংসের হাড়টাড় জুটে যেত আমার কপালে। রাখাল কশাইও 'মরবি ছুঁড়ি'র বাবু ছিল, কেউ কেউ বলত তার ব্যবসার অংশীদারও ছিল নাকি। মোট কথা, সে-ও রোজ যেত তার কাছে। এক বাটি মেটের চাট আর পাইট ধেনো মদ নিয়ে রোজ রাত্রি দশটা আন্দাজ যেত সে। তোমার ভুরু কুঁচকে গেল কেন? রাখাল নামটা শুনে? হ্যাঁগো সে হিন্দুই ছিল। শুধু হিন্দু নয়, হিন্দু ব্রাহ্মণ। চক্রবর্তী উপাধি। এই সময়টাতে একদিন রাস্তায় বেরিয়েছি—হঠাৎ দেখি টম মোটর চাপা পড়তে পড়তে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়ে ছুটে এল আমার কাছে। টম আমার বাল্যবন্ধু ছিল। তার মা আর আমার মা সহোদরা দুই বোন। দেখা হলেই দুজনে ঝগড়া মারামারি লাগিয়ে দিত, মনে হত মায়ের ওর চেয়ে বড় শত্রু আর বোধহয় কেউ নেই, কিন্তু ওর ছেলে টমের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। টম খুব বিনয়ী ছিল। আমার কাছাকাছি এলেই ঘাড় হেঁট করে ল্যাজ পিছনের দুটো পায়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করত যে তাকে না ভালোবেসে উপায় ছিল না। তুমি হয়তো বলবে ও বিনয়ী ছিল না, ভীতু ছিল। কিন্তু ওর ওই ভীতু ভাবটাই ভালো লাগত আমার। তোমাদের আপিসের বড়বাবুরা যেমন হাত-জোড়-করা হেঁ-হেঁ বুলি-বাজ খোশা-মুদে কেরানীদের দেখে গদগদ হন আমিও তেমনি টমকে দেখে হতাম। কেরানীদের সঙ্গে টমের একটু তফাতও ছিল। কেরানীরা আড়ালে বড়বাবুদের গাল দেয়, কিন্তু টম কখনও আমাকে আড়ালে গাল দিয়েছে বা আড়ালে আমার ক্যারিকেচার করে হাসাহাসি করেছে এ কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না। ভণ্ডামি জিনিসটা মানুষদেরই একচেটে। টমের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। কুকুরের ভাষায় সে এসে বললে, তোমার মা বৌবাজারে একটু আগে মোটরচাপা পড়ে মারা গেছে। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, এখনি চলে যাও। খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। শোকে খুব যে একটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম তা বলতে পারি না। তবু খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মায়ের অনেক-দিন-আগে-দেখা মুখটা মনে পড়ল। ক্ষিদের জ্বালায়, নানা দুঃখে কষ্টে সে মুখ মাঝে মাঝে বীভৎস হয়ে পড়ত সত্যি, কিন্তু তবু সে মায়ের মুখ। এই মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম সেই বিধবাটির মুখে, সে মুখও আর দেখতে পাব না। তোমাদের এই ভেজাল-সর্বস্ব সভ্যতায় কোনও বিশুদ্ধ জিনিস বেশীক্ষণ টেঁকে না। হয় তাতেও তোমরা ভেজাল মিশিয়ে খারাপ করে দাও, না হয় তাকে শেষ করে ফেল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই মানবসমাজেই আমাদের বাস করতে হয়। আর আশ্চর্য, এই মানবসমাজে বাস করেই আমরা বুঝতে শিখেছি কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা আলো, কোনটা অন্ধকার। এই সব কথাই তখনও মনে হয়েছিল বোধহয়, ঠিক মনে নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বৌবাজারের দিকেই অগ্রসর হলাম অবশেষে। বৌবাজার লম্বা রাস্তা। অনেক লোকের ভিড়, সবাই নিজের কাজে, নিজের ধান্দায় ছুটে চলেছে, মোটরও অনেক। এর মধ্যে আমার মায়ের মৃতদেহটা কোথায় পড়ে আছে, কি করে আমি তা জানতে পারব এই ভেবে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তবু কিন্তু থামিনি, চলতেই লাগলাম রাস্তা ধরে। রাস্তা শেষ হয়ে গেল তবু কিছু

দেখতে পেলাম না। আবার উলটো :‹ে চলতে লাগলাম। অনেকক্ষণ চলবার পর তোমাদের সার্কুলার রোডের কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম ফুটপাথের কাছে একটা কুকুর পড়ে আছে। কাছে গেলাম, চিনতে পারলাম মাকে। মা তখনও মরেনি! কোমরের উপর দিয়ে গাড়ির চাকাটা চলে গিয়েছিল। কোমরটা ভেঙে গেছে রাস্তার ময়লার উপর রক্তাক্ত দেহে শুয়ে মা এঁকে বেঁকে কাতরাচ্ছে। আমাকে দেখে খুব জোরে কেঁদে উঠল একবার। আমি এখনও মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ অহংকারকে আঁকড়ে আছি যে মা মৃত্যুকালে তার পুত্রকে দেখে হয়তো খুশী হয়েছিল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে সে খুশীর কোন আভাস আমি দেখতে পাইনি, মা যে আমাকে চিনতে পেরেছিল তাও তার দৃষ্টি থেকে বুঝতে পারিনি। মায়ের যন্ত্রণাকাত‑ দৃষ্টি তখন অনিবার্য মৃত্যুকেই দেখছিল সামনে, আমাকে নয়, যুক্তি দিয়ে ভাবলে এই কথাই ‹নে হয়। কিন্তু আমরা সব সময়ে যুক্তি আঁকড়ে থাকতে পারি না। তাই কল্পনা করছি, মা আমা ক দেখে খুশী হয়েছিল। তুমি তোমার বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পাওনি বলে দুঃখ করছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি মায়ের শেষ সময়ে যদি না উপস্থিত হতাম তাহলেই বোধহয় ভালো হত। দেখলাম কেবল মায়ের সেই চলচ্ছক্তিহীন অসহায় অবস্থা, আর চারিদিকে উদাসীন জনস্রোত। কেবল একটি হাফপ্যান্ট-পরা ছোট ছেলে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বোধহয় মজা দেখছিল, কারণ তার চোখের দৃষ্টি থেকে যা উপচে পড়ছিল তা করুণা বা অনুকম্পা নয়, তা কৌতুক। আর একটা বড় গোছের ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। ছোট ছেলেটা বললে, "হাবুদা, কুকুরটা মোটর চাপা পড়েছে দেখেছো? কি রকম অদ্ভুত ভাবে সামনের পা দুটো দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে দেখ। সার্কাসে গেলে এ কুকুর নাম করত। দেখ দেখ, কেমন শরীরটাকে বেঁকাচ্ছে—"

হাবুদা সাবধানী লোক। বললেন, "কাছে যাসনি, কামড়ে দেবে। এই কুকুরগুলো একটা নিউসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কর্পোরেশনে ফোন করেছি, নিয়ে যাক এটাকে সরিয়ে। এখনও তো কেউ এলো না। কর্পোরেশনও আজকাল ওয়ার্থলেস হয়েছে দেখছি—"

কিন্তু দেখা গেল হাবুদা কর্পোরেশনকে যত ওয়ার্থলেস মনে করেছিলেন, তত ওয়' লেস তাঁরা নন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যমদূতাকৃতি জন দুই ডোম এসে হাজির হল। তাদের হাতে মোটা মোটা বাঁশ।

"আরে এটা এখনও মরেনি দেখছি। এতে তো টাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"সাবড়েই দাও না।"

দড়াম করে একটা বাঁশের লাঠি পড়ল মায়ের মাথায়। আর্তনাদ করে উঠল মা। তার পর আর এক লাঠি। মাথাটা ফেটে গেল, ছিটকে বেরিয়ে এল একটা চোখ। মাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার আর অসুবিধা রইল না। আমি ভেবেছিলাম ওরা মায়ের পাগুলো বেঁধে তার ভিতর বাঁশ চালিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। একটা মরা গরুকে ওই ভাবে নিয়ে যেতে দেখছিলাম। কিন্তু দেখলাম ওরা অত মেহনত করতে রাজী নয়, তারা মায়ের পা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। আমার আত্মসম্মানে হঠাৎ ঘা লাগল। তুমি হাসছ মনে হচ্ছে। ভাবছ রাস্তার খেঁকি কুকুরের আবার আত্মসম্মান থাকে নাকি। তোমরা হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বিদেশীর, বিভিন্ন শাস্ত্রের, অদ্ভুত বিচিত্র সমাজের লাথি খেয়ে খেয়ে যদি আত্মসম্মানের বড়াই করতে পার—তাহলে আমি পারি না কেন? আমার আত্মসম্মান তোমাদের চেয়েও তীক্ষ্ণ, যদিও তোমাদের মতো সরব

নয়। বিশ্বাস কর, আমি ঘেউ ঘেউ করে সেই ডোমগুলোর পিছনে তাড়া করেছিলাম। আমার হাতে অবশ্য পিস্তল ছিল না, থাকলে তোমাদের শহীদদের মতোই আমিও শহীদ হতাম সেদিন। দেশমাতৃকার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের যে মনোভাব হয়েছিল আমার মায়ের অপমান দেখেও আমার ক্ষোভ তার চেয়ে কিছু কম হয়নি। আমি ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যেতেই একটা ডোম বললে—আয়, এটাকেও শেষ করে দি। বলেই সে বাঁশ নিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে। তোমাদের শহীদরা যা করেছিল আমিও তাই করলাম। বোঁ বোঁ করে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলাম একটা গলির ভিতর ঢুকে। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তোমাদের শাস্ত্রেও সে কথা বলেছে। এ গলি সে গলি দিয়ে একটা কানাগুলিতে ঢুকে শেষে এক ছাতুউলি বুড়ির আশ্রয়ে এসে পৌঁছে গেলাম। বুড়ীও প্রথম আমল দিতে চায়নি, একটা ঝাঁটা নিয়ে দূর দূর করে তেড়ে গিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু আমি তার পায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে শুয়ে পড়লাম একেবারে। দু'এক ঘা ঝাঁটার বাড়ি খেয়েও পড়ে রইলাম। বুড়ী তখন বলে উঠল—

"ওলো সাবি, মুখপোড়া কুকুরের কাণ্ড দেখে যা। ঝাঁটা খেয়েও নড়ছে না। কি করি বল তো। তুই বেরিয়ে আয় না, কত ভাবোন আর করবি এখন থেকে। নগেন তো আসবে সেই সন্ধ্যের পর—"

"আহা, আমি ভাবোন করছি নাকি। চুল আঁচড়াবো না তা বলে!"

একটি ছোট আয়না বাঁ হাতে নিয়ে আর ডান হাত দিয়ে মাথার অজস্র ঘনকৃষ্ণ চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে সাবি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চোখে মুখে চাপা হাসির অপরূপ শোভা। পরনের কমলারঙের একটা সস্তা শাড়ি। বুড়ীর যুবতী নাতনী সাবি (বোধহয় সাবিত্রীর অপভ্রংশ) সত্যিই সুন্দরী। রং খুব ফরসা নয়, খুঁটিয়ে দেখলে নাক মুখ চোখও নিখুঁত নয়, তবু সে সুন্দরী। নগেনও—তার স্বামী বা প্রণয়ী যে-ই হোক—নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। সাবি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বলল—"ওমা কি সুন্দর কুকুর, ওকে মারছ কেন দিদিমা—"

যৌবনে সব স্ত্রী-পুরুষই একটু উদার হয়। তাদের মনে তখন এমন একজন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর আবির্ভাব হয় যে অনায়াসে দৈনন্দিন তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সুন্দরকেই জীবনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু হায়, তোমাদের জীবনে এই উদার সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী। তাদের সিংহাসনচ্যুত করে গদি দখল করে বদমায়েশ মতলববাজ স্বার্থপর শয়তানরা। তারাই তোমাদের সমাজ শাসন করে। তারাই হর্তাকর্তা বিধাতা।

বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল।

"সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। সুন্দর দেখলে আর জ্ঞান থাকে না। একটি মাত্র তো ঘর, একটি সুন্দরকে তো জুটিয়েছ, আমাকে বারান্দায় শুতে হচ্ছে, আবার সুন্দর সুন্দর বলে হেদিয়ে পড়ছ! রাস্তার নেড়ি কুত্তো, ও আবার সুন্দর। দূর হ মুখপোড়া—"

আবার বুড়ী ঝাঁটা তুলল।

"না, না ওকে মেরো না দিদু। আহা, আমাদের যদি আর একটু বেশী জায়গা থাকত ওটাকে ঠিক পুষতাম। কি সুন্দর দেখতে, সত্যি! দাঁড়াও ওকে কেকটা খেতে দি—"

"ওকে কেক্‌টা দিয়ে দিলে নগেন খাবে কি?"

"সে তো রোজই খায়। আজ না হয় খাবে না।"

"কাণ্ড দেখ মেয়ের।"

একটা ছোট তিন-কোণা কেক বার করে সাবি নিজে হাতে সেটি ধরলে আমার মুখে। টপ্ করে খেয়ে ফেললাম এবং কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে ল্যাজ নাড়তে লাগলাম। একটু আগেই মায়ের যে শোচনীয় মৃত্যু দেখে এসেছিলাম তা আমার লোভকে দমাতে পারলে না। যখন কেক খাচ্ছিলাম তখন সে কথা মনেও ছিল না। তুমি হাসছ নাকি? তোমাদের কীর্তিকথা কি তুমি জান না? পাছে তেড়ি নষ্ট হয়ে যায় এজন্য তোমাদের অনেকেই আজকাল মা বাবার মৃত্যুতে চুল কামাও না, অনেকেই নমো নমো করে শ্রাদ্ধ সেরে ফেল, অনেকে আবার তা-ও কর না, দাদা থাকলে দাদার উপর বা ছোট ভাই থাকলে তার উপর শ্রাদ্ধের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সেখানেও তোমাদের পাটোয়ারি বুদ্ধির খেল দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে পুরোহিত তোমাদের মৃত পিতা বা মাতার আত্মার তৃপ্তির জন্য সারাদিন উপবাসী থেকে গলদঘর্ম হয়ে মন্ত্রপাঠ করে যান তোমাদের সাধারণত চেষ্টা তাকে কি করে তাঁকে তাঁর ন্যায্য পাওনাটা থেকে বঞ্চিত করবে। তিনতলা পাকা বাড়ি, প্রকাণ্ড মোটর, গোঁফে আতর এমন লোকেরও মাতৃশ্রাদ্ধে দানের যে রকম খেলো জিনিসপত্র দেখেছি তাতে তোমাদের উপর ঘেন্না ধরে গেছে। তোমাদের সত্যি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে শ্রাদ্ধের ভড়ং করতে যাও কেন তা বুঝি না। আমার মনে হয় ভূতের ভয়ে কর। তোমাদের ভয় হয় শ্রাদ্ধ না করলে মৃতের প্রেতাত্মা যদি ঘাড়ে এসে চড়ে কিংবা অন্য কোনো অনিষ্ট করে। আসলে তোমরা অত্যন্ত কাপুরুষ এবং ভীতু। আর একদল আছেন যাঁরা শ্রাদ্ধের উপলক্ষ করে নিজেদের ঐশ্বর্যটা জাহির করতে চান লোককসমাজে। এরকমও দেখেছি যে মা মরছে ছেলে দিব্যি মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে আছে, কিন্তু সেই মা যখন মল তখন শ্রাদ্ধের কি ধূম! সত্যি বলছি, ঘেন্না ধরে গেছে তোমাদের উপর। ওকি, জিমিকে ওখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওকে দেখব বলেই তোমার গেটের সামনে কষ্ট করে বসে আছি; তোমাকে গল্প শোনাবার জন্য আমি আসিনি। আমি চললাম। ও যখন বাইরে আসবে তখন আমি আসব। ও মেয়েটি কে? তোমার নিজের লোক নাকি! ওর চেহারা চাল-চলন তো ভালো নয়। পেট-কাটা জামা আর ফিনফিনে শাড়ির নীচে গোলাপী সায়ার বাহার সাধারণত যে জাতীয় ললনাদের শ্রীবৃদ্ধি করে, তাদের তোমরা কি চোখে দেখ আজকাল্? তোমাদের রুচি তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় আচ্ছা চললুম, পরে আসব আবার—"

কুকুরটা চলিয়া গেল। দেখিলাম আমার ভাইঝি সুলীনা জিমিকে লইয়া ভিতরে যাইতেছে। এখন জিমির স্নান করিবার সময়। সুলীনা স্বহস্তে তাহাকে স্নান করায়। জিমি সুলীনারই কুকুর। নগদ আড়াই শ টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছে। নিজেই তাহার সব পরিচর্যা করে। আমার ভাই নাদুর কথা আগেই বলিয়াছি। সুলীনা তাহারই মেয়ে। আমার কাছেই মানুষ হইয়াছে। উহার মা সুন্দরী ছিল, রূপসী বলিয়া উহারও সুখ্যাতি হইয়াছে। একাধিক সিনেমা কোম্পানি উহাকে অভিনেত্রীরূপে পাইবার জন্য ব্যস্ত। উহার বাজারদর প্রায় গগনচুম্বী হইয়াছে। আমিই এখন উহার গার্জেন, সুতরাং আমার বাজারদরও এখন গগনচুম্বী। সিনেমায় নামিবার পূর্বে উহার ডাকনাম ছিল 'টেঁপি' ভাল নাম ছিল শংকরী। কিন্তু ওসব সেকেলে নাম আজকাল সিনেমায় চলে না—তাই নাম বদলাইয়া দিতে হইয়াছে। তাহার ঠাকুরমার দেওয়া নাম দুইটি আজ অবলুপ্ত হইয়াছে সত্য (ঠাকুমা নিজেই কি অবলুপ্ত হন নাই?)—কিন্তু সুলীনা নামটি আজ ভারতবিখ্যাত। সুলীনার দৌলতে

আমিও আজ পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। সকলে বলিতেছে সিনেমা-সাহিত্য-জগতে আমিই নাকি একাধারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সকলে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সব লেখা পড়ে নাই, কিন্তু আমার লেখা পড়ে নাই এমন পাঠক-পাঠিকা বিরল। আমাকে প্রণাম জানাইয়া, আশীর্বাদ জানাইয়া. প্রেম নিবেদন করিয়া এত পত্র রোজ আসে যে সে-সবের উত্তর দিবার জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিতে হইয়াছে। প্রথমে একজন এম. এ. পাস ছোকরাকে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইল। কারণ দেখিলাম সে পরশ্রীকাতর, আমার খ্যাতি ও ঐশ্বর্য তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। সর্বদা মুখটিকে ম্লান করিয়া রাখিত। একদিন খবর পাইলাম আমার সম্বন্ধে নানারকম সত্যমিথ্যা গুজবও সে রটাইয়া বেড়ায়। এবং যদিও আমার অন্নে প্রতিপালিত তবু চেষ্টা করে কি করিয়া আমাকে সে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবে। শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিদায় দিতে হইল। এখন একজন তরুণীকে রাখিয়াছি। মহিলাটি শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের কাজ শেষ করিয়া আমার বাড়িতে আসেন, আমার চিঠিপত্রের উত্তর লেখেন, এবং রাত্রি নয়টার পর প্রত্যহ আমার নূতন লেখা টোকেন। আমি আজকাল লিখি না, লিখিলে তিন মাস অন্তর একখানা করিয়া বড় নভেল লেখা যায় না, আমি আজকাল যাহা লিখি তাহা হয়তো বিদগ্ধ রসিক পাঠক-পাঠিকার মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবে, কিন্তু বহুকাল সৎসাহিত্য রচনা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে সৎসাহিত্য এদেশে বড় একটা বিক্রয় হয় না। মুষ্টিমেয় দুই-চারিজন বিদগ্ধ পাঠক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সমালোচনাতেই পঞ্চমুখ, বই কিনিবার বেলায় মুক্তহস্ত নহেন। আমার প্রথম যৌবনে যে সব ভালো বই লিখিয়াছিলাম, যাহা অনেক সাহিত্যরসিকের অনেক প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, সে বই কিন্তু বিক্রয় হয় নাই। সম্ভবত তাহারা এখনও প্রকাশকের দোকানে বা দপ্তরীর বাড়িতে পোকার ভোগ্য হইয়া তাহাদের জীর্ণ জীবন যাপন করিতেছে। ভালো বইয়ের বাজারে চাহিদা নাই। অনেক ধনী অবশ্য রবীন্দ্র রচনাবলী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থকারদের পুস্তক-সংগ্রহ আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবার জন্য কেনেন, কিন্তু পড়েন কি না সন্দেহ। বই কিনিয়া সাজাইয়া রাখাও আজকাল কেতাদুরস্ত ফ্যাশনেব্‌ল সমাজের একটা ঢং মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক নহে। উক্ত গ্রন্থকারদের জীবনী পাঠ করিয়া দেখি জীবদ্দশায় তাঁহাদের বই মোটেই ভালো বিক্রয় হয় নাই। তাঁহাদের সময় সিনেমা-সাহিত্যের প্রলোভন ছিল না, থাকিলে অনেকেই হয়তো এই ফাঁদে পা দিতেন। আমিও এ ফাঁদে পা দিতাম না, আমার দিবার কল্পনাও ছিল না, কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল।

একদিন এক জাঁদরেল সিনেমা ডিরেকটার আমার অতিসাধারণ একটা ছোটগল্প লইয়া আমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সমুপস্থিত হইলেন বলিলে আরও ভালো হয়। বলিলেন, আপনার এই গল্পটি আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কিনিতে চাই। গল্পটিতে খুব ভালো একটি ছবি হইবে। আমার তখন একটু টানাটানি চলিতে ছিল অভাবিতরূপে সহসা হাতে স্বর্গ পাইয়া কেমন যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। ঠিক সেই সময় টেঁপি আমাকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। টেঁপি তখন সুলীনা হয় নাই। টেঁপিকে বলিলাম, "এঁকেও এক পেয়ালা এনে দাও।" টেঁপি ভিতরে চলিয়া যাইবার পর ডিরেকটার মহাশয় ঈষৎ কাশিয়া আর একটি যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমার প্লীহা প্রায় স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। বলিলেন, "এটি আপনার কে হয়?"

"ভাইঝি।"

"আমার আর একটি প্রস্তাবও আছে। কিছু মনে করবেন না তো? আপনার গল্পের নায়িকার পার্টে আপনার ভাইঝিকে চমৎকার মানাবে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একে সেই পার্টে নামাতে পারি। দেখবেন একেবারে হৈ হৈ পড়ে যাবে। পুরোনো মুখ দেখে দেখে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!"

আমি আমার কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারিতেছিলাম না।

"ও ছেলেমানুষ, ও কি অভিনয় করতে পারবে?"

"অভিনয় শিখিয়ে নেব। চেহারাটাই আসল। নিউ ফাউন্ডের জন্যে আমাদের প্রডিউসার দশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজী আছেন। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সে টাকাটাও আমি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি।"

দশ হাজার টাকা! কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। যে টেঁপি আমার বাড়িতে চাকরানীর মতো খাটিতেছে, ঘর-মোছা, বাসন-মাজা, ফাইফরমাশ খাটাই যাহার নিত্য কাজ, আমার মেয়েদের ছোট-জামা এবং পুরাতন কাপড়ই যাহার অঙ্গভূষণ, সেই টেঁপির জন্য এই ডিরেকটার এক কথায় দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত! টেঁপির মা-বাবা দুইজনেই বহুপূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি খবর পাইয়াছি তাহাদের মৃত্যুও হইয়াছে। একজনের হাসপাতালে, আর একজনের উদ্বন্ধনে। সুতরাং আমিই টেঁপির একমাত্র অভিভাবক। টেঁপির বয়স ছিল তখন মাত্রা ষোল বৎসর, অর্থাৎ তখনও সে সাবালিকা হয় নাই। আমি আপত্তি করিলে সে সিনেমায় নামিতে পারিত না। কিন্তু আমি আপত্তি করিতে পারি নাই। আমি জানিতাম যে সিনেমার পথ অতিশয় পিচ্ছিল, যে কোনও মুহূর্তে পদস্খলন হইতে পারে, আমি জানিতাম যে ভদ্রঘরের মেয়েরা সিনেমায় নামে না, যাহারা নামে তাহারা ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হয়—তখন তাহাই হইত, কিন্তু তবু সিনেমা পরিচালকের ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই, বলিতে পারি নাই তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমাদের মতো উচ্চবংশের মেয়েকে তুমি অভিনেত্রী বানাইতে চাও! না, একথা বলিতে পারি নাই। বরং সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, প্রস্তাবটা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। ওই সামান্য টেঁপির জন্য দশ হাজার টাকা! সত্যই মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল সেদিন। আজকাল আর সেদিন নাই। এখন এরকম প্রস্তাব আসিলে আর মাথা ঘুরিবে না। এখন একজন প্রতিভাময়ী সুন্দরীর পারিশ্রমিক খুব কম হইলেও কুড়ি হাজার টাকা। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও আজকাল সিনেমায় নামিয়া নিজেদের কুল পবিত্র করিতেছে, সুতরাং এখন আর আমার লজ্জা বা সংকোচেরও কারণ নাই। তখন কিন্তু হইয়াছিল। তখন টাকার লোভেই কেবল রাজী হইয়াছিলাম। এখন সুলীনারই জয়-জয়কার। নিজের বিবেককেও আর দায়ী করি না। কারণ ইহা পরে জানিয়াছি টেঁপিই পূর্বে উক্ত পরিচালকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া যোগযোগটা স্থাপন করিয়াছিল। ইহাও এখন আর আমার অবিদিত নাই যে, সেদিন টেঁপিই আসল লক্ষ্য ছিল এবং আমার গল্পটা যদি তিনি কেনেন তাহা হইলে আমি নাকি তাহার সিনেমা-পথে বাধা সৃষ্টি করিব না। এ খবরটা জানিবার পর অনুভব করিয়াছিলাম যে তখন টেঁপির বয়স যদিও ষোল বৎসর মাত্র ছিল কিন্তু তাহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রবীণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো। ওই বয়সেই সে আমার মনের ঠিক মাপটা ধরিতে পারিয়াছিল। আমি যে একজন সুবিধাবাদী মাত্র, টাকার টোপ ফেলিয়া আমাকে

যে অনায়াসে গাঁথা যায়, এ কথাটা সে ওই বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আমি আগেই বলিয়াছি সত্যই আমি সুবিধাবাদী। এ যুগে সুবিধাবাদী না হইয়া উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি সৎপথে থাকিলে বাঁচা যায় না, হয়তো কোনোক্রমে কৃমি বা কীটের ন্যায় বাঁচা যায় কিন্তু ভদ্র সামাজিক মানুষের মতো মাথা উঁচু করিয়া বাঁচা যায় না। যাহার ঐশ্বর্য নাই, যশ নাই, প্রতিপত্তি নাই তাহাদের দিকে আমরা ফিরিয়াও চাই না। কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে লোকে আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাক, আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হোক। কিন্তু এ যুগে টাকা না থাকিলে সহজে কাহারও দৃষ্টি কাহারও উপর পড়ে না! তাই আমি টাকা রোজগারের দিকেই নজর দিয়াছি। সুলীনা এখন আমাকে হাজার হাজার টাকা আনিয়া দিতেছে। শুধু তাহাই নহে, সিনেমার বাজারে —সম্ভবত সুলীনার দৌলতেই—আমার গল্পও খুব চালু হইয়াছে। বর্তমানে আমি নিম্নলিখিত প্রকার ছাঁচে গল্প লিখিয়া খুব কৃতকার্য হইতেছি। শুধু সিনেমায় নয়, বাজারেও বই বেশ কাটিতেছে। সাধারণত ত্রিভুজোপম প্রেমের গল্পই বেশী জনপ্রিয় হয়। গল্পে প্রেম থাকা চাই, সে প্রেমে বাধাও থাকা চাই, প্রেমটা সমাজবিরোধী হইলে আরো ভালো হয়। ধনীর সন্তানের সঙ্গে গরীব মেয়ের প্রেম, অথবা ইহার বিপরীতটা, ধনীর দুহিতার সঙ্গে গরীবের ছেলের প্রেম সাধারণত বেশ জমে যদি মাঝখানে একটা অনমনীয় পিতা বা দুর্ধর্ষ অসভ্য গোছের দ্বিতীয় প্রেমিক থাকে। এই দ্বিতীয় প্রেমিকটাকে ঠিক প্রেমিক করিলে চলিবে না, তাহাকে লম্পট কামুক করিতে হইবে। তাহার পর নানাভাবে ঝটাপটি মারপিট করিয়া অশ্বযোগে, মোটরযোগে বা ছুটিতে ছুটিতে গিরিদরি বনবাদাড় মাঠ পার হইয়া, ছুরি ছোরা গুলিবন্দুক চালাইয়া, যেখানে সেখানে সঙ্গীত সমন্বিত অশ্রু-বর্ষণ করিয়া প্রেমটিকে শেষে এমন স্থানে আনিতে হইবে যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন অনিবার্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন অনিবার্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন না করিলে বই চলে না। আমাদের দেশের মেয়েরা এবং মেয়েলী ছেলেরা উহাই চায়। মেয়েদের কল্যাণেই আমাদের সাহিত্য এবং সিনেমা টিকিয়া আছে। মেয়েদের খুশী রাখিতে হইবে। এমন কিছু লিখিলে চলিবে না, যাহাতে মেয়েদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাহারা প্রেম করুক ক্ষতি নাই, যথেচ্ছ প্রেম করুক, কিন্তু সে প্রেমকে এমন ভাবে আঁকিতে হইবে যে মনে হইবে সুন্দরী নায়িকাটি নায়কের সহিত গোপনে দেওয়াল ডিঙাইয়া পলায়ন না করিলেই বুঝি মনুষ্যত্বের শাশ্বত আদর্শ চুরমার হইয়া গেল। ওইখানেই লিখিবার কায়দা। নায়িকা যাহাই করুক তাহাই পবিত্র, মহৎ এবং আদর্শমূলক মনে হওয়া চাই। এই টেকনিকে বই লিখিয়া আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছি। আর একটি টেকনিকও আছে, সেটাও মন্দ নয়। গল্পটা যতদূর সম্ভব অশ্লীল করিয়া শেষে নায়ক বা নায়িকার মুখে ও হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের বুলি সাজাইয়া দেওয়া। কারণ আধুনিক সভ্য মানুষ অশ্লীলতাও চায়, আমার সত্য-শিব-সুন্দরকেও চায়। এই দুই বস্তুকে পান্চ করিয়া পরিবেশন করিতে পারিলে চমৎকার রস জমে! এই টেকনিকে লিখিয়া আমার গোটাকতক বই তো বাজারে খুব নাম করিয়াছে। সেদিন একজন পাঠক বলিতেছিলেন, আপনিই এ যুগের সাহিত্য প্রধানমন্ত্রী, সম্রাটই বলিতাম কিন্তু সম্রাটের যুগ তো চলিয়া গিয়াছে। এই ধরনের আরও অনেক কথা তিনি সেদিন বলিলেন। এমন কি, ইহাও বলিতে ছাড়িলেন না যে, আমার বইগুলি অনুবাদ করিয়া নোবেল-প্রাইজ প্রতিযোগিতায় পাঠান উচিত। তাঁহার বিশ্বাস নোবেল-প্রাইজ আমাকে বরণ করিয়া ধন্য হইবে। গোঁফে আলতো-

আলতো ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার চাটুবাক্যগুলি সেদিন স্মিতমুখে উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু শেষে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে সবই যেন বেসুরো হইয়া গেল। বলিলেন, 'আপনারা এক সেট বই যদি অটোগ্রাফ করে আমাকে দেন তাহলে—'। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করি নাই, কিন্তু সবই বেসুরো হইয়া গেল। বর্তমানে আমার জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি। সকলেই আমার কাছে আসে স্বার্থের জন্য। যাহারা আমার প্রশংসা করে তাহাদেরও ওই একটিমাত্র উদ্দেশ্য—আমার নিকট হইতে কিছু বাগাইয়া লওয়া। যাহারা বাগাইতে পারে না, তাহারা নিন্দায় ফাটিয়া পড়ে। আমাকে ঘিরিয়া যে সব স্তুতিনিন্দা আবর্তিত হয় তাহার ওই একটি কেন্দ্র—স্বার্থ। নিন্দার আর একটা কেন্দ্রও আছে, সেটা ঈর্ষা, অহেতুকী ঈর্ষা। অহেতুকী প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়াছি কিন্তু জীবনে তাহা কখনও অনুভব করি নাই। অহেতুকী ঈর্ষার দৃষ্টান্ত রোজই দেখিতেছি। আমি আজকাল অনেক টাকা রোজগাব করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমার টাকা দুই হাতে খরচ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আমার নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে আমার বাড়ি ঠাসা। আমার ছেলে একটা চামারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমাদের ছাড়িয়ে গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাকে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠাইতে হয়। সে এবং তাহার স্ত্রী দুইজনেই রোজগার করে—আজকাল সকলেই বলে স্ত্রীদের রোজগার না করিলে সংসার চলে না—কিন্তু আমি দেখিতেছি রোজগার করা সত্ত্বেও চলিতেছে না। আমি তাহাকে মাসে দুইশত করিয়া টাকা দিই, আমার স্ত্রীর মনোকষ্ট নিবারণের জন্যই টাকাটা দিতে হয়, কিন্তু শুনিতেছি ইহাতেও তাহাদের টানাটানি ঘুচিতেছে না। তাহাদের আরও টাকা দিতে হইবে। আরও, আরও, আরও—ইহার আর শেষ নাই। তাহাদের আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিতে বলিয়াছিলাম, চামার বউকে ঘরে লইতে গৃহিণীর প্রথমটা সংকোচ ছিল, কিন্তু পুত্রস্নেহের প্রাবল্যে এখন সে সংকোচও ভাসিয়া গিয়াছে, তিনি এখন উহাদের ঘরে লইতে রাজী আছেন, বউ কিন্তু রাজী নয়। সে নাকি বলিয়াছে চামারেরও একটা আভিজাত্য আছে, সে আভিজাত্য কৃপা এবং অনুকম্পার আবহাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হয়, সুতরাং সে আমাদের কাছে আসিবে না। অনাহারে অর্ধাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তবু আসিবে না। কোনও ভদ্রলোক চাহে না যে তাহার পুত্রবধূ অনাহারে অর্ধাহারে প্রাণত্যাগ করুক, সুতরাং টাকা পাঠাইতে হয়। আশ্চর্য কাণ্ড, মনি-অর্ডার বা চেক কোনোদিন ফেরত আসে না। টাকা লইলে চামারের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। বড় মেয়েটাও আমার গলগ্রহ হইয়াছে। বিবাহের কিছুদিন পরেই পাগল হইয়া গিয়াছে সে। জামাই আবার বিবাহ করিয়াছে। মেয়েকে পাগলাগারদে রখিয়াছি। তাহার ব্যয়ভারও আমাকে বহন করিতে হয়। দ্বিতীয় কন্যাকে বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ দিতে পারি নাই। আমাদের সমাজে টাকা না থাকিলে ভালো বিবাহ হয় না। আমার তখন টাকা ছিল না; রত্নাকে সামান্য একটি কেরানীর হাতে দিয়াছিলাম। তাহার একঘর ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। প্রতিবছরই একটা করিয়া হয়, মাঝে দুইবার যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। আমার জামাইটি বেশ বিনয়ী ভদ্রলোক। মুখে কথা নাই। সামনে যতক্ষণ থাকে মুখে মৃদু হাসি ফুটাইয়া চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে নীরবে হাত কচলায় খালি। তাহাকেও মাসে মাসে সাহায্য করিতে হয়, মেয়ের নামে প্রতিমাসে কিছু পাঠাইয়া দিই। ছোট মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। সে সোসাইটি গার্ল। সুলীনার এবং আমার খ্যাতির হাওয়ায় সে প্রজাপতির মতো উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। সে যে কাহাকে বিবাহ করিবে, তাহা আমি জানি না, সে নিজেও

বোধহয় জানে না। একপাল নানা আকারের ছোঁড়া তাহার পিছু-পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিরুপায় হইয়া এই দৃশ্যটাই কেবল দেখি। তাহার হোটেলের এবং পিকনিকের খরচ এবং নিত্যনতুন শাড়ি পোশাকের ব্যয়ভারও আমাকেই বহন করিতে হয়। না করিয়া উপায় নাই। যে সমাজের স্রোতে আমি গা ভাসাইয়াছি সে সমাজে কেহ কাহারও মুখে লাগাম লাগাইতে পারে না। সে সমাজে স্বেচ্ছাচারী হওয়াই নিয়ম। মালিকার (আমার ছোট মেয়ে) সম্বন্ধে আমি একটু রাশ টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার গৃহিণীই তাহাতে বাধা দিলেন। বলিলেন, "তোমার বড় ছেলে যেদিন কুলে কালি দিয়ে চামারের মেয়েকে বিয়ে করে এল, সেই দিনই বুঝেছি আমাদের দেশের গোঁড়া ঘরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চুকে গেল। তারা কেউ জাত খুইয়ে আর আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবে না। না-ই করুক, আজকাল গোঁড়া ঘরের ভদ্রলোকদের যা অবস্থা, সেখানে তোমার মেয়ে গিয়ে কি টিকতে পারবে? ওই তো রতির (রত্না, আমার মেজ মেয়ে) বিয়ে দিয়েছ গোঁড়া ভদ্রপরিবারে, হাড়ির দুর্গতি হয়েছে তার। রিকশ চড়বারও পয়সা জোটে না। মনোর (মনোরমা, আমার বড় মেয়ে) বিয়েও বিরাট বড় ধনী একান্নবর্তী পরিবারে দিয়েছিলে, বিয়ের সময় লাখপতি, কোটিপতি অনেক কথা শুনেছিলুম—এখন পাগলা গারদের খরচ আমাদেরই যোগাতে হচ্ছে। ঝাঁটা মারি অমন সব ভদ্র গোঁড়া একান্নবর্তী পরিবারের মুখে। মালি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করুক। ওকে তুমি কিছু বোলো না। নিজের বর নিজেই পছন্দ করুক। যা দেখছি, সমাজে সবাই ডোম মুচি চামার। গলায় পৈতে থাকলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? ঘেন্না ধরে গেছে আমার। ওরা নিজেদের চরকায় নিজেরাই তেল দিতে পারবে, আমাদের চেয়ে ভালো করেই পারবে, ওদের কিছু বোলো না।"

প্রবল বানে ভাসিয়া গিয়া কেহ ভাগাড়ে আশ্রয় পাইলেও সেইখানেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। আমার গৃহিণীরও সেই অবস্থা। কিন্তু আমি জানি গৃহিণী মুখে যদিও ওই সব কথা বলেন, কিন্তু ওটা মুখের কথা মাত্র। তথাকথিত সভ্যতার টানে আমরা যেখানে ভাসিয়া আসিয়াছি সে জায়গাটা তাঁহার মতে ভাগাড়ই, কিন্তু সে কথা বলিতে তাঁহার মাথা কাটা যায়, আত্মসম্মানে বাধে। তাই তিনি বারবার চীৎকার করিয়া বলেন—এই ভালো, এই ভালো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। যে গৃহিণীকে আমি লুকাইয়া কাপড় গহনা কিনিয়া দিয়া অসীম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম, যে গৃহিণী আমার স্কুলের ভাত দিবার জন্য খুব ভোরে উঠিয়া আমাকে পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিয়া আমার সামনে পাখা হাতে বসিতেন, যে গৃহিণীকে নির্জন ঘরে পাইবার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, যাহার সামান্য সুখে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না, যাহার সামান্য অসুখে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতাম—আমার সে গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার স্থানে যে মেদবহুলা বিভীষিকা আমার গৃহে রাজত্ব করিতেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি। এখন তিনি আমার ঐশ্বর্যের পাহারাদার, আমার খ্যাতির অংশীদার এবং আমার চরিত্রের সদা-সন্দিহান অভিভাবক। আমার কাছে অনেক যুবতী মেয়ে আসে, অনেক যুবতী মেয়ে চিঠি লেখে, ভদ্রতার খাতিরেই অনেকের সঙ্গে হাসিয়া শিষ্টালাপ করিতে হয়, আমার গৃহিণী এসব মোটেই পছন্দ করেন না। আমার স্ত্রী ছাড়া আমার আর একটি গার্জেন জুটিয়াছেন, তিনি আমার মামা। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছি। আসিয়াই তিনি আমার গার্জেন পদে আসীন হইয়াছেন এবং আমার সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহার বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি

এখনও বেশ তীক্ষ্ণ, দাঁতও পড়ে নাই, কিছু দাঁত ক্ষইয়া গিয়াছে কিন্তু অটুট আছে। চুল, ভুরু পাকিয়াছে অবশ্য। কিন্তু মুখে জরার চিহ্ন প্রকট নয়। কেবল চোখের কোণে সামান্য কুঞ্চন দেখা যায় মাত্র। রোজ গোঁফ দাড়ি কামান। সরু লম্বা গোছের মুখ, চোখের তারা ঈষৎ কটা। নাকটি শুকচঞ্চুর মতো। তাঁহাকে দেখিলে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কোনো ধূর্ত প্রৌঢ় বুঝি মাথায় শাদা পরচুলা পরিয়া ছদ্মবেশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পৃথিবীর হালচাল নিরীক্ষণ করিতেছেন। খুব কম কথা বলেন। কিন্তু যেটি বলেন সেটিই মতলবপূর্ণ। প্রথমে আসিয়াই একটি প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি একটি চৈনিক ভদ্রলোকের বিষয়ে। তিনি নাকি একশত কুড়ি বৎসর বয়স অবধি বাঁচিয়া আছেন। এখনও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট আছে, মনে হয় এখনও বেশ কিছুদিন বাঁচিবেন। জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল যে তিনি কি খাইয়া এমন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলেন প্রথম জীবনে যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। পঞ্চাশের পর দশ বৎসর নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু ঈষৎ দুর্বলতা বোধ করাতে আবার মাংস ধরিয়াছেন এবং আর ছাড়েন নাই। মাংস খাইয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। দেখিলাম এই অংশটুকু মামা লাল কালি দিয়া দাগ দিয়াছেন। আমি খবরের কাগজটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি বলিলেন, "দেখলে তো। তোমার বাড়িতে মাংস তো রোজই হয়। কিন্তু বউমার কেমন একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বুড়ো মানুষের মাংস খাওয়া অনুচিত। তাই তিনি নিজেও খান না, আমাকেও খেতে দেন না। তিনি নিজে তো হবিষ্যান্ন খান, কেবল মাত্র সধবার নিয়মরক্ষের জন্য সামান্য একটু মাছ ভেঙে মুখে তোলেন। কিন্তু এরকম ভাবে মাছ-মাংস থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাটা কি ঠিক? ওই চীনে ভদ্রলোক যা বলেছেন তা তো নিজের চোখেই দেখলে। বউমার চেহারাটা দেখতেই মোটা, কিন্তু ও স্বাস্থ্যের পুষ্টি নয়, ও থসথসে মোটা। সুনীলার চেহারাটা বেশ টাইট আছে। থাকবে না? রোজ মাংস খায় কত?"

মামা সুশীলাকে সুনীলা বলেন।

"তুমি বাবা বউমার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু দৃষ্টি রেখ। এটা তোমার কর্তব্য—"

"আপনার বউমা আমার কথা শুনবে না। তবে আপনি যাতে মাংস রোজ পান সে ব্যবস্থা করে দেব।"

মামার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং গলার ভিতর হইতে খিঁচ্ খিঁচ্ খিঁচ্ খিঁচ্ শব্দ হইতে লাগিল। মামা যখন হাসেন তখন তৈলবিহীন চলন্ত সাইকেল-চাকা-নিঃসৃত শব্দের মতো একটা শব্দ তিনি কণ্ঠ হইতে বাহির করেন। এ শব্দটাও প্রায়ই শোনা যায় না, যখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হন তখনই এটা শোনা যায়। মামার আর একটা কথা মনে পড়িল। একদিন মামা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যোগেন, তুমি কি করছ জান?"

প্রশ্নটার তাৎপর্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। বলিলাম, "কি?"

"তুমি ফুটো কলসীতে হাঁই হাঁই করে জল ভরে যাচ্ছ। তোমার কলসী শতছিদ্র। যত জলই ভর না কেন এক ফোঁটা জলও সঞ্চয় করতে পারবে না।"

এই হেঁয়ালিপূর্ণ রূপক শুনিয়া তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম না, তিনি ঠিক কি বলিতে চাহিতেছেন। পরমুহূর্তেই কথাটা তিনি খুলিয়া বলিলেন, "তোমার বোনেদের আবার এখানে জুটিয়েছ কেন। সুশীলার না হয় অবস্থা খারাপ; তার ছেলেমেয়েদের তুমি

পড়াচ্ছ সেটা ভালই করছ। কিন্তু ক্যাত্যায়নী আর দুর্গার গুষ্টি এখানে এসে আসর জমিয়েছে তার কোনও মানে হয়? ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, কিন্তু ভাত ছড়াবে কেন তুমি শুধু শুধু?"

আমি যে উত্তর সকলকে দিই, মামাকেও তাহাই দিলাম।

বলিলাম, "মামা, আমার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করেও আনিনি, কাউকে দূর করে তাড়িয়ে দিতেও পারব না। ওদের ভাগ্যে ওরা খাচ্ছে পরছে, আমি নিমিত্ত মাত্র!"

মামা তাঁহার সেই হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, "খুব উচ্চাঙ্গের দার্শনিক কথা বললে বটে, কিন্তু আমি জানি ওটা তোমার মনের কথা নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখেছ কোনোদিন? তোমার চোখ কোটরে ঢুকেছে, সোনার মতো গায়ের রং কালিবর্ণ হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে পুড়ছ তুমি; খরচ কমাও, খরচ কমাও। বুড়ো মানুষের কথাটি শোন—"

আমার মামা পূজনীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিবার স্পর্ধা আমার নাই, তবু একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমার গায়ের রং কোনও দিনই গৌরবর্ণ ছিল না। আমাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও বলা চলে না। সত্যই আমার গায়ের রং বেশ কালো। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, মামার ধারণা অন্যরূপ। আমার আর একদিনের আর একটা কথাও মনে পড়িতেছে। সেদিন অনেকগুলি মেয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে মামা প্রশ্ন করিলেন—"ওরা কে জান?"

"জানি বই কি। কয়েকজন সুলীনার বান্ধবী, আর বাকী কজন আমার লেখার ভক্ত। ওরা এসেছিল—"

মামা আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আহা, ওসব পরিচয় ওদের আসল পরিচয় নয়। ওদের আসল পরিচয় কি তোমার জানা নেই?"

"আসল পরিচয়?"

"হ্যাঁ, আসল পরিচয়। ভুলে গেছ দেখছি। ওদের আসল পরিচয় ওরা প্রত্যেকেই একটি ঘিয়ের ভাঁড়। কেউ গাওয়া ঘি, কেউ ভঁয়সা ঘি, ভেজিটেবল ঘিও থাকতে পারে দু'একজন, কিন্তু সবাই ঘি আর তুমি আগুন। তোমার বয়স হয়েছে, যৌবনের আগুন হয়তো নিস্তেজ হয়েছে খানিকটা। কিন্তু তার বদলে এসেছে পয়সার আগুন। অতি ভয়ংকর আগুন এটা। সুতরাং ঘিয়ের কাছ থেকে সাবধান থেকো!"

মামার কটা চোখ দুটিতে ভর্ৎসনার সহিত চাপা হাসি ঝিকমিক করিতে লাগিল। কোনও মামার পক্ষে ভাগ্নেকে এসব কথা বলা সমীচীন কি না তাহা আপনারা প্রণিধান করুন, আমি কিন্তু একটা কথা জানি। মামা যে আমার হিতৈষী এই কথাটা তিনি সুযোগ পাইলেই নানা ছুতায় আমার কাছে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পান। সেজন্য আমি তাঁহার এসব কথায় তেমন কিছু মনে করি না।

আমার নিজের কথা এতক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। সুলীনা আসিতেছে। খাতাটা মুড়িয়া রাখিতে হইল। তাহার সহিত যে কথাবার্তা হইবে তাহা পরে টুকিয়া লইব।

সুলীনা বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে ভালবাসে। দেশী বিদেশী বাঙালী পাঞ্জাবী কাশ্মিরী রাজস্থানী সব দেশের পোশাকের বিচিত্র সমন্বয় করাও তাহার প্রতিভার একটা লক্ষণ—অন্তত তাহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহাই বলেন। সে যা পরে তাহাই তাহাকে মানায়, কারণ সে যুবতী এবং সুন্দরী। আমার মাঝে মাঝে বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু আমি সে কথা তাহাকে বলি না। বলিতে ভয় পাই। সে আজকাল মাসে গড়পড়তা চার পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করে, নিজের হাতখরচের জন্য হাজারখানেক টাকা রাখিয়া বাকিটা সে আমার হাতেই দেয়। তাহার আয়ের তুলনায় আমার আয় যৎসামান্য, মাসে হাজার টাকাও সব সময়ে হয় না। বস্তুত সুলীনার উপার্জনেই আমার এই ঠাটবাট বজায় আছে এবং এই চোখ-ধাঁধানো ঠাটবাটকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমিও টিকিয়া আছি। সুতরাং তাহার পোশাকের সমালোচনা করিয়া তাহার মনে আঘাত দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সুলীনা আমার নিকট যখন আসিল তখন তাহার পরনে আঁট প্যান্টালুন এবং কোমরকাটা ব্লাউস। ব্লাউসের উপর একটি সুদৃশ্য দোপাট্টা। সুলীনা তাহার একটি হাত পিছনের দিকে রাখিয়াছিল। মনে হইল গোপনে কি যেন লইয়া আসিয়াছে।

"জেঠুমণি তুমি চোখ বোজ। আমি আসছি।"

"আয় না, চোখ বুজব কেন।"

সুলীনা ঈষৎ নাকী সুরে আবদার করিয়া বলিল, "না, তুমি চোখ বোজ লক্ষ্মীটি—"

চোখ বুজিলাম। সুলীনা আসিয়া আমার চেয়ারের হাতলটার উপর বসিল।

"এইবার হাঁ কর।"

হাঁ করিলাম। সুলীনা আমার মুখের ভিতর কি যেন একটা ঢুকাইয়া দিল।

"এবার চিবোও। কি বল দেখি—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু চমৎকার খেতে। ডিম আছে মনে হচ্ছে? ওমলেট?"

বস্তুটা যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কলকণ্ঠের হাসি শুনিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই ভুল বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুলীনা হাসিয়া উঠিল, মনে হইল একটা কাচের বাসন যেন তাল ছন্দ বজায় রাখিয়া ভাঙিয়া গেল।

"জেঠু তুমি যে কি! এই তো কয়েকদিন আগে তোমাকে খাওয়ালাম স্যাণ্ডুইচ, স্যাণ্ডুইচ, নিজে হাতে আজ তৈরি করেছি। ডিম অবশ্য আছে ওতে। ঠিকই ধরেছ---"

"হঠাৎ স্যাণ্ডুইচ করতে গেলে যে নিজে হাতে?"

"আজ রমেনের জন্মদিন যে। তাকে নেমন্তন্ন করেছি। গাড়ি নিয়ে একবার বেরুব এখন। কিছু ফাউল কাটলেট আর কিছু চিংড়ির কাটলেট নিয়ে আসব। রমেন খুব ভালবাসে—কিছু পীচ, পীয়র আর ম্যাঙ্গোস্টীনও আনব।"

"তা তোমার যাবার দরকার কি। ড্রাইভার গিয়েই তো আনতে পারে।"

"না ও ঠিক পারবে না। আমাকে যেতে হবে।"

বুঝিলাম এই সূত্রে বাহিরে গিয়া সে রমেনের সহিত যোগাযোগ করিবে। বুঝিলাম, কিন্তু মানা করিতে পারিলাম না। তাহার নিজের দামী গাড়ি আছে, নিজেই চালায়। কাহারও তোয়াক্কা করে না।

"কুকুরটাকে কোথা রেখে এলি?"

"চান করিয়ে ভিতরের বারান্দায় বেঁধে দিয়েছি।"

"বাইরের বারান্দায় বেঁধে দে—"

"কেন—"

"এমনি। বারান্দায় বেঁধে রাখলে বেশ চমৎকার মানায়।"

"বেশ, তাই বেঁধে দিচ্ছি। আমি এখন উঠি তাহলে। ফুলও কিনতে হবে। যদি পাই তোমার জন্যে পদ্মও কিনে আনব কিছু।"

সুলীনা আমার দুই গালে হাত দিয়া এমন ভাবে আদর করিল, যেন আমি একটা ছোট শিশু। তাহার পর ভিতরে চলিয়া গেল। আমি রমেনের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। রমেন খুব ভালো ছেলে। অমন ভালো ছেলে প্রায় দেখা যায় না। নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বের শিখরে আরোহণ করিয়াছে। গরীবের ছেলে আপনজন কেহ নাই, প্রাইভেট ট্যুশনি করিয়া বরাবর পড়িয়াছে এবং বরাবর পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন চাকরি করে। চাকরি ভালো, ভবিষ্যতে হয়তো উন্নতি করিবে। কিন্তু এখন বেতন পায় সামান্য, মাত্র দুইশত টাকা, ইহাতে তাহার নিজের কোনোরকমে চলিয়া যায়। সুলীনার সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল পত্রযোগে। সুলীনারও অনেক চিঠি আসে রোজ। অধিকাংশ চিঠিই স্তব-স্তুতিতে ভরা। সুলীনা গর্বভরে তাহার সব চিঠিই আমাকে দেখাইত। একদিন সুলীনা আসিয়া বলিল, "দেখ জেঠু এই অসভ্য লোকটা কি বিশ্রী চিঠি লিখেছে।" সেইটি রমেনের প্রথম পত্র। রমেন লিখিয়াছিল, শ্রীমতী সুলীনা দেবী, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার চেহারা ভালো। আপনার এই চেহারাকে যদি সু-অভিনয়ের কাজে লাগাইতে পারিতেন তাহা হইলে সিনেমা-জগতে আপনি একটা স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি আপনার সেদিকে মন নাই। আপনার অভিনয়ে ন্যাকামি এবং নিতান্ত অকারণে দৈহিক যৌবন-সম্ভার প্রদর্শন করিবার অশোভন প্রবণতা এত বেশী যে মাঝে মাঝে তাহা শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। আপনাকে ভালো লাগিয়াছে বলিয়া এবং আপনার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া এই রূঢ় কথাগুলি কর্তব্যবোধে লিখিলাম। যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবেন।

রমেনের এই ছোট চিঠিটা এতো ভালো লাগিয়াছিল এবং এতবার সেটি পড়িয়াছিলাম যে আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। সুলীনার সম্বন্ধে অমন সত্য কথা আর কেহ লেখে নাই। সত্যকথা সর্বদা অপ্রিয় হয় না, কিন্তু যখন হয় তখন তাহা কুইনিনকেও হার মানায়। মনে পড়িতেছে সুলীনার মুখটা।

"কি বিশ্রী চিঠি লিখেছে দেখেছ। সত্যি আমি ওই রকম করি নাকি জেঠু?"

বলিলাম, "আরে না না। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কিনা খায়। সবাইয়ের কথা কি শুনতে আছে? আমার কাছে মাঝে মাঝে কি রকম খারাপ চিঠি আসে দেখিস নি? ওসব অগ্রাহ্য করতে হয়।"

সুলীনা কয়েক মুহূর্ত ছলছল চোখে ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়া ফেলিল। হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া আমার কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া বলিল, 'ও যা লিখেছে সবই সত্যি। আমি ওই রকমই করি। কিন্তু কি করব, ডিরেকটার যে আমাকে ওই রকম করতে বলে—"

আমি কি আর বলিব, আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম।

রমেনের সঙ্গে আলাপের এই প্রথম ধাপ। এর পর অনেক ধাপ অতিক্রম করিয়াছে

তাহারা। এখন ভাবভঙ্গী হইতে মনে হয় রমেন সুলীনার প্রণয়ী। মুখে সে প্রণয় প্রকাশ করিয়াছে কি না জানি না, তাহার ব্যবহারে সংযম ও সুরুচির যে সুষ্ঠু প্রকাশ দেখি তাহাতে মনে হয় না বর্তমান যুগের প্রগল্‌ভ যুবকদের মতো সে অসার বাক্যের ফুলঝুরি কাটিয়া সুলীনার সম্ভ্রমকে বিব্রত করিয়াছে। সন্দেহ হয় মুখে হয়তো সে কিছুই বলে নাই। সুলীনার অনেক প্রণয়ী, অধিকাংশই ধনীর সন্তান, তাহারা যখন তখন দামী দামী গাড়ি চড়িয়া আমাদের বাড়িতে আসে এবং খানিকক্ষণ সুলীনার সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া চলিয়া যায়। রমেন কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে কখনও আসে না। সুলীনা নিজেই অনেক সময় তাহার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়াছে, ছুটির দিনে অনেক সময় তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে। তাহারা পরস্পর কি আলাপ করে জানি না। সুলীনা তাহার অন্যান্য বন্ধুদের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে আমার সহিত আলাপ করে। কিন্তু রমেনের কথা বড় একটা বলে না। যতটুকু বলে তাহা সশ্রদ্ধ ও সম্ভ্রমপূর্ণ। তাই মনে হয় সুলীনাও রমেনকে ভালবাসিয়াছে। প্রকৃত ভালবাসা প্রথমে ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা হয় শুনিয়াছি। কি যে হইবে, ভয়ে ভয়ে আছি।

সুলীনা বাহির হইয়া আসিল। ইরানীর বেশে সাজিয়া আসিয়াছে। নানাবর্ণের অপরূপ সমন্বয়ে মহিমময়ী হইয়া উঠিয়াছে যেন। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। আজ এত সাজের ঘটা কেন?

"জেঠু আমি চললুম। জিমি এখানে বাঁধা রইল—"

দেখিলাম একটা টিফিন বাক্স লইয়া বেয়ারাটা পিছু পিছু আসিল।

"ওটা আমার গাড়িতে তুলে দে—"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওতে কি নিয়ে যাচ্ছিস?"

"রমেন যদি না আসতে চায়, ওইখানেই খাইয়ে দেব তাকে। যা ছেলে হয়তো বলবে সময় নেই।"

সুলীনা যখন বাহিরে যায় তখন একটা পুরাতন গাড়িতে পর্দাবৃত হইয়া যাওয়া পছন্দ করে। তাহা না করিলে রাস্তায় তাহাকে দেখিবার জন্য ভিড় জমিয়া যায়।

সুলীনা চলিয়া গেল।

আমি গেটের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম লোম-ওঠা কুকুরটা কখন আসিবে?

দ্বিতীয় পক্ষীর কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের যে সত্তার কাহিনী আপনারা এতক্ষণ শুনিতেছিলেন আমি সেই সত্তারই দ্বিতীয় অংশ। যোগেন্দ্রনাথের সত্তাটির যে অংশ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে অর্থাৎ সুখে উল্লসিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে আমি সে অংশ নহি, আমি নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র। যদি কল্পনা করিতে পারেন যে একই ব্যক্তির একটা অংশ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছে এবং আর একটা অংশ প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সে অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে তাহা হইলে ব্যাপারটা হয়তো বুঝিতে পারিবেন। একটু তফাত অবশ্য আছে। আপনারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কিছুক্ষণ মাত্র দেখেন। কিন্তু মানবজীবনের যে অভিনয়ের কথা বলিলাম তাহা সর্বক্ষণ চলিতেছে। জীবনের বিরাট রঙ্গমঞ্চে

একই সত্তার দুইটি অংশ অভিনেতা ও দর্শকরূপে সর্বদা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এ কল্পনাতেও একটু ভুল আছে। আপনাদের রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরাও বিচলিত হন। কিন্তু যে মহানাটকের কথা বলিতেছি সে মহানাটকের দর্শক নির্বিকার। তিনি উচ্ছ্বসিত হন না, অবসন্ন হন না, তিনি কেবল নিরীক্ষণ করেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবননাট্যে আমি সেইরূপ নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র। যোগেন্দ্রনাথের জীবনের কোনো কার্যকেই আমি ভালো বা মন্দ আখ্যায় চিহ্নিত করি না। ভালো মন্দ আপনাদের সৃষ্টি। স্থান কাল পাত্রভেদে তাহাদের রূপ পরিবর্তন হয়। এদেশে যাহা ভালো অন্য দেশে তাহা মন্দ, একালে যাহা ভালো, অন্য কালে তাহা মন্দ, একজনের পক্ষে যাহা ভালো অন্যজনের পক্ষে তাহাই মন্দ। সুতরাং যোগেন্দ্রনাথ জীবনে যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা ভালো কি মন্দ এসব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। বস্তুত কোনো বিষয় লইয়াই আমি মাথা ঘামাই না, আমি নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র, বিচারক নহি। কিন্তু যে লেখক যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া তাঁহার আত্মকথা বলাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা আমিও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলি। লেখকেরা কবি। কবিদের আদেশে ভগবানও স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইয়া দেখা দেন। আমিও তাঁহার এ আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে যোগেন্দ্রনাথের যতটুকু দেখিয়াছি, যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা অকপটে ব্যক্ত করিব। একটা কথা গোড়াতেই বলি। লেখক যোগেন্দ্রনাথের যে আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক জিনিসই বাদ পড়িয়াছে। তিনি তাঁহার বাল্যকাল বা কৈশোর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার বাল্যকালের ও কৈশোরের কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার পরবর্তী জীবন আভাসিত হয়। শৈশবে তিনি অতিশয় আদুরে এবং একগুঁয়ে ছিলেন। যাহা লইব বলিয়া বায়না ধরিতেন তাহা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি থাকিত না। তাঁহার বাবা মা এজন্য মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়িতেন। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। যোগেনের বয়স তখন তিন কি চার হইবে। সেদিন পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। যোগেনের মা যোগেনকে কোলে লইয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া ছড়া বলিতেছিলেন—আয় আয় চাঁদ আয় আয়রে, যোগেনের কপালেতে টিপ দিয়ে যারে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল—যোগেন হঠাৎ বায়না ধরিল—মা আমি চাঁদ নেব। আমাকে চাঁদটা পেড়ে দাও। তাহার মা তাহাকে কত বুঝাইলেন—চাঁদ কি পাড়া যায় বাবা? কত উঁচুতে আছে দেখছ না? কিন্তু যোগেন এসব স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন। চীৎকার শুনিয়া যোগেনের মামা ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওকি, যোগেন কাঁদছে কেন? কি চায়?"

মা উত্তর দিলেন, "তোমার ভাগ্নে আকাশের চাঁদ চাইছে। কি করে দিই বল—"

"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি—"

যোগেনের মামা ভিতরে গিয়া ছোট একটি হাত-আয়না লইয়া আসিলেন। আয়নার ভিতরে চাঁদকে প্রতিফলিত করিয়া সেটি যোগেনের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও চাঁদ। দেখ, দেখ—বাঃ কেমন সুন্দর চাঁদ।" যোগেনের কান্না থামিল। যোগেন যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার বাতিক ছিল নানারকম প্রজাপতি ও রঙীন ফড়িং ধরা। এজন্য বনেবাদাড়ে ঝোপেঝাড়ে কণ্টক কর্দমকে তুচ্ছ করিয়া সে যে কত প্রজাপতি ও রঙীন ফড়িং ধরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় বড় কাচের জার কিনিয়া তাহাদের ভিতর প্রজাপতি ফড়িংদের রাখিত আর স্বপ্ন দেখিত। কত স্বপ্নই যে দেখিত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার স্বপ্ন দেখা অভ্যাস ছিল। যে কোনও তুচ্ছ

জিনিসকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনে রঙীন স্বপ্ন ঘনাইয়া উঠিত। এই স্বপ্ন দেখার প্রবণতাই তাহাকে লেখক করিয়াছে। আহা, এই স্বপ্নদেখা ব্যাপারটা সে যদি নির্বিকার ভাবে কবিতে পারিত। স্বপ্ন যে স্বপ্নই, কিছুক্ষণ পরেই তাহা যে মিলাইয়া যাইবে, তাহাকে যে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহাকে কোনও বন্ধনে বন্দী করা যে অসম্ভব এ বোধটা কিন্তু তাহার জীবনে কখনও জাগিল না। অনিত্য আলেয়াকে নিত্যবস্তু মনে করিয়া সে বার বার তাহাকে খাঁচায় পুরিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার আর একটা শখও ছিল, ঘুড়ি-ওড়ানো। ছোট বড় নানারঙের ঘুড়ি উড়াইয়াছেন যোগেন্দ্রনাথ। লাটাইও নানারকম ছিল। ঘুড়ির সুতাকে মজবুত করিবার জন্যই নানারকম 'মানজা'ও সংগ্রহ করিতেন তিনি। মানজার উদ্দেশ্য শুধু নিজের ঘুড়ির সুতাকে মজবুত করা নয়, অপরের ঘুড়ি সুতাকে কাটিয়া দেওয়াও। অপরের ঘুড়িকে কাটিয়া দিয়া তিনি অদ্ভুত আনন্দ পাইতেন। তাঁহার নিজের ঘুড়িও বার বার কাটিয়া গিয়া তাঁহার অন্তরকে বিষাদে পরিপূর্ণ করিয়া দিত। তাঁহার জীবনে, ঘুড়ি-ওড়ানোর যুগে, তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল তাঁহার ঘুড়িটা শুধু যে অপরের ঈর্ষা উৎপাদন করিবে, তাহাই নহে, তাহা সকলের ঘুড়িকে কাটিয়া দিয়া একাকী স-গৌরবে চিরকাল আকাশে উড়িবে। কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথের ঘুড়ি বার বার কাটিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ তখন সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে ঘুড়িটা তাঁহারই, যে লাটাই এবং সূতা ঘুড়িটাকে চালাইতেছে তাহাও তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। কিছুই যে তাঁহার নহে, সবই যে প্রকৃতির মায়া মাত্র, ওই ঘুড়ি-ওড়ানোটাই যে প্রকৃতি-পরিকল্পিত ক্ষণিক লীলা মাত্র—এ সব চিন্তা একবারও যোগেন্দ্রনাথের মনে জাগে নাই। আমিই ঘুড়ির মালিক, আমিই ঘুড়ির চালক, বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে চালাইতে পারিলে আমার ঘুড়ি বিজয়ী হইয়া চিরকাল আকাশে উড়িবে—এই ধরনের চিন্তায় সম্মোহিত হইয়া যোগেন্দ্রনাথ বাল্যকালে ঘুড়ি উড়াইতেন। এজন্য অনেক মনোকষ্টও তাঁহাকে পাইতে হইয়াছে। উপমার সাহায্য লইতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহা হইলে বলিব যোগেন্দ্রনাথের বাল্য অবস্থা এখনও কাটে নাই। এখনও তিনি সামান্য দর্পণে প্রতিফলিত চাঁদকে করায়ত্ত করিয়া ভাবিতেছেন আকাশের চাঁদই বুঝি সত্যই তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছে। এখনও তিনি বহুরকম প্রজাপতি ফড়িং ধরিয়া তাহাদের নানাভাবে বন্দী করিয়া ভাবিতেছেন যে তাহারা বুঝি চিরকাল তাঁহার সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। এখনও তাঁহার ঘুড়ি-ওড়ানোর নেশা কাটে নাই। এ ঘুড়ি অবশ্য কাগজের ঘুড়ি নহে, অন্যরকম ঘুড়ি। আগেই বলিয়াছি যোগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল এখনও কাটে নাই, বাল্যকালের খেলনাগুলি তাহাদের রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। একটু কিন্তু তফাত আছে। শিশুদের খেলনার সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে বটে কিন্তু সেই আগ্রহের পাশাপাশি বৈরাগ্যও থাকে। যে খেলনা পাইবার জন্য শিশু আজ উদ্বাহু, দুইদিন পরে দেখা যায় সে খেলনা সে ধূলায় অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আর তাহার মোহ নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মোহ বাড়ে, তখন মানুষ যাহা পায় তাহা আর ছাড়িতে চায় না, একেবারে আঁকড়াইয়া থাকে। যখন সে-সব জিনিসের প্রয়োজনও ফুরাইয়া যায়, তখনও তাহাদের ফেলিতে পারে না। অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্তূপ শ্বাসরোধকর হইয়া ওঠে, তবু পারে না। অধিকাংশ মানুষই অনর্থক সঞ্চয়ী, যোগেন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। যোগেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে একটি খেঁকি কুকুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে ও কুকুরের কোনো অস্তিত্ব নাই। উহা যোগেন্দ্রনাথের কল্পনা সৃষ্টি। আমার মনে হয় কুকুরটি

উহার নিজেরই নিস্পিষ্ট বিবেক। যে সব কথা মানুষ যোগেন্দ্রনাথ সাহস করিয়া সমাজে উচ্চারণ করিতে পারেন নাই সেই সব কথা তিনি কুকুরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। উহা তাঁহার আত্মগ্লানিরই একটা প্রকাশ মাত্র। কুকুর যাহা বলিয়াছে তাহার সত্যাসত্য আপনারা নির্ধারণ করুন, আমি শুধু জানি উহা যোগেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি মাত্র। নাদু বা নাদুর স্ত্রীরা সম্বন্ধেও সব কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই। তাহাদের যে শোচনীয় পরিণতি হইয়াছে তাহা অবশ্যই তাহাদের কর্মফল। কিন্তু এই কর্মফল কিভাবে তাহাদের অভিভূত করিল তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিলে তাহাদের প্রতি ঘৃণা হইবে না, বরং তাহাদের জন্য হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। অসহায় শিশুকে প্রবল বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে যে দুঃখ হয় সেই প্রকার দুঃখে হৃদয় বিচলিত হইবে। নাদুর সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা উল্লেখযোগ্য। শৈশবে তাহার প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ততটা মনোযোগ তাহার পিতামাতা তাহার প্রতি দেন নাই। বাল্যকাল হইতেই যোগেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে লইয়াই মাতিয়া ছিলেন সবাই। এমন কি উহাদের গৃহশিক্ষক পর্যন্ত। স্বল্পবুদ্ধি নাদুর দিকে কেহ তেমন নজর দেয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ ক্লাসে প্রত্যেকবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নানাবিধ প্রাইজ লইয়া বাড়িতে আসিতেন, আর নাদু কোনোক্রমে পাস করিয়া প্রমোশন পাইত মাত্র। দুই এক বছর তাহাও পাইত না। নাদু যে অতি 'ওঁছা' 'অগা' 'গবেট'—এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার দফা যে নিকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার যে আর উদ্ধারের আশা নাই, একথা সকলের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মনেও এই বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে লেখাপড়ার রাস্তায় চলিয়া আর সে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। সুতরাং ও পথে চলার চেষ্টাও সে কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিল। মানুষের মন কিন্তু কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য সদাই উন্মুখ। সদাসর্বদাই সে সেই জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত যেখানে তাহার পটুতা জয়মাল্যে ভূষিত হইবে। এইরূপ একটি ক্ষেত্র নাদু আবিষ্কার করিয়াছিল তাহার বন্ধুবহলে। নাদু পড়াশোনায় ভালো না হইলেও অন্য অনেক গুণ ছিল তাহার। সে ভালো ক্যারিকেচার করিতে পারিত, তাস খেলায় খুব দক্ষ ছিল, চমৎকার ম্যাজিক দেখাইত এবং সর্বোপরি তাহার বাকচাতুর্য এমন হৃদয়গ্রাহী ছিল, এমন অনায়াসে সে সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করিতে পারিত যে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিতে পারে নাই কিন্তু তাহার অনর্গল ইংরেজি শুনিয়া মনে হইত সে বুঝি এম. এ. পাস। চেহারাও চমৎকার ছিল তাহার। তাহার এই সব গুণ তাহার দুইটি বন্ধুকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুইজনই অবাঙালী। একজন মাড়োয়ারী—শিউরাম আর একজন আগ্রার মুসলমান—আবদুল লতিফ। দুইজনেই ধনী। দুইজনেরই ফালাও কারবার ছিল। নাদুর কারবার-বিষয়ক জ্ঞানের জন্য নহে, তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই তাহারা তাহাকে তাহাদের ব্যবসায়ে দালাল হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিল। দুইজনের ব্যবসায়ে বিরোধও ছিল না। শিউরামের ছিল ঘিয়ের ব্যবসায় আর লতিফের ছিল কার্পেটের। দালালির কমিশন হিসাবে ঠিক সে কত রোজগার করিত তাহা ঠিক জানি না, যোগেন্দ্রনাথের ধারণা বিশেষ কিছু করিত না। তাহার বন্ধু-মনিবরা তাহাকে মাঝে মাঝে কিছু বখসিস দিত তাহাই তাহার মুখ্য রোজগার ছিল—এই কথাই যোগেন্দ্রনাথ তাহার আত্মকথায় বলিয়াছেন। কিন্তু সব কথা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। সম্ভবত চক্ষুলজ্জাবশতই তিনি

ঘটনাটা চাপিয়া গিয়াছেন। নাদু যোগেন্দ্রনাথকে মনে মনে খুব ভক্তি করিত। সে ইহা কুণ্ঠার সহিত অনুভব করিত যে সে নিজে একটা অপদার্থ, তাহার নিজের সংসারভার দাদার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে। এই ভক্তি বা কুণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু অদ্ভুত ধরনের ছিল। সে সর্বদাই যেন একটা বেপরোয়া বিদ্রোহীর ভাব লইয়া ঘোরাফেরা করিত, যাহা উপার্জন করিত তাহার অধিকাংশই নিজের শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যয় করিয়া বাহিরে একটা মেকী আভিজাত্যের ভড়ং জাহির করিবার প্রয়াস পাইত সে। অন্তরে সে দীন ছিল বলিয়াই বাহিরের একটা মুখোশ তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকেরই হয়। নিতান্ত ভিখারীরও একটা সাধুত্বের ভড়ং থাকে—যোগেন্দ্রনাথ কবি, তিনি নাদুর অশোভন আচরণের প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন, কিন্তু বাহিরে তিনি নাদুর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না! কারণ কবি বা দার্শনিকেরা সব সময়ে কার্যক্ষেত্রে মহৎ হইতে পারেন না। কবি হইলেই যে মহৎ হইবে এমন কোনো কথা নাই। যোগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাই সে সময়ে স্বার্থের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। নাদু তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। ইহার আর একটা কারণ অবশ্য নাদুর বাবা মা। তাঁহারা সব সময়ে এই অপদার্থ নাদুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন বলিয়া যোগেন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা আরও বাড়িয়াছিল। নাদুর বাবা মারও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পিতামাতারা সাধারণত অসমর্থ সন্তানেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। স্নেহের ইহাই নিয়ম। আর একটি ঘটনাও যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলেন নাই। নাদুর মুসলমান বন্ধু আবদুল লতিফ যেদিন প্রথম তাহার স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সেদিন নাদু যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল, "লতিফ ছোটবউকে তার বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ করেছে। বলেছে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। বাবা-মাকে বলেছি, তাঁদের আপত্তি নেই। তাঁরা বরং বললেন—যাওয়াই ভালো। উনি তোমার মনিব আর এমন হিতৈষী বন্ধু, না গেলে অন্যায় হবে। কিন্তু ছোটবউকে নিয়ে যাবার আমার তেমন ইচ্ছে নেই, যদিও মুখে সেটা ওকে বলতে পারছি না। ওদের যদি বলি, তুমি আপত্তি করেছ—।" যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি আপত্তি করতে যাব কেন। তুমি যা ভাল বোঝ কর।" সেদিন যোগেন্দ্রনাথ যদি আপত্তি করিতেন তাহা হইলে ভয়ংকর যোগাযোগটা হয়তো হইত না। নাদুর মনের জোর ছিল না, সে বাধা দিতে পারে নাই। ঘন ঘন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, নিমন্ত্রণের সহিত নানারূপ ভেটও। ছোট বউ আবদুল লতিফের বাড়ি হইতে শেষে বাগানবাড়িতে যাইতে শুরু করিল। ইহার কিছুদিন পরে সে আবদুল লতিফের সহিত পলাইয়া যায়। স্ত্রীর খোঁজ করিবার জন্য নাদু বাহির হইয়াছিল। আর ফেরে নাই। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর কথা যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আর একটি শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি বলেন নাই। টেঁপির একটি ছোট ভাই ছিল। বয়স ছয় বৎসর। পিতামাতার আকস্মিক অন্তর্ধানে সে যেন কেমন হইয়া গেল। দিনরাত তাহার চোখ দিয়া জল পড়িত, অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিল। প্রায়ই দেখা যাইত উলঙ্গ হইয়া সে বাড়ির বাহিরের বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, চোখে জল ঝরিতেছে। একমাত্র টেঁপিই তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, খাওয়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু কৃতকার্য হইতে না। তখন তাহাকে প্রহার করিত। নিষ্ঠুর সে প্রহার। ছোট ভাইয়ের প্রতি করুণা এবং পিতামাতার কলঙ্কের জন্য লজ্জা নিষ্ফল আক্রোশে ওই হতভাগ্য শিশুটাকেই পীড়ন করিত। ছেলেটা কিছুদিন পরে যক্ষ্মারোগে মারা যায়। যোগেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে কিছু বলেন

নাই, কারণ এজন্য মনে মনে তিনি দোষী হইয়া আছেন। ছেলেটার ভালো চিকিৎসাও হয় নাই। টেঁপির সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ কিছু বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সবটা বলেন নাই। বাল্যকালে টেঁপিকে যে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার ও লাঞ্ছনা বহন করিতে হইয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র ভয়ংকর। ওইটুকু মেয়েকে ভোর চারটার সময় উঠিয়া সকলকে চা করিয়া দিতে হইত। শীতকালে গরম জামাও থাকিত না বেচারীর। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতেই সব কাজ করিতে হইত তাহাকে। যোগেন্দ্রনাথ ঝি ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। টেঁপিই ঝিয়ের সমস্ত কাজ করিত। ভোরবেলা হইতে রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত সকলের ফরমাশ খাটিত সে। কাহারও পান হইতে চুন খসিলেই বকুনি খাইতে হইত। সে রূপসী, ইহাও তাহার যেন একটা অপরাধ। যোগেন্দ্রনাথের কুৎসিত মেয়েগুলি ইহা লইয়া তাহাকে যে ভাষায় গঞ্জনা দিত, তাহা মোটেই ভদ্রভাষা নহে। এইভাবেই তাহার দুঃখের দিনগুলি কাটিতেছিল, এমন সময় একদিন পরেশ বিশ্বাস রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিলেন। পরেশ বিশ্বাস একজন আধুনিক কবি, ঝাপসা পাঁচালো ভাষায় প্রেমের কবিতা লেখেন। তিনি লেখক যোগেন্দ্রনাথের ভক্ত হিসাবে একদিন তাঁহার বাড়িতে দেখা করিতে আসিলেন এবং সেখানে মূর্তিমতী আধুনিক কবিতা টেঁপিকে দেখিয়া এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে প্রায় প্রত্যহই আসিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটই টেঁপি উক্ত সিনেমা ডিরেকটারের খবর পাইয়াছিল এবং তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ একথা জানিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মচরিতে এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে তিনি কিছুই জানিতেন না। উক্ত আধুনিক কবিরও সিনেমা-পটে নায়করূপে অবতীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা আরও স্বপ্নমধুর হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে আহা টেঁপিও যদি আমার সহিত নায়িকা হইয়া নামে! তাই তিনি টেঁপির পত্র লইয়া সিনেমা ডিরেকটারের কাছে গিয়াছিলেন, নিজের কথাও সম্ভবত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই খেলা, সিনেমা ডিরেকটার তাঁহাকে নির্বাচন করিলেন না, টেঁপিকেই করিলেন। টেঁপির ভাগ্য পরিবর্তন হইল। টেঁপির সহিত যোগেন্দ্রনাথেরও। যোগেন্দ্রনাথ বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ছিলেন, আজকালকার উন্নাসিক সমালোচকগণ হয়তো বলিবেন তৃতীয় শ্রেণীর। উন্নাসিক সমালোচকদের আমি তেমন আমল দিই না। তাঁহাদের ওই উন্নাসিকতাটুকুই আছে, ভিতরে বস্তু নাই। তাঁহারা প্রায় যাহা বলেন তাহা ঈর্ষা-প্রসূত পূতিগন্ধময় অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। যোগেন্দ্রনাথ খুব খারাপ লেখক নন। কিন্তু ইদানীং টেঁপির কল্যাণে যতটা খ্যাতি তিনি লাভ করিয়াছেন। ততটা খ্যাতি ভবিষ্যতে তাঁহার থাকিবে না। কালের নিকষে যাচাই হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান হইয়া যাইবে। একথা যোগেন্দ্রনাথও যে না জানেন তাহা নয়। কিন্তু সব সময়ে কথাটা তাঁহার মনে থাকে না। যখন রাশি রাশি টাকা আসে, রাশি রাশি চিঠি আসে, যখন দলে দলে ভক্ত ও প্রকাশকেরা তাঁহার দ্বারে ভিড় করে, যখন কাগজে কাগজে তোষামোদপ্রিয় সমালোচকরা তাঁহার জয়ধ্বনি করে—তখন তাঁহার মনে থাকে না যে তিনি সাধারণ লেখক মাত্র। সাহিত্যের পথে বড়জোর একজন পদাতিক, রথী বা মহারথী নন। সত্যই তখন তাঁহার মতিভ্রম হয়, সত্যই তখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের পংক্তিতে নিজেকে বসাইয়া অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

লেখক হিসাবে তিনি বড় বা ছোট যা-ই হোন একটা কথা সত্য, লেখনীর জোরেই তাঁহার আধিভৌতিক দুঃখ ঘুচিয়াছে। আর একটা কথাও সত্য। যে অর্থ তিনি উপার্জন করিতেছেন,

তাহা তিনি একা ভোগ করেন নাই। শুধু তিনি লেখক বলিয়াই বিখ্যাত নহেন, আত্মীয়-প্রতিপালক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। কোনও প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যায় না। সব সময়ে তিনি যে প্রসন্ন মনে দান করেন তাহা নয়, নানারকম আধুনিক কুসংস্কার অনেক সময় তাঁহার দানের মাহাত্ম্যকে মলিন করিয়া দেয়—কিন্তু ইহাও সত্য কথা। কোনো প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন না। এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁহার একটু অহঙ্কার আছে। তাঁহার এক কাকা নাকি খুব ধনী ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের যখন অত্যন্ত দুরবস্থা, প্রথম জীবনে মাস্টারি করিতে করিতে যখন দারিদ্র্যের ভারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেন, তখন এই ধনী কাকার কথা তাঁহার মনে হইত। তাঁহাকে দুই-একবার পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর আসে নাই। তখন তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইত—হায়রে ভগবান যাহাকে ধন দিয়াছেন, তাহাকে দান করিবার মতো মন দেন নাই। আমার যদি কোনোদিন টাকা হয় আমি দেখাইয়া দিব ধনের সদ্ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয়। 'আমি দেখাইয়া দিব'—এই অহংকারই তাঁহাকে বদান্য আত্মীয়-প্রতিপালক করিয়াছে। অহংকারের এটা ভালো দিক। অহংকার নিজেকে চরিতার্থ করিয়াই আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অহং-এর সম্যক উপলব্ধি হইলে ঈশ্বর-দর্শনও হয় শুনিয়াছি। সুতরাং সুখেরও সীমা থাকে না। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মোটেই সুখী নন। একথা নিজেও তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন। হাল-বিহীন নৌকা যেমন স্রোতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে ডুবিয়া যায়, যোগেন্দ্রনাথের আদর্শহীন জীবনও তেমনি নানা ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হইবে ইহাই আমার আশঙ্কা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যোগেন্দ্রনাথ আদর্শবান। কিন্তু যে আদর্শ জীবনের সর্বকর্মকে একমুখী করিয়া মালার ন্যায় গাঁথিতে পারে সে আদর্শ যোগেন্দ্রনাথের নাই। সুবিধাবাদী যোগেন্দ্রনাথ যখন যেটাকে নিজের কার্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করিয়াছেন তখনই সেটা আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় আদর্শ ছিল যেমন করিয়া হোক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইতে হইবে। এজন্য তিনি রাত জাগিয়া নোট মুখস্থ করিয়াছেন, শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রশ্নের ধরনটা কিরূপ হইবে জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একবার পরীক্ষার 'হলে' বই হইতে টুকিয়াছেন পর্যন্ত। পরীক্ষায় তিনি ভালো নম্বরই পাইয়াছেন। কিন্তু সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি যতবার অনুচিত কর্মে রত হইয়াছেন ততবার তাঁহাকে বিবেকের ভ্রূকুটির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মানুষ যত হীন যত নীচই হোক না কেন, তাহার বিবেক কখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় না। এই বিবেক কখনও মৃদুকণ্ঠে, কখনও তারস্বরে সর্বদা মানুষকে তাহার দুষ্কর্মের জন্য ভর্ৎসনা করে। এই ভর্ৎসনাই তাহার অসুখের হেতু। সে মনে মনে অনুভব করে—আমি যাহা করিয়াছি তাহা অন্যায়, তাহা অশিব, তাহা অসুন্দর, তাহা মিথ্যা। এই চিন্তা তাহার সুখের বুকে, তাহার শান্তির মূলে কীটের ন্যায় অহরহ দংশন করে। তিনি কাম্যবস্তু পান বটে, কিন্তু তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হয়। যোগেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছে বাহিরে তিনি ধনী বটেন, কিন্তু অন্তরে তিনি নিঃস্ব। এই নিঃস্বতা তিনি প্রতিমুহূর্তে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ যদি চিরকাল আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক থাকিতেন তাহা হইলে তিনি ধনী হইতেন না, কিন্তু সুখী হইতেন। লেখক যোগেন্দ্রনাথ যদি সস্তা খ্যাতি এবং প্রচুর অর্থের মোহে আত্মহারা না হইয়া নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরূপে থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এত অসুখী হইতেন না। কেন তিনি সুবিধাবাদী হইয়াছেন ইহার সপক্ষে তিনি এখন নানা যুক্তি খাড়া করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার

বিবেক তাহাতে নিরস্ত হইতেছে না। সে ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে, তুমি পাজী, তুমি লোভী, তুমি চোরাকারবারী। শিক্ষা এবং সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে তুমি বাজে অপবিত্র মাল পাচার করিয়া কৌশলে বেশী দাম আদায় করিয়াছ। তুমি অসাধু প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নও। বিবেকের এই তাড়নায় যোগেন্দ্রনাথ সর্বদাই ম্রিয়মাণ। তিনি সাহিত্যিক, বাহিরের সকলে জানে তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক। কিন্তু তিনি নিজে জানেন তিনি ইহার বিপরীত। এই জ্ঞান, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। তিনি জানেন আধুনিক কল-কব্জা-যন্ত্রের যুগের একমাত্র চাহিদা 'আরও, আরও, আরও', একমাত্র আকাঙ্ক্ষা 'টাকা, টাকা, টাকা', তিনি ইহাও জানেন এই সর্বনাশা কামনা বেড়া-আগুনের মতো সমস্ত মানবসমাজকে লেলিহান শিখা-বিস্তার করিয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, তিনি অনুভব করেন যে আর্ত নরনারীর দল কেহ সরবে, কেহ নীরবে, কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে, কেহ হাসিতে হাসিতে বলিতেছে—"শান্তি নাই, শান্তি নাই, কোথা যাই, কি করি, কেন এমন হইল, সুখ কোথায়", তিনি ইহাও জানেন যে এসব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র কবিরাই দিতে পারেন। যোগেন্দ্রনাথ নিজেও জানেন যে লেখক হিসাবে তিনি প্রাচীন ভারতের সেই কবি-ঋষিদেরই সমগোত্র যাঁহারা একদিন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে, তাঁহারও কর্তব্য আর্ত ভীত সন্ত্রস্ত মানবসমাজকে সান্ত্বনা দেওয়া। কবির কাজই পথ নির্দেশ করা। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহিত্যে কোনো পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি নিজেই পথ হারাইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট কামক্লিন্ন সাহিত্য পাঠ করিয়া অনেকে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, পপুলার হইবেন বলিয়া পশুত্বকেই তিনি মনোহর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, পয়সার লোভে নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় মন্দ জানিয়াও নিজের ভাইঝিকে তিনি সিনেমায় নামাইয়াছেন। নিজের স্বরূপ তাঁহার নিজের কাছে অবিদিত নাই। মনে মনে নিজেকে তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিবর্ণমুখে সেদিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার এ দুঃসহ কষ্ট বাহিরের লোকে দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। আমি তাঁহার রক্তাক্ত হৃদয়ের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া আছি। লোকে মনে করে যোগেন্দ্রনাথ কত সুখী, কিন্তু আমি জানি তিনি মহাদুঃখী। তিনি আদর্শ-ভ্রষ্ট এবং তিনি নিজে তাহা জানেন। বার বার তিনি বলেন বটে যাহা করিয়াছি ঠিক করিয়াছি, পারিপার্শ্বিকের চাপে করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু এ কথায় রুষ্ট বিবেক তুষ্ট হয় না। অন্তরনিবাসী সেই দেবতার অভিশাপ-অগ্নিতে যোগেন্দ্রনাথ অহরহ দগ্ধ হইতেছেন। যোগেন্দ্রনাথের আর একটি চিন্তার কারণ হইয়াছে তাঁহার অর্থসমস্যা। সকলে জানে যোগেন্দ্রনাথ লাখ লাখ টাকা রোজগার করেন, কিন্তু আমি জানি টাকাটা রোজগার করে সুলীনা, যোগেন্দ্রনাথের পুস্তকের জন্য যাহা আয় তাহাও সুলীনার জন্য এবং সে আয় প্রচুর নহে। বিলাসের তপ্তকটাহে তাহা নিমেষে শেষ হইয়া যায়। সুলীনাই এখন তাঁহার একমাত্র ভরসা। সুলীনার টাকাও তিনি দুইহাতে মুঠা মুঠা খরচ করিতেছেন, চাল যে ভাবে বাড়াইয়াছেন তাহাকে খরচ না করিয়া উপায় নাই, তাই এক পয়সাও সঞ্চয় নাই। উপরন্তু বাজারে ধার জমিয়াছে। সুলীনা যদি সারাজীবন কাজ পায় এবং সমানভাবে খাটিতে পারে, এখন বাজারে তাহার যে সুনাম এবং চাহিদা আছে তাহা যদি বরাবর অটুট থাকে তাহা হইলেই যোগেন্দ্রনাথের সংসার-তরণী কোনোরূপে তীরে ভিড়িবে। নচেৎ সর্বনাশ। এই চিন্তাও যোগেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন কি করিয়া সুলীনা আরও বেশী কনট্র্যাক্ট পায়। পাবলিসিটি নামক যন্ত্রের বিভিন্ন

চাকায় তাঁহাকেই এখন নিপুণভাবে তৈল-নিষেক করিতে হইতেছে। মাসের একাধিকবার প্রসিদ্ধ চিত্রসমালোচকদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের আপ্যায়িত করেন। বড় বড় হোটেলে নামজাদা প্রযোজক, পরিচালকদের পার্টি দিতে হয়। এসব না করিলে তাঁহার কাহিনী ছবিতে চলে না, সুলীনারও কনট্র্যাক্ট হয় না। যৌবনে মাস্টারি করাটা তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর মনে হইত। মনে হইত এত পরিশ্রম করি তবু সংসারের অভাব ঘোচে না। এখন মনে হয় এত ঐশ্বর্য, এমন বাড়ি, দুইখানা মোটর, দশজন চাকর-চাকরানী, শিক্ষিতা প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাড়িতে বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী, লেখক-লেখিকাদের পদার্পণ, সুলীনাকে ঘিরিয়া লাখপতি কোটিপতিদের গুঞ্জন, কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কিন্তু কই অভাব তো মিটিল না, এখনও তো অভাবের বিরাট গহ্বর সম্মুখে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শুধু টাকার অভাব নহে, সুখেরও অভাব। যোগেন্দ্রনাথ লোক খারাপ নন, তিনি উদার, কিছু সাহিত্যবুদ্ধিও তাঁহার আছে, অন্তরে সত্য-শিব-সুন্দরের আভাস তিনি পাইয়াছেন, পরোপকারী লোক, গরীবের দুঃখে কষ্টে সাড়া দেন, কিন্তু আধুনিক যুগের যে নৃশংস বস্তুতান্ত্রিক বিলাসপ্রবণ স্বার্থপর সভ্যতা দক্ষ শিকারীর মতো সকলকে বিরাট জালে আবদ্ধ করিয়াছে, যোগেন্দ্রনাথও সেই জালে কবলিত হইয়াছেন। যে সংযম, যে তিতিক্ষা, যে বৈরাগ্য, যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষকে সুখী করে তাহা এখন যোগেন্দ্রনাথের আয়ত্তাতীত। তাঁহার বস্তুতান্ত্রিক বিবেক এখন খেঁকি কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া পথের ধূলায় নালার কাছে ডাস্টবিনের পাশে লোলুপ কামুকের মতো বসিয়া আছে। তাহার মুখে তিনি মানুষের ভাষা শুনিতেছেন। তাঁহার নিজের চিন্তাই কুকুরের মুখে বাঙ্ময় হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ সত্যই বড় দুঃখী।

প্রথম পক্ষীর কথা

গেটের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। প্রতিমুহূর্তে আশা করিতেছি এখনই রমেনকে লইয়া সুলীনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভাবিতেছি রমেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাড়িতে যে ভোজের আয়োজন হইবে তাহাতে আমার তরফ হইতে কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। জুপিটার সিনেমার শর্মাকে তো বলিতেই হইবে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে জাহানারা টকির মালিককে নিমন্ত্রণ করা চলিবে কি? ইঁহারা উভয়েই আমাদের হিতৈষী, শর্মা একজন নামজাদা প্রযোজক। তিনি আমার 'স্বর্ণকমল' গল্পটার নাম বদল করিয়া 'রূপ যমুনার তীরে' এই নামে অনেক টাকা খরচ করিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করিতেছেন। সুলীনা তাহাতে একটি পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে। আমাদের যে টাকা তিনি দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদিও এখনও সবটা দেন নাই, তবু আশা আছে বইটা যদি 'হিট' করে, বাকি টাকা পাইয়া যাইব। সুতরাং এই পার্টিতে শর্মাকে যদি নিমন্ত্রণ না করা হয় তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন। শর্মা লোকটা চরিত্রহীন তাহা জানি, সুলীনাকে টাকার লোভ দেখাইয়া তিনি যে নানাভাবে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহাও আমার অজ্ঞাত নাই, কিন্তু তবু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। কারণ আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'মালদার' বলে তিনি তাহাই। তাঁহাকে উপেক্ষা করিবার সাহস নাই। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে। কিন্তু জাহানারা টকির বদরুদ্দিন খান যদি

শোনেন যে সুলীনার পার্টিতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন কি হইবে? সুলীনা পার্টি দিয়াছিল লোকমুখে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। বদ্‌রুদ্দিন খান তাহার এক রক্ষিতার ভাইকে দিয়া একটি 'লাচ্ছেদার' গল্প লিখাইয়াছেন, সে গল্পটির চিত্রনাট্য আমি লিখিয়াছি, সেই গল্পে প্রায়-উলঙ্গিনী যে নর্তকীটি পথে পথে নাচিয়া সকলের মনোহরণ করিতেছে এবং অবশেষে যে সহসা একজন বড়লোকের নেকনজরে পড়িয়া তাহার সাহায্যে মস্ত বড় একটা অন্ন-সত্র খুলিয়া দিল—সেই নর্তকীর ভূমিকায় সুলীনা অভিনয় করিবে ইহা ঠিক হইয়াছে। বেশ মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। বদ্‌রুদ্দিনকে যদি সুলীনার পার্টিতে সমাদরে নিমন্ত্রণ না করা যায়, তাহা হইলে সব ভণ্ডুল হইয়া যাইবে না তো! বদ্‌রুদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করিতে আপত্তি নাই, বরং আগ্রহই আছে আমার। মুশকিল হইয়াছে শর্মাকে লইয়া। তাহার সহিত বদ্‌রুদ্দিনের অহি-নকুল সম্পর্ক। একবার একটা পার্টিতে তাহারা নাকি ঘুষোঘুষি পর্যন্ত করিয়াছে। একটা মোটরের শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আমার বাড়ির কাছে আসিয়া মোটরটা গতিবেগ কমাইল। সুলীনা আসিতেছে বোধহয়। নিশ্চিন্ত হইলাম। সুলীনাই ঠিক করুক তাহার পার্টিতে বদ্‌রুদ্দিন এবং শর্মাকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করা চলিবে কি না, সে উভয়কে একসঙ্গে 'ম্যানেজ' করিতে পারিবে কি না। সুলীনা অসাধ্যসাধনপটিয়সী, সে ইচ্ছা করিলে সবই পারে। কিন্তু একি, এ তো সুলীনার গাড়ি নয়! ঘন নীল রঙের প্রকাণ্ড মিনার্ভা আসিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইয়াছে। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একজন সুকান্তি সুবেশ দীর্ঘকান্তি পুরুষ। অপরিচিত লোক। পূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি গেট খুলিয়া প্রবেশ করিলেন।

"যোগেনবাবুর কি এইটেই বাড়ি?"

"আসুন, আসুন।"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলাম। কাছে আসিতে অবাক হইয়া গেলাম তাঁহার গোঁফ দেখিয়া। সরু গোঁফ, কিন্তু অদ্ভুত। মনে হইল যেন সরু দুইটি সাপ দুই দিকে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখের দৃষ্টিতে চাপা চতুরতা ও স্পর্ধা চকমক করিতেছে।

"সুলীনা দেবী কি আপনারই ওয়ার্ড? আপনিই কি যোগেনবাবু?"

"হ্যাঁ। আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!"

"আমার নাম বি. এন. গজপৎ। আমি ব্যবসা করি। তামা, টিন, লোহার কারবার আমার—"

বি. এন. গজপৎ-এর নাম আমি শুনিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম কোটপতি লোক তিনি। সেই ব্যক্তি আজ আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! আমি রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিলাম, "আপনার নাম শুনেছি। সৌভাগ্য, আজ দেখাও হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

গজপৎ একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি নিজের গরজেই এসেছি। খুলে বলছি ব্যাপারটা। তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা দিই। আমি দিল্লীর লোক; জাতে বেনিয়া। যদিও অবাঙালী কিন্তু বাঙালীর উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা, বিশেষ করে তার সাহিত্য, শিল্প আর সংস্কৃতির জন্য। নিজেও আমি বাংলাটা ভাল করে শিখেছি এই জন্যে। আর এই জন্যেই আমার ইচ্ছা এবার সিনেমা ব্যবসাতে নামব। সেই জন্যেই আপনাদের কাছে আসা। এ বিষয়ে আমার মনে নূতন ধরনের একটা প্রেরণা এসেছে। সেটা আপনাদের কাছে খুলে বলতে চাই। সুলীনা দেবী কোথা?"

"সে একটু বাইরে বেরিয়েছে। আমাকে বলতে পারেন কি আপনি করতে চান।"

"আমি একটা ভাল ছবি করতে চাই। নায়িকা-প্রধান ছবি। সুলীনা দেবী হবেন তার নায়িকা। তাঁকে আমি ছবিতে দেখেছি, দূর থেকেও একবার দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে আমার। আমার আর একটা প্ল্যান আছে, আর সেইটিই হচ্ছে আমার 'ওরিজিনালিটি'—যদি অনুমতি করেন সেটাও আমি বলি—"

"বলুন—"

"ছবিওলারা সাধারণত একটা ভুল করেন বাইরে থেকে গল্প নিয়ে। সে গল্প সাহিত্যের বাজারে হয়তো খুব নামী গল্প, ধরুন রবীন্দ্রনাথের গল্প বা শরৎবাবুর গল্প, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ছবিতে সে গল্প ঠিক ওৎরাচ্ছে না। এর কারণ কি জানেন? কারণ সে গল্প নায়ক বা নায়িকার প্রাণের গল্প নয়। সে গল্প যেন জোর করে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ছবি নায়ক-প্রধান হয় তাহলে সে গল্প নায়কের প্রাণের স্বতোৎসারিত গল্প হওয়া চাই, তবেই তা জমবে। ছবিটি যদি নায়িকা-প্রধান হয় তাহলে নায়িকাকেই সে গল্প লিখতে হবে, অপর লোককে দিয়েও সে গল্প তিনি লেখাতে পারেন কিন্তু সে গল্পের উৎস হওয়া চাই তাঁর প্রাণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমি ছবিটি নায়িকা-প্রধান করতে চাই, তাই আমার ইচ্ছে সুলীনা দেবীকে দিয়েই বইটা লেখাব।"

এরূপ উদ্ভট প্রস্তাব ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। সুলীনা রূপসী এবং যুবতী বটে, অভিনয়ও মন্দ করে না, কিন্তু সে যে মূর্খ, ক-অক্ষর গোমাংস—সে বই লিখিবে কি করিয়া। লোকটা পাগল নাকি! আমার মনের আসল কথাটা অবশ্য খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। একটু দ্বিধাভরে বলিলাম, "সুলীনা কি বই লিখতে পারবে?"

"এই কলকাতা শহরে থাকলে পারবেন না। কিন্তু ওঁকে যদি কাশ্মীরের স্বপ্নময় পরিবেশে রঙীন আবহাওয়ায় নিয়ে গিয়ে আরামে আনন্দে রাখা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই পারবেন। দেখবেন তখন মাস্টারপীস একখানা বেরিয়ে যাবে ওঁর মন থেকে। আর সেটাই হবে ওঁর হিট্ পিক্চার।"

কি আর বলিব, নির্বাক হইয়া রহিলাম।

গজপৎ বলিয়া চলিলেন—"কাশ্মীরে আমার একটা ভালো বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে সুলীনা দেবী থাকবেন, আর থাকব আমি। উনি গল্প ডিক্‌টেট করবেন, আমি টুকব! এটা একটা নূতন ধরনের এক্‌স্‌পেরিমেন্ট, আশা করি আপনারা এতে বাধা দেবেন না।"

শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা বলে কি! ইচ্ছা হইল লোকটাকে দূর করিয়া দিই, কিন্তু গজপৎ অত্যন্ত ধনী লোক, তাহাকে সোজা গেট দেখাইয়া দিবার সাহস হইল না। একটু মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আপনি যা বলছেন তা কি করে হতে পারে। সুলীনা কুমারী মেয়ে, আপনি যা বলছেন তা করলে—"

"কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তাই 'অল্‌টারনেটিভ' প্রস্তাবও ভেবে এসেছি একটা। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সুলীনা দেবীকে আমি বিয়ে করতেও রাজি—

ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "এ প্রস্তাবে আমার অবশ্য 'না বলবার মুখ নেই, কারণ আমার ছেলেই অসবর্ণ বিয়ে করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুলীনারও একটা মতামত আছে। সেটা না জানলে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তাছাড়া এর একটা আর্থিক দিকও আছে—"

"হ্যাঁ, আছে বই কি—" গজপৎ আমার কথাটা যেন লুফিয়া লইলেন—"সেটাও আমি ভেবেছি। সুলীনা যদি আমাকে বিয়ে করে তাহলে তাকে আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেব। আর বিয়ের সময় যৌতুক দেব নগদ এক লাখ টাকা। আমার সম্পত্তির বর্তমান ভ্যালুয়েশন এক কোটী টাকার উপর। আর তিনি যদি আমাকে বিয়ে না করতে চান, তাহলে যতদিন তিনি আমার কাছে থাকবেন ততদিন প্রতিমাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে পাবেন।"

"আমার তাতে কি লাভ—"

শুষ্ক একটা হাসি হাসিয়া কথাটা শেষে বলিয়াই ফেলিলাম।

"আপনিও আমার সিনেমা কোম্পানিতে বাঁধা স্ক্রিপ্ট রাইটার হয়ে থাকতে পারেন। আপনাকে এজন্য মাসে হাজার টাকা করে দেব।"

"হাজার টাকায় আমার সংসার চলে না।"

"কত হলে চলে?"

"মাসে তিন হাজার টাকা—"

"বেশ, তাই দেব, আপনি সুলীনাকে রাজী করান।"

আমার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল, কানের দুই প্রান্তে এবং চোখের চারিপাশে আগুনের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। আনন্দে, ভয়ে না ঘৃণায় তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আচ্ছা সুলীনা আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে দেখি—"

"আচ্ছা, কাল আমি ঠিক এই সময়েই আসব। সুলীনা দেবীও যদি থাকেন সে সময় ভালো হয়। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন—

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

নীল মোটরটা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইলাম সেই খেঁকি কুকুরটা বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কথা কহিয়া উঠিল।

"খানিকক্ষণ দার্জিলিং বাস করে এলাম। আমাদের দার্জিলিং নর্দমা। গরম অসহ্য হলে নর্দমায় গা ডুবিয়ে বসে থাকি খানিকক্ষণ। এমনি গরম তো আছেই, তাছাড়া আমার প্রেমের গরমও সারা দেহ-মনকে সরগরম করে তুলেছে। তাই বাধ্য হয়ে নর্দমার দিকে ছুটেছিলাম। আমি অনেকক্ষণ এসেছি। ওই নীল মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল বলে এতক্ষণ আমাকে দেখতে পাওনি। বাঃ, জিমিকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে। ওকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়েছ বুঝি? আহা, আমাকেও কেউ যদি সাবান দিয়ে স্নান করাতো রোজ, দেখতে আমারও রূপ অমনি ঠিকরে পড়ত। আমি কুৎসিত নই। দুর্দশার কালিমায় আমার আসল রূপ চাপা পড়েছে। সত্যিই আমি রূপবান। শুধু আমি কেন, সব কুকুরই রূপবান। যে কুক্কুরবংশে ককার্স স্প্যানিয়েল, অ্যালসেশিয়ন, সেন্ট বার্নার্ড, গোল্ডেন রিট্রিভার্স আছে, সে বংশের গৌবব তোমাদের ওই জিমি, সেই বংশে কেউ কুৎসিত কুরূপ নয়। সবাই সুন্দর। কেবল তোমাদের সংসর্গে এসেই আমাদের কারো কারো দেহে অসুন্দরের ছায়া নেমেছে। তোমরা সাম্য সাম্য নিয়ে চীৎকার কর, কিন্তু তোমরা সাম্যের 'স'ও জান না। যা কিছু কর নিজেদের ভোগের জন্য কর। আর আমাদের তোমরা কি জাদুতে মুগ্ধ করেছ জানি না, আমরা তোমাদের শতদোষ জেনেশুনেও

তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা আমাদের দু'পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছ তবু তোমাদের ত্যাগ করে যেতে পারি না। পৃথিবীতে যত রকম দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল বা আছে তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে আমাদের দাসত্বটা। তোমরা চিরকাল প্রভু, আমরা চিরকাল তোমাদের দাস। আমরা বিচারবুদ্ধিহীন হতভাগ্য জীব। আমরা জানতেও চাই না আমাদের প্রভু প্রতিভাবান না সাধারণ লোক, বিদ্বান না মূর্খ, চোর না সাধু—আমরা যেখানে থেকেই হোক এক টুকরো রুটি এবং একটু আদর পেলেই কৃতার্থ হয়ে ল্যাজ নাড়ি। আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে অবশ্য, তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসেনি, আসতে চায়ও না। তারা বনে থাকে, তোমরা তাদের বন্যকুকুর বল। তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকে, তাই তাদের ভয়ে তোমরা অস্থির। সুযোগ পেলেই গুলি করে তাদের মেরে ফেল তোমরা, কিন্তু এখনও পোষ মানাতে পারনি তাদের। তারা এখনও বিদ্রোহী, তারা এখনও তোমাদের এই পচা সমাজের খাঁচায় ঢোকেনি। দেখ, দেখ, দেখ, তোমার জিমি আমায় দেখতে পেয়েছে, আমার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘনঘন ল্যাজ নাড়ছে। ও ল্যাজ নাড়ার অর্থ আমি বুঝি। সার্থক হয়েছে আমার সাধনা, আমার প্রণয় নিবেদন ওর মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে, তোমার ওই শিকল লোহার না হলে এখুনি ওটা ছিঁড়ে ও ছুটে চলে আসত আমার দিকে। আহা খুলে দাও বেচারীকে—খুলে দাও, খুলে দাও—''

আবার একটা মোটরের শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে সুলীনার সেই ভাঙা গাড়িটাই আসিতেছে। হ্যাঁ, সুলীনারই গাড়িটা গেটের সামনে আসিয়া থামিল। কিন্তু কই, সুলীনা ছুটিয়া নামিয়া আসিল না তো। রমেনও না। একটি চাকর আসিয়া একটি চিঠি দিল। সুলীনার চিঠি।

শ্রীচরণেষু,

জেঠু, আমি আর ফিরলাম না। আর ফিরবও না বোধহয়। আমি রমেনকে বিয়ে করেছি, ওকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটাব এবার। বিয়েটা আজই হয়েছে। ভেবেছিলাম আজকে রমেনকে ওখানে নিয়ে গিয়ে কথাটা বলব তোমাকে। দুজনে তোমাকে প্রণাম করে আরম্ভ করব আমাদের নূতন জীবন। কিন্তু তা আর হল না। এখানে এসে দেখি রমেন জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। মধুপুরে সে বদলি হয়েছে নাকি। আমিও ওর সঙ্গে মধুপুর চললাম। সেইখানেই কোনও পলাশবনে ওর জন্মোৎসব করব। আমারও আজ নব জন্মদিন। মৃত্যুদিনও বলতে পার। অভিনেত্রী সুলীনার মৃত্যু হল, জন্মাল নূতন একটি লোক। সে ঠিক আগেকার টেঁপি বা শংকরী নয়; সে একেবারে নূতন লোক; তার নাম রমেনের গৃহিণী। জেঠু, এতদিন পরে আমি আমার জীবনের সত্যতীর্থে পৌঁছে গেছি, দেখতে পেয়েছি দেবতাকে, আবিষ্কার করেছি নিজের রাজ্য যেখানে আমি সত্যিই রাজরানী, যেখানে আমি সত্যিই স্বাধীন। এতদিন স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি, এতদিন কেবল দাসীবৃত্তি করতে হয়েছে। সিনেমায় নামার আগে আমার কি যে জীবন ছিল তা আর কেউ না জানুক তুমি জানতে। সেই ভোর পাঁচটা থেকে উঠে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার হাত পায়ের বিরাম থাকত না—সকলের মন রাখা। অত করেও কিন্তু কারো মন পাইনি, একমাত্র তোমার মন ছাড়া। তুমি আমার কষ্ট বুঝতে। জেঠু আমিও তোমার কষ্ট বুঝতাম, বাড়ির আর কেউ তোমার মনের কথা বুঝত না। সবারই লক্ষ্য ছিল কেবল তোমার ব্যাংক ব্যালান্সের দিকে। তারপর আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে সিনেমার যুগ এসে গেল। ভাবলাম বুঝি মুক্তি পেলাম। কিন্তু সিনেমার মধ্যে ঢুকে দেখলাম এ আর এক রকম দাসীবৃত্তি।

প্রডিউসার, ডিরেক্টার, পাবলিক, বক্স-অফিস এরাই মালিক, এদের মনে রেখে না চলতে পারলে সিনেমার অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতিলাভ করা যায় না। নিজের মতো করে অভিনয় করবার স্বাধীনতা নেই। এমনি করে দাঁড়াও, এমনি করে চাও, হাতটা তোল, পা-টা বাড়াও, এবার একটু মুচকি হাস—এই ধরনের নানা হুকুম মেনে অভিনয় করতে হয়। আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। নিজস্ব শুধু আমার দেহটা, সেইটেই নানারকম ভাবে প্রদর্শন করাই ওদের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আরও যে-সব কুমতলবের ষড়যন্ত্রে অহরহ পড়তে হয় এবং নানা কৌশলে তার থেকে বেরিয়ে আসতে হয় তার কাহিনী সবাই জানে, কিংবা আন্দাজ করে। এই সত্য বা মিথ্যা কলঙ্কের কাহিনী প্রত্যেক অভিনেত্রী নাগপাশে জড়িয়ে আছে, এর থেকে তাদের মুক্তি নেই, এ-ও একরকম বন্দীত্ব। টাকা অনেক পেয়েছি সত্য, মুঠো মুঠো পেয়েছি, কিন্তু মুঠো মুঠো খরচও করেছি। একটা প্রবল বানের মতো এসেছে আর চলে গেছে, ঘরের যা যৎসামান্য জিনিস ছিল তা-ও ভেসে গেছে তার সঙ্গে। তবে ওই সিনেমা জীবনের কাছে আমি একটি জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ। সিনেমায় নেমেছিলাম বলে রমেনের নাগাল পেয়েছি। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই ওৎড়াই ভাঙতে পেরেছিলাম বলেই অমরনাথের দেখা পেয়েছি। এতদিন পরে মনে হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান পেলাম। এবার দুজনে মিলে যে জগৎ আমরা সৃষ্টি করব সে জগতের আমরাই অধীশ্বর এবং অধীশ্বরী। আমি আর ও বাড়িতে ফিরে যাব না। ওখান থেকে যে কাপড় গয়নাগুলো পরে এসেছিলাম সেগুলোও ড্রাইভারের হাতে ফেরত পাঠাচ্ছি। রমেন আমাকে টুকটুকে লালপাড় শাড়ি আর কাচের চুড়ি কিনে দিয়েছে। আমার যা কিছু ওখানে আছে, সব তোমাকেই দিয়ে দিলাম জেঠু। ও নিয়ে যা করবার তুমিই কোরো। আমার ব্যাংকে কিছু টাকা এবং 'ভল্টে' কিছু গয়না আছে। সেগুলোও তোমাকে দেব। আমার অতীত জীবনের জের টেনে আমি নূতন জীবন আরম্ভ করতে চাই না। আমার নূতন জীবন হবে সম্পূর্ণ নূতন। ও বাড়ি ছেড়ে আসতে আমার একটুও দুঃখ হচ্ছে না। কেবল একটি দুঃখ, তোমাকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে। তোমার দুঃখ ও বাড়ির কেউ বুঝবে না। আর এ-ও বুঝতে পারছি তুমি এ বয়সে সব ফেলে দিয়ে ও বাড়ির ছেড়ে চলেও আসতে পারবে না। ও বাড়িতে তোমার অনেক বন্ধন। ট্রেনের আর বেশী দেরি নাই। তাই এবার এইখানেই থামি। ইচ্ছে ছিল তোমাকে প্রণাম করে যাব। কিন্তু একই দিনে বিয়ে এবং মধুপুর যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হল বলে সময় পেলুম না। পরে আর একদিন তোমাকে এসে প্রণাম করে যাব। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর এবার যেন সত্যি সুখী হই। আমাদের প্রণাম নিও। ইতি—

প্রণতা টেঁপি।

চিঠিখানা পড়িবার পর মনে হইল আমার দেহভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে। মনে হইল এতক্ষণ যাহা আমাকে মুগ্ধ করিতেছিল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা উথলিয়া উঠিতেছিল তাহা মরীচিকা মাত্র। যাহাকে সুদৃঢ় পর্বত মনে হইয়াছিল অনুভব করিলাম তাহা মেঘ, পর্বত নয়, দেখিতে দেখিতে তাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল। আর আশ্চর্য আমার শরীরের ভারও যেন অনেকটা লাঘব হইল। তাহা হইলে সুলীনাই কি আমার ভার ছিল? কিন্তু সে তো—কথাটা ভালো করিয়া ভাবিবার অবসর পাইলাম না। ড্রাইভারটা বলিল, "এ জিনিসগুলো কি ভিতরে পাঠিয়ে দেব হুজুর?"

দেখিলাম সে একটি বড় প্যাকেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"হ্যাঁ, ওগুলো ভিখনকে দিয়ে দাও—"

ড্রাইভার ভিখনের খোঁজে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। হঠাৎ আমার গেটের দিকে নজর পড়িল। চমকাইয়া উঠিলাম। দেখিলাম খেঁকি কুকুরটার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হইয়াছে। সে আর খেঁকি নাই, সে সুস্থ সবল যুবক কুকুর। তাহার সর্বাঙ্গে ভ্রমরকৃষ্ণ থোকো থোকো লোম, ঝোলা ঝোলা কান দুইটি যেন কালো মখমল। চোখ দুইটিতে পদ্মরাগমণি জ্বলিতেছে। সেই কাদামাখা খেঁকি কুকুরের এ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল কি করিয়া!

কুকুরই উত্তর দিল।

"পরশমণির ছোঁয়া পেলে লোহাও সোনা হয়ে যায়, প্রেমের গুণে শুষ্ক তরুও মঞ্জুরিত হয়—এসব তোমরাই বল। তাহলে আশ্চর্য হচ্ছ কেন এখন? জিমির প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে আমার সর্বাঙ্গে। তাই আমি জরা-ব্যাধিমুক্ত হয়েছি। জিমি আমাকে তার সারা অন্তর দিয়ে যে ভাবে চেয়েছে সেই ভাবেই আমি আবির্ভূত হয়েছি এখন। আমি এখন প্রথম শ্রেণীর ককার্স স্প্যানিয়েল। জিমির জন্যে এতদিন ধরে যে তপস্যা করছিলাম আমি, তাতে সিদ্ধিলাভ করেছি। জিমিকে আর আটকে রেখ না, খুলে দাও।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বারান্দায় গিয়া জিমিকে খুলিয়া দিলাম। জিমি ছুটিয়া গেটের বাহিরে চলিয়া গেল, আমার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষীর কথা

যোগেন্দ্রনাথের ভোগী সত্তা এতক্ষণ যাহা বলিলেন তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্যও নহে। তাহা অর্ধ সত্য। রমেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে ভোজের কথা তিনি বলিয়াছেন সে ভোজের আয়োজন তিনিই করিতেছিলেন। সুলীনা বা রমেনের প্রতি স্নেহবশত নহে; রমেনের প্রতি তাঁহার কোনো স্নেহ ছিল না বরং বিরূপতাই ছিল। তাহার জন্মদিনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া উৎসব করিবার আন্তরিক কোনও আগ্রহ তাঁহার ছিল না। তিনি ইহা করিতেছিলেন সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে মনোবৃত্তি শিকারীকে ফাঁদ পাতিতে প্ররোচিত করে। কিছুদিন হইতে তিনি অনুভব করিতেছিলেন সুলীনার সহিত তাঁহার বন্ধন ক্রমশ যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। যদিও নিজে তিনি কখনও প্রেমে পড়েন নাই তবু তিনি জানিতেন ইতিহাস বা কাব্যে প্রেমের যে মহিমা কীর্তিত যে মহিমার দীপ্তিতে পার্থিব সব কিছুই ম্লান হইয়া যায়। ঐশ্বর্য, খ্যাতি, সামাজিক মর্যাদা সবই তুচ্ছ মনে হয় তাহার কাছে। সুলীনা রমেনের প্রেম ঠিক এতটা উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছিল কিনা যোগেন্দ্রনাথ জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা ছিল হয়তো সুলীনা মীরা বা রাধার মতো সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া রমেনকেই শেষে আশ্রয় করিবে। তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে সিনেমা জগতের নামজাদা ডিরেকটার এবং প্রডিউসারদের নিমন্ত্রণ করিয়া রমেনকেও তাহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন এবং গোপনে তাহাদের বলিবেন যে রমেনকে যেন তাঁহারা ছোটখাটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দেন। না দিলে হয়তো অঘটন ঘটিবে। রমেন হয়তো সুলীনাকে সিনেমা জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারও যদি জাত মারিয়া দেওয়া যায়, তাহাকেও যদি অভিনয়

জগতে টানিয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে এ দুর্ভাবনা আর থাকিবে না। জুপিটার সিনেমার শর্মার কাছে কথাটা তিনি আগেই একদিন পাড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন রমেনের চেহারা যদি ভালো হয় এবং সে যদি ভিলেনের পার্ট করিতে রাজী থাকে তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার 'তিন টেক্কা' চিত্রে একটি ভূমিকা তিনি দিতে পারেন। তিনি নিজেই 'তিন টেক্কা'র কাহিনীকার এবং নিজেই তিনি বইটির পরিচালকও হইবেন এই রকম একটা বাসনা তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে। অবশ্য ব্যাপারটার রূপ-পরিগ্রহ করিতে এখনও বছর দুই লাগিবে। যোগেন্দ্রনাথ এ আশাও করিয়াছিলেন যে নানা কৌশলে রমেনকে ক্রমশ তিনি ঘর-জামাই করিয়া ফেলিবেন। রমেনও যদি অভিনেতারূপে নাম করিতে পারে তাহা হইলে সুলীনার আয় অনেক বাড়িয়া যাইবে। সুলীনার আয়, মানে, তাঁহারই আয়। এই সব চিন্তার ফলেই তিনি রমেনের জন্মোৎসব ঘটা করিয়া করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলীনা যখন আসিল না, সুলীনার পরিবর্তে রঙ্গমঞ্চে যখন বি. এন. গজপৎ আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি একটু হতাশ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই হতাশার মধ্যেও সামান্য একটু আশার আলো যে ছিল না তাহা নয়। গজপৎ-এর উদ্ভট প্রস্তাবটা তাঁহার প্রথমে খুব ভালো লাগে নাই, এ লোকটার আসল উদ্দেশ্য যে কাশ্মীরের স্বপ্নময় পরিবেশে লইয়া সুলীনাকে ভোগ করা, একথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। একথা বুঝিবার পর গজপৎ-কে অর্ধচন্দ্র দিয়া দূর করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই, দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। গজপৎ যে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন সে দুইটিই অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে অত্যন্ত লোভজনক। সুলীনা যদি গজপৎকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার বিরাট সম্পত্তির সে-ই অধিশ্বরী হইবে। আর বিবাহ না করিয়া যদি রক্ষিতা হইয়া থাকিতেই সে রাজী হয়, তাহা হইলেও মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাহাও নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া তাঁহাকে মাসে আলাদা তিন হাজার করিয়া দিতে তিনি রাজী হইয়াছেন—যোগেন্দ্রনাথ লোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই যখন তিনি গজপৎকে বলিলেন, 'আচ্ছা, সুলীনা আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে দেখি'—তখন গজপৎকে এড়াইবার জন্য তিনি স্তোকবাক্য মাত্র বলেন নাই। তাঁহার নিজেরও ইচ্ছা ছিল এ বিষয় কথা বলিয়া সুলীনাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সুলীনা আসিল না। আসিল তাহার মর্মস্পর্শী চিঠিখানা। যোগেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-সৌধ চুরমার হইয়া গেল। তিনি খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর জিমিকে খুলিয়া দিলেন জিমির প্রণয়ী সেই লোম-ওঠা কুকুরটা তাঁহার চক্ষে সত্যই অপরূপ-কান্তি অভিজাত কুকুরের-রূপ পরিগ্রহ করিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী জীবন-দর্শন সব যেন বদলাইতে লাগিল। বহুকাল পূর্বে শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর পাঠ করিয়াছিলেন। তাহারই শ্লোকগুলি আবার তাঁহার কর্ণের কাছে যেন মেঘমন্দ্রে বাজিতে লাগিল। তাহার পর বাজিয়া উঠিল 'ফোন'টা। পাওনাদারের তাগাদা! সহসা মনে হইল বাজারে অনেক দেনা জমিয়াছে। ফোনটি নামাইয়া রাখিতে না রাখিতেই আবার সেটা বাজিয়া উঠিল। একজন চরিত্রহীন জমিদার তাঁহার বাগানবাড়ির এক পার্টিতে তাঁহাকে এবং সুলীনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথ ফোনটা নামাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন তিনি মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, আর সংসারে থাকিব না। এবার নূতন পথে চলিয়া নূতন জীবন যাপন করিতে হইবে।

যোগেন্দ্রনাথ কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার বাবা যে বাড়িটাতে ছিলেন দৈবক্রমে সেই বাড়িটাই পাইয়া গিয়াছেন তিনি। বাড়িটার অত্যন্ত দুরবস্থা, কিন্তু তবু এই বাড়িটাই তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ঘরের দরজা জানালা ভাঙা, অনায়াসে চোর প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু চোর প্রবেশ করে না, কারণ চুরি করিবার মতো কোনো দ্রব্যই তাঁহার নাই। গৃহিণী যদি তাঁহার সহিত আসিতেন তাহা হইলে হয়তো ভালো বাড়ি ভাড়া করিতে হইত। কিন্তু গৃহিণী আসেন নাই। যোগেন্দ্রনাথ যখন তাঁহাকে বলিলেন, "আমার আর সংসার ভালো লাগছে না। আমি কাশীবাস করতে চাই। তুমিও চল!"

"আমরা চলে গেলে সংসার চালাবে কে?"

"সংসার আমরা চালাই না, সংসার আপনি চলে। ছেলেমেয়েদের উপর ভার দিয়ে চল আমরা চলে যাই।"

"আমার বই থেকে যে আয় হয় তা ওরা নিক। আমাদের বাড়িটাও বেশ বড়, চারটে ফ্ল্যাট অনায়াসে করা যায়। একটা বা দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকুক, বাকিটা ভাড়া দিক। তার থেকে কিছু আয় হবে। তাছাড়া আমরা চলে গেলে বিশু আর তার বউ বোধ হয় এখানে আসতে আপত্তি করবে না। তারাও ভালো রোজগার করে শুনেছি। ওদের চলে যাবেই এরকম করে। চল আমরা কাশী যাই।"

"আর মেয়েরা? তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা? তোমার মামা?"

"ওরা নিজেদের বাড়িতে চলে যাক। আমি আর কতদিন ওদের পুষব। যতদিন সামর্থ্য ছিল পুষেছিলাম। এখন আর পাচ্ছি না, চল যে ক'দিন বাঁচি শান্তিতে থাকি গিয়ে।"

গৃহিণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কাশী গিয়ে শান্তি পেতে পার, আমি পাব না। না মরলে আমার শান্তি নেই। তা-ও আছে কিনা জানি না। তোমরা পুরুষরা খেয়াল মতো যখন যা খুশী করতে পার কিন্তু আমরা মেয়েরা তা পারি না। আসছে মাসে রত্নার ছেলে হবে। বৌমাও পোয়াতি শুনেছি। তোমার মামার রোজ ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে, একটা ভালো ডাক্তার ডেকে দেখানো দরকার। চল বললেই কি সংসার ফেলে হুট করে চলে যাওয়া যায়। আর তোমারই বা কাশী গিয়ে কষ্ট করে থাকবার দরকার কি। মহাদেবের মূর্তি সামনে রেখে দোতলায় তোমার ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাক না। আমরা কেউ তোমায় বিরক্ত করব না। মন যদি শুদ্ধ থাকে এইখানেই তুমি বাবা বিশ্বেশ্বরকে পেতে পারবে।"

যোগেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার সহধর্মিণী নহেন। তিনি তাঁহার মর্মের ভাষা বুঝিতে বরাবরই অপারগ। বলিলেন, "তোমার ওসব বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি!

"না। আমি যেতে পারব না।"

"তাহলে আমি আমার বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি যা আছে তা তোমার নামে লিখে দিয়ে যাচ্ছি। সুলীনার একাউন্টে দশ হাজার টাকা আছে, তার গয়নাও আছে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার। সে সব আমাকে দিয়ে গেছে। সেগুলোও তুমি নাও—"

দেখা গেল যোগেন্দ্রনাথের গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে আত্মসম্মানবিবর্জিতা নহেন। এ কথা শুনিয়া তিনি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুলীনার গয়না টাকা আমি নেব কেন? তোমাকে দিয়ে গেছে তুমি নাও।"

"আমিই তো তোমাকে দিচ্ছি—"

"না, আমি ওর টাকা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও ছোঁব না।"

যোগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, তুমি থাক তাহলে। আমি চললুম—। বিশুর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি তাহলে।"

যৎসামান্য অর্থ লইয়া যোগেন্দ্রনাথ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিস তিনি সঙ্গে আনেন নাই। তাঁহার বাবার সেই ভাঙা ট্রাঙ্কটি তাঁহার কাছে ছিল। সেই ট্রাঙ্কে করিয়াই সামান্য কিছু কাপড়চোপড় আনিয়াছিলেন। চারখানি কাপড়, দুইটি পাঞ্জাবি, দুইটি গামছা, এবং দুইটি রুমালের বেশী আর কিছু আনেন নাই। কাশীতে আসিয়া বাবার সেই পুরাতন গৃহটি পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সেই ঘরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তিনি। নিকটেই একটি ছোট হোটেল ছিল। সৌভাগ্যক্রমে হোটেলের মালিক মোহিত চক্রবর্তী লোকটি ভদ্রলোক। তাঁহাকে গিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি একবেলা আপনার হোটেলে নিরামিষ খাবার খাব। আর রোজ সেরখানেক করে দুধ আমাকে বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আর আমার কিছু লাগবে না।"

"চা খাবেন না? চাও আমরা করে দিতে পারি।"

"চা এখন আর খাই না। আগে খেতাম। সেরখানেক দুধ হলেই আমার চলে যাবে।"

"দুধটা কি আপনার বাসায় পৌঁছে দেব?"

"যদি আপনার হোটেলেই রেখে দেন ক্ষতি কি। আমি এসে খেয়ে যাব। এতে কি আপনার অসুবিধা আছে?"

"না, না, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। হোটেলের চার্জ কুড়ি টাকা আর দুধের জন্য ত্রিশ টাকা, মাসে এই পঞ্চাশ টাকা আপনার লাগবে। আমি হরি গোয়ালাকে বলে দেব সে সামনে দুধ দুয়ে দেবে। তার গুরুর দুধও খুব মিষ্টি।"

"এ মাসের টাকাটা তাহলে অগ্রিম দিয়ে দি—"

"টাকার জন্যে কি আছে, পরেও দিতে পারেন।"

"সঙ্গে যখন রয়েছে নিয়েই নিন না—"

যোগেন্দ্রনাথ টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বাড়িটা সস্তায় পাইয়াছিলেন। ওই ভাঙা বাড়ির ভাড়াটে জুটিত না। বাড়ির মালিক বাড়িটা ভাড়াও দিতে চাহেন নাই। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে শেষে রাজী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"বেশ মাসে তাহলে টাকা পঁচিশেক দেবেন। মিউনিসিপাল ট্যাক্সটা আমার তাহলে ঘর থেকে লাগবে না।" বাড়ি ভাড়াও তিনি মাসের প্রথমে দিয়া দিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহার মুশকিল হইল এত সময় লইয়া কি করিবেন এই ভাবিয়া। রাত্রে চার পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুম হয় না। দিনে একেবারেই হয় না। কোনো কাজ নাই, কোনো অবলম্বন নাই, সময় কাটে কি করিয়া! প্রথম প্রথম তিনি খুব বেড়াইতে লাগিলেন। মোটরে চড়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, হাঁটিয়া বেড়াইতে কষ্ট হইত। তবু কষ্ট করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত হইলে বসিয়া পড়িতেন। বসিয়া রাস্তার জনস্রোত দেখিতেন। এ দৃশ্য তাঁহার বড় ভালো লাগিত। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়াই তিনি কাশীর দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার উপলব্ধি হইল যে মনের ক্ষুধা ইহাতে মিটিতেছে না। জনস্রোত বা মন্দির, প্রাসাদ বা বিশ্ববিদ্যালয়, গঙ্গার ঘাট বা

দেবতার মন্দির যত বিচিত্র, যত মহৎ, যত পবিত্রই হউক না কেন তাহাদের উপরে একবার মাত্র চোখ বুলাইলে তৃপ্তি হয় না। তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাদের লইয়া মাতিয়া উঠিতে হয়, তাহাদের সত্তার সহিত মিশিয়া যাইতে হয় তবে আনন্দ মেলে, তবে মনের ক্ষুধা মেটে। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তাহা পারিলেন না, তাঁহার অবশেষে একদিন মনে হইল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। সারাজীবন তিনি শিক্ষকতা এবং সাহিত্যচর্চা করিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহাও করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জানিতেন শিক্ষকতা করিতে চাহিলে তাঁহাকে কোথাও শিক্ষকতার চাকরি করিতে হইবে। চাকরির যে কি মর্ম তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না; তিনি হয়তো চেষ্টা করিলে কোথাও একটা চাকুরি জুটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যতটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে চাকুরি করিলে সেটুকুও আর থাকিবে না। সাহিত্যচর্চার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার যেটুকু ছিল সেটুকু যৌবনেই নিঃশেষিত হইয়াছে, এতদিন ত্রিভুজোপম প্রেমের গল্প লিখিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা হাস্যকর ধাষ্টামি মাত্র। তাঁহার অনেক রসিক বন্ধু তাঁহাকে একথা লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তিনি নিজেও জানিতেন নিজের অন্তরের কামনা কলুষকে দু'চারিটি ধর্মকথার ফুল বিল্বপত্র ঢাকা দিয়া মহৎ সাহিত্য করা যায় না। মহৎ সাহিত্যের জন্য মহৎ কল্পনা চাই, মহৎ চরিত্র চাই। সর্বোপরি চাই অলোকসামান্য প্রতিভা। তিনি জানিতেন ওসব তাঁহার কিছুই নাই। লিখিতেন টাকার জন্য। এখন তো আর টাকার প্রয়োজন নাই, আর ওসব কেন। যদি লিখিতেন তাহা হইলে হয়তো প্রকাশক জুটিত, ব্যাঙের ছাতার মতো যে সব পত্রিকা অলিতে গলিতে নিত্য গজাইতেছে তাহারা হয়তো সে সব ছাপিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থও দিত, কিন্তু তাঁহার আর অর্থের প্রয়োজন ছিল না, লোভেরও অবসান হইয়াছিল, তাই তিনি আর সাহিত্যচর্চা করিবার কোনো প্রেরণা পাইলেন না। তিনি আসিয়া তাঁহার গৃহিণীকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন—'আমি এখানে বেশ সুখে আছি। তোমরা আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না। মাঝে মাঝে তোমাদের খবর দিতে পার, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু করিও না। আর ফিরিয়া যাইব না। আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তোমরা যদি চেষ্টা কর তাহা হইলে স্থির জানিও তোমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তোমাদের জন্য আমার যদি মন কেমন করে আমি নিজেই যাইব। তোমরা এখানে আসিও না।' ইচ্ছা করিয়াই পত্রে তিনি নিজের ঠিকানা দেন নাই। কিন্তু তথাপি কয়েকদিন পরে সভয়ে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বড় ছেলে এবং স্ত্রী খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাসায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারাণত যাহা নিজেদের মোক্ষম অস্ত্র বলিয়া মনে করেন যোগেন্দ্র-গৃহিণী তাহাই প্রয়োগ করিলেন। অর্থাৎ হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্র গুম হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হইলেন না, তাহাদের বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি এখানে শান্তিতে আছি। কোনো কষ্ট নেই। তোমাদের ওই হট্টগোলের ভিতর আমাকে টেনে নিয়ে গেলে আমি হয় পাগল হয়ে যাব, না হয় অকালে মারা যাব। তোমরা সে চেষ্টা কোরো না।" তাহার পর তিনি নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছে কর আমার সঙ্গে থাকতে পার। তাতে আপত্তি করবার আমার অধিকার নেই।" কিন্তু দেখা গেল তাঁহার স্ত্রী এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের সহিতই বাস করিতে ইচ্ছুক। স্বামীকে তাহার প্রয়োজন নাই।

স্বামী চলিয়া আসাতে তাঁহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন, যদিও সরবে সে কথা একবারও তিনি বলেন নাই এবং সম্ভবত নিজের জ্ঞাতসারেও একথা ভাবেন নাই। খবরটা তাহার মগ্ন চৈতন্যলোকের এবং আমারও অনুমান মাত্র। যাই হোক, যখন যোগেন্দ্রনাথ কিছুতেই গেলেন না, তখন অবশ্য তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। যাইবার আগে তিনি হোটেলওলা মোহিত চক্রবর্তীর সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "দেখবেন ওঁর যেন খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট না হয়। উনি কে জানেন? উনি বিখ্যাত লেখক একজন। ওঁর দশখানা বই সিনেমা হয়েছে। কিন্তু এখন উনি বাবা বিশ্বেশ্বরের আদেশ পেয়ে এখানে এসেছেন গরীবের মতো থাকবেন বলে। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে একথা অবশ্য উনি বলবেন না কাউকে, কিন্তু আমি জানি কেন এসেছেন। যাই হোক, আপনি বাবা দেখবেন ওঁর যেন খাওয়া-থাকার কোনও অসুবিধা না হয়। এই আমার ঠিকানা রইল, যদি বেশী টাকা লাগে, আমাকে লিখলেই আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেব। ওঁকে আপনি কিন্তু এসব কথা যেন কিছু বলবেন না।" সংবাদ শুনিয়া মোহন চক্রবর্তী এমন ভান করিলেন যেন তিনি আকাশ হইতে পড়িয়াছেন। সাহিত্য-জগতের তিনি তেমন কোনও খবর রাখিতেন না, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে যে একজন লেখক আছেন এ খবর তাঁহার অবিদিত ছিল। কিন্তু তিনি পাকা ব্যবসাদার লোক, এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যেন যোগেন্দ্রনাথ নামক সর্বজনবিদিত লেখক তাঁহার হোটেলে অন্নগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে চরিতার্থ করিয়াছেন। স্মিতমুখে বার বার ঘাড় নাড়িয়া তিনি কথা দিলেন যে যোগেন্দ্রনাথের খাওয়ার কোনও কষ্ট তিনি হইতে দিবেন না, তাঁহার প্রাণ থাকিতে নয়। সন্তুষ্ট হইয়া যোগেন্দ্র-গৃহিণী সপুত্র ফিরিয়া গেলেন। যোগেন্দ্রনাথের খাওয়া-থাকার কোনো সমস্যা রহিল না, কিন্তু তাঁহার সমস্যা হইল সময় লইয়া। একদিন তাঁহার মনে হইল যখন কাশীতেই আসিয়াছি তখন দেখাই যাক না বিশ্বেশ্বরের চরণে মন বসাইতে পারি কিনা। এবম্বিধ প্রেরণা জাগিবার একটা কারণ ছিল অবশ্য। গৃহিণী চলিয়া যাইবার পরই হোটেল-ওলা চক্রবর্তী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং গৃহিণী তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। লোকটা তাঁহাকে মহাপুরুষ মহাকবি তপস্বী বলিয়া বিনা দ্বিধায় প্রণাম করিয়া ফেলিল। প্রথমটা যোগেন্দ্রনাথের বাক্যস্ফূর্তি হইল না! যখন হইল তখন তিনি বলিলেন, "আপনি যা বলছেন তা সত্য নয়। এসব কথা দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। বললে, অকারণে লোকের ভিড় হবে, সেটা আমি চাই না। আমি এখানে নির্জনে শান্তিতে থাকতে এসেছি। দয়া করে আমার শান্তির বিঘ্ন করবেন না।"

মোহিতবাবুর ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বেশ তাই হবে। কিন্তু আমার অ্যাসিসটেন্ট ছকু কথাটা শুনে ফেলেছে। তাকেও মানা করে দেব তাহলে কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়।"

মোহিতবাবু চলিয়া যাইবার পর তাঁহার মনে হইল, 'দেখাই যাক না বিশ্বেশ্বরের চরণে যদি মন বসাইতে পারি। আমি তপস্বী তো নইই, সামান্য সন্ধ্যাহ্নিকটা পর্যন্ত করি না; কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি। আর কিছু না হউক কিছু সময় তো কাটিবে।' তাহার পরদিনই তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেলেন এবং সেখানকার এক পাণ্ডার সহিত যোগাযোগ করিয়া সেখানে খানিকক্ষণ পূজাও করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল আর যেখানেই

বিশ্বেশ্বরের চরণে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হোক, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে তাহা হইবার উপায় নাই। চতুর্দিকে শ্বাসরোধকর ভিড়। নানা জাতের লোকের ভিড়। পাণ্ডার ভিড়, ভণ্ডের ভিড়, ভিখারির ভিড়, পূজারীর ভিড়—নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে কেবল 'দাও দাও' রব। একটি মুহূর্ত সেখানে নিঃশব্দ নহে। ঘণ্টার শব্দ, শাঁখের শব্দ, ঝাঁঝরের শব্দ, মন্ত্রের শব্দ। যে শক্তি থাকিলে এসব সত্ত্বেও মহাদেবের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া যায় সে শক্তি যোগেন্দ্রনাথের ছিল না। দিন দুই বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার তখন ধারণা হইল কোনো নির্জন স্থানে গেলে হয়তো তিনি সফলকাম হইবেন। নির্জন মনোমত স্থান পাওয়াও সহজ হইল না। নির্জন স্থানের সন্ধানে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। কয়েকদিন পরে একটা মনোমত স্থান পাওয়া গেল—ললিতা ঘাট। ছোট ঘাট এবং নির্জন। দুপুরে সেখানে কেহ থাকে না। যোগেন্দ্রনাথ ললিতা ঘাটেরই একধারে একদিন চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুদিত চক্ষুর সম্মুখে, তাঁহার মানসপটে বার বার যে সব ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার একটাও মহাদেবের ছবি নহে। তিনি কখনও তাঁহার স্ত্রীকে কখনও ছেলেমেয়েদের, কখনও বা সুলীনাকে দেখিতে লাগিলেন। জিমির মুখখানাও বার কয়েক উঁকি দিয়া গেল, সেই খেঁকি কুকুরটাও। মহাদেব এক-বারও দেখা দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইল তিনি যাহাকে ধরিয়া অথবা যে তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার জীবনের ক্লেশ ক্লান্তি অবসাদ আলস্য দূর করিতে পারেন তাহা আর যাই হোক ওই প্রস্তরমূর্তি বিশ্বেশ্বর নন। হয়তো বিশ্বেশ্বরকেই শেষ পর্যন্ত পাইতে হইবে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বেশ্বর অন্যত্র অন্য রূপে আছেন। কোথায়? কোন রূপে? যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে ক্রমাগত সন্ধান করতিে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বেশ্বর কোথায় লুকাইয়া আছেন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে এই জেদ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি প্রত্যহ পথে পথে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মনে ওই এক চিন্তা—কোথায় তিনি। একদিন বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন সুলীনার একটি চিঠি আসিয়াছে। সুলীনা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু

জেঠু, জ্যাঠাইমার কাছে ঠিকানা পেয়ে এই চিঠি লিখছি। আপনি যে কাশী চলে গেছেন সে খবর আমি শুনেছিলাম কিন্তু ঠিকানা জানতাম না বলে এতদিন আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। দাদার কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওখানে একটা হোটেলে খেয়ে খুব গরীবের মতো আছেন। আপনার ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফির দরকার হত, কতরকম খাবারের ফরমাশ করতেন—এখন নাকি সব ছেড়ে দিয়েছেন। শুনে বড়ই কষ্ট হল। উনি ছুটি পাচ্ছেন না, তা না হলে আপনার কাছে আমি চলে যেতাম। আর একটা কথা। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে আমি মাসে ত্রিশ টাকা করে পাঠাতে পারি। আপনি যদি সুখে থাকেন কাশীতেই থাকুন কিন্তু অত কষ্ট করে থাকবার দরকার কি আমরা যখন আছি। দাদাও অনায়াসে আপনাকে মাসে মাসে কিছু পাঠাতে পারেন। দাদা বৌদি দুজনের মিলে মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার করছেন। বাড়ির দুখানা ফ্লাট ভাড়া দেওয়া হয়েছে তাতেও না কি সাতশ টাকা করে পাওয়া যায়। আপনার প্রকাশকরাও নাকি দাদাকে মাসে দু'শ আড়াইশ' করে টাকা পাঠায়। আপনি দাদাকে সে টাকা নাকি সংসারেই খরচ করতে বলেছেন। জেঠু, আপনি কেন এত কষ্ট করে থাকবেন? আপনার চিঠি পেলেই আপনাকে আমি ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দেব। আরও বেশী পাঠাতে পারতুম, কিন্তু আমার একটি খোকা হয়েছে তার জন্যে খরচ বেড়েছে

কিছু। কি সুন্দর যে দেখতে হয়েছে খোকা, মুখের আদল অনেকটা আপনার মতো। উনি ছুটি পেলেই আপনার কাছে যাব ওকে নিয়ে। আর একটা কথা। আপনার সময় কাটে কি করে? চিরকাল তো লেখা নিয়ে কাটালেন, এখন কি করেন? লেখা কি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন? করেন কি সমস্ত দিন? বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যান? বই পড়েন? ওখানে আপনার কাছেপিঠে কি ভালো লাইব্রেরী আছে? সব খবর দিয়ে চিঠি লিখবেন। আপনার জন্যে খুব চিন্তা হয়। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

প্রণতা শংকরী।

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়া দিলেন।

কল্যাণীয়াষু,

তোমার পত্র পাইলাম। আমার কোনো কষ্ট নাই, বেশ সুখে আছি, আমার জন্য একেবারেই ব্যস্ত হইও না। তোমরা ব্যস্ত হইলে তাহাই আমার কষ্টের কারণ হইবে। আমাকে টাকা পাঠাইবার দরকার নাই। আমি ১৭৫.০০ টাকা পেন্সন পাই। ৭৫.০০ টাকায় আমার থাকা খাওয়া বেশ ভালো ভাবেই হইয়া যায়। মাসে ১০০.০০ টাকা করিয়া পোস্টাপিসে জমাই। তোমার আপত্তি না থাকে তো তোমার খোকার জন্য আমি মাসে মাসে কিছু পাঠাইতে পারি। তোমরা এখানে কেহ আসিও না। কোলাহলপূর্ণ আড়ম্বরময় জীবনে সুখ-শান্তি কিছুই পাই নাই, স্বার্থের আলেয়াকে অনুসরণ করিয়া নানাভাবে কেবল বিপন্ন হইয়াছি, যাহা আদর্শ বলিয়া মুখে আস্ফালন করিয়াছি তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিতে পারি নাই। তাই এবার ঠিক করিয়াছি অনাড়ম্বর একক জীবন যাপন করিব, দেখি মানবজীবনের যাহা পরম কাম্য তাহা পাই কিনা। তোমারা যদি আবার এখানে আসিয়া হাজির হও আমার সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। তাই অনুরোধ, তোমরা কেহ আসিও না। আমি এখানে সারাদিন প্রায় হাঁটিয়া বেড়াই। লিখিতে আর ইচ্ছা করে না, কারণ বুঝিয়াছি, আমার লিখিবার ক্ষমতা নাই। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখান হইতে মাইল দুই দূরে একটি ভালো লাইব্রেরী আছে শুনিয়াছি। তোমার চিঠি পাইয়া স্থির করিলাম সেইখানেই গিয়া মেম্বার হইব। বই পড়িয়াই সময় কাটাইতে হইবে। আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ লও। ইতি আশীর্বাদক জেঠু।

তাহার পরদিনই যোগেন্দ্রনাথ লাইব্রেরীতে গিয়া সভ্য হইলেন। ভাবিলেন—যাক্, অকূলে তবু একটা কূল মিলিল। কিন্তু কূলে উঠিয়াও তিনি আশ্বাসজনক কিছু দেখিতে পাইলেন না। লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। সবই প্রায় বাজে ডিটেকটিভ গল্প, না হয় তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা উপন্যাস। তাঁহারও কয়েকটি উপন্যাস আছে দেখিলেন। এই সব পড়িয়া কি তাঁহার মন ভরিবে? একটু হতাশ হইয়া গেলেন। পুস্তক তালিকার পাতা উলটাইতে উলটাইতে একটা জিনিস তাঁহার নজরে পড়িল। লাইব্রেরীতে বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ রহিয়াছে। যদি কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হইবে কিন্তু ইহা সত্যকথা যে যোগেন্দ্রনাথ রামায়ণ ভালো করিয়া পড়েন নাই। লোকের মুখে শুনিয়া ভাসা-ভাসা ভাবে রামায়ণ গল্পটা জানিতেন মাত্র। পুরাপুরি রামায়ণ কখনও পাঠ করেন নাই। হঠাৎ স্থির করিয়া ফেলিলেন রামায়ণটা এবার ভালো করিয়া পড়িতে হইবে, তাহার পর মহাভারত। রামায়ণটা লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন রামায়ণ পড়িতে বসিয়া হঠাৎ একটা নূতন প্রেরণা তাঁহার মনে

জাগিল। তাঁহার মনে হইল শুধু পড়িলেই যথেষ্ট হইবে না, বইটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। ছাত্রজীবনে কোনো কিছু আয়ত্ত করিতে হইলে তিনি সেটাকে নকল করিতেন। যখন শিক্ষকতা করিতেন তখন অনকে ছাত্রকেও তিনি এই উপদেশ দিয়াছিলেন। ঠিক করিলেন রামায়ণটাকে তিনি টুকিয়া ফেলিবেন। রামায়ণ শেষ হইলে মহাভারত। তাহার পর পুরাণ, তাহার পর উপনিষদ। তিনি সহসা সমস্ত জীবনব্যাপী একটা মহৎ কাজ পাইয়া গেলেন যেন। তাঁহার মনে হইল যে মহাকবিগণ তৃষিত মানব-মানবীর জন্য চিরন্তন সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অমর বাণীধারায় অবগাহন করিয়া তিনিও পবিত্র হইবেন, ধন্য হইবেন। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথমেই আছে, নারদ বাল্মীকিকে রামচরিত বর্ণনা করিয়া শুনাইতেছেন ঃ— "বিশ্ববিশ্রুত ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি আছেন। তিনি মহাবলবান, সুদর্শন, ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ও নির্বিকার। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান ও শত্রুসংহারকারী তেমনি দেখিতে মহাবাহু, উন্নতস্কন্ধ ও গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ভূষিত। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, ললাট সুন্দর, মাংসলতাপ্রযুক্ত তাঁহার বক্ষ ও স্কন্ধমধ্যগত অস্থি দৃষ্ট হয় না এবং তিনি পরম শক্তিমান। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত। তিনি শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব। তিনি প্রজাহিতরত, সত্যবাদী, ধার্মিক, যশস্বী ও শুচি...."

যোগেন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর আদর্শ পুরুষ আদর্শ নৃপতি রামের চরিত্র টুকিতে লাগিলেন।

এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ তখন মহাভারত শেষ করিয়া হরিবংশ আরম্ভ করিয়াছেন। সময় লইয়া কি করিবেন তাঁহার এই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি যেন আর একটা ক্ষুধা, আর একটা অতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নাই। মহাকবিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আমি তাহাই আবার লিখিয়া যাইতেছি। ইহা গঠনমূলক কোন কাজ নহে, ইহা পুনরাবৃত্তি মাত্র। কোনো কিছু গঠন বা সৃষ্টি করিতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় মানব জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। এই অতৃপ্তি লইয়াই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। তাঁহার গৃহিণী আর আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই, কারণ তিনি কাশীতে আসিবার কিছুদিন পরেই হৃদরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রকন্যারা মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়াই তাঁহার খবর লইত। তাহারাও আর আসে নাই, কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল আসিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা দামী মোটর থামিল। গাড়ি হইতে নামিয়া যে রূপসী নারীটি তাঁহাকে প্রণাম করিল তাহাকে প্রথম তিনি চিনিতে পারেন নাই।

"কে আপনি?"

নারীটি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথের মনে হইল এ হাসি আগে কোথায় যেন শুনিয়াছেন। কাচ ভাঙার আওয়াজ।

"ওকি জেঠু, আমাকে চিনতে পারলে না! আমি টেঁপি—"

যোগেন্দ্রনাথ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুলীনার রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং জগদ্ধাত্রী যেন।

"ওঁকে আর খোকনকেও নিয়ে এসেছি। ওগো তোমরা নাম না।"

রমেন একটি পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুকে লইয়া প্রবেশ করিল। রমেন যোগেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিল, কিন্তু শিশুটি করিল না।

"ও কি খোকন, দাদুকে নমো কর—"

খোকন মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুখের ভিতর বাঁ হাতের আঙুল পুরিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রণাম করিল না।

"নমো কর, নমো কর—"

কিছুতেই করিল না, শেষে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া ড্রাইভারের পাশে বসিল।

অনুনাসিক সুরে টেঁপি বলিল—"কি যে দুষ্টু হয়েছে জেঠু, আমার একটি কথা শোনে না।"

তাহার পর টেঁপি একটু থামিয়া আসল কথাটি পাড়িল।

"খোকন আপনার কাছেই থাক জেঠু। ওকে আপনিই মানুষ করুন।"

রমেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

টেঁপি বলিতে লাগিল—"আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হব।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ছেলেবেলায় সব ছেলেরই মা-বাপের কাছে থাকা উচিত। বিশেষ করে মায়ের কাছে—"

"কিন্তু আমি যে সিনেমায় নাবছি আবার। ওঁর তাই ইচ্ছে। ওঁর ধারণা আমি স্বাধীন ভাবে সিনেমায় নাবলে সিনেমা-শিল্পের একটা নূতন দিক খুলে দিতে পারব। কিন্তু সিনেমায় নাবলে বাড়িতে যে ধরনের লোক ক্রমাগত আসবে আমি চাই না খোকন তাদেব সঙ্গে মিশুক। তাই ঠিক করেছি ওকে আপনার কাছে রেখে যাব। আপনি ওকে মানুষ করুন।"

যোগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"বেশ। আমি রাজি আছি। কিন্তু ওকে আমার কাছে আমার এই বাসায় আমার মতন করে মানুষ করব। ও আমার খাবার খাবে, আমার এই দড়ির খাটে শোবে, আমি যা জামা কাপড় দেব তাই পরে থাকবে!"

"ও এখানে এ ভাবে থাকতে পারবে কি? আমি আপনাকে ভাল বাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি। চাকর বামুন রেখে দিচ্ছি—তার যা খরচ লাগে আমিই দেব।"

"না। কারো কাছে আমি হাত পাতব না।"

যোগেন্দ্রনাথের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া টেঁপি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "খোকন কি এ ভাবে থাকতে পারবে? এ ভাবে থাকতে তো ও অভ্যস্ত নয়। তার চেয়ে ভাল একটা বোর্ডিং হাউসে দি, কি বলেন।"

"তাই দাও।"

কিছুক্ষণ থাকিয়া টেঁপি মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথের মনে হইল, 'টেঁপি যদি ছেলেটাকে রাখিয়া যাইত, উহাকে মনের মতো করিয়া মানুষ করিতাম!' তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তিনি আবার মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিলেন যে সুলীনা-রমেন কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন নাই। রমেন যে সুলীনাকে আবার সিনেমায় নামাইবে ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কোনো কিছু গঠন বা সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যে অতৃপ্তি তাঁহার মনে জাগিত তাহাই আবার কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। তিনি আবার হরিবংশ নকল করিতে লাগিলেন :

"হে সুরেশ্বর, আপনি আমাকে পারিজাত নামক বর-তরু প্রদান করুন...।"

ছয় মাস পরে একটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটিল। একদিন সকালে উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথ কপাট খুলিয়া দেখিলেন একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশু তাঁহার দ্বারদেশে মলিন মুখে বসিয়া আছে। বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী হইবে না।

"কে তুমি?"

শিশু কোনও উত্তর দিল না। সজল নয়নে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কেবল।

"তোমার বাড়ি কোথা?"

তবু কোনো উত্তর নাই।

"তোমার বাবা মা কোথা?"

এইবার বালক কথা কহিল। বলিল, "আমার বাবা মা দুজনেই মারা গেছেন।"

"আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?"

বালক মাথা নাড়িয়া জানাইল কেহ নাই।

তাঁহার প্রতিবেশী বাহির হইয়া বলিলেন, "ওর বাবা মা এখানেই কলেরায় মারা গেছে। আত্মীয়স্বজনের কোনও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটা ক'দিন থেকে টং টং করে রাস্তায় ঘুরছে দেখছি। গভর্নমেন্টের এদিকে নজর দেওয়া উচিত নয়? অন্তত একটা অনাথালয়ে দিয়ে আসা উচিত ছেলেটাকে। কিন্তু কে দেবে বলুন। দিনকতক পরে দেখবেন রাস্তায় শুকিয়ে মরে পড়ে আছে।"

যোগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বালকটিও সজল দৃষ্টি মেলিয়া সোৎসুকে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভিতরে এস— তোমার নাম কি?"

"ভারু।"

যোগেন্দ্রনাথ ভারুকে কিছু মুড়ি খাইতে দিলেন। তাঁহার ঘরে আর কিছু ছিল না। তাহার পর তাহাকে লইয়া বাজারে বাহির হইলেন। জামা কাপড় কিনিয়া দিলেন তাহার। একটা শ্লেট, পেন্সিল এবং একটা বই কিনিলেন। তাহার পর তাহাকে লইয়া গেলেন মোহিত চক্রবর্তীর হোটেলে। বলিলেন, "আজ থেকে এই ছেলেটি আমার সঙ্গে খাবে। কত করে দিতে হবে?

"হাফ চার্জ দেবেন।"

"ওর জন্যে দুধও নেবেন আধসের করে।"

"বেশ। ছেলেটি কে?"

"আমার আত্মীয়।"

হোটেল হইতে তাহাকে লইয়া গেলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানে স্বহস্তে তাহাকে ভালো করিয়া স্নান করাইলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল—একটা ভুল হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য একটা গামছাও কেনা উচিত ছিল। নিজের কোঁচা দিয়াই তাহার গা মুছাইয়া দিলেন। একটা অদ্ভুত আনন্দে তাঁহার সারা হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিত পারিতেছিলেন না। অনেক কষ্টে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভারু চল এবার হোটেলে যাওয়া যাক—"

দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। ভারু ভাতটা ডাল দিয়া ভালো করিয়া মাখিতে পারিতেছিল না, নিজেই তিনি মাখিয়া দিলেন। তাহার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার খাটে শুয়ে ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি একটু বেরুচ্ছি—"

যোগেন্দ্রনাথ প্রথমে পোস্টাফিসে গেলেন। সেখান হইতে কিছু টাকা তুলিলেন। তাহার পর বাজার হইতে একটা ছোট খাটিয়া, একটা কম্বল, একটা সাধারণ বিছানা এবং একটা গামছা কিনিয়া ফেলিলেন। বাজার করিয়া এত সুখ তিনি জীবনে কখনও পান নাই। সেগুলিকে কুলির মাথায় চাপাইয়া তিনি আবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে গেলেন। সেখানে একজন জ্যোতিষী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার কাছে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতজি, বলুন তো বিদ্যারম্ভের পক্ষে আজ দিনটা প্রশস্ত কি না।"

পণ্ডিতজি পাঁজি পুঁথি খুলিয়া বলিলেন, "আজ বৃহস্পতিবার। এমনিতেই বিদ্যারম্ভের পক্ষে শুভ। বেলা তিনটের পর আরও শুভ—"

যোগেন্দ্রনাথ কোনো দিন পাঁজি বা জ্যোতিষে বিশ্বাসী নহেন, সেদিন কেন যে তিনি পণ্ডিতজির নিকট গেলেন তাহা নিজেও তিনি বোধহয় বলিতে পারিতেন না।

খবরটা লইয়া দ্রুতপদে তিনি বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন। একটা ঘড়িতে দেখিলেন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া দেখিলেন ভারু অঘোরে ঘুমাইতেছে।

"ভারু ভারু, ওঠ, ওঠ—"

ভারু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তোমার ভালো নাম কি?"

"ভালো নাম নেই।"

"তাহলে তোমার ভালো নাম হোক ভারতকুমার। এখানে এস, আমার কোলের উপর বস। প্রথম ভাগ থেকেই আরম্ভ করা যাক—"

ভারুকে তিনি টানিয়া কোলের উপর বসাইলেন। প্রথম ভাগ খুলিয়া বলিলেন, "এটা কি?"

ভারু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

"বল অ।"

"অ।"

"বাঃ—এই তো শুরু হয়ে গেল!"

সস্নেহে তিনি ভারুকে চুম্বন করিলেন। যে অতৃপ্তি এতদিন তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল তাহা সহসা যেন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া গেল।

যোগেন্দ্রনাথ সত্যই এখন সুখী।

তীর্থের কাক

।। এক ।।

গাড়িতে প্রচুর ভিড় ছিল সেদিন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরকে প্রচণ্ডতর করিয়া 'লু' বহিতেছিল। ধূলা ও বালির ঝড়ে চতুর্দিক অন্ধকার। ট্রেনের গর্জন ও ঝড়ের গর্জন যে প্রলয়-রোল তুলিয়াছিল তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কথা, কিন্তু যাত্রীদের মুখে আতঙ্কের কোনো চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। যাঁহারা বসিবার স্থান পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঢুলিতেছিলেন, কেহ খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, গুনগুন করিয়া সুরও ভাঁজিতেছিলেন একজন। ভদ্রঘরের মহিলাও ছিলেন কয়েকটি। একজনের মাথায় ঘোমটা ছিল, তিনি দুইটি আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নানা যাত্রীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছিলেন। আর একধারে কয়েকজন নোংরা-কাপড়-পরা লোক নিজেদের মধ্যে জটলা করিতেছিল। দুইজন বিড়ি ফুঁকিতেছিল, একজন ছুরি দিয়া একটা বড় ফুটি ছাড়াইতেছিল, খৈনি মলিতেছিল একজন, আর দুইজন পাটের দড়ি পাকাইতেছিল একধারে বসিয়া। কেহই নীরব ছিল না, সকলেরই রসনা দ্রুতবেগে চলিতেছিল। মনে হইতেছিল একদল ছাতারে পাখি যেন কচবচ করিতেছে। গাড়ির সব জানালা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা জানালার সার্সি হড়াম্ করিয়া খুলিয়া গেল, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া অব্যাহত বেগে প্রবেশ করিল ধূলি-ধূসরিত উন্মত্ত 'লু'। চঞ্চল হইয়া উঠিল যাত্রীরা।

"জানলাটা বন্ধ করে দিন মশাই—"

"খিড়কি বন্দ্ কর দিজিয়ে।"

"প্লিজ ক্লোজ দি শাটার্স।"

যুগপৎ তিনটি ভাষায় কলবল করিয়া উঠিল সকলে। জানালার ঠিক ধারেই বসিয়াছিল নবকিশোর। তাহারই অসুবিধা হইতেছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া সার্সিটা বন্ধ করিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সার্সিটা এমন বেকায়দায় আটকাইয়া গিয়াছিল যে কিছুতেই তোলা গেল না। নবকিশোর অনেক টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই তোলা গেল না। নবকিশোর অনেক টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু অনড় সার্সিকে আর নাড়ানো গেল না। হু হু করিয়া কামরার মধ্যে যখন উত্তপ্ত 'লু' প্রবেশ করিতেছে এমন সময় হঠাৎ 'ক্যাঁচ' করিয়া একটা শব্দ হইল। কে যেন 'চেন' টানিয়াছে।

নবকিশোর চাহিয়া দেখিল একটি বলিষ্ঠ যুবক কামরার অপর প্রান্ত হইতে আগাইয়া আসিয়া 'চেন' ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখে মৃদু হাসি। মৃদু কিন্তু স্পর্ধা-ব্যঞ্জক। স্পর্ধা-ব্যঞ্জক হইলেও উদ্ধত নয়। তাহা চিত্তে আঘাত করে না, চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে। সে হাসি নীরব ভাষায় যেন সকলকে বলিয়া দিল—ইহা ছাড়া এখন করিবার আর কি আছে, তোমরা কেহ সাহস করিলে না, কিন্তু আমি করিয়াছি। সব ঝুঁকি আমিই লইলাম। যুবকের দিকে চাহিয়া নবকিশোর মুগ্ধ

হইয়া গেল। উৎসাহকে সেই প্রথম দেখিল সে। তখন ইংরেজের আমল। এখনকার মতো তখন যখন-তখন যেখানে-সেখানে চেন টানিয়া ট্রেন থামাইতে কেহ সাহস করিত না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থামিয়া গেল এবং গার্ড সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। গার্ড সাহেব, সাহেব নন, প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক।

"চেন টেনেছে কে?"

"আমি—"

উৎসাহ আগাইয়া গেল।

"চেন টানলেন কেন হঠাৎ? কি হয়েছে—"

"গাড়ির জানলা বন্ধ হচ্ছে না। আমরা গরমে মারা যাচ্ছি। জানলাটা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করুন—"

"কি হয়েছে, দেখি—"

গার্ড সাহেবও জানলাটা ধরিয়া খানিকক্ষণ টানাটানি করিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে পারিলেন না।

"মিস্ত্রী না হলে হবে না। এই মাঠের মাঝখানে মিস্ত্রী কোথায় পাব! এই জন্যে চেন টানলেন? আশ্চর্য!"

"এমন বাজে গাড়ি আপনারা দিয়েছেন কেন! আপনারা কি থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের মানুষ বলে মনে করেন না?"

গার্ড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যদি মানুষ হতাম তাহলে কি ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করতে পারত! তারা ক্ষমা-ঘেন্না করে যা আমাদের দিয়েছে তাই আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে—"

"নেব না। গাড়ির জানলা যতক্ষণ না বন্ধ হয় আমরা গাড়ি যেতে দেব না, বারবার চেন টানব।"

একদল বিহারী উৎসাহের দলে যোগ দিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জরুর জরুর—"

হৈ হৈ করিয়া উঠিল সকলে।

গার্ড সাহেব উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জানেন এর পরিণাম কি? আপনাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা তো দিতেই হবে, জেলও হতে পারে।"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত গার্ড সাহেবের মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর যাহা বলিল তাহা অপ্রত্যাশিত।

"এ মাসে আমার গোচর ফল খুব ভালো। চতুর্থ স্থানে মীনরাশিতে বৃহস্পতি আছেন। আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না আমার!"

একটা কাবুলী এতক্ষণ কামরার এককোণে নিদারুণ ভিড় এবং গরম সত্ত্বেও অগাধে ঘুমাইতেছিল। গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"হাল্লা কাহে বাবু সাব?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সব শুনিল সে। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি বাক্যব্যয় না করিয়া ভিড় ঠেলিয়া একেবারে সোজা আসিয়া হাজির হইল জানলাটার কাছে। একবার নাড়াইয়া দেখিল, তাহার পর সামনের বেঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রচণ্ড একটি লাথি মারিল সার্সিটার

যতটুকু বাহির হইয়া ছিল তাহার উপর। খট্‌ করিয়া শব্দ হইল একটা। ব্যস্‌, তাহার পর সব ঠিক। লাথি খাইয়া সার্সিটা সুড়সুড় করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কাবুলী কোনো দিকে ফিরিয়া চাহিল না, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং আবার অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

গার্ড সাহেব তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন—"তাগদ আছে বটে লোকটার।" তাহার পর উৎসাহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কুষ্ঠিতে বিশ্বাস আছে না কি?"

"অগাধ।"

"হাতটাত দেখতে জানেন?"

"সামান্য—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়—"

"আমার গাড়িতে। বে-আইনী কাজ করেছেন জরিমানা দিতে হবে।"

"একটি পয়সা দেব না। পয়সা নেইও। যদি জেলে পুরে দিতে পারেন কৃতজ্ঞ থাকব। হার্ড স্ট্রাগলের দিনে গভর্নমেন্টের স্কন্ধে বসে দিনকতক খাওয়া যাবে বিনা পয়সায়—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন গার্ড সাহেব।—"আরে না, না মশায়। আপনাকে দিয়ে হাতটা দেখাব। আসুন কতদূর যাবেন আপনি?"

"কলকাতা।"

"আসুন আমার গাড়িতে। সঙ্গে জিনিসপত্র আছে?"

"না। একেবারে ঝাড়া হাত পা—"

গার্ড সাহেবের সহিত উৎসাহ চলিয়া গেল।

নবকিশোর মনে মনে একটু হতাশ হইল, ছেলেটির সহিত আলাপ করিবার বাসনা জাগিয়াছিল তাহার। যদিও সে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বিজ্ঞানের নিকষে যাচাই না করিয়া কোনো কিছু সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে তাহার বুদ্ধি অস্বীকার করে, তবু ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার কিছু দুর্বলতা আছে। একজন জ্যোতিষী তাহার মায়ের মৃত্যুর তারিখটা নির্ভুলভাবে বলিয়া দিয়াছিল মায়ের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে। আর একজন জ্যোতিষী তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী জগমোহনবাবুর হাত দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে এক বৎসরের মধ্যে জগমোহনবাবু একটি পাকা বাড়ির মালিক হইবেন। দরিদ্র জগমোহন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু নিষ্ফল হয় নাই। এমনই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটিয়াছিল যে জগমোহনবাবু সত্যই এক বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি পাকা বাড়ি কিনিতে পারিয়াছিলেন। নবকিশোর এমনি আরও দুই একটা আশ্চর্যজনক গল্প শুনিয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফলিত জ্যোতিষের ব্যাখ্যা করা যায় না—কিন্তু শেক্‌সপীয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটা মনে পড়ে—there are more things in heaven and earth.... । নবকিশোরের ইচ্ছা আছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্যোতিষের আলোচনা করিবে। কিন্তু পথ দেখাইবে কে তাহাকে? এই ছেলেটির জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দখল আছে মনে হয়, কিন্তু ও তো চলিয়া গেল। সহসা নবকিশোরের মনে হইল মুখটা যেন চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখিয়াছে। কোথায়? কলিকাতায় যাইবে বলিল। সেও তো কলিকাতায় চলিয়াছে।

কলিকাতাতেই কি দেখা হইয়াছিল কখনও? আবার কি হইবে? ট্রেন আবার চলিতে শুরু করিল। নবকিশোরের মনে উৎসাহের মুখটাই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল বারবার।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নবকিশোরের সঙ্গে ছোট একটি ট্রাঙ্ক ছিল। সেটি নিজেই সে নামাইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর রাখিল এবং সন্ধান করিতে লাগিল কোনও কুলি পাওয়া যায় কি না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম, ট্রাঙ্ক লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে গিয়া একটা ট্যাক্সি কিংবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিতে হইবে। সেকালে 'বাস'-এর তেমন প্রচলন হয় নাই, ট্রামও স্টেশনের ধার পর্যন্ত আসে নাই। তখন পুরাতন হাওড়ার পুল ছিল, দিনে দুইবার খোলা হইত। কুলি বেশী ছিল না এবং তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যাহাদের বেশী মাল আছে তাহাদের লইয়া। একজন কুলি বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এ মালগুলো গাড়িতে চড়িয়ে এখনই ফিরে আসছি। তারপর আপনার ট্রাঙ্কটা নিয়ে আপনাকে গাড়িতে চড়িয়ে দেব। আট আনা পয়সা নেব কিন্তু—।" সেকালের হিসাবে মজুরিটা একটু বেশী। এক আনা, বড় জোর দুই আনাই পর্যাপ্ত মজুরি ছিল সেকালে। নবকিশোরের মনে হইল লোকটা গরজ বুঝিয়াছে। পাশের প্ল্যাটফর্মে আর একটা গাড়ি আসিয়াছিল, সেজন্য অনেক কুলি সেই দিকে ছুটিয়াছিল। নবকিশোর ভাবিতেছিল কি করিবে, এমন সময় দেখিতে পাইল উৎসাহ আসিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে এত ভিড়, এত কলরব, কোনো দিকে তাহার যেন খেয়াল নাই। নবকিশোর আগাইয়া গেল।

"নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনি তো নেবেই গেলেন—"

"কে আপনি! ও, আগে নমস্কারটা করা উচিত—! নমস্কার, নমস্কার। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না, অথচ মনে হচ্ছে—"

"যে জানলা নিয়ে দুপুরে আমাদের কামরায় এত কাণ্ড হল, আমি সেই জানলার পাশেই বসেছিলাম। আপনি চেন টেনে গাড়ি থামালেন—"

"বুঝেছি। মনে পড়েছে। আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে সবটা। আলাপ করবেন আমার সঙ্গে? কেন!"

"আপনার বলিষ্ঠ দৃপ্ত আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আর কোনও কারণ নেই—"

"আমাকে ফ্ল্যাটার করে আপনার লাভ? আমি বড়লোক নই, কেউ-কেটা নই, আমি অতি সামান নগণ্য লোক—"

"আমিও তাই। লাভ লোকসান ভেবে কারও সঙ্গে আলাপ করিনি আজ পর্যন্ত—"

"তাহলে আসুন প্রথমেই আলিঙ্গনবদ্ধ হই।"

উৎসাহের বলিষ্ঠ বাহু দুইটি নবকিশোরকে জড়াইয়া ধরিল।

"এইবার আপনার নামটা বলুন।"

"নবকিশোর মুখোপাধ্যায়।"

"বাঃ, তাহলে গোত্র মিলে গেছে। আমি উৎসাহ মুখোপাধ্যায়। চলুন, যাওয়া যাক, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

"ট্রাঙ্কটা নিয়ে যেতে হবে। কুলির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আট আনা পয়সা চাইছে—"

"কুলি বি ড্যাম্‌ন্‌ড্‌ (be damned), চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিবেকে যদি খচখচ করে পয়সাটা আমাকেই দিয়ে দেবেন। চলুন।"

অবলীলাক্রমে উৎসাহ ট্রাঙ্কটা হাতে ঝুলাইয়া লইল।

কিছুদূর গিয়া নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

"মল্লিকের হাত দেখছিলাম।"

"মল্লিক কে—"

"ওই যে গার্ড সাহেব।"

"সমস্ত দিন ওইখানে ছিলেন?"

"সমস্ত দিন।"

"সমস্ত দিন হাত দেখছিলেন?"

"শুধু হাত নয়, সর্বাঙ্গ দেখছিলাম।"

"সর্বাঙ্গ?"

"সর্বাঙ্গ না দেখলে সব কথা ঠিক ঠিক বলা যায় না। মল্লিককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেখেছি।"

"কি রকম?"

"ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব? কল্পনা করুন তাহলে। দুপুরের প্রখর রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিকে। হুহু করে 'লু' বইছে ধুলো বালি উড়িয়ে। কুমড়ো-মুখো মল্লিক উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, তাঁর হাইড্রোসিল, তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়ি, তাঁর কাঁচা-পাকা লোমে ভরতি বুক, তাঁর তলপেটের জড়ুল, তাঁর গোপন অঙ্গের তিল প্রখর, দিবালোকে প্রকট হয়ে উঠেছে। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চকন্যা এবং তিনপুত্রের জন্মদাতা মল্লিক আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এবার?"

"হয়েছে। কি দেখলেন?"

"তা আলোর মতো স্বচ্ছ করতে পারব না। 'এটিকেট'-বিরুদ্ধ। তবে আবছাভাবে বলতে পারি আমাদের সকলেরই মতো উনিও সংসার-তরঙ্গ-তাড়িত খড়কুটো। কিন্তু উনি যে খড়কুটো মাত্র সে জ্ঞানটুকু নেই, অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আছেন। মনে করছেন চেষ্টা করলে উনি বুঝি ভাগ্যকেও উলটে দিতে পারেন। তাবিজ পরেছেন, মাদুলি পরেছেন, দামী দামী পাথর ধারণ করেছেন, স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন—"

"ওসবে কিছু হয় না বুঝি?"

"তা জানি না। রত্ন-বিশারদ বিরাট পণ্ডিত বলেন হয়। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আমি 'হাঁ না' কিছুই বলতে পারব না—"

ট্রেন হইতে একটা বরযাত্রীর দল নামিয়াছিল। লাল-চেলী পরা নববধূটিকে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসাইয়া কর্তা-ব্যক্তিরা গাড়ির খোঁজে বাহিরে গিয়াছিলেন সম্ভবত। বধূটির পাশে সিল্কের মোজা ও চকচকে পাম-শু-পরা ছোকরাটি সম্ভবত বর। উৎসাহ হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং বরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর যেন আপন মনেই অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হায়, ভগবান—!"

"কি হল—"

"কিছু না। চলুন—"

হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া নবকিশোরের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, "ছোকরা বেশী দিন বাঁচবে না। অকালবৈধব্য হবে মেয়েটার—"

"আপনি বুঝতে পারলেন?"

"পারলুম বৈকি। মনে হল মুণ্ডহীন কেতুর কবন্ধটা দুহাত বাড়িয়ে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে!"

"বলেন কি!"

উৎসাহ কোনো উত্তর না দিয়া হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতে লাগিল, মনে হইল শান-বাঁধানো স্টেশন প্ল্যাটফর্মের উপরই সে যেন উত্তরটা খুঁজিতেছে। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল— "আমার জীবনের এইটেই ট্রাজেডি। আমি বিপদের ছায়া আগে থাকতে দেখতে পাই, অথচ জানি সে বিপদ নিবারণ করা যাবে না। ভালোটা দেখতে পাই না, খারাপটা পাই। কিছুদিন থেকে আমার এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা ভূতের মতো আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ক্রমাগত বলছে—ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ—ওই লোকটা মরবে, ওই লোকটা খুনী, ওই মেয়ে পতিঘাতিনী। কি করি বলুন তো?"

করুণকণ্ঠে উৎসাহ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

"কতদিন থেকে আপনি এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পাল্লায় পড়েছেন? মাপ করবেন পাল্লা কথাটা ব্যবহার করলাম, আর কোনো জুতসই কথা মাথায় আসছে না।—"

" 'কবল' বললে আরও জুতসই হত। এক শ্মশান ভৈরবীর নির্দেশে আমি দিনকতক তান্ত্রিক সাধনা করেছিলাম। যোগিনী-সাধনা। বর পেয়েছি, কিন্তু বর অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। তারপর থেকেই এই ব্যাপার।"

উৎসাহ পুনরায় হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতে লাগিল। আর কোনো কথা বলিল না। নবকিশোরের মনে হইল সে কাহারও দিকে চাহিতে চায় না বলিয়াই বোধ হয় হেঁটমুণ্ডে হাঁটিতেছে।

নীরবেই তাহারা বাকি প্ল্যাটফর্মটুকু পার হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নবকিশোর প্রশ্ন করিল—"আপনি কোথা যাবেন?"

"আমি যাব সিংহিবাগান। মদন চাটুজ্যে লেন। আপনি?"

"আমি মির্জাপুর স্ট্রীট। এক কাজ করা যাক, আসুন একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করি। আমি আপনাকে সিংহিবাগানে নাবিয়ে দিয়ে আমার মেসে চলে যাব—"

"আমি গরীব মানুষ, ঘোড়ার গাড়ি চড়া আমার অভ্যাস নেই। আমি হেঁটে যাব—"

"না, না, চলুন, আমার সঙ্গে।"

"এ অহেতুক আগ্রহ কেন?"

"অহেতুক নয়, হেতু আছে বই কি একটা—"

"সেটা ব্যক্ত করুন।"

"আপনাকে দেখে এত ভাল লেগেছে যে কলকাতার এই ভিড়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। আপনার বন্ধুত্ব কামনা করছি। এতে কি আপনি আপত্তি করবেন? আপনার মুখটাও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আপনি কি করেন?"

"আমি এবার মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি—"

"ও, তাই। আমিও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আপনার ফার্স্ট ইয়ার? আমি ফোর্থ ইয়ারে উঠলাম এবার। আপনি আই. এসসি পাস করেছেন কোথা থেকে?"

"আই. এসসি পাস করেছি কটক থেকে—"

"আপনি তাহলে উড়িষ্যা থেকে সিলেক্টেড হয়েছেন?"

"না। চেষ্টা করেছিলাম, হইনি। তারপর বি. এসসি পড়ি বহরমপুর থেকে। তবুও ঢুকতে পারিনি। এবার এম. এসসি পাস করেছি সায়ান্স কলেজ থেকে, এবারও ঢুকতে পারতাম না। কিন্তু এখন যিনি আমার অভিভাবক তিনি প্রিন্সিপাল বার্নাডো সাহেবের কি যেন একটা উপকার করেছিলেন এককালে। সাহেবরা উপকারের কথা ভোলে না। বার্নাডোও ভোলেননি। তাঁরই সুপারিশে ভরতি হতে পেরেছি। ডিয়ার সাহেবের আমলে কলকে পাইনি, কারণ জানা-শোনা ছিল না, ঘুষ দেবার মতো পর্যাপ্ত টাকাও ছিল না হাতে। সুতরাং কালক্ষয় করতে হয়েছে। সবই অদৃষ্ট, আমাদের কোনও হাত নেই। চললুম। এই আপনার ট্রাঙ্ক রইল। আপনি একটা গাড়ি ডেকে চলে যান—"

"চলুন না একসঙ্গেই যাই—"

"না, মাপ করবেন। পরের পয়সায় গাড়ি চড়ব না। আমার কাছেও পয়সা নেই যে গাড়ির অর্ধেক ভাড়া দিয়ে দেব। সুতরাং চরণবাবুর জুড়িতেই চললুম—"

"কিন্তু আপনার সঙ্গে যে ভাব করতে চাই।"

"সে পরে হবে এখন। আচ্ছা, আমার ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি আপনাকে। আপনার ঠিকানাটাও দিন। তাছাড়া কলেজেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

উৎসাহ পকেট হইতে ছোট একটা পকেট বুক বাহির করিল এবং তাহারই একটা পাতায় ঠিকানা লিখিয়া কাগজটা ছিঁড়িয়া নবকিশোরকে দিল।

"এই নিন। এইবার আপনার ঠিকানাটা বলুন, টুকে নিই। ঘুরতে ঘুরতে একদিন গিয়ে পড়ব। সন্ধ্যের পর নিশ্চয়ই বাড়ি থাকেন?"

"হ্যাঁ। সাধারণত থাকি। আমার ঠিকানা ৩ নং মীর্জাপুর স্ট্রীট।"

"আচ্ছা, চলি তাহলে—"

"আচ্ছা, নিতান্তই যখন যাবেন না একসঙ্গে, তখন ছেড়ে দিতেই হবে। নমস্কার। সময় পেলে কালই যাব আপনার ঠিকানায়। খুব ভোরে কিংবা বিকেলে ছটা নাগাদ। কি বলেন?"

"বেশ। কলেজেও দেখা হতে পারে—"

"তা হতে পারে। আমার সকাল থেকেই ক্লাস, তারপর হাসপাতাল, তারপর আবার ক্লাস। আপনারও ক্লাস তো সকাল থেকেই শুরু। কলেজে আলাপ করার সময় হবে কি। দেখা যাক—"

নবকিশোরের একবার মনে হইল উনি যখন আমার পয়সায় গাড়ি চড়িতে অনিচ্ছুক তখন আমিই বা বিনা পয়সায় উঁহাকে দিয়া ট্রাঙ্কটা বহাইয়া লইলাম কেন। আমিই বা ঋণী থাকিব কিসের জন্য! একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে সে বলিয়াই ফেলিল—"আপনি পরের পয়সায় গাড়ি চড়তে নারাজ, আমারও তো তাহলে আপনাকে দিয়ে বিনা পয়সায় ট্রাঙ্কটা বইয়ে নেওয়া উচিত হল না—আপনি হয়তো মনে মনে আমাকে সুবিধাবাদী ভাবছেন—"

"বেশ তো মজুরি দিতে চান দিন না। আপনি যা দেবেন তাই নেব। আমি তীর্থের কাক, যেখান থেকে যতটুকু পাই ছাড়ি না—"

নবকিশোরকে তখন মানি-ব্যাগ বাহির করিতে হইল। দেখিল খুচরা মাত্র চার আনা আছে, বাকি সব টাকা। একটি টাকাই সে বাহির করিয়া বলিল—"এই নিন তাহলে—"

উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি পকেটস্থ করিয়া হাসিমুখে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া রহিল ক্ষণকাল, তাহার পর বলিল—"শুধু টাকাটাই পেলাম না, আরও অনেক কিছু পেলাম, কিন্তু আপনি সেটা জানতে পারলেন না। কাকেরা ধূর্ত, তারা অনেক জিনিস লুকিয়ে নিয়ে পালায়।"

"আর কি পেলেন।"

বিস্মিত নবকিশোর প্রশ্ন করিল।

"আপনার চরিত্রের খানিকটা পেলাম। বুঝলাম আর পাঁচজনের মতো আপনিও নকলনবীশ। যা করলেন তা আমার নকল করে করলেন, বিবেকের আদেশে নয়। 'তুমি এই করলে, বেশ আমিও করছি, আমিও তোমার চেয়ে কম কিছু নই'—এই আপনার মনোভাব। এ মনোভাবের নাম দম্ভ!"

"কিন্তু আপনার মনোভাবও কি দম্ভ নয়?"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনাকে এখনই বলবার ইচ্ছে ছিল না। হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে ওটাও দম্ভ। কিন্তু আমি একটা ব্রত পালন করছি, সে ব্রতের মেরুদণ্ড স্বাবলম্বন। এর বেশী এখন আর বলব না কিছু। সত্যিই যদি আমাদের বন্ধুত্ব হয় তখন সব জানতে পারবেন। চললুম। নমস্কার—"

উৎসাহ হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। একটা ছুটন্ত ট্যাক্সি আসিয়া তাহাকে চাপা দিল। তাহার নিজেরই পিছনে সম্ভবত কোনও পাপগ্রহ ছায়াপাত করিয়াছিল কিন্তু সে ছায়া উৎসাহ দেখিতে পায় নাই। পিছনে তো চোখ থাকে না! ট্যাক্সিওয়ালাকে ঘিরিয়া একদল লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল। নবকিশোরও ছুটিয়া গেল সেখানে। দেখিল উৎসাহ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। নবকিশোর আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই ট্যাক্সিতেই তাহাকে লইয়া মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল। সঙ্গে রহিল কেবল একটা পুলিশ।

।। দুই ।।

নবকিশোর উৎসাহকে লইয়া যখন মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি রুমে পৌঁছিল তখন সেখানে ও. ডি. (অফিসার অন্ ডিউটি) ছিলেন ডাক্তার পুলিন মিত্র। তিনি রসিক লোক। নবকিশোরকে ভালও বাসিতেন।

বলিলেন, "রৌরব তো জমজমাট। দু'টি সুইসাইড, একটি বার্ন কেস (burn case), গোটা দুই ফ্র্যাকচার। তুমি বাবা আর একটি পাপীকে এনে জোটালে! ওদিকে বড় সায়েব মাল চড়িয়ে লাট হয়ে বসে আছেন। কুটোটি নেড়ে সাহায্য করবেন না। একটু আগে একটা স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া (strangulated hernia) এসেছিল, খবর পাঠালুম, এলেন না। নিজে গেলুম, দেখি ফুল ফোর্সে ফ্যান খুলে দিয়ে শুধু গায়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। পাশের টেবিলে হুইস্কি

সোডা। আমাকে দেখে বললেন—I am not very steady now, you do it yourself Pulin : এই মাত্র সেটির গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে নেবে এসেছি। তুমি আবার কাকে আনলে।"

"আমাদের কলেজেরই ছাত্র। একটু আগেই আমার সামনে ট্যাক্সি চাপা পড়ল হাওড়ায়। আগে ওকে একটু দেখুন সার।"

"সবায়ের মুখেই তো ওই এক বুলি—আগে ওকে একটু দেখুন সার। চল দেখি। মেডিকাল কলেজের ছেলে এত আনাড়ি, ট্যাক্সি চাপা পড়ল!"

"অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা cross করছিল—"

অজ্ঞান উৎসাহকে ইমার্জেন্সি রুমের টেবিলে চড়াইয়া দেখা গেল বাম হাতের একটা সামান্য ক্ষত হইতেই তাহার জামা কাপড় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও হাড় ভাঙে নাই। ডাক্তার মিত্র উৎসাহের নাড়ী, চোখ, মুখ, পেট প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এখন observation-এ রেখে দেওয়া যাক। চট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কংকাশান অব দি ব্রেইন (concussion of the brain) হয়েছে। দেখ তো এজরাতে (Ezra) বেড খালি আছে কি না—"

নবকিশোর দেখিল, আছে।

"সেইখানেই নিয়ে যাও তাহলে। ওর আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছ?"

"না। আমি তাদের চিনি না—"

"যদি মরে যায় তাহলে কি ডোমে ফেলবে?"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মনে পড়িল উৎসাহ তাহাকে সিংহিবাগানের একটা ঠিকানা দিয়াছিল।

"ওর একটা ঠিকানা জানি। সেইখানে গিয়েই খোঁজখবর করছি—"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অজ্ঞান লোককে লইয়া পুলিশ প্রবেশ করিল এবং ডাক্তার মিত্রকে সেলাম করিয়া বলিল—"মাতোয়ালা হ্যয় হুজুর। রস্তা পর গিরা হুয়া থা—"

"ওই বেঞ্চ পর শুতা দো। ভিতর মে আর জায়গা নেহি হায়—ওহে এটার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালো—"

ডাক্তার মিত্র নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে এজরায় শুইয়ে দিয়ে এসো। সেখানে যে নার্সটি আছে তাকে চেনো? নার্স কিং—"

"আলাপ নেই—"

"দুটো মিষ্টি কথা বলে আলাপ করে ফেল। আখেরে ভালো হবে। ওদের হাতেই তো সব—"

ইমার্জেন্সি ডিউটিতে নবকিশোরের এক বন্ধু সুশীল ছিল। সে খানিকটা বরফ-জল আনিয়া মাতালটার মুখে ঝাপটা দিতে লাগিল। দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে নবকিশোরকে বলিল—"তুই এর মুখে জলের ঝাপটা দে। আমি তোর বন্ধুকে এজরায় নিয়ে যাচ্ছি। মিস্ কিংয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—"

ডাক্তার মিত্র একটা ফ্র্যাক্চার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবকিশোর সুশীলের হাত হইতে বরফ-জলের বড় মগটা লইয়া মাতালটার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগিল, সুশীল একটা স্ট্রেচার যোগাড় করিয়া উৎসাহকে লইয়া গেল এজরার দিকে।

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ বাহির হইয়া আসিলেন।

"একি, তুমি এজরায় যাওনি—?"

"সুশীল গেল। আমি তার কাজটা করে দিচ্ছি। ও বললে ওর সঙ্গে আলাপ-সালাপ আছে—"

"আচ্ছা ঘড়েল ছোকরা তো! এক মাগী আপিং গিলে এসেছে, আর একবার তার 'স্টমাক ওয়াশ' (stomach wash) করতে হবে। ওকে সব ঠিক করতে বলেছিলাম—পাগল করে দেবে দেখছি আমাকে তোমরা—"

ডাক্তার মিত্র আবার হন্তদন্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন, কারণ ফ্র্যাকচার রোগীটার ক্লোরোফর্মের নেশা বোধ হয় ছুটিয়া গিয়াছিল, চীৎকার করিতেছিল সে। ডাক্তার মিত্র পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"তুমি ওই ফ্র্যাক্‌চার কেসটাকে একটা মর্ফিন দিয়ে এস। আমি এটাকে দেখি—অমন যাদুর গায়ে হাত বোলালে হবে না—"

ডাক্তার মিত্র হড়হড় করিয়া মগের সব জলটা তাহার মাথায় ঢালিলেন এবং একটা কুলিকে আদেশ করিলেন—"আরও জল আন—"

মাথায় মুখে প্রচুর বরফ-জল দেওয়াতে মাতালের জ্ঞান হইল। সে চোখ খুলিয়া তাকাইল।

চৌগোঁপ্পা বলিষ্ঠ কনস্টেবলটা সবিস্ময়ে এতক্ষণ নীরবে চাহিয়া ছিল। এইবার সে মন্তব্য করিল—"অব শালেকা হোস্‌ আয়া—"

ডাক্তার মিত্র প্রশ্ন করিলেন, "নাম কি?"

"জগন্নাথ।"

জগন্নাথ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর নিজের ভিজা কাপড়চোপড়ের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"এটা কি হল, সার।"

"জগন্নাথের স্নানযাত্রা—"

ডাক্তার মিত্র কাগজপত্রে সই করিবার জন্য আবার ভিতরে চলিয়া গেলেন। ইমার্জেন্সি রুমের নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইতে লাগিল।

ইমার্জেন্সি রুম হইতে বাহির হইয়া নবকিশোর 'এজরায়' গেল। 'এজরা' হাসপাতালের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। তখনও তাহার সেখানে 'ডিউটি' পড়ে নাই। গিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার পর ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকিয়া সে হঠাৎ নির্মলকে দেখিতে পাইল। নির্মল তাহার সহপাঠী। এজরাতেই তাহার ডিউটি ছিল। তাহার নিকটই সে খবর পাইল সুশীল উৎসাহকে লইয়া স্টুডেন্টস কেবিনের দিকে গিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড নিস্তব্ধ। নবকিশোর বারান্দা দিয়া কেবিনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চোখে-ব্যান্ডেজ-বাঁধা রোগীর দল নিজের নিজের বিছানায় শুইয়া আছে। এজরা তখন চোখের হাসপাতাল ছিল। হঠাৎ খটখট শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিতে পাইল নার্স আসিতেছে, তাহার পিছু পিছু সুশীল। নার্স নির্বিকার, সুশীল গদগদ।

"এই যে নবকিশোর। ইনিই নার্স কিং। এঁকে বলে দিয়েছি সব। তোমার বন্ধু ওই কেবিনটায় আছে—"

নবকিশোরের সহিতও নার্স কিং-এর পরিচয় করাইয়া দিল সুশীল।

"Glad to meet you."

মুচকি হাসিয়া নার্স কিং খটখট করিয়া আগাইয়া গেল। নবকিশোরকে দেখিয়া তাহার গতিবেগ কিছুমাত্র কমিল না। নবকিশোরের কেন জানি না মনে হইল একটা খঞ্জন খুর খুর করিয়া চলিয়া গেল।

উৎসাহের কেবিনে গিয়া দেখিল উৎসাহ তখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। মাথায় আইস ক্যাপ। নাড়ীটা টিপিয়া দেখিল একবার। যদিও তাহার নাড়ীজ্ঞান বিশেষ কিছু হয় নাই তখনও, তবু তাহার মনে হইল নাড়ী ভালই চলিতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও বেশ স্বাভাবিক। মুখভার যদিও প্রশান্ত তবু নবকিশোরের মনে হইল উৎসাহ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছে যেন। শুধু তাই নয় তাহার মুখে কি যেন একটা পরিবর্তনও আসিয়াছে। কিন্তু সেটা কি তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। যে লোক গাড়ির চেন টানিয়া ট্রেন থামাইয়াছিল, যে লোক সদ্যবিবাহিত বরের পিছনে কেতুর ছায়া দেখিতে পাইয়াছিল, এ যেন সে লোক নয়। একটা আত্মসমর্পণের ভাব যেন সারা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু আগে সে বলিয়াছিল 'আমি তীর্থের কাক'। কোন্ তীর্থের? তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নবকিশোর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সহসা মনে পড়িল সিংহিবাগানে একটা খবর দিতে হইবে। পকেট হইতে কাগজটা বাহির করিয়া আর একবার সে ঠিকানাটা পড়িয়া লইল—কেয়ার অফ পণ্ডিত বিরাটেশ্বর শর্মা, মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা। চিৎপুরের কাছে।

নবকিশোরের ট্রাঙ্কটা ইমার্জেন্সি রুমেই ছিল। সেটি লইয়া প্রথমে সে মেসে গেল। মেসে গিয়া স্নান করিয়া লইল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। ঠাকুর বলিল—রান্না হইয়া গিয়াছে।

"আমার খাবারটা ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। একটু বেরুচ্ছি এখন। ফিরতে হয়তো দেরি হবে—"

ট্রামেই বাহির হইয়া পড়িল নবকিশোর।

পথে একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মদন চ্যাটার্জি লেনটা কোথায় বলতে পারেন? আমি মফস্বলের ছেলে, কলকাতার পথ-ঘাট এখনও সব চিনি না—"

ভদ্রলোক বলিলেন,—"আপনি যে মফস্বলের লোক একথাটা পথে-ঘাটে বলে বেড়াবেন না। কলকাতা শহরে ঠগের অভাব নেই; এখুনি কেউ আপনার পিছু নেবে। আমি কলকাতা শহরে গত কুড়ি বছর থেকে আছি, আমিও সব রাস্তাঘাট চিনি না। মদন চাটুজ্যে লেনের নাম শুনিনি—"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন এবং ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে আর একটি উপদেশ দিলেন।

"কলকাতায় যদি ঘুরতে চান একটা স্ট্রীট গাইড কিনে ফেলুন। তাতে সব রাস্তার খবর পাবেন।"

তাঁহার পাশে একটি রোগা-গাছের হাই-পাওয়ার-চশমাপরা ভদ্রলোক বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ঠন্ঠনে কালীবাড়ির সামনে নেবে পড়ুন। তারপর

চিৎপুরের দিকে এগিয়ে যান। কাউকে জিগ্যেস করবেন মল্লিকদের মার্বেল প্যালেস কোথায়। সেখানে গিয়ে দেখবেন ডান হাতি একটা গলি বেরিয়েছে। সেই গলি গিয়ে পড়েছে মদন চাটুজ্যে লেনে। কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে। মদন চাটুজ্যে ও অঞ্চলে বিখ্যাত লোক, ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় ছিলেন। কতদিন কলকাতায় এসেছেন?"

"তিন বছর হয়ে গেল—"

"এখনও রাস্তাঘাট চেনেন না! কি করেন এখানে?"

"মেডিকেল কলেজে পড়ি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় পাই না তো তেমন। কলেজের কাছেই থাকি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজেই থাকতে হয়—"

সেকালে মেডিকেল কলেজের ছেলেদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা সমীহভাব ছিল। দুইজন ভদ্রলোকেরই চোখে মুখে সে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি কিন্তু হটিবার পাত্র নন। তাঁহারও যে মেডিকেল কলেজের সহিত কিছু সম্পর্ক আছে একথা তিনি জাহির করিতে ছাড়িলেন না।

"আমার আপন মাসতুতো দাদার আপন ভগ্নীপতি মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রার ছিলেন—"

ট্রামের আরোহীদের মধ্যে অনেকে হঠাৎ হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। চশমা-পরা ভদ্রলোক বলিলেন—"মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট এসে গেছে। এইবার আপনি নেবে পড়ুন!" তিনি নিজেই উঠিয়া ট্রামের ঘণ্টার দড়িটা টানিয়া দিলেন।

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"মেডিকেল কলেজের সামনেই। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে—"

"ও আচ্ছা, নমস্কার।"

ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে নবকিশোর নামিয়া পড়িল। দেখিল অত রাত্রেও অনেক লোক হাত জোড় করিয়া মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সেও দাঁড়াইয়া পড়িল এবং মা কালীকে প্রণাম করিল। এতদিন কলিকাতায় আছে, কিন্তু ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়িতে সে কখনও আসে নাই। কালীঘাটেও যায় নাই। কোথায়ই বা গিয়াছে সে। ইডেন গার্ডেন, বটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিযাম, কোথাও তাহার যাওয়া হয় নাই। যাইবার প্রেরণাই পায় নাই সে। এমন কি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়েও যাওয়া হয় নাই, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পরমভক্ত সে। যেখানে পরিবেশ অনুকূল নয়, যেখানে মূঢ় জনতার হৈ-হৈ, যেখানে হুজুক, যেখানে আত্ম বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সেখানে যাইবার প্রবৃত্তি নবকিশোরের কখনও হয় না। সে বিহারের ছেলে, বিহারের এক গ্রামে তাহার জন্ম। গ্রামের পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে। সেই গঙ্গার তীরে আছে এক শিমুল গাছ—বিশাল শাল্মলী তরু—আর তাহার পাশেই বটবৃক্ষ একটি। সেটিও বিশাল। সেখানেও দেখিবার জিনিস অনেক আছে। অনেক পাখি, অনেক প্রজাপতি, অনেক ফড়িং, আরও অনেক অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু সে-সব দেখিতে কেহ সেখানে যায় না, সেখানে ভিড় নাই। গ্রামের সেই নদীতীরের অনুরূপ স্থান কলিকাতার নিকটেও আছে হয়ত, কিন্তু নবকিশোর এখনও তাহার সন্ধান পায় নাই। যে সব মার্কা-মারা বহু বিজ্ঞাপিত বেড়াইবার জায়গাগুলি কলিকাতার কাছে-পিঠে জনতাকে আকর্ষণ করে সে-সব জায়গা নবকিশোরের চিত্ত বিনোদন করিতে পারে না। সে নির্জনতা ভালবাসে। গ্রামের সেই গঙ্গাতীর তাহার প্রিয় স্থান

ছিল। ডাক্তারি পড়িবার জন্য বাধ্য হইয়া সে কলিকাতা শহরে আসিয়াছে। এখানে ভিড় অনিবার্য। কিন্তু এই অনিবার্য ভিড়ের মধ্যেও সে একটি নির্জনলোক সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিরাট জঙ্গলের মধ্যে একটি সরু পথ। এই পথেই সে যাতায়াত করে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিবার সাহস বা প্রবৃত্তি কোনোটাই তাহার নাই। এতদিন কলেজে আছে, কিন্তু কাহারও সহিত তেমন অন্তরঙ্গতা হয় নাই। দুই চারিজনের সঙ্গে তথাকথিত 'ফ্রেন্ডশিপ' অবশ্য হইয়াছে, তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে যাহারা আছে তাহাদের সহিতও তাহার সামাজিক হৃদ্যতা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু মেলে নাই একজনও। যাহাকে দেখিবামাত্র প্রাণের তন্ত্রী আপনি বাজিয়া উঠিবে, যাহাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন জাগিবে, আকুলতা ঘনাইবে সে বন্ধুর সন্ধান সে পায় নাই এতদিন। আজ হঠাৎ ট্রেনে উৎসাহকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার দৃপ্ত আচরণ, তাহার শক্তি-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, তাহার বে-পরোয়া ভাব, তাহার অকপট ব্যবহার, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করিবার প্রবণতা, আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার জীবন সংশয়—এই সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা আবির্ভাব যাহা নবকিশোরকে বিচলিত করিয়াছে, কৌতূহলী করিয়াছে, তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন তাহাকে বলিতেছে—এই তো বন্ধু মিলিয়াছে। তাহাকে পাইয়াই কি হারাইবে? না না, সে তো অসম্ভব। ভক্তিভরেই সে ঠন্‌ঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করিল, এই অজ্ঞাতকুলশীলের জন্য। এই হঠাৎ-পাওয়া বন্ধুর জন্য সত্যই প্রার্থনা করিল সে।

কিছুদূর আগাইয়া সে পানের দোকান দেখিতে পাইল একটা।

"আচ্ছা, মদন চাটুজ্যের গলিটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

"পাশেই ডানহাতি গলি। কোথা যাবেন, বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি না কি—"

"হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন আপনি—"

"আপনার চেহারা দেখেই বুঝেছি। অচেনা লোক মদন চাটুজ্যে লেনের ঠিকানা খুঁজলেই বুঝতে পারি বিরাট পণ্ডিতের খোঁজে এসেছে। বিশেষত এত রাত্রে। আমি এ পাড়ার চেনা লোকেদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। একটু আগেই আর এক অচেনা ভদ্রলোককে বিরাট পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। আসুন—"

পান-ওলা পান সাজিতেছিল, এক খিলি পান সে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল।

"না, পান দরকার নেই—"

"খেয়ে দেখুন না এক খিলি। ভাল মঘই পান। খেলে আমাকে ভুলতে পারবেন না। আসুন। ভাব করে নিচ্ছি আপনার সঙ্গে সার। বিরাট পণ্ডিতের পাল্লায় যখন পড়েছেন তখন বারবার আপনাকে আসতে হবে এখানে। বিরাট পণ্ডিতের দৌলতে অনেক লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। আপনাকেই বা ছাড়ব কেন। আসুন—"

নবকিশোরকে পানের খিলিটি লইতে হইল। খাইয়া দেখিল সত্যই ভালো পান। শিল্পীর হাতের তৈরি।

"কি করেন, কোথায় থাকা হয়—"

"আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। মেসে থাকি—"

"উচ্ছে বাবুর বন্ধু নাকি?"

নবকিশোর প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই যে 'উৎসাহ' নামটাই 'উচ্ছে' হইয়াছে।

"উচ্ছে কে চিনি না। আমি উৎসাহের বাড়িতে খবর দিতে এসেছি—"

"ওই উৎসাহকেই উচ্ছে করেছেন বিরাট পণ্ডিত। এ পাড়ার সবাই ওকে উচ্ছে বলেই জানে। কি খবর দিতে এসেছেন?"

"উনি মোটর চাপা পড়েছেন। মেডিকেল কলেজেই আছেন এখন—"

"আরে, কি সর্বনাশ! যান যান তাহলে দেরি করবেন না। পান ভাল লাগল?"

"চমৎকার—"

"তাহলে আসুন, আর এক খিলি—"

"কত খাব! না, আর থাক—"

"ওই দেখুন, আপনার ঢাকনি তো খোলা যাচ্ছে না সহজে। ভাল লেগেছে যখন নিন আর এক খিলি—"

"আপনি দোকান করেছেন পান বিতরণ করবার জন্যে না কি—"

"ধরে নিন তাই। নিন। আর দাঁড়াবেন না। পরে আলাপ হবে—"

আর এক খিলি পান চিবাইতে চিবাইতে নবকিশোর বিরাট পণ্ডিতের বাসার দিকে পা বাড়াইল।

"চিৎপুরের কাছ বরাবর গিয়ে বাড়িটা পাবেন। সাইনবোর্ড আছে—"

তিন।।

বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী সময় লাগিল না। চিৎপুরের কাছেই দ্বিতল বাড়িটা। বাড়ির সামনে একটি ল্যাম্পপোস্ট এবং সেই ল্যাম্পপোস্টের আলোকে ঝুলিয়া-পড়া সাইনবোর্ডটাও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কালো রঙের সাইনবোর্ডের উপর বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা। অক্ষরের রঙও উঠিয়া গিয়াছে অনেক জায়গায়। একতলার বসিবার ঘরটা খোলা ছিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে নবকিশোর শুনিতে পাইল কে যেন কাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সে সহসা ঢুকিতে সাহস করিল না। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

"বৃথা ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন কেন। আপনি অতি দরিদ্র, অতি অসহায়, জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য, সোমত্ত মেয়ের জন্যে পাত্র জোটাতে পারছেন না, চাকরিতে একসটেনশন পাননি, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে—এসব তো অনেকবার শুনেছি। ওই আপনার ললাটের লিখন। আমি কি করব বলুন। আপনার দুঃখের কাঁদুনি শুনে আমার লাভই বা কি। আমি যা জানি তা আপনাকে বলেছি। পুরুষকার চাই। গ্রহ কুপিত হয়েছে, তাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চেষ্টা করলে কুপিত গ্রহকে ঠাণ্ডা করা যায়। অন্তত সে চেষ্টাটা করতে হবে আপনাকে। ওই চেষ্টার নামই পুরুষকার। একটি পান্না আপনাকে ধারণ করতে হবে। পাঁচ রতি পান্নার দাম আড়াইশ' টাকা পড়বে। তাছাড়া সোনা আছে, আপনার আঙুলগুলোও গোবদা গোবদা। কম সোনাতে হবে না। সাড়ে তিনশ চারশ টাকা লেগে যাবে বানি নিয়ে—"

"আমি অতি দরিদ্র লোক। অত টাকা কোথায় পাব পণ্ডিত মশায়—"

"তাহলে এখানে এসেছেন কেন। ডাক্তারের কাছে এসেছেন, ডাক্তার যে ওষুধ লিখে

দিয়েছে, তা যদি কেনবার সামর্থ্য না থাকে তাহলে অসুখ সারবে না। কেঁউ কেঁউ করলে বুধ গ্রহ শান্ত হবে না।"

"আমি দরিদ্র—"

"না, আপনি দরিদ্র নন। যে রক্তমুখী নীলাটা আপনি ধারণ করে আছেন তা কোনও দরিদ্র লোক ধারণ করতে পারে না!"

"কি করব, একজন জ্যোতিষীর পরামর্শে ওটা ধারণ করেছি। এর জন্যে স্ত্রীর গয়না বিক্রী করতে হয়েছে—"

"সে জ্যোতিষী গবেট। ফল পেয়েছেন কোনও?"

"কিচ্ছু না। খারাপই হয়েছে বরং।"

"সে জ্যোতিষী গবেট। এই নীলাই আপনাকে ডোবাচ্ছে—"

"কি করব তাহলে বলুন।"

"বলেছি তো, আমার উপর বিশ্বাস যদি থাকে নীলা খুলে পান্না ধারণ করুন।"

"কিন্তু এখন আমার যা অবস্থা তাতে—"

"তাহলে বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

"আমাকে দয়া করতেই হবে পণ্ডিত মশায়—"

"আমার উপর সত্যি বিশ্বাস আছে আপনার কি?"

"আছে বই কি। তা না হলে এত কষ্ট করে সেই কইকালা থেকে আপনার কাছে এসেছি—"

"তাহলে তার প্রমাণ দিন। আপনার ওই নীলাটা খুলে আমার কাছে রেখে যান। তার বদলে আপনাকে আমি পান্নার আংটি করিয়ে দেব একটা। সাতদিন পরে আসবেন।"

"নীলাটা খুলে দিয়ে যাব বলছেন?"

"এতে দুর্বোধ্য তো কিছু নেই—"

"আমার গিন্নীকে না জিগ্যেস করে এটা আপনাকে দিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। তার গয়না বেচেই এটা কিনেছি কিনা—হাতে আংটি না দেখলে তুলকালাম কাণ্ড করবে—বোঝেনই তো মেয়েমানুষ—"

"তাহলে মেয়েমানুষের কাছেই যান! উঠুন, আমি ভিতরে যাব একটু, কপাট বন্ধ করব। ওরে গাঁট্টা, শোন, আমাকে তুলে দে একটু। উচ্ছে কি এখনও আসেনি?"

"আমাকে কি সত্যিই হতাশ করবেন পণ্ডিতমশায়। বড় আশা করে এসেছিলাম।"

"ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার না করে দিলে কি আপনি যাবেন না?"

"আচ্ছা বেশ নীলাটাই খুলে দিয়ে যাচ্ছি তাহলে। আচ্ছা ধরুন আর এক কাজ করলে হয় না। আমার চেনাশোনা একজন জুয়েলার আছে তার কাছ থেকে যদি পান্নাটা কিনি, সে হয়তো ধারে দেবে—"

"আমার পরামর্শ অনুসারে যদি রত্ন ধারণ করতে চান সে রত্ন আমিই দেব। গোড়া থেকে কানে কামড়ে এই একটি কথাই তো বারবার বলছি আপনাকে। অপরের দেওয়া রত্নের উপর আমার বিশ্বাস নেই। ইমিটেশন স্টোনে বাজার ছেয়ে গেছে—"

"বেশ, তাহলে রাখুন এটা—"

"সাতদিন পরে আসবেন। ওরে গাঁট্টা কোথা গেলি তুই আবার—"

নবকিশোর দেখিল একটি প্রৌঢ় লোক বাহির হইয়া আসিলেন। মুখময় কয়েকদিনের না-কামানো কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে আধময়লা কামিজ, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, বগলে একটি তালি-দেওয়া ছাতি। মনে হইল ভদ্রলোক একটু কুব্জও। কোনো দিকে না চাহিয়া তিনি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন এবং চিৎপুরের দিকে আগাইয়া গেলেন।

নবকিশোর এইবার ঢুকিয়া পড়িল। গিয়া দেখিল একটি ক্ষীণকায় অস্থি-পঞ্জর-সার ব্যক্তি একটি বলিষ্ঠ লোকের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। নবকিশোরকে দেখিয়ে বলিলেন—"দাঁড়া, দাঁড়া, আবার কে এল। আমাকে আজ সেক নিতে দেবে না দেখছি। কি চান আপনি—"

নবকিশোরের মুখের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন বিরাট পণ্ডিত, তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"ও বাবা, এ যে মহাপুরুষ দেখছি। বসুন, বসুন। মহাপুরুষের কি দরকার আমার কাছে—"

"আমি উৎসাহের খবর এনেছি। তিনি হাওড়ায় মোটরচাপা পড়েছিলেন। এখন মেডিকেল কলেজে আছেন।"

"মোটর-চাপা পড়েছিল? উচ্ছে?"

বিরাট পণ্ডিতের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার নাকটাই প্রথমে চোখে পড়িল। প্রকাণ্ড একটা খাঁড়' যেন শীর্ণ মুখের উপর ঝুলিয়া আছে। নাকের ছিদ্র দুইটি হইতে লোমও বাহির হইয়া আছে প্রচুর। গোঁফ দাড়ি কামানো। চক্ষু দুইটি আরক্ত এবং আকর্ণবিস্তৃত, মনে হয় যেন প্রতিমার চোখ। বুদ্ধিদীপ্ত মর্মভেদী দৃষ্টি। দেখিলে ভয় করে।

"এ রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম। মাসখানেক থেকে পই পই করে বলছি প্রবালটা ধারণ কর। কিছুতে করলে না। স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী কি না। বেঁচে আছে তো?"

"বেঁচে আছে। কিন্তু এখনও জ্ঞান হয়নি।"

"আপনি কে।"

"আমিও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমরা একসঙ্গে ট্রেনে আসছিলাম। হাওড়া স্টেশনে নেবে আমি একটি ঘোড়ার গাড়ি করতে চাইলাম, বললাম চলুন দুজনে একসঙ্গে যাই। কিন্তু উনি বললেন আমি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ব না, হেঁটেই যাব। ভিড়ের মধ্যে হনহন করে এগিয়ে গেলেন, এমন সময় একটা ট্যাক্সি চাপা দিয়ে দিলে এসে—"

"ভয়ানক একগুঁয়ে চিরকাল। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কি করি বলুন তো। আমি এখন বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছি। আমার পক্ষে যাওয়া শক্ত। অথচ—। আপনি দয়া করে একটা কাজ করবেন?"

"কি বলুন, নিশ্চয়ই করব।"

"আমি ওর জন্য একটা ভালো প্রবালের আংটি করিয়ে রেখেছি। সেটা ওকে পরিয়ে দিন গিয়ে। এক্ষুনি দিন—। গাঁট্টা, বসিয়ে দে আমাকে ভাল করে। কোমরটায় বড্ড ব্যথা হয়েছে, বুঝলেন। একটু সেক দিলেই কমে যেত, কিন্তু সে অবসরটুকু আর পাচ্ছি না। লোকের পব

লোক, লোকের পর লোক, জ্বালাতন করে মেরেছে—। আপনি বসুন একটু। চা খাবেন, না কফি— ?”

“না কিছু দরকার নেই।”

“আপনার দরকার নেই, আপনি মহাপুরুষ, কিন্তু আমার দরকার আছে। মহাপুরুষের সেবা করতে পারা মহাভাগ্যের কথা। সুযোগ যখন পেয়ে গেছি ছাড়ব কেন। মাংস খাবেন? হরিণের মাংস?”

নবকিশোর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

“মাংস খাই, কিন্তু হরিণের মাংস কখনও খাইনি। কিন্তু অত হাঙ্গামা করছেন কেন—”

“হাঙ্গামা কিছু নেই। মাংস তৈরি রয়েছে, প্লেটে করে এনে দেবে, আপনি চটপট খেয়ে নেবেন। তারপর এক কাপ কফি, কফিই মাংসের সঙ্গে জমবে ভাল। গাঁট্টা, চটপট করে ব্যবস্থা করে ফেল দিকি—”

গাঁট্টা ভিতরে চলিয়া গেল।

“বসুন ভাল করে—”

ঘরে কয়েকটা চেয়ার ছিল, নবকিশোর তাহারই একটাতে উপবেশন করিল। বিরাট পণ্ডিত বসিয়াছিলেন বড় একটা চৌকিতে। তাঁহার পিছনে কয়েকটি তাকিয়া ছিল। ডান পাশে ছিল বড় একটা কাঠের বাক্স। তিনি সেটির ডালা খুলিলেন, নবকিশোর দেখিতে পাইল সেটি টুকিটাকি নানা জিনিসে পরিপূর্ণ। বাক্স হইতে তিনি একটা কৌটা বাহির করিলেন। কৌটা খুলিয়া বাহির করিলেন প্রবালের একটি আংটি। সেটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার কৌটার মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন—‘আপনি কৌটোসুদ্ধই নিয়ে যান। কৌটোটি কিন্তু ফেরত চাই আমার। অষ্টধাতুর তৈরি কৌটো, কাশীতে এক স্যাকরাকে ফরমাশ দিয়ে করিয়েছিলাম। কোটের ইনার পকেট আছে? তার ভিতরই রেখে দিন কৌটোটা। আজই আংটিটি ধারণ করিয়ে দেওয়া চাই—”

নবকিশোর বলিল—“ওঁর হাতে হবে তো আংটিটা!”

“ওর আঙুলের মাপ নিয়েই তৈরি করেছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই পরলে না। দুচার পাতা জ্যোতিষ পড়ে নিজেই পণ্ডিত হয়েছে। বলে ভাগ্যকে বদলানো যায় না। বলে, পুরুষকার নিষ্ফল। মানুষ হয়ে শক্তসমর্থ বুদ্ধিমান পুরুষ হয়ে বলে পুরুষকার নিষ্ফল। পাজি নচ্ছার কোথাকার। এখনি গিয়ে আপনি আংটিটা ধারণ করিয়ে দিন!”

“আচ্ছা।”

নবকিশোর কৌটোটি কোটের পকেটে রাখিয়া দিল। সে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। কে এই বিরাট পণ্ডিত? উৎসাহের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল ইনি যদিও সকলকে রত্ন ধারণ করাইবার জন্য ব্যগ্র কিন্তু নিজে কোনও রত্ন ধারণ করেন নাই। আংটি, মাদুলি, তাবিজ কিছুই সে দেখিতে পাইল না। অথচ বাতে এত কষ্ট পাইতেছেন!

গাঁট্টা এক প্লেট মাংস এবং খানকয়েক লুচি আনিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল কোথায় রাখিবে।

“খবরের কাগজে পেতে এই চৌকির উপরই দে। ছোট তেপায়াটা কোথা—”

গাঁট্টা এতক্ষণ কোনও কথা বলে নাই। এই কথায় তাহার চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী হইয়া

উঠিল। বলিল, "তেপায়াটা উপর পা রেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে জরি নবেল পড়ছে। বললাম, তেপায়াটা দে—পায়ের পাতা নেড়ে বললে, দেব না যা।"

"উচ্ছে ওর মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে দিয়েছে দেখছি। চৌকির উপর খবরের কাগজ পেতেই দে খাবারটা। আপনি একটু এগিয়ে আসুন—। যা কফিটা নিয়ে আয় চট করে—"

নবকিশোর আহারে প্রবৃত্ত হইল। হরিণের মাংস তাহার সত্যই খুব ভাল লাগিতেছিল। খুব নরম এবং চমৎকার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ একটা।

"ভালো লাগছে হরিণের মাংস?"

"চমৎকার। কোথায় পেলেন?"

"গ্রহবর্মা নামে আমার এক শিকারী ভক্ত আছে। সে-ই দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। এই বাঘের চামড়া, ওই হরিণের চামড়া সবই তার দেওয়া। অব্যর্থ লক্ষ্য ছোকরার—"

নবকিশোর এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এবার দেখিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত একটি বাঘের চামড়ার উপরই বসিয়া আছেন। হরিণের চামড়াটি দেওয়ালে ঝোলানো আছে।

"আর একটু মাংস দেবে?"

"না, আর চাই না।"

গাঁট্টা এক গ্লাস জল, একটি তোয়ালে লইয়া প্রবেশ করিল। নবকিশোর উঠিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

"কফি কই—"

"জরি আনছে। হঠাৎ নবেল ফেলে দিয়ে উঠে বললে—তুই যা আমি কফি নিয়ে যাচ্ছি!"

রাগত ভাবে গাঁট্টা প্রস্থান করিল।

নেপথ্য হইতে শোনা গেল—"জেঠু সেক নেবে এখন? তোমার জন্য তেল গরম করব?"

নবকিশোরের মনে হইল একটা বাঁশি বাজিল যেন।

"আগে তুই কফি দিয়ে যা—"

তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়ে বলিলেন—"সব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? জীবনটাই অদ্ভুত। দু'চার দিন যাতায়াত করলেই আর অদ্ভুত মনে হবে না, তখন মনে হবে এইটেই স্বাভাবিক। এও এক অদ্ভুত নিয়ম। অন্ধকারে প্রথমটা দেখা যায় না কিচ্ছু, কিন্তু একটু পরেই সব দেখা যায় আবার।"

নবকিশোর এইবার সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল—"উৎসাহ আপনার কে হয়?"

"কেউ হয় না। এরা কেউ আমার কেউ হয় না। আমি তীর্থ, এরা তীর্থের কাক!"

হাস্যোদীপ্ত কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"নিজেকে তীর্থ বললুম বলে নিশ্চয়ই আপনি মনে করছেন লোকটা খুব অহঙ্কারী। কিন্তু ওটা অহঙ্কারবশত বলিনি। বিনয়বশতই বলেছি। তীর্থ অতি খারাপ জায়গা। বৃন্দাবন গেছেন? মথুরা গেছেন? কাশী? তারকেশ্বর?"

নবকিশোর হাসিয়া মাথা নাড়িল।

"যাননি? গেলে বুঝতে পারতেন তীর্থ অতি খারাপ জায়গা। আমিও অতি খারাপ লোক। পরিচয় হোক বুঝতে পারবেন। কিন্তু না-ও পারতে পারেন, মহাপুরুষরা সবাইকেই ভাল দেখে।"

নবকিশোর সঙ্কুচিত হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে বারবার মহাপুরুষ বলছেন কেন—"

"মহাপুরুষ না হলে কি আপনি কষ্ট করে এত রাত্রে উচ্ছের জন্য ছুটে আসতেন? পরের জন্য কে কি করে মশাই? কার বয়ে গেছে। তাছাড়া আপনার কপাল দেখেই বুঝেছি—ইউ আর এ গ্রেট ম্যান। আপনার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে নয়, স্বচ্ছ। আপনার হাতটা একবার দেখাবেন?"

নবকিশোর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

"দেখাতে আপত্তি আছে না কি। তবে থাক—"

"আচ্ছা দেখুন—"

বিরাট পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নবকিশোরের প্রসারিত করতলের উপর নিবদ্ধ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাতটা তিনি দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চমৎকার হাত। জীবনে অনেক উন্নতি করবেন। শনিটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে কেবল। নীলা পরুন। নীলার আংটি আছে আমার কাছে একটা। দেখি আপনার আঙুলে হয় কি না—"

বিরাট পণ্ডিত সেই নীলার আংটিটি নবকিশোরের আঙুলে পরাইয়া দেখিতে লাগিলেন কোনও আঙুলে লাগে কি না। ডান হাতের মধ্যমা আঙুলে ঠিক হইল।

"এটা শনির আঙুল, ভালই হল। ওটা নিয়ে যান আপনি—"

নবকিশোর আংটিটি খুলিয়া চৌকির উপর রাখিয়া সবিনয়ে বললি—"আংটি কেনবার পয়সা নেই আমার—"

"পয়সা দিতে হবে না আপনাকে।"

এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হইল। নবকিশোর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একটি মেয়ে একটি ছোট তেপায়া লইয়া প্রবেশ করিয়াছে।

"কফি হয়ে গেছে। আনব?"

"আনবে বই কি। খবর শুনেছ? উচ্ছে মোটর-চাপা পড়ে হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ইনি খবর এনেছেন—"

জরি ভিতরে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি রঙিন ট্রের উপর কফির সরঞ্জাম সাজাইয়া লইয়া আসিল। তাহার পর নিঃসঙ্কোচে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি কফিটা খান। আমি কাপড়টা বদলে আসি। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

আবার ভিতরে চলিয়া গেল সে।

"দেখলেন কাণ্ডটা! এত রাত্রে ওর যাবার দরকার কি। কিন্তু শুনবে কি ও কোনও মানা? এইজন্যেই আমি কলেজে পড়ার ঘোর বিরোধী। বড় বার-ফটকা হয়ে যায় মেয়েগুলো। ওরে গাঁট্টা, জরি বেরুচ্ছে, তুইই আমার কোমরে তেলটা মালিশ করে দে—তুইই অগতির গতি—"

একটু পরেই জরি বাহির হইয়া আসিল। কালো রঙের সিল্কের একটা শাড়ি পরিয়াছে, রুপোলী জরির পাড়-বসানো। মেয়েটির রঙও কালো। এতক্ষণে নবকিশোর তাহার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল। গোল মুখ, নাকটা থ্যাবড়া, চোক দুটি গোল। কিন্তু কুৎসিত নয়। চোখের দৃষ্টি সমুৎসুক এবং তীক্ষ্ণ, মনে হইল একটু যেন হিংস্রও। পুষ্ট অধর, চিবুক দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কেমন যেন একটা বাঘ-বাঘ ভাব।

"চলুন—"

"ওকি, আংটিটা ফেলে যাচ্ছেন যে। নিয়ে যান, ধারণ করুন ওটা"—বিরাট পণ্ডিত মনে করাইয়া দিলেন।

"মাপ করবেন, ওটা আমি—"

অপ্রত্যাশিতভাবে জরি বলিয়া উঠিল—"দিচ্ছেন যখন, নিন্ না—"

নবকিশোর আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। আংটিটা আঙুলে পরিয়া ফেলিল। বিরাট পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। নবকিশোরের মনে হইল ব্যঙ্গের হাসি।

রাস্তায় দুইজনেই নীরবে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। নবকিশোর স্বভাবতই একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। জরি প্রথমে কথা কহিল।

"আপনার পাথর-টাথরে বিশ্বাস নেই না কি—"

"ও বিষয়ে কোনো মতই নেই আমার। কখনও তো ধারণ করিনি। আমার চেনা-শোনা কাউকে ধারণ করতে দেখিওনি।"

"বাড়ি কোথা আপনার—"

"বিহারে। ভাগলপুরে—"

"নীলাটা তাহলে আপনি পরবেন না?"

"কি করব ভাবছি। ওঁর কাছ থেকে বিনা পয়সায় অমন একটা দামী পাথর-বসানো সোনার আংটি নেওয়াটা উচিত কি না সেইটেই প্রথম কথা। উনি আমাকে দিলেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে আগে ওঁর কোনো পরিচয়ই তো ছিল না—"

"কেন দিয়েছেন তা পরে বুঝতে পারবেন। তবে একটা কথা বলতে পারি, একবার যখন ওঁর কাছে এসে পড়েছেন তখন বারবার আপনাকে আসতে হবে। সুতরাং ওঁকে চটানো ঠিক নয়। আংটিটা রাখুন আপনি। তবে নীলায় যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে ওটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন—আমি আপনাকে একটা ইমিটেশন-স্টোনের আংটি দিয়ে দেব—"

"আপনি কি করবেন!"

"বিক্রি করে দেব। বেশ দাম পাওয়া যাবে ওটার। চলুন না ওতলোকে দেখাই গে। ওতলো এ বিষয়ে গুণী—"

"ওতলো কে—"

"ভাল নাম অতুল। আমরা আড়ালে ওতলো বলি। ওই যে মোড়ে পানের দোকানটা রয়েছে তারই মালিক।"

"হ্যাঁ, আসবার সময় আলাপ হল যে ওঁর সঙ্গে। পান খাওয়ালেন আমাকে—"

"হয়েছে আলাপ? অদ্ভুত লোক। বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়াও জানে, অথচ পানের দোকান করেছে। আর কিছু করবে না। বলে পানের দোকানই আমার শখ পেশা স্বপ্ন—সব। চলুন ওকেই দেখাই। আংটিটা খুলে দিন আমাকে—"

নবকিশোর আংটিটি খুলিয়া দিল। একটু পরেই পানের দোকানের সমীপবর্তী হইল তাহারা।

"আসুন জরিদি। এই যে আপনিও। ভাব হয়ে গেছে বুঝি। হবেই জানতাম। আসুন—"

দুইজনকে দুই খিলি পান দিয়া অতুল জরির মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবটা—এত রাত্রে এ অনুগ্রহের অর্থ কি।

"অতুল, এই নীলার আংটিটা দেখ তো। দাম কত হতে পারে।"

অতুল আংটিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখলি। তাহার পর আলোর দিকে পাথরটাকে ফিরাইয়া

বাম চক্ষুটি বুজিয়া কেবল দক্ষিণ চক্ষু দিয়া নিরিক্ষণ করিল খানিকক্ষণ, তাহার পর দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া বাম চক্ষু দিয়া আরও খানিকক্ষণ।

"বেশ দামী পাথর। দাম অন্তত শ' তিনেক হবে। সোনার দাম ছাড়া—"

"তাহলে ওটা রেখে আপাতত আমাকে একশ' টাকা দিতে পারবে?"

অতুলের চোখে একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"টাকা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নীলাটি রাখবো না। বিরাট পণ্ডিতই আমাকে বলেছিলেন নীলার ত্রিসীমানায় তুমি যেও না। নীলা তোমার সইবে না—"

অতুল ক্যাশবাক্স খুলিয়া একশ' টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া জরির হাতে দিল।

"আংটিটা যদি বেচতে চান হীরালাল জহুরির কাছে দেবেন। সে ঠকাবে না। হীরালালকে চেনেন তো?"

কিন্তু জরির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল থামিয়া গেল। জরি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল।

"আংটি যদি তুমি না রাখতে পার টাকাটাও রেখে দাও। আমি হীরালালের কাছে থেকেই টাকা নেব। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনি।"

নোটখানা প্রায় ছুঁড়িয়া দিয়া সে আংটিটা তুলিয়া লইল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"চলুন। এখানে আর সময় নষ্ট করে কি হবে।"

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল অতুল।

"ছি, ছি জরিদি, কি কাণ্ড! টাকা নিয়ে যান আপনি। দিন, দিন আংটিটা আমাকে। আমিই হীরালালের কাছে নিয়ে যাচ্ছি ওটা। এত রাগী লোক আপনি! আসুন আর এক খিলি পান খান। একটু তাম্বুল বিহার দিয়ে দেব?"

জরির মুখে মৃদু হাসি ফুটিল। নবকিশোর দেখিল তাহার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিও স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। জরি পানের খিলিটি মুখে পুরিয়া নোটটি তুলিয়া লইল। অতুল নবকিশোরের দিকেও আর এক খিলি পান বাড়াইয়া বলিল, 'আসুন'।

"না। আমি আর খাব না। পান তো খাই না সাধারণত—"

"চলুন—"

অতুলের দোকান ছাড়াইয়া কিছু দূর গিয়া জরি প্রশ্ন করিল—"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

নবকিশোর কিছু না বলিয়া মুচকি হাসিল একটু।

"এই ট্যাক্সি—"

একটা ছুটন্ত ট্যাক্সিকে থামাইয়া জরি বলি, "চলুন আপনাকে আর একটু আশ্চর্য করে দি। চলুন চৌরঙ্গী থেকে ঘুরে আসি একটু—"

"চৌরঙ্গী থেকে? কেন!"

" 'কারণ' কিনব। ওইখানেই ভালো পাওয়া যায়।"

"কারণ? মানে, মদ?"

"মদ কথাটা ভালগার। 'কারণ' হচ্ছে বিশুদ্ধ পবিত্র নাম। আপনি একেবারেই অজ্ঞ লোক দেখছি—"

নবকিশোরের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। সে কোনও উত্তর দিল না। কলুটোলার মোড়ে সে বলিল—"রোকো—"

তাহার পর জরির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি 'এজরা' হাসপাতালে নেবে যাচ্ছি। আপনি যদি আসেন ওখানে খোঁজ করলেই পাবেন আমাকে। উৎসাহ এজরাতেই আছে—"

"আপনার নামটা তো জানি না।"

"নবকিশোর মুখোপাধ্যায়।"

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

নবকিশোর সন্তর্পণে হাসপাতালে ঢুকিয়া দেখিল নার্স কিং একটি সবুজ শেড দেওয়া সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্পের আলোকে বসিয়া কাজ করিতেছে। পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিল। তাহার পর নবকিশোরকে চিনিতে পারিয়া হাসিমুখে বলিল, "Good evening, student. Your friend is still unconscious. Would you like to see him again? Know where he is, please go softly......"

[নমস্কার। আপনার বন্ধু এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন। ওঁকে দেখবেন আর একবার? কোথায় আছেন তাতো জানেন, আস্তে আস্তে চলে যান।]

নবকিশোর গিয়া দেখিল উৎসাহ তখনও অজ্ঞান। প্রবালের আংটিটা তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতেই সে সামান্য একটু নড়িয়া উঠিল যেন। তাহার চোখের পাতাটাও ক্ষণিকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। আবার সব চুপচাপ; নবকিশোর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। আবার তাহার মনে হইল উৎসাহের মুখে কি যেন একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহার দৃপ্ত মুখভাব যেন প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। সে মেসে ফিরিয়া যাইবে ভাবিতেছিল এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল নার্স কিং আসিতেছে। তাহার সঙ্গে স্বয়ং প্রিন্সিপাল বার্নাডো! বার্নাডো একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিতেই নার্স কিং তাহার পরিচয় দিয়া দিল। বার্নাডো সাহেব তখন হাসিয়া ইংরেজীতে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই ঃ "তুমি আমাদের কলেজের ছেলে? এর বন্ধু? তাহলে তো ভালই হল। তুমিই এর খবরদারি কর। বিরাট পণ্ডিত এখনই আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে? প্রচণ্ড বিদ্বান এবং বহুদর্শী লোক।"

বার্নাডো ঝুঁকিয়া উৎসাহের নাড়ীটা পরীক্ষা করিলেন। "না, কোনও ভয় নেই—। আচ্ছা, আমি তাহলে পণ্ডিতকে ফোন করে দিচ্ছি—তুমি ওর দেখাশোনা কর।"

বার্নাডো সাহেব চলিয়া গেলে নবকিশোর নার্সকে বলিল—"আমি আমার মেসে ফিরে যাচ্ছি। এখন তো ভালো আছে—"

"কতদূরে তোমার মেস—"

"কাছেই। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট। কলুটোলার সামনেই—"

"আচ্ছা, ঠিকানাটা লিখে রেখে যাও। দরকার হলে আমি তোমাকে খবর দেব।"

মোটরের হর্নে নবকিশোরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার মেসের সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটর ক্রমাগত হর্ন দিয়া যাইতেছে। গাড়িবারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিল ট্যাক্সি একটা। ট্যাক্সির সামনে দাঁড়াইয়া আছে জরি। গোলদীঘি হইতে গ্যাসের আলো

তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে। সেই আলোকে তাহার মেসের দিকে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সে। তাহার কালো শাড়ির জরির পাড়ে যেন আগুন লাগিয়াছে।

"নবকিশোরবাবু—নবকিশোরবাবু—"

"যাই—"

নবকিশোর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মনে হইল কে যেন তাহার গলায় গামছা দিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জরির সামনে গিয়া যখন দাঁড়াইল তখন জরি কোনো কথা কহিল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিরাট পণ্ডিতের ভাষায় আপনি ঘোর তামসিক লোক দেখছি। এত গাঢ় আপনার ঘুম! আধ ঘণ্টা ধরে ডাকছি, আপনার ঘুমই ভাঙে না।"

"কটা বেজেছে—"

"বারোটা বেজে গেছে—"

"উৎসাহের কাছে যাবেন এখন?"

"ঘুরে এসেছি সেখান থেকে। নার্স কিংয়ের সঙ্গেও আলাপ হল। সে-ই আপনার ঠিকানা দিলে।"

"তাহলে—এখন কি করবেন।"

"চলুন লম্বা একটা ড্রাইভ দিয়ে আসা যাক। সুযোগ তো সব সময় পাওয়া যায় না। যান, একটা জামা গায়ে দিয়ে জুতো পরে আসুন। চট করে যান—"

"ড্রাইভ! এত রাত্রে ড্রাইভ দিয়ে কি হবে!"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে। সেটাই বা কি কম। আপনার দিক থেকেও হয়তো লাভ হবে কিছু, সেটা অবশ্য নির্ভর করে আপনি কি জাতের লোক তার উপর। আসুন না দু'জন দুটো অজ্ঞাত অরণ্যে ঢুকে পড়ি খানিকক্ষণের জন্য।"

"অরণ্য মানে?"

"আপনি একটা অরণ্য আমি একটা অরণ্য। আপনি আমার ভিতর ঢুকবেন, আমি আপনার ভিতর।"

তাহার চোখের দৃষ্টি চকচক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল সে দৃষ্টিতে।

"ঢোকা যাবে না। বড় জটিল ব্যাপার। তবু চেষ্টা করতে হবে। সারা জীবনই চেষ্টা করতে হবে। চলুন।"

নবকিশোর ইতস্তত করিতে লাগিল।

সহসা জরি তাহার কাঁধ ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিল।

"এখনও ঘুমুচ্ছেন না কি! উঠুন, চলুন—যাই—"

"কোথায় যাচ্ছি আমরা।"

"বেলগেছিয়ার দিকে। সেখানে একটা খালি বাগানবাড়ি আছে। সে বাড়ির মালি আমার চেনা। ডাকলেই গেট খুলে দেবে।"

"সেখানে কেন—"

"চমৎকার ছাত আছে। চলুন না, গেলেই বুঝতে পারবেন।"

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

জরি বলিল, "আপনি ভাববেন না যে আমি মদ খেয়ে মাতলামি করছি। মদ এক বোতল কিনেছি বটে, কিন্তু খাইনি এখনও। এইবার খাব। ওই বাড়ির ছাতে বসে!"

নবকিশোর কোনো উত্তর দেয় নাই। উত্তর দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না তাহার। লজ্জায় ধিক্কারে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। বারবার মনে হইতেছিল এত রাত্রে কেন সে এমন ভাবে এই অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত ভাসিয়া পড়িল? খরস্রোতা নদীর জলে যে সব খড়কুটা ভাসিয়া যায় তাহাদের বোধশক্তি থাকিলে তাহারাও হয়তো এইরূপই ভাবিত। নবকিশোরের মনের মধ্যে যে আবর্ত ঘূর্ণিত বিঘূর্ণিত হইতেছিল তাহার প্রাবল্য নীরবেই সে ভোগ করিতে লাগিল। নিজেকেই সে ধিক্কার দিতেছিলে বেশী। কিন্তু এই ধিক্কারের মধ্যে একটু মাধুর্য, একটু বিস্ময়ও ছিল। আর ছিল একটু কৌতূহল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে, কয়েক ঘণ্টাও নয়, কয়েক মিনিট বলিলেই ঠিক হয়—এই স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটি প্রায় উপযাচিকার মতো তাহার কাছে আসিয়া হাজির হইল কেন।

"চুপ করে আছেন কেন। কি ভাবছেন—"

"ভাবছি আপনি আপনার এই নৈশ অভিযানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন!"

"প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দি—'লাভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট্' নয়। প্রথম দর্শনেই পা হড়কে অথৈ জলে পড়ে যাইনি। অথৈ জলে পড়েছি অনেক আগেই। হাবুডুবু খাচ্ছি। আপনি খড়, সামনে এসে পড়েছিলেন, তাই আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি। জানি লাভ কিছু হবে না, তবু ধরেছি। ও হ্যাঁ, ভুলে যাওয়ার আগে এইটে নিয়ে নিন—"

"কি—"

"ইমিটেশন নীলার আংটিটা, প্রায় ওইটার মতোই দেখতে। পরে থাকুন। আঙুলে আংটি না দেখলে জেঠু জেরা করবেন। নিন।"

নবকিশোর আংটিটা লইল, কিন্তু পরিল না।

"পণ্ডিতমশাই কি আপনার জ্যাঠমশাই হন?"

"না। শুনেছি আমার বাবা ওঁকে দাদা বলতেন। ওঁর শিষ্যও হয়েছিলেন। আমার মা বহুদিন আগে মারা গেছেন। আমার বাবা মরবার সময় আমাদের ওই বাড়িটা উইল করে দান করে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে, মানে বিরাট পণ্ডিতকে। আমার সমস্ত ভারও তিনি দিয়ে গেছেন গুরুদেবের উপর। উনিই এখন আমার অভিভাবক। এসব অবশ্য আমার শোনা কথা।"

"আর উৎসাহ?"

"উচ্ছের ও উনি অভিভাবক। উচ্ছের বিধবা মা ওঁর শিষ্যা ছিলেন। থাকতেন তাঁর দাদার বাড়িতে। রাধুনীবৃত্তি করতেন। তিনি যখন মারা যান তখন উচ্ছের বয়স সাত বছর। সেই থেকে উচ্ছে বিরাট পণ্ডিতের কাছে আছে। এও শোনা কথা। উচ্ছেকে আমি জন্মে থেকে দেখছি।"

"উৎসাহেরও কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল না কি।"

"জানি না। তবে একটা রংচটা হলদে রঙের তালা-লাগানো তোরঙ্গ আছে, সেট শুনেছি ওর মায়ের। জেঠু সেটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে 'সীল' করে রেখে দিয়েছেন। কাউকে হাত দিতে দেন না। ওর মধ্যে যে কি রহস্য আছে জানি না। হয়তো ভয়ঙ্কর কিছু আছে।"

"আপনাদের পারিবারিক খবর জানবার এ অশোভন কৌতূহল আশা করি মার্জনা করবেন—"

"দেখুন নবকিশোরবাবু, না নবকিশোরবাবু বলব না, বার বার বেড়া টপকে যাতায়াত করা পোষাবে না। দেখ নরু, 'অশোভন কৌতূহল, মার্জনা করবেন' এ সব কেতাবী বুলি কেতাবেই মানায়। অশোভন তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বরং তোমার মনের কথা যদি স্পষ্ট করে বলবার সাহস থাকত তাহলে বলতে—ওলো হারামজাদি, এই যে এমন করে রাত দুপুরে আমার টিকি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস, তুই কে, তোর পরিচয়টা অন্তত দে—আর সত্যিই এমনি ভাবে যদি বলতে পারতে তাহলে কি খুশি যে হতাম। মুখোশ, মুখোশ, মুখোশ, চারদিকে কেবল মুখোশ। খানিকক্ষণের জন্যে মুখোশটা খুলে ফেল দিকি। কি জানতে চাও অসঙ্কোচে জিগ্যেস কর, আমি অকপটে সব বলব। উলঙ্গ হবার জন্যেই আজ বেরিয়েছি—"

নবকিশোর এ সব কথা শুনিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। আড়চোখে ড্রাইভারটার দিকে চাহিয়া দেখিল একবার। প্রকাণ্ড পাগড়িমাথায় প্রচুর গোঁফদাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী ড্রাইভার নির্বিকার ভাবে স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিয়া আছে। সে যে তাহাদের কথা শুনিতেছে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হইল না।

"চুপ করে আছ যে। তোমার অশোভন কৌতূহল শেষ হয়ে গেল?"

"না শেষ হয়নি। কৌতূহল অফুরন্ত। কোথা থেকে শুরু করব ভাবছি। আপনার জরি নামটা কে রেখেছে—"

"আপনার নয়, তোমার। বেড়া ভেঙে ফেল, মুখোশ খোল। জরি নাম আমি নিজেই রেখেছি। আমার ভালো একটা সংস্কৃত নাম ছিল 'অজরা', মা রেখেছিলেন। সেটা ছোট করে জেঠু ডাকতেন 'অজু' বলে। আমি একদিন জেঠুকে বললাম, নাম যদি ছোট করতেই হয় তাহলে 'অজু' নয়, জরি বলে ডাকুন আমাকে। জেঠুর পছন্দ হয়ে গেল। ওই জরি নামকে আরও নানাভাবে রূপান্তরিত করেছেন জেঠু। জরদা, জর্জরিতা, জিরে, জরৎকারু ইত্যাদি ইত্যাদি। জেঠু অদ্ভুত লোক। অমন কবি, অমন পণ্ডিত, অমন দেবতা, অমন পিশাচ—একাধারে দুর্লভ। এতদিন একসঙ্গে আছি অথচ এখনও ওঁর কূল-কিনারা পাই নি—"

"পিশাচ?"

"হ্যাঁ পিশাচ। অর্থপিশাচ। আমার বিশ্বাস ওঁর এই রত্ন-ধারণ করানোটা বুজরুকি। টাকা রোজগার করবার ফন্দী একটা। আমার মনে হয় ওঁর বাতটাও একটা 'পোজ'। ওঁর বাত-টাত কিচ্ছু হয়নি।"

"এ রকম 'পোজ' করবার মানে?"

"ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এক ডাক্তারকে লোকের কাছে খেলো করবার উদ্দেশ্যে। তিনি ভালো অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। কিন্তু তিনিও জ্যোতিষচর্চা করেন, কুষ্ঠি দেখে রত্ন দেন। তাঁকে উনি একদিন 'কল' দিলেন, বললেন কোমরে আর হাঁটুতে খুব ব্যথা হয়েছে, চিকিৎসা করুন। ওষুধ

খেতে পারি, কিন্তু ইনজেকশন নেব না। ডাক্তারবাবু নানারকম ওষুধ দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন মাংস ডিম খাওয়া চলবে না। জেঠু একটি ওষুধও খাননি, মাংস ডিম পুরোদমে খেয়ে চলেছেন। দুবেলা লোকদেখানো 'সেক' নেন অল্পক্ষণের জন্যে। লোকের সামনে ভান করেন বাতে পঙ্গু হয়ে গেছেন আর গালাগাল দেন ড্যাশগুপ্তকে। ডাক্তার দাশগুপ্তকে উনি ড্যাশগুপ্ত বলেন। রোজ রাত্রিবেলা দেখি বেশ গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যাচ্ছেন আর সেখানে পদ্মাসনে বসে কোমর সোজা করে প্রাণায়াম করছেন। সত্যি বাত হলে পারতেন না।"

"বল কি! টাকা রোজগার করবার জন্যে এত সব করছেন? বৃহৎ পরিবার না কি!"

"ওঁর কেউ নেই। আমাদের জন্যই টাকা রোজগার করেন। ওঁর নিজের খরচও অবশ্য রাজকীয়। আতর চাই, 'কারণ' চাই, মাংস চাই। যখন তন্ত্র সাধনা করেন তখন সাধনসঙ্গিনীও চাই। আমি যখন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করি তখন আমাকেও উনি সাধনসঙ্গিনী করেছিলেন দিনকতক—যদিও আমি ওঁর মেয়ের মতো। দিনকতক পরে বললেন আমি ওঁর সাধন-সঙ্গিনী হবার যোগ্য নই। আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটা চামারের মেয়ের সঙ্গে জুটলেন। তাকেও ছেড়ে দিলেন মাস ছয়েক পরে—"

"সাধন-সঙ্গিনী? ব্যাপারটা কি—"

"সংক্ষেপে, অর্চনা। আমার সর্বাঙ্গ উনি রীতিমত পুজো করতেন!"

"পুজো করতেন। সর্বাঙ্গ? কি রকম?"

"আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গকে উনি মন্ত্র উচ্চারণ করে ভক্তিভরে পুজো করতেন যেন আমি শক্তির প্রতীক। আমাকে বলেছিলেন তুই ঠিক পাষাণ প্রতিমার মতো নির্বিকার থাকবি। কিন্তু আমি পাষাণ নই, নির্বিকার থাকতে পারিনি। দিনকতক পরে বললেন, তুই পশু, তোকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না—দূর হ।"

"তন্ত্রের এসব ব্যাপার তুমি বিশ্বাস কর।"

"ও অরণ্যে তো ঢুকতে পারিনি। তাই কোনও জ্ঞান নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, জেঠু সত্যিই বিরাটেশ্বর। তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিয়ে খেলা করেন, গায়ে আঁচড়টি লাগে না। দুরন্ত বিষধরকে গলায় জড়িয়ে বেড়ান, সে ফণা তুলতে সাহস করে না। উচ্ছেও ওই সব নিয়ে মেতেছিল দিনকতক এক শ্মশান-ভৈরবীর সঙ্গে। তিনি আসতেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে। জেঠু একদিন রাগারাগি করে সব থামিয়ে দিলেন। বললেন—আগে পড়াশোনা করে জমি তৈরি কর, তারপর বাগানের স্বপ্ন দেখো। অথচ আশ্চর্য, জেঠু মেয়েদের পড়াতে চান না। বলেন মা কালী মা দুর্গার কলেজে পড়বার দরকার নেই। ওরা এমনিই শক্তি। আমি হাংগার স্ট্রাইক শুরু না করলে আমাকে মা কালী মা দুর্গা হয়েই থাকতে হত....কিন্তু আমি মানুষ, রক্তমাংসের...."

নবকিশোরের মনে হইল যেন একটা আগ্নেয়-পর্বত লাভা উদ্‌গিরণ করিতেছে। এক মুহূর্ত থামিতেছে না, গলগল করিয়া নিজের ফুটন্ত মনটা বাহিরে নিষ্ঠুরভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিতেছে।

জরি বলিতে লাগিল—"শুধু রক্তমাংসের নয়, মনের আত্মার চিন্তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার এক বিচিত্র সমন্বয় আমি, জেঠুর স্তোকবাক্যে তাই আমি ভুলিনি। লেখাপড়া শিখেছি, ছোট্ট চৌবাচ্চা থেকে ঝাঁপ দিয়েছি বিশাল সমুদ্রে। ছোট্ট উঠোনের দেওয়াল টপকে লাফ দিয়েছি যে জগতে তা এত বৃহৎ যে দু'হাত দিয়ে আঁকড়েও তাকে পাওয়া যায় না। তা—"

হঠাৎ জরি থামিয়া গেল। তাহার পর আবার বলিল, "এখন মনে হয় ভুল করেছি। কিছু লাভ হয়নি। 'আমি শক্তি' জেঠুর এই তত্ত্বটাকে যদি নিভৃতে ঘরের কোণে বসে তা দিতুম তাহলে হয়তো শক্তির প্রচ্ছন্ন ভ্রূণটা পাখি হয়ে একদিন আকাশে ডানা মেলতে পারত। কিন্তু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে একটা, নিজের কথাই বলে যাচ্ছি কেবল। তোমার কথা একটু শুনি—"

"শোনবার মতো চমকপ্রদ ঘটনা আমার জীবনে তো কিছুই ঘটেনি! আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সাধারণ ছেলে। ছেলেবেলাতেই বাবা-মা যে লাইন ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই লাইন ধরেই চলছি। তোমার এই অদ্ভুত বিচিত্র জীবনের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। আর একটা কথা ভেবেও অবাক হচ্ছি, আমাকে তুমি কতটুকুই বা চেন, অথচ তোমার জীবনের সব কথা এমন ভাবে বলে যাচ্ছ—"

"পৃথিবীতে সবাই অচেনা। পাশাপাশি বহুকাল একসঙ্গে বাস করলেও অচেনা অচেনাই থাকে। উচ্ছের সঙ্গে এতকাল বাস করেছি, সে-ও যেমন অচেনা তুমিও তেমনি অচেনা। বললাম তো, তোমাকে সামনে পেয়েছি তাই আঁকড়ে ধরেছি। বিরাট পণ্ডিত বললেন তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, হয়তো আমাকে তুমি ঠিক ভাবে দেখতে পাবে। আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। জেঠু বলেন, তুই দুর্বল, উচ্ছে বলে তুই পাপীয়সী, গাঁট্টা বলে তুই পাজি হারামজাদি, ওতলো বলে তুমি রহস্যময়ী—কিন্তু কেউ আমাকে ঠিক-ঠিক দেখতে পায়নি। ওরা যা বলে তা ঠিক. কিন্তু ওসব ছাড়াও আমি আরও কিছু। আশা আছে সেই আরও কিছুটা তুমি দেখতে পাবে, জেঠু বললেন, তুমি মহাপুরুষ, তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। পাবে কি দেখতে?"

যেন মিনতির মতো শুনাইল। নবকিশোর উত্তর দিবার অবসর পাইল না। পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওলা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"বেলগাছিয়া আ গিয়া। কাঁহা উৎরেঙ্গে।"

"চল এখানেই নেবে পড়ি। এখান থেকে বেশী দূর নয়।"

নবকিশোর এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এবার দেখিতে পাইল জরি একটি বড় ব্যাগ কিনিয়াছে। ব্যাগটি লইয়া সে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সি ভাড়া উঠিয়াছিল প্রায় বারো টাকা। সে টাকাটাও দিয়া দিল।

ব্যাগ খুলিয়া টর্চ বাহির করিল একটা।

"চল এইবার—"

"এ সব কোথা পেলে। যখন আমার সঙ্গে এলে তখন তো ছিল না।"

"কিনলাম। মানুষের মন ছাড়া আর সব জিনিসই কেনা যায়। এখান থেকে বেশী দূর নয়। চল—"

ও অঞ্চলটা তখনও একটু পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ ছিল। তখন রাস্তায় বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিত না। অনেক দূরে দূরে কেরোসিনের আলো ছিল মাঝে মাঝে। টর্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে তাহারা আগাইয়া চলিল। রাস্তায় পীচ ছিল না। অনেক জায়গায় খোয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর এক জায়গায় হোঁচট খাইল।

"টর্চটা তুমিই নাও। আমার এ-সব পথ চেনা!"

"পথ চেনা হতে পারে। কিন্তু গর্তগুলো?"

"ওগুলোও চেনা।"

নবকিশোর টর্চটা লইয়া জরিকেই পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

"আমাকে পথ দেখাতে হবে না। স্বর্গের পথ যদি দেখাতে পার তাহলেই বুঝব তুমি মহাপুরুষ। মর্ত্যের পথ আমার চেনা।"

নবকিশোরের মানসিক আড়ষ্টতা ক্রমশ কাটিয়া যাইতেছিল। এবার সে সহজভাবে, একটু ব্যঙ্গেরই সুরেই উত্তর দিল—"স্বর্গের পথ ভূগোলের পথ নয়। সে যে গোলে আছে তা শুনেছি, গোলক-ধাঁধা। সমাধান করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তোমার কি ক্ষমতা আছে কি ক্ষমতা নেই তা তুমি কি জান? হাতী কি জানে সে কতটা শক্তিধর! জানে না। তাই মানুষের খেদায় ধরা পড়ে একটা কুনকি হাতীর মোহে। তুমি মোহের বেড়া ভাঙতে পারবে, এটা হয়তো দুরাশা। কিন্তু ওই সব দুরাশাকে আঁকড়েই তো এতদিন কাটল। এই তো জীবন।"

"ধর মোহের বেড়া যদি ভাঙতেই পারি তাহলেই কি তোমাকে স্বর্গের পথ দেখাতে পারব?"

"মোহের বেড়া ভাঙলেই স্বর্গ, জেঠু বলেছেন। তুমি নিজেই তখন স্বর্গ হয়ে যাবে, তোমার থেকেই তখন নির্মল আনন্দের নির্ঝর উৎসারিত হবে, স্নান করে পান করে অবগাহন করে আমি বাঁচব।"

"তুমি খুব ভালো বাংলা জানো দেখছি—"

"জানি। এম.এ.তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। শুধু বাংলা নয়, আরও অনেক কিছু জানি। নানা রকম জ্ঞানের শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছি। কিন্তু শান্তি নেই।"

নীরবেই তাহারা পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা যাঁর বাগানবাড়িতে যাচ্ছি তাঁর নাম কি?"

"তাঁর নামটা করব না, তিনি মানী লোক। যখন বি. এ. পড়তুম তখন তিনি আমার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে এই বাড়িটা আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিইনি, কারণ আমি যা চাই তার তুলনায় এ বাড়িটা ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ। তিনি তাঁর মালি সুখদেওকে ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছেন যে, আমি দিনে রাত্রে যখন খুশি এসে যতক্ষণ থাকতে চাইব তার ব্যবস্থা সে যেন করে দেয়। কিন্তু আমি ওই হুকুমের সুযোগ নিয়ে যাই না, যাই সুখনের টানে। সুখন গরীব চাকর মাত্র, কিন্তু আমি জানি সে তার ধনী মালিকের চেয়ে বড়লোক। সত্যি ভালবাসে আমাকে। আর যাই ছাতটার লোভে। তিনতলার উপর প্রকাণ্ড ন্যাড়া ছাত। রেলিং নেই, আলসে নেই। অসাবধানে সীমা অতিক্রম করলেই মৃত্যু। ভারি লোভনীয়....."

"অসাবধান হবার ইচ্ছে হয় না কি মাঝে মাঝে— ?"

"না। মরবার ইচ্ছে নেই এখন। মোটেই নেই। কিন্তু মৃত্যু পাশেই আছে এই ধারণাটা বেশ রোমাঞ্চকর। বালিশের নীচে সাপ থাকার মতো। থ্রিলিং।"

"বাড়ির মালিক এখন কোথায় আছেন?"

"কলকাতাতেই আছেন। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী এখন। উন্মত্ত প্রেমিকদের শেষ পর্যন্ত যে দশা হয় তাই হয়েছে তাঁর। এই যে আমরা এসে গেছি—"

প্রকাণ্ড একটা গেটের সামনে জরি দাঁড়াইয়া পড়িল। গেট না বলিয়া সিংহদরজা বলাই উচিত। দুই পাশের স্তম্ভে দুইটি প্রকাণ্ড সিংহের মূর্তি, থাবা তুলিয়া স্পর্ধা ভরে দাঁড়াইয়া আছে।

"সুখন, সুখন, সুখদেও—"

"কোনও সাড়াশব্দ নাই। তখন জরি নীচের ঠোঁটটা দুই আঙুলে টিপিয়া খুব জোরে একটা 'সিটি' দিল। এইবার কাজ হইল। গেটের নিকটেই যে ঘরটা ছিল সেটার কপাট খুলিয়া গেল।

"কে, সুখন?"

মৃদু কোমল কণ্ঠে উত্তর আসিল—'হাঁ, বেটি'। একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া সুখন বাহির হইয়া আসিল। দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ লোক। কাছে আসিতেই নবকিশোর দেখিল তাহার মুখভাব গম্ভীর। কপালের উপর লাল চন্দনের তিলক। নগ্নদেহে উপবীতগুচ্ছ বিলম্বিত। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চেহারা। জরির দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরেই সে যেন বলিল—"এত রাত্রে কেন বেটি। ফের বদখেয়াল, না অন্য কাজ আছে—"

"বদখেয়াল নয়, শুধু খেয়াল। আমার নতুন বন্ধুকে নিয়ে এলাম এখানে। মৌজ করব। তোমার জন্যেও ভাল 'বিলাইতি' এনেছি আজ। তোমার সেই গ্লাশটা আছে তো—"

গম্ভীরবদন ব্রাহ্মণের মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। একটা নেবানো ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ সহসা বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিল যেন।

"আছে বই কি—"

"এখানে সোডা পাওয়া যাবে কি।"

"সব যাবে। গণেশকে উঠিয়ে এখুনি সব নিয়ে আসছি। খাবার আনব? এত রাত্রে ঠাণ্ডা সিঙাড়া কচুরি পাওয়া যেতে পারে রামধন হালুইয়ের দোকানে—করিমও দিতে পারে হয়তো কিছু।"

"যা পাও আন। ক্ষিধে পেয়েছে—"

"চাবিটা রাখ তুমি তাহলে। আমি যাই, নিয়ে আসি জিনিসগুলো। তোমরা সামনের ঘরটা খুলে বস।"

সুখদেও চলিয়া গেলে নবকিশোর প্রশ্ন করিল, "ও কি বাঙালী?"

"খোঁজ করিনি। নাম শুনে মনে হয় বিহারী। যাই হোক গ্রেট ম্যান। এই রাত্রে কি অসাধ্যসাধন করে দেখ না আমাদের জন্যে। চল সামনের ঘরটায় গিয়ে বসা যাক ততক্ষণ। ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই। আমি মোমবাতি কিনে এনেছি কিছু। দেশলাইও আছে। দাঁড়াও বার করি ব্যাগটা থেকে। সিগারেটও এনেছি এক টিন। তুমি সিগারেট খাও না বোধ হয়।"

"না—"

"আমি খাই মাঝে মাঝে।"

বাহিরের বৈঠকখানাটা প্রকাণ্ড। মহার্ঘ সোফা সেটি দিয়া সাজানো। মাঝখানে খুব বড় একটা মার্বেল পাথরের টেবিল। দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং ছবি। রবি বর্মার বিখ্যাত কয়েকখানা ছবিও রহিয়াছে। জরি মোমবাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর ব্যাগ হইতে হুইস্কির বোতলটাও বাহির করিল। নবকিশোরের দিকে চাহিয়া হাসিল একটু।

"ভাল ছেলের এ সব চলে না নিশ্চয়—"

"না—"

"You are a darling: তোমাকে দিতে হলে আমার ভাগে খানিকটা কমে যেত। সুখনকেও খানিকটা দিতে হবে।"

"সুখন তোমার একগ্লাসের ইয়ার এতে ভারি আশ্চর্য লাগছে।"

"সুখনকে মদ খেতে শিখিয়েছে ওর মালিক। এখন ওর মালিক কাত হয়েছেন, মুশকিলে পড়েছে বেচারা। শুনেছি রোজ তাড়ি খায়। আমি যখন আসি ওকে ভালো জিনিস খাওয়াই।"

"অথচ তোমাকে তো বেটি বলে সম্বোধন করলে।"

তাতে কি হয়েছে। বাপ বেটিতে তো অনেক জায়গায় একসঙ্গে মদ খায়। ও আমাকে বেটি বলে তার একটা ইতিহাস আছে। একদিন আমার প্রেমিকবর মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন, আমি তখনও বেহুঁশ হইনি। সুখন মালিকের মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করছিল। আমি সেই সময় এক কাণ্ড করে বসলাম। হঠাৎ ওর কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরলাম। পুরুষ হিসাবে he is a wonderful specimen, ও কি করলে জান? ও আমার গালে একটা চুমু খেয়ে বললে—তুই আমার বেটি। কোলে বসেছিস বেশ করেছিস। এখন শুবি চল—। সেই থেকে আমি ওর বেটি।—কি, ফ্রয়েড্ মনে পড়ছে না কি—হা-হা-হা-হা—।"

নবকিশোর চমকাইয়া উঠিল। জরি যে এত জোরে হাসিতে পারে তাহা সে কল্পনা করে নাই।

জরি মদের বোতলটা খুলিয়া ফেলিল।

সুখন সত্যই অসাধ্যসাধন করিয়াছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গরম গরম কচুরি ও আলু-পেঁয়াজের ছেঁচকি আনিয়া হাজির করিল সে। ছয় বোতল সোডাও।

বলিল, "করিম মুর্গি জবাই করেছে। এখুনি 'কারি' তৈরি করে আনছে। তোমরা ততক্ষণ এইগুলো খাও। দেখি—"

মদের বোতলটা তুলিয়া সস্নেহে সেটার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"দাঁড়াও, আমি আমার গ্লাশটা নিয়ে আসি!"

সিঁড়ি দিয়া যখন তাহারা ছাতে উঠিতেছিল তখন কোনো আলো ছিল না। জরি ইচ্ছা করিয়াই কোনো আলো আনে নাই।

"তুমি আমার হাতটা ধর। দুচার ধাপ উঠলেই বুঝতে পারবে সিঁড়ির ধরনটা কেমন। ভাল সিঁড়ি।"

'টর্চটা আনলে না কেন।"

"তুমি বেরসিক দেখছি। অন্ধকার উপভোগ করতেই তো এসেছি। এখানে আলো জ্বেলে কি হবে—"

"হাতটা ভালো করে ধর তাহলে। এইবার চল—"

কিছুদূর উঠিয়া জরি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটা জান? তোমার আছে তো হাতখানি।"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল।

জরি আবার বলিল—"সেই যে, বিজন ঘরে—"

নবকিশোর মদ খায় নাই, তবু সে উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল একটা। তাহার মনে হইতেছিল আরব্য-রজনীর একটা অদ্ভুত রজনীই বুঝি সুদূর অতীত হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া বিংশ শতাব্দীর কলিকাতা নগরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মূর্ত হইয়াছে। কথা বলিয়া এই

উত্তেজনার মোহটাকে ছিন্নভিন্ন করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। উত্তেজনাটা সে উপভোগ করিতেছিল তাই চুপ করিয়া ছিল। জরি কিন্তু না-ছোড়।

"চুপ করে আছ কেন—"

"অন্ধকারে তুমিই তো আলো ফেলতে চাইছ না। ভুলে যাচ্ছ যে কথাও আলো। তাই চুপ করে আছি—"

"আমি কথার আলো নিয়ে খেলা করব বলেই তো অন্য আলো আনিনি। কথার আলো জ্বেলে জ্বেলেই নিবিড় অন্ধকারে আমি যে জগতে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই সে জগৎ দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং চুপ করে থাকা চলবে না। আমি তো কথা বলবই, তোমাকেও বলতে হবে। বুঝলে—?"

জরি নবকিশোরের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

নীরবে তাহারা সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

জরি একবার বলিল, "তুমি এক পেগ খেয়ে নিলে পারতে।"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না।

একটু পরেই অনুভব করিল সে যেন একটা ঝড়ের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হু হু করিয়া প্রবল বেগে হাওয়া বহিতেছে।

"আমরা ছাতে এসে গেছি। দাঁড়াও, তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি এক জায়গায়। চুপ করে বসে থাক। ছাতে আলসে নেই,—এইখানে বস।"

নবকিশোরকে বসাইয়া দিয়া জরি সরিয়া গেল। হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে। নির্মেঘ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় গেল জরি? এই অন্ধকার রঙ্গ-মঞ্চে কোন্ নাটকের অভিনয় হইবে?

"এইগুলো তুমি নাও তো। ভালো করে ধরে থাকো। উড়ে না যায়। আজ বড্ড হাওয়া—"

নবকিশোর হাত দিয়া অনুভব করিল একটা কাপড়ের পুঁটুলি।

"কি এটা।"

"আমার শাড়ি সেমিজ সায়া আর ব্লাউস। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েছি। উলঙ্গ হবার জন্যেই আসি এখানে। ধরে থাক ভালো করে। উড়ে না যায়। আমি এখানেই বসছি—"

নবকিশোরের সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল। একটু পরেই মদ ঢালার শব্দ এবং গ্লাসের ঠুনঠুন ও শুনিতে পাইল সে।

"একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে বুঝে নাও নবু। তোমাকে নষ্ট করব বলে এখানে নিয়ে আসিনি। আমি অনেক বাঘ সিংহ হাতি গণ্ডার শিকার করেছি, তোমার মতো নিরীহ শশককে বধ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাছাড়া sex-এর চরম করেছি বলেই জানি ওই নিয়ে উন্মত্ত হয়ে যারা সারাজীবন কাটিয়ে দেয়, তারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। আমিও সেই শ্রেণীর ছিলাম, হঠাৎ—ভালো ফুটবল খেলোয়াড়কে কিক্ করতে দেখেছো কখনও—হঠাৎ সেই রকম একটা কিক্ খেয়ে মাটি থেকে আকাশে উঠে গেছি। ফুটবল হলে মাটিতে আবার নেবে পড়তুম, কিন্তু আমি ফুটবল নই, তাই এখনও আকাশে আকাশেই ভেসে বেড়াচ্ছি আর সেই আকাশ-লোকেই দেখা পেয়েছি তোমার। তুমি হয়তো জানতে চাইবে কে আমাকে 'কিক্' করেছিল, নামটা কিন্তু বলব না। তুমি আন্দাজ করতে পার কিন্তু জেনে রাখ সে আন্দাজটাও ভুল হবে—"

হঠাৎ জরি থামিয়া গেল। যে কথাটা নবকিশোরের গোড়াতেই মনে হইয়াছিল সেই কথাটাই আবার মনে হইল। মেয়েটা পাগল নয় তো? তাহার উপর মদ গিলিতেছে! নিজের উপরই রাগ হইল আবার। কেন সে এমন ভাবে এত রাত্রে—

জরি কথা কহিল।

"তোমার রাগ হচ্ছে জানি। রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তুমি নিজেকে হয়তো ইঁদুর ভাবছ, আর আমাকে ভাবছ বেড়াল। ভাবছ তোমাকে গ্রাস করবার আগে থাবা দিয়ে দিয়ে খেলাচ্ছি। বিশ্বাস কর, তা নয়। আমার অন্তরটা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম তাহলে তুমি হয়তো রাগ করতে না। কয়লার খাদ দেখেছো কখনও? যে খাদ থেকে আর কয়লা ওঠে না, বিস্ফোরণে যে খাদ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, যেখানে একটা কালো গহ্বর ছাড়া আর কিছু নেই—দেখেছ এরকম খাদ? আমার অন্তরটা অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সেই অন্ধকার অন্তরের অন্তরতম গুহায়, পাতাল পর্যন্ত প্রসারিত সেই গাঢ় তমিস্রায় একটা ছোট্ট সবুজ স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। সেই স্বপ্নটা আমার চুলের ঝুঁটি ধরে আমাকে সেই খাদ থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না বেচারা। প্রথমত ছোট্ট, দ্বিতীয়ত স্বপ্ন। তুমি তাকে একটু সাহায্য করবে? কেউ করেনি। কেউ করতে চায় না। গাঁট্টা, ওতলো, উৎসাহ, আরও অনেককে বলেছিলাম। কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ না-বোঝবার ভান করে। জেঠু বুঝতে পেরেছেন কিন্তু তিনি মুচকি মুচকি হাসেন আর বলেন—তখনই বলেছিলাম কলেজ-ফলেজ যাসনি। অথৈ জলে পড়ে এখন হাবুডুবু খা খানিকক্ষণ, তারপর নৌকা নিয়ে আসবে কেউ একজন। জেঠু হেঁয়ালিতে কথা বলেন। আমি হাবুডুবু খাচ্ছি না, জলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও ওটা জেঠুর হেঁয়ালি। আমি অবলম্বন-হীন হয়ে শূন্যে ঝুলছি। আগে যখন মোহে পড়ে ভালবাসার ভান করতাম তখন তাই একটা অবলম্বন ছিল, তারপর যখন মোহমুক্ত হলাম তখন ঘৃণা করতাম সকলকে, ঘৃণাটাই অবলম্বন ছিল। সকলকে প্রাণ ভরে গাল দিয়ে সময় কাটত। এখন ঘৃণাও করতে পারি না। এখন—"

আবার হঠাৎ চুপ করিয়া গেল জরি। নবকিশোর এসব কথার উত্তরে কি যে বলিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে সে মরিয়া হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল—

"আমি কিছু করলে যদি তোমার উপকার হয় আমি তা করতে প্রস্তুত আছি যদি তা আমার সাধ্যাতীত না হয়। আমি—"

জরি তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

"মহত্ত্বের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যদি উপকারের মুষ্টিভিক্ষা দাও তাহলে কাজ হবে না। সে ভিক্ষা আমি পাবও না, কারণ ভিক্ষাপাত্র প্রসাবিত করে আমি দাঁড়িয়ে নেই। তা ধুলোয় পড়ে নষ্ট হবে। উপকার নয়, তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। আমাকে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মনে কর, তাহলেই আমাকে বুঝতে পারবে। এসব জিনিস বুদ্ধি দিয়ে হয় না, অনুভূতি চাই, মেকি নয় খাঁটি অনুভূতি—"

"কিন্তু এরকম অনুভূতি তুমি আমার কাছে কেন প্রত্যাশা করছ, আমি তোমার সম্পূর্ণ অচেনা, তোমার সম্বন্ধে এক বিস্ময় ছাড়া আর তো কোনও অনুভূতি আমার মনে জাগছে না। তুমি উলঙ্গ হয়ে অন্ধকারে বসে যা বলছ তা যদি আবোল-তাবোল হত তাহলে তোমাকে পাগলই মনে করতাম। কিন্তু তা আবোল-তাবোল নয়, তা অত্যন্ত অদ্ভুত, অত্যন্ত শাণিত,

অত্যন্ত উজ্জ্বল। তা তাচ্ছিল্য করে অগ্রাহ্য করব এমন শক্তিও আমার নেই। অথচ আমি কি যে করব, কি যে করতে পারি তাও ভেবে পাচ্ছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি—"

"তোমাকে গোড়াতেই বলেছি তুমি অচেনা এইটেই আমার পক্ষে মস্ত সুবিধে। চেনা-লোকেরা বড় উদাসীন, আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ফুরিয়ে গেছে। তারা যদিও আমার কিছুই জানে না কিন্তু মনে করে যেন সব জেনে ফেলেছে। শেক্‌সপীয়ার, মিলটন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেনা হয়ে গেছে, তাই আমরা আর তাদের পড়ি না। তাদের সমস্ত বিস্ময় সমস্ত ঐশ্বর্যকে আমরা ঔদাসীন্যের ধামাচাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। তুমি আমাকে চেনো না, আমি তোমাকে চিনি না এইটেই মস্ত সুবিধে। তাই তোমাকে টেনে এনেছি এখানে—"

ঐশ্বর্যকে আমরা ঔদাসীন্যের ধামাচাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। তুমি আমাকে চেনো না, আমি তোমাকে চিনি না এইটেই মস্ত সুবিধে। তাই তোমাকে টেনে এনেছি এখানে—"

"কি করতে হবে বল—"

"কিচ্ছু করতে হবে না। কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই। আমাকে শুধু তুমি বোঝ, সহ্য কর। আমার কেউ নেই। এই ভয়াবহ নির্জনতায় তুমি শুধু কাছে থাক। আর পার যদি আমার ওই সবুজ স্বপ্নটাকে একটু সাহায্য কর। আমি যা করছি তা অসম্ভব, তা হাস্যকর। কিন্তু তবু আমি তা করবই..."

"কি সেটা—"

"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই জীবন ঘটালে মোর জনম জনমান্তর।' সেটা হয়তো তাঁর কল্পলোকে ঘটেছিল। আমি এই জীবনে তা সত্যিসত্যি ঘটাতে চাই। জেঠু বলেন, যা তুমি প্রাণমন দিয়ে চাইবে তাই হবে। জেঠুর কথা বিশ্বাস করি আমি। আমি সেই সাধনাই করছি। তুমি তার সাক্ষী থাক—"

"কি সাধনা, বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"যা ঘটেছে এ জীবনে আমি তা মুছে ফেলতে চাই। ক্লীন স্লেট নিয়ে শুরু করতে চাই আবার। আবার সেই শিশু হতে চাই যে শিশু নিষ্কলঙ্ক, নির্ভয়, নির্মোহ, যা আমি একদিন ছিলাম—"

"বেশ তো হও না, কিন্তু আমি এর মধ্যে কি করে আসছি—"

"তুমি সাক্ষী থাকবে। আমি সত্যিই যদি স্বপ্নটাকে সফল করতে পারি তাহলে তোমার দরকার হবে না, যদি না পারি তুমি তোমার বন্ধুকে বোলো যে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি—"

"কোন্ বন্ধুকে?—"

"উচ্ছেকে, যার ভালো নাম উৎসাহ, যে শ্মশান ভৈরবীর সঙ্গে জুটে একদিন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল—যে আমাকে বলেছিল তোর পেছনে একটা নীচস্থ শুক্র ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তুই পাপীয়সী, আমাকে ছুঁসনি—।"

"উচ্ছেকে ভালবাস না কি—"

"মোটেই না। ওকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে আমি ওর নীচস্থ শুক্রকে ভয় করি না। সাধনার জোরে নীচস্থ শুক্রকে তুঙ্গী বৃহস্পতি করে দিতে পারি। যদি না পারি, তুমি বোলো আমি চেষ্টা করেছিলাম—"

"তুমি নিজেই তো বলতে পার।"

"পরাজয়ের কথাটা নিজের মুখে বলতে পারব না। সেটা তুমি বোলো—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল—"নবু, কাল আমাকে কিছু লজেনস্ চকোলেট কিনে দেবে? আর দু'চারটে খেলার পুতুল? আমি ওই সব নিয়েই আবার থাকতে চাই। দেবে?"

"তা না হয় দেব। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না এখনও। তুমি—"

"বোঝবার দরকার নেই। আমাকে তুমি শিশু মনে কর। আমার সঙ্গে শিশুর মতো ব্যবহার কর। ভুলে যাও যে আমি যুবতী নারী। মনে কর আমি তোমার খুব ছোট্ট একটি বোন, যে এখনও ভালো করে হাঁটতে শেখেনি, কথা বলতে শেখেনি। একাগ্র হয়ে যদি একথা ভাবতে পার আমি ঠিক শৈশব ফিরে পাব। শ্রীরামকৃষ্ণের একাগ্রতায় মৃন্ময়ী কালী জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। তুমি এই ঝুনো পাকা বুড়ীটাকে কচি শিশু করে দাও—তুমি পারবে যদি চেষ্টা কর। জেঠু বলেছেন, তুমি মহাপুরুষ। তোমার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। তুমি ক্ষেত্রবাবুর 'অভয়ের কথা' পড়েছ? তাতে এক জায়গায় আছে, একজন মানুষের মুক্তি হলেই সব মানুষের মুক্তি হয়ে যায়। একজনও যদি সত্যি সত্যি উপলব্ধি করে যে জগৎটা মিথ্যা মায়া মাত্র, সব উপে যাবে। অর্থাৎ একজন মানুষ সত্যি সত্যি ইচ্ছে করলে আর একজন মানুষকে রূপান্তরিত করতে পারে—এই সারটুকু আমি সংগ্রহ করেছি। তীর্থের কাক তো—যা পাই সংগ্রহ করে রাখি। অনেক বাজে জিনিসও সংগ্রহ করেছি জীবনে। এটার জলুস কিন্তু বাড়ছে দিন দিন, তাই এটাকে আঁকড়ে আছি—"

"বিরাট পণ্ডিত তোমাদের তীর্থের কাক বলে, না?"

"হ্যাঁ, সবাইকে ওই নাম দিয়েছেন জেঠু। এমন কি নিজেকেও। বলেন, আমি যে তীর্থের কাক সে তীর্থের মন্দিরে কিন্তু ছাত নেই, চূড়া নেই, দেওয়াল নেই, অর্থাৎ সে তীর্থে মন্দিরই নেই। সেখানে মাথার উপরে আকাশ, পায়ের নীচে মাটি আর আশেপাশে দশ দিক। এই তীর্থের কাক উনি। নিজেকে মাঝে মাঝে তীর্থও বলেন। জেঠুর সবই আজগুবি, সবই অদ্ভুত!"

"তোমার জেঠুকে বার্নাডো সাহেব খুব খাতির করেন মনে হল—"

"করেনই তো। চরক, সুশ্রুত, জ্যোতিষ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানদান করেছেন উনি বার্নাডো সাহেবকে। একটা ভালো প্রবালের আংটিও দিয়েছেন। সে আংটি পরে নাকি সাহেবের অনেক উন্নতি হয়েছে। জেঠুর সুপারিশেই তো উচ্ছে মেডিকেল কলেজে ঢুকতে পেরেছে।"

"উৎসাহও তো খুব ভালো জ্যোতিষী। নয়?"

"কি করে জানলে?"

"আজ ট্রেনে যখন আসছিলাম ও চেন টেনে গাড়ি থামিয়েছিল। গার্ডসায়েব যখন এলেন তখন বলল—আমার গোচর ফল এখন ভালো, আমার কিচ্ছু করতে পারবেন না আপনি—"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল জরি।

"বেচারা উচ্ছে। জেঠু ওর আসল কুষ্ঠিটা লুকিয়ে রেখেছেন, ওকে যে কুষ্ঠিটা দিয়েছেন, তা একটা বানানো কুষ্ঠি—ওর নয়—"

"সে কি! তুমি কি করে জানলে—"

"আমিই তো টুকে দিয়েছিলাম কুষ্ঠিটা। উচ্ছে যখন শ্মশান ভৈরবীকে নিয়ে মাতল তখন একদিন জেঠুর কাছে এসে কুষ্ঠি চাইলে। জেঠু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, সেটা আমার পুরোনো খাতায় টোকা আছে, পরে বার করে দেব। উচ্ছে চলে যাবার পর জেঠু আমাকে ডেকে বললেন, তুই এই কুষ্ঠির ছকটা ওকে টুকে দে। এটা ওর কুষ্ঠি নয়। কিন্তু ওকে বলিসনি সে কথা। জিগ্যেস করলাম—ওর নয় তো, কার কুষ্ঠি এটা। জেঠু বললেন, কারো নয়। সেই কুষ্ঠি নিয়ে উচ্ছে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। ওর না কি রাজযোগ আছে—"

আবার জরি হাসিয়া উঠিল।

জরির হাসিতে পরিবেশটা যেন হালকা হইল একটু। বিস্ফোরণ-বিধ্বস্ত কয়লার খনিটা এমন হাসি হাসিতে পারে? নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল নবকিশোর। জরিও নির্বাক। ছাতের উদ্দাম বাতাসটাও থামিয়া গেল হঠাৎ। নবকিশোর সহসা অনুভব করিল তাহার সমস্ত দেহটা ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দিন ট্রেনে কাটিয়াছে, তাহার পর উৎসাহকে লইয়া মেডিকেল কলেজে ছুটাছুটি, মেসে আসিয়া সামান্য একটু ঘুমাইয়াছিল, তাহার পরই জরি।

"আমার বড় ঘুম পাচ্ছে জরি—"

"আমি তোমাকে এতক্ষণ ধরে যা বললাম তাতে তো ঘুম অন্তর্ধান করা উচিত। সব শুনেও তোমার ঘুম পাচ্ছে—?"

"পাচ্ছে তো—?"

"তাহলে ওইখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। বিছানা বালিশ কিছুই নেই। কষ্ট হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে পারতে। কিন্তু অতটা নির্বিকার হয়েছ কি? হওনি। এক কাজ কর, আমার কাপড় জামার পুঁটুলিটা মাথায় দিয়েই শোও। একটু ঘুমিয়েই নাও। কিন্তু ভয় হচ্ছে আমার। ঘুমের পর মানুষের মন বদলে যায়। তুমি বদলে যাবে না তো! যে খড়টাকে আঁকড়ে ধরেছি সেটা সর্পে রূপান্তরিত হবে না তো?"

নবকিশোরের মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নীচে বসিয়া জরি সাগ্রহে যেন তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কি উত্তর সে দিবে? কাহাকেও আশ্বাস দিবার সামর্থ্য কি তাহার আছে? কোনো উত্তর সে দিতে পারিল না।

একটু পরে জরিই আবার কথা বলিল—"ঘুমের পর মানুষ বদলে যায়, কিন্তু তবু ঘুমকে তো আটকানো যায় না। ঘুমোও তুমি—"

লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল নবকিশোর। কিন্তু স্বস্তি পাইল না। শাড়ির জরিপাড় তাহার কাঁধের নীচে বিঁধিতে লাগিল, ব্লাউসের বোতামগুলো মনে হইল যেন সজীব পোকা কয়েকটা। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সে। কিন্তু ঘুম আসিল না। আচ্ছন্নের মতো তবু অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল সে। মনে হইতে লাগিল যেন যুগ-যুগান্ত পার হইয়া যাইতেছে। জরির কোনও সাড়াশব্দ নাই। কিন্তু হঠাৎ সে যেন চাবুক খাইয়া উঠিয়া বসিল। বিবেকের চাবুক। এ কি করিতেছে সে। অজানা একটা বাড়ির ছাতে অচেনা একটা মাতাল মেয়ের প্রলাপ শুনিয়া সে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছে! এ কি দুর্মতি হইল তাহার। বাতাসের বেগটা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। বহুদূর হইতে ঝিল্লীর ঝনৎকার ভাসিয়া আসিয়া অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিল।

"জরি তুমি কোথায়—"

দূর হইতে উত্তর আসিল, মনে হইল অনেক দূর হইতে।

"আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি। তোমার ঘুম হয়ে গেল?"

"আমি চললুম—"

"এখনই?"

"হ্যাঁ—"

"অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারবে?"

"পারব—"

নবকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ কাচ ভাঙার একটা শব্দ হইল। তাহার পর গড় গড় করিয়া গড়াইয়া আসিল কি যেন একটা।

"যাঃ, হাওয়ার দাপটে গ্লাশটা ভেঙে গেল। বোতলটা গড়িয়ে যাচ্ছে তোমার দিকে, খালি বোতলটা—"

নবকিশোর কোনো উত্তর না দিয়া হাতড়াইয়া সিঁড়ির দরজাটা খুঁজিতেছিল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হইতেছিল আলিসাবিহীন ছাতের সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া যাইবে না তো! সৌভাগ্যক্রমে তখনই সিঁড়ির দরজাটা হাতে ঠেকিল।

"শোন শোন, এত রাত্রে একা যাবে কি করে? ট্যাক্সি পাবে কি। টাকা আছে সঙ্গে? নীচের ঘরে টেবিলে আমার ব্যাগে টাকা আছে, তার থেকে নিয়ে যাও কিছু—"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না। অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

।। চার ।।

পরদিন নবকিশোর কলেজে গিয়াই প্রথমে উৎসাহের খোঁজ করিল। গিয়া শুনিল তাহার জ্ঞান হইয়াছে। ডাক্তাররা নাকি তাহার বিশেষ যত্ন লইতেছেন। বার্নাডো সাহেব আর একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন। নবকিশোরকে দেখিয়া নার্স কিং আগাইয়া আসিয়া ইংরেজীতে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এইঃ "তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। আমার ডিউটি শেষ হয়েছে এখন। নার্স ব্রাউন থাকবেন। তাঁকে সব বলে দিয়েছি। ভয় নেই, জ্ঞান হয়েছে। তুমি কাছাকাছি থাকো, কিন্তু ওর সঙ্গে বেশী কথা বোলো না এখন। কর্নেল বার্নাডো মানা করে গেছেন। আমি চললুম। গুড বাই। সন্ধ্যের সময় দেখা হবে।"

নার্স কিং চলিয়া গেল। গত রাত্রে নবকিশোর যে অদ্ভুত আবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহার ঘোর তখনও সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া সেটাকে উড়াইয়া দিতে পারিলে সে হয়তো স্বস্তি পাইত। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনা-পরম্পরাকে দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না সে। সমস্তক্ষণ তাহার মনের মধ্যে জরি অটল হইয়া বসিয়া রহিল। উৎসাহের শয্যাপার্শ্বে যখন গিয়া সে দাঁড়াইল, তখনও তাহার মনে হইতে লাগিল জরি তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

উৎসাহ চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। নবকিশোর নিকটে দাঁড়াইতেই সে চোখ খুলিয়া চাহিল।

তাহার আগমনবার্তা যেন উৎসাহের মনের মধ্যে নীরবেই সঞ্চারিত হইল। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল নবকিশোরের দিকে। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "নমস্কার। কি কাণ্ড যে হয়ে গেল!"

"সব বলব। এখন নয়, পরে।"

"ঘটনা কি ঘটেছিল তা আমি জানি। আপনার বন্ধু আমাকে আশ্বাসও দিয়ে গেছেন আমার হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি। প্রিন্সিপালও এসে বলে গেলেন কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার সব ভেঙে গেছে—"

"কি ভেঙে গেছে?"

"এতদিন ধরে যে হর্ম্যটা গড়েছিলাম সামান্য একটা ধাক্কায় তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার কুষ্ঠি অনুসারে আমার যা গোচর ফল তাতে আমার কোনও বিপদ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হয়ে গেল তো। তার মানে—"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু।

"ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবেন না। এখন আপনার বিশ্রাম দরকার—"

"ভাবছি মরে গেলেই বা ক্ষতি কি। এ প্রবালের আংটিটা আমার হাতে আপনি পরিয়ে দিয়ে গেছেন কি?"

"হ্যাঁ, আমি বিরাটেশ্বর শর্মার কাছে গিয়েছিলাম আপনার খবরটা দিতে। তিনিই আমাকে আংটিটা দিয়ে বললেন—এখুনি ওটা গিয়ে ওকে ধারণ করিয়ে দিন। কাল রাত্রেই এসে ওটা আপনাকে পরিয়ে দিয়ে গেছি। তখন আপনার জ্ঞান ছিল না। আংটি পরে তো উপকার হয়েছে দেখছি—"

উৎসাহ কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—"আংটিটা আপনি নিয়ে যান। বিরাট পণ্ডিতকে ফেরত দিয়ে দেবেন। ওসবে আমার বিশ্বাস নেই—"

উৎসাহ আংটিটা খুলিয়া তুলিয়া ধরিল।

"এখন থাক না। এখুনি তো আমি যাচ্ছি না তাঁর কাছে। কবে যাব, যাব কি না, কিছুই ঠিক নেই, আপনি সেরে উঠুন, তারপর ফেরত দেবেন।"

"তাহলে ওটা আপনার কাছেই রাখুন এখন। আমি ওটা পরব না, আমার কাছেও রাখব না।"

অগত্যা নবকিশোরকে আংটিটা লইতে হইল।

"বিরাট পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"হয়েছে। অদ্ভুত লোক বলে মনে হল—"

"জরির সঙ্গে?"

"হয়েছে। জরি আরও অদ্ভুত।"

উৎসাহ আবার চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এবার বুঝতে পেরেছি কেন যেতে চাইছেন না।"

"আমি এখন চললুম। আমি থাকলেই আপনি কথা কইবেন।"

"একটা কথা শুনে যান। মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে একটা লাভ হয়েছে—"

"কি লাভ—"

"আমার সেই ক্ষমতাটা লোপ পেয়েছে। সকাল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি কারো পিছনে আর পাপগ্রহের ছায়া দেখতে পাচ্ছি না। ভৈরবী আমাকে বলেছিল অহমিকার ধাক্কায় ও ক্ষমতা চলে যাবে। ভাবছি অহমিকাটা কার, আমার না ট্যাক্সির—"

"Please do not talk much."

(বেশী কথা কইবেন না)

নার্স ব্রাউন হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা চললুম—"

নবকিশোর বাহির হইয়া গেল।

ক্লাস ওয়ার্ড প্রভৃতি সারিয়া সে যখন মেসে ফিরিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে মেসের চাকর বলিল—"একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেছিল সে। এই চিঠিটা রেখে গেছে। বলেছে সময় পেলে আজ সন্ধ্যের পর আবার আসবে। আপনার খাবার নিয়ে আসি?"

"এস—"

খামের চিঠিখানি হাতে করিয়া নবকিশোর উপরে উঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা খুলিল না। ভাবিল খাইবার পর ধীরে সুস্থে খুলিবে। খাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে চিঠিটা খুলিল না। অপেক্ষা করিতে লাগিল তাহার রুম-মেট যোগেন ঘুমাইয়া পড়িলে খুলিবে। যোগেন অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির লোক। খামের চিঠি খুলিতে দেখিলেই প্রশ্ন করিবে কার চিঠি। নবকিশোরের চিঠি বড় একটা আসে না। খামের চিঠি তো আসেই না। সৌভাগ্যক্রমে যোগেন সেদিন খাইয়া উঠিয়াই জামা জুতা পরিতে লাগিল।

"এখন কোথায় বেরুবে এই দুপুরে?"

যোগেন বলিল—"চেতলা যাচ্ছি। সেখানে আমার এক পিসির কলেরা হয়েছে খবর পেলাম। খবর যখন পেয়েছি যেতেই হবে। তোমার পিসি-টিসি আছে?"

"না—"

"ভাগ্যবান লোক তুমি।"

যোগেন বাহির হইয়া গেল। নবকিশোর উঠিয়া ঘরের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল, শুধু বন্ধ নয়, খিল দিয়া দিল। কেন এরূপ করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো লজ্জিত হইয়া পড়িত। বিছানার উপর বসিয়া খামের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। হাতের লেখাটাও অদ্ভুত। পরিষ্কার গোটাগোটা মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর নয়। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো জটিল লেখা, কিন্তু ওই জটিলতার মধ্যেও কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ পরিচ্ছন্নতা আছে।

চিঠি খুলিতেই একটা আংটি বাহির হইয়া পড়িল। সেই ইমিটেশন স্টোনের নীলার আংটিটা। আংটিটা নবকিশোর টেবিলের উপরই রাখিয়া আসিয়াছিল।

জরি লিখিয়াছে—

"নবু,

হয়তো তোমার দেখা পাব না এই ভেবেই আগে থাকতে চিঠিটা লিখে নিয়ে যাচ্ছি। যদি

দেখা না পাই, চিঠিটা রেখে আসব। তুমি কাল রাত্রে যে আচরণ করেছ তা সাধারণের চোখে কাপুরুষোচিত মনে হবে। কিন্তু আমার চোখে তা মনে হয়নি। মহাপুরুষরা অনেক সময় কাপুরুষোচিত আচরণ করতে পারেন বলেই মহাপুরুষ বলে গণ্য হন। তাছাড়া পশ্চাদপরসণ করা অনেক সময় সেরা রণকৌশল। টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস' নিশ্চয় পড়েছ। রুশ সেনাপতি কুটুজভ্ যদি মস্কো ছেড়ে পালিয়ে না যেতেন তাহলে তিনি নেপোলিয়নকে হয়তো হারাতে পারতেন না। কাল রাত্রে তুমি হয়তো ভয়েই পালিয়েছ, কিন্তু তোমার ওই ভয়টাই তোমার ভদ্র মনের পরিচয় দিয়াছে। আমি কাল রাত্রে অকপটে তোমাকে যা বলেছি, আমার আচরণে যা তোমার কাছে প্রকট করেছি, তাতে আমাকে ভয়ঙ্করী মনে করাই তো স্বাভাবিক। অনেকের কাছে এই ভয়ঙ্করীও আবার লোভনীয়া। তুমি তথাকথিত সাহসী হলে যা করতে পারতে তাতে আমি বাধা দিতাম না। কিন্তু তারপর তোমাকে সেই আস্তাকুঁড়ে আবর্জনার মতো ফেলে দিতাম যেখানে অসংখ্য লালসাক্লিন্ন মনুষ্যাকৃতি পশুর দল নানা ওজুহাতে কিলবিল করছে অনাদিকাল থেকে। আর্ট, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান—কোনো-না কোনো একটা অজুহাতের ছুতোয় তুমিও অনায়াসে পশুত্বের সেই আদিমস্তরে নেমে যেতে পারতে। কিন্তু তা তুমি যাওনি। ভয়েই যদি কাল পালিয়ে থাক বেশ করেছ—আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ভয় না হয়ে যদি ওটা ঘৃণা হয় তাহলে অবশ্যই কিছু বলবার আছে। কারণ ঘৃণা অহমিকারই রূপান্তর। নিজেকে একটা কাল্পনিক উচ্চবেদীতে না তুললে অপরকে ঘৃণা বা কৃপা করা যায় না। কৃপাও ঘৃণার আর একটা রূপ। আমরা ভগবানের বা ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করি কারণ তাঁকে আমরা নিজের মতো ভেবে নিই। তিনি যেন দারোগা, হাকিম বা ওই জাতীয় কিছু একটা। এ ধরনের অহমিকায় তোমার মন ওতপ্রোত তা আমি অবশ্য কল্পনা করতে পারি, কিন্তু কল্পনা করতে ইচ্ছে করে না। তোমার যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাকে সেই অতি-বিরল-শ্রেণীভুক্ত করতে ইচ্ছে করে যার চলতি নাম 'ভদ্রলোক'। জেঠু তোমাকে এক নজরেই চিনেছিলেন তাই তোমাকে বলেছিলেন 'মহাপুরুষ'। ভদ্রলোকেরাই মহাপুরুষ। যাক এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশী আলোচনা করব না। তুমি হয়তো বিব্রত বোধ করছ। ভদ্রলোকেরা প্রশংসা শুনে স্ফীত হয় না, বিব্রত হয়। আমার নিজের কথাই বলি এবার। কাল সব কথা তোমাকে বলা হয়নি। সবচেয়ে দরকারী কথাটাই বলিনি। যে অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে কাল তুমি ভয়ঙ্করী উন্মাদিনীকে অভিনয় করতে দেখেছিলে তার যবনিকা কালই ফেলে দেব আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিলাম। যখনই তোমার কাছ থেকে নীলার আংটিটা পেয়ে গেলাম আর ওতলো সেই আংটির বদলে টাকা দিলে তখনই ঠিক করেছিলাম সেটা। তোমাকে দর্শকরূপে পেয়ে উৎসাহটা বেড়ে গেল আরও। ঠিক করলাম আমার দৈন্যের ঐশ্বর্য তোমার কাছেই উজাড় করে দেব সব। তারপর যবনিকাটা ফেলে দিয়ে আরম্ভ করব নূতন জীবন। তোমার কাছেই নিজেকে নিরাভরণ নগ্ন করে দেখাবার প্রবৃত্তি কেন আমার জেগেছিল তা কাল তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম—জীবনে নিরুত্তর হইনি কখনও—কিন্তু আজ তোমাকে বলছি, উত্তরটা আমিও জানি না। লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট (Let there be light and there was light) বাইবেলে উক্ত এই ঘটনার মতো ওটাও একটা বিস্ময়কর, কিন্তু সত্য ঘটনা। বিরাট আবর্জনার বোঝা গঙ্গাই বইতে পারে, তোমাকে হয়তো আমার গঙ্গা বলেই মনে হয়েছিল, হয়তো আমার অবচেতন লোকে তোমাকে আমি

আরও মর্যাদা দিয়েছিলেন, হয়তো তোমাকে আমি সেই ত্রিপথগামিনী স্রোতস্বিনী বলে কল্পনা করেছিলাম যিনি স্বর্গে অলকানন্দা, মর্ত্যে গঙ্গা এবং পাতালে ভোগবতী। ওই দেখ, আবার তোমার কথায় এসে পড়েছি। যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে, যা করবার করে ফেলেছি। এইবার আসল কথাটা বলি যেটা কাল তোমাকে বলা হয়নি। আমি কাল এখানে থেকে চলে যাচ্ছি। অনেক দিন আগে একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে আর তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে বোর্ডিংয়ে। ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গলাভের জন্য মন অনেকদিন থেকেই উৎসুক হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরাই আমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবে যাকে যীশুখৃস্ট কিংডম্ অব হেভেন বলেছেন। চাকরিটা পাব সে আশা করিনি। কিন্তু পেয়ে গেছি। কাল চলে যাব। তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কোরো, আমাকে ছোট শিশু বলে ভেবো, আমার বিশ্বাস তাতে অনেক কাজ হবে। নীলার আংটিটা তুমি ফেলে গিয়েছিলে, ফেরত দিলাম এই সঙ্গে। যদি পরতে না চাও রেখে দিও। আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই থাক ওটা তোমার কাছে। জেঠুকে সব বলেছি। তাঁর নীলার আংটিটাও ফেরত দিয়ে দিয়েছি তাঁকে। ওতলোকেও টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। জেঠু আমাকে মার-ধোর করলেন একটু (আমার মতো বুড়ো মেয়েকেও উনি চুলের ঝুঁটি ধরে কিল চড় লাথি মারতে ইতস্তত করেন না!)—কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিলেন এবং ওতলোকেও যাচ্ছেতাই করলেন টাকাটা দিয়েছিল বলে। ওতলোর সঙ্গে আলাপ কোরো। ও মহাশয় লোক পণ্ডিতও—ডবল এম. এ.। আমাকে ও ভালবাসে, কিন্তু কদর্থে নয়। আমাকে শ্রদ্ধা করে, সহ্য করে, আর আমাকে নিয়ে ও মনে মনে না জানি কি একটা রহস্যময় কৌতুক-কাব্যলোক সৃষ্টি করেছে যার আভাস ওর চোখের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। লোক কিন্তু চমৎকার। ওর সঙ্গে আলাপটা বজায় রেখো, সুখ পাবে। ও আমার অনেক আবদার সহ্য করেছে, আমাকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, জেঠুর চেয়ে ওতলো আমার বড় সহায়, জেঠুকে ভয় করে, ওতলোকে করে না। আমি কাল চলে যাব সে কথা আর কাউকে বলিনি এখনও। বললে একটা হুলুস্থুল হবে আশঙ্কা করছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। রাত্রি দশটার আগে আসব না। কারণ তার আগে হয়তো তোমার কাজ শেষ হবে না, আর তার আগে কলকাতার হৈ-হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে সত্যিকার 'দেখা' কি হওয়া সম্ভব? তুমি মেসেই থেকো, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব—"

জরি চিঠিতে নাম সই করে নাই। নবকিশোর আংটিটা আঙুলে পরিয়া দেখিল। ঠিক ফিট করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া আবার রাখিয়া দিল সেটা টেবিলের উপর। তাহার পর আবার উঠিল। বাক্স খুলিয়া কাপড়-জামার নীচে রাখিয়া দিল আংটিটা। তাহার পর মনে পড়িল উৎসাহের আংটিটাও তাহার পকেটে আছে। বিরাট পণ্ডিতের সেই অষ্টধাতুর কৌটোটাও। কৌটোর মধ্যে আংটিটা পুরিয়া সেটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল সে। একবার ইচ্ছা হইল এখনি গিয়া বিরাট পণ্ডিতকে আংটিটা ফেরত দিয়া আসে। এখন তো ক্লাস নাই। জরির কথা ভাবিয়াই কিন্তু নিরস্ত হইল সে। যদি তাহার সহিত দেখা হইয়া যায়, যদি সে ভাবে চিঠিটা পাইয়াই হ্যাংলার মতো ছুটিয়া আসিয়াছে—না, নিজেকে অত খেলো করিবে না সে। কৌটোটা রাখিয়া, জামাটা খুলিয়া লুঙ্গি পরিয়া শুইয়া পড়িল। এই সময় সাধারণত সে ঘুমায়। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই। শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল—একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় যেন দেখা হইয়াছে—নিতান্ত ছোট, তিন চার বছরের বেশী হইবে না,

মাথায় লাল ফিতা দিয়া বাঁধা বেড়াবিনুনি, এক হাতে ন্যাকড়ার পুতুল, আর এক হাতে আধ-খাওয়া বিস্কুট। নবকিশোরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। নবকিশোর দুই হাত বাড়াইয়া তাহার দিকে আগাইয়া যাইতেই কিন্তু ছুটিয়া চলিয়া গেল সে। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল হঠাৎ। সেখানে অজস্র ফুল ফুটাইয়া প্রকাণ্ড কদম গাছ দাঁড়াইয়া আছে একটা। বৃদ্ধ গাছটাও যেন রোমাঞ্চিত। ...দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল নবকিশোরের। কপাটে কে ধাক্কা মারিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া দিল। যোগেন আসিয়াছে। ঘর্মাক্ত কলেবর।

"পিসি পটল তুলেছে। মাঝ থেকে আমার ভোগান্তি আর খরচ। ডিস্‌গাস্‌টিং! খুব ঘুমিয়েছ? চোখ তো বেশ লাল দেখছি। খিল দিয়ে শুয়েছিলে ভালো করেছিলে। নতুন ছোঁড়া চাকরটা চোর মনে হচ্ছে। বিশুদার লাল গামছাটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"জামা খুলবে না?"

"এখনি তো ক্লাস। তুমি যাবে না?"

"যাব নিশ্চয়ই। চল—"

উইলসন সাহেবের সার্জারির ক্লাস ছিল। উইলসন সাহেবের পাকা গোঁফ কাইজারী কায়দায় তা দেওয়া। ঊর্ধ্বমুখী গুম্ফপ্রান্ত যেন সদম্ভে ঘোষণা করিতেছে—হট্ যাও। ছাত্রদের উপর কিন্তু তিনি ভারী প্রসন্ন। প্রথম দিনই ক্লাসে আসিয়া বলিয়াছিলেন—বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া সার্জারি শেখা যায় না। তোমাদের মধ্যে কেহ সত্যই যদি সার্জন হইতে চাও হাতে-কলমে কাজ শিখিতে হইবে। অনেকবার ঠকিয়া, অনেক ধাক্কা খাইয়া, অনেক লাঞ্ছনা এবং বকুনি সহ্য করিয়া তবে সার্জন হইতে হয়। পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য এই লেকচার। আমার প্রফেসারের দেওয়া যে নোট পড়িয়া আমি পাস করিয়াছিলাম, সেই নোট আমার খাতায় টোকা আছে। সেই খাতা হইতে আমি তোমাদের রোজ পনরো মিনিট করিয়া সেই নোট ডিক্‌টেট করিব। তোমরা তাহা যদি আয়ত্ত করিতে পার অনায়াসে পরীক্ষায় পাস করিয়া যাইবে। উইলসন সাহেব পনরো মিনিটের বেশী ক্লাস লইতেন না। নবকিশোর ক্লাস হইতে বাহির হইয়া উৎসাহের কাছে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো বিরাট পণ্ডিত বসিয়া আছেন। কপালে রক্তচন্দনের টিকা, পরিধানে সাদা থান, পায়ে সাদা চামড়ার চটি। খালি গা, বুক-ভরা কাঁচা-পাকা লোম, তাহার উপর শুভ্র উপবীতগুচ্ছ। নবকিশোরকে দেখিয়া তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। নবকিশোরের মনে হইল দুই চোখে যেন দুইটি শিখা জ্বলিতেছে। বিরাট পণ্ডিত শীর্ণকায় অস্থিপঞ্জরসার ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার কপালের রক্তচন্দন, তাঁহার চোখের শিখায়িত দৃষ্টি, তাঁহার মুখের মেকী হাসি দেখিয়া নবকিশোর শঙ্কিত হইল। ওই ছোটখাটো লোকটাকে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত বলিয়াই মনে হইল তাহার।

"এই যে আপনিও এসে গেছেন। আপনিই বলুন, কাক আর মানুষে তফাত আছে কি না।"

"আছে বই কি—"

"কিন্তু কোনও কাক যদি হঠাৎ মনে করে যে সে মানুষের মতো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে—"

উৎসাহ বলিয়া উঠিল, "আমি কাক নই, আমি মানুষ—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত।

"ক'টা মানুষ আছে দুনিয়ায়! কেউ কেঁচো, কেউ ব্যাঙ, কেউ শ্বাপদ, কেউ সাপ। তীর্থের কাকও বেশী নেই, তীর্থই বা ক'টা আছে। মানুষ অসাধ্যসাধন করে, বিধির বিধানকে উলটে দিতে চায়। তুমি কি করেছ শুনি? তুমি তো সামান্য একটা রাস্তা পার হতে পার না, মোটর চাপা পড়ে যাও! ভাগ্যে কাল প্রবালটা ধারণ করিয়ে দিয়েছিলাম তাই বেঁচে গেছ। ওটা পরে থাক—"

নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আংটিটা আপনার কাছেই আছে তো, দিন পরিয়ে দিন—"

নবকিশোর আংটি আর অষ্টধাতুর কৌটোটা বিরাট পণ্ডিতের হাতে দিল। তিনি প্রবালের আংটিটা বাহির করিয়া সেটা আবার উৎসাহের হাতে পরাইয়া দিলেন।

"আর খুলো না। আমি বলছি না ওতে অমোঘ অব্যর্থ ফল ফলবেই। কিন্তু ও ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই। সাগর পর্বত লঙ্ঘন করবার জন্যে মানুষ নৌকা জাহাজ প্লেন করেছে, লঙ্ঘনও করছে, আবার ব্যর্থও হচ্ছে। ব্যর্থ হচ্ছে বলে থামছে না। পুরুষকারেই মনুষ্যত্ব। আংটি খুলবে না—"

উৎসাহ আর কোনো প্রতিবাদ করিল না, আংটিটা পরিয়াই রহিল। নবকিশোর আর একমাত্র অনুভব করিল, যে বিদ্রোহী পুরুষকে সে ট্রেনের কামরায় দেখিয়াছিল সে বোধ হয় ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। উৎসাহের এখন আত্মসমর্পণের ভাব। নবকিশোরের ভালো লাগিল না। সকালে সে যখন আংটিটা খুলিয়া দিয়াছিল তখন ভালো লাগিয়াছিল। উৎসাহ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমিও কুষ্ঠি দেখতে জানি। আমার কুষ্ঠির গোচর ফল অনুসারে আমার এখন এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল না—"

"হবে তা আমি অনেক আগেই জানতাম তাই প্রবালের আংটি করিয়ে রেখেছিলাম। তুমি যদি পরে থাকতে কিছুই হত না। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হলে যা হয় তোমার তাই হয়েছে। তাই বিরাট পণ্ডিতের কথার উপর কথা কইতে চাও—"

"আমার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির তাহলে কি কোনও মূল্য নেই আপনার কাছে?"

"মানুষেরই স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন বিচারবুদ্ধি থাকে, তুমি এখনও মানুষ হওনি। তুমি তীর্থের কাক মাত্র। মন্দির থেকে খুঁটে খুঁটে যা পাও তাই তোমার পাওনা, তার বেশি এখন পাবে না, পেতে চাইলে দুঃখ পাবে।"

বিরাট পণ্ডিতের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ব্যঙ্গের হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। উৎসাহ নতচক্ষে শুনিল সব। কোনো উত্তর দিল না।

"আপনার বাত কেমন আছে"—নবকিশোর প্রশ্ন করিল।

"ভালো আছে। ডাক্তারী ওষুধে কিছু হল না। ড্যাশগুপ্ত কিছু করতে পারলে না। একটা তান্ত্রিক মন্ত্র কাল থেকে জপ করছি, ফল পেয়েছি। আপনি নীলাটা ধারণ করেননি?"

"না। আমি জরিকে দিয়ে দিয়েছি ওটা। ওসব পরতে আমার ভালো লাগে না।"

বিরাট পণ্ডিত চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি যে জরির নিকট হইতে আংটিটা ফেরত পাইয়াছেন তাহা ভাঙিলেন না। জরির সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না তিনি। নবকিশোরও কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর উঠিয়া পড়িলেন বিরাট পণ্ডিত।

"আমি এবার চললাম। বার্নাডো বলেছে ওকে আরও দু'দিন এখানে রাখবে। তারপর ছেড়ে দেবে। আমি আজই নিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ও একগুঁয়ে লোক রাজী হল না। দুনিয়াতে সবাই একগুঁয়ে, মানে সবাই মনে করে সে যা ভাবছে তাই নির্ভুল। সারা জীবনটা পাথর ডিঙিয়ে আর হোঁচট খেতে খেতে চলতে হচ্ছে। আপনি আসছেন আবার তো আমাদের বাড়িতে? আসবেন নিশ্চয়। উচ্চে যখন আপনার বন্ধু আসতেই হবে আপনাকে— ।"

যাইবার পূর্বে উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আংটিটি খুলো না দয়া করে—"

সহজভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহজভাবেই হাঁটিতে লাগিলেন। কালই তিনি যে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন স্বচক্ষে না দেখিলে নবকিশোর তাহা বিশ্বাস করিত না। জরি যাহা বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। বিরাট পণ্ডিতকে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া নবকিশোর আবার উৎসাহের কাছে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল উৎসাহ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রবালের আংটিটাই দেখিতেছে।

"বেশ ভালো আছেন তো?"

"হ্যাঁ। কোনো কষ্ট নেই। ঘাড়ের সে ভূতটাও নেবে গেছে। বেশ ভালো আছি। প্রবালটা পরব না ভাবছি—"

"পরুন না, ক্ষতি কি। আপনার অভিভাবকের যখন অত ইচ্ছে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে উনি যখন অত বড় পণ্ডিত, আপনার নিজেরও জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে যখন—তখন পরেই দেখুন না দিনকতক—"

"উনি আপনাকে নীলা দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। অত দামী নীলা আমি ওঁর কাছ থেকে বিনা পয়সায় নেব কেন, তাছাড়া ওসব ব্যাপারে কোনও জ্ঞানই নেই আমার, কখনও পরিনি ওসব, তাই জরিকে ফেরত দিয়ে দিলাম।"

"জরির সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"হয়েছে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—"

নবকিশোর আশা করিয়াছিল উৎসাহ হয়তো জরির সম্বন্ধে কিছু বলিবে। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল সে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। আড়চোখে আর একবার তাহার দিকে চাহিল। মনে হইল এখন এখানে না থাকাই উচিত।

"আমি এখন চলি। পরে আসব।"

নবকিশোর চলিয়া যাইতেছিল, উৎসাহ ডাকিল।

"শুনুন। আমার একটা উপকার করবেন? আমাকে গোটা দুই প্রাইভেট ট্যুশনি যোগাড় করে দিতে পারবেন?"

"কেন!"

"আমি তাহলে বিরাট পণ্ডিতের কাছে আর থাকব না। স্বাধীনভাবে থাকব এবার। মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা রোজগার করতে পারলেই হয়ে যাবে। আমি এম. এসসি ভালভাবেই পাস করেছি। বি. এসসি ক্লাসের ছেলেদের পড়াতে পারব—"

"আমার সঙ্গে তো তেমন কারও আলাপ নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তাহলে। কিন্তু বিরাট পণ্ডিত সত্যিই আপনার হিতৈষী লোক। সত্যিই আপনাকে স্নেহ করেন। তাঁর কাছ থেকে চলে আসাটা কি—"

"তাঁর স্নেহ অক্টোপাসের মতো। আষ্টেপৃষ্ঠে সর্বদা জড়িয়ে থাকতে চায়। ছেলেবেলা থেকে সহ্য করেছি, আর পাচ্ছি না। এইবার মুক্তি চাই, আপনি একটু সাহায্য করুন আমাকে!"

"চেষ্টা করব—"

নবকিশোর আর দাঁড়াইল না। যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল এই অপরিচিত পরিবারের সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া পড়াটা কি ভালো হইতেছে?

।। পাঁচ ।।

জরির প্রতীক্ষায় নবকিশোর মেসে বসিয়া ছিল। এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার রুম-মেট যোগেনের নাইট ডিউটি। সে অনেকক্ষণ আগে হাসপাতালে চলিয়া গিয়াছে। নবকিশোরেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। অন্যদিন হইলে সে এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িত। সেদিনও সে শুইয়াছিল কিন্তু ঘুম আসিতেছিল না। শুইয়া শুইয়া যে ডাক্তারী বইটা সে পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারও একবর্ণ তাহার মাথায় ঢুকিতেছিল না। সে কান পাতিয়া রাখিয়াছিল রাস্তার উপর—যদি কোনও মোটর দাঁড়াইয়া হর্ন দেয়। অনেক মোটর আসা-যাওয়া করিতেছিল, হর্নও অনেকবার বাজিয়াছে, নবকিশোর অনেকবার গাড়িবারান্দাতে উঠিয়াও গিয়াছে, কিন্তু জরির মোটর আসে নাই। যখন পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল তখন নবকিশোর আবার গাড়িবারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইলে মির্জাপুর স্ট্রীটের অনেকটা এবং গোলদীঘির প্রায় সবটাই দেখা যায়। নবকিশোর ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া রাস্তার যতটা দেখা যায় দেখিল। পথ প্রায় নির্জন হইয়া আসিয়াছে। ফুটপাথে ভিখারীরা ঘুমাইতেছে। একটা রিক্‌শা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থরগতিতে চলিয়া গেল। পথ প্রায় জনশূন্য।

"নবু—"

সেই বাঁশির স্বর ভাসিয়া আসিল হঠাৎ।

নবকিশোর দেখিল রাস্তার ঠিক ওপারে গোলদীঘির রেলিং ধরিয়া জরি দাঁড়াইয়া আছে। গোলদীঘির আলোছায়ার পরিবেশে চিত্রার্পিতবৎ জরিকে অবাস্তব বলিয়া মনে হইল। সত্যই কি জড়ি দাঁড়াইয়া আছে? না, তাহার দৃষ্টির ভ্রম!

"নবু—"

আবার সেই বাঁশির ডাক।

নবকিশোর জামা গায়ে দিয়া জুতো পরিয়া নীচে নামিয়া গেল। চাকরকে উঠাইয়া বলিয়া দিল—তাহার ফিরিতে দেরি হইবে। সে যেন কপাটটা বন্ধ করিয়া দেয়।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল জরি নাই। রাস্তা পার হইয়া গোলদীঘিতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রথমটা কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

"এই যে আমি এখানে—"

একটা ঝোপের ছায়ায় ঘাসের উপর জরি বসিয়াছিল। নবকিশোর কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলিতে পারিল না।

"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"অনেকক্ষণ। তুমি আমার জন্যে সত্যি সত্যি অপেক্ষা করছ কি না সেইটেই লক্ষ্য করছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাল তোমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ আর সে ইচ্ছে নেই। আজ তুমি নিজে আসবে এইটেই আমার কামনা ছিল। আমার সে কামনা তুমি পূর্ণ করেছ। অজানা পথে চলে যাওয়ার আগে এটা আমার মস্ত বড় পাথেয় হয়ে রইল। চল—"

"কোথা যাবে—"

"গঙ্গার ধারে। বাবুঘাটের কাছে বসব কোথাও।"

গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া সিনেট হলের সম্মুখে দাঁড়াইল তাহারা। জরি সিনেট হলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই রহিল খানিকক্ষণ। মনে হইল তন্ময় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর যাহা করিল তাহা নবকিশোর প্রত্যাশা করে নাই। দুই হাত জোড় করিয়া সে নমস্কার করিতে লাগিল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এর কাছে অনেক পেয়েছি—অনেক!"

দেখা গেল একটু দূরে একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। সেই দিকেই তাহারা অগ্রসর হইল।

বাবুঘাটে ঠিক গঙ্গার উপরেই তাহারা বসিয়া ছিল। জরি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা নবু, কাউকে কখনও ভালবেসেছ?"

"রোম্যান্টিক ভালবাসা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি। তবে—"

ঘাটের একটু দূরেই যে নৌকাখানা স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ছিল সেই দিকে চাহিয়া নবকিশোর ইতস্তত করিতে লাগিল।

"তবে কি—"

"একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে, তাকেই আমি ভালবাসি যদিও তাকে এখনও দেখিনি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জরি বলিল—"প্রমীলা ভাগ্যবতী। তার কাছে—"

"প্রমীলাকে তুমি চেন নাকি—"

"একসঙ্গে পড়েছি। তার কাছ থেকেই তোমার অনেক কথা শুনেছিলাম আগে, তারপর হঠাৎ কাল দেখা হয়ে গেল। নবকিশোর মুখোপাধ্যায় আর মেডিকেল কলেজ শুনেই বুঝলাম—"

জরি কথাটা শেষ করিল না। চুপ করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর হঠাৎ আবার শুরু করিল—"যাবার আগে সত্যি কথাটাই বলে যাই। প্রমীলা বড়লোকের মেয়ে, রূপসী, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। তাই তাকে হিংসে করতুম খুব। তার মুখেই শুনেছিলুম মেডিকেল কলেজের ভালো ছেলে নবকিশোর মুখুজ্যের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। সেই নবকিশোরকে কাল যখন নাগালের মধ্যে পেলাম, ভাবলাম একটু বাজিয়ে দেখি। দেখি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে কলঙ্করেখা এঁকে দিতে পারি কি না। কিন্তু পারলুম না হেরে গেলুম। আমার জীবনে এই প্রথম পরাজয় আর সে পরাজয়ের গৌরব আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে শুক্র নীচস্থ নয়, বৃহস্পতি তুঙ্গী। দুঃখ পেলে একথা শুনে?"

"দুঃখ পাব কেন। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি। তোমাকে একটা আশ্চর্য উপন্যাস বলে মনে হচ্ছে। প্রতি পরিচ্ছেদেই নতুন বিস্ময়—"

"উপন্যাস কাল্পনিক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ জীবন্ত সত্য। যারা মহাপুরুষ তারাই কল্পনা আর সত্যকে অভিন্ন বলে মনে করে। সাধারণ মানুষে তা পারে না। তুমি যে মহাপুরুষ তার আর একটা প্রমাণ পেলাম। আচ্ছা, সত্যি কথা বল তো নবু, আমাকে তোমার কেমন লেগেছে?"

"এ কথা জানতে চাইছ কেন। আমি এত রাত্রে তোমার সঙ্গে এই গঙ্গার ধারে এসে বসে আছি, এর থেকে কি সেটা বুঝতে পারছ না—"

"বুঝতে পারছি উপন্যাস পড়ার মনোভাব নিয়ে তুমি এসেছ। দেখতে চাইছ এর পর কি হয়। কিন্তু সত্যি বলছি নবু, এর পর আর কিছু হবে না। আর কিছু নেই। এর পর যদি কিছু হয় তা অন্যত্র নূতনভাবে হবে। কাল যে সবুজ ছোট্ট স্বপ্নটার কথা বলেছিলাম তা যে কি হয়ে উঠবে, হয়ে উঠব না শুকিয়ে যাবে, কিছুই জানি না এখনও। আমি শুধু জানতে চাইছি আমি তোমার মনে যে ছাপটা রেখে গেলাম, তা কি শুধু কালিরই ছাপ? কালিমাই কি তার একমাত্র তাৎপর্য?"

"আমি ওসব কিছু ভাবিনি। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি শুধু। তোমার মতো মেয়ে এর আগে আমি দেখিনি, দেখব কল্পনাও করিনি। এর চেয়ে বেশি আর কি বলব—"

"আমার জন্যে তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল কি জমেনি?"

"জল? না। জল জমবে কেন শুধু শুধু!"

"না, আমার দিক থেকে সে রকম দাবি কিছু নেই। আমার জীবনের ট্র্যাজেডিটা যদি—থাক, ওসব কথা আর বলব না। একটা কথা শুধু জেনে রাখো, এই একটি কথাই শুধু মনে রেখো যে আমি এই ভাগ্যহত যুগের প্রতীক—ভোগের মাঝখানে থেকেও যার ক্ষুধা মেটেনি—যে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েও আবার অগ্নি-কামনা করেছে বারবার। ছাইও পুড়েছে, পুড়ে নতুন ধরনের ছাই হয়েছে। এই ক্রমাগত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে এ যুগে। ভস্ম হবার আকাঙ্ক্ষাই এ যুগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমি এই যুগেরই প্রতীক। জেঠু যে মহেশ্বর ভোলানাথ মহাকালের কথা বলেন তিনি ভস্মভূষণ। বহু যুগের ভস্মকে তিনিই অঙ্গে ধারণ করেন, এ যুগের ভস্মকেও হয়তো করবেন। কিন্তু আমার তাতে সান্ত্বনা নেই। আমি ভস্ম হয়েই থাকতে চাই না, আমি আবার উন্মুখ উৎসুক হয়ে ফুটতে চাই নবাঙ্কুরের কচি কচি পাতায় যা ভস্মকে উজ্জীবিত করবে, যা অমর—"

জরি থামিয়া গেল। নবকিশোরের মনে হইল অশ্রুর বন্যা বুঝি তাহার ভাষাকে ভাসাইয়া লইয়া সেই দেশে চলিয়া গেল যেখানে নীরবতাই ভাষা। সেই নীরবতাই বার বার নবকিশোরকে বলিতে লাগিল—মনে রেখো আমি এই ভাগ্যহত যুগের প্রতীক। আমি আবার উন্মুখ উৎসুক হয়ে ফুটতে চাই—।

জরি আবার কথা কহিল।

"বিরাট-মন্দিরে তীর্থের কাক ছিলুম। অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি। কিছুই কাজে লাগেনি। একটি জিনিস ছাড়া। সেটি হচ্ছে সেই চিরন্তন বিশ্বাস—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। তাই বুকে আঁকড়ে নিয়ে চললাম।...'

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় চাকরি পেয়েছ?"

"তা বলব না। পুরোনো জগতের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে যাচ্ছি। ক্লীন স্লেট নিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করব। তুমি আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো নবু। করবে?"

"প্রার্থনা? আমার প্রর্থনায় কি ফল হবে কোনও? আমি তো সন্ধ্যাহ্নিক পর্যন্ত করি না! কাকে প্রার্থনা করব? ভগবানকে? ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আমার নেই। আমি অতি সাধারণ লোক, আমাকে এ-সব অনুরোধ করছ কেন—"

"তুমি সাধারণ নয়, তুমি অসাধারণ। তুমি কাল পালাতে পেরেছিলে। সাধারণ লোক হলে কাল নরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, তারপর সাফাই গাইবার জন্য ফ্রয়েড আওড়াতে। তা তুমি করনি। জেঠু একনজরেই তোমায় চিনেছিলেন। কাউকে উদ্দেশ্য করে তোমার প্রার্থনা করতে হবে না। তুমি মনে মনে কামনা কোরো আমার ওই সবুজ স্বপ্নটা যেন বেঁচে থাকে। করবে?"

নবকিশোর হাসিয়া বলিল, "বেশ, বলছ যখন করব—"

"বিলেতে গিয়েও যেন ভুলে যেও না—"

"আমি বিলেত যাব কে তোমাকে বললে—"

"প্রমীলা। বিয়ে হয়ে গেলেই বড় ডিগ্রি আনবার জন্যে বিলেত পাঠাবেন তোমাকে প্রমীলার বাবা। খুব বড়লোক তো। তোমার দাদা-বৌদি নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। শুনলাম তোমার দাদা প্রফেসর, উত্তর প্রদেশে কোথায় যেন আছেন—"

"এত খবর তুমি যোগাড় করলে কি করে?

"সব প্রমীলা বলেছে। এ-সব তো তোমার বাইরের খবর। যে কেউ যোগাড় করতে পারত। প্রমীলা যোগাড় করেছে নিজের স্বার্থের জন্যে। আর সেটা গলগল করে আমার কাছে বলেছে নিজের সৌভাগ্য জাহির করবার জন্যে। এটা অবশ্য ওর বিশেষত্ব নয়, আস্ফালনটা সব যুগেরই বিশেষত্ব। আমি কিন্তু তোমার যে খবরটি পেয়েছি তা প্রমীলা জানে না, সেটি বহুমূল্য রত্নের মতো সঞ্চয় করে রাখব আমি—"

নবকিশোর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। জরির সঙ্গে প্রমীলার ভাব আছে! তাহার এত খবর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সে! জরি তাহার সম্বন্ধে কোন্ খবরটি বহুমূল্য রত্নের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চায়? জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাস করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

জরিই কথা কহিল আবার।

"মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তোমার বুকটা হয়তো পাষাণে গড়া। কিন্তু এ-ও জানি সন্দেহটা অলীক। পাষাণের তলায় ঝরনার সাড়াও পেয়েছি।"

"আমার বুকটা পাষাণে-গড়া এ সন্দেহ হঠাৎ হল কেন?"

"এখন হঠাৎ মনে হল। কারণ তোমার কোনও কৌতূহল নেই। অন্য কেউ হলে এখুনি জানতে চাইতে তোমার সম্বন্ধে যে বহুমূল্য খবরটি আমি রত্নের মতো সঞ্চয় করে রেখেছি সে খবরটি কি। কিন্তু তুমি চুপ করে রইলে। হয়তো মহাপুরুষের এ-ও একটা লক্ষণ।"

"বলতে যদি বাধা না থাকে বল খবরটি কি—"

"খবরটি হচ্ছে তুমি অতি ভীতু লোক। এ যুগের অতিসাহসী আরশোলার দলে তুমি একটি অতি-ভীতু 'মথ'—"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল জরি। নবকিশোরের আবার মনে হইল জরি এমন হাসিতে পারে!

"উৎসাহের সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?"

"তুমি হাসপাতাল থেকে চলে আসবার ঠিক পরেই আমি গিয়েছিলাম। নার্স ঢুকতে দিলে না। বললে এখন ভিজিটিং আওয়ার নয়। তার কাছে উৎসাহের নামে একটা চিঠি রেখে এলাম। আর তো তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কেন, কখন যাবে তুমি—"

"এখনই যাব। সুখনের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার জিনিসপত্র টাকাকড়ি নিয়ে এখানেই আসবে। সে এলেই চলে যাব—"

"কোন্ ট্রেনে?"

"ট্রেনে নয়, নৌকায় যাব। ওই যে আমার নৌকো বাঁধা আছে—"

স্তুপীকৃত অন্ধকারের মতো যে নৌকোটা একটু দূরে বাঁধা ছিল জরি সেই দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

"নৌকো করে যাচ্ছ? কেন!"

"জলে কোনও দাগ থাকে না। আমার অন্তর্ধানের পর জেঠু চারদিক তোলপাড় করবেন। তাই আমি এই পথ ধরেছি। এ পথে আমার নাগালে পাওয়া সহজ হবে না। তুমি কথাটা গোপন রেখো। তুমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না।" একটু থামিয়া বলিল—"জানবেও না।"

"তুমি একা যাবে?"

"না। সুখন যাবে আমার সঙ্গে। কিছুদূর পর্যন্ত যাবে, তারপর ফিরে আসবে। বাকি পথটা একাই চলতে হবে আমাকে।"

"সুখন যাবে? সুখদেও?"

"হ্যাঁ। ও বলিষ্ঠ, বিশ্বাসী এবং পিতৃতুল্য। ও আমার সত্যিকার হিতৈষী। ওর উপর নির্ভর করা যায়—"

"তুমি কাল বলেছিল ও আর একজনের চাকর। এ কি করে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে? ওর মনিব অনুমতি দিয়েছে বুঝি—"

"শুধু দিয়েছে নয়, দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। ওর মনিবের মনিব যে আমি। আচ্ছা নবু বিরাট বড়লোকদের মনস্তত্ত্ব বোঝ কিছু? ও লোকটা জানে যে আমি ওকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও সুখনকে ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছে আমার কোনও বাসনা যেন অপূর্ণ না থাকে। আমি সুখনকে কাল বলেছিলুম আমি নৌকো করে বেড়াতে বেরুব। ও যেন বাবুঘটে একটা নৌকো ঠিক করে রাখে আর আমার জিনিসপত্র আর কিছু টাকাকড়ি নিয়ে রাত বারোটা নাগাদ বাবুঘাটে এসে যেন পৌঁছয়। সুখন আজ বিকেলে এসে বলে গেছে, নৌকো সন্ধ্যা থেকেই বাবুঘাটে বাঁধা থাকবে। তার মালিক তাকে হুকুম দিয়েছেন সে যেন কিছু টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে যায়। ও ভদ্রলোক জানে যে আমি ওকে ঘৃণা করি, তবুও আমার পিছনে টাকা খরচ করবার জন্যে এত উৎসুক কেন! আর আমিই, যা এত নীচ, কেন সে সব জেনেশুনেও ওর টাকা দুহাত পেতে নিই! এ-সব রহস্যের সমাধান করতে পার? না, তুমি পারবে না। এ সব জটিল গোলক-ধাঁধায় কোনও দিন তো ঢোকনি।"

জরি কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করিল। তাহার পরই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"দেহ

দিয়ে লোককে যে সুখ দেওয়া যায় তার কি কোনো বাঁধা-ধরা বাজারদর আছে? নেই, নেই, নেই। সুতরাং—"

আবার থামিয়া গেল সে। হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু বাধা পড়িল। একটা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল রাস্তার উপর।

"সুখন এল বোধ হয়।"

সত্যিই দেখা গেল সুখন আসিতেছে। তাহার এক হাতে একটা স্যুটকেস আর এক হাতে টিফিন কেরিয়ার।

"সুখন এসেছ? ওই নৌকোটাই কি আমার নৌকো।"

"হাঁ ওহিঠো। আজ দিন-ভোরের মজুরি দিয়ে ওকে এখানে থাকতে বলেছি—হো ভিখুয়া, ভিখুরাম—"

নৌকার ভিতর হইতে সাড়া আসিল—"জি হাঁ—"

"নিকলো নাওসে। চিজবস্ সামহালো—"

নৌকার ভিতর হইতে জ্বলন্ত টর্চ হাতে করিয়া ভিখু বাহির হইয়া আসিল এবং সুখনের হাত হইতে স্যুটকেস ও টিফিন-কেরিয়ার লইয়া গেল। সুখন একটি লম্বা কোট গায়ে দিয়া আসিয়াছিল। সে কোটের ইনার পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া জরির হাতে দিয়া বলিল—"ইঠো ঠিকসে রাখ্খো বেটি—"

"কি এটা?"

সুখন এতক্ষণ হিন্দীতে কথা বলিতেছিল, এইবার বাংলায় বলিল—"টাকা। পাঁচশো টাকা আছে। আর একটা ব্ল্যাংক্ চেক!"

জরি তাচ্ছিল্যভরে খামটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"যার টাকা তাকে দিয়ে দিও। আমি ভিখিরি নই। আমি কাল যে টাকা টেবিলের উপর রেখে এসেছিলাম সে টাকা কোথায়—"

সুখন খামটা তুলিয়া লইয়া বলিল—"তোমার স্যুটকেসে রেখে দিয়েছি। বিয়াল্লিশ টাকা সাড়ে ছ আনা ছিল—"

"স্যুটকেস কোথা থেকে পেলে—"

"কিনে আনলাম। কাপড় জামাও কিনেছি কিছু—"

"আন্দাজি জামা কিনেছ?"

"আন্দাজি কিনব কেন। তোমার একটা 'বিলাউস্' বাগানে উড়ছিল। কাল রাত্রে ফেলে এসেছিলে। সেইটের মাপেই কিনেছি—সব ঠিক আছে। এবার চল—"

জরি অপ্রত্যাশিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও তুমি। সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি একা একবস্ত্রে হেঁটে হেঁটে যাব, নৌকো চাই না—"

তারপর নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"নবু, আমি চললুম। আর দেখা হবে না। তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। ফিরে যাও—"

জরি রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল।

সুখনের মুখে প্রশান্ত মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল একটা।

"পাগলী ফের ক্ষেপল!"

ট্যক্সি-ওলা আসিয়া ভাড়া চাহিল। দেখা গেল ট্যাক্সি-ওলা সুখনের চেনা লোক। তাহার হাতে একটি দশ টাকার নোট দিয়া সুখন বলিল—"সরদারজি, এবাবুকে ফিরতি পথে নাবিয়ে দিয়ে যেও। তুমি তো এখন গারাজে ফিরবে?"

"হাঁ। আপ কাঁহা যাইয়েগা—"

"মেডিকেল কলেজকো সামনে হামকো উতার দিজিয়ে গা।"

"ঠিক হ্যায়। আইয়ে—"

নবকিশোর ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল। আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া জরি হাঁটিয়া চলিয়াছে। সুখন স্মিতমুখে বলিল—"আপনি ভাববেন না। বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমি পাগলীকে ফিরিয়ে আনব ঠিক—"

নবকিশোর তবু কয়েক মুহূর্ত সেই অপস্রিয়মান আবছা মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

"চলিয়ে—"

· ড্রাইভার তাগাদা দিল আবার।

"চল।"

নবকিশোর যখন মেসে ফিরিল তখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কড়া নাড়িতেই চাকরটা কপাট খুলিয়া দিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

চাকরটা বলিল—"আপনি চলে যাবার পর এক বাবু আপনার খোঁজে এসেছিলেন। এই চিঠিটা রেখে গেছেন।

নবকিশোর উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া চিঠিটা পড়িল। বিরাট পণ্ডিতের চিঠি।

মহাপুরুষেষু,

জরি হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। আপনি কোনও খবর জানেন কি? দয়া করিয়া কাল যদি আমার বাড়িতে পদধূলি দেন কৃতার্থ হইব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা

।। ছয় ।।

সকালে উঠিয়াই নবকিশোর এজরা হাসপাতালে গেল। জরির অন্তর্ধানে উৎসাহের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা প্রথমে জানিয়া তাহার পর বিরাট পণ্ডিতের সহিত দেখা করা উচিত এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল তাহার। আর একটা কথাও মনে হইতেছিল। ইহাদের কাছে জরির প্রসঙ্গ তোলা কি আদৌ উচিত হইবে? জরির অনুরোধ মনে পড়িল—তুমি কথাটা গোপন রেখো। তুমি ছাড়া একথা আর কেউ জানে না। ইহাদের সহিত তাহার পরিচয় আকস্মিক। উৎসাহ, বিরাটেশ্বর, জরি, অতুল, গাঁট্টা—ইহাদের কাহাকেও তো সে চিনিত না। আশ্চর্য, হঠাৎ ইহারাই এই মুহূর্তে তাহার জীবনে প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবলতম আকর্ষণ জরি। অথচ জরির সে কতটুকু জানে? তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার কি

বাধ্যবাধকতা আছে তাহার? এই সব প্রশ্ন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে নিজেকে করিতেছিল কিন্তু জ্ঞাতসারে যে উত্তরটা তাহার মনে সজাগ ছিল তাহা এই—জরির অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। তাহার জীবনে এতদিন কোনও রোম্যান্টিক ঘটনা ঘটে নাই, প্রমীলাকে ঘিরিয়া তাহার যে স্বপ্ন তাহা নিতান্তই বাঁধাধরা নীতিসম্মত স্বপ্ন, তাহাতে কোনও শিহরন, উন্মাদনা বা অনিশ্চয়তা নাই। ইহা লইয়াই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু প্রত্যেক নর-নারীর মনের নিভৃততম প্রদেশে রোমান্সলোলুপ যে বাসনাটি থাকে, নানা মনে তাহার নানা রূপ। নবকিশোরের মনে তাহা যেন একটি শূন্য ঘরের রূপ-পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টির অগোচরে ছিল এতদিন—গভীর অরণ্যের মধ্যে লতা-গুল্ম-পরিবৃত নির্জন ঘর একটি। সেই ঘরে হঠাৎ একটা বন্যহরিণী সহসা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সহসা আবার পলাইয়া গেল। শিকারীর দল তাড়া করিয়া আসিতেছে। হরিণী কোন্ দিকে গেল তাহা সে বলিয়া দিবে কি? বলিয়া দেওয়া কি উচিত? খুব স্পষ্টরূপে না হইলেও এই ধরনের একটা ছবি তাহার অবচেতনলোকে ফুটি-ফুটি করিতেছিল। উৎসাহ যদি জরির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাহা হইলে কি করিবে সে। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে একটু বিপন্নভাবেই সে এজরা হাসপাতালে প্রবেশ করিল। গিয়া যাহা শুনিল তাহাতে সে আরামও পাইল, বিস্মিতও হইল। উৎসাহ না কি রিস্‌ক্ বন্ডে (Risk bond) সহি করিয়া হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছে। একটু আগেই চলিয়া গিয়াছে।

নার্স কিং বলিল—"Your friend was very adamant about it. He didn't care even to listen to Dr. Ghosh's advice." তাহার পর হাসিয়া বলিল—"But I liked him for it. He didn't feel quite at home here."

[তোমার বন্ধুটি ভারি একগুঁয়ে। ডাক্তর ঘোষের কথাও সে শুনল না। .....কিন্তু এইজন্যেই ওকে আমার ভাল লেগেছে। বেচারা এখানে স্বস্তি পাচ্ছিল না]

"কোথায় গেছে তা জান?"

"না। He just walked out".

খানিকক্ষণ পরে ইমার্জেন্সি-রুমের ও. ডি. (O. D) ডাক্তার পুলিন মিত্রের সহিত দেখা হইয়া গেল নীলমণির চায়ের দোকানে।

"কি হে তোমার বন্ধুটির খবর কি। সে শুনছি একটি খলিফা ছেলে। নগেনবাবুর মতো কড়া লোককেও বশীভূত করে ফেলেছে।"

"কি রকম—"

"তাঁর মুখ দেখে আর হাত দেখে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা নাকি ওয়াণ্ডারফুল। নগেনবাবু কাল বলছিলেন। সে নাকি বলেছিল সাতদিনের মধ্যেই আপনার চাকরির উন্নতি হবে। হয়েছে। বলেছিল—এই মাসের মধ্যেই আপনার মেয়ের জন্য সুপাত্র পেয়ে যাবেন। পেয়েছেন। আমাকে একবার তার কাছে যেতে হবে। কি রকম আছে ছোকরা, খবর নিয়েছিলে?"

"সে চলে গেছে আজকে 'রিস্‌ক্ বন্ডে' সই করে।"

"তাই নাকি! 'রিস্‌ক্ বন্ডে' সই করে?"

"হ্যাঁ, তাই শুনলাম এখনি গিয়ে। খামখেয়ালী ছোকরা, আমার সঙ্গে আলাপও হয়নি

তেমন। সেদিন স্টেশনেই প্রথম আলাপ। এদিকে বেশ বিদ্বান, এম. এসসি. পাস। আমাকে বলছিল—টিউশনি জুটিয়ে দিন। বি. এসসি ক্লাসের ছেলেকেও পড়াতে পারব।"

"গরীব না কি—"

"আমি ওর ঠিকানাটা জানি, আর বিশেষ কিছু জানি না। ভাবছি আজ বিকেলের দিকে আর একবার যাব ওর খোঁজে। হঠাৎ চলে গেল কেন এমনভাবে—"

"আমার এক আত্মীয় তাঁর ছেলের জন্য ভালো গার্জেন টিউটার খুঁজছেন। ছেলেটি আই. এস-সি পড়ে—"

নবকিশোর একটু অবাক হইল।

"যে ছেলে আই এস-সি পড়ে তার জন্যে গার্জেন টিউটার কেন?"

"প্রথম কারণ ছেলেটির পিতামাতা উভয়েই প্রগতিবাদী। সব সময় সমাজের এবং সংস্কৃতির উন্নতি করবার জন্য বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। ছেলের দিকে নজর দেবার সময় পান না। দ্বিতীয় কারণ—বড়লোক। তোমার বন্ধু যদি রাজী থাকে বলে দেখতে পারি। থাকবার জন্যে আলাদা ঘর পাবে, খাওয়া পাবে, তাছাড়া মাইনে একশ টাকা।"

"বলব। কিন্তু গার্জেন টিউটারি করে মেডিকেল কলেজে পড়া চলবে কি—"

"চলা উচিত নয়। বলে দেখতে পারি তাদের, কিন্তু অন্ ওয়ান কন্ডিশন। আমার হাত আর কুষ্ঠি ভালো করে দেখে দিতে হবে।"

"বলব ওকে। আপনিও কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করেন না কি—"

"দেখ ভাই, যত বয়স বাড়ছে ততই বুঝতে পারছি নিজের কিছু করবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আমি জানি সার্জারির আমি কিছু জানি না, কিন্তু কাল যখন সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বললে—ও পুলিন, ইউ ডীড্ এ নীট বিট্ অব্ সার্জারি—তখন বড় মিষ্টি লাগল। যদিও কালকের সেই স্ট্র্যাংগুলেটেড হার্নিয়া কেসটা আজ পটল তুলেছে আমার নীট্ বীট্ অব্ সার্জারিকে কলা দেখিয়ে—তবু মিষ্টি লাগল সাহেবের কথাগুলো। নিজের কানাপুতকে কেউ যদি পদ্মলোচন বলে, ভারি ভালো লাগে। কুষ্ঠি দেখাতে যাই ওই আশায়। যদি কেউ দুটো মিষ্টি কথা শোনায়। হরু জ্যোতিষীটা পাষণ্ড। কুষ্ঠি দেখে পট্ করে বলে দিলে আপনার মেয়ে বিধবা হবে। তার নিজের তিন তিনটে মেয়ে বিধবা কি না, তাই আর কারো মেয়ে সধবা আছে এটা সে সহ্য করতে পারে না। অনেক জ্যোতিষী পরশ্রীকাতর জান? ভালো জিনিস দেখতে পায় না, কিংবা দেখতে পেলেও বলতে চায় না। তোমার বন্ধুটির কেমন ধরন-ধারণ? মিষ্টিকথা শোনাবে দু'চারটে?"

"কি জানি। আমি কিছুই বিশেষ জানি না ওর সম্বন্ধে। আচ্ছা সার চলি। আটটা বেজে গেছে। ওয়ার্ডে যেতে হবে।"

"কার ওয়ার্ডে?"

"বার্নাডো সাহেবের।"

"নটা দশটার আগে তিনি আসবেন না। তুমি আরও ঘণ্টাখানেক স্বচ্ছন্দে আড্ডা দিতে পার। সাহেব চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছে আজকাল। নীলমণি, ডবল ডিমের ওমলেট দাও আমাকে। তুমি খাবে?"

"না থাক"—সলজ্জ হাসি হাসিয়া নবকিশোর প্রতিবাদ করিল।

"থাক কেন! যা যেখানে পাবে হামড়ে খেয়ে নেবে তবে না যুঝতে পারবে। বাঁচা মানে লড়াই, ডারবিন সাহেব বলে গেছেন। ডাক্তার হতে যাচ্ছ, ডাক্তারি মানেও ওই, যা যেখানে পাবে হামড়ে নিয়ে নেবে। লজ্জা, বিনয়, ভদ্রতা ওসব পোস্টাফিসে জমা করে রেখে দাও। যখন অসমর্থ হয়ে পড়বে তখন কাজে লাগবে। নীলমণি, আর একটা ডবল ডিমের ওমলেট। ওহে, একটা সুখবর আছে, উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে বদলি হয়েছি"—বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন—"অনেক 'কল' খাইয়েছিলাম সাহেবকে। ফল ফলেছে—"

ওয়ার্ডে গিয়া নবকিশোর দেখিল ডাক্তার মিত্রের কথাই সত্য। বার্নাডো সাহেব তখনও ওয়ার্ডে আসেন নাই। নবকিশোরের কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। অন্যমনস্ক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটা কথাই সে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি সে এখনই যাইবে, না সন্ধ্যার পর।

।। সাত ।।

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া সে বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। মেস হইতে বাহির হইয়াই খালি ট্রাম পাইয়া গেল একটা। ছুটিয়া গিয়া সেকেন্ড ক্লাসেই চড়িয়া বসিল। পিছনের দিকের বেঞ্চটা খালি ছিল। বেঞ্চের এককোণে বসিয়া তাহার মনে হইল ক্যাপ্‌টেন কুক, ডাক্তার লিভিংস্টোন, কলম্বাস প্রভৃতি মহারথীর মতো সেও যেন একটা দুর্জয় অভিযানে চলিয়াছে। রুষ্ট বিরাট পণ্ডিতের সম্মুখীন হইবার পর কি যে ঘটিবে তাহা অনিশ্চিত। ঠিক করিল প্রথমে অতুলের সহিত দেখা করিতে হইবে। ও বাড়ির আবহাওয়ার খবরটা সে-ই ভালো দিতে পারিবে। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনেই নামিয়া পড়িল। দেখিল বহুলোক সেখানে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, অনেকে প্রণাম করিতেছে। ধূপধুনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। পুরোহিত মহাশয় সম্ভবত আরতি করিতেছেন। নবকিশোরও দাঁড়াইয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে যে প্রার্থনা সে করিল তাহা যেন নির্বাক হইয়া তাহার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, এইবার বাঙ্ময় হইল। অস্ফুটকণ্ঠে নবকিশোর বারবার বলিতে লাগিল—মা, জরির মনের বাসনা যেন সফল হয়। তার সবুজ স্বপ্নটা যেন বেঁচে ওঠে। বড় দুঃখী সে। প্রার্থনা শেষ করিয়াই তাহার মনে হইল কেন এসব করিতেছে সে। তাহার প্রার্থনার কি মূল্য আছে? জরিই বা তাহার কে। একটু অপ্রস্তুত হইয়াই সে পথ চলিতে লাগিল। এতদিন সে যে বাঁধা-ধরা পথে চলিয়া আসিয়াছে সে পথে কোনও মনস্তাত্ত্বিক খানা-খন্দ ছিল না, নেপথ্যবাসিনী প্রমীলা ছাড়া আর কোনও নারীরও ছায়া পড়ে নাই সে পথে। এখন এ কি হইল? জরির শারীরিক ছায়াটা অবশ্য সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মৃতির ছায়া যে গাঢ়তর হইল। একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিল নবকিশোর।

অতুলের দোকানের সামনে আসিয়া দেখিল অতুল নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছে। নবকিশোরকে দেখিয়া সে বইটি মুড়িয়া রাখিল এবং হাসিমুখে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"আমি জানতাম আপনি আসবেন। আসুন—"

সামনেই কয়েক খিলি পান সাজা ছিল, তাহার একটি সে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল। নবকিশোর আপত্তি করিল না। সে বুঝিয়াছিল আপত্তি টিকিবে না। অতুল তাহার পর একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে তুলা এবং একটি সরু কাঠি বাহির করিয়া ছোট একটি তুলি প্রস্তুত করিল এবং পাশের তাক হইতে একটি চমৎকার আতরের শিশির ছিপি খুলিয়া তুলিতে একটু আতর মাখাইয়া হাসিমুখে তুলিটি নবকিশোরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আবার বলিল—"আসুন—"

"কি ওটা।"

"গোলাপী আতর। খুব ভালো নয়, কিন্তু এর চেয়ে ভালো আতর কলকাতা শহরে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। নাকের কাছে একটু লাগিয়ে নিন। তারপর তুলোটা গুঁজে রেখে দিন কানে। চিত্ত প্রফুল্ল থাকবে। চিত্তটা প্রফুল্ল থাকা দরকার—"

নবকিশোর তুলিটা লইয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আপনার কাণ্ডকারখানাই আলাদা দেখছি।"

অতুল সবিনয়ে হাসিমুখে বলিল, "এটা আমার দ্বিতীয় পরিচয়ের সওগাত। যদি পরিচয় গাঢ়তর হবার সৌভাগ্য হয় তাহলে আরও নতুন রকম কিছু ভেট দেবার ইচ্ছা রইল!"

"সেটা আবার কি রকম হবে—"

"আমার যে-সব বই ভালো লেগেছে তাই একে একে আপনাকে দেব, যদি আপনার পড়ার ঝোঁক থাকে।"

"আপনি খুব পড়েন বুঝি—"

"এই দোকানে বসে যতটা পারি—"

"দোকানে? এখানে অনেকক্ষণ থাকেন বুঝি।"

"সব সময়ে বসে আছি। ভোর পাঁচটায় খুলি, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত খুলে রাখি—"

"খেতে যান না?"

"পাশের হোটেল আমার স্নানাহারের ভার নিয়েছে। আমার আপন লোক নেই কেউ। রাত্রে বাড়িতে শুতে যাই। সেখানে তেতলার উপর ঘর আছে একখানা, বাইরে থেকে সিঁড়ি আছে। চুপি চুপি উঠে যাই। ভাড়াটেদের জাগাতে হয় না।"

"পানের দোকান নিয়েই থাকেন সমস্ত দিন? আশ্চর্য তো। জরি বলছিল আপনি পণ্ডিত লোক—"

অতুলের চোখের কোণে কৌতুকছটা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

"জরিদি আমাকে স্নেহ করেন তাই ওসব বলেছেন। জরিদি'কে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেছেন?"

"সেই শুনেই তো আসছি। উৎসাহও চলে এসেছে হাসপাতাল থেকে। বাড়ি এসেছে তো?"

"আমি যতদূর জানি, আসে নি। গাঁট্টা একটু আগে এসেছিল, তার মুখ থেকেই শুনলাম। বিরাট পণ্ডিত ভিতরের ঘরে চোখ বড় বড় করে বসে আছেন নাকি গুম হয়ে। সন্ধ্যে থেকে কারো সঙ্গে দেখা করেননি। অনেক লোক এসেছিল, সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গেও হয়তো দেখা করবেন না।"

"আমাকে উনি ডেকেছেন।"

"তাহলে যান। আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। বড়ই রহস্যময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল। রোজ এমনটা ঘটে না। যাবার সময় আমাকে খবরটা দিয়ে যাবেন কি হল! আমি ততক্ষণ বইটা পড়ি বসে বসে—"

"কি বই ওটা—"

"ডন্ কুইক্সোট্ (Don Quixote)—ঠিক উচ্চারণটা জানি না। পড়েছেন এ বই?"

"স্কুলে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়েছিলাম—এ বই পড়ছেন যে হঠাৎ এখন।"

"জরিদির কথা মনে করে। ওরা কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি জরিদিও ডন্ কুইক্সোট্। ডন্ কুইক্সোট নিজের কল্পিত আদর্শের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ছুটে বেড়িয়েছিল নানারকম অ্যাডভেনচারের (adventure) পিছু-পিছু। আমাদের কাছে তা অনেক সময় হাস্যকর, অনেক সময় অদ্ভুত, অনেক সময় করুণ—কিন্তু ডন্ কুইক্সোটের চোখে তা একটিমাত্র আদর্শের রূপ নিয়ে মূর্ত হয়েছে সর্বদা—বীরত্বের আদর্শ। এর জন্যে সে অনেক দুঃখ সয়েছে কিন্তু আদর্শচ্যুত হয়নি। জরিদির ব্যাপারও অনেকটা সেইরকম। উনিও অনেক রকম বিপদ বরণ করেছেন, অনেক রকম ঝামেলায় জড়িয়েছেন নিজেকে, আমাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে আমরা সে সবের মানে বুঝতে পারিনি। আমার বিশ্বাস উনিও একটা বড় আদর্শের জন্যেই এ সব করছেন যদিও সেটা কি তা মাথায় ঢোকেনি এখনও। জরিদির কথা মনে হচ্ছিল বলেই বইটা আবার পড়ছিলাম—"

নবকিশোর বলল—"জরিদির চেয়েও আপনি আমাকে বেশী অবাক করেছেন। আপনার মতো বিদ্বান্ লোক পানের দোকানে বসে—"

"কোর্টে এজলাসে গাউনটাউন পরে গিয়ে বসলে বেশী ভালো হত বলছেন? হয় তো হত। কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আমার এই বেশ ভালো লাগে। এই দোকানে বসে বসে, কত রকম লোকই যে দেখি, কত কথাই যে শুনি। আকাশে সূর্য চন্দ্র তারার মিছিল আর এই দোকানের সামনে মানুষের। সূর্য চন্দ্র তারা একঘেয়ে, মানুষ কখনও একঘেয়ে হয় না। খাশা আছি। এ দোকান না থাকলে কি আপনার নাগাল পেতুম? একবার একজন কবি এখানে দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা ছোট্ট কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। দেখবেন?"

অতুল একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

"এই দেখুন। এটা অটোগ্রাফের খাতা। আমি বিখ্যাত লোকের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করি না। এতে যাদের হাতের লেখা আছে তাদের কেউ চেনে না। এই প্রথম পাতাটা দেখুন।"

নবকিশোর দেখিল আঁকাবাঁকা বড় বড় হরফে লেখা আছে—"আমার নাম ভুঁদি। ভালো নাম সবিতা।"

"এ রকম অনেক আছে। আপনাকে কবিতাটা দেখাই।"

খাতাটার পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া অতুল অবশেষে একটা পাতায় আসিয়া থামিল।

"এই দেখুন—"

নবকিশোর দেখিল সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

পথের পাশে ছোট্ট দোকান
দু'চার কথা এ-কান ও-কান

হঠাৎ পাওয়া হাসির গমক
ছুটকো গানের গিট্‌কিরি
ঢেউ লাগছে সুখের দুখের
চলছে মিছিল চলতি মুখের
পানের দোকান প্রাণের দোকান
নানান্ ছিটের ছিট্‌কিরি।

—পথিক

"বাঃ, চমৎকার কবিতা। কবির নাম পথিক নাকি?"

"জানি না। প্রথমে নাম লেখেনি। বলাতে শেষে 'পথিক' লিখে দিলে। এখনও ওর আসল নাম কি জানি না। আমার দোকানে মাঝে মাঝে আসতো। কিমাম দিয়ে পান খেতে ভালবাসত খুব। ওর জন্যে ভালো কিমাম সংগ্রহ করে রেখেছি। অনেকদিন আসেনি। কি জানি পথিক কোথায় চলে গেছে।"

একটু থামিয়া অতুল বলিল—"যাক্। যাওয়াটাই তো নিয়ম। তার একটা পদচিহ্ন ধরে রাখতে পেরেছি এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি। জরিদিও কোথায় চলে গেল কে জানে। আপনি যান, বিরাট পণ্ডিতের হালচালটা হালচালটা কি জেনে আসুন। জরিদিকে টাকা দিয়েছিলাম বলে আমাকে তো পণ্ডিত মারতে বাকি রেখেছেন খালি। অদ্ভুত লোক, ভয়ঙ্কর লোক, অথচ কী বিদ্বান্, হেন বিষয় নেই যে জানেন না—"

"জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে আপনার?"

"জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা জানি না। কিন্তু এটা জানি যে বিরাট পণ্ডিত যা বলে দেন তা ফলে যায়। কোন্ শাস্ত্র পড়ে বলেন তা জানি না, সবাইকে উনি বলেনও না, কিন্তু যা বলেন তা নির্ঘাৎ। আমার কুষ্ঠি এক নজর দেখে বলেছিলেন তোর মাতুল বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সত্যি ধ্বংস হয়ে গেল। দিন কুড়ি আগে মাতুল বংশের শেষ প্রদীপটি নিবে গেছে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছি—"

"আপনি অপ্রস্তুত কেন। আপনার দোষ কি—"

"আমি তাদের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী যে। আসুন।"

অতুল আর এক খিলি পান তুলিয়া ধরিল।

"পান খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই!"

"অভ্যাস করুন। দুএকটা নেশা থাকা ভালো। জীবনটাকে যদি সেতার-বাজনার সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে এই ছোটখাটো নেশাগুলো চিকারির ঝঙ্কারের মতো ভারি মিষ্টি লাগে। কাশীর ভালো জর্দাও আছে আমার কাছে। নেবেন একটু?"

"না থাক। আমি চলি এবার—"

"আচ্ছা ওদের যদি কোনো খবর পান আমাকে বলে যাবেন। কেমন?"

"আচ্ছা।"

বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়াইয়াছিল। বৈঠকখানার কপাটটা খোলা ছিল। নবকিশোর শুনিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত কাহার সঙ্গে যেন কথা কহিতেছেন। শুনিতে পাইল বিরাট পণ্ডিত বলিতেছেন—"আপনি সন্ধান পেয়েছেন সে মাগীর?"

একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর অবশেষে ঢুকিয়া পড়িল।

"আসুন, আসুন মহাপুরুষ, আপনারই অপেক্ষা করছি। ইনি একজন বড়ো পুলিশ অফিসার। আমাকে সর্বদাই অনুগ্রহ করেন। জরি তো পালিয়েছেই, উচ্ছেও পালিয়েছে হাসপাতাল থেকে। আপনি কিছু জানেন কি।"

. "না। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। জরি অবশ্য কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। বলেছিল কোথায় না কি একটা চাকরি পেয়ে সে বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় চাকরি পেয়েছ। বলল, তা বলব না। তারপর চলে গেল। আর তো কিছু জানি না।"

পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় আপনাদের দেখা হয়েছিল—"

"আমার মেসের সামনেই কলেজ স্কোয়ার। সেখানে থেকেই জরি ডাকছিল আমায়। আমি কলেজ স্কোয়ারেই তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

"তখন কটা হবে?"

"সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পরে। ঠিক সময়টা বলতে পারছি না, দশটা আন্দাজ হবে—"

কথাটা বলিয়াই নবকিশোর একটু অস্বস্তি বোধ করিল। কারণ সে জানিত বারোটার পর তাহার সহিত জরির দেখা হইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে সে অভ্যস্ত নহে। তাহার খারাপ লাগিতে লাগিল। কিন্তু আরও মিথ্যাভাষণ তাহাকে করিতে হইল।

পুলিশ অফিসার আবার প্রশ্ন করিলেন—"কতক্ষণ আপনারা দুজনে ছিলেন একসঙ্গে—"

"বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক—"

"তারপর কি হল—"

"তারপর জরি একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেল—"

"কোন্‌দিকে গেল।"

"তা ঠিক বলতে পারব না। ট্যাক্সিটা হ্যারিসন রোডের দিকে চলে গেল।"

পুলিশ অফিসার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন— "এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি যতটা পারি চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার ফোটো আছে?"

"না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুলিশ অফিসার সহাস্যে বিরাট পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিলেন—"ওর কুষ্ঠি দেখেছিলেন আপনি?"

দেখেছিলাম। কুষ্ঠি থেকে মনে হয় ও আর ফিরবে না। কিন্তু তা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।"

"নিশ্চয়। চেষ্টা করব। আমার মেয়ের কুষ্ঠিটা দেখবার সময় পেয়েছিলেন?"

'হ্যাঁ। ওর এখন বিয়ে দেবেন না। আর ভালো চুনী পরিয়ে দিন একটা। আমিই দেব এখন। ভালো চুনী আছে আমার কাছে। খুঁজে বার করতে হবে। পেলে আপনাকে খবর দেব।"

"আচ্ছা। উৎসাহবাবুর সম্বন্ধে কি করব।"

"তাকে ওই মাগীর কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। ও সাংঘাতিক মেয়েমানুষ, শ্মশানে-

মশানে বেড়ায়, ওর পাল্লায় পড়ে ছোকরা উচ্ছন্ন গিয়েছিল দিনকতক। বি.এস-সিতে ও ফার্স্ট হত কিন্তু ওর প্যাঁচে পড়ে সাধনা আরম্ভ করে দিলে পড়াশোনা ছেড়ে—”

“উৎসাহবাবু কিন্তু স্পষ্টই বললেন তিনি এখানে ফিরে আসতে চান না।”

“আসতেই হবে। ওর মায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে ওকে মানুষ করব। ওর মা বেঁচে থাকলে সে-ই ওকে সামলাত, কিন্তু সে আমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজেছে, আমি ওকে একটা ডাকিনীর কবলে দেখে চুপ করে বসে থাকব কি করে! আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন যেমন করে হোক—”

পুলিশ অফিসার বলিলেন—“চেষ্টা করব। কিন্তু কথা কি জানেন, উৎসাহবাবু নাবালক নন, উনি আইনত কোনো দোষও করেননি, তাই ঠিক আমাদের এলাকার মধ্যে পড়ছেন না। তবু দেখি চেষ্টা করে। একটা কথা কিন্তু বলব, যদিও ওঁর উপর আপনার রাগ খুব, ওই শ্মশানভৈরবীকে দেখলে কিন্তু ভক্তি হয়। একেবারে মাতৃমূর্তি। উনিও উৎসাহবাবুকে বার বার অনুরোধ করলেন ফিরে আসতে, কিন্তু উৎসাহবাবু ফিরতে রাজী নন! জোরজবরদস্তি করবার স্কোপ নেই, ওঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।

“মাগী ওকে জাদু করেছে। আপনাকেও করেছে মনে হচ্ছে। বিপদ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধরে আসে তখন তা তত বিপজ্জনক নয়, কারণ তার ভয়ঙ্কর রূপই মানুষকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু সে যখন মনোহর মূর্তি নিয়ে আসে তখনই সর্বনাশ। তখন মানুষ মুগ্ধ হয়, স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দেয় অদৃশ্য হাড়কাঠে। উঃ কি কুক্ষণেই আমি ওকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম কারণ আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু দুদিন পরেই দেখলাম, ও বাবা! এ একেবারে জাতসাপ। ঠাকুমার গল্পের সেই ‘রূপ-তরাসী’। সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় করে দিলাম, কিন্তু তখন উৎসাহের মুণ্ডুটি ঘূরে গেছে—”

হঠাৎ বিরাট পণ্ডিত থামিয়া গেলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর পুলিশ অফিসারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ওকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি বন্ধুলোক, তাই আপনাকে এই কষ্টটুকু দিচ্ছি—”

“আমি যথাসাধ্য করব, যথাসাধ্য করব, সারটেনলি। এখন কিন্তু উঠি। আপনার ফোন পেয়ে কাজ ফেলেই চলে এসেছি—। আমি আবার যাব উৎসাহবাবুর কাছে—”

“আচ্ছা।”

পুলিশ অফিসার বিরাট পণ্ডিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত তখন নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মহাপুরুষ, আপনাকেও চেষ্টা করতে হবে। উচ্ছের যখন আপনাকে ভালো লেগেছে—”

“আমাকে ‘আপনি’ বলছেন কেন—”

“মহাপুরুষকে তো ‘আপনি’ই বলা উচিত। পুলিশ অফিসারের কাছে আপনি যে ছোট্ট মিছে কথাটা বললেন তাতে মনে হল আপনি সত্যিই মহাপুরুষ। জরির কাছে যে প্রতিশ্রুতিটা দিয়ে এসেছিলেন সেটা রক্ষা করলেন। প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করাই তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে দশরথের মতো পুণ্যবান রাজাও রামের মতো ছেলেকে বনবাসে দিয়েছিলেন।”

বিরাট পণ্ডিত স্থির কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নবকিশোরের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা বিরাট পণ্ডিত জানিলেন কিরূপে? তবে কি সুখদেও ফিরিয়া আসিয়া সব কথা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে? তবে কি জরি একাই হাঁটিতে হাঁটিতে অন্ধকার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে? হঠাৎ নবকিশোর মনস্থির করিয়া ফেলিল।

"আমি মিথ্যে কথা বলেছি তা কি করে জানলেন?"

"আমি জরিকে তার জন্ম থেকে জানি যে। ও আপনাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডেকে দশমিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবে এটা অবিশ্বাস্য। তাছাড়া আপনি কথাটা যখন বলছিলেন তখন আপনার চোখের পাতার কাঁপন আর আপনার অপ্রস্তুত মুখভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্যটা ঢাকছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। খুব ভালো কাজ করেছেন। ওতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। পুরাণ উলটে দেখবেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করেছেন।"

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—"প্রতিশ্রুতির সিন্দুকে আমিও অনেক সত্যকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি। ওটা দোষের কিছু নয়। ভদ্রলোকরাই করে। আমার দুঃখ জরির মতো অসাধারণ মেয়েকে এত কষ্ট করে বড় করলুম, কিন্তু সে কাছে রইল না। অমাবস্যার গর্ভ থেকে চাঁদকে এনে লালন করলুম, কিন্তু পূর্ণিমা হওয়ার আগেই সে অস্ত গেল। উচ্ছেও মনে হচ্ছে থাকবে না। ওরা থাকে না। তীর্থের কাক কিনা, পূজারী তো নয়। ডানা আছে উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। তীর্থে তীর্থে ঘুরে, চেখে চেখে দেখতে চায় আরও ভালো কিছু পাওয়া যায় কি না। অনেক লোক ক্রমাগত গুরু বদলায়, অনেক ছাত্র প্রাইভেট টিউটার বদলায়, কলেজ বদলায়, অনেক স্ত্রী স্বামী বদলায়, অনেক স্বামী স্ত্রী বদলায়, ভাড়াটেরা বাড়ি বদলায়, বাবুরা জামা জুতো বদলায়, ফ্যান বদলায়, কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত লাভ কিছুই হয় না। দেখা যায় কাক কাকই আছে, ময়ূরও হয়নি, বুলবুলিও হয়নি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে আমি এ সত্যটা বুঝেছি। ওরাও বুঝবে। কিন্তু ওদের আমি এমনি ছেড়ে দেব না। জরিকে খুঁজতে হবে, উচ্ছেকে আবার ধরে আনতে হবে। আনতে হবে ওদের জন্য নয়, আমার নিজের জন্য। আমার পুরুষকারকে সার্থক করবার জন্য। আমি কুষ্ঠি নিয়ে ব্যবসা করি বটে কিন্তু নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করি না। আমি মানুষ, আমি যোদ্ধা, আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয় যুদ্ধে হেরে গিয়ে তবে করব—তার আগে নয়। আপনার সাহায্য পেতে পারি কি।"

"কি সাহায্য বলুন। জরি কোথায় গেছে আমি জানি না, এর বেশী আমি আর কিছু বলতে পারব না।"

"আমি জানতেও চাই না। পুলিশ তাঁর খোঁজ করুক। আপনি উচ্ছের কাছে যান, তাকে বুঝিয়ে বলুন যে অত তদ্বির করে তাকে মেডিকেল কলেজে ঢোকালুম, ওই হারামজাদির পাল্লায় পড়ে সে কি সব জলাঞ্জলি দেবে? কুম্ভক শবসাধনা এসব করার কোনও মানে হয় পড়াশোনা ছেড়ে? জ্যোতিষ শিখতে চাও আমার কাছেই শেখ না, শিখেওছো তো কিছু-কিছু, কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে এ কি কাণ্ড। আপনি বুঝিয়ে বললে শুনবে। আপনাকে ওর ভালো লাগেছে। ওই ভালো লাগার টানেই পৃথিবী চলে। আমাকে ওর ভালো লাগে না, কারণ আমি ওর অভিভাবক, ওর হিতৈষী। আমি তো মন রেখে মিষ্টি কথা বলি না, হিত-কথা বলি, তা অনেক সময় তেতো। আমার জীবনের এইটেই ট্র্যাজেডি। যদিও অবশ্য আমি ট্র্যাজেডিকে গ্রাহ্য

করি না, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তা যাব না, হার মানব না। আমি জানি ওদের জীবনের পরিণাম কি, কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হব না তা হলে। যা কর্তব্য তা করতেই হবে। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

"করব। উৎসাহ কোথায় আছে বলে দিন, আমি গিয়ে দেখা করব তার সঙ্গে। বুঝিয়ে বলব। কিন্তু একটা কথা বলছি আপনাকে, রাগ করবেন না তো—"

"না, রাগ করব কেন। আমার বাইরের শীর্ণ চেহারাটা, বিশেষ করে আমার নাকটা দেখে অনেকে মনে করে আমি বুঝি খুব তিরিক্ষে লোক। বাইরেটা আমার ঝুনো নারকেলের মতো হলেও ভিতরে কিছু শাঁস-জল আছে। কি বলতে চান নির্ভয়ে বলুন।"

"উৎসাহ বড় হয়েছে, ওর নিজেরও মতামত হয়েছে একটা। ওর মতের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করতে যাওয়াটা কি ঠিক? ও প্রবালের আংটি পরতে চায় না, ওর ওসবে বিশ্বাস নেই, অথচ আপনি জোর করে সেটা পরাতে চান ওকে। ওতেই ও খুব চটে গেছে। আমাকে বলছিল টিউশনি যোগাড় করে দিন, আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না—"

"বলছিল না কি। এখন তাতো বলবেই। এখন ডানা হয়েছে। উড়তে চাইবেই। যখন পাখা হয়নি, তখন বাসায় বসে খালি হাঁ করত আর আমি খাবার এনে দিতাম। শুধু দেহের খাবার নয়, মনের খাবারও। তখন গণৎকার হিসেবে আমার নাম হয়নি, কেরাণীগিরি করতাম আর সেন্ট জেভিয়ার্সের এক ঋষিতুল্য প্রফেসারের কাছে রাত্রে গিয়ে অ্যাস্ট্রনমি (astronomy) চর্চা করতাম। আয় যৎসামান্য ছিল, সেই সময় থেকে ওর ভার নিয়েছি, ওর ভালো করবার চেষ্টা করেছি, ওকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি—এখন উনি আমার উপর নিজের মতামত ফলাতে এসেছেন, নিমকহারাম নচ্ছার কোথাকার। প্রবাল কেন পরাতে চাইছি জানেন? ওকে মঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। মঙ্গলই ওর মারক। জ্যোতিষশাস্ত্র যদি মানতে হয় তাহলে প্রবাল, নীলা, গোমেদ, হীরে, চুনী—সব মানতে হবে। বিজ্ঞান বসন্তরোগের যে তত্ত্ব বার করেছে তা স্বীকার করলে টিকে-নেওয়াটাকেও স্বীকার করতে হবে। একটাকে মানব, আর একটাকে মানব না তা হয় না। হতে পারে না। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র—তা ঠিক। কিন্তু আমরা পাথর নই, মানুষ। বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বুদ্ধি বিধাতাই আমাদের দিয়েছেন—"

"কিন্তু উৎসাহ বলছিল ওর কুষ্ঠি না কি ভালো। ওর গোচার ফল না কি—"

"উৎসাহ কুষ্ঠি দেখার কিচ্ছু জানে না। কিন্তু হামবড়া ভাব আছে খুব। ওতেই সর্বনাশ করেছে। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনাকে যে নীলাটা আমি দিয়েছিলাম সেটা আপনি জরিকে দিয়েছিলেন বুঝি। জরি কোনো জিনিস চাইলে 'না' বলা শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু নীলাটা নিয়ে ও কি করেছিল জানেন? ওই পানওলা ওত্‌লোর কাছে সেটা রেখে তার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়েছিলে। টাকা নিয়ে বেলেল্লাগিরি করেছে সমস্ত রাত। আর সাহস দেখুন, তারপর দিন সকালে এসে আমারই কাছে খুলে বলছে সব। দুর্জয় সাহস তো মেয়েটার। না পারে হেন কাজ নেই। জোয়ান্ অব্ অর্ক হবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এ যুগের আবহাওয়ায় পচে গেল, নর্দমায় পড়ে ভেসে ভেসে চলে গেল অমন সুন্দর ফুলটা—"

বিরাট পণ্ডিত আবার হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"কুছ পরোয়া নেই। লড়ে যাব ভাগ্যের সঙ্গে। দেখি কি হয়—উই মাস্ট্ ফাইট্।"

দ্বারে পদশব্দ হইল।

"আসতে পারি?"

"আসুন।"

নবকিশোর প্রথম দিন যে ভর্ৎসিত ভদ্রলোককে কুণ্ঠিতমুখে লগুড়াহত কুকুরের মতো বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল তিনি দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। এবার হাসিমুখ। জুতা খুলিয়া আগাইয়া আসিলেন এবং বিরাট পণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"পাথরে খুব কাজ হয়েছে। বড় ছেলের চাকরি হয়েছে একটা। এই সুখবরটা দিতে এলাম।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। ওইটেই এখন ধারণ করে থাকুন। আর কিছু করতে হবে না।"

"যে আজ্ঞে।"

তিনি জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"আমার স্ত্রী বলছিলেন ওই নীলাটা যদি দিয়ে দেন তাহলে আমি ওটা বিক্রি করে আপনাকে—"

"আপনি পান্নার দামটা দিয়ে তবে নীলাটা নিয়ে যাবেন। সাতদিনের মধ্যে যদি দাম না পাই এটা বিক্রী করে দেব। কারণ যে জহুরি আমাকে পাথর দেন তাঁকে দামটা দিতে হবে। এ নিয়ে কোনো রকম কচলাকচলি করবার আমার সময় নেই। বুঝলেন?"

"যে আজ্ঞে।"

আবার চলিয়া গেলেন তিনি।

দ্বারের দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানিয়া বিরাট পণ্ডিত বলিলেন—"মিথ্যাবাদী চামার। লোকটার দারিদ্র্যযোগ আছে। চরিত্রও তাই বলিষ্ঠ নয়। বুধ নীচস্থ কি না, তারুণ্যের কোনো লক্ষণ নেই।"

নবকিশোর চুপ করিয়া রহিল। কোনও প্রকার মন্তব্য করা সমীচীন মনে করিল না।

বিরাট পণ্ডিত বলিলেন, "আপনি উচ্ছের সঙ্গে দেখা করুন। সে বউবাজারে আছে ওই ভৈরবী মাগীর বাসায়। ঠিকানা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি—"

"ভৈরবী কলকাতায় থাকে না কি—"

"হ্যাঁ, ওটা ওর স্বামীর বাড়ি। শোনা যায় ওর স্বামীর শবের উপর বসে ও নাকি শবসাধনা করেছিল। স্বামী রাত্রে হার্টফেল করে মারা যায়,—বাড়িতে আর কেউ ছিল না—ও কাউকে খবর দেয়নি। খিড়কির কপাটটা নাকি খোলা ছিল, ঠিকে দাই এসে দেখে স্বামীর বুকের উপর চোখ বুজে বসে আছে মাগী। একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। হতে পারে ঢং, হতে পারে সত্যিই সমাধিস্থ হয়েছিল। সমস্তটাই গুজব হতে পারে, বাংলা দেশে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি গুজবের। যা শুনেছি তাই বললাম। তবে যেটা জানি সেটাও বলে দিচ্ছি—মেয়েটি মোহিনী ও মায়াবিনী। বয়স কত তা আন্দাজ করা শক্ত, দেখে মনে হয় ষোড়শী। খুব সাবধান, আপনিও যেন মুগ্ধ হয়ে যাবেন না। জরি ওকে চিনেছিল ঠিক, জরির সঙ্গে ওর একটা সূক্ষ্ম রাইভালরিও (rivalry) হয়েছিল যেন। জরিই আমার টিকি টেনে ধরেছিল, তা না হলে আমিও ডুবছিলাম। আপনি পারতপক্ষে ওর সামনে থাকবেন না বেশীক্ষণ। উচ্ছেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোনও পার্কে বসে কথা বলবেন।"

"আচ্ছা—"

দ্বারে কড়া নড়িল।

"আসুন—"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল নবকিশোর। ডাক্তার পুলিন মিত্র! কোট-প্যান্ট নাই, ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালী ভদ্রলোক।

"এ কি সার, আপনি!"

"নবকিশোর না কি। তুমি এখানে?"

"আমি উৎসাহের খোঁজে এখানে এসেছি। এইখানেই সে থাকে। ইনি তার গার্জেন—"

নমস্কার করিয়া ডাক্তার পুলিন মিত্র বলিলেন, "আমি এসেছি পণ্ডিত বিরাটেশ্বর শর্মার খোঁজে। তিনিও কি এখানে থাকেন? আমার নাম পুলিন মিত্র।"

"এই যে তিনি।"

পুলিন মিত্র নমস্কার করিলেন আবার।

"আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তাই আপনার কাছে এলাম একটা সন্দেহ মেটাতে—"

"কি রকম সন্দেহ—"

"এক জ্যোতিষী আমার কুষ্ঠি দেখে বললেন আমার সদ্য-বিবাহিতা মেয়ে নাকি বিধবা হবে এক বছরের মধ্যে। শুনে থেকে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। আপনি একটু দেখুন তো—"

"কোন্ জ্যোতিষী একথা বলেছে।"

"হরু জ্যোতিষী—"

"গ্যাঁড়াতলার হরু জ্যোতিষী?"

"হ্যাঁ—"

"সে একটি আকাট। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"আমি কুষ্ঠিটা সঙ্গে এনেছি। যদি একটু দেখে দেন—"

"রেখে যান। দেখে রাখব। কুষ্ঠি দেখতে আমি সাধারণত একশ টাকা করে নিই—"

"জানি সেটা—"

ডাক্তার পুলিন মিত্র পকেট হইতে কুষ্ঠি এবং মানি-ব্যাগ হইতে একশত টাকার একটি নোট বাহির করিয়া বিরাট পণ্ডিতের সম্মুখে রাখিলেন।

"আপনি উৎসাহকে চেনেন? এই মহাপুরুষের সঙ্গে তো আলাপ আছে দেখছি।"

"আমি মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডে হাউস সার্জন। এরা কলেজের ছাত্র সুতরাং আলাপ হবেই—"

"ও, আপনি মেডিকেল কলেজের ডাক্তার! মানে, এদের মাস্টার? আপনার কাছে কোনও দক্ষিণা নেব না।"

"না, ওটা নিতে হবে। আমাদের কেউ যদি ফি না দেয় বড় রাগ হয় মনে। যদিও অনেক সময় সে রাগটা প্রকাশ করা যায় না—"

"ও, আপনি তাহলে একটি পাষণ্ড দেখছি আমারই মতন। স্বজন লাভ করে আনন্দিত হলাম। তবে, একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না। আমরা সত্যি সত্যি কারও কিছু করি না। বিনিময়ে তার কাছ থেকে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু আদায় করি এবং আদায় করবার প্রত্যাশা রাখি। অধিকাংশ মানুষই সে প্রত্যাশা পূর্ণও করে। অবশ্য এমন দুএকটা

শৃগালও দেখা যায় যাদের বিষ্ঠাটুকুর প্রয়োজন হলে তাঁরা পর্বতে গিয়ে মল-ত্যাগ করে আসেন। আপনি উৎসাহ আর এই মহাপুরুষের একটু দেখা-শোনা করবেন এই প্রতিশ্রুতিটুকু শুধু প্রত্যাশা করব আপনার কাছে। টাকা চাই না। টাকাটা উঠিয়ে নিন। আপনার মেয়ে জামাইয়েরও কুষ্ঠি দরকার। মেয়ের শ্বশুরের পেলে আরও ভালো হয়—"

পুলিন মিত্র কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "নবকিশোর আর উৎসাহ আমাদের কলেজের ছাত্র হলেও তাদের দেখাশোনা করবার 'স্কোপ' আমার খুব বেশী নেই। তবু যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করব। কিন্তু তার জন্যে আপনি আপনার প্রণামী নেবেন না এতটা আবদার করবার মতো ঘনিষ্ঠতা হয়নি এখন আপনার সঙ্গে। আগে সেটা হোক, তারপর দেখা যাবে। আজ প্রণামীটা আপনার পায়ের কাছেই থাক। আমার মেয়ে আর জামাইয়ের জন্মকুণ্ডলীর ছক আমার ডায়েরিতে টোকা আছে। এক টুকরো কাগজ পেলে এখনই লিখে দিয়ে যেতে পারি। আমার মেয়ের শ্বশুরের কুষ্ঠিটা যোগাড় করা একটু শক্ত হবে। কুষ্ঠি আছে কি না সন্দেহ, তিনি একটু সাহেবী ধাঁচের মানুষ! তবু খোঁজ করব—"

"দরকার হলে হাত দেখে আমি কুষ্ঠি তৈরি করে দিতে পারব কুষ্ঠি যদি না থাকে। কি করেন তিনি—"

"তিনি একজন আই. এম. এস. ডাক্তার। দিল্লী মেডিকেল কলেজে বায়োলজির প্রফেসার। মনে হয় জ্যোতিষে তেমন আস্থা নেই। বিয়ের সময় কুষ্ঠি চাননি।"

"তিনি এখানে আসবেন কি কখনও?"

"এসে পড়তে পারেন। আই. এম. এস. অফিসারদের ভারতবর্ষের কোথাও যেতে বাধা নেই। শুনেছি এখানে আসবার চেষ্টাও করছেন—"

"আপনার মেয়ের আর জামাইয়ের জন্মসময় আর জন্মকুণ্ডলী টুকে দিয়ে যান তাহলে এই খাতাটায়। আপনি যখন না-ছোড় তখন এবার টাকাটা নিচ্ছি, কিন্তু বারান্তরে আর দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার অহঙ্কারটাকে এবার একটু তৈলাক্ত করে দিলুম, কিন্তু বার-বার পারব না। আপনি দিনদশেক পরে আসবেন—"

একটি মোটা খাতায় ডাক্তার পুলিন মিত্র তাঁহার মেয়ে-জামাইয়ের জন্মকুণ্ডলী লিখিতে লাগিলেন। বিরাট পণ্ডিতও একটি কাগজে উৎসাহের ঠিকানাটা লিখিয়া নবকিশোরকে দিয়া বলিলেন—"এই ঠিকানা। এইখানে গেলেই আশা করি তার দেখা পাবেন। এখন যেতে পারবেন কি।"

"এখন? এত রাত্রে?"

"বেশী রাত তো হয়নি। মোটে এগারোটা। এই সময়টাই তো ভালো। নির্জন চারদিক—"

"দেখি—"

পুলিন মিত্র লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"লিখে দিলাম। অনুমতি করেন তো যাই এবার।"

"আসুন। আমি ভালো করে দেখে রাখব। যদি ভয়ের কিছু থাকে তারও ব্যবস্থা করব। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

প্রণাম করিয়া পুলিন মিত্র নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখন বসবে নাকি।"

"হ্যাঁ। ওঁর কাজ শেষ হয়নি এখনও।"

"আমি চলি তাহলে।"

পুলিন মিত্র চলিয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মুখ দেখে যতটা বুঝলাম আপনার ওই পুলিন মিত্র সুবিধার লোক নন। ধূর্ত এবং সুবিধাবাদী। ওঁর সঙ্গে বেশী মেশামিশি করবেন না। আর উৎসাহের কথাও ওঁকে বলবেন না। তাই ওঁর সঙ্গে যেতে দিলুম না আপনাকে! আপনি এখুনি গিয়ে উৎসাহকে ধরবার চেষ্টা করুন। বাড়িতে ঢুকবেন না। ঢুকলে ভৈরবীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে, সে 'রিস্‌ক্‌' নেবেন না। গলির মধ্যে বাড়ি। আপনি বাড়ির কড়া নেড়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। একটা বুড়ী চাকরাণী আছে, সে-ই এসে কপাট খুলে দেবে। ভৈরবী মাগী সাধারণত দোতলা থেকে নাবে না। সে দিনরাত ধ্যানাসনে বসে থাকে না কি। কপাট খুললে আপনি বলবেন উৎসাহের সঙ্গে দেখা করব, তাকে নীচে পাঠিয়ে দাও। সে নীচে এলে তাকে বড় রাস্তায় আনবেন। আর পারেন যদি, মানে তাকে রাজী করাতে পারেন যদি, একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে চড়ে বসবেন তাতে। আর বোঁ বোঁ করে এখানে চলে আসবেন। এই পুলিন মিত্রের একশ' টাকা আপনিই নিয়ে যান, যা খরচ-খরচা হয় করবেন। পরে হিসেব নেব আপনার কাছ থেকে—"

"টাকার জন্যে আটকাবে না। টাকা আছে আমার কাছে—"

"থাকলেই বা। গরজটা আমার, আপনি খরচ করতে যাবেন কেন!"

"টাকার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—"

"মহাপুরুষরা বড়ই বেহিসাবী হন জানি সেটা। সেইজন্যেই তাঁদের সঙ্গে কারবার করা কঠিন। আচ্ছা, বেশ,—থাক টাকা। আপনাকে চটাতে চাই না। আপনি দয়া করে কাজটি উদ্ধার করে দিন। ওকে যদি নিয়ে আসতে পারেন—"

"যদি না আসতে চায়, জোর তো করতে পারি না। ছোট ছেলে তো নয়—"

"ও ছোট ছেলেই। ওর দেহটাই বড় হয়ে গেছে, মনটা শিশু। ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে হবে। একটা টোপ ফেলতে পারেন। বলতে পারেন প্রবাল-ট্রবাল পরতে হবে না, তোমার মতেই তুমি চলো—"

তাহার পর চোখ মটকাইয়া বলিলেন—"প্রবাল পরতেই হবে বাছাধনকে। ও আসুক, ওকে কন্‌ভিন্‌স করে তারপর পরাব। মুশকিল কি জানেন, স্বল্পবিদ্যা আর অহঙ্কার এই দুটোর যোগাযোগ ভয়ঙ্কর। দিশি কুকুরের ল্যাজের মতন, যুক্তি দিয়ে যতই টানুন, ছেড়ে দিলেই আবার গুটিয়ে যাবে। আসুক তো, তারপর দেখা যাবে—। আপনি এনে ফেলুন ওকে এখানে। তারপর দেখা যাবে—"

"উঠি আমি তাহলে—"

"আচ্ছা। রাত্রে কিন্তু আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকব।"

নবকিশোর প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অতুলের দোকান খোলা ছিল। অতুল তন্ময় হইয়া ডন্ কুইক্‌সোটই পড়িতেছিল। নবকিশোরকে দেখিয়া মুখ তুলিল।

"কি হল? বিরাট পণ্ডিত খুব ক্ষেপচুরিয়াস না কি।"

" না ভদ্রলোক বড্ড দমে গেছেন মনে হল।"

"উনি অদম্য। আপনার কাছে হয়তো দমে গেছেন এই অভিনয়টা করলেন। ভাবলেন তাতে হয়তো কাজ হবে। কি করতে বললেন আপনাকে।"

"উৎসাহকে ফিরিয়ে আনতে বললেন যেমন করে হোক। উৎসাহ নাকি সেই ভৈরবীর কাছে চলে গেছে—"

"সঙীন পরিস্থিতি। ভৈরবী স্বেচ্ছায় যদি উচ্ছেকে ছেড়ে না দেয়, আনা শক্ত হবে। উচ্ছে ভৈরবীর কেনা গোলাম। দেখুন যদি আনতে পারেন। ঠিকানা পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। আচ্ছা, এ ভৈরবীর ইতিহাস জানেন কিছু? উনি এদের জীবনে এলেন কোথা থেকে—"

"আকাশ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এমনি এক ভৈরবী এসেছিলেন। নৌকো থেকে নেবে এলেন অজানা থেকে, এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধনাপথে এগিয়ে দিয়ে গেলেন মায়ের মতো। এ-ও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। ইনি নৌকো থেকে নাবেননি, রিকশা থেকে নেবেছিলেন। আমার এই দোকানের সামনেই নেবেছিলেন। নেবে জিগ্যেস করেছিলেন বিরাটেশ্বর শর্মার বাড়ি কোথায়। আমিই বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর—"

"ও। ভদ্রমহিলা কি ধরনের বলুন তো—"

"দেখলে ভক্তি হয়। অমন অতলকালো চোখের তারা আমি আর দেখিনি। চোখের দিকে চাইলে মনে হয় হারিয়ে গেলুম। রিক্‌শা-ওলা ভাড়া নিতে চাইছিল না, জানেন? সে-ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলে দেবীজির কাছে ভাড়া নেব না। আমি বিশেষ কিছুই জানি না তাঁর সম্বন্ধে। ওই একদিনই দেখেছিলুম। বিরাট পণ্ডিতের বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। জরিদির মুখে শুনেছিলাম প্রত্যাদিষ্ট হয়ে উনি নাকি এসেছেন উচ্ছেকে দীক্ষা দেবার জন্যে। বিরাট পণ্ডিতও নাকি ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন খুব। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম উনি চলে গেছেন। জরিদির সঙ্গে নাকি ঝগড়া হয়েছিল। এর বেশী আর কিছু জানি না আমি। আমি তো বাইরের লোক। তবে উচ্ছে মাঝে মাঝে এসে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত ওঁর সম্বন্ধে। বলত আমি মাতৃহীনা ছিলুম, এতদিনে মা পেয়েছি। কিছু বিভূতিও পেয়েছিল উচ্ছে ওঁর কাছ থেকে। খুব ভক্তি করে ওঁকে। আপনি চলে যান, গেলেই বুঝতে পারবেন। আসুন—"

অতুল আর এক খিলি পান তুলিয়া ধরিল।

"আপনি পানের নেশাটা ধরিয়ে ছাড়বেন দেখছি। চমৎকার পান আপনার!"

অতুল হাসিমুখে হাতজোড় করিয়া রহিল। কোনো উত্তর দিল না।

"আচ্ছা, এবার চলি তবে আমি।"

।। আট ।।

নবকিশোর সোজা বউবাজারে গেল না। নিজের মেসে গেল প্রথমে। প্রথম উদ্দেশ্য টর্চটা লওয়া, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মেসের চাকরটাকে বলিয়া যাওয়া যে তাহার ফিরিতে রাত হইবে, সে একটা দরকারী কাজে বাহিরে যাইতেছে। মেসের চাকর মিঠ্ঠু এই মেসে বহুকাল আছে।

অনেক ছাত্র তাহার হেফাজতে থাকিয়া বড় বড় ডাক্তার হইয়াছে। তাহার ভাব-ভঙ্গী অভিভাবক-গোছের। নবকিশোর আজও রাত্রে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"রোজ রোজ রাত্রে বেরিয়ে যাওয়া ভালো নয়, বাবু। কলকাতা বড় খারাপ জায়গা। একটু আগে আপনার বড়াভাই এসেছিলেন। আমি বললাম, বাবুর নাইট ডিউটি আছে। ঝুট বাত বলে দিলাম। কিন্তু রোজ রোজ এরকম বেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কাল সকালেই উনি আবার আসবেন। সাতটার সময়। তার আগে ফিরবেন তো?"

"হাঁ, হাঁ—আমি একটু পরেই ফিরব। দাদা কি একাই এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি তাঁকে বসিয়ে সিঙাড়া চা খাওয়ালাম। খেতে চাইছিলেন না। আমি জবরদস্তি করলাম, বললাম, আপনি নব্বু বাবুর বড়াভাই, এমনি এমনি চলে যাবেন তা হবে না। কিছু খেতেই হবে। কাল মাইজিকে নিয়ে আসবেন বললেন।"

"বউদি এসেছেন না কি।"

"বললেন তাই। আপনি কোথায় যাচ্ছেন চট্ করে ঘুরে আসুন—দেরি করবেন না।"

"যোগেন কোথা।"

"থিয়েটার দেখতে গেছেন। খেয়ে যায়নি। আমি খাবার ঢাকা দিয়ে আগলাচ্ছি বসে। এলে গরম করে দিতে হবে। বড় 'দিক্' করেন আপনারা বাবু। সুনীলবাবু আজ আপনার খোঁজ করছিলেন একটু আগে।"

"তাই না কি।"

নবকিশোর শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুনীলদা সিক্স্‌থ্ ইয়ারের ছেলে। এ মেসের গার্জেন এবং আদর্শ ছাত্র। স্বাস্থ্যে, পড়াশোনায়, নীতি-নিয়মে নিখুঁত। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। তিনি মাঝে মাঝে জুনিয়ার ছাত্রদের খোঁজখবর নেন। কোনও উপদেশ দেন না, বকুনিও দেন না। কিন্তু তিনি খোঁজখবর লইয়াছেন জানিতে পারিলেই সকলে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

"কিছু বললেন না কি।"

"না। এমনি জিগ্যেস করলেন নবকিশোর কোথা।"

"আচ্ছা আমি এখুনি ঘুরে আসছি—"

নবকিশোর টর্চের বোতামটা একবার টিপিয়া দেখিল ঠিক জ্বলিতেছে কি না।

"কতক্ষণ পরে ফিরবেন।"

"এই ধর ঘন্টাখানেক।"

"বারোটা বেজে গেছে, সেটা যেন মনে থাকে।"

নবকিশোর কেন যে হঠাৎ এই অপরিচিত পরিবারের সহিত নিজেকে জড়াইয়া সময় নষ্ট করিতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো সে সদুত্তর দিতে পারিত না। বহু-পূর্বে মহর্ষি বাল্মীকি অন্য একটি গল্পের মধ্যে ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নগরে প্রস্তুত সন্দেশের লোভ দেখাইয়া কয়েকজন পতিতা শহরে ভুলাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। বন্য ফলমূলে পরিতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অভিনব সন্দেশ খাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। নবকিশোরেরও অনেকটা সেই দশা। তাহার দেহাতী সরল মন সেই রোমান্সের মোহে মুগ্ধ যে রোমান্সের স্বাদ ইতিপূর্বে সে পায় নাই। উৎসাহ, জরি, অতুল, বিরাট পণ্ডিত, সুখদেও সকলেই যেন আরব্য উপন্যাসের বর্ণময়

কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিয়া ভিন্ন নামে সহসা এই কলিকাতা শহরের তুচ্ছতার মধ্যেই রহস্য-রসে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান ভৈরবী আবার কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে কে জানে। গলিটার সামনে নবকিশোর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। অন্ধকার গলি। টর্চ ফেলিয়া দেখিল, সোজা নয়, ডান দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। একটা বাড়ির বারন্দায় একটা লোমওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। তাহার সামনেই জঞ্জালে পরিপূর্ণ একটা ডাস্টবিন। এইখানে এই এঁদো গলির মধ্যে শ্মশান ভৈরবী আছে! বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু বিরাট পণ্ডিত ভুল খবর দিবার লোক নন। একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর অবশেষে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল কুকুরটা হয়তো ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিবে। কিন্তু সে টুঁ শব্দটি করিল না। টর্চের আলো ফেলিয়া সে খুঁজিতে লাগিল বত্রিশ বাই ওয়ান বাই এ, কোন্ নম্বরটা। অনেক বাড়িতে নম্বরই দেখিতে পাইল না সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ নজরে পড়িল একটা বাড়ির কালো কপাটে খড়ি দিয়া নম্বরটা লেখা রহিয়াছে। আর, কি আশ্চর্য কড়া নাড়িবামাত্র কপাটটা খুলিয়া গেল। চাকরানী কপাট খুলিয়া দিল এবং বলিল—"ওপরে চলুন—"

"ওপরে যাব?"

"হ্যাঁ। আপনিই তো উৎসাহবাবুর বন্ধু?"

"হ্যাঁ—"

"মা বললেন আপনাকে উপরে নিয়ে আসতে।"

"উৎসাহ কি উপরেই আছে?"

"তিনি একটু বেরিয়েছেন। এখুনি ফিরবেন। আপনি আসুন।"

নবকিশোর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। উৎসাহ নাই এ সময় কি বাড়িতে ঢোকা উচিত? বিরাট পণ্ডিত মানা করিয়া দিয়াছেন—

"এস বাবা, উপরে উঠে এস। উৎসাহ এখনি আসবে!"

না, বাঁশির মতো গলা নয়। একটু যেন ভাঙা-ভাঙা ধরা-ধরা। দ্বিতলের স্বল্পালোকিত অন্ধকার হইতে কথাগুলি ভাসিয়া আসিল। নবকিশোর মুখ তুলিয়া দেখিল অস্পষ্ট একটি মূর্তি আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে এই দিকে সিঁড়ি..."

চাকরানী সিঁড়িটা দেখাইয়া দিল। এ অবস্থায় ফিরিয়া আসা অশোভন। নবকিশোর টর্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

"এস বাবা ঘরের ভিতরে বস।"

অস্পষ্ট মূর্তি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। উপরের খোলা দ্বারপথটা আলোকিত হইয়া উঠিল। নবকিশোর কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল অপরূপ সুন্দরী ষোড়শী মূর্তি দেখিবে। কিন্তু দেখিল একটি পলিতকেশা প্রৌঢ়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখে আসন্ন জরার চিহ্ন। ইনিই কি শ্মশান ভৈরবী? একটু ইতস্তত করিয়া নবকিশোর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনিই কি ভৈরবী মা?"

"হ্যাঁ ওই নামে ডাকে আমাকে অনেকে।"

"উৎসাহ কি হাসপাতাল থেকে এখানেই চলে এসেছিল? ও আপনার ঠিকানা জানত না কি।"

"না জানত না। আমিও এখানে ছিলাম না। তারাপীঠে ছিলাম। যেদিন এখানে আসি সেদিন পথে জরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ই জিগ্যেস করেছিল আমি এখানে কোথায় উঠব। তাকে ঠিকানা বলেছিলাম। আমার এ ঠিকানা পুরোনো ঠিকানা। অনেকেই জানে, বিরাট পণ্ডিত মশাই এসেছেন এ বাসায়। বস।"

ভৈরবী মা খাটের তলা হইতে একটি কার্পেটের আসন বাহির করিয়া মেঝেতে বিছাইয়া দিলেন। ঘরে টেবিল চেয়ার ছিল না। এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া ছিল শুধু।

"বস। উৎসাহের ঘরে চেয়ার আছে একটা। ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে।"

"আপনি বসুন—"

"বসি—"

ভৈরবী মা পাশের ঘরে ঢুকিয়া একটা বড় কাঠের পিঁড়ি লইয়া আসিলেন। নানারকম কাঠ জোড়া দেওয়া একটা অদ্ভুত পিঁড়ি। পিঁড়ির উপর তিনি পদ্মাসনে বসিলেন। নবকিশোরও বসিয়া পড়িল।

"তুমি যে আসছ তা অনেকক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পারছি। উৎসাহকে বললুম, তোমার বন্ধু আসছে, তার জন্যে কিছু খাবার এনে রাখ। ক্ষিদে পেয়ে গেছে বেচারীর। কাছেপিঠে খাবার পাওয়া গেল না, তাই উৎসাহ চিৎপুরের দিকে গেল। সেখানে একটা দোকানে নাকি সমস্ত রাত খাবার পাওয়া যায়!"

"আপনি আগে থাকতে বুঝতে পেরেছিলেন আমি আসছি? আশ্চর্য তো।"

"কিছুই আশ্চর্য নয়। মন সব টের পায় বাবা। আয়না যদি পরিষ্কার থাকে ঠিক ছবি পড়ে। তোমার কথা উৎসাহের কাছে শুনলুম সব। ভালো ছেলে তুমি, ভাগ্যবান ছেলে। উৎসাহকে ছেড় না, উৎসাহ খুব ভালো ছেলে, ও নিজে জানে না ওর মধ্যে কি অসাধারণ শক্তি আছে, কিন্তু ওর ভাগ্যটা খারাপ; মৃত্যু ওর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেডিকেল কলেজ জায়গাটাই ওর পক্ষে ভালো নয়। ওকে আমি মেডিকেল কলেজে যেতে মানা করেছিলুম, কিন্তু ওর বাবাই ওকে যখন জোর করে ঢুকিয়ে দিলে আমি কি আর বলব। একটা মন্ত্র জপ করতে বলেছি, কিন্তু এ-ও জানি নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না!"

"উৎসাহের বাবা আছেন না কি? কোথায় থাকেন তিনি।"

"বিরাট পণ্ডিতই উৎসাহের বাবা। জরিও বিরাট পণ্ডিতেরই মেয়ে। ওরা দু'জন বৈমাত্রেয় ভাই বোন।"

"তাই না কি। জানতুম না তো।"

"কেউ জানে না। ওরাও না। আমি জানি। আমি কিছুদিন ওদের কাছে ছিলাম—"

নবকিশোরের মনে হইল ভৈরবী হঠাৎ রসনা সংযত করিলেন। তাহার পর অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—"তুমি তো মেসে থাক?"

"হ্যাঁ।"

"উৎসাহকেও তোমার সঙ্গে রাখ না। ওর বাড়ির আবহাওয়া ওর পক্ষে ভালো নয়। বিরাট পণ্ডিত গুণীলোক, মস্তলোক, কিন্তু উৎসাহের উপর ওঁর প্রভাব শুভ নয়, কারণ উৎসাহ ওঁকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। শ্রদ্ধার সোপান দিয়েই মানুষ ওপরে ওঠে। ও বাড়িতে সে সোপান নেই। তোমার সঙ্গে থাকলে ওর মঙ্গল হবে।"

"আমাদের মেসে তো 'সীট' খালি নেই। তাছাড়া—আচ্ছা, একটা কথা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি—"

"রক্তের সম্পর্ক নেই। আলো বাতাস জলের সঙ্গে সকলের যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে ওর সেই সম্পর্ক। রক্তের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। মরে যাওয়ার পর তো রক্ত থাকে না, ওরা থাকে।"

"আপনি কি করে ওর কাছে এলেন।"

"আলো বাতাস জল যে ভাবে আসে। তোমার কাছেও এসেছি। সকলের কাছেই আসি। কেউ চিনতে পারে, কেউ পারে না। আলো বাতাস জলের অভাব টেরই পায় না অনেকে। টের পেলেই পরিচয় ঘটে, দেরি হয় না। উৎসাহের অন্তরাত্মা আলো বাতাস জলের অভাবে ছটফট করছিল, তাই এসে পড়লুম একদিন।"

এই ধরনের উচ্চাঙ্গের কথার প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য নবকিশোরের ছিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া নত-নয়নে কার্পেটের আসনটাই দেখিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে নির্বাক্ হইয়া গেল সে। পিঁড়িতে উপর বসিয়া আছে প্রৌঢ়া নয় একজন ষোড়শী যুবতী, চোখের তারা অতল কালো, মুখে প্রসন্ন মৃদু হাসি, সর্বাঙ্গে অপূর্ব লাবণ্য-লীলা। নবকিশোরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"কে, কে আপনি!"

সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শী অন্তর্ধান করিল, পলিতকেশা ভৈরবী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি সামান্য মানুষ বাবা। আমার মানুষ-আমিকে আড়াল করে মাঝে মাঝে আমার সাধনার সিদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে আমার অজ্ঞাতসারে। অনেক সময় আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কিছু দেখলে না কি।"

"দেখলাম আর একজন বসে আছেন আপনার জায়গায়। অপরূপ সুন্দরী—"

"হ্যাঁ ওই। ওই মাঝে মাঝে এসে আমাকে আড়াল করে ফেলে। আমাকে অপ্রস্তুত করে দেয়। আমি যা নই লোকে আমাকে তাই মনে করে।"

"আমি এখনি যাকে দেখলাম আপনি তা নন?"

"না। আমি যা হতে চাই তাই!"

নবকিশোর লক্ষ্য করিল প্রৌঢ়া ভৈরবীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে আকুলতা ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। নবকিশোরের মনে হইল সে দৃষ্টি যেন ঘরের কোথাও নিবদ্ধ নহে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করিয়া তাহা কোন্ মহাশূন্যে যেন কি অন্বেষণ করিতেছে। নবকিশোর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা সরিল না। একটু যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। ভৈরবীই কথা কহিলেন আবার।

তোমাকে একটা অনুরোধ করছি বাবা। যা দেখলে তা কাউকে বোলো না। উৎসাহ শুনলে খুব রাগারাগি করবে। ও সব দেখালে থাকে না জানি। আমি সব সময় দেখাতেও চাই না, আপনি এসে পড়ে। বিরাট পণ্ডিতের বাড়িতে যখন ছিলাম তখন এই বুড়ীটাকে আড়াল করে ওইটেই সর্বক্ষণ ছিল, তাই গোলমালেরও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ও বাড়িতে এক উৎসাহ ছাড়া কেউ চেনেনি আমাকে। আমাকে আড়াল করে আমার সিদ্ধি বড় হয়ে উঠুক তা ও চায় না। ও বলে আমি মানুষটাকে চাই। তার ডিগ্রীটা তাকে আড়াল করে ফেলবে, তার বাইরের পোশাকটা তাকে ঢেকে ফেলবে—এ আমি মোটেই চাই না। তুমি বড় ডিগ্রী পেয়েছ, সেটা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ। কিন্তু বাবা এ তো কাগজের উপর লেখা ডিগ্রী নয় যে সিন্দুকে বন্ধ

করে রাখলেই আড়ালে থাকবে। সিন্দুকেই বদ্ধ করে রেখেছি, তবু মাঝে মাঝে ও বেরিয়ে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর এটাও ঠিক মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছেও হয় ও বেরিয়ে আসুক, হাজার হোক মেয়েমানুষ তো, নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে ইচ্ছে করে বই কি। এ দুর্বলতাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি বাবা। উৎসাহকে তুমি কিছু বোলো না। বড্ড বকাবকি করবে। তুমি উৎসাহকে নিতে এসেছ, কিন্তু ও কি যাবে, ও প্রাইভেট টিউশনি করবে বলে ক্ষেপেছে, কিন্তু দাসত্ব করতে করতে কি কোনও বড় কাজ করা যায়, তুমিই বল—"

"বিরাট পণ্ডিতের কাছে ফিরে যাওয়াই ওর পক্ষে ভালো। এখানে থাকলে আপনার জপ-টপের বিঘ্ন হবে—"

"তা হবে না। এ পথে ও আমার সহায়, বিঘ্ন নয়। বিশুদ্ধচরিত্র কি না, অসীম মনের বল, অসাধারণ ধৈর্য। সাধনার পথে থাকলে ও খুব বড় তপস্বী হতে পারত, কিন্তু ও এ পথে থাকবে না, নিয়তি ওকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। ও মহীরুহ, কিন্তু ঝড় আশঙ্কা করছি। দেখ, তুমি বুঝিয়ে যদি ওকে ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পার, ও যদি যায় আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি জানি ও জায়গাও ওর পক্ষে শুভ নয়—"

নবকিশোর একটু হাসিয়া বলিল, "বিরাট পণ্ডিত মশাই নিজেকে তো তীর্থ বলেন, আর এদের বলেন তীর্থের কাক—"

"উনি নিজেই একটি কাক। ভূশুণ্ডী কাক। অদ্ভুত প্রতিভা, যেন দশ-ফলা ছুরি, প্রত্যেক ফলাটাই চকচক করছে। কিন্তু সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লালসা আর অহঙ্কারের জন্য। ওঁর মেয়ে জরিও প্রতিভাময়ী কন্যা। ও ইচ্ছে করলে অসাধ্যসাধন করতে পারে। কিন্তু থাকতে পারল না বাপের কাছে। ছিটকে চলে গেল। তন্ত্রের খুব ভালো একটা বই দিয়েছিলাম ওকে, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছিল বইটা। ইজিপ্ট দেশেও একরকম তন্ত্র আছে, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে তার ফরাসী অনুবাদ যোগাড় করে এনেছিল, আমাকে মাঝে মাঝে শোনাতো। সোজা মেয়ে! তিন চারটে ভাষা জানে—"

"ও কোথা গেছে, আপনি জানতে পেরেছেন নিশ্চয়—"

"ও এখনও কোথাও গিয়ে পৌঁছয়নি। নদী-প্রান্তর পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছে এখনও। কোথাও থামেনি, কেবল চলছে—ও আর ফিরবে না।"

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

"উৎসাহ আসছে—"

উৎসাহ একটা খাবারের ঝুড়ি হস্তে প্রবেশ করিল।

"এই যে। আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে সব? কেন এখানে এলাম, কি করে এলাম, আপনি যে আসছেন তা আগে থাকতে কি করে জানতে পারলাম এসব বিষয়ে আবছা আর কিছু নেই তো!"

নবকিশোর স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল। কোনও জবাব দিল না।

ভৈরবী প্রশ্ন করিলেন—"কি খাবার পেলে?"

"হিংয়ের কচুরি, মোগলাই পরোটা আর আলুর দম। চমচমও এনেছি কিছু।"

"নিজের জন্যেও এনেছ তো? তুমি তো আমার সঙ্গে একবেলা হবিষ্যান্ন খাচ্ছ খালি—"

"তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে। তোফা আছি।"

নবকিশোর সঙ্কোচবোধ করিতেছিল।

বলিল, "এত রাত্রে আমার জন্যে খাবার আনতে আপনি চিৎপুরে ছুটেছিলেন এতে ভারি খারাপ লাগছে।"

"ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব? ভৈরবী মা সন্ন্যাসিনী হলেও ভদ্রতাবোধ-বিবর্জিতা নন। তাছাড়া তিনি মা। সুতরাং আমাকে ছুটতে হল। আপনি সঙ্কোচ করবেন না। ওটা সহ্য করব না। ভুলে যাবেন না সঙ্কোচ বিনয় নয়, ওটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ!"

ভৈরবী হাসিয়া বলিলেন—"শুনলে তো! ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না। যাও তোমরা ওঘরে গিয়ে খাও, ওখানে টেবিল চেয়ার কুঁজো কাচের গ্লাশ সব আছে।"

"তাই চলুন। ওঘরে আপ-টু-ডেট সব ব্যাপার আছে, মায় অ্যাশ্‌ট্রে পর্যন্ত। মা ভেবেছিলেন যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি তখন সিগারেট খেতে শিখেছি নিশ্চয়—এসে দেখি সব আনিয়ে রেখেছেন।"

"না, না বাবা। সব এনেছে রাজু, আমার ঝি, ওই যাকে দেখলে একটু আগে। তাকে বলেছিলাম একজন ডাক্তারবাবু আসবেন, তাঁর জন্যে দক্ষিণদিকের ঘরটা ঠিক করে রাখ। সে-ই সব কেনা-কাটা করেছে। কি এনেছে না এনেছে আমি দেখিওনি। যাও তোমরা খেয়ে নাও, আর রাত কোরো না।"

খাইতে খাইতে উৎসাহ প্রশ্ন করিল—"ভৈরবী আগে থাকতেই সব জানতে পারেন। আমি যে এখানে আসব তা আগে থাকতে জানতে পেরেছিলেন, আপনি যে আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসছেন তাও জানতে পেরেছিলেন। উনি সর্বজ্ঞ। এইবার বিরাট পণ্ডিতের ব্যাপারটা আমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ করে দিন তো।"

"আপনি জরি দুজনেই চলে আসাতে তিনি বড্ড অসহায় হয়ে পড়েছেন। বললেন—"

"জরি হাসপাতালে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। দেখবেন?"

টেবিলের ড্রায়ার খুলিয়া সে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল।

জরি লিখিয়াছে—

উচ্ছে,

নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম যার সঙ্গে আমার বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে, যাকে ঘিরে প্রেম ঘৃণা স্বপ্ন বাস্তব মেঘের মতো এসেছে আর ভেসে গেছে। আমিও ভেসে যাচ্ছি। যে ভৈরবী মার সন্ধানে তুমি তারাপিঠে গিয়েছিলে এবং যেখানে থেকে ফিরবার সময় তোমার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, সেই ভৈরবী মা ফিরেছেন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তুমি যে মৃত্যুর কবলে পড়বে তা তিনি জানতেন, তুমি যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে তাও তিনি জানেন। বউবাজারের সেই গলিতে সেই পুরোনো ঠিকানায় তিনি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন বললেন। আমি জানি এ প্রতীক্ষার মর্যাদা তুমি দেবে। তোমার শৈশবের সাথী আমি একটি অনুরোধ শুধু করে যাচ্ছি, ডুবে যেও না, মাথা উঁচু করে ভেসে থেকো। মেডিকেল কলেজের পড়াটা শেষ কোরো। শ্মশান ভৈরবী চোখ-ধাঁধানো আলো, সে আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি বটে, কিন্তু তাঁর মহিমাকে অস্বীকার করছি না। স্বীকার করছি যে আলোয় তিনি জ্যোতির্ময়ী তা দুরূহ তপস্যার আশ্চর্য প্রকাশ। তোমার বন্ধু নবকিশোরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর লোক, কিন্তু চমৎকার। ওঁর সঙ্গ ছেড়ো না। জেঠুকে ছেড়ে চলে আসতে বড় কষ্ট হল। ছেড়ে এলাম কারণ এখানে থাকলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। উদ্দেশ্যটা কি তা ব্যক্ত করলে তোমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। তাই সেটা আপাতত উহ্য থাক। জেঠুর সঙ্গে তোমার বনছে না জানি, কিন্তু জেঠুকে ত্যাগ কোরো না। তাঁর ছোট বড় নানা দোষ আছে, কিন্তু খানা-খন্দ কঙ্কর-কণ্টক দেখে পর্বতের বিচার করা হাস্যকর। বিরাটেশ্বর শর্মা পর্বত। তুমি চলে গেলেও তিনি পর্বত থাকবেন। অন্য কেউ হয়তো সেখানে এসে ঘর বাঁধবে, তীর্থের কাকের অভাব হবে না কখনও। তুমিই তোমার আশ্রয়টুকু হারাবে। তাঁর চূড়ায় যদি উঠতে পার অনেক বড় দিগন্ত দেখতে পাবে। মেডিকেল কলেজে ছেলেদের কমন-রুমে বসে এই চিঠি লিখলাম। তোমার সঙ্গে দেখা তো হল না। এই চিঠিটা তোমার নার্সকে দিয়ে যাব। দেখা হলে এর চেয়ে বেশী আর কিই বা বলতাম। তবু মনে হচ্ছে দেখা হলে হয়তো আরও একটু কিছু হত যা হল না। কিন্তু কি আর করা যাবে। এইখানেই থামি। ইচ্ছে করেই ভালবাসা জানালাম না।—ইতি

জরি

চিঠি পড়িয়া নবকিশোর কয়েকমুহূর্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবেন ঠিক করেছেন।"

"ঠিক করিনি এখনও কিছু। এ-ও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ঠিক করতে পারবও না বোধ হয়। নিজের কাছে ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে না। বিরাট পণ্ডিতের বিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসে, ভৈরবী মার ব্যক্তিত্বে দম বন্ধ হয় না, কিন্তু দিশাহারা করে দেয়। মনে হয় ভুল পথে চলছি, জীবনের আসল লক্ষ্য যদি মোক্ষ হয় তাহলে ডাক্তারি পড়া অর্থহীন। ভৈরবী মা বলছেন ওই মেডিকেল কলেজের আবহাওয়াই না কি আমার পক্ষে অশুভ। অথচ কি যে করা উচিত তাও খুলে বলছেন না। একটা মন্ত্র দিয়েছেন। বলছেন ওইটেই কেবল জপ কর রোজ সকাল সন্ধ্যা। দশ বছর পরে অন্য রাস্তা দেখাবেন। কিন্তু এ দশ বছর আমি করি কি। ভৈরবী মা বলছেন, 'তোমার ভাগ্যই সেটা ঠিক করে দেবে। তুমি যদি বিরাট পণ্ডিতের কাছে না ফিরে যেতে চাও, এখানে থাকতে পার। এখানে তোমার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি এখানে থাকব না। কামরূপে আমার গুরুদেব আছেন, তিনি ডেকেছেন আমাকে। সেখানেই আমি যাব।' এ বাড়ির মালিক ভৈরবী মার একজন গুরুভাই। তিনি ভৈরবী মাকেই এ বাড়িটা দিয়েছেন থাকবার জন্যে। কিন্তু ভৈরবী মার অবর্তমানে আমাকে থাকতে দেবেন কি না তার তো ঠিক নেই। সুতরাং ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে না। আপনার মেসে 'সীট' পাওয়া যাবে একটা?"

"আমার মেসে সীট খালি নেই। খুঁজলে অন্য মেসে সীট হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি বিরাট পণ্ডিত মশায়ের আশ্রয় ছাড়বেন কেন।"

"অক্টোপাসকে জড়িয়ে থাকা যাবে না। ছেলেবেলায় ওঁর অনেক মার সহ্য করেছি, এ বয়সে আর পারব না। নিজের স্বাধীনতাকে—"

"পণ্ডিতমশায় কিন্তু একটা কথা বলে পাঠিয়েছেন। আপনার স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। এমন কি আপনি যদি প্রবালের আংটি না-ও পরেন, আপত্তি করবেন না তিনি।

আপনি মেডিকেল কলেজের পড়াটা শেষ করুন, এইটেই তাঁর ইচ্ছে। জরি চলে গেছে, আপনিও যদি তাঁকে ছেড়ে আসেন তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা বড়ই মর্মান্তিক হবে। আপনাদের তিনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, যতদুর জানি আপনারা ছাড়া তাঁর আপন লোক কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে মতে মিলছে না বলে তাঁকে ছেড়ে চলে আসাটা কি উচিত হবে। তিনি আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে বড় কষ্ট হল।"

"কিন্তু ভৈরবী মা বলছেন ওঁর প্রভাব না কি আমার পক্ষে শুভ নয়।"

"হতে পারে। কিন্তু ধরুন যদি উনি আপনার বাবা হতেন আর ওঁর যদি কুষ্ঠ থাকত তাহলে কি আপনি ওঁকে ছেড়ে চলে আসতেন? আসাটা কি উচিত হত! আপনি কি ওঁকে একটুও ভালবাসেন না?"

"সমুদ্রকে কেউ গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার কি একটুও জল নেই? তাহলে তা যেমন হাস্যকর হয় আপনার এই প্রশ্নটাও তেমনি হাস্যকর মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এইবার? ওঁকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে ভালবাসি না। But he is so terrible, so deep, so fathomless (কিন্তু উনি এমন ভয়ঙ্কর, এমন গভীর, এমন অতল) যে ভয়ও করে। উনিও তো আমার গুরু। আমাকে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, অঙ্ক, বায়োলজি সব পড়িয়েছেন। গুরুমশায়ের মতো বেত হাতে নিয়ে পড়িয়েছেন। এই সেদিনও আকাশে মঘা নক্ষত্র দেখাতে পারিনি বলে কান মলে দিয়েছেন আমার। আমাকে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফারমাকোলজি পড়াবেন বলে বই কিনে পড়াশোনা আরম্ভ করেছেন নিজে। একটু বেচাল হলে এ বয়সেও মার-ধোর করেন। তাঁকে না বলে তারাপীঠে চলে গিয়েছিলাম ভৈরবী মার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, তারপরই মোটর অ্যাকসিডেন্ট হল। এর পর তাঁর কাছে ফিরে গেলে যে কি দুর্গতি কপালে নাচছে কে জানে—"

"কিছু হবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, তিনি আপনার জন্যে জেগে বসে আছেন।"

উৎসাহ টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারিয়া বলিল, "আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন কিছু হবে না?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ চলুন তাহলে। ভৈরব মাকে বলে দি। জিনিসপত্র কিছু নেই। একবস্ত্রে এসেছিলাম। ভৈরবী মা কাপড় গামছা কিনে দিয়েছিলেন অবশ্য। সেগুলো এখানে থাক। আসুন—"

তাহারা পাশের ঘরে গিয়া দেখিল ভৈরবী মা নাই। সেই চাকরানীটা বসিয়া আছে।

"মা কোথা গেলেন—"

"তিনি তো নেবে চলে গেলেন।"

"কোথায়।"

"তা তো জানি না। ত্রিশূলটা নিয়ে নেবে গেলেন।"

"তাই না কি!"

নবকিশোর আশা করিয়াছিল একটা ট্যাক্সি পাইয়া যাইবে। কিন্তু পাওয়া গেল না। কিছুদূর হাঁটিয়া একটা রিক্শা পাওয়া গেল। তাহাতেই চড়িয়া বসিল তাহারা। উৎসাহ নজর রাখিতে লাগিল রাস্তায় কোথাও যদি ভৈরবী মার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখা গেল না।

নবকিশোর বলিল, "আশ্চর্য তো, কোথায় চলে গেলেন উনি—"

"আমার পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বোধহয়। আর হয়তো দেখাই হবে না।"

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল বউবাজারের মোড়ে। ট্যাক্সিতে বসিয়া উৎসাহ বলিল, "আমার কিন্তু ভয় করছে নবকিশোরবাবু। কি যে হবে কে জানে।"

"কি আবার হবে।"

"আপনি বিরাট পণ্ডিতকে চেনেন না ভালো করে।"

ট্যাক্সি যখন মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে ঢুকিল তখন দুইজনেই ঠনঠনিয়ার কালীকে প্রণাম করিল। অতুলের দোকানের সামনে গিয়া নবকিশোর অবাক্ হইয়া গেল। অতুল তখন নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, দোকান খোলা। একটি সুদৃশ্য ধূপদানে ধূপ জ্বলিতেছে। নবকিশোর ট্যাক্সি থামাইয়া মুখ বাড়াইল।

"অতুলবাবু, আপনি এখনও এখানে?"

"আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি। উচ্ছে এল?"

"এই যে—"

উৎসাহ হাসিমুখে মুণ্ডু বাড়াইল।

"ওদিকের খবর কি।"

"জানি না। গাঁট্টা সাধারণত দশটার পর পান খেতে আসে। আজ আসেনি, এলে খবর পেতুম।"

"চল—"

ট্যাক্সি বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড়াইতেই খট করিয়া ভিতরের ছিটকিনিটা খুলিয়া গেল। কপাটটাও খুলিয়া গেল তাহার পর। কিন্তু কপাটের সামনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইল না। ভাড়া লইয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। খোলা কপাটের সামনে উৎসাহ আর নবকিশোর দাঁড়াইয়া রহিল কয়েকমুহূর্ত। দেখা গেল ঘরের ভিতরে আলো জ্বালিতেছে।

"আসুন—"

নবকিশোরই প্রথমে আগাইয়া গেল।

"হাঁ, চলুন।"

উৎসাহই ঘরের ভিতরে প্রথমে ঢুকিল। তাহার পিছু পিছু নবকিশোর। বিরাট পণ্ডিত স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বড বড় চোখ দুইটা জ্বলিতেছিল। মনে হইতেছিল কোনো হিংস্র শ্বাপদ যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে। উৎসাহ ঘরে ঢুকিতেই তিনি লাফাইয়া আগাইয়া আসিলেন এবং তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া বলিলেন, "রাসকেল, আমাকে বুড়ো বয়স পর্যন্ত তুমি জ্বালাবে। ভেবেছ কি তুমি—।"

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহাকে চড়াইতে লাগিলেন।

"চাবকে আজ তোমার পিঠের ছাল ছাড়িয়ে ফেলব আমি।"

হয়তো ইহার পর তিনি চাবুকই বাহির করিতেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত এবং ভয়ঙ্কর। প্রকাণ্ড একটা গোক্ষুর সর্প হঠাৎ কোথা হইতে যেন মন্ত্রবলে, আবির্ভূত হইল এবং বিশাল ফণা তুলিয়া বিরাট পণ্ডিত ও উৎসাহের মাঝে দাঁড়াইয়া দুলিতে

লাগিল। বিরাট পণ্ডিতকে দুই একবার ছোবল মারিবারও চেষ্টা করিল সে। ভাবটা যেন—খবরদার ফের যদি মার, তোমাকে শেষ করিয়া দিব। বিরাট পণ্ডিতের অদ্ভুত পরিবর্তন হইল। তিনি সভয়ে পিছাইয়া গেলেন এবং হাতজোড় করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। নবকিশোর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল লাঠি সংগ্রহ করিবার জন্য। এইটাই তাহার সর্বপ্রথম মাথায় আসিল। বাহির হইয়া কিন্তু কোনো-কিছু তাহার চোখে পড়িল না। তখন সে অতুলের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল তাহাকে। তাহার পাশ দিয়াই বিরাট সাপটা সন্ সন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এত বড় সাপ সে কখনও দেখে নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মনে হইল উহাদের কাহাকেও কামড়ায় নাই তো। আবার সে দ্রুতপদে ফিরিতে লাগিল। গিয়া দেখিল বিরাট পণ্ডিত বসিয়া আছেন এবং উৎসাহ তাঁহার দুই পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কক্ষনো আপনার অমতে কিছু করব না। আমাকে আপনি দয়া করুন, দয়া করুন।"

বিরাট পণ্ডিত নির্বাক। তাঁহার চোখ দিয়াও দরদরধারে অশ্রু ঝরিতেছে। হঠাৎ তিনি দুই হাত দিয়া নিজেকেই চড়াইতে লাগিলেন।

"আমার কামের, ক্রোধের, লোভের শাস্তি আমি নিজেই নিজেকে দিচ্ছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই আমাকে করতে হবে। মহাপুরুষ, আসুন, এগিয়ে আসুন, আপনার পায়ের ধুলো দিন আমাকে। তীর্থের কাকের মুক্তি হোক—"

নবকিশোর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বিরাট পণ্ডিতের হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিল।

"ছি, ছি, কি করছেন আপনি। থামুন। উৎসাহবাবু উঠে বসুন আপনি। এসব কি কাণ্ড।"

উৎসাহ চেয়ারটায় উঠিয়া বসিল এবং নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। বিরাট পণ্ডিত কিন্তু দুই চোখ মুদিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল।

"মহাপুরুষ, আজ বড় শুভদিন। আপনি আমাদের আপন লোক হয়ে গেলেন। আমরা যেখানে দুর্বল, যেখানে অপরিচ্ছন্ন, যেখানে আতুর, অসহায় সেই ঘনিষ্ঠলোকে আজ পেলাম আপনাকে। আপনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন না। বসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন—"

যে কথাটা নবকিশোরের মনে সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই সে এইবার বলিল।

"অত বড় সাপটা এখানে এল কি করে? আপনাদের কাউকে কামড়ায়-টামড়ায় নি তো? দেখলাম গলি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

"ও আপনিও দেখেছেন বুঝি"—বিরাট পণ্ডিতের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল—"হ্যাঁ, ভয় পাবারই কথা বটে। কিন্তু ওটা আসল সাপ নয়। ওটা—"

বিরাট পণ্ডিত কথা শেষ করিলেন না, হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন।

"কি ওটা—"

"ওটা মানে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান দিয়ে ওটার ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। হয়তো আমার ক্রোধেই ওই মূর্তি ধরে আমাকে শাসন করে গেল, কিংবা হয়তো—থাক—ওসব ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। তবে ওটাকে দেখে আমি আত্মস্থ হয়েছি। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে দিন ওর কোনও কাজে আমি আর বাধা দেব না। বাধা

দিয়েছি ওর ভালোর জন্যই, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি ও বড় হয়েছে, নিজের ভালোমন্দ কিসে হয় তা ও নিজেই ঠিক করুক। আমার কাছে যদি না থাকতে চায় তাতেও আমার আপত্তি নেই। জরি তো চলেই গেল। ও যদি যেতে চায় যাক। চরের উপর উপুড়-হয়ে পড়ে-থাকা ভাঙা নৌকো দেখেছেন? আমার অবস্থা অনেকটা সেইরকম। অনেক যাত্রী পার হয়েছে আমার উপর চড়ে, এখন যদি তারা আমার দিকে ফিরে না চায়, বলবার কিছু নেই। এই নিয়ম!"

উৎসাহ এতক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলিয়া প্রদীপ্ত চক্ষে অকম্পিত কণ্ঠে কহিল—"প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনি যা বলবেন তা আমি এবার থেকে নির্বিচারে পালন করব। আমি নিজের মতে চলতে চেষ্টা করে অন্যায় করেছিলাম সেটা এখন বুঝতে পেরেছি—"

বিরাট পণ্ডিতের চোখে মুখে আনন্দের একটা জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—"একটা লোহার শক্ত শিক কেঁচোর মতো নাত্পেতে হয়ে যাক তা আমি চাই না, যদিও পাগলা ঘোড়ার মতো বনে-জঙ্গলে অপথে-বিপথে ছুটোছুটি করে বেড়ানোটাও ভালো নয়—"

উৎসাহ বলিল—"কি ভালো কি মন্দ তা আপনিই ঠিক করে দেবেন এবার থেকে। আপনার আদেশ আমি নির্বিচারে পালন করব।"

নবকিশোর তখনও দাঁড়াইয়া ছিল।

"মহাপুরুষ, আপনি দাঁড়াইয়া রইলেন যে! বসুন।"

"আমি এবার মেসে ফিরব। রাত অনেক হয়েছে। আর বসব না এখন।"

"ও, হ্যাঁ, তা বটে। উচ্ছের কথাটা শুনে রাখুন। বলছে ও এবার থেকে আমার কথা শুনে চলবে। আপনি সাক্ষী রইলেন।"

"ওর কথা অবিশ্বাস করছেন কেন। যখন বলেছে—"

"ওকে চিনি যে। ও একটি মানুষ-হাউই। এমনি বেশ আছে, কিন্তু বারুদে আগুন ধরে গেলে, 'হুস্' করে কোথায় যে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই। নির্জীব হাউই হলে আর ফিরত না, অস্কার ওয়াইলডের গল্পের হাউইয়ের মতো কোনও পচা ডোবায় পড়ে থাকত। সজীব বলে ফিরে এসেছে। দেখা যাক।"

নবকিশোর উৎসাহের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে প্রস্তর-মূর্তিবৎ বসিয়া আছে।

"আমি তাহলে চলি এখন।"

"এত রাত্রে কি করে যাবে?"

"পেয়ে যাব কিছু একটা। না হয় হেঁটেই চলে যাব। বেশী দূর তো নয়।"

নবকিশোর যাইবার পূর্বে বিরাট পণ্ডিতকে প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু তিনি 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন।

"করেন কি, করেন কি! আপনার যা পরিচয় পাচ্ছি তাতে আমারই উচিত আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া। আমি প্রথম দর্শনেই চিনেছিলাম আপনাকে। না—না।"

উৎসাহের দিকে ফিরিয়া নবকিশোর বলিল—"চললুম এখন। কাল কলেজে দেখা হবে।"

অতুল তখনও জাগিয়া দোকানে বসিয়া ছিল।

"কি হল?"

"যা হল তা আশ্চর্য কাণ্ড। বিরাট পণ্ডিত উৎসাহের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলেন—"

"হ্যাঁ, ওঁর হাত খুব চলে। আমিও ওঁর হাতে মার খেয়েছি। জরিও খেয়েছে। তারপর ভাব হয়ে গেল তো?"

"হ্যাঁ। উনি কাঁদতে লাগলেন, উৎসাহও কাঁদতে লাগল। শেষে উনি নিজের গালে নিজেই চড় মারতে লাগলেন! হ্যাঁ, আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের মাঝখানে। আমি তো আপনার কাছে ছুটে আসছিলাম লাঠির খোঁজে, এমন সময় সাপটা বেরিয়ে গেল।"

অতুল বিস্মিত হইল না। তাহার চক্ষু দুইটি কৌতুক-হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কেবল। সে শুধু বলিল—"বিরাট পণ্ডিতের বিরাট কাণ্ডকারখানা। ওর রহস্য ভেদ করা আমাদের কর্ম নয়। একটু আগে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। দেখবেন?"

"কি—"

"দেখুন—"

অতুল তাহার ছোট কাঠের বাক্সটি খুলিয়া একটি মীনাকরা রূপোর কৌটা বাহির করিল।

"খুলে দেখুন—"

নবকিশোর খুলিয়া দেখিল তাহার ভিতর একগোছা চুল রহিয়াছে।

"কি এ? কার চুল?"

"জরিদির বোধহয়। একটু আগে সুখদেও এসে দিয়ে গেল। এই কৌটোটা গত বছর আমি আমি জরিদিকে দিয়েছিলাম তার জন্মদিনে। সেইটের ভিতরই খানিকটা চুল পুরে ফেরত পাঠিয়েছেন। মনে পড়েছে আমি একদিন ওঁর চুলের প্রশংসা করেছিলাম।"

"সুখদেও ফিরে এসেছে? কি বললে সে? জরি কোথায় এখন?"

"তা সে জানে না। তার হাত ফসকে পাখি উড়ে গেছে। বললে, আমি ঘুমিয়েছিলাম, বেটি চুপসে উঠে কোথা চলে গেল। অনেক খুঁজলাম, পাত্তা করতে পারলাম না। ডিব্‌বাটা আমায় দিনের বেলাতেই দিয়েছিল, বলেছিল অতুলবাবুকে দিয়ে দিও যখন ফিরে যাবে। তখন আন্দাজ করতে পারিনি ও ভাগবার মতলবে আছে। তারপর তার মাতৃভাষায় বলল—হদ্ কিয়া। সুখদেও একটা অদ্ভুত ক্যারেকটার।"

"কোথায় ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে?"

"শ্রীরামপুর পর্যন্ত ওরা নৌকোয় গিয়েছিল। সেখানে নৌকো ছেড়ে দিয়ে স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ছিল। সেই ওয়েটিং রুম থেকেই জরিদি অন্তর্ধান করেছে।"

নবকিশোর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন আশা ছিল সুখনের সহিত জরি আবার ফিরিয়া আসিবে।

"আমি চলি তাহলে। অনেক রাত হল। আচ্ছা, এ অঞ্চলে কাছেপিঠে কোনও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে।"

"এখন ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু—"

"কেন—"

"দাঁড়ান না। আসুন। এইটেই আজকের লাস্ট পানের খিলি। চলুন, আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

"আপনি? আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন।"

"কষ্ট হবে না। গাড়ি আছে—"

অতুল দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল।

"আসুন, এই পাশের গলিতেই গারাজ—

পাশের গলিতে ঢুকিয়া অতুল গারাজ হইতে নতুন একটি মোটর গাড়ি বাহির করিয়া ফেলিল।

"চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার আস্তানাটাও দেখে আসব।"

"কার গাড়ি?"

অতুল মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনারই। কোন্ দিকে যাব—"

"কলেজ স্কোয়ার। মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার মেস।"

ফাঁকা রাস্তা। নবকিশোর দেখিল অতুল সুদক্ষ ড্রাইভারও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি তাহার মেসের সামনে আসিয়া থামিল। নবকিশোর নামিয়া পড়িল।

"নমস্কার।"

"নমস্কার। অদ্ভুত সেকেলে লোক তো আপনি।"

"কেন।"

"ধন্যবাদ তো দিলেন না!

মুচকি হাসিয়া নবকিশোর মেসের দিকে অগ্রসর হইল। অতুলের মোটর সার্কুলার রোডের দিকে চলিয়া গেল। মেসে কপাটের কড়া নাড়িতেই মিঠ্ঠু সঙ্গে সঙ্গে কপাটটা খুলিয়া দিয়া একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিল। মেসে ঢুকিবার পথটা অন্ধকার।

"এই কি আপনার একটু পরে ফেরা? কটা বেজেছে জানেন? তিনটে। আমি জেগে কেবল ঘড়ির ঘণ্টা অগুনে যাচ্ছি!"

নবকিশোর কোনও উত্তর দিল না। কেবল এক নজর মিঠ্ঠুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। থলথলে ভারী মুখটায় প্রচ্ছন্ন হাস্য উঁকি দিতেছে। নিশ্চিন্ত হইল সে। মিঠ্ঠু চটিলেই মুশকিল। মেসের সে-ই কর্ণধার। সে কিন্তু চটে না। নিতাইবাবু মাঝে মাঝে মদ খাইয়া আসিয়া মাতলামি করেন, যোগেন প্রায়ই মুখ খারাপ করিয়া গালাগালি দেয়, রজনীবাবু ধারে খাবার আনাইয়া পয়সা শোধ করেন না, বিলাসবাবু কোথায় কখন কি ফেলেন মনে থাকে না। এবং চাকর ঠাকুরকে চোর বলিয়া সন্দেহ করেন। মিঠ্ঠু কিন্তু চটে না। হাসিমুখে সে এই দুরন্ত দামাল উদীয়মান ডাক্তারদের সব দৌরাত্ম্য সহ্য করে।

"চা খাবেন? টিনে দুধ আছে একটু—"

"না—"

নবকিশোরের মনে হইল মিঠ্টুর সহিত সুখনের যেন সাদৃশ্য আছে। যোগেন উলঙ্গ হইয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। ঘুমের সময় তাহার কোমরে কাপড় থাকে না। ঘুম কিন্তু সজাগ। নবকিশোরের পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। রক্তচক্ষু মেলিয়া সহাস্যবদনে সে বলিল—"ও নবু! রাধিকার খবর কি।"

"রাধিকার খবর মানে?"

"অভিসারে বেরিয়েছিলে তো!"

"আরে না, না। দরকারি কাজে বেরিয়েছিলুম—"

"ও!"

যোগেন আর কিছু না বলিয়া কাপড়টা কোমরে একটু জড়াইয়া লইল এবং পাশ ফিরিয়া পুনরায় নাসিকাগর্জন শুরু করিল।

।। নয় ।।

পরদিন ঠিক সাতটার সময় অধ্যাপক হরিকিশোর মুখোপাধ্যায় পত্নী শ্রবণার সহিত নবকিশোরের মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটি বড় রুই মাছ, এক হাঁড়ি সন্দেশ এবং এক কড়াই দই। নবকিশোর দাদার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিল। প্রণাম করিয়া বলিল, "কাল দেখা হয়নি, আমি একটু দরকারে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। মাছ-টাছ এনেছেন কেন!"

"তোমরা সবাই খাবে।"

হরিকিশোরবাবু ঈষৎ হাসিয়া একটু অপ্রতিভভাবেই কথাগুলি বলিলেন যোগেনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া। যোগেন নিজের টেবিলের উপর একটা ছোট ফাটা আয়নার সামনে বসিয়ে মুখভঙ্গী সহকারে দাড়ি কামাইতেছিল। কোনো নোটিশ না দিয়া নবুর বন্ধুদের সম্মুখে এই সব ভোজ্যবস্তু এভাবে নিক্ষেপ করা হয়তো ঐশ্বর্য আস্ফালনের মতো দেখাইতেছে এই কথাটা মনে হওয়াতে হরিকিশোরবাবু মনে মনে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন।

নবকিশোর যোগেনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

"আমার দাদা, বৌদি—"

যোগেন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আধ-কামানো অবস্থাতেই হেঁট হইয়া প্রণাম করিল তাঁহাদের।

"থাক থাক থাক—"

হরিকিশোরবাবু শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

শ্রবণা দেবী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "করুক না। ছোট ভাই তো সব। হঠাৎ এতগুলি দেওর পেয়ে খুব ভালো লাগছে, যদিও সকলের সঙ্গে আলাপ হয়নি এখনও। একটি শুভ সংবাদ এনেছি, তাই মাছ দই মিষ্টিও আনলাম। আগামী রবিবার ঠাকুরপোর বিয়ে। হরিশ মুখার্জি রোডে আমরা বাড়ি ভাড়া করেছি। সেখানেই হবে। বিয়ে অনেক আগে থাকতেই ঠিক হয়ে ছিল, উনি ছুটি পাচ্ছিলেন না, বাড়িও সুবিধামতন পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই দেরি হয়ে গেল—"

নবকিশোর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"আমাকে তো কিচ্ছু জানাননি।"

"তুমি তো জানই। নতুন করে আবার কি জানাব। ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এসেছি, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের দিও।"

শ্রবণা দেবী তাঁহার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া একগোছা রঙীন খাম বাহির বরিলেন। একটি যোগেনকে দিলেন, বাকিগুলি নবকিশোরকে।

যোগেন চিঠিটি পড়িল এবং মাছ, মিষ্টি, দই দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা বউদি, আপনি টের পেলেন কি করে বলুন তো।"

"কি টের পেলাম?"

"এই মেসে যে বারোটি রাক্ষস বাস করে এ খবর আপনাকে দিলে কে! এত এনেছেন!

শ্রবণা দেবীর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

বলিলেন, "আহা, কতই বা এনেছি। যাই হোক, তোমরা সব যেও।"

"নিশ্চয় যাব। কাকের মুখে খবর পেলেও যেতাম। আর একটা কথা, দেওর হিসাবে যদি কোনো ফরমাশ করতে চান বিনা দ্বিধায় করতে পারেন। আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।"

"কি ফরমাশ—"

"এই ধরুন, কেনা কাটা, ডেকোরেটারকে ডাকা, বাসনপত্র যোগাড় করা—ইন শর্ট ফপরদালালি করা—"

"না না, সে সব করতে হবে না তোমাদের। সে সবের জন্য আলাদা লোকই এনেছি আমরা। এঁর কয়েকজন ছাত্রও সে-সবের ভার নিয়েছে। তোমরা বরং দেখো বরযাত্রীদের যেন কোনও কষ্ট না হয়।"

"দেখব, নিশ্চয় দেখব।"

অধ্যাপক হরিকিশোর উদ্ভাসিত মুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মনের সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ-গুচ্ছকে প্লাবিত করিয়া যে প্রশান্ত হাস্য বিকীর্ণ হইতেছিল তাহা সত্যই অধ্যাপক-সুলভ। তিনি একটি কথা না বলিয়া একবার যোগেনের মুখের দিকে এবং আর একবার শ্রবণার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। যদিও তিনি 'বটানি'র প্রফেসর তবু কত ধানে কত চাল হয় তাহা তিনি জানেন না। যিনি জানেন, যিনি তাঁহার সংসার-তরণীর কর্ণধার, তাঁহার আশ্চর্য নিপুণতাই তিনি যেন মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"রাবড়িটা আনা হয়নি তো—"

"রাবড়ির ফরমাশ দিয়েছিলে না কি।"

"দিয়েছিলাম। ভাগলপুরের কৈলাশ শ্যামবাজারে একটা দোকান করেছে। ভালো রাবড়ি দিতে পারবে বললে। তাকে সের দুই করে রাখতে বলেছিলাম।"

"আমাকে কিছু বলনি তো।"

"ভুলে গিয়েছিলাম। কাল প্রফেসর বোস এসে পড়লেন তো, কথায় কথায়—"

"তাহলে ঠাকুরাপো চলুক আমাদের সঙ্গে। নিয়ে আসবে ওটা—"

নবকিশোর বলিল—"আমার তো হাসপাতাল এখন। ওয়ার্ডে যেতে হবে—"

যোগেন বাধা দিল—"তুমি ভাল ছেলে, তুমি ওয়ার্ডে যাও। আমি যাচ্ছি বউদির সঙ্গে। আমার কাছে ওয়ার্ডে গিয়ে ভ্যারেন্ডা ভাজার চেয়ে রাবড়ি, বিশেষত দাদা বউদির দেওয়া রাবড়ি ঢের বেশী মূল্যবান। বউদি, আমি যাব আপনার সঙ্গে"—

প্রফেসর হরিকিশোর কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

"না, ক্লাস কামাই করা ঠিক নয়। আমরাই ফেরবার সময় দিয়ে যাব। আমরা এখন

ব্যারাকপুর যাচ্ছি। এগারোটা নাগাদ ফিরব। কটার সময় খাও তোমরা?”

“বারোটার আগে নয়—”

“তার আগে আমরা পৌঁছে যাব। এখন উঠি তাহলে—। নবু, তুমি একবার হরিশ মুখুজ্যে রোডে যেও সন্ধ্যাবেলা। দিদি, জেঠিমা, আর ভাগলপুরের অনেকে এসেছেন?”

“যাব। বুলু কোথা—তাকে সঙ্গে আনোনি?”

“তাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। সে কাকিমার জন্যে ব্লাউস তৈরি করছে।”

বুলু হরিকিশোরবাবুর একমাত্র কন্যা সন্তান। এলাহাবাদ কলেজে। আই. এ. পড়ে।

“এবার উঠি তাহলে—”

হরিকিশোরবাবু নিজের কাজেই আসিয়াছিলেন। নবকিশোর ও যোগেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিল। গাড়ি চলিয়া গেলে যোগেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, “তোমাদের গাড়ি?”

“হ্যা, দাদা বিলেত থেকে আসবার সময় কিনে এনেছিলেন।”

যোগেন নবকিশোরের পুরা পরিচয় জানিত না। গাড়ি দেখিয়া বুঝিল এই নিরীহ প্রকৃতির হাবা-গোবা গোছের ছেলেটি কেউ-কেটা নয়—শাঁসালো ব্যক্তি। যোগেন সেই প্রকৃতির লোক যাহারা ঐশ্বর্যের গন্ধ পাইলে সশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। নবকিশোরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা হইল।

“তোমাদের বাড়ি তো ভাগলপুরে?”

“হ্যা। সেখানে অবশ্য এখন কেউ নেই। দাদা এলাহাবাদে প্রফেসরি করেন। আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে আছেন রঘুনাথ ভেইয়া।”

“তিনি আবার কে—”

“তিনিই ওখানকার সর্বেসর্বা। দাদার সঙ্গে পড়েছিলেন কিছুদিন। তারপর পড়াশুনা ছেড়ে দেন। বিয়ে-টিয়ে করেননি। মস্ত বড় পালোয়ান, মস্ত বড় শিকারী। তিনিই আমাদের ভাগলপুরের বিষয়-আশয় দেখাশোনা করেন।”

“বাঃ বাঃ শুনে সুখী হলাম। হে উড্ বি (would be) ইন্দ্রজিৎ, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। চল এবার সন্দেশগুলো ধ্বংস করা যাক।”

দুইজনে উপরে উঠিয়া গেল।

।। দশ ।।

নবকিশোর কলেজে আসিয়া দেখিল ওয়ার্ডে হৈ হৈ কাণ্ড। অমৃতবাজার পত্রিকায় কে যেন বেনামীতে একটি চিঠি লিখিয়াছে যে বার্নাডো সাহেব না কি ঠিক সময়ে ওয়ার্ডে আসিয়া ছাত্রদের ক্লিনিকস্ দেন না, তিনি সমস্ত সকালটা প্র্যাকটিস করিয়াই কাটাইয়া দিতেছেন। ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত। বার্নাডো সাহেব নিজেই আসিয়া স্বমুখে খবরটি ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, আমাদের জীবন-মরণ লইয়া কারবার। আমরা সেজন্য সব সময়ে রুটিন বজায় রাখিতে পারি না, কারণ মরণ পূর্বাহ্নে সময় ঠিক করিয়া আসে না এবং মরণ দ্বারে হানা দিলেই আমাদের ডাক পড়ে। মরণকে ঠেকাইতে পারি বা না পারি আমাদের ছুটিয়া যাইতে হয়। এজন্যই রুটিন ঠিক রাখিতে

পারি না। ছাত্র-হিতৈষী ভদ্রলোকটি খবরের কাগজে চিঠি লিখিয়া আমার বিবেককে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন। কাল হইতে আমি ঠিক আটটায় সময় ওয়ার্ডে আসিব। ঠিক আটটায় সময় 'রোল কল' হইবে। যদি কোনও ছেলের আসিতে দেরি হয় সে আর সেদিনের 'পারসেনটেজ' পাইবে না। ইহার পর বার্নাডো সাহেব লিভারের নানারূপ অসুখ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। ওয়ার্ডে কয়েকটি লিভারের রোগী ছিল। বার্নাডো সাহেব চলিয়া যাইবার পর হৈ-চৈ শুরু হইল। বার্নডো সাহেবকে খোসামোদ করিতেন এরূপ ডাক্তারের অভাব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছাত্রদের খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "যে কাগজে চিঠি লিখেছ তার উচিত বার্নাডো সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। পিছনে থেকে কামড়ানো ভীরু কুকুরের কাজ। তার যদি মনুষ্যত্ব থাকে সে বার্নাডো সাহেবের কাছে ক্ষমা চাক। কে কাগজে ও চিঠি লিখেছে তা আমরা জানতে পারবই। লুকোনো কিছু থাকবে না। তখন কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।"

যোগেন হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমি লিখেছি সার। আপনি আমাকে বার্নাডো সাহেবের কাছে নিয়ে চলুন, দেখা যাক কি হয়।"

ডাক্তারটি থতমত খাইয়া গেলেন।

"তুমি লিখেছ? বিশ্বাস করলাম না। তুমি ভালো ছেলে।"

"আপনি তো একজনকে 'স্কেপ গোট' খাড়া করতে চান। আমাকেই করুন।"

ডাক্তারবাবুর চেহারা বদলাইয়া গেল। তিনি যোগেনের পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন—"কি যে পাগলামি কর। যাও যাও সব। বার্নাডো সাহেবকে চটিও না, বুঝলে—হি ইজ্ এ জিনিয়াস (he is a genius) ।

ইহার পর সকলে নীলমণির দোকানে গিয়া আড্ডা জমাইল।

সেখানে নবকিশোর দেখিল উৎসাহ এক কোণে বসিয়া চা খাইতেছে। তাহার হাতে প্রবালের আংটি। নবকিশোরকে দেখিয়া সে মুচকি হাসিল একটু।

বার্নাডো সাহেবের ব্যাপার লইয়াই সকলে আলোচনা করিতেছিল, কিন্তু নবকিশোর তাহাতে যোগ দেয় নাই। একটি কথাও বলে নাই সে। চায়ের কাপটি নামাইয়া রাখিয়া সে উৎসাহের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থ—চলুন বাইরে যাই।

বাহিরে গিয়া উৎসাহ বলিল, "আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। জেঠুর একটি পরিচিত লোক এসেছিল আজ আমাদের বাড়িতে। এক বছর আগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়। তখন ডাকাতদের লাঠিতে তার হাত ভাঙে। ওখানকার ডাক্তাররা চিকিৎসা করেছিল, কিছু হয়নি। জেঠু বললেন ওকে, নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে দেখাতে। ওকে এনেছি। এখন কি করতে হবে বলুন।"

"চলুন, সার্জিকাল আউটডোরে যাই। আগে ডাক্তার মুখার্জি ওঁকে দেখুন। তিনি যা বলবেন তাই হবে। প্রবালের আংটিটা পরেছেন দেখছি।"

"কাল তো বলেছি, জেঠুর আদেশ আর অমান্য করব না। জানেন? ভৈরবী মা কাল থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। রাত্রে ফেরেননি। সকালে খোঁজ করেছিলুম। ব্যাপারটা আমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ মনে হচ্ছে না।"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ। উনি ভারি অভিমানিনী। হয়তো আমি ওঁকে ছেড়ে চলে এলুম বলে—"

"না, না। উনি নিজেই তো বললেন উৎসাহ যদি যায় যাক, আমার আপত্তি নেই। উনি এখানে থাকবেনও না। কামরূপে যাবেন বললেন।"

"আমাকে তা বলেননি। চলুন।"

"এই নিন। বরযাত্রী যেতে হবে কিন্তু। পণ্ডিতমশাই আর অতুলবাবুর নিমন্ত্রণ-পত্রটা কি আপনার হাতে দিয়ে দেব?"

নবকিশোর কয়েকখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পকেটে করিয়া আনিয়াছিল। উৎসাহ নিমন্ত্রণ-পত্রটার দিকে চাহিয়া হাসিল।

"আপনাকে ট্রেনে প্রথম দিন দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল শিগগিরই আপনার বিয়ে হবে। সে কথা কিন্তু তখন বলিনি। বেশ, ও দুটো পত্রও আমাকে নাম লিখে দিয়ে দিন।"

"অতুলবাবুর পুরো নাম কি।"

"অতুলানন্দ বিশ্বাস। ওঁর সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয়েছে? পানের দোকান নিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু যেমন বিদ্বান তেমনি ধনী, তেমনি খেয়ালী। আশ্চর্য লোক উনি।"

"কিছু পরিচয় পেয়েছি।"

"চলুন এবার কোথায় যাবেন।"

"একটা কথা বলব।"

"বলুন—"

"বাইরের পোশাকটা এবার ছেড়ে ফেলা যাক। অনেকক্ষণ পরে আছি। আর 'আপনি' নয়, এবার থেকে তুমি।"

"তথাস্তু।"

সার্জিকাল আউটডোরে ডাক্তার মুখার্জী রামেশ্বর পাণ্ডের ভাঙা হাত দেখিয়া বলিলেন—"অপারেশন করে এ হাড় জুড়তে হবে। একে উইলসন্ সাহেবের ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিচ্ছি। সেখানেই নিয়ে যাও।"

ভর্তির কাগজখানি হাতে লইয়া তাহারা সার্জিকাল আউটডোর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রামেশ্বর পাণ্ডে তাগড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। তাঁহার হাতটাই খালি ভাঙা, অন্যান্য অঙ্গ রীতিমত বলিষ্ঠ। তিনি একজন বড় ব্যবসাদারও। ব্যবসার উপলক্ষেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বিরাট পণ্ডিতের একজন অনুরাগী শিষ্য হিসাবেই তাঁহার সহিত আজ দেখা করিতে গিয়াছিলেন তিনি। ডাকাতে যে তাঁহার হাত ভাঙিয়া দিবে ইহা না কি বিরাট পণ্ডিত বলিয়াছেন ভাঙা হাত জোড়া লাগিবে কি না সন্দেহ আছে, তবু চেষ্টা করিতে হইবে। নিয়তির হাতে অসহায় পশুর মতো আত্মসমর্পণ করা মানুষের শোভা পায় না। ভাঙা হাড় যাহাতে জোড়া লাগে তাহার বিধিমতো চেষ্টা করিতে হইবে।

রামেশ্বর পাণ্ডে বিহারের লোক। তিনি হিন্দীভাষায় যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই যে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হইতে রাজী আছেন। কিন্তু অপারেশনটি শীঘ্র করাইয়া দিতে হইবে। হাসপাতালে বিছানায় শুইয়া শুইয়া তিনি কালক্ষয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার বম্বে যাওয়ার কথা পনের দিন পরে। না গেলে ব্যবসায়ের প্রভূত লোকসান হইবে। তাহার মধ্যেই ব্যাপারটা

মিটিয়া যাইবে এ প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হইবেন না।

উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে গিয়া নবকিশোর দেখিল পুলিন মিত্র সেখানে সিনিয়র হাউস সার্জন হইয়া আসিয়াছেন। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বলিল, "সার, এই 'কেসটার যাতে তাড়াতাড়ি অপারেশন হয়ে যায় সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

"করে দেব। বিরাট পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে কিছু বললেন না কি।"

"না।"

"আমার মেয়ে জামাইয়ের কুষ্ঠি দেখেছেন কি?"

"তাও জানি না।"

"সেটা জেনে এসে আমাকে খবর দিও।"

"আচ্ছা। এ 'কেস'টার যাতে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি দেখব'খন।"

রামেশ্বর পাণ্ডেকে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া নবকিশোর ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

নবকিশোর বলিল—"আমি নিজেই যাব পণ্ডিতমশায়ের কাছে। নিমন্ত্রণটা নিজে গিয়েই করা উচিত।"

"কখন যাবে—"

"তিনটে নাগাদ। আজ বিকেলে আমার ক্লাস নেই।"

"আমার কিন্তু আছে।"

"আমি একাই যাব। চিঠি দুটো দাও আমাকে।"

।। এগারো ।।

দুপুর কলেজে হইতে মেসে ফিরিয়া নবকিশোর দেখিল খাওয়ার মহাসমারোহ। মিঠ্ঠুর তত্ত্বাবধানে মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল হইয়াছে। সুনীলদা নিজের পকেট হইতে ঘি এবং পেশোয়ারি চালের দাম দিয়াছেন, পোলাও হইতেছে। নবকিশোরের বিবাহ উপলক্ষে মেসে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মিঠ্ঠু খবর দিল, ঠিক হইয়া গিয়াছে সকলে চাঁদা করিয়া নবকিশোরকে একটি উৎকৃষ্ট বিলাতী স্যুটকেস কিনিয়া দিবে। তাহার উপর লেখা থাকিবে 'তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট হইতে' আর তাহার ভিতরে থাকিবে একখানি ভালো বেনারসী শাড়ি, একটি ভালো গরদের পাঞ্জাবি, একটি শান্তিপুরী জরিপেড়ে কাপড় এবং চাদর। ইহা ছাড়া কিছু এসেন্স এবং সাবান। কেশববাবু না কি স্যুটকেসটি কিনিবার জন্য হগ সাহেবের মার্কেটে চলিয়া গিয়াছেন। স্যুটকেস আসিলে বাকি জিনিস কেনা হইবে।

নবকিশোর আসিতেই সুনীলদা হাসিমুখে আগাইয়া আসিলেন।

"খুব খুশী হয়েছি ভাই। তোমার দাদা বৌদি এসেই চলে গেলেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হল না। একটু আগে তাঁরা এসে রাবড়িও দিয়ে গেছেন। ওপরে ওঠেননি। বিয়ের দিন আলাপ করতে হবে।"

সুনীলদা উপরে চলিয়া গেলেন। তিনি তিনতলায় থাকেন। হরেনবাবু নবকিশোরের সাড়া পাইয়া নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওয়াভারফুল মাছ ভাই। একখানা ভাজা চেখে দেখেছি। ওয়ান্ডারফুল।"

একটু পরেই কেশববাবু প্রকাণ্ড স্যুটকেসটা লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাজির হইলেন। তিনি একটু মোটা মানুষ। নবকিশোরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"দেখ পছন্দ হল কি না।"

"কি—"

"স্যুটকেস, তোমার বিয়েতে দেব আমরা। তোমার পছন্দ হলে ওর উপর লাল অক্ষর দিয়ে লেখাতে হবে 'তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট হইতে'। এর চেয়ে ভালো আর পেলাম না।"

"আপনারা কেন এত সব—"

কেশববাবু ধমক দিয়ে তাহাকে থামাইয়া দিলেন, "তা আমরা তোমার সঙ্গে ডিস্‌কাস্ (discuss) করতে চাই না। পছন্দ হয়েছে কি না বল—"

"খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার জিনিস তো।"

"ব্যস—"

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে দেড়টা বাজিয়া গেল। যোগেন বলিল, "গণ্ডেপিণ্ডে তো গিললাম। পেট না ছেড়ে দেয়। একটু অ্যাকোয়া টাইকোটিস খেয়ে ফেলি, কি বল?"

যোগেন প্রায়ই অ্যাকোয়া টাইকোটিস খায়। ঘরেই সেলফের উপর শিশিটা ছিল। খানিকটা খাইয়া ফেলিল সে।

"এইবার একটু শোয়া যাক। তুমিও শুয়ে পড়। প্রচুর খাওয়া হয়েছে।"

গাউ করিয়া সে একটা ঢেঁকুরও তুলিয়া ফেলিল।

নবকিশোরও শুইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল একটা। বিরাট পণ্ডিত যেন একটা প্রকাণ্ড কাকের সামনে হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কপাল দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

"আপনার কপালে রক্ত কেন"—নবকিশোর যেন জিজ্ঞাসা করিল।

"ওই কাকটা ঠুকরে দিয়েছে। কিছুতেই ওকে প্রসন্ন করতে পারছি না। মহাপুরুষ, তুমি একটু বল ওকে—"

নবকিশোরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল সে। ঘড়িতে দেখিল আড়াইটা। যোগেনের নাসিকাগর্জন শুরু হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জামা ছাড়িয়া কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে বিরাট পণ্ডিত তাহাকে যেন টানিতে লাগিলেন।

।। বারো ।।

গলিতে ঢুকিয়াই অতুলের সঙ্গে দেখা। সে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া পান সাজিতেছিল। নবকিশোরকে দেখিয়াই স্নিগ্ধ হাস্যে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আসুন।"

যথারীতি একখিলি পান তুলিয়া ধরিল সে। পানটি লইয়া নবকিশোর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রটি বাহির করিল।

"যাবেন দয়া করে।"

"হরিকিশোর মুকুজ্যে কি অধ্যাপক হরিকিশোর মুকুজ্যে না কি—"

"হ্যাঁ—"

"আরে! যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তুম, তখন আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। যদিও উনি বটানির ছাত্র ছিলেন কিন্তু শেলী, কীট্‌স্‌ আর বায়রন নিয়ে সুন্দর বলেছিলেন একদিন আমাদের সাহিত্য সভায়। সে জন্য ওঁর কথাটা মনে আছে। উনি আপনার দাদা? বাঃ বাঃ শুনে সুখী হলাম। নিশ্চয় যাব বিয়েতে। আপনি কোথা যাচ্ছেন এখন?"

"পণ্ডিতমশায়ের কাছে। ওঁকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে।"

"নিশ্চয়। উচ্ছে কোথা?"

"সে কলেজে। তার ক্লাস এখন।"

"শান্ত হয়েছে?"

"এখন তো কোনও গোলমাল নেই।"

"আবার বেগড়াবে। ওর মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সেদিন শ্মশান ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হল?"

"হ্যাঁ।"

"কি রকম লাগল।"

"অদ্ভুত। যা দেখলাম তা—"

"বুঝেছি। বলতে হবে না। বুদ্ধি দিয়ে ওঁদের বিচার করা যায় না। ওই ঠিকানাতেই আছেন এখনও?"

"না। শুনছি কামরূপে চলে গেছেন।"

"তাই না কি। কিন্তু উনি উচ্ছেকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি বেশী দিন? উচ্ছের উপর ওঁর মায়া পড়ে গেছে—"

"কিন্তু আমি যখন গেলাম বললেন উৎসাহ যদি ফিরে যায় আপত্তি করব না আমি—"

"ও 'যদি'টাই রহস্য। ওইটেই 'পিভট্' (pivot)। সাপের ব্যাপারটাও আমি কাল ভেবে দেখেছি। মনে হচ্ছে ওটাই ওই ভৈরবীর কাণ্ড।"

"কী রকম।"

"তন্ত্রের বই পড়ুন, বুঝতে পারবেন। যার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে সে সব করতে পারে।"

নবকিশোরের কাছে এ-সব হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইতেছিল।

বলিল, "কি জানি মশাই। বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এ সব। মাথায় ঢোকে না। আচ্ছা, আমি চলি। বিরাট পণ্ডিত আশা করি এখন একলা আছেন।"

"না। উদীয়মান ঔপন্যাসিক পিনাকীলাল চৌধুরী একটু আগে গেলেন তাঁর কাছে। যান আপনি—চিঠিটা দিয়ে আসুন। যদি গোলমাল বোঝেন সরে পড়বেন। চলে যান।"

অতুল মুচকি হাসিল।

বিরাট পণ্ডিতের দরজা খোলাই ছিল। নবকিশোর দ্বারপথে শুনিতে পাইল—"আপনার একাদশে ভালো গ্রহসংস্থান আছে। আপনার আয় ভালো হবে। কিন্তু মহৎ সাহিত্য আপনি সৃষ্টি করতে পারবেন না। কারণ আপনার বৃহস্পতি নীচস্থ, শুক্র চন্দ্রও খুব ভালো নয়।"

"সমালোচকরা তো আমার বই খুব ভালো বলেছেন।"

"সমালোচক কে আছে মশাই? আর লিখেছেনই বা কি আপনি? দুচারটে প্যানপ্যানে প্রেমের 'সেক্‌সি' কেচ্ছা, তা-ও বিলিতি বই থেকে চুরি। পয়সা যতদিন পিটতে পারেন পিটে নিন। আর বেশি কিছু আশা করবেন না।"

নবকিশোর ঢুকিয়া পড়িল।

"আসুন মহাপুরুষ।"

"আমি তাহলে উঠি—"

খানকয়েক নোট বিরাট পণ্ডিতের সামনে রাখিয়া বিরাট ঔপন্যাসিক পিনাকীলাল নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"কি খবর।"

নবকিশোর নিমন্ত্রণ-পত্রটি সসঙ্কোচে বিরাট পণ্ডিতের হাতে দিল।

"শুভ বিবাহ! কার?"

"আমার। আপনি যদি যান, দাদা খুব খুশী হবেন।"

বিরাট পণ্ডিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন।

"আমি তো কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। বিয়ের পর দিন গিয়ে বউমাকে আশীর্বাদ করে ওই নীলার আংটিটা দিয়ে আসব, আর তাঁকে বলে আসব তিনি যেন ওটা আপনাকে পরিয়ে দেন। শনিটা আপনার একটু খারাপ। আর সব ভালো। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

নবকিশোর সামনের চেয়ারটায় বসিল।

"আমিও উচ্ছের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। একটি সুন্দর সুলক্ষণা মেয়েও সন্ধানে আছে। উচ্ছেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাগড়া পড়ে গেল। বামাচরণ এসে গেছে। এতক্ষণে হয়তো উচ্ছের সঙ্গে দেখাও করেছে মেডিকেল কলেজে গিয়ে।"

"বামাচরণ কে।"

"বামাচরণ উচ্ছের মায়ের বাল্যবন্ধু। উচ্ছের জন্ম হবার পাঁচ বছর পরে তার একটি মেয়ে হয়। ওরা উচ্ছের পালটি ঘর। চাটুজ্যে। উচ্ছের মা মরবার কিছুদিন পূর্বে বামাচরণকে একটি চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে যে উচ্ছের সঙ্গে বামাচরণের মেয়ের বিয়ে দেবে সে। এর কিছুতেই অন্যথা হবে না। আমি মেয়েটিকে দেখেছি। দাঁড়কাকের মতো দেখতে। কালো, লম্বা সুঁটকো, মাথায় চুল নেই, চিরুন-দাঁতী, পা খড়মের মতো। তার উপর মূর্খ। মাস তিনেক আগে বামাচরণ আমার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। আমি মেয়েটির ঠিকুজি চাই। ঠিকুজিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঠিকুজি দেখে আমার চক্ষুস্থির। সপ্তমে শনি রবি, অষ্টমে মঙ্গল। উচ্ছেরও লগ্নে মঙ্গল। ও মেয়ে বিধবা হবে। আমি বলে দিয়েছিলাম ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। কাল আবার লোকটা এসে হাজির হয়েছে মনোরমার সেই চিঠিটা নিয়ে। উচ্ছের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। চিন্তিত হয়ে বসে আছি। উচ্ছে তার মায়ের চিঠি দেখে যদি—"

বিরাট পণ্ডিত থামিয়া গেলেন। তাঁহার রগের শির ফুলিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন।

"যেমন করে হোক, এ বিয়ে রুকতে হবে—। আপনি আমার সহায় হোন। আজ উচ্ছের সঙ্গে আপনার দেখা হবে কি।"

"ঠিক বলতে পারছি না। আমি এখন দাদার কাছে যাব।"

"একবার কলেজ হয়ে যান না। যদি তার দেখা পান শুধু বলবেন আমার সঙ্গে দেখা না করে সে যেন বামাচরণকে কিছু না বলে—"

"আচ্ছা, চেষ্টা করব। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনাকে না জানিয়ে সে কিছু করবে কি।"

"যে চাঁদ পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র, সেই চাঁদই অমাবস্যায় গায়েব। আপনি ওকে চেনেন না —"

একটা মোটরগাড়ি আসিয়া থামিল। পরমুহূর্তেই সেই পুলিশ অফিসারটি প্রবেশ করিলেন।

"বোম্বেতে পুলিশ একটি মেয়েকে অ্যারেস্ট করেছে। সে উইদাউট টিকিটে যাচ্ছিল। তার ফোটো ওরা নিয়েছে। সে ফোটো আসবে দুচারদিন পরে। কিন্তু মেয়েটি যদি রেলের ভাড়া দিয়ে দেয় তাহলে তাকে বেশী দিন আটকে রাখা যাবে না। আপনি অনেক কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আমিও যতদূর পেরেছি পুলিশ মহলে খবর দিয়েছি। বম্বের খবরটা এখুনি পেলাম। সব চেয়ে ভালো হয়—"

একটু ইতস্তত করিয়া পুলিশ অফিসারটি থামিয়া গেলেন।

বিরাট পণ্ডিত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আমি আজকেই বম্বে রওনা হচ্ছি। আমি না গেলে সে আসবে না।"

"আপনি যাবেন?"

"হ্যাঁ। কোথায় যেতে হবে, আপনি—"

"আমি চিঠি দিয়ে দেব। লোকও না হয় দেব একজন। একটা ফোনও করে দিচ্ছি মেয়েটিকে যাতে না ছাড়ে! আপনি কষ্ট করে না গিয়ে আর কাউকে যদি পাঠাতে পারতেন—"

"আমার কেউ নেই। তীর্থের কাকরা এসে মাঝে মাঝে জড় হয়, তারপর কার্যসিদ্ধি হলেই চলে যায়। ওরে গাঁট্টা একটা ট্যাক্সি ডাক। বম্বে মেল তো সন্ধ্যার সময় ছাড়ে—"

"চলুন, আমিই না হয় আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। সঙ্গে গাড়ি আছে।"

"তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ওর গাঁট্টা, আমার ট্রাঙ্কটা আর বিছানাটা তুলে দে মোটরে।"

বাক্স হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া আবার হাঁকিলেন, "ওরে গাঁট্টা এই টাকাগুলো বাক্সে পুরে দে—"

তাহার পর সহসা তিনি নবকিশোর সম্বন্ধে সচেতন হইলেন।

"মহাপুরুষ, ফিরে এসে বৌমাকে আশীর্বাদ করব। তুমি উচ্ছের সঙ্গে দেখা করে সব বৃত্তান্ত খুলে বোলো তাকে। ওকে রুকতে হবে। যেমন করেই হোক রুকতে হবে!"

"আমি তাহলে চলি—"

"আমরাই তোমাকে মেডিকেল কলেজের সামনে নাবিয়ে দিতে পারি।"

"জায়গা হবে তো গাড়িতে?"

পুলিশ অফিসার বলিলেন—"একটা ভ্যান নিয়ে এসেছি। প্রচুর জায়গা আছে—"

"ও হ্যাঁ—বিরাট পণ্ডিত নবকিশোরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এই খামটাও নিয়ে যাও। তোমাদের পুলিন ডাক্তারকে দিয়ে দিও। কুষ্টি বিচার করে সব লিখে দিয়েছি। তিনি হয়তো এসে ফিরে যাবেন—"

নবকিশোর খামটি পকেটে পুরিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাঁট্টা বিরাট পণ্ডিতের ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া প্রবেশ করিতেই বিরাট পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন—"তোমাকে একশ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। উচ্ছে যদি আসে তাকে ভালো করে মাংসের কোর্মা করে দেবে। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়, ওতলোর কাছ থেকে টাকা নিও—"

একটু পরেই সকলকে লইয়া পুলিশ ভ্যান বাহির হইয়া গেল।

।। তেরো ।।

নবকিশোর মেডিকেল কলেজের সামনে যখন নামিল তখন পৌনে পাঁচটা। সে কলেজের ভিতর ঢুকিয়া খোঁজ করিল ফার্স্ট ইয়ার ছেলেদের কোনও ক্লাস তখনও চলিতেছে কি না। হঠাৎ নজরে পড়িল 'অ্যানাটমি হল' খোলা আছে। হয়তো 'ডিসেক্‌শন্‌' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 'অ্যানাটমি হলে' ঢুকিয়া উৎসাহের দেখা পাইয়া গেল সে। উৎসাহ বিরাট একটা উপুড় করা ফিমেল বডির নিতম্বদেশের খানিকটা মাংস কাটিয়া এবং চর্বি সরাইয়া কি যেন খুঁজিতেছে।

"উৎসাহ—"

"তুমি এখানে এখন!"

"দরকার আছে তোমার সঙ্গে একটু। কতক্ষণ কাজ করবে।"

"হয়ে গেল প্রায়। এত ফ্যাট (fat) যে নার্ভগুলো খুঁজে পাচ্ছি না।"

"খোঁজ। আমি তাহলে চললাম এখন। তুমি এখান থেকে বাড়ি ফিরবে তো।"

"না। অন্য আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

"আমি এখন দাদার কাছে যাচ্ছি। ফিরতে আটটা হবে। তখন তোমাকে কোথায় পাব।"

"ততক্ষণে বাড়ি ফিরে যাব।"

"তাহলে বাড়িতেই আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আটটার পর সেখানেই যাব না হয়। বিরাট পণ্ডিতমশাই একটু আগে জরির খবর পেয়ে বম্বে চলে গেলেন!"

"জরি বম্বে চলে গেছে!"

"জরি কি না সেইটে ঠিক করতেই যাচ্ছেন উনি। পুলিশ সেখানে একটি মেয়েকে অ্যারেস্ট করেছে। তার চেহারা না কি অনেকটা জরির মতন।"

উৎসাহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল, "বেশ, বাড়িতে অপেক্ষা করব। তুমি এসো।"

হরিশ মুকুজ্যে রোডের বাড়িতে আনন্দের সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। যদিও নবকিশোরের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে জ্যাঠাইমা, দিদি এবং বুলু ছাড়া আর কেহ নাই, তবু বাড়ি গমগম করিতেছে। জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা, দিদির দুই মেয়ে কণিকা ও মণিকা তো আসিয়াছেই, উপরন্তু আসিয়াছে, হরিকিশোরবাবুর বন্ধুর ছেলেমেয়েরা। রঘুনাথ ভেইয়ার সঙ্গেও ভাগলপুরের পুরাতন বন্ধু-বান্ধব এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়াছেন। নবকিশোর গিয়া দেখিল হরিকিশোর, জ্যাঠাইমা, দিদি এবং রঘুনাথ ভেইয়া একটা টেবিলে ব্রিজ খেলিতে বসিয়াছেন। জ্যাঠাইমার সমস্ত চুল সাদা, ব্যাটাছেলের মতো ছাঁটা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা মোটা কালো ফ্রেমের। দেখিলে হঠাৎ পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয় কোনো অধ্যাপক বা জজ বুঝি। ব্রিজ খেলায় তিনি নাকি অপরাজেয়। হরিকিশোর অতি কাঁচা খেলোয়াড়। তাঁহাকেই পার্টনার লইয়া তিনি বসিয়াছেন এবং তবু জিতিতেছেন। রঘুনাথ ভেইয়ার মুখে চোখে একটা স্নিগ্ধ সম্ভ্রমপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মল্লযুদ্ধে তিনিও অপরাজেও, কিন্তু তাসের ব্যাপারে তিনি নাচার। বড়দার অনুরোধে বসিতে হইয়াছে। তাছাড়া বড়ী মাইজি জিতিতেছেন ইহা তো গৌরবের কথাই। এই ধরণের একটা মিশ্রিত মনোভাব তাঁহার সারামুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নবকিশোরকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন— "এই যে ছোটদা, এসে গেছ। বুলু মা তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। যাও ও ঘরে যাও—"

পাশের ঘরে যাইতেই বুলু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। "আচ্ছা, তোমার কি কাণ্ড বল দেখি, কাকু। তোমার বিয়ে, তোমারই পাত্তা নেই! মাপ নেবে বলে দর্জি সেই কখন থেকে এসে বসে আছে। কাকিমার জন্যে একটা ব্লাউসে প্যাটার্ন তুলেছি, দেখবে? তোমার যদি পছন্দ না হয়, প্যাটার্ন বুক থেকে আর একটা পছন্দ করে দাও, এখনও সময় আছে—আর জানো কাকু— শোন—"

নবকিশোরের কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিল, "বাবাকে বল না, গাড়িটা নিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে যাই। দিদু ব্রিজ খেলে আজ পর্যন্ত যা জিতেছেন তা সব জমিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে বললেন, তুই পছন্দ করে নবুর জন্যে কিছু একটা কিনে দে। পাঁচশ' ছাপ্পান্নো টাকা দিয়েছেন। কি সুন্দর ছোট্ট মিষ্টি একটা রেডিও দেখে এসেছি দোকানে। নতুন এসেছে। কিনব সেটা তোমার জন্যে? ওই টাকাতে হয়ে যাবে। তোমার যদি পছন্দ হয় তাহলে ওদের বলি সোনার জলে কাকিমার নাম লিখে দিক তাতে। ওরা লিখে দিতে পারবে। হর্সুখ এসে গেছে। চল না তাকে নিয়ে বেরুই। বাবা তাস নিয়ে বসেছে, এখন উঠবে না। তুমি বল না বাবাকে একটু। হর্সুখ নিয়ে যাবে বলেছে—"

হর্সুখ (হর-সুখ) হরিকিশোরবাবুর ড্রাইভার।

নবকিশোর বলিল—"আমি দাদাকে বলতে পারব না।"

"আচ্ছা আমি দুধমাকে দিয়ে বলাচ্ছি তাহলে। দুধমা তেতলায় আছেন! চল। কণিকা আর মণিকাকে দেখেছ ইদানিং? কি মিষ্টি যে হয়েছে দেখতে। কণিকা পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। কোনও সাবজেক্টে সেকেন্ড হয় না। মণিকা পড়াশোনায় সাধারণ কিন্তু কী ছবি আঁকে! তোমার জন্যে একটা হর-গৌরি এঁকে এনেছে দেখবে চল—"

ঘরের বাহির হইতে না হইতেই কণিকা মণিকার সহিত দেখা হইয়া গেল। কণিকা শ্যামবর্ণা, মণিকা ফরসা। দুইজনেই হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। ভাগলপুর

হইতে আগতা দিদিমা-সম্পর্কের হৃষ্টপুষ্টা এক বয়স্কা বিহারী মহিলা নবকিশোরকে দেখিয়া বিহারী ভাষায় গান গাহিয়া উঠিলেন—

পহুনা আইলো রে ননদিয়া পানি দে
মোঢ়া তামাকু দে আম ক্ষীর সানি দে—

[ওগো ননদা, অতিথি এসেছে, তাকে জল দাও, মোড়া দাও, তামাক দাও, তারপর ক্ষীরের সঙ্গে আম মেখে দাও]

তাহার পর তিনি নবকিশোরের থুতনি নাড়িয়া আদর করিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে? লুকিয়ে লুকিয়ে বউ দেখতে গেসলে না কি!"

একটা হাসির কলরব উঠিল। বুলু নবকিশোরকে টানিতে টানিতে তেতলায় লইয়া গেল। নাম যদিও দুধমা (বুলুকে ছেলেবেলায় দুধ খাওয়াইয়াছিলেন বলিয়া) রং কিন্তু বেশ কালো। মোটা থলথলে চেহারা। মুখটি অবিকল হরিকিশোরবাবুর মতো, কেবল গোঁফ নাই। তিনি একগাদা নূতন শাড়ি কাপড় লইয়া গোছাইতেছিলেন কাহাকে কোনটা দিতে হইবে। বুলু ঘরে ঢুকিয়াই আবদার-মাখা কণ্ঠে বলিল, "দুধমা, তুমি বাবাকে বল না একবার মোটরটা দিতে। কাকুকে নিয়ে একটু বেরুই। হর্সুখ তো এসে গেছে—"

"আমি বলতে গিয়ে বকুনি খেয়ে মরি আর কি। কেন এখন বেরুবি?"

"বাঃ, কাকুর যে কিছুই কেনা হয়নি। জুতো মোজা রুমাল। দোকানে না গেলে কিনব কি করে?"

"সে শ্রবণা বুঝবে। তুই মাথা ঘামাচ্ছিস কেন।"

"মায়ের মাথায় এখন পিয়ানো ঘুরছে! বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে এই নিয়ে। রেগে টং হয়ে বসে আছে মা। তাকে এখন কিছু বলতে গেলেই বকুনি খেতে হবে। তুমি একবার চল না, তুমি বললেই বাবা রাজী হয়ে যাবে।"

"বাবা, বাবা! আচ্ছা চল।"

নবকিশোরের দিদির কোমরে বাত। বুলুর হাত ধরিয়া তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইতেই নবকিশোর তাহার দিদিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তিনি থুতনিতে হাত দিয়া চুমু খাইলেন।

"বুলু দিদিকে কেন কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে বলছ—"

"না আমার কোনো কষ্ট হবে না। একটু চললেই ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া ও যখন জেদ ধরেছে ছাড়বে না কি। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকবে। তার চেয়ে চল বলেই আসি। শ্রবণার ব্যাপারটাও শুনিগে।"

দুধমা নিচে গিয়ে হরিকিশোরকে অনুরোধ করিলেন না, আদেশ করিলেন।

"হর্সুখকে বল গাড়িটা বার করতে। বুলু আর নবু বেরুবে। নবুর জুতো কেনা দরকার। আরও টুকিটাকি কি সব কিনবে। সেরে আসুক—"

হরিকিশোর তাসে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিলেন। হাঁক দিলেন—"হর্সুখ। গাড়ি নিকালকে ছোটবাবুকো লে যাও।"

হর্সুখ উর্দি পরিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্রবণাও পাশের ঘর হইতে বাহির হইলেন।

"আমিও যাই ওদের সঙ্গে। পিয়ানোটা—"

হরিকিশোর তাস হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "পিয়ানো কেনবার আগে জেনে এস প্রমীলা পিয়ানো বাজাতে পারে কি না। পিয়ানো বাজাতে না জানলে শুধু শুধু—"

"না জানলে মাস্টার রেখে শিখিয়ে নেব। আমার শখ ছিল হয়নি। নবুর বৌকে দিয়ে আমি সে শখ মেটাব।"

জ্যাঠাইমা একটা তাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা, যা, কিনেই নিয়ে আয়। ওর শখ হয়েছে, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন হরু—"

হরিকিশোর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

" না, না, বাধা দেব কেন। মানে—"

শ্রবণা কাপড় বদলাইবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। যে কাপড় পরিয়া ছিলেন তাহাতে নিন্দনীয় কিছু ছিল না। ভালো শান্তিপুরের শাড়ি। কিন্তু তবু বাহিরে যাইবার পূর্বে কাপড়টা বদলাইয়া আয়নার সামনে একবার না দাঁড়াইতে পারিলে তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন।

এই উৎসব সমারোহের মধ্যে নবকিশোর সহসা কেমন যেন একটু বিমর্ষ বোধ করিতে লাগিল। উৎসাহের কথা মনে পড়িল তাহার। মনে হইল কি একটা অদৃশ্য অশনি যেন তাহার মাথার উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। মনে প্রশ্নও জাগিল নানা রকম। উৎসাহ নিজে জ্যোতিষী—গার্ড সাহেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়াছে, অথচ নিজের বেলায়—। নিশ্চয় কিছু একটা রহস্য আছে। শবব্যবচ্ছেদরত উৎসাহের চেহারাটা বারবার মনে পড়িতে লাগিল তাহার। উৎসাহকে তাহার বড়ো ভালো লাগিয়াছে, উহার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রাণবন্ত বিশেষত্ব আছে। বিরাট পণ্ডিত ইহার বাবা? উৎসাহ সে কথা জানে না নিশ্চয়। সে তাঁহাকে জ্যাঠামশাই বলিয়া জানে? জরিও তাঁহাকে জেঠু বলিয়া ডাকে। এ রহস্যের আড়ালেই বা কি আছে। কেন এই লুকোচুরি? উৎসাহের কথাই বারবার মনে হইতে লাগিল তাহার। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসব যে প্রাচুর্য উথলাইয়া উঠিতেছে, উৎসাহের জীবনে তাহা নাই কেন। কেন এ অসাম্য, এ বিসদৃশ ব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, সমাজ না নিয়তি, ইহজন্ম না পূর্বজন্মের ফলাফল? উৎসাহের চেহারাটা আবার মনে পড়িল। সত্যই উহার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। বিরাট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়াছিল, অথচ সে-ই আবার বিরাট পণ্ডিতেরই পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আপনি এবার থেকে যা বলবেন তা আমি নির্বিচারে পালন করব।" দুইটি বিভিন্ন সত্তা যেন উহার মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছে। একজন বিদ্রোহী আর একজন আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ। আর ওই আশ্চর্য নারী শ্মশান-ভৈরবীর স্বরূপই বা কি? উৎসাহের সহিত কি সম্পর্ক? উৎসাহের প্রতি উনি অত অনুরাগিণী কেন? এইসব নানা কথা ভাবিয়া তাহার মনটা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভয় হইল। মনে হইতে লাগিল উৎসাহের সব স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যাক। তাহার দাদা, বৌদি, বুলু, দিদি, জ্যাঠাইমা, তাহার অদেখা বধূ প্রমীলা তাহার জীবনকে আলোকিত করিয়া থাকুক। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত হইল সে। কেবল নিজেকে লইয়া থাকিবে এ রকম স্বার্থপরের মতো প্রবৃত্তি তাহার মনে কেন জাগিতেছে?

"চল—"

এসেন্সের গন্ধ বিকীর্ণ করিতে করিতে সুসজ্জিতা শ্রবণা পাশের ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে বুলু। সে-ও একটু প্রসাধন করিয়াছে। নবকিশোরের মনে হইল বুলু যেন শ্রবণার ছোট বোন, মেয়ে নয়।

মোটরে চড়িয়া শ্রবণা বলিলেন, "ঠাকুরপো, প্রমীলার বাড়ি যাব না কি। চল না একটা 'সারপ্রাইজ্' ভিজিট (surprise visit) দি। তুমি তো ওকে দেখনি এখনও—"

"আপনারা দেখেছেন তো। বিয়ের পর একেবারে দেখা যাবে।"

"সত্যি খুব সুন্দর। ভয় হচ্ছে—"

"কেন।"

"ওকে পেয়ে আমাদের না ভুলে যাও।"

নবকিশোর কেবল একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। কিছুদুর গিয়া বলিল, "আমাকে আটটার একটু আগে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে কিংবা মদন চ্যাটার্জি লেনে নাবিয়া দিও।"

"কেন—"

"ওখানে একজন বন্ধু আছে। দরকার আছে তার সঙ্গে।"

।। চোদ্দো ।।

বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির সামনে হরিকিশোরবাবুর 'কারটা নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। নবকিশোর নামিয়া পড়িতেই সেটা আবার বাহির হইয়া গেল। বাড়িটার সম্মুখে নবকিশোর রহিল কয়েক মুহূর্ত। স্বল্পালোকে বাড়িটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হইতে লাগিল। সামনের কপাটটা খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া আরও অবাক্ হইয়া গেল সে। একটা অপূর্ব গন্ধে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ। ঘরে আলো নাই।

"উৎসাহ—"

"এসেছ? যাই—"

আলো জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই উৎসাহ আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত। মনে হইল সে যেন একটু উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে।

"ঘরে কিসের গন্ধ ভাই? বড় চমৎকার গন্ধ।"

"সমস্ত বাড়ি গন্ধে ভরে আছে। মধুমতী এসেছিলেন।"

"মধুমতী? তিনি কে।"

"ডামর-তন্ত্র, তন্ত্রসার, ভূতডামার এ সব বই নিশ্চয়ই পড়নি কখনও।"

"না।"

পড়লে বুঝতে অসুবিধা হত না মধুমতী কে। মধুমতী একজন যোগিনী। সাধনা করলে তিনি দেখা দেন। আমি আই. এসসি পাস করে যখন দারিদ্র্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তির অভাবে মেডিকেল কলেজে ঢুকতে পারলাম না, তখন দিনকতকের জন্য বিবাগী হয়ে যাই। সেই সময় শ্মশান-ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হয় আমার। তাঁর কথা শুনে তাঁর চেহারা দেখে আমি খুব

আকৃষ্ট হই তাঁর প্রতি। আমার সব কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি মধুমতীর সাধনা কর—তাহলে তোমার ঐহিক ভোগসুখের কোনও অভাব হবে না। তুমি উপযুক্ত আধার, তোমাকে আমি দীক্ষা দেব। দীক্ষা দিলেন। আমি এক নির্জন প্রান্তরে বসে তাঁর উপদেশ মতো সাধনায় লেগে গেলাম। কদিন সাধনা করেছিলাম তা মনে নেই। হঠাৎ একদিন ভোরে—সবে তখন উষার আলো ফুটি-ফুটি করছে পাখিরা তখনও জাগেনি, হঠাৎ দেখি অপরূপ গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। এ গন্ধ আগে কখনও পাইনি। চোখ খুলে দেখি অপরূপ এক সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যে মন্ত্র অহরহ ধ্যান করছিলাম—

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং
মঞ্জীর-হারকেয়ুর-রত্নকুন্ডল-মন্ডিতাম্

সেই মন্ত্রই যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হল চোখের সামনে। মন্ত্রে গন্ধের কথা নেই, কিন্তু গন্ধে ভরে গেল দশদিক। আমি বিভোর বিস্মিত আচ্ছন্ন হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আর বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু না বললেও ব্যাপারটা তোমার কাছে আলোর মতো স্বচ্ছ হবে না—তাকে দেখেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। হ্যাঁ, লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট (love at first sight)—সত্যি বলছি, পা হড়কে পড়ে গেলাম গভীর জলে। গভীর সমুদ্রে। মধুমতী আমার কাছে বসলেন এবং স্মিতমুখে বললেন—'আমি এসেছি। আমি তোমারই। আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য দেব। স্বর্ণ দেব, রত্ন দেব, শক্তি দেব, দিব্যদৃষ্টি দেব। তুমি যে-কোনও লোককে দেখে তার বিপদ প্রত্যক্ষ করতে পারবে, যে-কোনো উলঙ্গ লোকের দশাঙ্গ দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। কিন্তু একটি বিষয়ে তোমাকে অন্ধ করে দিচ্ছি। নিজের সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে পারবে না, কিছু দেখতে পাবে না। কিছু জানতে চেও না। তুমি কেবল আমার থাক। কোনও ভয় নেই। এই নাও।' আমাকে একথলি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। বললেন—'সঞ্চয় কোরো না, খরচ করে ফেল। ফুরিয়ে গেলে আবার দেব'—এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। শ্মশান-ভৈরবীকে বললাম সব। তিনি বললেন তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। কিন্তু এখন তোমাকে খুব সাবধানে সংযমী স্বাবলম্বী হয়ে থাকতে হবে। মধুমতীর কাছ থেকে অর্থ নিও না। অর্থ অনর্থের মূল। ও টাকা আজই কোথাও দান করে দাও। নিজের জন্য খরচ কোরো না। আর একটা কথা, অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি না হয় যেন। তাহলে মধুমতী সর্বনাশ করে দেবে। মধুমতী তোমাকে যে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন তাতেও তুমি শান্তি পাবে না। কিন্তু ও শক্তি তোমার বেশী দিন থাকবে না, অহমিকার ধাক্কায় নষ্ট হয়ে যাবে ওটা। তুমি সাধনায় এত সহজে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে, মধুমতীকে এত সহজে পাবে তা আমি আশা করিনি। তোমার শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়েছি। তোমার অভাব অনটনের কথা শুনে তোমাকে মধুমতীর সাধনা করতে বলেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল বলেছিলাম। তোমার যা শক্তি তাতে তুমি ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারবে। মধুমতীর ঐশ্বর্যে তুমি ভুলো না। ভৈরবীর আদেশ অনুসারেই আমি চলছি তার পর থেকে। মধুমতী কিন্তু এখন আসে মাঝে মাঝে। এসে আমাকে প্রলুব্ধ করে। বলে, জীবনকে ভোগ কর। যখন আসে তখন আমি পাগলের মতো হয়ে যাই। কেমন যেন নেশা ধরে। মাঝে মাঝে মনে হয় ভৈরবীর কথা অগ্রাহ্য করে গা ভাসিয়ে দিই। কিন্তু পারি না। ভৈরবীকে ভয় করে।"

"ওই ভৈরবী কে? কি করে ওর সঙ্গে পরিচয় হল তোমার? ওঁর মধ্য ভয়ঙ্কর তো কিছু দেখলাম না।"

"ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক শ্মশানের ধারে জঙ্গলের মধ্যে। আমি তখন বিবাগী। যা পয়সা সঙ্গে করে বেরিয়েছিলাম যখন তা ফুরিয়ে গেল তখন হাঁটতে লাগলাম। একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালাম ওই শ্মশানে। দেখলাম চিতা জ্বলছে। সরে গেলাম সেখান থেকে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। শ্মশানের ধারে বড় বড় শিমুল আর তলগাছ। আর তাতে অসংখ্য শকুনি বসে আছে। আরও দূরে চলে গেলাম সেখান থেকে। গিয়ে প্রবেশ করলাম এক জঙ্গলে। সেখানেও বড় বড় গাছ। একটা বটগাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর হাঁটতে পারছিলাম না। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। একটা অদ্ভুত হাসি শুনতে পেলাম। সে হাসিকে খিল খিল, খল খল বা হা হা বলে বর্ণানা করা যাবে না। কহ্ কহ্ কহ্ কহ বললে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজনা। যেন পাঁয়জোর পায়ে দিয়ে হাসির তালে তালে কেউ নাচছে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার। গাছতলা থেকে উঠে পড়লাম। দেখলাম চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। গাছগুলোর আড়ালে দিয়ে দেখতে পেলাম গাছগুলোর ওপারে ফাঁকা মাঠ রয়েছে একটা। সেইদিকেই এগুলাম আস্তে আস্তে। গিয়ে কি দেখালাম আন্দাজ কর তো—"

"আমি কিছুই আন্দাজ করতে পাচ্ছি না।"

"দেখলাম জীবন্ত ছিন্নমস্তা মূর্তি, নিজেই মুণ্ডটা হাতে করে পাঁয়জোর পরে নেচে বেড়াচ্ছে সেই ফাঁকা জায়গায়। রক্তের ধারা ফোয়ারার মতো উঠে কাটা মুণ্ডের উপর পড়ছে। আর মুণ্ডটা হাসছে কহ্ কহ্ কহ্ কহ্। আমি চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হল তখন সকাল হয়ে গেছে। দেখলাম কার কোলে যেন মাথা রেখে শুয়ে আছি। উঠে পড়লাম টপ করে। দেখলাম একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী বসে আছেন আর তাঁর আশ্চর্য দুটি চোখ থেকে করুণার ধারা বিগলিত হয়ে পড়ছে। মধুর কণ্ঠে বললেন, বাবা তুমি ভয় পেয়েছো। ভয়ের কোনও কারণ নেই। চল তুমি আমার সঙ্গে, আমার আশ্রমে। বেশী দূরে নয়, কাছেই। ভৈরবী মার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর আশ্রমে গেলাম। ভৈরবী মা তাঁর সেই তেড়াবেঁকা জোড়া-লাগানো কাঠের আসনে বসলেন। পরে জেনেছি নানা চিতার কাঠ জুড়ে জুড়ে ওই আসনটি করিয়েছেন তিনি। সেই আসনে বসে তিনি আমার সব কথা শুনলেন। তার দুদিন পরে আমাকে দীক্ষা দিলেন যোগিনী সাধনায়। ওই প্রান্তরে বসেই আমি মধুমতীর দেখা পাই। ভৈরবী মা একটি ফেনোমেনন (phenomenon)। তাঁর শক্তির কূল-কিনারা পাইনি। পাব এ আশাও নেই। তিনি ইচ্ছামত যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারেন। প্রথম দিন যে জীবন্ত ছিন্নমস্তাকে দেখেছিলাম, তিনি ভৈরবী মা-ই। পরদিন যে রূপসী যুবতীকে দেখলাম তিনিও ভৈরবী মা—তখন ষোড়শী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তুমি যাঁকে দেখেছ। সেই প্রৌঢ়া কার রূপ তা আমি জানি না, আমি তাঁকে ওই প্রৌঢ়া রূপে থাকতেই অনুরোধ করছি। সমাজে ঘোড়াফেরা করতে হলে ওই সাদা-মাটা রূপই ভালো। উনি এখানে এসে ষোড়শী রূপে ছিলেন কিছুদিন। বিরাট পণ্ডিতের পর্যন্ত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জরি ওঁকে বলত ডাইনি। শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হল তাঁকে। সেদিন যে সাপটা এসেছিল আমার ধারণা সাপের বেশে ভৈরবী মা-ই এসেছিলেন আমাকে বাঁচাতে। বিরাট পন্ডিত বুঝতে প্রেরেছিলেন সেটা, কিন্তু মহা বুদ্ধিমান লোক তো, আর একটা মানে বের করে

ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি যে জটিল জালে জড়িয়ে আছি এবার তা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে আশা করি।"

"না, হয়নি। ও সব অলৌকিক ব্যাপার আমি বুঝিও না, ও নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছেও নেই। বিরাট পণ্ডিতের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কিন্তু কি রকম গোলমেলে ঠেকছে আমার। এই তুমি ওঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ধরে কেঁদে বলছ আপনার কথা আর অমান্য করব না। আবার শুনছি ওঁর মতের বিরুদ্ধে কোথাও না কি বিয়ে করতে যাচ্ছ।"

"ও, শুনেছ একথা? মধুমতীও এসেছিলেন ওই জন্যে, তিনিও আমাকে শাসিয়ে গেছেন যদি আমি বিয়ে করি তাহলে আমার ভালো হবে না। মধুমতীও ডিক্‌টেটার। তাঁর ইচ্ছে আমি তাঁর স্লেভ (slave) হয়ে থাকি। আজও আবার অনেকগুলো মোহর রেখে গেছেন। দেখবে?"

উৎসাহ উঠিয়া গেল এবং পাশের ঘর হইতে বেশ বড় একটা থলি আনিয়া নবকিশোরের সামনে উপুড় করিয়া দিল। অবাক্ হইয়া গেল সে। একসঙ্গে এত মোহর সে আগে কখনও দেখে নাই। মোহরগুলি থলির মধ্যে পুরিতে পুরিতে উৎসাহ বলিল, "কিন্তু আমি কারও স্লেভ (slave) হব না, তা তিনি যে-ই হোন। বিরাট পণ্ডিতের ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেব? এই পৃথিবীতে উৎসাহ মুকুজ্যে তার অস্তিত্বের জন্যে কার কাছে ঋণী জান? বিরাট পণ্ডিতের কাছে। উনি আমাকে খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, আমাকে অ আ ক খ থেকে আরম্ভ করে এম. এসসি. পর্যন্ত পড়িয়েছেন, শুধু স্কুল-কলেজের মাইনে দিয়েই নিজের কর্তব্য শেষ করেননি, আমাকে সামনে বসিয়ে গুরুমশাইয়ের মতো পড়িয়েছেন রাত জেগে জেগে, বেত হাতে নিয়ে। ওঁর চেয়ে বড় হিতৈষী আমার আর কেউ নেই। এ কথাটা আমি ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না যে বিরাটেশ্বর শর্মার নামটাই শুধু বিরাটেশ্বর নয়, মনীষাতেও উনি বিরাটেশ্বর, এত বিষয়ে এত অগাধ পাণ্ডিত্য আমি আর কারও দেখেনি। উনি না থাকলে আমি সংসার-স্রোতে খড়ের টুকরোর মতো ভেসে যেতাম। এ সব আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু আর একটা কথাও ভুলতে পারি না। বিরাটেশ্বর শর্মার পাণ্ডিত্যের যেমন তুলনা নেই, তেমনই ওঁর নীচতার, চরিত্রহীনতার, নিষ্ঠুরতার, মিথ্যাচারের, ভণ্ডামিরও তুলনা নেই। নিজের স্বার্থের জন্য উনি সব সহ্য করতে পারেন। এই বয়সেও ওর একজন রক্ষিতা আছে সোনাগাছিতে। কোনও সংযমের ধার ধারেন না। নানা রকম বিচিত্র ধরনের খাওয়া উনি খান। কেবল খাসি মটন মুর্গিতে ওঁর তৃপ্তি হয় না, মাঝে মাঝে অনেক টাকা খরচ করে হরিণ, ময়ুর, বটের, তিত্তিরের মাংসও খান উনি এই কলকাতা শহরে বসে। হেরিং স্যামনেও (salmon) রুচি খুব। নানারকম আতর ওঁর রোজ চাই। আগে ঋণ করেও এ-সব কিনতেন। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে গিয়াছিলেন। কিছুদিন থেকে রত্নের ব্যবসা করে উনি অবশ্য অনেক টাকা উপার্জন করছেন। আমার মনে হয় রত্নের ব্যবসাটা ওঁর লোক-ঠকানো ব্যবসা। কিন্তু উনি খুব ভালো জ্যোতিষী, যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়, সেইজন্যে লোকে ওঁর দেওয়া পাথর আগ্রহ করে কিনে নিয়ে যায়। এই সব কারণে মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আমার। মানে ঠিক যেন দোলনা হয়ে যাই। কখনও এ এক্‌স্‌ট্রিমে (extreme) চলে যাই, কখনও ও এক্‌স্‌ট্রিম। ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে? এইবার আমার বিয়ের

ব্যাপারটা বলি। আমার মায়ের সঙ্গে বিরাট পণ্ডিতের ঠিক কি সম্পর্ক তা আমার জানা নেই। শুনেছি মা ওর শিষ্যা ছিলেন। আমার বাবার খবরও আমি জানি না। জন্মে থেকে বিরাট পণ্ডিতকেই দেখছি, বাবাকে দেখিনি। শুনেছি বাবা আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান, বিরাট পণ্ডিত নাকি তাঁর দূরসম্পর্কের দাদা, তিনিই আমাদের সমস্ত ভার নিয়েছেন। আমার ভার সর্বতোভাবে তিনি যে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আমি কি খাব, কি পরব, কার সঙ্গে মিশব, কখন ঘুমুব, কখন উঠব, কি বই পড়ব,—সব বিরাট পণ্ডিত ঠিক করতেন। আমার মায়ের ইচ্ছে হত আমাকে মাঝে মাঝে সাজাতে, আমাকে খেলনা কিনে দিতে কিন্তু বিরাট পণ্ডিতের ভয়ে কিছু করতে সাহস হত না তাঁর। তিনি কিছু লেখাপড়া জানতেন, স্কুলে যখন পড়তাম তাঁর ইচ্ছে হত আমি তাঁর কাছে বসে পড়ি, কিন্তু বিরাট পণ্ডিত দিতেন না। মেয়েদের বুদ্ধির উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর। তাঁর মতে ওরা শুধু মা,—আর কিছু নয়। আমার মা আমার সম্বন্ধে তাঁর কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। একবার লুকিয়ে তিনি আমাকে আচার খেতে দিয়েছিলেন, তার পরদিন আমার পেট খারাপ হয়। বিরাট পণ্ডিত কি করেছিলেন জান? আমার মাকে মেরেছিলেন সেজন্য। মাকে উনি মাঝে মাঝে মারতেন। আমার মায়ের সেই শীর্ণ মুখ সভয় দৃষ্টি আমার মনে আঁকা আছে। আমার সেই মা তাঁর মরবার কিছুদিন আগে আমার সম্বন্ধে একটি মাত্র ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেছেন। ঠিক করেছি সে ইচ্ছার সম্পূর্ণ মর্যাদা আমি দেব। মায়ের ছেলেবেলার বন্ধু বামাচরণবাবু আজ দেখা করেছেন আমার সঙ্গে। মায়ের একখানা চিঠি তিনি এনেছিলেন। তাতে মা লিখেছেন—বাবা, উৎসাহ—আমার খুব ইচ্ছে তুমি আমার বাল্যবন্ধু বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে কর। মেয়েটি এখন খুব ছোট, তুমিও ছেলেমানুষ! বড় হয়ে তুমি বিয়ে কোরো ওকে, আমি খুব সুখী হব তাতে। আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচবো না, বেঁচে থাকলেও বিরাট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস হবে না আমার। তাই বামাচরণের হাতে এই চিঠি দিলাম। আশা করি তুমি আমার ইচ্ছ পূর্ণ করবে। চিঠিখানা পড়ে আমি বামাচরণবাবুকে কথা দিয়েছি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব।"

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উৎসাহ চুপ করিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "ব্যাপারটা আলোর মতো স্বচ্ছ হয়েছে এবার?"

নবকিশোর হাসিয়া উত্তর দিল—"মোর দ্যান্ (more than) স্বচ্ছ কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করছি। তুমি যখন খুব ছেলেমানুষ ছিলে তখন তোমার মা মারা গেছেন। তাঁর হাতের লেখা কেমন ছিল, তোমার মনে আছে কি? ও চিঠি জালও তো হতে পারে।"

"জাল যে নয় তার প্রমাণও পেয়েছি। বামাচরণবাবুই বললেন, তোমার মায়ের হলদে রঙের একটা ট্রাঙ্ক আছে। সেই ট্রাঙ্কে সে কিছু শাড়ি রেখে গেছে তার ভাবী পুত্রবধূর জন্য। কিছু কাগজপত্রও আছে তাতে। তার মধ্যে এই চিঠির একটা কপিও সে রেখে গেছে। আমাকে অন্তত তাই বলেছিল। মায়ের একটা ট্রাঙ্ক আছে তা জানি। বিরাট পণ্ডিত সেটা সীল দিয়ে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। মানা করেছিলেন ওটা যেন আমি না খুলি। বিরাট পণ্ডিতের অনুপস্থিতিতে আজ সেই ট্রাঙ্কের সীল আর তালা ভেঙে সেটা খুলেছি আমি। দেখলাম তাতে সেকেলে বেনারসী শাড়ি, পার্সি শাড়ি, আর বোম্বাই শাড়ি আছে একটা করে। সেকেলে গয়নাও আছে কয়েকখানা। একটা বড় সিঁদুর কৌটো আছে। আর আছে কিছু

সেকেলে বই—সীতার বনবাস, শরীর পালন, শিশুবোধক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ—এইসব। আর সব চেয়ে নীচে আছে কিছু কাগজপত্র। সেই কাগজপত্র ঘেঁটে মায়ের ওই চিটির নকলটা পেলাম। আর পেলাম আমার আসল কুষ্ঠিটা। বিরাট পণ্ডিতেরই করা কুষ্ঠি। আমি যখন জ্যোতিষ শিখি তখন আমার কুষ্ঠিটা চেয়েছিলাম বিরাট পণ্ডিতের কাছে। আজ বুঝলাম তিনি আমাকে আমার আসল কুষ্ঠি দেননি। দিয়েছিলেন একটা বাজে মেকি ছক। মধুমতী আমাকে নিজের সম্বন্ধে অন্ধ করে দিয়েছিল বলে আমি আমার চেহারা থেকে ভেরিফাই (verify) করে নিতে পারিনি যে সেটা ঠিক কি না। বিরাট পণ্ডিতকে অবিশ্বাস করবার কল্পনাও করিনি কখনও। তাই ওই মেকি ছককে বিশ্বাস করে আমি মেকি-স্বর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাথা উঁচু করে। আসল কুষ্ঠিটা দেখে আজ বুঝতে পারলাম কেন উনি আমাকে প্রবাল পরাবার জন্যে ব্যস্ত। জেঠুর উপর রাগ হয়নি এজন্যে। আসল কুষ্ঠিটা দেখালে আমার মন ভেঙে যেত। ও কুষ্ঠি যদি সত্য হয় তাহলে আমি হতভাগ্য স্বল্পায়ু লোক। তাই আমাকে আমার আসল কুষ্ঠি দেননি জেঠু। আমাকে যে উনি কত ভালবাসেন এটা তারই একটা প্রমাণ। আমার দুর্ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে উনি কি যুদ্ধই না করেছেন। আমার বিদ্যাস্থানের গ্রহগুলো ভালো নয়, কিন্তু জেঠুর পুরুষকারের জোরেই আমি এম. এসসি. পাস করেছি, ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছি। উনি মস্ত বড় জ্যোতিষী, কিন্তু উনি ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারে বেশী বিশ্বাস করেন। যাক্, অনেক বকবক করলুম। আমাকে তুমি কি বলবার জন্যে এসেছিলে, বললে না তো।"

"বম্বে যাবার আগে বিরাট পণ্ডিত আমাকে বলে গেছেন বামাচরণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়েটা যেন আমি ঠেকিয়ে রাখি—"

"তা পারবে না। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। কালই বিয়ে হবে বামাচরণবাবুর সারপেনটাইন লেনের বাসায়। তুমি যদি যাও ঠিকানাটা দিতে পারি তোমাকে।"

"ও মেয়ের কুষ্ঠিতে শুনেছি—"

"কুষ্ঠি বি ড্যাম্‌ড্ (be damned)! আমার যে মা আমার সম্বন্ধে তাঁর কোনো ইচ্ছাকেই পূর্ণ করতে পারেননি জীবনে, তাঁর এ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবই। বিরাট পণ্ডিত, মধুমতী, কুষ্ঠি কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি যাবে বিয়েতে? না, তোমার যাবার দরকার নেই। তোমাকে ঠিকানা দেব না। তোমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বিরাট পণ্ডিত হয়তো গুণ্ডার গ্যাং (gang) নিয়ে গিয়ে হাজির হবেন বিয়ে পণ্ড করে দিতে। সব পারেন উনি। না ঠিকানা দেব না। রাত হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি যাও। মোহরগুলো নেবে? নেবে না? আচ্ছা থাক, কোনও একটা সৎকার্যে ব্যয় করা যাবে। যাও, বাড়ি যাও। আমার কাছে বেশীক্ষণ থেকো না। তুমি সৌভাগ্যবান, সুখী লোক, নির্মল কুসুম। আমি দুর্ভাগা অসুখী, আমার মলিনতা হয়তো তোমার সুখের জীবনে ছায়াপাত করবে। এখানে থেকো না তুমি—যাও—"

উৎসাহ হঠাৎ ভিতরে চলিয়া গেল।

হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল নবকিশোর। উঠিয়া পড়িবে, না আর একবার উৎসাহকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে? পরমুহূর্তেই কিন্তু সে অনুভব করিল উৎসাহকে বুঝাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। যাহাকে মধুমতী নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, বিরাট পণ্ডিতের বিরাট প্রভাব যেখানে নিষ্ফল হইয়া গেল, সেখানে দুদিনের বন্ধু সে কি করিবে। তাছাড়া সে যখন সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার মৃতা জননীর মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করিতে উদ্যত

হইয়াছে তখন তাহাকে বাধা দেওয়া কি উচিত? কুষ্ঠির ফল যে ফলিবেই এমনই বা কি নিশ্চয়তা আছে? অনেক কুষ্ঠির কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে না এ রকম উদাহরণ তো বিরল নয়। মধুমতী? মধুমতী হয়তো উহার কল্পনার সৃষ্টি, হ্যালুসিনেশন (halucination)। শ্মশান-ভৈরবী—সহসা তাহার চোখের সামনে শ্মশান-ভৈরবীর ষোড়শী মূর্তিটা ভাসিয়া উঠিল। এটা তো সে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার পরই চোখে পড়িল মোহরের থলিটা। দুইটি মোহর তখনও বাহিরে পড়িয়াছিল। সে দুইটি যেন দুইটি জীবন্ত চোখের মতো তাহার দিকে চাহিয়া জ্বলিতে লাগিল। কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল তাহার। সে উঠিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই উৎসাহ প্রবেশ করিল আবার।

"আমার ভাই বড় অনুতাপ হচ্ছে।"

"কিসের অনুতাপ।"

"আমার সব কথা আবেগের মুখে তোমাকে বলে ফেলেছি বলে। এ সব কথা আর কাউকে বলিনি। তুমি হয়তো এর মর্যাদা রাখবে না, হয়তো মনে মনে উপহাস করবে—হয়তো ভাববে—"

"না, না—তা কেন—"

"একটা প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে—"

"কি বল।"

"যা শুনলে তা কারো কাছে বলবে না। আমার বিয়ের কথা কেউ ঘুণাক্ষরে যেন না জানতে পারে।"

"আচ্ছা—। তাই হবে। এবার যাই তাহলে—"

"না, ওপরে চল। বিয়ের নিমন্ত্রণটা আগেই খেয়ে নাও। গাঁট্টা পোলাও আর মাটনের কোর্মা করেছে। চল—"

নবকিশোরকে লইয়া উৎসাহ উপরে চলিয়া গেল।

।। পনেরো ।।

ইহার পর দুইদিন নবকিশোর উৎসাহের দেখা পাইল না। নিজের বিবাহ ব্যাপারে সে তো অন্যমনস্ক ছিলই, কলেজে আর একটা ব্যাপার হওয়াতে সে আর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। খবরের কাগজে বার্নাডো সাহেবের বিরুদ্ধে মন্তব্য বাহির হইবার পর হইতে বার্নাডো সাহেব ঠিক ঘড়ি ধরিয়া আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। আসিয়াই তিনি 'রোল-কল' করাইতেন। যে সব ছেলেরা ঠিক আটটার সময় উপস্থিত হইতে পারিত না, তাহারা 'পারসেন্‌টেজ্‌' হারাইতে লাগিল। এজন্য ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ ধোঁয়াইতেছিল, সেদিন তাহা অপ্রত্যাশিতরূপে এক অঘটন ঘটাইয়া বসিল। বার্নাডো সাহেব আসিয়া তাঁহার জুনিয়ার হাউস সার্জেনকে বলিলেন, 'রোল-কল' কর। জুনিয়ার হাউস সার্জন কিন্তু রোল-কল না করিয়া বিব্রতভাবে এদিকে এদিকে চাহিতে চাহিতে এ টেবিলে সে টেবিলে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন।

"কি করছ, রোল-কল কর। আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে—"

"রোল-কলের খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না সার। একটু আগে এই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কোথায় গেল বুঝতে পারছি না।"

গর্জন করিয়া উঠিলেন কর্নেল বার্নাডো।

"অমন একটা দরকারী খাতা তুমি যেখানে সেখানে রেখে দিয়েছিলে! তোমার হাতে করে রাখা উচিত ছিল। এখন কি করবে?"

সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কর্নেল বার্নাডোই অবশেষে কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। তিনি হসপিটাল সুপারিন্‌টেন্ডেন্টকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—"সামনের গেটটি ছাড়া মেডিকেল কলেজের আর সব গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দাও। যে গেটটি খোলা থাকবে সেখানে একজন লোক বসে থাকুক। আমার লেখা অনুমতিপত্র ছাড়া সে গেট দিয়ে কাউকে বেরুতে দেবে না। একটা দরকারি খাতা এখুনি হারিয়ে গেছে। তদন্ত করবার জন্য আমি টেগার্ট সাহেবকে এখুনি ফোন করছি।"

স্তম্ভিত বিস্মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সকলে। একটু পরেই স্বয়ং টেগার্ট সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়াই বার্নাডো সাহেবকে জিজ্ঞাসর করিলেন—"কি হারিয়েছে—"

"রোল-কলের খাতা।"

"কোথায় ছিল সেটা।"

জুনিয়র হাউস সার্জন বলিলেন—"এই টেবিলের উপর রেখেছিলাম।"

"ঠিক মনে আছে?"

"ঠিক মনে আছে। এই টেবিলেই রোজ রাখি।"

টেগার্ট সাহেব ওয়ার্ডের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন। ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে একটা বিছানায় রোগী ছিল না। খালি বিছানায় গদিটা পাতা ছিল শুধু। টেগার্ট সাহেব গটগট করিয়া সেই গদিটার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং গদির কোণটা তুলিয়া ধরিলেন। রোল-কলের খাতাখানা বাহির হইয়া পড়িল। টেগার্ট সাহেব একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত ওয়ার্ডটা যেন থমথম করিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত ছাত্রেরা একযোগে বাহির হইয়া গেল ওয়ার্ড হইতে। কমনরুমে। গিয়া একটা মীটিং করিল তাহারা। ঠিক হইল যে বার্নাডো সাহেব তাহাদের পুলিশ ডাকিয়া অপমান করিয়াছে, যে বার্নডো সাহেবের ওয়ার্ডে তাহারা আর যাইবে না। ইহার জন্য তাহাদের যদি ছয় মাস নষ্ট হয় হোক। মীটিংয়ের পর নবকিশোরের মনে পড়িল ডাক্তার পুলিন মিত্রের সহিত দেখা করা দরকার। বিরাট পণ্ডিত তাঁহার মেয়ে জামাইয়ের কুষ্ঠি গণনা করিয়া খামের যে চিঠিটা দিয়েছেন সেটি তাঁহাকে দিতে হইবে। তাছাড়া হাতভাঙা রামেশ্বর পাণ্ডের কবে অপারেশন হইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। পুলিন মিত্র অপারেশনের জন্য পুট আপ্ (put up) না করিলে তো অপারেশন হইবে না।

উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে গিয়াই পুলিন মিত্রের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

"আরে কি খবর! তোমরা শহীদ হবার মতলবে আছ না কি। শুনলাম টেগার্ট সাহেব তোমাদের ওয়ার্ডে এসেছিলেন। তোমরা না কি বড় সায়েবের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক করেছ!"

নবকিশোর সত্য বিবরণ বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, "পুলিশ আনাতে সকলে বড় অপমানিত বোধ করেছে।"

"দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামে একজন কবি ছিলেন জান?"

"যার লেখা সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত—"

"হ্যাঁ তিনি। তাঁর সেরা লেখা হচ্ছে 'হাসির গান'। তাতে একটি কবিতা আছে—জিজিয়া কর। সে কবিতার প্রথম কলিটি হচ্ছে এই—

'পাঁচশ' বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদায়
এইটি কি আর সইবে না কো দুঘা বেশী জুতার ঘায়
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা দেনা বাবা
দুঘা বেশী দুঘা কমে এমনি কি আর আসে যায়'

আমারও পরামর্শ হচ্ছে দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে এমনি কি আসে যায়। সহ্য করে যাও। আখেরে ভালো হবে। শ্বেতাঙ্গরা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের প্রভু। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার তাগদ কৃষ্ণাঙ্গদের নেই। মিটিয়ে ফেল। বিরাট পণ্ডিতের কাছ থেকে কোনও খবর পেয়েছ?"

"এই যে তিনি কুষ্ঠি গণনা করে দিয়েছেন।"

খামটি বাহির করিয়া সে পুলিন মিত্রের হাতে দিল। পুলিন মিত্র তখনই সেটা পড়িলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিততর হইতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর নবকিশোরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—'বোগাস'।

"কেন, কি লিখেছেন।"

"দেখ।"

নবকিশোর পড়িতে লাগিল।

সবিনয় নিবেদন,

মিত্র মহাশয়, আপনার কন্যা, জামাতা, এবং আপনার কুষ্ঠিটা দেখিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উত্তরটি আনন্দজনক হইলে আপনিও সুখী হইতেন, আমিও হইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি আনন্দজনক নহে। আপনার কন্যার বৈধব্য অনিবার্য। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব বিচার করিলে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রেই মানব-মনীষার শেষ সীমা নয়। জ্ঞানের আরও নানা দিগন্ত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধানই যদি মানিতে চান তাহা হইলে প্রতিকারার্থে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে-সব নির্দেশ আছে তাহাও মানিতে হইবে। আপনার মেয়েকে নীলা, গোমেদ ও সীসা ধারণ করানো উচিত। প্রত্যহ দক্ষিণা কালীর পূজার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আপনার আগ্রহ থাকিলে আমি এ সব বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে পারি। মেয়েকে যদি নীলা ও গোমেদ ধারণ করাইতে চান, যে-কোনও দোকান হইতে কিনিবেন না। প্রকৃত রত্ন অনেকেই চেনে না। জুয়াচোরেরও অভাব নাই। ন্যায্য মূল্য লইয়া আমি আপনাকে রত্ন সরবরাহ করিতে পারি। দুইটি রত্নে আন্দাজ পাঁচশত টাকা খরচ পড়িবে। ভগবান আপনার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করুন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিরাটেশ্বর শর্মা

নবকিশোর চিঠিটা পড়িয়া ফেরত দিল।

পুলিন মিত্র বলিলেন, "এক গ্লাস শরবতের আশায় গিয়েছিলাম। এক বোতল কুইনিন মিকশ্চার পাঠিয়ে দিয়েছে লোকটা। রত্ন ধারণ করাবার ফিকিরে আরও কিছু দোহনও করতে চায়। বোগাস।"

নবকিশোর প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইল।

"ওই হাত-ভাঙা কেসটাকে কবে পুট্ আপ্ করবেন সার।"

"ও তো বেশ শাঁসালো মাল হে! চট্ করে 'পুট্ আপ্' করে দিলে কিছুই পাব না যে। একটু খেলাতে হবে।"

"কিন্তু ও বেশীদিন হাসপাতালে থাকতে পারবে না। পনেরো দিন পরে ওকে বোম্বে যেতেই হবে।"

"কিছু টাকা ছাড়ুক। কালই পুট্ আপ্ করে দিচ্ছি! তুমি একটু হিন্ট্ (hint) দাও না।"

"সে আমি পারব না সার—"

"না পারবার কি আছে এতে! জীবনে ওই তো করতে হবে, নানা ফিকিরে টাকা রোজগার করাই তো জীবনের লক্ষ্য। তোমার বিরাট পণ্ডিতও ওই করছেন। তুমি পারবে না কেন।"

"ওসব কথা বলতে আমার, মানে—"

"মানে বুঝেছি। তুমি একটি অপদার্থ। আচ্ছ, আমিই ব্যবস্থা করে নেব এখন। তুমি যাও।"

কথাটা শুনিয়া নবকিশোর কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিল সে। বাহিরে আসিয়া সে অনুভব করিল মনে মনে নিরন্তর সে যাহার কথা ভাবিতেছে সে কোথায়? উৎসাহের নাগাল সে কবে পাইবে? সত্যিই কি তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে? সত্যই কি সে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ওই কালো কুৎসিত অলক্ষণা মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে? মেসের দিকে যাইতে যাইতে একটি প্রশ্নই সে বার বার নিজেকে করিতে লাগিল। উৎসাহ যাহা করিয়াছে সে কি তাহা করিতে পারিত? নিজের মায়ের কথা মনে পড়িল তাহার। মায়ের খুব শখ ছিল তাহাকে সাজাইবার। নানারকম শৌখিন জামা জুতা কাপড় কিনিতেন তাহার জন্য। তাহার কিন্তু মোটেই বাবু সাজিবার ইচ্ছা হইত না। মায়ের কেনা অনেক জামা জুতা সে পরে নাই। স্কুল-জীবনে সে জুতাই পরিত না। টুইল শার্ট আর মিলের সাধারণ ধুতি পরিয়াই স্কুলে যাইত। মা জমিদারের মেয়ে ছিলেন, তাঁহার এসব পছন্দ হইত না। সে বরাবর থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়িতে চায়, ইহাও মায়ের ঘোর আপত্তির কারণ ছিল। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে সে সেকেন্ডে ক্লাসে চড়িয়াছে বটে, কিন্তু একা যখনই যেখানে গিয়াছে, থার্ড ক্লাসে গিয়াছে! মায়ের এসব ইচ্ছা পূর্ণ করা কি তাহার উচিত ছিল? খুব ছেলেবেলায় মা তাহার মুখে দুধের সর আর কাঁচা হলুদ জোর করিয়া মাখাইতেন, তাহার পর জোর করিয়া চিরুনি দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতেন। নবকিশোরের মোটেই এসব ভালো লাগিত না। নিজের মায়ের কথাই নানাভাবে মনে পড়িতে লাগিল তাহার। কাল বুলু তাহার জন্য একটা সোনালী রঙের পাম্‌শু কিনতে চাহিয়াছিল। সে কিন্তু সেটা কেনে নাই, একটা 'সোবার' বাদামী রঙের কিনিয়াছে। তাহার

মনে হইল মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন হয় তো ওই সোনালী রঙেরটাই কিনিবার জন্য জেদ করিতেন। মেসের সামনে আসিয়া দেখিল তাহাদের গাড়িটা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হর্সুখ স্টিয়ারিং ছাড়িয়া নামিয়া আসিল এবং সেলাম করিল।

"মাতাজি উপর গ্যয়ী।"

উপরে গিয়া নবকিশোর দেখিল তাহার বউদি, বুলু এবং আর একটি অপরিচিতা ভদ্রমহিলা তাহার ঘরে বসিয়া আছেন। গদ্গদ মিঠ্ঠুর হাতে একটি প্রকাণ্ড টিফিনকেরিয়ার, উল্লসিত যোগেন বউদির পায়ের ধূলা লইতে লইতে গান ধরিয়াছে—

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ—"

"কি ব্যাপার!"

"বউদি আমাদের জন্যে এক টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি পানতোয়া এনেছেন। কাণ্ড দেখেছ! টিফিন-কেরিয়ারের সাইজ দেখ। পানতোয়াও ম্যাগনাম্ (magnum) সাইজের!"

শ্রবণা বলিলেন, "বাড়িতে ভিয়েন বসেছে যে। তাই তোমাদের জন্যে নিয়ে এলাম কিছু। সবাই না খেলে কি আনন্দ হয়—"

"হায় বউদি, আপনার মতো একথা যদি সবাই বুঝত! সেদিন এক জায়গায় নিমন্ত্রণ খেতে গেছি, একটি মাত্র ছোট্ট রসগোল্লা নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে জিগ্যেস করছে—দেব? দেব? আরে বাবা, নেমন্তন্ন করেছিস, দিবি না কেন! সবাই অপচয় বাঁচাতে ব্যস্ত আজকাল!"

"আমি কিন্তু এবার উঠব ভাই। সুহাসকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। নবু, ইনিই আমার বান্ধবী সুহাস। একজন পিয়ানো স্পেশালিস্ট। যে পিয়ানোটা কাল দেখে এসেছি সেটা একেও একবার দেখিয়ে নিতে চাই। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?"

"আমার এখনও খাওয়া হয়নি যে।"

"চল না ওই অঞ্চলেই কোনও ভালো হোটেলে ঢুকবো আমরা। সুহাসকে লাঞ্চ (lunch) খাওয়াব বলে নিমন্ত্রণ করে এনেছি। তুমিও চল।"

যোগেন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "বউদি, আমারও পিয়ানো সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি ছেলেবেলায় পিয়ানো বাজাতাম।"

"বেশ, তুমিও চল তাহলে—"

যোগেন সঙ্গে সঙ্গে মিঠ্ঠুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মিঠ্ঠু আমরা দুজনে তাহলে চললুম। আমাদের ভাতটা তোমরাই খেয়ে নিও। বউদির আদেশ অমান্য করতে পারি না।"

মিঠ্ঠু সবিস্ময়ে বলিল, "আমাদের ভাত তো রেঁধেইছে।"

"তাহলে দিয়ে দাও কাউকে—কিংবা—"

"বেশ। সে যা হোক আমি করব। এ মিষ্টিগুলো কখন খাবেন।"

"রাত্রে। এখন তুমি প্রত্যেকের ঘরে কিছু কিছু দিয়ে এস। বাকিটা আমাদের জন্যে রেখে দিও।"

বুলু নবকিশোরকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিল, "কাকা শোন, একটা কথা আছে।"

নবকিশোরকে গাড়িবারান্দায় লইয়া গেল সে।

"রেডিওটাতে আজ নাম লেখাতে দেব। কি লিখতে বলব বল তো? প্রমীলা দেবী, না প্রমীলা মুখোপাধ্যায়।"

"মুখোপাধ্যায়ই তো ভালো।"

"তাই, না? আমিও তাই ভাবছিলাম। চল তাহলে, তাই বলে দিই গে—"

"বুলু, আমারও আর একটা কথা মনে হচ্ছে। কাল জোর করে এই বাদামী পাম্‌শুটা কিনলুম বটে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সোনালীটা কিনলেই হত! বাদামীটা কি ওরা ফেরত নেবে?"

"নিশ্চয় নেবে। আর ফেরত দেবার দরকার কি। সোনালিটাও কিনেনি চল। দু জোড়া থাকলে বা ক্ষতি কি।"

ঘরের ভিতর হইতে শ্রবণা তাগাদা দিলেন।

"নবু আর দেরি কোরো না, চল। সুহাসকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি—"

সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। মেয়েরা আগে নামিয়ে গেলেন। যোগেন ও নবকিশোর পিছনে ছিল। নবকিশোর যোগেনকে প্রশ্ন করিল—"তুমি পিয়ানো বাজাতে পার না কি।"

যোগেন হাসিয়া উত্তর দিল—"একদম না। কিন্তু ভালো হোটেলে লাঞ্চ খাওয়ার সুযোগ তো রোজ জুটবে না। আর বউদি আমাকে পরীক্ষাও করবেন না। তাই একটা গুল চালিয়ে দিলাম। তবে ওখানে ফপরদালালি যা করব তাতে তাক লেগে যাবে সকলের। তুমি কেবল দয়া করে সব ফাঁস করে দিও না যেন। ভালো কথা, কাল ওয়ার্ডে যাচ্ছ না তো?"

"না। সবাই যখন ঠিক করেছে তখন আমি একা যাব কেন।"

"গুড্। দেখাই যাক না কি করে—"

সকলকে লইয়া মোটর চৌরঙ্গীর দিকে চলিয়া গেল।

।। ষোলো ।।

বিরাট পণ্ডিত বোম্বে হইতে সকালের ট্রেনেই ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু হওড়া হইতে তিনি সোজা বাড়ি যান নাই। সন্ধ্যার পর একটা ছ্যাকড়া গাড়ি করিয়া তিনি ব্রাড়ি ফিরিলেন। সঙ্গে একটি অতি কুৎসিত নয় দশ বছরের মেয়ে। রং কালো, নাক বসা, চোখ ট্যারা, মাথায় টাক। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন—"গাঁট্টা, গাঁট্টা, কপাট খোল—"

কপাট বন্ধ ছিল। গাঁট্টা আসিয়া কপাট খুলিয়া দিতেই বিরাট পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন—"উচ্ছে বাড়িতে আছে তো?"

"না। দুদিন থেকে আসেনি। আপনি চলে যাবার পরদিন এসেছিল। তারপর যে চলে গেছে আর আসেনি।"

"আসেনি? নবকিশোর এসেছিল?"

"না, তিনিও আর আসেননি।"

"আসেনি! কেউ আসেনি?"

বিরাট পণ্ডিত কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিলেন, "একে ভিতরে নিয়ে যা। খেতে দে—"

"এ কে'—বিস্মিত গাঁট্টা প্রশ্ন করিল।

"সে খোঁজে তোর দরকার কি! তোকে যেমন একদিন কুড়িয়ে এনেছিলাম, একেও তেমনি এনেছি। আর একটা তীর্থের কাক। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করব, তারপর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। সব জেনে শুনেই এনেছি। তোর নাম কি রে।"

মেয়েটি সসঙ্কোচে উত্তর দিল—"পুষ্প"।

"নামের বাহার আছে তো। একে খেতে দে আগে। খাবার আছে তো ঘরে?"

"ওবেলার মাংস ভাত আছে, উচ্ছের জন্য রেঁধে রেখেছিলাম। এস, ভিতরে চল—"

"ওকে খেতে দিয়ে ভৈরব ডাক্তারকে খবর দে। মেয়েটা রুগ্ন। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এখনি—"

গাঁট্টা পুষ্পকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বিরাট পণ্ডিত গাড়োয়ানকে দিয়া ট্রাঙ্ক বিছানা বাস্কেট নামাইয়া লইলেন। তাহার পর তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকিলেন না। হনহন করিয়া তিনি অতুলের দোকানের দিকে চলিতে লাগিলেন। অতুল একটি বেহালা মেরামত করিতেছিল। উদ্‌ভ্রান্ত বিরাট পণ্ডিতকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি দোকান হইতে নামিয়া আসিল।

"উচ্ছের খবর জান?"

"না, দু তিন দিন তাকে দেখিনি তো।"

"নবকিশোরের?"

"না, তিনিও আসেননি।"

"নবকিশোর তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকে। তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তুমি কি যেতে পারবে।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি।"

"যদি দেখা পাও উচ্ছের খবরটা জিগ্যেস কোরো। আর যদি আসতে চায় নিয়ে এস তাকে—"

অতুল তবু বিরাট পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন কিছু বলিবে, অথচ বলিতে সাহস করিতেছে না। তিনি যে জরির খোঁজে বম্বে চলিয়া গিয়াছেন এ খবর সে গাঁট্টার মুখে শুনিয়াছিল।

"অমন করে চেয়ে আছ যে—"

"জরিদির—"

বিরাট পণ্ডিত তাহার কথা শেষ করিতে দিলেন না। "যে মেয়েকে পুলিশরা ধরে রেখেছিল সে জরি নয়। অন্য মেয়ে। জরি আর ফিরবে না। তবু আমি চেষ্টায় ত্রুটি করব না। পুলিশকে দিয়ে লন্ডনে, প্যারিসে, রোমে, বার্লিনে, মস্কোতে, সুইজারল্যান্ডে, বেলজিয়ামে, সুইডেনে, আমেরিকায় সব জায়গায় 'কেব্‌ল্‌' (cablc) করিয়েছি । অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার। কিন্তু তবু আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব তাকে খুঁজে বার করবার। উচ্ছেও মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। জানি, সেও আসবে না। তবু আমি

চেষ্টা করে যাব। তোমার চোখে হাসি চিকমিক করছে কেন? ভাবছ এইবার নেমেসিস্ (Nemesis) এসে গেছে? আমি জীবনে কোনও প্রতিধ্বনিকে কোনো 'একো'কে (Echo) আমোল দিইনি বটে, কিন্তু তবু কোনো 'নেমেসিস্' আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমি শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে লড়াই করে যাব। তুমি যদি উচ্ছের খবরটা আনতে পার। আমি বাড়িতেই আছি।"

বিরাট পণ্ডিত বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন ভৈরব ডাক্তার বসিয়া আছেন। ভৈরব ডাক্তার সেকালের ক্যাম্বেল পাস ডাক্তার। বিরাট পণ্ডিতের বাড়ির কাছেই তাঁহার ডিস্‌পেন্সারি। ছোটলোক মহলে তাঁহার খুব প্র্যাকটিস। চাব আনা, এক টাকা যে যাহা দেয় বা যাহার কাছে যতটা আদায় করিতে পারেন তাহাতেই সন্তুষ্ট তিনি। বিরাট পণ্ডিতেরও যখন দরকার হয় তাঁহাকেই ডাকেন। ডাকিলেই ছুটিয়া আসেন ভৈরব, কারণ তিনি বিরাটের গুণমুগ্ধ ভক্ত একজন। একদা ভৈরবের হাত দেখিয়ে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন বিরাট পণ্ডিত এবং সেই জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। ভৈরব ডাক্তারের চেহারাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার মুখটি বিড়ালের মুখের মতো। এক জোড়া সুপুষ্ট লাল রঙের গোঁফ আছে, চোখের তারাও কটা। মাথার সামনের দিকে প্রশস্ত টাক, পিছনের দিকের চুলগুলিও লাল রঙের। কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের একটি বড় ফোঁটা। আড়ালে সকলে তাঁহাকে 'লাল ডাক্তার' বলে দেখিলেই বোঝা যায় তিনি প্রচুর পান খান, পুষ্ট ওষ্ঠাধরও পানের রঙে রঞ্জিত। বিরাট পণ্ডিতকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমাকে ডেকেছেন কেন পণ্ডিতমশায়।"

"আর একটা তীর্থের কাক জুটেছে। দেখ্ তো ওটাকে, মনে হচ্ছে খুব রুগ্ন। ওর চিকিৎসার ভার নাও। ওরে গাঁট্টা, পুষ্পকে নিয়ে আয়।"

একটু পরেই পুষ্পকে লইয়া গাঁট্টা প্রবেশ করিল।

"খেয়েছিস?"

পুষ্প ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খাইয়াছে।

গাঁট্টা বলিল—"মাংস ভাত খেয়েছে।"

বিরাট পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি ভৈরবের জন্যে এক কাপ কড়া কফি তৈরি কর। আর আমার সঙ্গে যে খাবার বাস্কেটটা এসেছে তার ভিতর খুব ভালো মটন কাটলেট আছে খানচারেক। আমি দুপুরে একটা হোটেল থেকে এক ডজন আনিয়েছিলাম; সবগুলো খেতে পারিনি। ওগুলো গরম করে ভৈরবকে দাও।"

ভৈরব ডাক্তার বিড়ালের মতোই চোখ মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। একটু আগেই তিনি এক গ্লাস সিদ্ধি খাইয়াছেন, এখন আর কিছু খাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তিনি বিরাট পণ্ডিতকে চেনেন।

"মেয়েটাকে দেখ তো ভালো করে।"

ভৈরব ডাক্তার তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করিলেন—"সিফিলিস।"

"ওইটুকু মেয়ের?"

"কন্‌জেনিটাল (congenital)"

"তা হতে পারে।"

"কোথা থেকে আনলেন ওকে।"

"সোনাগাছি থেকে। ঘাগী বেশ্যা পাঁচির কাছে দাসীবৃত্তি করছিল। পাঁচি অনেকদিন আগেই বলেছিল, 'আপনি ওকে নিয়ে যান, আমি ওকে আর পুষতে পাচ্ছি না। আমার নিজেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলুচ্ছে না আজকাল।' আজ তাই নিয়ে এলাম। এখানেই থাক—"

ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আবার একটা ঝামেলা জোটালেন—"

"তুমি সিদ্ধি খেয়েছ বুঝি? তাই বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে গেছে, তাই বুঝতে পারছ না যে জীবন আর ঝামেলা শব্দ দুটো সিননিমাস্ (synonymous), একার্থবোধক। জীবন মানেই ঝামেলার সঙ্গে লড়াই করা। আর সেই লড়াই-করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, তার পুরুষকারের পরীক্ষা। কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? নিরালম্ব হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি আমার নাই। বাঁচতে হলে অবলম্বন চাই।"

ভৈরব ডাক্তার সভয়ে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"অবলম্বন তো আপনার আছে পণ্ডিতমশাই—"

"না, নেই। উচ্ছে জরি সব সরে পড়েছে। লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়েছে, এখন আর থাকবে কেন। গাঁট্টাটার লেখাপড়া কিছু হয়নি, ছেলেবেলায় মাস্টারের মাথায় গাঁট্টা মেরে রাসটিকেটেড (rusticated) হয়ে গিয়েছিল, আমি ছাড়া আর গতি নেই, তাই টিঁকে আছে। কিন্তু ওকে নিয়ে মন ভরে না। ও কেমন যেন বোদা গোছের। আমি যাকে নিয়ে তলোয়ারের খেলা খেলতে চাই, সে-ও ভালো খেলোয়াড় না হলে খেলা জমে না। জরি উচ্ছে দুজনেই ভালো খেলোয়াড় ছিল। ওরা সরে পড়েছে। ভেবেছে আমাকে কাবু করে দেবে। কিন্তু কাবু হবার লোক আমি নই। ওরকম শত শত জরি উচ্ছে আমি সৃষ্টি করতে পারি। আমি ভগবান—"

ভৈরব ডাক্তার এ কথা শুনিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া টাকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। বিরাট পণ্ডিত ভৈরব ডাক্তারের এই দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গী দেখিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি ভাবছ এটা ভারী অহংকারের কথা হল? অহংকারের কথা নয়, সত্য কথা। শংকরাচার্য বলেছেন—আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহংকার নই—আমি শুধু শিব। কিন্তু বিরাট পণ্ডিত বলতে চায়, আমি মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রতিভা, পুরুষকার—আমি স্রষ্টা ভগবান। হয়তো আমার সৃষ্টি হিমালয় বিন্ধ্যাচলকে মহাকাল শিব এক লাথিতে চুরমার করে দেবে শেষকালে, তবু আমি থামব না, আবার সৃষ্টি করব নূতন হিমালয়, নূতন বিন্ধ্যাচল—"

গাঁট্টা কফি ও কাটলেট লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে পুষ্পও প্রবেশ করিল একটি ছোট টুল লইয়া।

"ওটা ডাক্তারবাবুর সামনে রাখ।"

টুলটি রাখিয়া সে একছুটে ভিতরে চলিয়া গেল এবং এক গ্লাস জল এবং ও একটি গামছাও লইয়া আসিল।

ভৈরব ডাক্তার কফিতে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, "বাঃ! চমৎকার।"

"কাটলেট খেয়ে দেখ দিকি। করিমের দোকানটা ছোট্ট কিন্তু কাটলেট করে ভালো। নামজাদা দোকানগুলিতে এ রকম টেস্টও হয় না, 'সাইজ'ও হয় না।"

কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভৈরব বলিলেন, "বাঃ খাশা—"

"এই মেয়েটার এখন কি করবে বল দিকি।"

ওকে ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ওর রক্তটা নেব। আগে ভাসারম্যান্ (Wassermann) টেস্টটা করাই। পজিটিভ্ হবেই! রিপোর্ট এলে তারপর ইনজেকশন শুরু করব।"

"রক্তপরীক্ষা করতে কত লাগবে।"

"চারুবাবু ষোল টাকা নেন—"

বিরাট পণ্ডিত বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিলেন।

"এই নাও। বত্রিশ টাকা দিলুম। ষোল টাকা চারুবাবুর আর ষোল টাকা তোমার—দরকার হলে পরে আরও দেব। মেয়েটাকে ভালো করে তোল দিকি। দুধ রাখবার আগে বাসনটা পরিষ্কার হওয়া চাই।"

ভৈরব ডাক্তার কাটলেট চিবাইতেছিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না। কাটলেটটি গলাধঃকরণ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে আবার টাকা কেন!"

"যেখানে যা পাচ্ছ খুঁটে তুলে নাও। আমরা সবাই তীর্থের কাক, সামনে যা পাই টপ্ করে তুলেনি, ওইটেই আমাদের স্বভাব। ভণ্ডামি করছ কেন।"

ভৈরব ডাক্তার মৃদু হাসিয়া আর একটি কাটলেট মুখে পুরিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে।

বিরাট পণ্ডিত একা নীচের ঘরে বসিয়া একটা মানুষের মাথার খুলি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে 'অ্যানাটমি' (anatomy) অধ্যয়ন করিতেছিলেন। পুষ্প আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঁট্রুকে তিনি অতুলের দোকানে বসাইয়া রাখিয়াছেন। অতুল ফিরিলেই তাহাকে যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। নিস্তব্ধ বাড়িতে একা ওঘর হইতে এঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তিনি। উৎসাহের ঘরে ঢুকিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার পর উৎসাহের হাড়ের বাক্সটা তাঁহার চোখে পড়িল। মড়ার মাথাটার শূন্য অক্ষিকোটর, বীভৎস হাসি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন তিনি। পাশের বইয়ের শেল্‌ফে উৎসাহের ডাক্তারি বইগুলিও সাজানো ছিল। গ্রে সাহেবের লেখা বিখ্যাত অ্যানাটমির বইটিও তাঁহার চোখে পড়িল।

"এইটে নিয়েই সময় কাটানো যাক—"

গ্রের অ্যানাটমি আর মড়ার মাথাটা লইয়া তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি হইতে এক অদ্ভুত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সহসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি খুলিটার কপালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"ললাটলিপি কি কপালের এই হাড়ের উপর লেখা থাকে? কিন্তু কই?"

বাহিরে মোটর থামার শব্দ হইল। তিনি অ্যানাটমি ও মড়ার মাথা সরাইয়া রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিলেন। অতুল আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু গাঁট্রাও। গাঁট্রা সোজা উপরে চলিয়া গেল।

"তোমার এত দেরি হল?"

"নবকিশোরবাবু মেসে ছিলেন না। চাকরটা বললে তাঁর যে বাড়ি থেকে বিয়ে হবে সেই হরিশ মুকুজ্যে রোডের বাড়িতে গেছেন তিনি। ঠিকানা জানতাম। সেখানে গেলাম। সেখানেও দেখলাম তিনি নেই। তাঁর দাদা বললেন, সে একটু বেরিয়েছে, এখুনি আসবে, আপনি বসুন একটু। একঘণ্টা পরে নবকিশোরবাবু এলেন। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম তাঁর মেসে। তিনি বললেন, তিনিও উচ্ছেকে দুদিন দেখেননি। উচ্ছে কোথায় আছে তা-ও তিনি জানেন না। এর বেশী তিনি আর কিছু বলতে চাইছিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বললেন, আমার মনে হয় উৎসাহ তার জেঠুর মানা শোনেনি। তাঁর অমতেই বিয়ে করেছে। বোধ হয় কাল তার বিয়ে হয়ে গেছে—"

"বিয়ে হয়ে গেছে!"

বিরাট পণ্ডিত যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

"নবকিশোরবাবুর সেই রকম আন্দাজ। ঠিক অবশ্য উনি কিছু বলতে পারলেন না। মনে হল বলতে চানও না।"

বিরাট পণ্ডিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অতুলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "তীর্থের কাক সব. আসে আর চলে যায়। ওতুলো, তুইও কি ত্যাগ করবি আমাকে? তোকেও শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত পড়িয়েছিলাম, সুতরাং আমাকে ঘৃণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে তোর! কিন্তু না, তুই পালাতে পারবি না। ওই পানের দোকানের খুঁটিতে তোর টিকি বাঁধা আছে। আমার এখানে থাকলে সরে পড়তিস এতদিন! তোরা সব পজিটিভ্ কারেন্ট্ (positive current), আমিও তাই। সুতরাং উই রিপেল্ ইচ আদার্ (we repel each other). একটা তীর্থের কাক আর একটা তীর্থের কাককে সহ্য করতে পারে না। এই নিয়ম, কিন্তু কোনো নিয়মের কাছে আমি কখনও নতি স্বীকার করিনি। এ নিয়মের কাছেও করব না। আমি আমার নিয়মে চলব। আরও তীর্থের কাক জুটিয়ে আনব আমি, ভাত ছড়িয়ে ছড়িয়ে। তুমি যাও, রাত হয়েছে। আমার জন্যে এত কষ্ট করলে—থ্যাংক ইউ (thank you)।"

অতুল কিছু বলিল না, প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিরাট পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘুম পাতলা হইয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিলেন। প্রকাণ্ড একটা ঈগল পাখি যেন একটা কাককে তাড়া করিয়াছে। সে ঈগল পাখি সাধারণ ঈগল পাখি নহে। বহুবর্ণসমন্বিত তাহার ডানা। বক্র চঞ্চুটি স্বর্ণময়। দুই চোখে যেন দুইটি চুনী জ্বলিতেছে। পায়ের নখরগুলিতে শাণিত ইস্পাতের দ্যুতি। কাকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়িয়া চলিয়াছে। বিরাট পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন তিনি। বসিয়া অনুভব করিলেন একটা তীব্র মধুর গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। কিসের গন্ধ? তাঁহার আতরের শিশি কি উল্টাইয়া গিয়াছে? তাকের উপর চাহিয়া দেখিলেন। না গোলাপী, খস্, মুস্কি, চামেলি—সমস্ত আতরের শিশিগুলিই তো যথাস্থানে রহিয়াছে। এ গন্ধ তো আতরের গন্ধ নয়, এ যে অপূর্ব,

অদ্ভুত একটা পাগল-করা গন্ধ! সহসা তাঁহার মনে হইল তিনি যেন একটা শব্দও শুনিতে পাইতেছেন। রুম ঝুম, রুম ঝুম, রুম ঝুম। অলঙ্কারের শিঞ্জন-ধ্বনি। উৎসাহের ঘরে কে যেন নুপুর পায়ে দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"কে—কে—কে"

চীৎকার করিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত। শব্দ থামিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎসাহের ঘরে গেলেন। কেহ নাই। মনে হইল উৎসাহের বালিশে মাথা রাখিয়া কে যেন শুইয়াছিল। একটু আগে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন বালিশে তো এ রকম ভাঁজ ছিল না। হাত দিয়া দেখিলেন বালিশটা ভিজিয়া গিয়াছে। কেহ যেন এখানে শুইয়া কাঁদিয়াছে। কে সে? সহসা বিরাট পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিলেন।

।। সতেরো ।।

পরদিন সকালে উৎসাহ হাসপাতাল আসিয়া হাজির হইল। উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডে গিয়া আগে খোঁজ করিল রামেশ্বর পাণ্ডাকে অপারেশনের জন্য 'পুট্‌ আপ' করা হইয়াছে কি না। দেখিল হয় নাই। শুধু তাহাই নয় রামেশ্বর পাণ্ডে আর হাসপাতালে থাকিতে চাহিতেছেন না। বলিতেছেন—এখানকার ডাক্তারবাবু 'পান' খাইতে চান। কিন্তু কত মূল্যের পান তাহা এখনও খুলিয়া বলেন নাই। সুতরাং এখন হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া পানের মূল্য লইয়া দরদস্তুর করিতে হইবে। তাহা তিনি করিতে ইচ্ছুক নন। বিলম্ব হইয়া যাইবে। উৎসাহের মাথায় দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "বেশ, আপনি এই মুহূর্তে হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথা যাব—"

"আপাতত গ্র্যান্ড হোটেলে চলুন। সেখানে আমি পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর ভাড়া নিয়েছি। সেইখানে চলুন এখন। তারপর যা করবার আমি করছি।"

"কি দরকার অত হাঙ্গামা করবার। আমি বম্বে চলে যাই। সেখানে গিয়ে যা হয় করব।"

"না, এখানেই ব্যবস্থা করে দেব সব; চলুন।"

"না, না মানে—"

রামেশ্বর পাণ্ডে ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"আপনাকে যেতেই হবে চলুন।"

উৎসাহের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রামেশ্বর পাণ্ডে বুঝিলেন আপত্তি করা চলিবে না, যাইতেই হইবে।

গ্র্যান্ড হোটেল সত্যই কয়েকখানা ঘর ভাড়া করিয়ছিল উৎসাহ। তাহারই একটাতে রামেশ্বর পাণ্ডে এবং তাঁহার অনুচরকে রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল। গেল সোজা উইলসন সাহেবের বাড়িতে। কার্ড পাঠাইল, মানে একটি কাগজে লিখিয়া দিল- মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র জরুরী দরকারে দেখা করিতে চায়। উইলসন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর পাকা গোঁফে তা দিয়া সহাস্যদৃষ্টিতে প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপার কি?"

"একটি রোগী দেখতে হবে। আমার আত্মীয়। এখনি যদি দেখতে পারেন ভালো হয়। সে গ্র্যান্ড হোটেলে আছে। বাইরে থেকে এসেছে। এখানে বেশীদিন থাকতে পারবে না।"

"চল এখুনি যাচ্ছি—"

উৎসাহ সসম্ভ্রমে চৌষট্টিটি টাকা টেবিলের উপর রাখিল। তখনকার দিনে সাহেবদের ফী ষোল টাকা ছিল, ইহা উৎসাহ জানিত। তবু ইচ্ছা করিয়াই সে বেশী টাকা আনিয়াছিল।

"তুমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তোমার আত্মীয় বলছ, তার কাছ থেকে আমি ফী নেব কি!"

উইলসন সাহেব আর একবার গোঁফে তা দিলেন।

"আমার ঠিক আত্মীয় নয়, চেনা লোক—"

"ও, আই সি। বেশ। আমার ফী ষোল টাকা। অত টাকা এনেছ কেন—"

উৎসাহ কিছু বলিল না। উইলসন সাহেব ষোল টাকা লইয়া বাকি ফেরত দিলেন।

উৎসাহের সঙ্গে গিয়াই উইলসন সাহেব রামেশ্বর পাণ্ডেকে দেখিলেন। বলিলেন, "মনে হচ্ছে এ আমার ওয়ার্ডে ছিল!"

"ছিল। কিন্তু ওয়ার্ডে অপারেশনের দেরি হবে বলে বাইরে চলে এসেছে। প্রাইভেটলি যদি কোনো নার্সিং হোমে রেখে করে দেন তাহলে ভালো হয়—"

"না। হাসপাতালেই করব। কালই করব। ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও আবার। আমি পুলিনকে বলে দিচ্ছি। কালই ওর অপারেশন হবে।"

পুলিন মিত্র উৎসাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মোটরে ধাক্কা লেগে তুমিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে না?"

"হ্যাঁ সার।"

"তাই মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে তোমার। এখনই ওকে ডিসচার্জ করিয়ে নিয়ে গেলে, আবার নিয়ে এসেছ ভর্তি করবার জন্য—"

"উইলসন সাহেবকে দেখিয়েছিলাম, তিনি যা বললেন তাই করেছি—"

সঙ্গে সঙ্গে উইলসন সাহেবও ওয়ার্ডে প্রবেশ করিলেন।

"পুলিন, এই ফ্রাক্‌চার্‌ কেসটাকে ভর্তি করে নাও। কালই ওর অপারেশন করব। এর একটু স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। আমাদের স্টুডেন্টের কেস—"

"ইয়েস সার—"

ত্রস্ত পুলিন মিত্র আদেশ পালন করিতে ছুটিলেন।

একটু পরে উৎসাহ একটি রূপার ডিবায় এক ডিবা পান ভর্তি করিয়া আনিয়া হাসিমুখে ডাক্তার মিত্রকে বলিল, "পাঁড়েজি আমাকে বললেন ডাক্তারবাবু পান খেতে ভালবাসেন, এঁকে কিছু মিঠা পান এনে দাও। তাই এইটে এনেছি সার।"

পুলিন মিত্র অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

।। আঠারো ।।

নবকিশোরের সুখের অবধি ছিল না। বউদির আগ্রহাতিশয্যে কাল সে প্রমীলাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সুন্দরী বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় প্রমীলা তাহা নহে। সে অপরূপ সুন্দরী। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর নয়, কিন্তু তাহা অবর্ণনীয়। তাহার আয়ত নয়নের লজ্জাস্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মার্জিত রুচির লাবণ্যময় প্রকাশ, তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখচ্ছবি, তাহার সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি নবকিশোরকে যে লোকে লইয়া গিয়াছিল, কোনও ভূগোলে তাহার নাম নাই। তাহা স্বপ্নালোক। তাহার দাদা বউদিদি, তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাচুর্যের আনন্দের তুফান বাড়াইয়া দিয়াছেন তাহা আন্তরিক, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা অনন্য। সত্যই নবকিশোরের সুখের অবধি ছিল না। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। এত সুখের মধ্যেও সে কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। এমন সুন্দর ঐকতানের মধ্যেও কি যেন একটা বেসুরা বাজিতেছিল। উৎসাহের কথা বারবার মনে পড়িতেছিল তাহার। তাহার জীবনের আলোকিত রঙ্গমঞ্চে উৎসাহের ছায়া একটা কালো প্রেতের মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নবকিশোর যদি সাধারণ স্বার্থপর লোক হইত, তাহার বন্ধুত্ব যদি আধুনিক ঠুনকো যুগের 'ফ্রেন্ডশিপ্'-এর ঊর্ধ্বে না উঠিতে পারিত, তাহা হইলে এই সময়ে, যখন সুখের সাগরে অনুকূল বাতাসে রঙীন পাল তুলিয়া তাহার সাধের তরণী ভাসিয়াছে, এমন করিয়া উৎসাহের কথা তাহার মনে পড়িত না। উৎসাহকে সত্যই সে ভালবাসিয়াছিল। কলিকাতা শহরের মেকি মুখোশ পরা জনতার মধ্যে উৎসাহের মধ্যে সে তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যাহা মেকি নয়, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, যাহা জীবন্ত, যাহা অনাবৃত, যাহা অনবদ্য। উৎসাহ যদি স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে ইহাকেই রোমান্টিক প্রেম বলা চলিত, হয়তো নবকিশোর পূর্বনির্দিষ্ট বিবাহ-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া উৎসাহকে বিবাহ করিবার জন্যই পাগল হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ উৎসাহ পুরুষ। পুরুষকে ঘিরিয়াও কিন্তু রোমান্টিক প্রেম হয়। সত্যই যাহা প্রেম তাহা নারী-পুরুষ বিচার করে না। উৎসাহের সহিত তাহার আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু নবকিশোরের মনে হইতেছে যে যেন তাহার চিরদিনের চেনা। তাহার আসন্ন বিপদ যেন তাহারই বিপদ, যে মেঘ তাহার ভাগ্যাকাশে ঘনাইয়া আসিয়াছে সে মেঘ কাটিয়া না গেলে তাহার যেন স্বস্তি নাই। অর্থ দিয়া, সামর্থ্য দিয়া, মনুষ্য-সাধ্য কোনো কিছু দিয়া যদি সে বিপদকে দূর করা সম্ভব হইত, নবকিশোর তাহা নিশ্চয় করিয়া ফেলিত। কিন্তু ওই শ্মশান-ভৈরবী, ওই মধুমতী, গ্রহনক্ষত্রের ওই অশুভ অবস্থান এমন একটা জটিল, রহস্যময়, অনিশ্চিত পরিবেশ যে কিছু করিবার উপায় নাই। বুদ্ধি দিয়া তাহা বিচারযোগ্য নহে, বিজ্ঞানের নিকষে তাহাকে যাচাই করিবার উপায় নাই। তবু তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কেমন যেন ভয় ভয় করে। উড়াইয়াই বা দিবে কি করিয়া? সে শ্মশান-ভৈরবীর ষোড়শী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মধুমতীর গন্ধে আকুল হইয়াছে, মধুমতীর দেওয়া মোহরের থলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে! উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? এখন দুরু দুরু বক্ষে কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার পর কি হয়। বিরাট পণ্ডিত কাল রাত্রে অতুলকে তাহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে ইচ্ছা করিয়াই উৎসাহের খবর যথাসম্ভব গোপন করিয়াছে। কতটাই বা সে জানিত? অতুল তাহাকে বিরাট পণ্ডিতের কাছে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ওই শীর্ণকান্তি বিশাল চক্ষু রোষ-দীপ্ত বিরাট পণ্ডিতের কাছে যাইতে তাহার সাহস হইল

না। পরদিন সকালে আসিয়াই যে খোঁজ করিল ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের ক্লাস কখন কখন। দেখিল দুপুরের আগে ক্লাস নাই।

হঠাৎ মহা কলরব করিতে করিতে যোগেন আসিয়া হাজির হইল।

"খবর শুনেছিস?"

"কিসের খবর।"

"বার্নাডো সাহেবের? ও যে এত 'গ্রেট' তা ধারণা ছিল না। ডাক্তার মজুমদার বললেন বার্নাডো সাহেব না কি বলেছেন যে রাগের মাথায় পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন বলে তিনি লজ্জিত। ছেলেরা ওয়ার্ডে জয়েন করুক। তাদের আমি একদিন খাইয়ে দেব। যে যা খেতে চায় তাই খাওয়াব। আমরা ঠিক করেছি দেশী বিদেশী দুরকম খানাই খাব। পেলেটি আর ভীম নাগ, নীলমণি আর নবীন ময়রা কাউকে বাদ দেব না। কি বলিস?"

নবকিশোর স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার পেটের খবর কি—"

"ভালো নয়। অ্যাকোয়া টাইকোটিস্ আর এসিড্ হ্'ইড্রোক্লোরিক ডিল, এদের ভরসাতেই যুদ্ধ করে যাচ্ছি। সুনীলদা বলেছেন একটা কোর্স 'এমিটিন' দেবেন আমাকে। বড্ড ব্যথা হয় ভাই। তোর বিয়েটা চুকে যাক। ফিস্ট-টিস্টগুলো খেয়েনি, তারপরে দেখা যাবে। চল্ এখন ওয়ার্ডে যাওয়া যাক—"

বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিয়াছিলেন। সমবেত ছাত্রদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আজ রোলকল হবে না। আজ সকলেই পারসেন্টেজ পাবে। তোমরা স্ট্রাইক করেছিলে বলে আমি রাগ করিনি। বরং তোমাদের যে আত্মসম্মানবোধ আছে এ দেখে আমি খুশী হয়েছি। আমার ছাত্রেরা যে ভেড়া নয়—মানুষ, এ খবর আনন্দজনক। আমার সঙ্গে এক বিরাট পণ্ডিতের আলাপ আছে। তিনি একজন বহুদর্শী বিদ্বান লোক। তিনি বলেন—পৃথিবীর বিশাল মন্দিরে আমরা সবাই কাকের দল। যেখানে যতটুকু খাবার পাই ছোঁ মেরে তুলেনি। বেগতিক দেখলে উড়ে পালাই। বিরাট পণ্ডিত নিজেকেও কাক বলেন। কিন্তু আমি জানি—হি ইজ্ মোর দ্যান্ এ মিয়ার ক্রো (he is more than a mere crow)—হি ইজ্ এ ফাইটার (he is a fighter)—যদিও তিনি খুব বড় একজন জ্যোতিষী তবুও তিনি কাউকে বলেন না তুমি ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার কর। বলেন, তুমি মানুষ, তুমি যোদ্ধা, তুমি বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে সেই ফাইটিং স্পিরিট (fighting spirit) দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। ডাক্তার মজুমদারকে বলেছি একটা ফিস্টের (feast) আয়োজন করতে। তোমরা কে কি খেতে চাও তাঁকে বোলো। একটা কথা আশা করি তোমরা মনে রাখবে, নর্ম্যাল হিউম্যান স্টমাকের (normal human stomach) কেপাসিটি (capacity) চার আউন্সের বেশী নয়। এইবার এস আমরা এই টাইফয়েড রুগীটাকে পরীক্ষা করি। এটা ওর থার্ড উইক (third week) শুরু হয়েছে, ওর এখন যা অবস্থা সেটাকে আমরা বলি টাইফয়েড স্টেট (typhoid state)."

বার্নাডো সাহেব একঘণ্টা ধরিয়া টাইফয়েড সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু আমি যা বলছি তা তোমরা যেন বেদবাক্য বলে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে সেটা যাচিয়ে নেবে, বাজিয়ে নেবে। তোমাদের বেডের (bed) প্রত্যেক রুগীকে বই পড়ে পরীক্ষা করে নিজে ডায়াগনোসিস্ (diagnosis) করবার চেষ্টা

করবে। ভুল হয় হোক, আমরা সেটা শুধরে দেব, কিন্তু তোমাদের নিজেদের চেষ্টা করতে হবে—"

যোগেন আগাইয়া গিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "স্যার, আমরাও যদি আপনাকে একদিন কোনও হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই তাহলে আপনি কি আপত্তি করবেন?"

"কিছুমাত্র না। তবে একটা ভোজের ধাক্কা আগে সামলানো যাক। তারপর ও কথা ভাবা যাবে।"

ছাত্রদের দল মুগ্ধ হইয়া ওয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর নবকিশোর উইলসন সাহেবের ওয়ার্ডের দিকে গেল। রামেশ্বর পাণ্ডের খবর লইবার জন্য। ডাক্তার পুলিন মিত্রের কথা শুনিয়া তাহার মন বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সত্যই কি উনি 'ঘুষ' না পাইলে উহাকে 'পুট্ আপ্' (put up) করিবেন না? মনে হইল উনি বোধ হয় রসিকতাই করিতেছিলেন। দেখা যাক কতদূর কি হইয়াছে।

সেখানে গিয়া উৎসাহের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "পাঁড়েজির অপারেশন হচ্ছে। তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। একটু পরেই তোমার মেসে যেতাম আমি।"

"ডাক্তার মিত্র তাহলে কাল আমার সঙ্গে রসিকতাই করছিলেন।"

"কি রসিকতা—"

"বলছিলেন, পাঁড়েজি শাঁসালো মাল, আমাকে কিছু পাইয়ে দাও।"

"ও, তোমাকেও বলেছিলেন না কি! পাঁড়েজিকেও বলেছিলেন। সে ব্যবস্থাও করেছি। পান খাইয়েছি তাঁকে। কিন্তু পান দেওয়াতে চটে গেলেন ভদ্রলোক।"

"কি রকম।"

উৎসাহ তখন তাহাকে সব খুলিয়া বলিল।

"গ্র্যান্ড হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছ তুমি! সে যে অনেক খরচের ব্যাপার।"

"মধুমতী অনেক টাকা দিয়ে গেছে আমাকে। টাকার অভাব নেই।"

"পাঁড়েজির জন্যই ঘর ভাড়া করেছিলে?"

"না, আগেই করেছিলাম। আমার বিয়ে হয়ে গেছে তো, কিন্তু ঘরের অভাবে এখনও ফুলশয্যা হয়নি। বামাচরণবাবু সারপেনটাইন লেনে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে মেয়ে এনে বিয়ে দিয়েছেন। সে বাড়িতে অত্যন্ত স্থানাভাব। তাই গ্র্যান্ড হোটেলে খানকয়েক ঘর নিয়েছি। ওইখানেই ফুলশয্যা হবে। কিন্তু তাতেও বাগড়া লেগেছে। বামাচরণবাবু আশা করতে পারেননি যে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে ফেলব। মেয়ে-জামাইকে যে খাটটি তিনি দেবেন বলেছিলেন, সেটা এখনও পুরো তৈরি হয়নি। তাঁর ইচ্ছে ওই খাটেই আমাদের ফুলশয্যা হোক। সেইজন্যে দেরি হচ্ছে। কাল নাগাদ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। গ্র্যান্ড হোটেলের ম্যানেজারও একটা বাগড়া লাগাবার চেষ্টায় ছিলেন। বলছিলেন, আমাদের ফার্নিচার সরিয়ে দুচার দিনের জন্য বাইরের ফার্নিচার এনে ঢোকানো আমাদের নিয়ম নয়। আরও কিছু বেশী টাকা দিয়ে সে নিয়মের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে হল। হাঙ্গামা কি কম! কাল কিন্তু তোমাকে আসতে হবে। বিকেলে একটু খাওয়ার আয়োজন করব। তুমিই আমার একমাত্র অতিথি। আমার বিয়ের কথা আর কাউকে জানাইনি। তুমি কাউকে বলনি তো?"

"না। তবে অতুলবাবুকে কাল বিরাট পণ্ডিত আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তোমার খবর জানবার জন্য। খবর তো আমি কিছুই জানতাম না সেই কথাই বললাম। তবে আভাসে জানিয়েছি যে তুমি হয়তো তোমার জেঠুর অমতে বিয়ে করে ফেলেছ।"

"জানিয়েছ না কি!"

উৎসাহ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"ভাগ্যের কি অদ্ভুত ষড়্‌যন্ত্র! আমার যিনি সবচেয়ে আপন লোক তাঁকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের খবরটা দিতে পারলাম না। যে আশীর্বাদ আমার জীবনে মহামূল্য সম্পদ হত তা থেকে বঞ্চিত হলাম। ফুলশয্যা হয়ে গেলে বউকে নিয়ে ওঁর কাছেই যাব, উনি মারুন ধরুন যাই করুন তবু যাব। জানি শেষ পর্যন্ত উনি ক্ষমা করবেন।"

"বউ কেমন হয়েছে?"

"শুভদৃষ্টির সময় মিনিটখানেকের জন্য দেখেছিলাম। ভালোই তো লাগল। বড় মায়া হলে দেখে। ভীরু অসহায় চোখের দৃষ্টি—"

আবার উৎসাহ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহার চোখের সামনে কালো একটি শীর্ণ মুখ এবং দুইটি ভীরু চোখের দৃষ্টি আবার ভাসিয়া উঠিল।

"তোমার বিয়ে কবে?"

"দিনচারেক পরে। তুমি তোমার বউকে নিয়ে এস। আসবে তো?"

উৎসাহের মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটিল।

"চেষ্টা করব। তোমার সুখের বিয়ে, সুখের সংসার, সবই সুখের। আমার দুর্ভাগ্যের স্পর্শ পাছে তোমার সুখকে মলিন করে ফেলে তাই ভয় হয়!"

"আমি নিজের আসল কুষ্ঠিটা দেখেছি যে। আমার মনে কোনও সংশয় নেই।"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "কোনও ক্ষোভও নেই। যা কর্তব্য বলে মনে করেছি তাই করেছি নির্ভয়ে! তারপর যা হবার হোক—"

"প্রবাল তো পরেছি। বিরাট পণ্ডিত বলেন ওতেই বিপদ কেটে যাবে।"

"বিরাট পণ্ডিত মুখে ও কথা বলেন সকলকে। কিন্তু মনে মনে তিনি জানেন যে পাহাড়ের ধস্ যখন ভেঙে পড়ে, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা যখন উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে, সব জানা সত্ত্বেও উনি বাঁশের ঠেকনো দিয়ে পাহাড়ের ধস্ আটকাবার চেষ্টা করেন, আগ্নেয়গিরিতে দু বালতি জল ঢেলে নেবাতে ছোটেন, মনে করেন দু'চার ঝুড়ি মাটি ফেললেই বুঝি বানকে রোধ করা যাবে। উনি জানেন এসব চেষ্টা হাস্যকর কিন্তু তবু উনি থামতে পারেন না। কারণ উনি জাতবিদ্রোহী, পুরুষকারের প্রচণ্ড উপাসক। ভাগ্য ওঁকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু ওঁর মেরুদণ্ড ভাঙতে পারেনি—"

তাহারা প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। উপর হইতে একটি ছেলে নামিয়া আসিয়া উৎসাহকে বলিল, " আপনার কেসটার অপারেশন হয়ে গেছে। তাঁকে ওয়ার্ডে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্লোরোফর্মের (chloroform) ঘোর এখনও কাটেনি।"

"চল দেখি গিয়ে।"

নবকিশোর ও উৎসাহ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

।। উনিশ।।

বিরাট পণ্ডিত পুষ্পকে লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। নিজে বাজারে গিয়া তাহার জন্য ছোট ট্রাঙ্ক, ছোট আলমারি, ছোট টিনের স্যুটকেস এবং ছোট কাঠের আলনা কিনিয়া আনিলেন। তাছাড়া আনিলেন দাঁতের মাজন, আয়না, চিরুনি, মাথার তেল এবং সাবান। শাড়ি এবং জামাও আনিলেন কয়েকটা। একটা সাধারণ গামছা, একটা লোমওলা তোয়ালে, একটা আলাদা বালতিও আনিলেন তিনি। পুষ্পের জন্য আলাদা একটা ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন, "এই ঘরটি তোর। তোর সব জিনিস কিনে দিলাম। বেশ করে গুছিয়ে রাখবি। দাঁত মাজবি ভালো করে। দাঁতে ছ্যাত্‌লা পড়ে আছে। চোখে পিঁচুটি কেন? ভালো করে চোখ ধুবি। সাবান দিয়ে গা হাত পা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করবি, কত ময়লা জমে আছে দেখ তো। নিজের কাপন নিজে কাচবি, নিজে শুকুতে দিবি, নিজে তুলে পাট করে রাখবি। গামছা তোয়ালে কাপড় জামা সব যেন ধবধবে পরিষ্কার থাকে। গাঁট্টার উপর নির্ভর করিসনি, ও মহা ফাঁকিবাজ। সব তোকে করতে হবে। পারবি তো?"

পুষ্প ঘাড় কাত করিয়া জানাইল পারিবে। বলিল, "আমি আপনারও কাপড় গামছা কেছে দেব, ঘর ঝাঁট দিয়ে দেব, বাসন মেজে দেব!"

"না, সে সব করতে হবে না। আগে নিজের কাজটা ভালো করে কর। তাছাড়া তোকে পড়তে হবে। পড়বি তো? কি ইচ্ছে তোর?"

পুষ্প ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছার কথা কেহ তো কখনও জানিতে চাহে নাই! কি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই অদ্ভুত লোকটা খুশী হইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। ট্যারা চোখের তির্যক দৃষ্টি বিরাট পণ্ডিতের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া একটু অপ্রস্তুতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কিরে, কি ইচ্ছে তোর? পড়বি তো।"

"আপনি যা বলেন তাই করব।"

"আমি যা বলি শেষ পর্যন্ত তা কেউ শোনে না। জরিকে আমার পড়াবার ইচ্ছে চিল না। কিন্তু ও তো আমার কথা শোনেনি। তুমিও শেষ পর্যন্ত শুনবে না। একটু বড় হয়ে তুমি যখন দেখবে আর পাঁচটা মেয়ে ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে, তোমার মনে হবে তোমাকে না পড়িয়ে আমি অন্যায় করেছি। তোমাকে সারাজীবন দাসী-বাঁদী করে রাখতে চাচ্ছি। এ অপবাদ আমি নিতে চাই না। তোকে পড়তে হবে। তারপর যা হবার হবে। অ আ ক খ জানিস?"

পুষ্প ঘাড় নাড়িয়া জানাইল জানে না।

"কাল তাহলে বর্ণপরিচয়ও কিনে আনব একটা। এম. এ. পর্যন্ত পড়াব তোকে। জরিকে যেমন পড়িয়েছিলাম। তারপর জরির মতো তুমিও আমাকে ছেড়ে পালাবে। সব জানি, তবু পড়াব।"

বিরাট পণ্ডিতের বিশাল নয়নে আগুনের শিখা যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুষ্প সেদিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাকে কখনও ছেড়ে যাব না।"

"ও কথা সকলেই বলে প্রথম প্রথম। যা, আগে সাবান দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে ফেল। কাগের বাসা হয়ে আছে। সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর তেল মেখে চিরুনি দিয়ে আঁচড়া ভালো করে। ভালো গন্ধ তেল এনে দিয়েছি। চুল ভালো হয় ওতে। যা—"

পুষ্প ভিতরে চলিয়া গেল।

বিরাট পণ্ডিত গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। গলিটা সহসা নির্জন হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চলমান একটা রিক্‌শার শব্দে সে নির্জনতা বিঘ্নিত হইল। বিরাট পণ্ডিত উঠিয়া বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আবার আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল। মনে মনে তিনি মঙ্গলস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"মঙ্গলো মঙ্গলোকরো ভুতিদো মঙ্গলাকরঃ
শিবদঃ শান্তিদঃ শব্দঃ, শিবমূর্তিঃ শিবালয়ঃ"

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ স্তোত্রটি তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেলেন। মঙ্গলের প্রদীপ্ত বীরমূর্তি তাঁহার চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। ধরণীগর্ভ সম্ভূত বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ মহাতেজা লোহিতাঙ্গ অঙ্গারক যেন তাঁহার মানসপটে মূর্ত হইয়া উঠিলেন। বিরাট পণ্ডিত মনে মনে বলিতে লাগিলেন—হে মহাশক্তিধর গ্রহ, জানি আপনি অজেয়, আপনি অমোঘ, জানি আপনিও নিয়তির নিয়মে অপরিবর্তনীয় পথে অনিবার্যগতিতে সঞ্চরণ করিতেছেন, জানি কোনো প্রার্থনাই আপনাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, কিন্তু তবু কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি, হে ধনদ, রাজ্যদ, শ্রীদ, সুখদ, স্বস্তিদ, কামদোগ্ধা শরণাগতবৎসল গ্রহরাজ, উৎসাহেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে শাস্তি দিন, আমার দর্প চূর্ণ করুন, কারণ আমিও সারাজীবন স্বয়ং চণ্ডীর মতোই স্পর্ধিতকণ্ঠে বলিয়াছি—যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি। আমাকে যিনি সংগ্রামে জয় করিয়া আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন। আমি জীবনে অনেক আঘাত পাইয়াছি। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, কুলিগিরি করিয়াছি, নাইট স্কুলে পড়িয়াছি, অনেক অপমান অনেক হীনতা সহ্য করিয়া টিউশনি, কেরানীগিরি করিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানের চর্চা ছাড়ি নাই। তাই আপনাদের মতো প্রদীপ্ত মহাশক্তিশালী গ্রহদের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি, আমাদের কাব্যে পুরাণে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি, গ্রীক পুরাণে দেব-দেবী ও টাইটানদের (Titan) উত্থান-পতন জয়-পরাজয়ের কাহিনী পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব-পশুদের বিচিত্র আলেখ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি, মানব-দেবাতার ক্বচিৎ আবির্ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আমি কিন্তু ভোগের পথে চলিয়াছি চিরকাল। আধ্যাত্মিক পথে চলিতে গিয়া বারম্বার পদস্খলন। হইয়াছে। আপনাদের কুদৃষ্টিই আমাকে ও পথে চলিতে দেয় নাই। আঘাতের পর আঘাত পাইয়াছি। কিন্তু সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করি নাই, আমার দর্প এখনও চূর্ণ হয় নাই। হে গ্রহরাজ, আপনি আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করুন, আপনি আমাকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লউন যে আমি পরাজিত হইয়াছি—কিন্তু উৎসাহকে রক্ষা করুন আপনি। অমন একটা প্রতিভাময় সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবেন না। এ অঙ্কুরকে বিনাশ করিলে আমি আঘাত পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি পরাজয় স্বীকার করিব না। আপনি শরণাগতবৎসল, আপনি সত্যপ্রিয়, আপনি শিবালয়, আপনি

শান্তি , আপনি স্বস্তিদায়ক, তাই আপনার মহাশক্তি মহামহত্ত্বের কাছে আমার আবেদন—উৎসাহকে রক্ষা করুন!

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে কড়াটা সজোর নড়িয়া উঠিল।

"কে? গাঁট্টা, গাঁট্টা—"

ভিতর হইতে গাঁট্টার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি কিমা পিষছি—"

বিরাট পণ্ডিত নিজেই উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন একটি উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

"কাকে চান আপনি?"

"বিরাট পণ্ডিতমশায়কে।"

"আমিই বিরাট পণ্ডিত। কি দরকার—"

"প্রশ্ন গণনা করাব একটা। ঠিকুজি সঙ্গে এনেছি।"

"একশ' টাকা লাগবে।"

"তা-ও এনেছি—"

"আসুন।"

ঠিকুজি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জানতে চান?"

"এর আয়ু কতদিন—"

"টাকাটা দিন।"

টাকাটা লইয়া বিরাট পণ্ডিত ছক্ দেখিয়া আর একটা ছক্ প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"বেশী দিন পরমায়ু নেই। বড়জোর মাসখানেক। তবে যদি নীলা আর প্রবল ধারণ করান—"

"না, ওসব কিছুই করাব না। আমি চাই ও তাড়াতাড়ি মরে যাক—"

"কেন?"

"যদিও ও আমার একমাত্র ছেলে, তবু ও শত্রু। আমার শত্রু, দেশের শত্রু। ঘরভেদী বিভীষণ। টাকার লোভে ধর্ম ত্যাগ করেছে। ও আপদ যত শিগ্‌গির বিদেয় হয় ততই ভালো। খুব আনন্দের সংবাদ শোনালেন। ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন এবং নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"ও মশাই শুনুন, শুনুন—"

ফিরিয়া আসিলেন ভদ্রলোক।

"কি।"

"আপনার পায়ের ধুলোটা নেব। মহৎ লোক আপনি।"

বিরাট পণ্ডিত সত্যই হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। ভদ্রলোক একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। পদধূলি লইয়া বিরাট পণ্ডিত যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখিলেন ভদ্রলোকের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। বিরাট পণ্ডিত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

।। কুড়ি ।।

সেদিন বৈকালে আকাশে মেঘের অদ্ভুত সমারোহ হইয়াছিল। সমস্ত পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া আকাশে যাহা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা যেন মেঘ নয়, তাহা যেন রাশি রাশি কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি। ঘনকৃষ্ণ চুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত আভাও বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন আগুনের শিখাও আছে উহার মধ্যে। মনে হইতেছিল বিরাট একটা মস্তক জ্বলজ্জটায় সমস্ত আকাশ বুঝি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কালো মেঘের মাঝে সাদা মেঘও ছিল খানিকটা। তাহাতে কাহার একটা সুন্দর মুখও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মুখের উপর রক্তাভকৃষ্ণ কেশদাম অবিন্যস্তভাবে লুটাইতেছিল। ছোট ছোট কালো মেঘের টুকরা সে মুখের উপর যে কালো চোখ ও ভ্রূ আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা অতিশয় মনোহর। সে চোখে সে ভ্রূভঙ্গীতে যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন-সুষমা-মণ্ডিত একাগ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন পৃথিবীর দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছে। এই বিরাট মেঘ-সমারোহ ধীরে ধীরে মধ্যগগনের দিকে বিসর্পিত হইতে লাগিল। হাওয়ার বেগ বাড়িল।

গ্র্যান্ড হোটেলের বারান্দায় খাওয়ার আয়োজন করিয়াছিল উৎসাহ। বারান্দা হইতে গড়ের মাঠ দেখা যায়। খাওয়ার টেবিল ফুলে ফুলে সজ্জিত করিয়াছিল সে। উৎসাহের নববধূ সাবিত্রী, উৎসাহ, বামাচরণবাবু, সাবিত্রীর ভাই সনাতন এবং নবকিশোর—মাত্র এই কয়জনের জন্য এত খাবারের আয়োজন করিয়াছিল যে তাহাতে কুড়ি পঁচিশ জন লোক স্বচ্ছন্দে খাইতে পারে। নানারকম খাবার এবং প্রত্যেকটাই প্রচুর।

"কি কাণ্ড করেছ তুমি! এত খাবে কে—"

"সব যে খেতেই হবে এ কথা তো বলছি না। যা পারো খাও। পাতে কিছু পড়ে না থাকলে বোঝা যায় না যে সবাই পুরো খেয়েছে।"

"তা বলে এত অপচয় করা কি ভালো"—বামাচরণবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"পৃথিবীতে কিছুই অপচয় হয় না। এবারে বসা যাক—"

উৎসাহ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নবকিশোর একটি বেহালার বাক্স এবং একটি গহনার বাক্স সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

"অতুলবাবু এই বেহলাটা সাবিত্রী দেবীকে উপহার পাঠিয়েছেন। বলেছেন যে এটা খুব পুরোনো বেহালা। খুব ভালো আওয়াজ এর। সাবিত্রী দেবী যদি শিখতে চান, অতুলবাবু তার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি আমার মেসে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই নাও চিঠি। আর এই সামান্য গয়নাটা বন্ধুজায়ার জন্যে আমি এনেছি।"

উৎসাহ গহনার বাক্সটা খুলিয়া দেখিল—দামী একটা জড়োয়ার হার।

"তুমি এত টাকা খরচ করতে গেলে কেন! দাম নিশ্চয় অনেক নিয়েছে।"

"বউদি কিনে দিয়েছেন। দাম কত আমি জানি না।"

উৎসাহ অতুলের চিঠিটা পড়িল।

"ভাই উচ্ছে,

তোমার বিয়েতে আমি থাকব না এ অঘটন আমি কল্পনা করতে পারতুম না। বাস্তব কিন্তু

কল্পনাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি যখন এই বেহালাটা বাজাতুম তুমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে। তোমারও ইচ্ছে হয়েছিল বেহালা শেখবার। একটু শিখেওছিলে। তোমার বিয়েতে এই বেহালাটাই উপহার পাঠালাম তোমাকে। তোমার বউ শিখুক। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। কবে আবার দেখা হবে? ইতি অতুল"

উৎসাহ অন্যমনস্ক হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"আকাশে অদ্ভুত মেঘ হয়েছে তো। আর মেঘের মধ্যে কেমন সুন্দর একটা মুখ। নবু দেখ, দেখ—"

ইহার পরই সেই অপূর্ব তীব্র মধুর গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া উঠিল। উৎসাহ আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল, তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্থির হইয়া উঠিল সে।

"নবু, মধুমতী এসেছে—"

"কোথা—"

"গন্ধ পাচ্ছ না? সেদিন রাত্রে যে গন্ধ পেয়েছিলে এ সেই গন্ধ—এ সেই গন্ধ—"

নবকিশোরের মনেও সংশয় ছিল না।

হঠাৎ ঝড় উঠিল। বজ্রগর্জনে কাহার অট্টহাসি শোনা গেল যেন।

"ওই যে মধুমতী—"

"কই।"

"ওই যে মাঠের মাঝখানে—"

"কই!"

"ওই যে গাছের নীচে। যাই, ওকে ডেকে নিয়ে আসি। আমি বললে ও ঠিক আসবে—"

উৎসাহ দ্রুতপদে, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

"মধুমতী কে?"

বিস্মিত বামাচরণবাবু প্রশ্ন করিলেন। নবকিশোর নির্বাক হইয়া রহিল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না। ঝড় তুমুল হইয়া উঠিল। টেবিলের ফুলদানী উলটাইয়া গেল।

"যাই, দেখি ও কোথায় গেল এই ঝড়ে।"

নবকিশোরও নামিয়া গেল। দেখিল উৎসাহ রাস্তা পার হইয়া মাঠের মধ্যে ছুটিতেছে। সে-ও রাস্তা পার হইবার জন্য বাড়াইয়াছিল, কিন্তু পারিল না, থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল তাহাকে। বিরাট সর্পের মতো একটা বিদ্যুৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া ঝলসিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া যে বজ্রপাত হইল তাহাতে ক্ষণিকের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল সব যেন। তাহার পর গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল মেঘে মেঘে। বৃষ্টি শুরু হইল। তবু নবকিশোর রাস্তা পার হইয়া ভিজিতে ভিজিতে মাঠের ভিতর খুঁজিতে গেল উৎসাহকে। একটু পরেই দেখিতে পাইল একটা গাছতলায় কে যেন পড়িয়া আছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল উৎসাহ।

"উৎসাহ, উৎসাহ—"

উৎসাহ সাড়া দিল না। বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নবকিশোর সবিস্ময়ে দেখিল, সে যেন হাসিমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

বিরাট পণ্ডিত নিজের ঘরে বসিয়া নিমীলিত নয়নে তারস্বরে দেবীকবচ আবৃত্তি করিতেছিলেন—

নারসিংহী মহাবীর্যা শিবদূতী মহাবলা
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।।
লক্ষ্মী পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা।।—

সহসা তাঁহার সম্মুখে নানালঙ্কারভূষিতা অপূর্বদ্যুতিময়ী ষোড়শী মূর্তি আবির্ভূতা হইলেন।

"বিরাট পণ্ডিত, তোমার চণ্ডীপাঠ ব্যর্থ হয়েছে। উৎসাহকে তুমি বাঁচাতে পারলে না। আমার হাতে যদি ওকে ছেড়ে দিতে তাহলে ওর এ অকালমৃত্যু হত না। মধুমতী ওকে গন্ধর্বলোকে নিয়ে গেছে। তার দেহটা গড়ের মাঠে পড়ে আছে। নবকিশোর তার পাশে বসে কাঁদছে। তার সৎকারের ব্যবস্থা কর।"

"কে! শ্মশান-ভৈরবী! কি বললে—?"

ষোড়শী অন্তর্হিতা হইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

উৎসাহের চিতা জ্বলিতেছিল।

বিরাট পণ্ডিতই মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত চিতার দিকে চাহিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ বসিয়াছিলেন তিনি। অতুল শ্মশানের একধারে বসিয়া সেই বেহালাটায় বাগেশ্রী রাগিণী আলাপ করিতেছিল। তাহার পাশে নবকিশোর বসিয়াছিল নীরবে। তাহার সমস্ত মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। বিরাট পণ্ডিতের পিছনে নতমুখে বসিয়াছিল সাবিত্রী। বিরাট পণ্ডিত তাহাকে মাথার সিঁদুর মুছিতে দেন নাই। তাহার হাতের চুড়ি গলার হার যেমন ছিল তেমনি আছে। একটু দূরে কপালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন বামাচরণ এবং আরও কয়েকজন শ্মশান-বন্ধু। তাহারা বিরাট পণ্ডিতের দিকে পিছন ফিরিয়া বিড়ি টানিতেছিল।

সহসা বিরাট পণ্ডিত কথা কহিলেন, "অতুল—"

"আজ্ঞে—"

"চন্দনকাঠ বেশ ভালো ছিল তো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আর ঘি?"

"ভালো গাওয়া ঘি এনেছি।"

"খুব ভালো গন্ধ বেরুচ্ছে না তো—"

অতুল চুপ করিয়া রহিল।

বিরাট পণ্ডিতও আর কিছু বলিলেন না।

।। একুশ ।।

বিরাট পণ্ডিত খুব একটা শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। সাবিত্রীকে তিনি নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার মাথার সিঁদুর, তাহার রঙীন শাড়ি তাহার গহনা যেমন ছিল তেমনি রহিল। বামাচরণবাবু একদিন সকালে আসিয়া নানাকথার পর বলিলেন —"আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার আমার মুখ নেই, আপনি যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে—আমি, মানে—"

"বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন। তোমার ন্যাকা ন্যাকা কথা শোনবার ধৈর্য বা অবসর আমার নেই। কাজের কথা যদি কিছু থাকে বল—,আর না থাকে তো সরে পড়—"

বামাচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে যা ছিল তাতো হয়ে গেছেই পণ্ডিতমশাই। এখন সমাজের যা বিধান তা মানতে হবে। সাবিকে এখন সিঁদুর গয়না পরিয়ে রাখাটা কি উচিত হচ্ছে—"

গর্জন করিয়া উঠিলেন বিরাট পণ্ডিত।

"দেখ এ বাড়িতে বিরাট পণ্ডিতের বিধান ছাড়া কোনও বিধান চলবে না। ও সিঁদুর শাড়ি গয়না সব পরবে। ওকে আরও শাড়ি আরও গয়না কিনে দেব। ওকে পড়াব, ওকে ডাক্তার করব। ও যদি কাউকে বিয়ে করতে চায় নিজে পৌরোহিত্য করে সে বিয়েও আমি দেব—আমি থামব না, আমি নত হব না—"

"কিন্তু—"

"দেখ, ও আমার পুত্রবধূ। ওর সম্বন্ধে আমি যা ঠিক করব তাই হবে। তোমার কাছে যতদিন ছিল তুমি কোনও কর্তব্য করনি। ওকে সামান্য লেখাপড়া পর্যন্ত শেখাওনি। কেবলই চেষ্টা করেছ কি করে কম খরচে ফাঁকি দিয়ে ওকে পাত্রস্থ করে বাজিমাৎ করাব। তোমার সে চেষ্টা সফল হয়েছে, তীর্থের ওঁছা কাক তুমি, পরের ঠোঙায় ছোঁ মেরে খানিকটা খাবার তুলে নিয়েছ। যাও এবার সরে পড়।"

বামাচরণ বাবু তবু বলিলেন—"আমি বলতে চাইছিলাম—"

"যা বলতে চাইছিলে তা রাস্তায় গিয়ে বল—"

তবু বামাচরণবাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন, "আপনি বলছেন ওর আবার বিয়ে দেবেন? আমরা গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ—"

ক্ষেপিয়া গেলেন বিরাট পণ্ডিত।

"তোমার মতো মূর্খ, কুলীন ব্রাহ্মণ? আর বিদ্যাসাগর, আশু মুকুজ্যে এরা বুঝি মুচি ছিলেন? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। সাবিত্রী যদি বিয়ে করতে চায়, একবার কেন, বারবার বিয়ে দেব তার—।"

"আমি বলছিলাম—"

"গাঁট্টা, গাঁট্টা—একে বার করে দে বাড়ি থেকে।"

বিরাট পণ্ডিত উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বামাচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন।

।। বাইশ ।।

ইহার পর ষোলো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পরই নবকিশোর সস্ত্রীক বিলাতে চলিয়া যায়। সেখানেই সে ডাক্তারি পড়া শেষ করিয়া এম ডি. এম. আর. সি. পি. ডিগ্রী লাভ করে। কিছুদিন নানা হাসপাতালে কাজ করিয়া সে অবশেষে একটি বড় জাহাজের কোম্পানীতে চীফ্ মেডিক্যাল অফিসারের কাজ পায়। কাজটি তাহার মনোমত হইয়াছে। অনেক অবসর। নিজের একটি ল্যাবরেটরি করিয়া তাহাতেই গবেষণা করিয়া সে অবসর যাপন করে। প্রমীলাও লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভালো ডিগ্রী অর্জন করিয়াছে। সে-ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে কাজ করে। তাহাদের একটি পুত্র এবং কন্যা হইয়াছে। লন্ডনেই পড়াশোনা করে তাহারা। হরিকিশোরবাবু রিটায়ার করিয়াছেন। বুলু এম.এ. পাস করিয়াছে। সে বিবাহ করে নাই। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারি করিতেছে। হরিকিশোরবাবু, শ্রবণা এবং বুলু ছুটিতে প্লেনে করিয়া নবকিশোরের কাছে আসে। প্রমীলা লন্ডনে ভালো পিয়ানোবাদকের সহায়তায় সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে। শ্রবণা যখন লন্ডনে আসেন তখন প্রমীলা প্রত্যহ তাঁহাকে পিয়ানো বাজাইয়া শোনায়। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে যোগেন মাঝে মাঝে নবকিশোরকে চিঠি লেখে। সে বিহারের একটি শহরে ভালো প্র্যাকটিস জমাইয়াছে। কিন্তু তাহার পেটের অসুখ এখনও সারে নাই, উপরন্তু ডায়াবিটিস (diabetes) হইয়াছে। ডাক্তার পুলিন মিত্রও মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন। তিনিও রিটায়ার করিয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা কিন্তু ফলবতী হয় নাই। এখন শুধু পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত নানা লোককে চিঠি লিখিয়া সময় কাটান। নবকিশোর প্রতি বৎসর স-বেতন দুই মাস ছুটি এবং জাহাজে করিয়া বিনা ভাড়ায় স-মর্যাদায় সপরিবারে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পায়। লন্ডনের একটি মফস্বল শহরে সে ছোটখাটো একটি বাড়িও কিনিয়াছে।

সেদিন ডাক্তার পুলিন মিত্রের একটি চিঠি আসিয়াছিল। নানা কথার পর পুলিন মিত্র লিখিয়াছেন—"তোমার বিরাট পণ্ডিতকে মনে আছে? লোকটি সত্যই বিরাট তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। যদিও প্রথম প্রথম লোকটির উপর বিরূপ হইয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইয়াছে। উৎসাহের বিধবা বউকে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়াছেন। মেয়েটি প্রতি বছর সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। বিরাট পণ্ডিত তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, সে কিন্তু বিবাহ করিতে চায় না। মাথার সিঁদুর কিন্তু মোছে নাই, শৌখিন শাড়ি গহনাও পরে। পুষ্প নামে আর একটি অভাগিনী মেয়েকেও তিনি মানুষ করিয়াছেন। সে গত বৎসর অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করিয়া ডি. ফিল দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মেয়েটি ট্যারা ছিল, কিন্তু চশমা পরিয়া তাহার চোখ ঠিক হইয়া গিয়াছে। পানের দোকানওলা অতুলবাবুই এখন বিরাট পণ্ডিতের সব দেখাশোনা করেন এবং প্রত্যহ তাঁহার নিকট বকুনি খান। বিরাট পণ্ডিত সত্যই বিরাট। এখনও নানারকম মাংস খান, নানারকম আতর কেনেন, নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তিনি একজন মিশরী পণ্ডিতের নিকট হায়ারগ্লিফিক্স্ (hieroglyphics)—প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরবিদ্যা শিখিতেছেন। মাঝে মাঝে পুলিশের নিকট খবর পাইয়া তিনি তাঁহার এক নিরুদ্দিষ্টা কন্যার খোঁজে বাহির হইয়া যান। এখনও কিন্তু মেয়েটির খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সেদিন তিনি তাহার

জন্য অমৃতসরে গিয়াছিলেন, কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু হতাশ হইবার লোক তিনি নন, নিরন্তর সন্ধান করিয়া চলিয়াছেন। আমি প্রায় প্রত্যহ বিরাট পণ্ডিতের বাড়ি যাই এবং ধমক খাইয়া চলিয়া আসি। আবার যাই। সত্যিই শ্রদ্ধেয় লোক। কুষ্ঠিগণনা করিয়া প্রত্যহ তিনি চার পাঁচশত টাকা রোজগার করেন। রোজই প্রচুর ভীড় থাকে। কিন্তু তিনি চার পাঁচটির বেশী প্রশ্ন গণনা করিতে চান না। যাহা বলেন তাহা নির্ভুল। আমার ছোট মেয়ের কুষ্ঠি দেখিয়া বলিয়াছেন, এ মেয়েটি রাজরাজেশ্বরী হইবে। এই আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া আছি। তুমি ওদেশে বেশ আছ। এখানে আসিবার কল্পনাও করিও না। এখানে খালি দীনতা, হীনতা, পরশ্রীকাতরতা আর নীচতা। আমরা পঙ্কে ডুবিয়া আছি। ভালবাসা জানিবে। ইতি

পুলিন।"

কিছুদিন পরে ছুটি পাইয়া নবকিশোর ও প্রমীলা মিশর ভ্রমণে গিয়াছিল। নীলনদের ভিতর দিয়া তাহাদের জাহাজ চলিতেছিল। একটা বন্দরে তাহাদের জাহাজ ভিড়ল। তাহারা দেখিল, একদল স্কুলের মেয়ে বন্দরে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। সম্ভবত কাছেই তাহারা কোথাও পিকনিক করিতেছিল। জাহাজ দেখিতে আসিয়াছে।

প্রমীলা বলিল, "দেখ, দেখ, ওই ফ্রক-পরা কালো মেয়েটি ঠিক জরির মতো দেখতে। নয়?"

নবকিশোরও সবিস্ময়ে দেখিল—হাঁ জরিই তো। বয়স দশ বছরের বেশী নয়, কিন্তু অবিকল

"জরি, জরি, জরি—"

ডাক শুনিয়া মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল সে। নবকিশোর আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

জাহাজ আবার চলিতে শুরু করিল।

রৌরব

।। এক ।।

নূতন ভাড়া-করা দোতলার ফ্ল্যাটের জানলায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অমা। চেয়েছিল পার্কটার দিকে। ল্যাম্প-পোস্ট, তালগাছ আর নানা রঙের বাড়ির দিকে চেয়েছিল সে। আর চেয়েছিল পার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তাটার দিকে। ওই রাস্তা দিয়েই তার স্বামী চন্দ্রভূষণ আসবে। সে ইন্টারভিউ দিতে গেছে চাকরির জন্য। দশটার আগেই বেরিয়ে গেছে দু'খানা বিস্কুট আর চা খেয়ে। দুটো বেজে গেল, এখনও সে এল না। তবে কি....। না, ইন্টারভিউ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো বোঝা যাবে না সে চাকরিটা পাবে কি না। খবরটা পরে আসবে, বেশ কিছুদিন পরে। তবে? আসছে না কেন এখনও? অমাও না খেয়ে বসে আছে এখনও তার জন্যে। কুকারটা খোলেনি এখনও। কুকারেই রেঁধে খায় আজকাল তারা। দিনে ভাতে-ভাত আর রাত্রে পাঁউরুটি আর আলুভাজা। চাঁদুর প্রতিজ্ঞা, যতদিন না চাকরি পাব ততদিন মাছ-মাংস-দুধ কিনব না। পয়সা যে একেবারে নেই তা নয়। অমা তো গান-বাজনা শিখিয়ে মাসে দুশো টাকা রোজগার করে। চাঁদু বলেছে—ইচ্ছে করলে তুমি তোমার জন্য মাছ-মাংস কিনতে পার, কিন্তু আমি যতদিন না রোজগার করছি ততদিন আমি নিরামিষ খাব। একগুঁয়ে চাঁদুর মুখটা মনে পড়ল অমার। সত্যিই ভারি একগুঁয়ে। বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে সে ত্যাগ করেছে তাকে বিয়ে করবার জন্য। প্রথম পরিচয়ের ছবিটাও ফুটে উঠল তার মনে। অমা তখন কলেজ থেকে ফিরছিল। দাঁড়িয়েছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা ন্যুব্জদেহ বুড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে পড়েছে একটা চলন্ত ট্রামের সামনে আর ওদিক থেকে আসছে একটা ছুটন্ত ট্যাক্সি। বুড়িকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিল অমা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে। বাঁচাতে পেরেছিল বুড়িকে। বুড়ির হাঁটুর কাছটা ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল খুব। ট্রামটা থেমে গিয়েছিল, ট্যাক্সিটাও। চারিদিকে লোকের ভিড়। অমারও কাপড়টা ছিঁড়ে গিয়েছিল ট্যাক্সিটার ভাঙা মাডগার্ডের খোঁচায়। ট্যাক্সিতে ছিল চাঁদু। সে নেমে এসে বলল—'চলুন, ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই। আপনিও আসুন।' হাসপাতালে পৌঁছে দেখা গেল বুড়ির বেশি লাগেনি। 'ফার্স্ট এড' দিয়ে ছেড়ে দিলেন তাঁরা বুড়িকে। বুড়ি বললে—'আমি হাঁটতে পারছি না। যাব কি করে।' 'কোথায় থাক তুমি—জিজ্ঞেস করেছিল চাঁদু। 'চিৎপুরে থাকি আমি'। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছিল চাঁদু। আর একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে সে। বুড়িকে বলল—'চল তোমাকে পৌঁছে দিই। আপনিও আসবেন কি? আসুন না। অমা গিয়েছিল। দেখা গেল বুড়ি এক বড়লোকের গাড়ি-বারান্দার নীচে থাকে। ভিক্ষে করে খায়। তাকে নামিয়ে দেবার পর বুড়ি আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল —'আমার পা খোঁড়া হয়ে গেল, এখন আমি কি করে ভিক্ষে করে বেড়াব বাবু।' চাঁদু ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল—'আর একটি টাকা আমার কাছে আছে। সেইটেই নাও তুমি। পরে এসে তোমার খোঁজ করব।' তারপর অমার দিকে ফিরে বলল—'আমাকে তো হেঁটে ফিরতে হবে। পয়সা ফুরিয়ে গেছে। আপনি কোথায় যাবেন?' অমা বলেছিল, 'আমি শ্যামবাজারে থাকি। আমার কাছে টাকা আছে কয়েকটা, একটা ট্যাক্সিই ডাকুন আবার। আপনি কোথায় থাকেন?' 'বউবাজারের একটা মেসে', হেসে উত্তর দিয়েছিল চাঁদু। 'এক জায়গায় ট্যুশনি করতে গিয়েছিলাম। আমার ছাত্রটি

বড়লোক, সে আমাকে মোটর পাঠিয়ে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়। আজ মোটর খারাপ ছিল বলে ট্যাক্সি করে দিয়েছিল। তারপর দেখুন কি কাণ্ড। অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

প্রথম দিনের সাক্ষাতের এই চিত্রটা ফুটে উঠল অমার মনে। সেইদিনই কি সে ভালোবেসেছিল তাকে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তাকে ভালো লেগেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কত লোককেই তো তার ভালো লেগেছে জীবনে, তাদের কি বিয়ে করেছে সে? না, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অনেক আলো, অনেক অন্ধকার, অনেক স্বপ্ন, অনেক ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটেছে সেই প্রথম দেখার উপর। দ্বিতীয় দেখা অনেকদিন পরে ঘটেছিল। কফি হাউসে। দেখা হওয়ামাত্রই সে নমস্কার করে এগিয়ে এসেছিল। পাশের খালি চেয়ারটায় বসে হেসে বলেছিল, 'যাক, আবার আপনার নাগাল পেয়ে গেলাম। সেদিন যখন আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন তখন আপনার ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আর বোধ হয় দেখা হবে না। যাক, আবার আপনার নাগাল পেয়ে গেলাম। এখন আপনার ঠিকানাটা বলুন দেখি।'

"আমার ঠিকানা চাইছেন কেন?"

"যদি দরকার হয় যাব আপনার কাছে।"

"আমার কাছে যাওয়ার কি দরকার হতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না।"

"হয়তো দরকার হবে না। তবু ভালো লোকের ঠিকানা টুকে রাখা ভালো। যদি কোনোদিন যুগপৎ ট্রাম আর ট্যাক্সির মাঝখানে পড়ে যাই, স্মরণ করব আপনাকে।"

"আমি কিন্তু ভালো লোক নই। লোক চেনা কি অত সোজা।"

"মোটেই সোজা নয়, খুব শক্ত। আপনি কিন্তু সেদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আপনার আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছিল।"

অমা হাসিমুখে বসেছিল, কোনও উত্তর দেয়নি।

চাঁদু নিজেই বলেছিল, "আমি কিন্তু এই সময় রোজ এখানে আসি, আর মেসে ফিরি রাত ন'টার সময়।"

নিজের পকেট-বুকে তার ঠিকানাটা টুকে নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—"আপনার নামটা তো জানি না, বলুন সেটাও টুকে রাখি।"

"অমা রায়।"

"অমা? এমন ফরসা মেয়ের নাম অমা কে রেখেছিল!"

"বাবা।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবার কথা মনে পড়েছিল তার হঠাৎ। সেই মুহূর্তেই ঠিকও করেছিল, বাবার সম্বন্ধে আর কিছু সে বলবে না।

"আমার নাম নিশ্চয়ই জানেন না—জানবার কথাও নয়। অখ্যাত লোক আমি। আমার নাম চন্দ্রভূষণ। চাঁদু বলে ডাকে সবাই।"

তারপরে হেসে বলেছিল, "আচ্ছা, উঠি আজ। নমস্কার।"

জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলোমেলো কত কথাই না মনে হচ্ছিল আমার। সেও তো বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিল চাঁদুকে। মা বলেছিলেন, 'ও ছেলে কি তোর

উপযুক্ত? উনি থাকলে ও কি সাহস করে একথা বলতে পারত ওঁর সামনে? দেখতেও তো সুন্দর নয়, কাটখোট্টা গোছের চেহারা। নিজের বংশপরিচয় দিতে চায় না। বলে, আমার পরিচয় আমিই। এ আবার কেমন কথা।' দাদারও মত ছিল না। দাদা বলেছিলেন, 'ছেলেটি বিদ্বান বটে, ওর বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, আমি ওর জন্যে পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। সে যদি আমাদের অমতে বিয়ে করে তাহলে আমরা খুব দুঃখিত হব। আশা করি আপনাদের আচরণ আমাদের পারিবারিক সুখশান্তির অন্তরায় হবে না।' এ চিঠির উত্তরে আমাকে লিখতে হয়েছে, এ বিয়েতে আমাদের মত নেই। তবে দু'জনেই লেখাপড়া শিখেছে, দু'জনেরই বয়স একুশ বছর হয়ে গেছে, তবে যদি স্বেচ্ছায় কিছু করে সেটাকে আইনত বাধা দেওয়া যাবে না। তবে এটা জেনে রাখুন, আমরা এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্রয় দেব না। আমি অমাকে সে কথা বলে দিয়েছি, আপনার ছেলে আমার কাছে আসেনি। শুনলাম, মায়ের সঙ্গে একদিন দেখা করেছিল, মা-ও মত দেননি।'

অমার মনে পড়ল, সে জোর করেই চাঁদুকে এনেছিল তার মায়ের কাছে। চাঁদু কিন্তু বিয়ের কথা কিছু বলেনি। মা যখন তার পরিচয় জানতে চাইলেন তখন সে বলেছিল, আমার পরিচয় আমিই। এর বেশি জেনে কি করবেন? আমার সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেদের শত্রুতা, তাদের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, তাদের পরিচয়ের জৌলুস দিয়ে নিজেকে সাজাতে চাই না।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অমাও হয়েছিল। অমাকে সে বাড়ির পরিচয় দেয়নি। বলেছিল, আমি বাংলা দেশের মানুষ। এই আমার একমাত্র পরিচয়। আমি বাঙালী, ভারতবাসী।

এই লোককে বিয়ে করেছিল অমা। বিচার-বিবেচনার নিক্তিতে ওজন করে করেনি। হঠাৎ করেছিল একদিন। মনে মনে সে প্রত্যাশা করেছিল অনেকদিন, এ প্রত্যাশার প্রস্তুতিপর্বও চলেছিল অনেকদিন ধরে, কিন্তু মুখে সে বলেনি কিছু। কিন্তু ভালো লাগছিল তার চাঁদুকে। ক্রমশই বেশি করে ভালো লাগছিল। বিশেষ করে ভালো লেগেছিল, যখন তার 'হবি'র কথাটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল তার কাছে। অনেকদিন আলাপের পরও এ কথাটা জানতে পারেনি অমা। চাঁদু নিজের কথা কখনও কিছু বলে না। সে ট্যুশনি করে আর মেসে থাকে, এর বেশি কোনও খবর অমা জানত না অনেকদিন। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে রাস্তায়, কফি হাউসে, ট্রামেও হয়েছিল একবার। কিন্তু নিজের কথা সে কিছু বলেনি কোনোদিন। একদিন হঠাৎ এসেছিল তাদের বাড়িতে। রবিবার ছিল সেদিন। অমা আশা করেনি যে চাঁদু আসবে। নীচে বসবার ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল, চাঁদু বসে আছে। হেসে বলল, "তোমার বাড়ি দেখতে এলাম। তোমার মা-বাবা কোথায়? আর কে আছেন বাড়িতে? একজন দাদা আছেন বলছিলে না?"

"আমার বাবা তো নেই।"

"ও জানতাম না তো। মা কোথায়? দাদা কোথায়?"

"দাদা মাকে নিয়ে কালীঘাটে গেছেন।"

"একটু আলাপ করব বলে এসেছিলাম, এ পাড়ায় এসেছিলাম একটা ফোটোগ্রাফের দোকানে। হঠাৎ মনে হলো তোমাদের বাড়িটা তো কাছেই। চলে এলাম। আচ্ছা উঠি তাহলে—"

"এসেছেন যখন বসুন না একটু। চা করে দেব?"

"না। চা আমি খাই না।"

চাঁদুর হাতে বড় একটা ফোটো অ্যালবাম ছিল।

"ফোটো তোলার শখ আছে নাকি?"

"আমার বন্ধুদের ফোটো তুলে রাখি—"

অ্যালবামটা টেবিলের উপর রেখে একটু হাসল সে।

"বন্ধুদের ফোটো তুলে রাখেন? আমার সঙ্গে তো বন্ধুত্ব করছেন, শেষকালে আমার ফোটোও তুলতে চাইবেন না কি!"

"না, না। এ অ্যালবামে যাদের ফোটো আছে, তাদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা তোমার নেই। কিংবা এটাও বলা যায় তোমার সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা এদের নেই।"

"কি রকম? কাদের ফোটো তুলেছেন? দেখতে পারি?"

"দেখ।"

খাতাটা খুলেই চমকে উঠেছিল অমা।

প্রথমেই একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীর ছবি। সভয়ে নির্নিমেষে সে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা তার মনে জেগেছিল সে কথাটা বলবার উপায় ছিল না। সব ছবিগুলি উলটে-পালটে দেখল সে। সব ভিখারীর ছবি। কানা খোঁড়া দরিদ্র জীর্ণ শীর্ণ, বুড়ো-বুড়ি, জোয়ান, কিশোর-কিশোরীর দল।

"এরা আপনার বন্ধু?"

"এরাই আমার বন্ধু। এটা আমার 'হবি' বলতে পার। লোকে টিকিট সংগ্রহ করে, প্রজাপতি সংগ্রহ করে, আমি এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, এদের ফোটো তুলে রাখি। ইতিহাসও লিখে রাখি এদের—"

অমা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কিসের যেন একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এমন একটা জগতে গিয়ে হাজির হলো যা সে আগে দেখেনি। গিয়ে কিন্তু চমৎকৃত হয়ে গেল, অভিভূত হয়ে পড়ল।

"আপনি এদের ইতিহাস জানেন?"

"পুরো জানি না। যে যতটা বলেছে তাই টুকে রেখেছি, সবাই সবটা হয়তো বলেনি। কেউ কেউ মিথ্যে কথাও বলে থাকতে পারে।"

"প্রথমেই ওই যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা রয়েছে—তার নাম কি, তার ইতিহাস জানেন আপনি?"

"নামটা শ্রীধর। শ্রীধর পাল। সব দিক থেকেই দুর্ভাগা বেচারা। বললে—তার ছেলে মেয়ে কেউ নেই। থাকলে হয়তো রাস্তায় বসতে হতো না।"

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অমা। তার মনে যা হচ্ছিল তা প্রকাশ করে বলবার উপায় ছিল না তার। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকাও অশোভন মনে হচ্ছিল, তাই সে আবার বলল—"আশ্চর্য 'হবি' তো আপনার। ভিখারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেড়ান?"

"একটু যদি ভেবে দেখ তাহলে আশ্চর্য হবে না। ওরা অবশ্য লেবেল-মারা ভিখারী। ওদের দেখলেই চিনতে পারা যায়, ওরা নিজেদের পরিচয় কোনও ছদ্মবেশ দিয়ে ঢেকে রাখে না। কিন্তু

আমরা কি ভিখারী নই? এমন কি যাঁরা আমাদের শাসনকর্তা তাঁরাও তো ভোট ভিক্ষে করে বেড়ান। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই মুখোশের তলায় অনুগ্রহপ্রার্থী ভিক্ষুকদের দেখতে পাও না তুমি? আমরা সবাই তো ভিক্ষুক। আমাদের মহাপুরুষরাও অনেকে ভিক্ষুক। এমন কি আমাদের মহাদেবও।—এই ভিক্ষুকদের দলে সব রকম মানুষ আছে। কিন্তু সবাইকে দেখে ভিক্ষুক বলে চেনা যায় না। যাদের চেনা যায় আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করি। খুব বাজে 'হবি' বলে মনে হচ্ছে কি? এতে একটা লাভ হয়েছে সেটা তো দেখতে পাচ্ছি—"

"কি লাভ।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্ব। তুমি যদি সেদিন ওই বুড়ি ভিখারীটাকে বাঁচাবার জন্যে না ঝাঁপিয়ে পড়তে তাহলে তোমার নাগালই পেতাম না আমি। তোমার দেখা পেলেও তোমার সঙ্গে কথা কইতাম না। কত মেয়ের সঙ্গেই তো রোজ দেখা হয়। যাক, এখন উঠি। আর একদিন আসা যাবে। তোমার মা আর দাদার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে।"

" 'আপনি আপনার ভিখারীদের ইতিহাসটা আমাকে পড়তে দেবেন?"

"দেব। কিন্তু একটি শর্তে।"

"কি বলুন।"

"'আপনি'র ভব্য পরদাটা সরিয়ে ফেলতে হবে। 'তুমি' বলবে আমাকে এখন থেকে।"

অমা মৃদু হেসে ঘাড় হেঁট করল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখ তুলে বললে, "বেশ তাই হবে"—তারপর—নিজের অজ্ঞাতসারেই সম্ভবত—পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। অতি কুৎসিত কদাকার মুখ। আদিম অসভ্য মানুষদের মুখের মতো। রং শুধু কালো নয়, মাঝে মাঝে নীলচে হয়ে গেছে। বিশেষত গালের দু'পাশে আর ঠোঁটের নীচে। চোখের দৃষ্টি—সমুৎসুক। মনে হলো একটু হাসির ছোপও যেন লেগেছে তাতে। অমার মনে হলো, অপূর্ব। অমা রূপসী, কিন্তু সে-ও মুগ্ধ হয়ে গেল। যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ প্রকৃত রূপকে আবিষ্কার করে সে দৃষ্টি চোখে থাকে না, থাকে মনের ভিতর, বিবেকের কষ্টিপাথরে তার যাচাই হয়।

"ইতিহাসের খাতাটা কবে পাব?"

"দিয়ে যাব একদিন।"

"তোমার ওই অ্যালবামে কি সব ভিখারীদের ফোটোই তোলা আছে।"

"না। সকলের ফোটো তুলতে পারিনি। সুযোগ হয়নি, তাছাড়া ফোটো তুলতে পয়সাও তো খরচ হয়। আমি যা রোজগার করি তাতে কুলোয় না।"

"তুমি ট্যুশনি ছাড়া আর কিছু কর না?"

"করবার সুযোগ পাইনি। আমার ডিগ্রি আছে, কিন্তু এ দেশে শুধু ডিগ্রি থাকলেই চাকরি হয় না। হলেও সে চাকরি টেকে না। পিছনে মুরুব্বি থাকা চাই। আমার তো তা নেই। আমি কাউকে খোশামোদ করতে পারি না। টাকা দিয়ে শুনেছি বশ করা যায় অনেককে। কিন্তু আমার তত টাকাও নেই। থাকলেও অবশ্য ওপথে যেতাম না। তাই ক্রমাগত ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি, আর বিজ্ঞাপন হাতড়াচ্ছি। এখন কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে পড়াই, তাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় কোনক্রমে।"

"তোমার বাবা—"

"না, আমার বাড়ির খবর কিছু বলব না। পরে জানতে পারবে হয়তো। হয়তো বলছি এই জন্যে যে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখনও তেমন দানা বাঁধেনি। কেমিস্ট্রির ভাষাতে বললে বলতে হয় অ্যামরফস্ স্টেজে (amorphous stage) আছে, ক্রিস্ট্যালাইজড (crystal-lised) হয়নি। যদি হয় তখন সবই জানতে পারবে। আজ চললুম। আমার খাতাটা দিয়ে যাব একদিন। ভিখারীদের কাহিনী পড়ে মজা পাবে অনেক। সেদিন তুমি যাকে বাঁচিয়েছিলে তার নাম থুতনি। বুড়ি বেশ রসিক। ও যা বলেছে লিখে রেখেছি। খাতাটা দিয়ে যাব, পড়ে দেখো।—এখন চললুম।"

সেদিনও অমা জানতে পারেনি যে, প্রত্যেক ভিখারীকে সে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য দেয়। না, চাঁদুর সম্বন্ধে বিয়ের আগে বিশেষ কিছুই জানত না সে।

অমা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। সন্ধ্যাবেলায় তাকে গান শেখাতে যেতে হবে। চোখ বুজে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘুম কিন্তু এল না। একটু পরে উঠে পড়ল আবার। আবার দাঁড়াল জানলায় গিয়ে। হঠাৎ নজর পড়ল, তার বাড়ির সামনে যে পোড়ো সবুজ জায়গাটা আছে তাতে এক জোড়া ঘুঘু চরছে। অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নেই, আপন মনে চরছে। আর একটু দূরে এক জোড়া শালিক। অমার মনে হলো, ওদের কোনও সমস্যা নেই, যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট।

এমন সময় দূরে দেখা গেল চাঁদুকে। মোটরে করে আসছে। তার সঙ্গে আর একজন কে যেন। ভদ্রলোকের মাথার চুল ধবধবে সাদা।

অমা ছুটে নীচে নেমে গেল।

"এত দেরি হলো যে?"

"এঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যে কারখানায় আমি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম সেখানে ইনি একজন ডিরেকটার। তোমার বাবার বন্ধু একজন।"

অমা প্রণাম করে বললে, "আসুন—"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বললেন, "বাবাকে তোমার মনে আছে?"

"আছে।"

"উনি যখন চলে যান তখন বয়স কত ছিল?"

"বারো—"

"ও, তাহলে তো ভালো করেই মনে থাকবার কথা।"

অমার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠল। চাঁদুকে বাবার কথা সব বলে দিয়েছেন নাকি ভদ্রলোক!

"আপনাকে আমি কিন্তু চিনতে পারছি না—"

"আমি তোমার বাবার সহপাঠী। স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। ওকালতিও একসঙ্গে পাস করেছি। কিন্তু ও যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করল, তখন আমার তেমন প্র্যাকটিশ জমল না। ও কিন্তু তরতরিয়ে উঠে গেল। আমি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসাসূত্রে প্রায়ই এদেশে-ওদেশে যেতে হতো। তবু মাঝে মাঝে গেছি তোমাদের বাড়ি। তোমার বাবাও এসেছে আমার আপিসে। শেষ যেবার এসেছিল সেটা বোধ হয় ন'বছর

আগে। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে একদিন। তোমাদের বাড়িতে গিয়ে খবর পেয়েছিলাম তোমার দাদার কাছে যে, তুমি চন্দ্রভূষণবাবুকে বিয়ে করেছ। আমাদের আপিসে আজ শুনলাম, আমাদের নূতন ম্যানেজার পোস্টের জন্য যে ক'জন প্রার্থী আছেন তার মধ্যে আছেন একজন চন্দ্রভূষণ মৌলিক। ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম চন্দ্রভূষণবাবুকে—আপনি কি অমাকে বিয়ে করেছেন? যখন তিনি হ্যাঁ বললেন তখন ভারি আনন্দ হলো। কৌতূহলও হলো একটু। ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাবার পর চন্দ্রভূষণবাবুকে বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। তারপর আপিসের কাজকর্ম সেরে চলে এলাম ওঁর সঙ্গে। উনিই আমাদের আপিসের ম্যানেজার হবেন ঠিক করে ফেলেছি আমরা। খুব খুশী হয়েছি আমি এতে। উনি তিনটে ইয়োরোপীয় ভাষা জানেন, এতে আমাদের খুব সুবিধে হবে। আর বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, উনি আমার বন্ধু বিষ্ণুর জামাই বলে।....."

"আপনার নামটি কি?"—অমা সোৎসুকে জানতে চাইল।

"আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মিত্র। বিষ্ণু আমায় সিধে বলে ডাকত।"

অমাদের ফ্ল্যাটে দু'টি মাত্র ঘর । বিছানাতেই এসে বসলেন সিদ্ধেশ্বর মিত্র। দু'টি চেয়ার ছিল বসবার ঘরে। শোবার ঘরেই ঢুকে ছিলেন সিধুবাবু।

"আপনি ও ঘরে চলুন।"

বসবার ঘরে নিয়ে গেল তাঁকে অমা।

"এইখানে বসুন। আপনার জন্যে চা করে দিই—"

তারপর চাঁদুর দিকে চেয়ে বলল—"তুমি কিছু খেয়েছ কি। কিছু খেয়ে যাওনি তো?"

"আমি সন্ধ্যার পরই খাব। আমাকে একটু চা দাও এখন।"

অমা বেরিয়ে গেল।

"আপনি মাত্র দুটো রুম নিয়েই থাকেন?"

"আপাতত তাই আছি। আমাদের দু'জনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট, তবে আপনারা যদি চাকরিটা আমাকে দেন, আপিস থেকে একটু দূর হবে। বাসে করে যেতে অন্তত—"

" 'বাসে' করে আপনাকে যেতে হবে না। আমাদের আপিসের গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে। ম্যানেজারের ব্যবহারের জন্য আমাদের আলাদা একটা গাড়ি আছে। আপনাকে আর একটি প্রস্তাব দিতে পারি। আমাদের ম্যানেজার হেমবাবু যে বাড়িতে থাকতেন সেটি খালি পড়ে আছে তাঁর মৃত্যুর পর। আমরাই ভাড়া দিচ্ছি এখন, কারণ আপিস থেকেই বাড়িটি নেওয়া হয়েছিল তাঁর জন্যে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন সেই বাড়িতে যেতে পারেন—"

"তাঁর পরিবারবর্গ কোথায় আছেন?"

"তিনি অবিবাহিত লোক ছিলেন। আগে অধ্যাপনা করতেন, পরে কিছুদিন রাজনীতিও করেছিলেন। তারপর আমাদের আপিসের ম্যানেজার হয়েছিলেন। যেমন বিদ্বান তেমনি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন তিনি। আপনার শ্বশুরের সঙ্গেও আলাপ ছিল তাঁর। আপনিও ওঁর খালি বাড়িটাতেও যেতে পারেন। এ ফ্লাটের ভাড়া কত?"

"মাসে দেড়শ' টাকা।"

"ওটার ভাড়া দিই আমরা মাসে একশ' টাকা। অনেকদিন আগে থেকে নেওয়া ছিল, এখন ওর ভাড়া তিনশ' টাকার কম হবে না। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আশা করি কিছু মনে

করবেন না। আপনি আমার বাল্যবন্ধু বিষ্ণুর মেয়ে অমাকে বিয়ে করেছেন। বিষ্ণু একজন নামজাদা অ্যাডভোকেট ছিল। এই শহরে তার খানকয়েক বাড়ি আছে। ব্যাংকে নগদ টাকাও আছে অনেক। আপনি তার জামাই। আপনি কি—"

"না, আমি আমার শ্বশুরবাড়ির কোনও দাক্ষিণ্য লাভ করিনি। তাঁদের অমতেই আমি অমাকে বিয়ে করেছিলাম। ওঁরা কেউ বিয়েতে যোগ দেননি। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল আমাদের।"

"ও তাই নাকি।"

এই সময় অমা এসে প্রবেশ করল।

"আপনারা আসুন। চা দিয়েছি—"

দুটি 'রুম' ছাড়াও ছোট যে 'ডাইনিং স্পেস'টি ছিল সেখানে ছোট টেবিলও ছিল একটি। তারই উপর খাবার দিয়েছিল অমা।

।। দুই ।।

অমার বাবা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় নানা সময়ে নানা লোককে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলি পড়লে তাঁর চরিত্রের যে চেহারাটা আমরা দেখতে পাব তা অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ চেহারা নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন আইনজীবীর প্রতিভার ছাপ এ চিঠিগুলিতে নেই, এগুলির আবেদন নিতান্তই মানবিক। সব চিঠিগুলিই ন'বছর আগে লেখা। ন'বছর ধরে তাঁর আর কোনও চিঠি কেউ পায়নি। ন'বছর ধরে তাঁর কোনও খবরও কেউ জানে না। তিনি একদা হঠাৎ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কেন নিরুদ্দেশ হয়েছেন তা তাঁর চিঠি থেকেই বোঝা যাবে। ন'বছর কিন্তু তাঁর কোনও খবর চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রী অতসীবরণীকে, অমার মাকে ঃ

সবুজ বনের সাকী। এই সম্বোধন করেই বোধহয় তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম। এখন আমাদের বন আর সবুজ নেই, সংসারের ঝড়ে-ঝাপটায় ধূসর হয়ে গেছে। ওমর খৈয়ামের সাকী তাঁর কাব্যের স্বপ্নলোকে চিরযৌবনা হয়ে আছেন। সংসারের সাকী কিন্তু চিরযৌবনা থাকতে পারে না, তুমি এখন ঠাকুমা হয়েছ, তোমার চুল পেকেছে, দাঁতও পড়েছে, মুখে জরার চিহ্নও দেখা দিয়েছে, তোমাকে আর সাকী বলা শোভা পায় না। প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলো কত শীঘ্র এল আর চলে গেল। এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি যেন চোখের সামনে দিয়ে এল আর মিলিয়ে গেল শূন্যে। নববধূ হয়ে তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার কানে ছোট ছোট দুটি হীরের দুল দুলত—সে দু'টি এখনও কি আছে তোমার কাছে? সেই নীলাম্বরী শাড়িটা? তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি, আজ মনে হচ্ছে, একদিন যা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যা। আজ মনে হচ্ছে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা কর্তব্য সবই মূল্যহীন। মূল্যবান শুধু স্বার্থ, মূল্যবান শুধু বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটা, আমার যা কিছু তাকে আঁকড়ে ধরে থাকাটাই একমাত্র কর্তব্য। এই 'আমার'-এর গণ্ডি কত বড়? বাবা-মা কি সে গণ্ডিতে পড়ে? স্বার্থের সঙ্গে যখন সংঘাত বাধে তখন পিতা-পুত্র তফাত হয়ে যায়। অনেক সময় সেই তফাত হয়ে যাওয়ায় আগে তখন

তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আমি সে তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাইলাম না। মানে মানে সরে এলাম। তোমাদের ছেড়ে চলে আসতে আমার যে কষ্ট হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কষ্ট খুবই হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈরাগ্যও এসেছিল মনে। সে বৈরাগ্য আমাকে অনেকটা শক্তি দিয়েছে। সে আমাকে শিখিয়েছে, একা পৃথিবীতে এসেছিলে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে এতদিন কি সুখ পেলে? দিনকতক একা থেকেই দেখ না, কেমন লাগে।ভালই লাগছে। যে কোনও ত্যাগের সঙ্গে খানিকটা সুখ জড়িয়ে থাকে। শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকীকে ত্যাগ করেছিলেন তখনও তাঁর মনে একটা সান্ত্বনা নিশ্চয়ই ছিল যে, যে দুঃখ তিনি ভোগ করেছেন তা কর্তব্য পালনের জন্য। আমিও কর্তব্য পালনের জন্যই তোমাদের ছেড়ে এসেছি। কিন্তু আমি নির্বিকার হতে পারিনি এখনও। তোমাদের জন্যে মন কেমন করছে। বিশেষ করে তোমার জন্যে, অমার জন্যে আর দাদুর জন্যে। নীলু যেদিন দাদুকে আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে বলল—তুমি আর ওকে কোলে নিও না, সৌম্যেন বার বার মানা করে গেছে, তবু তুমি শোন না কেন। আমি কোনও দিনই তাকে ইচ্ছা করে কোলে নিইনি, আমি বসলেই সে আমার কোলে এসে চড়ত, আমার গলা জড়িয়ে ধরত। তাকে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু নীলুকে কোনও কথা আমি বলিনি। কিন্তু সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। শেষকালে দেখলাম তুমিও আমাকে ছুঁতে ইতস্তত করছ। বাড়ির ঝি আমার কাপড় কাচতে চাইছে না। অমাও কেমন যেন ভয়ে ভয়ে সরে সরে থাকতে চায়। নিজের বাড়িতেই আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেছি। তোমরা জান, আমি চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিনি, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, তাঁরা সবাই বলেছিলেন সারবে, কিন্তু অনেক দেরি হবে। তাতে আমি বিচলিত হইনি। আমি বিচলিত হলাম তোমাদের ব্যবহারে। আমার পিঠে একটা লাল দাগ হয়েছে, ডাক্তাররা সেটা কুষ্ঠ বলে সন্দেহ করছে, এইজন্য তোমরা আমাকে অস্পৃশ্য বোধে ঘৃণা করছ এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। মনে হলো সংসার তো অনেকদিন ভোগ করলুম, বানপ্রস্থে যাওয়ার সময় অনেকদিন আগেই হয়েছে, তোমাদের মনে সর্বদা আতঙ্কের হেতু হয়ে তোমাদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে আর তো সুখী হতে পারব না। সুতরাং চলে যাওয়াই ভালো। নীলু যা রোজগার করে তাতে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন ভালো করেই চলে যাবে। তুমি যাতে হাত-খরচের জন্যে মাসে দু'শ টাকা করে পাও তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আমার ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে তোমার কাছে টাকা যাবে। অমার পড়াশোনার জন্যেও প্রতি মাসে একশ' টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সে টাকাও তোমার কাছে যাবে। অমার বিয়ের জন্যে ২৫,০০০ টাকার 'ফিক্সড্ ডিপোজিট' করে এসেছি। অমা যদি তোমার নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করে তাহলে ওই টাকা তাকে যৌতুকস্বরূপ দিও। আর সে যদি স্বেচ্ছায় নিজের মতে বিয়ে করে তাহলে তাকে কিছু দেবে কিনা, তা তুমিই ঠিক কোরো। আমার জন্যে ভেবো না—এ মিথ্যা উপদেশ তোমাকে দেব না। আমার জন্যে যদি ভাবো তাহলে আমি খুশী হব। একটা কথা মনে রাখলে অনর্থক ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবে। পৃথিবী বিরাট। যে কোনও মানুষই সেখানে নিজের স্থান করে নিতে পারে। তাছাড়া টাকা থাকলে অনেক সুখ সুবিধা সেবা কেনা যায়। সে টাকা আপাতত আমার আছে। সুতরাং চালিয়ে নিতে পারব। আমাকে খুঁজে তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। কারণ আমি আর ফিরব না বলেই বেরিয়েছি। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

কোনও চিঠিতেই তাঁর ঠিকানা বা তারিখ থাকত না। বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মিত্রকেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানিতে রেজেস্ট্রি আপিস সংক্রান্ত যে কথার উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য পরে স্পষ্ট হয়েছিল।

চিঠিখানি এই ঃ

ভাই সিধু,

প্রায় দু'শো মাইল দূরে বসে তোকে চিঠি লিখছি। একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, এ খবর আশা করি এতদিনে পেয়েছিস। হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের শ্লোকগুলি সত্য। আগে অনেকবার পড়েছি ওগুলি, কিন্তু ঠিক এভাবে উপলব্ধি করিনি। আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, কিন্তু উপলব্ধি করি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে, অর্থাৎ ঘা খেয়ে। ঘা খেয়েছি ভাই। নিদারুণ ঘা। আমরা সেকেলে লোক, একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, আমার এক পিসতুতো ভাই আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছিল। তার যখন বসন্ত রোগ হলো তখন তাকে আমরা বাড়ি থেকে দূর করে দিইনি কিংবা তাকে অস্পৃশ্য করেও রাখিনি। আমার মা তার বিছানায় বসে তাকে সেবা করেছেন, তার জন্যে মানত করেছেন, পূজা করেছেন। তাকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত একথা আমাদের কারও মনে জাগেনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমাদের আচরণ হয়তো ঠিক হয়নি, আত্মরক্ষা করে ওকে হাসপাতালে পাঠালেই হয়তো ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত হতো। কিন্তু আমরা তা পারিনি, পারিনি বলেই কিন্তু আমি গর্ববোধ করি। আমার ওই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মা, যিনি তার বিছানায় বসে তাকে সেবা করতেন আর আকুলভাবে মা শীতলার কৃপাভিক্ষা করতেন, তাঁকে আমি দেবী বলে শ্রদ্ধা করি। আমার একটা দুরারোগ্য কুৎসিত ব্যাধি হয়েছে বলে সেই বংশেরই ছেলে, আমার নিজেরই ছেলে, আমার কোল থেকে আমার নাতিকে নামিয়ে নিয়ে বললে—তুমি আর বাড়িতে থেকো না, হাসপাতালে যাও। আমার ছেলেকে আমি যতদূর সম্ভব শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেছি, সে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিলেত-ফেরত অধ্যাপক—কিন্তু সেদিন অনুভব করলাম, যে শিক্ষা সে পেয়েছে তাতে তার মনুষ্যত্ব গঠিত হয়নি, সে বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে একটা ডিগ্রি পেয়েছে মাত্র, ডিগ্রির জোরে চাকরিও পেয়েছে একটা, কিন্তু সে হৃদয়হীন স্বার্থপর পশু হয়ে গেছে। যে দেশে শিবি, দাতা কর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শ্রদ্ধা সহকারে সকলে স্মরণ করে অভিভূত হয়ে পড়েন, সে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, সে জড়বাদী জীব হয়ে গেছে। আমিও যদি ওর মতো বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী হতাম তাহলে বলতে পারতাম—এটা আমার স্বোপার্জিত টাকায় তৈরি বাড়ি, এ বাড়িতে আমিই আমরণ থাকব, তোমার যদি এখানে থাকতে ইচ্ছা না হয় অন্যত্র চলে যেতে পার। কিন্তু আমি তা বলতে পারিনি, নিজেই চলে এসেছি। কারণ আমি সেকেলে আদর্শে বিশ্বাসী।

যাক ওসব কথা। আসবার আগে যে পাগলামি কাণ্ডটা করে এসেছি, যার সাক্ষী তুমি এবং আমার আর এক উকিল বন্ধু, সেটা আশা করি তুমি যত্ন করে রেখে দিয়েছ। রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে রেজিস্ট্রারের সামনেও আমি ওই ব্যাপার করেছি। দু' জায়গায় থাকাই ভালো। আমি এখন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াব, ফেরবার ইচ্ছে নেই। এতদিন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছিলাম,

এখন চললাম অচেনা লোকেদের মধ্যে। দেখা যাক কি পাই তাদের কাছে—ভালোবাসা জেনো।

প্রিয় নানকুবাবু,

আপনার সঙ্গে ট্রেনে সেদিন আলাপ হয়ে কি যে ভালো লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সেদিন একটা কথাই আমার মনে স্পষ্ট হলো, দেশের নাম-করা যে বড়লোকদের আমরা চিনি, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করবার সুযোগ আমাদের হয়নি, সুযোগ পেলে তাঁদের সম্বন্ধে ঠিক কি মনে হতো তা বলতে পারব না, কারণ বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে অনেক লোককে যত বড় মনে হয়, কাছে গেলে দেখা যায় তারা ঠিক ততটা বড় নয়, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই নীচ কিংবা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমার জীবনে এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ খুব বেশি নেই আমাদের সমাজে। থাকলে এ দুর্দশা হতো না আমাদের। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সেদিন বুঝলাম যে, যাদের আমরা চিনি না, যাদের নাম কখনও শুনিনি এমন লোকের মধ্যেও অসাধারণ ভদ্রলোক আছেন, তাই এত দুর্দশা সত্ত্বেও আমরা একেবারে রসাতলে তলিয়ে যাইনি। আমি বুড়ো মানুষ সেদিন স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতে বেশ চোট পেয়েছিলাম, আমাদের পাশের ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে একজন বড়লোকও নেমেছিলেন, সঙ্গে প্যান্ট-পরা দুটি যুবক এবং আধুনিকা সাজে সজ্জিতা একটি মেয়েও ছিলেন, আমি পড়ে গেলাম তাঁরা দেখলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না। এগিয়ে এলেন আপনি। আরও যাঁরা দু'চারজন এলেন, তাঁদের আমরা 'ছোটলোক' বলি। আপনি শুধু এগিয়েই এলেন না, আপনি যখন শুনলেন আমি এলাহাবাদেই নামব এবং একটা হোটেলে গিয়ে থাকব, তখন আপনি 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠলেন। বললেন, হোটেলে যাবেন কেন, আমার বাড়ি চলুন, আমার বাড়ির পাশেই ডাক্তার বিশ্বাস থাকেন, তিনি আগে পরীক্ষা করে দেখুন, আপনার হাড়-টাড় ভেঙেছে কিনা, পা-টাও ছড়ে গেছে, এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি কখনও। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম আপনার ভদ্রতায়। আপনার বাড়ি গিয়ে দেখলাম আপনি ছাপোষা মধ্যবিত্ত লোক। আপনার বাইরের ঘরটা আপনার ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর। কিন্তু সেই ঘরেই আপনি খাট পেতে বিছানা করে দিলেন আমায়। ডাক্তার বিশ্বাস এসে আমাকে দেখলেন, বললেন, হাড়-টাড় কিছু ভাঙেনি। ইনজেক্‌শন দিলেন, ব্যান্ডেজ করে দিলেন। যখন ফি দিতে গেলুম, বললেন—নানকুবাবুর বাড়িতে আমি ফি নিই না। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন নানকুবাবুই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। ওঁরই সহায়তায় আমার প্র্যাকটিশ গড়ে উঠেছে এ পাড়ায়। ক্রমশ জানতে পারলাম আপনি ধনীলোক নন, চাকুরিও করেন না, বাজারে একটা ছোটখাটো দোকান আছে আপনার—কাটা কাপড়ের দোকান। কিন্তু বাঙালী অবাঙালী সকলের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসন আপনি অধিকার করে আছেন তা মোটেই ছোটখাটো নয়। আপনার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা আমায় যে সেবা-যত্ন করেছেন তা ঠিক যেন নিজের লোকের মতো। আপনার স্ত্রীকে আমার পুত্রবধূর আসনে বসিয়ে, আপনার ছেলেমেয়েদের আমার নিজের নাতিনাতনী মনে করে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমি নিজের পরিচয় আপনাকে দিইনি, কিন্তু যখন শুনলাম, আপনি একটি দুষ্টলোকের চক্রান্তে একটা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, তখন আমাকে বলতে হলো যে, আমি একজন

অ্যাডভোকেট। আপনার উকিলের সঙ্গে দেখা করে আমি যে পরামর্শ দিয়ে এসেছি তদনুসারে চললে আপনি মকদ্দমায় জিতবেন বলেই মনে করি। আমার আর কোনও পরিচয় আপনাদের দিইনি, কারণ সেটা অবান্তর। যে পরিচয়ে আপনার সঙ্গে পরিচিতি হয়েছি সেইটেই এখন আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি অসমর্থ লোক, পথ চলতে গিয়ে পড়ে যাই। আর আপনার পরিচয় আপনি সেই পড়ে-যাওয়া লোকটাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি বিদেশী পথিক, দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনার স্নিগ্ধ সৌজন্যের গঙ্গাধারায় অবগাহন করে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছি। জীবনে এটা আমার মস্ত প্রাপ্তি একটা। আমি বউমার জন্যে আর নাতিনাতনীদের জন্যে সামান্য কিছু উপহার পাঠালাম। দিল্লীর একটা দোকান থেকে পার্শেলটা যাবে আপনার কাছে। গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। দিল্লীর দোকানদারকে আমি যে নাম বলেছি তা আমার প্রকৃত নাম নয়, নিজেকে গোপনই রাখলাম আপনার কাছে। কারণ প্রকাশ্যে জানাবার মতো আমার জীবনে কিছু নেই। আমি বৃদ্ধ লোক, আপনাকে আশীর্বাদ করছি যে এই অধঃপতিত যুগে আমাদের দেশের শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখবার শক্তি যেন আপনার অটুট থাকে। ইতি।—

আপনাদের একান্ত আত্মীয় বিদেশী পথিক।

প্রিয় যতীনবাবু,

সেদিন আপনার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ করে সুখী হয়েছিলাম খুব। আসবার সময় আপনার ঠিকানাটা চেয়ে নিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে ওই বিষয়ে আর একটু আলোচনা করব বলে। সেদিন আলোচনাটা খুব জমেছিল, কিন্তু শেষ হয়নি। আপনাকে নেমে পড়তে হলো। স্টেশনে দেখলাম অনেক লোক এসেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। আমি যদিও পলিটিক্সের লোক নই, কিন্তু পলিটিক্স সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞও নই। আমাদের বার লাইব্রেরিতে ও নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অনেক আলোচনা অনেক তর্কাতর্কি হতো। এই পলিটিক্সের নানা চেহারা আমরা দেখছি। ওই পলিটিক্স করতে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পথের ভিখারী হয়ে গেলেন, আবার ওই একই পলিটিক্সের জোরে আমাদের মক্কেলবিহীন আর একজন উকিল (নামটা আর করব না) গাড়ি করলেন, বাড়ি করলেন, ছেলেদের ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করে দিলেন, বিয়ে দিলেন কুৎসিত মেয়েদের ভালো ভালো পাত্রের সঙ্গে। পলিটিক্স পথের মতো, ওই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রী যেতে পারে, আবার চোর ডাকাতও যেতে পারে। আমার যখন জন্ম হয়েছিল, তখন দেশে ইংরেজ শাসন। একটা কথা বলতে পারি, সে সময় আমাদের যে সুখশান্তি ছিল এখন আর তা নেই। একটা কথা তখন শুনতে পেতাম, ইংরেজরা নাকি এদেশ থেকে টাকা শোষণ করে নিয়ে বিদেশ যাচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু এখন কি শোষণ বন্ধ হয়েছে? হয়নি। বিলাতী জিনিস কেনবার জন্যে আমরা উদ্বাহু হয়ে আছি সর্বদা। এদেশে মোটর প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ভিতরের মাল অধিকাংশই বিলাতী। যেটুকু দেশী সেটুকু খারাপ। আমাদের অধিকাংশ ইনডাস্ট্রিতেই তাই। আমরা বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যুদ্ধোপকরণ কিনছি, ভিক্ষা করছি, এবং না পেলে মান-অভিমানও করছি। শোষণ ঠিক চলছে। স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মতলববাজ পলিটিসিয়ানরা নিজেরা গুছিয়ে নিয়েছেন, দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে, তিমির গাঢ়তর হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যদের হাতেই ইংরেজ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন, দেশকে দু'টুকরো করে। স্বাধীনতা

পেয়ে তাঁদেরই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। হিন্দু বাঙালীদের কিচ্ছু সুবিধা হয়নি, বাঙালী মুসলমানরাও নানা অশান্তির মধ্যে আছেন। আগে দেশে কয়েকটা গভর্নর আর আই. সি. এস. অফিসার দেশকে সুশাসনে রাখতে পারতেন। এখন অজস্র মিনিস্টার, অজস্র অফিসার, অজস্র দফতর—সর্বত্রই কিন্তু অব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধী আমাদের অনেক ধর্মের বুলি শুনিয়েছিলেন, আমাদের ধর্ম-প্রবণতা একটু বেশি, ধর্ম-কথা শুনলেই আমরা বেসামাল হয়ে পড়ি। মহাত্মাজীর ধর্ম-কথাই ভারতের জনসাধারণকে উদ্বেলিত করেছিল, যেমন করেছিল শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচার ষোড়শ শতাব্দীতে। শ্রীচৈতন্য কিন্তু ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্স করেননি। মহাত্মাজী কিন্তু করেছিলেন। কালের নিকষে যাচাই করে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর রাজনীতি—যা ইংরেজদের সঙ্গে আপসনীতিরই নামান্তর—আমাদের দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে ক্ষুন্ন করেছে। তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যরা তাঁর উচ্চ ধর্মনীতিকে অনুসরণ করেননি, কংগ্রেসের বিঘোষিত আদর্শকে পদদলিত করে তাঁরা স্বচ্ছন্দে করেছিলেন দেশ ভাগ, সে দেশ ভাগের সময় মহাত্মাজী আমরণ অনশন করার ভয় দেখিয়ে প্রতিবাদ করেননি, যা তিনি অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেকবার করেছিলেন তার আগে। দেশ ভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে মহাত্মাজীর অহিংসা-ধর্ম প্রচার সত্ত্বেও দেশে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তার একটি মাত্র অর্থই আমাদের মনে জাগরূক আছে—মহাত্মাজীর অহিংসার বাণী আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে কিছু প্রভাব বিস্তার করেনি। অহিংসার বাণী এদেশে নূতন কিছু নয়, বুদ্ধদেবের আমল থেকে আমরা তা শুনে আসছি, এ বাণীর দ্বারা দু'চার জন লোক হয়তো উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু ইতিহাস বলে, বেশির ভাগ লোকই হননি। পশুত্বের নানা নৃত্য আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে হয়ে গেছে। ধর্মের মুখোশ পরে নানা ভেকধারী পিশাচকে আমরা আগেও দেখছি, এখনও দেখতে পাচ্ছি। রাজনীতির দাবাখেলায় ধর্মকে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু ধর্ম দেশের সমস্ত লোককে মহাপুরুষ করে তুলবে এ আশা দুরাশা। ধর্মের মূল কথা পরার্থপরতা, ত্যাগ। রাজনীতির মূলকথা স্বার্থপরতা এবং জবর-দখল। ও দুইয়ের নিবিড় মিলন কখনও ঘটতে পারে না। রাজনীতির দাবাখেলায় যে জিন্না সাহেবের কাছে মহাত্মাজী হেরে গেছেন তা আজ আর বুদ্ধিমান লোকের কাছে অস্পষ্ট নেই। মহাত্মাজীর ধর্মপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে চতুর ইংরেজ আমাদের দেশের সামগ্রিক চেতনাকে, আমাদের স্বাধীনতার আদর্শকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে আমাদের দেশে ও সমাজে যে বীজ বপন করে দিয়ে গেছে তার ভয়ঙ্কর চেহারা ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে। আমাদের স্বাদেশিকতা লোপ পেয়েছে, আমরা মনে-প্রাণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দাস হয়েছি, এদেশ থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়েও বাস করে কৃতার্থ বোধ করছে এবং তাদের বাপ-মায়েরা তা নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন সগর্বে। আমাদের সাহিত্যে রাজনীতিতে পোশাক-পরিচ্ছদে, সামাজিকতায় আহারে-বিহারে সর্বত্রই এই দাস মনোভাব। বিদেশী সভ্যতা থেকে ভালো জিনিস আহরণ করা নিন্দনীয় নয়, যেটা নিন্দনীয় সেটা হচ্ছে আত্মসুখের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণ। স্বাধীনতার পর আমরা এত বেশি স্বার্থপর এবং এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি, এত বেশি ধর্মহীন জড়বাদের উপাসক হয়ে পড়েছি যে, টাকাই এখন আমাদের সভ্যতা-ভব্যতার চালক হয়েছে। এদেশে মহাত্মাজীর আদর্শ যে কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয়েছে তা মনে হয় না। আপনি বললেন আপনি যে রাজনৈতিক দলের হয়ে লড়ছেন তার লক্ষ্য দেশের দুর্দশা মোচন করা।

কিন্তু দেশ মানসিক দুর্দশার যে স্তরে পৌঁছে গেছে তার থেকে তাকে টেনে তোলার কথা নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন না। দেশ বদলাক তাতে তত ক্ষতি নেই, পোশাকে-পরিচ্ছদে, চিন্তায়, সাহিত্যে তারা বিলিতী, ফরাসী, মার্কিন, চীনে, জাপানী যা খুশি হোক, কিন্তু তারা যদি মনুষ্যবিবর্জিত ঘোর স্বার্থপর, কামুক, অর্থগৃধ্নু পশু হয়ে যায় তাহলে আমাদের এ স্বাধীনতা কত দিন টিকবে? যে-কোনও বড় স্বাধীন দেশের খবর নিয়ে দেখবেন, সেখানে হঠাৎ গেলে হয়তো মনে হবে একটা চোখে-খোঁচা-মারা বেলেল্লাগিরি, যথেচ্ছাচার অবাধ মেলামেশা আপনার ভদ্রতাবোধকে ক্ষুণ্ণ করছে। কিন্তু খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন ওদেশে নমস্য শ্রদ্ধেয় মানুষের সংখ্যাও অনেক, তাই তাঁরা জগতের মানব-সমাজের নেতৃত্ব করছেন। এ রকম মানুষ ব্রিটেনে আছে, ফ্রান্সে আছে, আমেরিকায় আছে, রাশিয়াতে আছে, চীনে আছে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যাবত্তায়, মনুষ্যত্বে, স্বদেশের বিশিষ্ট মর্যাদায় জ্যোতিষ্কের মতো দেদীপ্যমান। আমরা ওদের ভালো গুণগুলো নিতে পারিনি, সে রকম গুণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্রে পরিস্ফুট করবার কোনও ব্যবস্থা নেই এখানে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা তোতাপাখির মতো কতকগুলো নোটবই মুখস্থ করে লেখাপড়া শেখে, পরের নকলে পোশাক পরে সভ্য হয়, পরের নকলে আলাপ করে, ঘোর স্বার্থপর হয় আর দাসখত লিখে দেয় টাকার কাছে। আপনি অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করবেন বললেন, তাই এই কথাগুলো লিখলাম। মানুষ নিয়েই দেশ, তাদের যদি উন্নতি না করতে পারেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু টিকবে না। নদীতে ড্যাম করে, কৃষকদের সার বিতরণ করে, স্কুল-কলেজের বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে, ফ্যাক্টরি খুলে কিচ্ছু হবে না, শেষ পর্যন্ত যদি না দেশে মানুষ তৈরি করতে পারেন। ওইটেই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি পেশাদার পলিটিসিয়ান নন, আপনি সত্যিই দেশের উন্নতিকামী সংস্কারক। আপনার পার্টি যদি গদিতে বসে তাহলে আমার অনুরোধ, দেশের ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো তৈরি করুন। দেশে আর মানুষ নেই। এবার আমার নিজের কথা বলি, তাহলেই বুঝবেন একথা কেন বলছি। আধুনিক মাপকাঠিতে আমার ছেলে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, এদেশে এবং বিদেশে অনেক ডিগ্রির মালা পেয়েছে, ভালো চাকরিও করে। বেশ চলছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল যখন স্বার্থের সংঘাত বাধল। আমার পিঠে একদিন 'প্যাচ' (patch) হলো একটা। ডাক্তার বললেন—ওটা কুষ্ঠ। ব্যস, তার পরই জাগল সমস্যা। আমারই বাড়িতে সকলেই আমাকে অস্পৃশ্য করে দিল। আমার খাওয়ার জন্য আলাদা এক সেট বাসন এল, বিছানাপত্র এল। আমার স্ত্রী পর্যন্ত আমাকে ছুঁতে দ্বিধা বোধ করতে লাগলেন। পারতপক্ষে স্পর্শ করতেন না আমাকে। আমার কাপড় কাচবার জন্য আলাদা একটা মেথরানী বাহাল হলো, সে 'ডেটল' বালতিতে ঢেলে আমার কাপড় কাচতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হলো আমার নাতিকে (পৌত্রকে) নিয়ে। সে তো বৈজ্ঞানিক নয়, যে দাদুর কোলে সে বরাবর চড়েছে, কাঁধ ধরে দুলেছে, তার কোলে সে এখন চড়তে পাবে না কেন, তার বিছানায় উঠে হুড়োমুড়ি করতে বাধা কি—এসব তার মাথায় ঢোকেনি। সে সকলের মানা অগ্রাহ্য করে প্রায়ই ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার কোলে, দুলত আমার পিঠ ধরে। কারও মানা শুনত না সে। ছেলেটা ভারি দুরন্ত আর আমার বড্ড নাওটা। আর আমার ছোট মেয়েটাও শুনত না কারও কথা। আমার বিছানায় এসে বসত। একদিন বলেছিল—বাবা, মেথরানীকে ছাড়িয়ে দাও, আমিই তোমার কাপড় জামা কেচে দেব। আমার গামছাটা ও নিজেই কাচত। এইভাবেই

চলছিল। হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল একদিন এবং আমার জীবনের পটভূমিকা বদলে গেল। অমা (আমার ছোট মেয়ে) বসেছিল আমার বিছানার উপর আর নাতিটা বসেছিল আমার কোলে। হঠাৎ আমার বড় ছেলে এসে তুলে নিল আমার নাতিকে আমার কোল থেকে। আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার উচিত হাসপাতালে গিয়ে থাকা। আপনি একে আর কোলে নেবেন না। অমা, উঠে যা এখান থেকে—। আমার মনে হলো কে যেন আমার গালে ঠাস করে চড় মারল একটা। বজ্রাহতবৎ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেলাম বাইরে। বাড়ির কাছে একটা পার্ক ছিল। একটা খালি বেঞ্চে গিয়ে বসে ভাবলাম অনেকক্ষণ। মনে হলো আমার আর সংসারে থাকার কোনও মানে হয় না—পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ—একথা আমাদেরই শাস্ত্রে আছে। আমার বিদ্বান ছেলে যা বলেছে তা যুক্তিযুক্ত, তার স্বপক্ষে বিজ্ঞান আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে হলো–বিজ্ঞান আছে, কিন্তু হৃদয় নেই। মানব-সভ্যতায় হৃদয় বড় না বিজ্ঞান বড়—এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া শক্ত। যন্ত্রসভ্যতা মানুষকেও হৃদয়হীন যন্ত্র করে তুলছে একথা ভাবতে কিন্তু ভালো লাগে না, —আমি হৃদয়হীন হতে পারিনি কিন্তু (হয়তো আমি সেকেলে অসভ্য)–যদিও ওই বাড়িটা আমার স্বোপার্জিত অর্থে তৈরি—তবু ওই বাড়ি ওদেরই ছেড়ে দিয়ে এসেছি আমি। ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে পথে, ট্রেনে ট্রেনে অচেনা লোকদের মাঝখানে। হয়তো 'ইনফেকশন' ছড়াচ্ছি। কিন্তু কোনও উপায় নেই। ভদ্রভাবে থাকব এমন কোনও কুষ্ঠ হাসপাতাল খুঁজে পাইনি এখনও। আপনারা যদি এবার জিততে পারেন কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটা ভদ্র হাসপাতালের ব্যবস্থা করবেন। যে দু'একটি কুষ্ঠাশ্রম দেখেছি তাতে থাকা সম্ভব নয়।

আপনাকে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখে ফেললাম কিছু মনে করবেন না। শুধু এই ভরসায় লিখলাম, আপনি যে দেশের নেতা হতে যাচ্ছেন আমিও সেদেশের একটা মানুষ, আমার সমস্যাও দেশের একটা বড় সমস্যা। এ দেশ থেকে যাতে অস্পৃশ্যতা উঠে যায় তার জন্যে আপনারা আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীরা যে অস্পৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এর কি কোনও প্রতিকার নেই? একটা জিনিস মনে হওয়াতে কিন্তু ভারি আনন্দ হলো। যেখানে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি, সেটা একটা খোলা প্ল্যাটফর্ম। আমাকে ঘিরে ফুরফুর করে হাওয়া বইছে, রোদ পড়েছে আমার সর্বাঙ্গে। ওরা কেউ অস্পৃশ্য বলে আমার কাছ থেকে সরে যায়নি। ওরাই পরমাত্মীয়। চিঠি লম্বা হয়ে গেল। আর নয়, নমস্কার গ্রহণ করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি বিজয়ী হোন, দেশের দুঃখ দূর করুন। ইতি—

আপনার ট্রেনের সহযাত্রী

শ্রীচরণেষু,

আপনারা কি জাত, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় না ছোট, এসব খবর জানি না, তবু 'শ্রীচরণেষু' লিখলাম কারণ আপনার উপর সত্যিকার শ্রদ্ধা হয়েছে আমার। আপনাকে দেখে আমার মাকে মনে পড়েছে। আপনার মতোই আমার মা লেখাপড়া তেমন কিছু জানতেন না, শুধু বাংলাটা পড়তে পারতেন, রামায়ণ পড়তেন বিকেলে বসে। খবরের কাগজ নয়। তিনি দেশ-বিদেশের খবর রাখতেন না, খবর রাখতেন নিজের সংসারের আর পাড়াপড়শীদের।

বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের ধাত, স্বাস্থ্য, মেজাজ, কে কি খেতে ভালবাসে সব তিনি জানতেন। টোটকা নানারকম ওষুধও জানতেন তিনি। শিউলিপাতার রস, তুলসী পাতার রস, কালমেঘের রস, চিরেতা ভেজানো, গাঁদাল পাতার ঝোল—কত রকম ওষুধই না খাওয়াতেন আমাদের। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের হাতেই খাইয়ে দিতেন রোজ দু'বেলা। ছোঁয়াছুঁয়ির খুব বিচার ছিল। গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়াতেন চারিদিকে। কিন্তু কারও উপর ঘৃণা ছিল না তাঁর। বাগদি, ডোম, মেথরদের ছুঁতেন না যদিও সংস্কার বশে, কিন্তু তাদের স্নেহ করতেন, তাদের ডেকে খাবার দিতেন, জামা কাপড়ও দিতেন। তাদের কারও অসুখ-বিসুখ করলে তাদের বাড়িও যেতেন দেখেছি, ফিরে এসে স্নান করতেন, মাথায় গঙ্গাজল ছিটোতেন, কিন্তু তাদের হিতৈষী ছিলেন তিনি। অস্পৃশ্যতাটাই বড় ছিল না তাঁর কাছে, ধর্মটাই বড় ছিল। তাঁর ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হতো। সে ঠাকুরঘরে যদিও লক্ষ্মীজনার্দনেরই পিতলের প্রতিমা ছিল, কিন্তু আরও অনেক ঠাকুরের ছবি টাঙানো থাকত সেখানে। মা ভোরবেলা উঠে স্নান করে পাটের কাপড় পরে যখন ওই ঠাকুরঘরে ঢুকতেন তখন আমাদের কারও ঘুম ভাঙত না। বেলা আটটার সময় ঠাকুরঘর থেকে বেরুতেন মা। আমাদের সক্কলকে প্রসাদ দিতেন, সক্কলের মাথায় এবং চারদিকে গঙ্গাজল ছিটোতেন। সেদিন যখন ধর্মশালার ঘরে দেখলুম আপনি বাক্স থেকে ঠাকুরের ছবি বার করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুজোর আয়োজন করছেন তখন আপনাকে দেখে আমার মাকে মনে পড়ল। আপনার ইচ্ছে হলো ফুল দিয়ে পুজো করবেন, ধর্মশালার চাকরটাকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু সে বলল তার এখন ফুরসত নেই, ফুল কিনতে বাজারে যেতে পারবে না। আপনার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল, চাকর মুখের উপর উত্তর দেবে এতে বোধ হয় আপনি অভ্যস্ত নন। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমি ফুল এনে দিচ্ছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি জুতোটা খুলে খালি পায়েই বেরিয়ে গেলাম। ফুলও নিয়ে এলাম একটু পরে। আপনি ফুলগুলোর উপরও গঙ্গাজল ছিটোলেন। তারপর ভক্তিভরে পুজো করলেন অনেকক্ষণ ধরে। সে পুজো শেষ করে আপনি যখন আমার মাথায় ফুল-বিল্বপত্র ঠেকাতে এলেন তখন আমি আপনাকে বললাম—মা, আমাকে ছোঁবেন না।—কেন, তুমি কোন জাত? জিজ্ঞেস করলেন আপনি। বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার এমন একটা ব্যাধি হয়েছে যে আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।—কেন, কি হয়েছে তোমার? জিজ্ঞেস করলেন আবার, সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন—অসুখ হলে মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে যায় নাকি। কি অসুখ? তখন সব খুলে বললাম আপনাকে। তারপর আপনি যা করলেন তা আমার বাড়ির লোকেরাও করেনি কখনও। আপনি আমার পিঠের সেই দাগটার উপর পুজোর ফুল বুলিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন—রোজ ঠাকুরের পায়ের ফুল-বিল্বপত্র এখানে বুলিয়ে দিও, ভাল হয়ে যাবে। আপনার সে স্নেহস্পর্শ আজও লেগে আছে আমার গায়ে। আপনি তার পরদিনই চলে গেলেন। আপনার ঠিকানাটি চাইলাম। আপনি আপনার ছেলের ঠিকানা দিলেন। আপনার নাম কি তা আমি জানি না। আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি কয়েকদিন। কারণ নিজের হাতে নিজের পিঠের মাঝখানে ফুল-বেলপাতা বোলানো যায় না। একটি ছোঁড়া চাকর বাহাল করেছিলাম। তাকে দিয়েই রোজ ঠাকুরবাড়ি থেকে ফুল আনিয়ে ও জায়গাটায় বোলাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোঁড়াটার কেমন যেন সন্দেহ হলো দিন কয়েক পরে। আমাকে বললে—আমাদের পাশেই এক ছোকরা ডাক্তার বাবু

থাকেন, তাকে দিয়ে চিকিৎসা করালে আপনি সেরে যাবেন। গেলাম সে ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি ছোঁড়াটার সামনেই বললেন—এ তো আপনার কুষ্ঠ হয়েছে মশাই। তারপর যেসব ওষুধ আর ইনজেক্‌শনের ফিরিস্তি দিল সেসব ফিরিস্তি আমার আগের ডাক্তারও আমাকে দিয়েছিল। ছোঁড়াটা কিন্তু তারপর থেকে অন্তর্ধান করেছে। এখানে ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি একটি নাকফোলা মেয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়। বোধহয় তারও কুষ্ঠ হয়েছে। তাকে একদিন ডেকে সব কথা বলেছি। সে বলেছে আমার পিঠে ঠাকুরবাড়ির ফুল-বেলপাতা বুলিয়ে দেবে। নিজের নাকে আর হাতেও বোলাবে। এখন তাই চলছে। দেখি এই ভাবে কতদিন চলে। আপনি আমার সভক্তি গ্রহণ প্রণাম করুন। আপনি আমার মা। যদি কোনোদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে আপনার ঠিকানায় হাজির হতে পারি, আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে আসব। ইতি—

প্রণত

আপনার হতভাগ্য পুত্র।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি লেখক মানুষ, বললেন অনেকগুলো বই আপনি লিখেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার নাম আমি আগে শুনিনি। আমিও বাংলা ভাষার বই পেলেই পড়ি, কয়েকটি সাপ্তাহিক মাসিকেরও নিয়মিত পাঠক আমি। কিন্তু আপনার নাম আমার চোখে পড়েছে বলে আমার মনে পড়ল না। আপনার সঙ্গে ট্রেনে বসে সাহিত্য-আলোচনা করে অনেক জ্ঞান লাভ করলাম কিন্তু সেদিন। আপনি অনেক দেশের সাহিত্য পড়েছেন, অনেক দেশের রাজনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আপনার প্রচুর জ্ঞান। আপনি যে একজন অনাদৃত এবং উপেক্ষিত 'জিনিয়াস' একথাও আপনার ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ পেল। আপনাকে দেখে কষ্ট হলো। আমিও একজন অনাদৃত এবং উপেক্ষিত লোক, কিন্তু আমি 'জিনিয়াস' নই। আমার যেটা কর্মক্ষেত্র ছিল সেখানে আমি নাম করেছি, আমার কর্মের বিনিময়ে টাকাও রোজগার করেছি—অনেক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের লোকের কাছে ঘা খেয়ে আমাকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। আমার দেহে একটা কুৎসিত দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলে আমার নিতান্ত আপনজনের কাছেও আমি আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছি, তারা আমাকে স্পর্শ করতেও ভয় পাচ্ছে। তাদের আমি দোষ দিতে পারি না। আমি ভাবছিলাম আপনার প্রতিভার গায়েও ওইরকম লেপ্রসির প্যাচ হয়নি তো? তাই কি লোকে আপনার কাছে যেতে চাইছে না। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যখন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওঁকে আপন লোক বলে চিনেছিলাম। আপনাকে চিনতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। খুব ছেলেবেলায় আমি একটা মিশনারি মেমসাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। মেমসাহেবের নিখুঁত ব্যবহার, পরিষ্কার পোশাক, মার্জিত রুচি, প্রচুর বিদ্যা এ সবই ছিল, কিন্তু তবু তাঁকে আমরা আপনজন ভাবতে পারিনি। আপনজন ছিল আমাদের মনুদি, যিনি ওই স্কুলে চাকরানীর কাজ করতেন। আমরা মেমসাহেবের চেয়ে তাঁকে ভালবাসতাম বেশি। আপনার লেখার ভাষায় ভাবে জৌলুসে তেমনি হয়তো এমন একটা কিছু আছে যাতে আমরা আপনাকে আপন ভাবতে পাচ্ছি না। কিংবা হয়তো এমন একটা কিছু আছে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই অনেকে শ্রেয়ঃ মনে করছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমি আপনার বই একখানা কিনে পড়েছি।

পড়ে দেখলাম আপনি অনেক জায়গায় নিজের বিদ্যে ফলাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক জায়গায় অকারণে যৌন প্রসঙ্গ, রাজনীতি প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন, আর সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগল, আপনি এদেশের সকলের পিঠ-চাপড়ে একটা অভিভাবকী সবজান্তা সুরে কথা বলেছেন, ফলে আপনার বইটি পড়লে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে না, রাগ হয়। আপনাকে অকারণে এই কটু কথাগুলো লিখতাম না হয়তো, আপনার বই কিনেও হয়তো পড়বার উৎসাহ হতো না আমার, কিন্তু আপনি সেদিন ট্রেনে আমার সঙ্গিনীর লাল নাকটা দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে আমার গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। আপনি বলেছিলেন—আ মোলো এ কুঠে মাগীটা কোথা থেকে উঠে এল আবার। তুমি অন্য গাড়িতে গিয়ে বস। তখন আমাকে বলতে হলো—ও আমার বোন, আমার সঙ্গেই নামবে। ওদের জন্যে আলাদা ট্রেনের বন্দোবস্ত তো গভর্নমেন্ট করেনি। তখন আপনিই আমাকে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান-গর্ভ নানাকথা বলে শেষে বললেন, আজকাল মুশকিল কি জানেন, আজকালকার লোকের সিভিক সেন্স নেই।—আপনার কি আছে? অনবরত সিগারেট খাচ্ছিলেন আপনি চারদিকে ধোঁয়া উড়িয়ে আর চারদিকে ছাই ছড়িয়ে। প্রায়ই বগলটা যে ভাবে চুলকাচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল ওখানে আপনার দাদ বা কোনও চর্মরোগ আছে। গাড়ির সব প্যাসেঞ্জারদের যদি ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবে ট্রেনে চড়তে দেওয়ার নিয়ম থাকত তাহলে কি এর সুরাহা হতো? হয়তো অনেক ঘুষখোর ডাক্তারদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে আমরা সার্টিফিকেট যোগাড় করতাম, কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করতাম বিক্ষোভ করে। মোটকথা, শেষ পর্যন্ত সুস্থ-অসুস্থ সবাইকে পাশাপাশি যেতে হতো। আমরা বরাবরই তাই গিয়েছি। পরের অসুখকে আমরা সহ্য করেছি। অসুস্থ হয়েছে বলে তাকে অপমান করিনি। যারা করেছে তাদের অসভ্য বলেছি। আপনি আপনার লেখায় বক্তৃতায় নিজেকে সুসভ্য সুশিক্ষিত বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি, কারণ আমরা শ্রদ্ধেয়কেই সত্যিকার শ্রদ্ধা করি, বাধ্য হয়ে অনেক সময় অশ্রদ্ধেয়কেও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হই, মানে বাইরে শ্রদ্ধা দেখাবার ভান করি, কিন্তু সে শ্রদ্ধা আন্তরিক নয়, তা টেকে না। আপনি যদি দেশের লোকের মনে প্রকৃত শ্রদ্ধার আসন পেতে চান তাহলে সত্যিই শ্রদ্ধেয় হতে হবে আপনাকে। নমস্কার। ইতি—

আপনার ট্রেনের সহযাত্রী।

পুনশ্চ। আপনি ভাবছেন আপনার ঠিকানা যোগাড় করলাম কি করে। যোগাড় করলাম আপনার প্রকাশকের কাছ থেকে। নমস্কার। ইতি—'

কল্যাণীয় বীরু,

তুমি আমাকে যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় আজ দশটা টাকা পাঠালুম তোমাকে। সেদিন তুমি যখন আমার পকেটে হাত দিয়ে আমার মানি ব্যাগটা তুলে নেবার চেষ্টা করেছিলে ভিড়ের মধ্যে, তখন আমি তোমার হাতটা ধরে ফেলেছিলাম। ধরে শুধু বলেছিলাম—আমার সঙ্গে চল। যদি সেই ভিড়ের মধ্যে হৈ চৈ করে উঠতাম তাহলে সবাই তোমাকে মারধোর করত। পুলিশেও দিইনি তোমাকে, যদিও কাছেই একটা কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। তোমাকে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করব বলে, তোমার মুখ থেকেই

শুনতে চেয়েছিলাম কেন তুমি এই হীনবৃত্তি অবলম্বন করেছ। তুমি বলেছিলে—পেটের দায়ে তুমি একাজ করছ। তোমাদের নাকি একটা দল আছে, সেই দল তোমাকে প্রতিপালন করে। তুমি বোধহয় জান না আমি একজন উকিল। অনেক জেরা করেছিলাম তোমাকে। জেরা করে করে তোমার জীবনের যে কাহিনী টেনে বার করলাম শেষ পর্যন্ত, তাতে তোমার উপর আর রাগ রইল না, নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হলো। তোমার মা বোন কেন বেশ্যাবৃত্তি করছে, তোমার বাবা কেন গুণ্ডা হয়েছে, কেন তোমার সুশিক্ষা হয়নি, কেন তোমাকে মাইনে বাকি পড়ার জন্য স্কুল থেকে চলে আসতে হলো, তুমি রাজনীতির কিছু বোঝ না, যখন যে দল তোমাকে পয়সা দেয় তখনই সে দলের মিছিলে যোগ দিয়ে কেন তুমি শ্লোগান আওড়াও, তুমি ভাল করে খেতে পাও না, পরতে পাও না অথচ তোমার সিনেমা দেখার দিকে এত ঝোঁক কেন—এই রকম নানা রকম 'কেন' এসে আমাকেই যেন সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে—বললে, যে সমাজের তুমি একজন অংশ সে সমাজই বীরুর অধঃপতনের জন্যে দায়ী। সে দায়িত্ব তুমিও এড়াতে পার না। তাই সেদিন তোমাকে পুলিশে না দিয়ে তোমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিলাম, ভালো ভাবে থেকো। তোমার ঠিকানা দাও, আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব। সেই ঠিকানাতেই টাকা পাঠালাম আজকে, এই চিঠিও লিখছি। ঠিকানা যদি ঠিক দিয়ে থাক তাহলে আমার চিঠি ও টাকা তোমার পাওয়া উচিত। শুনেছি চোরেরা অনেক সময় নিজেদের নাম ঠিকানা দিতে চায় না। এক একজন চোরের একাধিক নাম থাকে। তাই সন্দেহ হচ্ছে—ঠিক ঠিকানা দিয়েছিলে তো? সেদিন তোমার কাহিনী আমার মনকে স্পর্শ করেছিল বলেই এত কাণ্ড করলাম। তোমাকে আর একটা কথাও বলছি। তুমি যদি ভদ্রভাবে আমার কাছে থাকো তোমার সমস্ত ভারই আমি নিতে পারি। তবে যে কথা সেদিনও বলেছিলাম সে কথা আজও বলছি, আমি ও আমার বোন 'ছুনি' যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি তা অনেকের চোখে ঘৃণ্য। ডাক্তাররা কিন্তু বলেন এ রোগ এতটা ছোঁয়াচে নয় যতটা ছোঁয়াচে ইনফ্লুয়েঞ্জা। সব জেনেশুনেও তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও আমি তোমার সমস্ত খরচ চালাব। তুমি আমাদের চাকর হবে না, আমরা নিজেরাই আমাদের সব কাজ করেনি, তুমি হবে আমার সহচর। তোমাকে মানুষ করাই আমার লক্ষ্য। যদি তুমি রাজী থাকো গয়ার পোস্ট মাস্টারের কেয়ারে আমাকে চিঠি লিখো। আমি গয়ায় কিছুদিন থাকব। আশীর্বাদ জেনো। ভালো হও, বড় হও, তোমার জীবন থেকে সব মলিনতা ধুয়ে যাক এইটেই আমি কামনা করি। ইতি—

শুভার্থী
বিষ্ণুপদ রায়

ভাই ফটিক,

হঠাৎ সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তুমিও আমাকে এড়াতে চাইছিলে, আমিও তোমাকে এড়াতে চাইছিলাম। কিন্তু এমন মুখোমুখি হয়ে গেলাম যে গা-ঢাকা দেওয়া সম্ভব হলো না। তুমি আমাকে এড়াতে চাইছিলে, কারণ বছর দুই আগে তুমি আমার কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়েছিলে, বলেছিলে দু'মাসের মধ্যেই ফেরত দেবে। তুমি আত্মীয়, তোমার কাছ থেকে হ্যান্ড নোট নেওয়া সঙ্গত মনে করিনি। ভেবেছিলাম সত্যিই

তুমি ফেরত দেবে। কিন্তু তুমি তা দাওনি। দু'বছর পেরিয়ে গেছে। শুনেছি তোমার অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। তুমি যে পাঞ্জাবিটা পরেছিলে সেটা বেশ দামী কাপড়ের মনে হলো। সোনার বোতামও ছিল। আমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে তুমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলে এবং গা-ঢাকা দিতে না পেরে একটু বিপন্ন বোধ করছিলে। আমিও বেশ বিপন্ন বোধ করেছিলাম, কারণ আমিও চেনা লোককে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছি। অবশ্য আমি কারও টাকা মারিনি, আমার কারণটা অন্য ধরনের। সেটা তোমার কাছে বলাও নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। একটি অনুরোধ শুধু করছি, আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছিল এ খবর যেন আমার বাড়িতে তুমি দিও না। অবশ্য টাকা নেওয়ার পর থেকে আমাদের কোনও খবর তুমি নাওনি; আমার অনুরোধ এখনও খবরাখবর কোরো না। আর আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি এবং কেন চলে এসেছি এ খবর তুমি যদি জেনে থাক তাহলে তা নিয়ে বেশি হইচই কোরো না। করে কোনও লাভ হবে না; আমি যা ঠিক করেছি তা করবই। কিন্তু তুমি যদি আবার পরিবারবর্গকে অকারণে অশান্ত করে তোল তাহলে ওই হাজার টাকার জন্য তোমার নামে আমি নালিশ করব। যদিও তোমার কাছ থেকে আমি হ্যান্ডনোট নিইনি কিন্তু তোমাকে একটা চেক দিয়েছিলাম। আমার ব্যাংকই সাক্ষী দেবে, তুমি আমার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়েছিলে। তোমাকে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে, কেন টাকাটা নিয়েছিলে তুমি। মকদ্দমায় আমি না-ও জিততে পারি, কিন্তু তোমাকে নানা ঝামেলায় ফেলে দিতে পারি আমি। সুতরাং আমার অনুরোধটি রক্ষা কোরো। ইতি—

তোমার পিসেমশাই।

মান্যবরেষু,

পণ্ডিত মশায়, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি সেদিন ঠাকুরবাড়ির চত্বরে বসে সন্ধ্যেবেলায় প্রেম-বিষয়ক যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা আমিও শুনেছিলাম একধারে বসে। অনেকেরই দেখলাম চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অনেকেই 'আহা' 'আহা' করছেন। আপনি বক্তৃতা ভাল দেন, গানও আপনার চমৎকার, গৈরিকধারিণী যে মহিলাটি আপনার পাশে বসেছিলেন তিনিও সুন্দরী। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল তখন, গঙ্গার উপর দিয়ে যে হাওয়া বয়ে আসছিল তা অপূর্ব। প্রেম-বিষয়ক আলোচনা করবার মতোই পরিবেশ ছিল সেদিন। আপনি, আশা করি, ওই ঠিকানাতেই আছেন এবং এখনও প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি সন্ধ্যায় আপনার বক্তৃতার বিষয় প্রেম কি না জানি না। আমি আপনার এক ভক্তের কাছে আপনার নাম, ঠিকানা যোগাড় করেছিলাম। সেই ঠিকানায় এই পত্র লিখছি, জানি না আপনি এ পত্র পাবেন কিনা। এ পত্র লেখার উদ্দেশ্য আপনাকে এই কথা বলা যে, সেদিন যখন আপনি প্রেম-বিষয়ক বক্তৃতা করছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আপনি বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো অলীক কাব্য-কথা আউড়ে যাচ্ছেন। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রেম নেই, আর তা নেই বলেই তাকে ঘিরে আমাদের মনে অনেক স্বপ্ন আছে। সেই স্বপ্নেরই জাবর কাটছি আমরা বহুকাল ধরে। আপনিও সেদিন তাই করছিলেন। সত্যি কথা হচ্ছে আমরা পশু; আমরা ষড়্‌রিপুর দাস। সেই ষড়্‌রিপুই সহস্ররূপে মূর্ত হয়েছে আমাদের স্বার্থ-ক্লিন্ন জীবনে। কাম

আছে, কিন্তু তা প্রেম নয়। সর্বস্ব উজাড়-করা প্রেমের অনেক কাহিনী পড়েছি, কিন্তু দেখিনি কখনও। শ্রীরাধা কবি-কল্পনা। সাধারণত উপন্যাসে নাটকে যেসব প্রেম-কাহিনী পাঠ করি তা কাম-প্রণোদিত জীবলীলা। মানে, অধিকাংশই তাই। ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যাঁরা গৃহত্যাগ করেন, সর্বস্ব ত্যাগ করেন, তাঁদের সংখ্যাও এত কম যে তাঁদের অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন অদ্ভুত লোক বলে মনে হয়। এরকম লোকের কথা ইতিহাসে পড়েছি, চোখে দেখিনি। চোখে যাদের দেখেছি তারা সব স্বার্থপর পশু। এইসব স্বার্থপর পশুদের জন্য যেসব প্রেম-কাহিনী বাজারে নাম করে সেগুলি প্রায়ই নিছক পর্ণোগ্রাফি, কিংবা পর্ণোগ্রাফিঘেঁষা। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কেউ পড়ে না আজকাল। পর্ণোগ্রাফির দিকেই সাধারণ লোকের ঝোঁক বেশি। আপনার সভায় যে ধরনের লোক-সমাগম হয়, লক্ষ্য করলাম, তাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমের ছটা কারও মুখে নেই। আপনার সভায় কমবয়সী মেয়েদের বেশ ভিড়, আরও লক্ষ্য করলাম আপনার পুরুষ শ্রোতারা নির্লজ্জের মতো তাদের দিকে দু'চক্ষু মেলে চেয়ে আছেন। যদিও মাঝে মাঝে কেউ কেউ 'আহা' 'উহু' করছেন কিন্তু সেটা যে আপনার বক্তৃতার সার-মর্ম উপলব্ধি করে তা আমার মনে হলো না। আপনার ওই আধ্যাত্মিক সভাতেও পশুদেরই ভিড় দেখলাম, যে ভিড় চারদিকেই দেখছি—আদালতে, বেশ্যালয়ে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে, রাজনীতি-সভায়, স্কুল-কলেজে, সাহিত্য-প্রগতিতে, ব্যবসায়ক্ষেত্র—এক কথায় সর্বত্র। দু-চারজন ভদ্রলোক যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁরাই আজকাল সব চেয়ে বেশি বিব্রত। প্রেম-কীর্তন না করে, পারেন তো আমাদের ওই ভদ্রতাবোধকে আবার উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করুন। কিন্তু বোধহয় তা পারবেন না। স্বয়ং বুদ্ধদেব ওই কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মও শেষে গুহ্য পূজায় পরিণত হয়েছিল এদেশে। পশুদের ভদ্র করা শক্ত। তবু ওই শক্ত কাজটা করবারই চেষ্টা করতে হবে। আপনি ভালো বক্তা ভালো গায়ক, আপনার চেহারাটিও সুন্দর—আপনি চেষ্টা করুন। নানা কারণে আমার মনটা বিষিয়ে আছে, তাই আমার চিঠির সুরটা যত ভদ্র হওয়া ছিল হয়তো ততটা হলো না। মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন। আগে পশুদের ভদ্র মানুষ করুন তারপর প্রেমের কথা কইবেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। ভদ্রতা আর প্রেম দুটোরই মূল কথা ত্যাগ, পরার্থপরতা। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি বেকার, তাই চিঠি লিখে সময় কাটাই। নানা লোককে লিখি। আপনাকেও লিখলাম। উত্তর চাই না, তাই ঠিকানা দিলাম না। তাছাড়া আমার কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানাও নেই। আমি একজন পথ-চলতি মুসাফির। ইতি—

কল্যাণীয়াসু,

আমি সেদিন তোমাদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। কারণ তোমাদের বাড়ির সামনে যে হোটেলটা আছে সেখান থেকে আমি কিছু ভাত তরকারি কিনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম ভাত চড়ানো হয়েছে, একটু পরেই গরম ভাত পাওয়া যাবে। আমি একটা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইটে তাদের কাছে দিয়ে দিলাম, বললাম, ওই সামনের বাড়ির বারান্দাতে বসছি, ভাত হলে আমাকে ডাক দিও। আমার হাতে কয়েকটা রঙিন রবারের বেলুন ছিল। রাস্তার একটা ফেরিওলার কাছে কিনেছিলাম। প্রায়ই কিনি। তারপর সেটা বিলিয়ে দিই ছোট ছেলেমেয়েদের। রাস্তায় এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলাম কোনও ছোট

ছেলে বা মেয়ের দেখা যদি পাই। এমন সময় তোমার ছেলে বেরিয়ে এল কপাট খুলে। তার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও। তোমার ছেলে সরাসরি দাবি করে বসল—ও ফানুসওলা, আমাকে একটা ফানুস দাও। তুমি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দড়াম করে খিল বন্ধ করে দিলে। ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম। ছেলেটার কান্না ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল। আমি তখন তোমার দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগলাম। আবার বেরিয়ে এলে তুমি। এসে বললে, বেলুন এখন কিনব না। আমি বললাম, বেলুন বিক্রি করি না আমি। আমি ছোট ছেলেদের বেলুন বিলিয়ে বেড়াই। এগুলো নাও তোমার ছেলের জন্যে। তুমি বললে, না, অমনিতে বিনাপয়সায় আমরা কিছু নিই না। আপনি যান। আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলেটি আবার বাইরে এল। আমি তখন তার হাতে বেলুনগুলি দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। তুমি তখন চীৎকার করে বললে—তুমি দাম নিয়ে যাও। আমি কিন্তু পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছিলাম। একটু পরে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম তোমার কপাট বন্ধ। তোমাদের বাড়ির দরজায় দেখলাম, নিমাইচন্দ্র বসু—এই নামটা লেখা রয়েছে। ইনি তোমার কে হন তা জানি না। তাঁরই নামে তোমাকে চিঠি লিখছি। তোমার নাম আমি জানি না, কিন্তু একটা কথা জানি, তুমি আমার পুত্রবধূর বয়সী, তুমি আমার মা। তাই তোমাকে সাহস করে এই চিঠি লিখছি। দেখ মা, আমি ভালোবেসে তোমার ছেলেকে ক'টা বেলুন দিতে গেলাম, কিন্তু তুমি বললে, বিনা পয়সায় আমি কিছু নিই না, তোমাকে দাম নিতে হবে। ভালবাসার দাম দিতে চাও তুমি? কুবেরের মতো ঐশ্বর্য থাকলেও তা কি দিতে পারতে? তোমার ওই উক্তিতে সেদিন যে স্পর্ধা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমার কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি। কারণ এ যুগটাই অন্তঃসারশূন্য স্পর্ধার যুগ, হৃদয়হীনতার যুগ। এ যুগে সবাই সবাইকে দেখাতে চায়—আমিও কারোর চেয়ে কোনও অংশে কম নই। তুমি আমার মেয়েকে যদি পঁচিশ টাকা দামের শাড়ি উপহার দাও, আমিও তৎক্ষণাৎ ঐ দামের শাড়ি তোমার মেয়েকে প্রত্যুপহার দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দেব, আমিও তোমার চেয়ে কম নই। এই স্পর্ধার এবং বাহাদুরির লোফালুফি করে আমরা ফতুর হয়ে যাচ্ছি, তবু থামতে পারছি না। থামতে পারছি না কারণ আমাদের চরিত্রে বিনয় নেই, শ্রদ্ধা নেই, মুক্ত আকাশে পাখা মেলবার মতো ডানা নেই। আমরা ছোট ছোট পিঞ্জরে বন্দী হয়ে আত্ম-আস্ফালন করছি, কিন্তু আসলে যে ছটফট করছি তা বুঝিনি এখনও। ওই ছটফটানির মূল সুরটা-অহংকার আর স্বার্থপরতা। সংসারে থাকতে গেলে স্বার্থপর হতেই হয়, স্বার্থপর না হলে সংসার গড়া যায় না, কিন্তু মজা হচ্ছে ওই স্বার্থপরতা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সোনার সংসার ভেঙে যায়। ওই স্বার্থপরতার দংশনে আমাকে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আমি রাস্তায় বেলুন বিলিয়ে বেড়াচ্ছি কেন জান? কারণ, যে নাতিটিকে ছেড়ে এসেছি তাকে বড় ভালবাসতাম। কোথাও ছোট ছেলে দেখলে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে তাকে কিছু কিনে দিই। তাই তোমার ছেলেকে বেলুনগুলি দিয়েছি। দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। তুমি বলতে পার এও তো একরকম স্বার্থপরতা। তা অস্বীকার করব না। আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি বটে, কিন্তু নিরাসক্ত সন্ন্যাসী হতে পারিনি। নিরাসক্ত সন্ন্যাসীরাই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হতে পারেন। আসক্তি মানে বন্ধন, এমনকি ভগবানে আসক্তিও বন্ধন। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই কাম্য তাঁদের। আমি

অতটা উঁচুতে উঠতে পারিনি। তবু আমার যে আসক্তি তা নিছক স্বার্থপরতা নয়, ওর মধ্যে একটু পরার্থপরতাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই ওর মধ্যে মাধুর্যও আছে খানিকটা। তোমাকে চিনি না তবু তোমাকে এত কথা লিখলাম, কারণ তোমার ব্যবহারে বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। অত অহঙ্কারী হওয়া ভালো নয়। তুমি মা, তোমাকে দেখে তোমার ছেলেও অহঙ্কারী হবে। দেশকে গড়বার দায়িত্ব তোমারও আছে অনেকখানি একথা ভুলো না। আশীর্বাদ করি সুখী হও। ইতি—

সেদিনকার সেই বেলুনওলা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বরেনবাবু, আপনি সেদিন যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেই ঠিকানাতেই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আশা করি, আপনি কাশী ছেড়ে এখনও চলে যাননি। আমি সেদিন আপনাকে নদীর ধার থেকে আমন্ত্রণ করে আমার বাসায় এনেছিলাম এতে আপনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—আমি যে অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য তা তো আমার মুখ দেখেই বোঝা যায়। এরকম সিংহবদন আর কোনও অসুখে হয় না। আমি নদীর ধারে একা বসেছিলাম। আমাকে দেখলেই লোকের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে তা আমি সহ্য করতে পারি না, তাই দূরে দূরে একাই থাকি যতটা সম্ভব। আপনি আমার মতো 'কুঠে'কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন কেন, ভারি আশ্চর্য লাগছে।—আপনার আশ্চর্য লাগত না, যদি তখন বলতাম আমিও 'কুঠে'। কিন্তু তখন বলিনি। ছুনি তখন ভিতরে রান্না করছিল, তাকে আপনি দেখতে পাননি, তাকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারতেন সেও 'কুঠে'। তার ফোলা নাকটা সে-কথা তারস্বরে ঘোষণা করছে। সে আপনাকে ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করেছিল বলে তার নাকটা আপনি দেখতে পাননি। ছুনিকে আমি আমার বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সহোদরা নয়। তার কুষ্ঠ হয়েছে বলেই তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছি। পথ থেকে ডেকে এনে ভগ্নীর আসনে বসিয়েছি তাকে। ওই ব্যাধিটাই আমাদের বন্ধন। আপনাকেও সেদিন আহ্বান করেছিলাম ওই জন্যে। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের আত্মীয় হতে পারেন। যে বাসাটায় আপনাকে এনেছিলাম সেটা আমি ভাড়া করেছি। আমিও চারিদিকে ঘুরে বেড়াই, মাঝে মাঝে এখানে এসে বিশ্রাম করি। আপনি যদি এখানে থাকতে চান, চলে আসুন। বাসাটা তো আপনি দেখেই গেছেন। যদি চিঠি লেখেন এখানকার পোস্টমাস্টারের কেয়ারে লিখবেন। আমিও আপনার মতো বাড়ি থেকে চলে এসেছি। কেউ আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি, নিজেই চলে এসেছি, কারণ ঘৃণা এবং আতঙ্কের পরিবেশে থাকা যায় না। আপনার কাহিনী আমাকে বলেননি, আমি শুনতেও চাই না। আপনার বেদনার কাহিনী আপনার চোখমুখেই লেখা রয়েছে। আমিও ভুক্তভোগী, তাই আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি। সমাজে মেশবার উপায় নেই আমাদের। আমার সঙ্গী কয়েকটা খবরের কাগজ। আর ছুনি। ছুনি কিন্তু বিশেষ কথা বলে না। ছুনির চিকিৎসা করাচ্ছি। একটু উপকার হয়েছে। আমি কিন্তু ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ব্যাধি যদি বাড়ে বাড়ুক। যে সমাজে অসুস্থ হলে সবাই ঘৃণা করে, ভয় পায়, সে সমাজে সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। মরতে তো হবেই একদিন, এই রোগেই না হয় মরব। ছুনিকে পেয়েছি এটা আমার মহাভাগ্য।

আপনিও যদি আসতে চান আসুন। আসবার আগে চিঠি লিখবেন একটা। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আমি যে নাম এখানে নিয়েছি সেটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম নানা কারণে প্রকাশ করবার ইচ্ছে নেই। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
রবিদাস ঘোষাল

নন্দরানী,

তোমার পুতুলের জন্যে মখমলের চারটি বালিশ আর বেড়্কভারের জন্য রঙিন বেনারসী কাপড় পাঠালাম খানিকটা। তোমার খেলাঘরের বর-কনে এবার আশা করি, আরামে শুতে পারবে। ছোট্ট একটা রঙিন খাট আর তোশকও পাঠাচ্ছি। পার্শেলটা তোমার কাছে যখন পৌঁছবে তখন নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে তুমি, হয়তো ভাববে, এ আবার কে। হয়তো খুশীও হবে একটু, যদি হও, তাহলে তোমার খুশীর ঢেউ আমার মনেও এসে লাগবে। তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি জন্মাবার আগেই তোমার ঠাকুরদা মারা গেছেন। তাঁকে তুমি দেখনি, তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তোমার ছেলের বিয়ের জন্য এইসব জিনিস কিনে দিতেন। মনে কর-না আমার হাত দিয়েই তিনি পাঠিয়েছেন এসব। তোমার বাবার সঙ্গে এক ট্রেনে এক কামরায় অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর মুখেই তোমার সব পরিচয় পেয়েছি। তোমার বয়স যদিও পাঁচ বছর কিন্তু তুমি নাকি ভয়ঙ্কর আবদেরে আর জেদী। তোমার বন্ধু থেবির মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে। তুমি নাকি তার কাছ থেকে মখমলের বালিশ আর বেনারসী বেড়্-কভার চেয়েছিলে। থেবির বাবা গরীব, তিনি বলে দিয়েছেন তিনি পারবেন না। তখন তুমি তোমার বাবার কাছে দাবি করে বসলে—তবে তুমিই কিনে দাও। তিনিও বললেন, আমিও পারব না কিনে দিতে। এজন্যে তুমি নাকি অনেক কান্নাকাটি করেছ। রাগ করে বিয়ে ভেঙে দিয়েছ শুনলাম। তোমার বাবা যখন এসব বলছিলেন তখন তোমার ঠাকুরদাও অদৃশ্যভাবে শুনেছিলেন সেসব। তিনি যখন নেমে গেলেন তখন তিনি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন—আমার নাতনী নন্দরানীকে আপনি জিনিসগুলি পাঠিয়ে দিন। সে ভারি অভিমানিনী। ভাগ্যে তোমার বাবার কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না এই আজগুবি গল্প? তাহলে এক কাজ কর, আমাকেই তোমার আর-এক ঠাকুরদা বলে ভেবে নাও। সেইটেই সহজ হবে, আর তা যদি পার তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। একটা দুঃখ কিন্তু হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার আর হয়তো দেখা হবে না। যদিও দৈবাৎ কখনও হয় তোমাকে চিনতে পারব না। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার জিনিসগুলো পার্শেল করে না পাঠিয়ে নিজে নিয়ে গেলেও তো পারতুম। বিশ্বাস কর, পারতুম না। কেন পারতুম না তা বলা যাবে না। কল্পনায় তোমাকে দেখছি, আদর করছি, কিন্তু কাছে যেতে পারব না। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

তোমার অচেনা ঠাকুরদা।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়,

স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুমে সেদিন আপনার সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি লিখছি। আপনি একটি বিখ্যাত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক,

আপনার কলেজের ঠিকানাতেই চিঠি লিখছি। আশা করি, চিঠিটা পাবেন। আমি বেকার লোক, চিঠি লিখেই সময় কাটাই, আপনাকে চিঠি লেখার এইটেই প্রধান কৈফিয়ত। আর একটা কৈফিয়ত, সেদিন যে প্রসঙ্গটা উঠে পড়েছিল সেটার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারিনি। আপনার ট্রেন আসাতে আপনি উঠে পড়লেন। আমার বক্তব্যটা আপনাকে তাই চিঠিতে জানাচ্ছি। আপনি সেদিন বললেন, শক্ত সমর্থ নেতা না এলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। শক্ত সমর্থ নেতা বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই, শক্তি সামর্থ্যের মূর্ত প্রতীক অনেক নেতা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অনেক লম্ফজম্প করে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারেননি, নিজেরাও ডুবেছেন, দেশকেও ডুবিয়েছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই সব সভ্যতার সব সমাজের সব রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। আমাদের বর্তমান সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম হবে না। বস্তুতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা যে মুষল প্রসব করেছে সেই মুষলই আমাদের শেষে ধ্বংস করবে। এই যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনে যে পাশবিক ক্ষুধা, যে দম্ভ, যে অবিনয় জাগিয়েছে, যে উচ্ছৃঙ্খলতায় আজ আমরা উন্মত্ত হয়েছি, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ধর্ম, দিব্যজ্ঞান। সে ধর্ম সে দিব্যজ্ঞান সহজে পাওয়া যায় না, তার জন্যে অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়, সে মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনোটাই আমাদের নেই এখন। দিব্যজ্ঞানের চেয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর জ্ঞান আমাদের কাছে বেশি কাম্য। কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি দিব্যজ্ঞানের বার্তা একদিন আসবে। আসবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখ থেকে। এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দর্পী দুর্যোধনদের রাজত্ব চলেছে। আমার একটা ভয় হয়। শান্তি পর্বে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উপদেশ শোনবার জন্য কিছু লোক বেঁচে ছিলেন, এ যুগের কুরুক্ষেত্র যখন শেষ হবে তখন শান্তির বাণী শোনবার জন্য কোনও মানুষ বেঁচে থাকবে কি? আপনি শিক্ষক। এ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আপনাদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন সেই শান্তি পর্বের উপদেশ উপলব্ধি করবার মতো কয়েকটি লোকও থাকে। এ যুগের যে যন্ত্রণাকে যুগ-যন্ত্রণা বলে এ যুগের লোকরা বর্ণনা করেন সে যন্ত্রণাটা কিন্তু রিরংসার আক্ষেপ বা লোভের উন্মত্ততা নয়, সে যন্ত্রণাটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের অবমাননা, আদর্শের লাঞ্ছনা, দৈত্যদের হাতে দেবতাদের দুর্দশা। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল পশুত্বের উল্লাস এবং ভদ্রলোকদের সমূহ বিপদ। ঘরে ঘরে এই পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়েছে, আপনারা শিক্ষকরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন। বস্তুত সকলেরই উপর এই পশুত্বের ছায়া পড়েছে। চারিদিকে চেয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন আমি মিথ্যা বলিনি, স্বার্থপরতাই আজ অধিকাংশ লোকের ধর্ম, পরার্থপরতার চিহ্ন কোথাও নেই। বিজ্ঞানই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বড় বড় শক্তিমান পশুরা অবলুপ্ত হয়েছে, তাদের অবলুপ্তি কিন্তু পশুত্বকে অবলুপ্ত করতে পারেনি, পশুত্ব ক্ষুদ্রকায় হয়েছে কিন্তু বেঁচে আছে এখনও সর্বত্র। শুধু বেঁচে নেই, বিজ্ঞানের সহায়তায় আরও বলীয়ান হয়েছে সে এবং ক্রমশ বলীয়ান হতে থাকবে যতক্ষণ না তার আত্মবিলুপ্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না মহাপ্রলয় আসছে। সেই মহাপ্রলয়ের পর যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলেই আবার নবসভ্যতা আরম্ভ হবে হয়তো। এইটেই আমার বিশ্বাস, তাই শক্ত সমর্থ নেতার উপযোগিতায় আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। এই কিছুদিন আগেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে পেয়েছি, বিবেকানন্দকে পেয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি, তাঁরা যা বলেছেন তা আমরা শুনেছি, কিন্তু তাঁদের নির্দেশ কি পালন করেছি আমরা? করিনি। নেতাদের

হিতকথা শুনলেই আমাদের পশুত্ব ঘোচে না। পশুত্বকে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখতে পারে লাঠি, পশুত্বকে চিরকালের মতো বিলোপ করতে পারে যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি আজও আমরা জানি না। ধর্ম, আত্মসংযম, ভদ্রতা দিয়ে আমরা পশুত্বের মুখে একটা লাগাম লাগাতে পারি, কিন্তু সে লাগামও বার বার ছিঁড়ে যায়। কামনার আগুনে ভোগের ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চারদিকে, এই বেড়া-আগুনে পুড়ে মরতে হবে সবাইকে। নানা কারণে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, তাই এই তিক্ত চিঠি লিখলাম আপনাকে, যা বললাম তা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোনও কিছু ভাবতে পারছি না এখন। একটি ক্ষীণ আশা শুধু আছে যে, মহাপ্রলয়ের পরও দু-চারজন ভালো লোক বেঁচে থাকবেন। সৃষ্টিকর্তা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবেন। মহাপ্রলয় পৃথিবীতে বার বার এসেছে, কিন্তু পৃথিবী একেবারে মনুষ্যহীন হয়নি। কোনও 'নোয়া' হয়তো কিছু ভালো জিনিসের নমুনা বাঁচিয়ে রাখবেন। আপাতত অসংখ্য অসুখী ধর্মহীন জনতার তর্জন-গর্জন আক্ষেপ-বিক্ষোভ ক্রন্দন-হাহাকার শোনা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

আবোল-তাবোল বকলুম অনেক। ক্ষমা করবেন। ক্ষমা করতে পারবেন—যদি বলি আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। নমস্কার। ইতি—

আপনার সেদিনকার সহযাত্রী।

।। তিন ।।

চন্দ্রভূষণ নূতন বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। বেশ বড় বাড়ি। একটা ঘরে চন্দ্রভূষণের লাইব্রেরি। অনেক বই। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, জর্মন—সব ভাষারই বই। এতদিন বইগুলো বাক্সবন্দী হয়ে একটা গুদোম ঘরে পড়েছিল। বড় বাড়িটা পাওয়াতে বইগুলো একত্রে সাজিয়ে রাখতে পেরেছে সে। চাঁদু প্রাইভেট ট্যুশনি ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। আপিসের পর আপিসের গাড়িতেই বাড়ি ফেরে। এসে জলখাবার খেয়েই কিন্তু বেরিয়ে পড়ে সে আবার। যায় তার সেই ভিখারী বন্ধুদের কাছে। অমাও তার সঙ্গে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু অমার রোজ যেতে ভালো লাগে না। ভিখারীরা তাকে তেমন পছন্দ করে না যেন। তার মনে হয় তারা চাঁদুকে খাতির করে স্বার্থের জন্য। চাঁদু তাদের অর্থ সাহায্য করে মাঝে মাঝে। তাদের অসুখ-বিসুখ করলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কাপড় জামা এমনকি থালাবাটিও কিনে দেয়। অমাকে কিন্তু তারা সুচক্ষে দেখে না। তাদের বোধহয় মনে হয় অমা হয়তো চাঁদুকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে একদিন। বিশেষ করে মেয়ে ভিখারীদের চোখে সে যেন ঈর্ষার ঝলক দেখতে পায় একটা। অমাকে তারা শত্রুপক্ষ মনে করে। একটা বুড়ি ভিখারিণী তো স্পষ্টই বলে বসল একদিন—"তুমি বুঝি বাবাঠাকুরের বউ। আমাদের নতুন মা-ঠাকুরণ? কিন্তু সত্যি কথা বলব? মেয়ে দেখলেই ভয় করে মা আমার। আমার নিজের মা, বোন, বউদি, ননদ, সবাই শত্রু ছিল আমার, সবাই গঞ্জনা দিয়েছে আমাকে। এইটেই বুঝেছি মা, মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে বড় শত্রু। ওরাই আমাকে রাস্তার ভিখিরি করেছে। তোমাকে দেখে তাই ভয় করছে, আমাদের উপর দয়া রেখো মা, আমরা বড় দুঃখী।" অমা অবশ্য উত্তরে বলেছিল

যে, সে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না, চেষ্টা করবে তাদের ভালো করবার জন্যে। কিন্তু তারপর থেকে সে আর ভিখারীদের কাছে যায় না। চাঁদু কিন্তু রোজ যায় তাদের কাছে। নানা জায়গায় থাকে তারা। খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, টালা, শ্যামবাজার, চৌরঙ্গী, কত জায়গায় তাদের আড্ডা। ফিরতে কোনও কোনও দিন রাত দশটা হয়ে যায়। উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকে অমা। কিন্তু মুখ ফুটে সে কোনোদিন বলতে পারে না, "রোজ রোজ ভিখারীদের দেখতে নাই-বা গেলে। আমার যে একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে না।" মাঝে মাঝে রাত্রি নটার আগেও ফিরে আসে চাঁদু। এসে বলে—"চল সেকেন্ড শো'-এ সিনেমা দেখে আসি। ভালো ইংরেজি বই আছে একটা।" তাড়াহুড়ো করে খেয়ে ট্যাক্সি করে সিনেমায় যায় সেদিন তারা। সিনেমা থেকে ফিরে নিজের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে পড়ে চাঁদু। অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা করে। প্রায় দুটো পর্যন্ত। বিয়ের পর প্রায় এক বছর কেটে গেছে। অমা ক্রমশ যেন বুঝতে পারছে সে চাঁদুর সহধর্মিণী হতে পারেনি। চাঁদু হিমালয়, চাঁদু সমুদ্র, চাঁদু অনেক বড়। তাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, তাকে ভালোবেসেছিল, সে যেন হঠাৎ ধস ভেঙে বেগবতী একটা নদীর খরস্রোতে পড়ে ভেসে গিয়েছিল, বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিল তাকে। চাঁদুও ভালোবেসেছিল তাকে, চাঁদুও বলেছিল, তোমাকে পেলে সত্যিই আমি খুব খুশী হব। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেনি, চাঁদুর মধ্যে কোনও থিয়েটারি আবেগ লক্ষ্য করেনি সে। যখন সে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তখনও না। মনে হয় সে যা করছে তা যেন কর্তব্যবোধে করছে। তার বাইরেটা কঠিন পাথরের মতো, মুখটা যেন মুখোশ। অমা সাধারণ মেয়ে, তবু সে আশা করে ওই পাথরের তলায় ঝর্ণাধারাকে আবিষ্কার করবে সে একদিন, ওই মুখোশটা সরিয়ে ফেলে দেখতে পাবে জীবন্ত মুখটাকে। এখনও কিন্তু পারেনি। যেসব অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ আলাপে একজন মানুষকে আর একজন মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এনে দেয় সেরকম আলাপ করতেই চায় না চাঁদু। শাড়ির পাড়, বালিশের ওয়াড়ের ছিট, পর্দার ফ্যাশন, গহনার প্যাটার্ন, আত্মীয়দের নিয়ে মুখরোচক চর্চা, পাড়ার কোনও ছেলের বা মেয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে সরস আলোচনা, সিনেমা অভিনেত্রীদের বয়স কত, যাকে ষোল বলে মনে হচ্ছে আসলে সে যে ছেচল্লিশ, সে ক'বার কার কার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়েছে, কাকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে, কাকে ফেলে পালিয়েছে—এসব আলোচনায় যোগই দিতে চায় না চাঁদু। সমস্ত সকালটা সে ব্যস্ত থাকে লেখা নিয়ে। কি যেন একটা থিসিস লিখছে। ভোরে উঠে নটা পর্যন্ত সে লেখাপড়া নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকে তার লাইব্রেরি ঘরে। অমা সে সময় রান্নাঘরে থাকে। রান্নাঘরেও তার কিছু সময় কাটত যদি ভোজনরসিক হতো চাঁদু। তার জন্যে নানারকম রান্না করে তৃপ্তি পেত। চাঁদু কিন্তু ভাতে-ভাত, একটু ঘি, দু'একখানা ভাজা এবং একটু দুধ বা দই পেলেই সন্তুষ্ট। সকালে চায়ের সঙ্গে দু-একখানা বিস্কুট আর কিছু ফলমূল, এর বেশি সে আর কিছু খেতে চায় না। পোশাকেও তার কোনও বাবুয়ানি নেই। বাড়িতে সাধারণ কাপড়, বাইরে কোটপ্যান্ট। কোনও দিক দিয়েই অমা চাঁদুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে না, একাত্ম হবার সব দ্বার যেন রুদ্ধ। তাই সে গানের ট্যুশনিগুলো এখনও ছাড়েনি। ওই নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটে তার। কিন্তু তবু সে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে খুব। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। দাদার অমতে, মায়ের অমতে সে চাঁদুকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তাঁরা একবারও আসেননি তার কাছে। মায়ের জন্য খুব মন কেমন করে তার। মায়েরও নিশ্চয় করে। দাদার ভয়েই মা

কোনও খবর নিতে পারে না। সে মাকে একখানা চিঠি লিখেছিল, বউদিকেও লিখেছিল, কিন্তু কেউ কোনও উত্তর দেয়নি। তবু সে মাঝে মাঝে ভাবে, দুপুরে একদিন লুকিয়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। বাবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তিনি সত্যিই কি আর ফিরবেন না? ন'বছর হয়ে গেল কোনও খবরই তাঁর পাওয়া যায়নি কোথাও। মা একবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে—তুমি ফিরে এস। আমি তোমার সঙ্গে আলাদা বাড়িতে বাস করব। কিন্তু কোনও ফল হয়নি এতে। অমার এখন মনে হয় দাদা বাবাকে ওকথা বলে অন্যায় করেছিলেন। দাদার অবশ্য ভয় হয়েছিল খোকাটার জন্য। বাবার খুব ন্যাওটা ছিল তো সে। সর্বদা তাঁর কোলে বসে থাকত। এই রকম নানা কথা মনে হয় তার। চাঁদুকে কিন্তু সে বাবার কথা বলতে পারেনি। চাঁদুর ধারণা তার বাবা বোধহয় মারা গেছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুকেও সে বলে দিয়েছিল একদিন, তার বাবা যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং তিনি যে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন একথা তিনি চাঁদুকে না বলেন। এতে চাঁদুর মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগতে পারে হয়তো। সিদ্ধেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান লোক, তিনি চাঁদুকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি। চাঁদুর নিজের কোনও ঔৎসুক্য নেই। নিজের পরিবারের সম্বন্ধেও নির্বিকার সে। এখনও অমা তার পরিবারের সম্বন্ধে কোনও খবর জানে না। বিয়ের আগে সে বলেছিল—আমিই আমার পরিচয়। অন্য কোনও পরিচয় জানতে চেও না। আরও বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হলে জানতে পারবে একদিন হয়তো। কিন্তু এখনও সে জানতে পারেনি কিছু। জিজ্ঞেসও করেনি। অপেক্ষা করে আছে, চাঁদু নিজেই একদিন বলবে। এখনও কিন্তু বলেনি সে। সে নিজের কাজ নিয়েই এত অন্যমনস্ক থাকে যে, সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামায় না। অমা অনুভব করে সে আইনত চাঁদু-রূপ বিরাট প্রাসাদে প্রবেশ করবার অনুমতি পেয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রাসাদের বাইরের ঘরে বসেই দিনযাপন করছে। ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ভিতরে প্রবেশ করবার আগ্রহ তার কম নয়। কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে প্রবেশ করবে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, স্বামীর কাছে আত্মসম্মানের প্রশ্ন তার মনে জাগছে কেন? তাহলে সে কি স্বামীকে ভালবাসে না? ভালবাসে বই কি, ভালবাসে বলেই তো বিয়ে করেছে তাকে। কিন্তু তবু সে সাহস করে এগিয়ে যেতে পারছে না কেন? কেন জোর করে বন্ধদ্বারে আঘাত হানতে পারছে না? কেন বলতে পারছে না, খুলে ফেল তোমার মুখোশ, তোমার আসল রূপটা দেখতে চাই। কিন্তু সে কি তার আসল রূপ দেখেনি? কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তাহলে? কি সে অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ যা তাকে এখনও মুগ্ধ করে রেখেছে—কিন্তু যাকে সে আটপৌরে কাপড়ের মতো ব্যবহার করতে পারছে না? চাঁদু বহুমূল্য দুর্লভ রত্ন। তাকে চিনছে বই কি অমা। তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সে আইনত। কিন্তু সত্যি পেয়েছে কি? এই সন্দেহের ছায়া তার মনে জাগে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাকে আমল দিতে চায় না সে। তার ক্ষোভ, চাঁদু কেন তাকে নিয়ে মেতে ওঠেনি, আর সকলের মতো। কেন মশগুল হয়ে যায়নি, কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর কি তা সে ভেবে ঠিক করতে পারে না। তার মনের যখন এই রকম অসহায় অবস্থা তখন একদিন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা।

একটি অপরিচিত যুবককে নিয়ে এল একদিন চাঁদু সন্ধ্যার সময়।

"এর সঙ্গে আলাপ কর অমা। বড় ভালো ছেলে।"

অমা নমস্কার করল।

বলল, "এর পরিচয় তো জানি না।"

"এর নাম অতুল লাহিড়ী। বিদ্বান ছেলে। আমাদের আপিসে আমার সহকারী। তাছাড়া আমার ইউ বি এস গঠনে মহা উৎসাহী—"

"ইউ বি এস কি?"

'ইউনাইটেড বেগারস্ সোসাইটি : বাংলা নাম, সংযুক্ত ভিক্ষুক সমিতি।"

"সেটা আবার কি।"

অতুল বলল—"আগে খেতে দিন আমাদের। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আপিস থেকে সোজা চলে এসেছি এখানে। আগে খাই তারপর সব বলছি আপনাকে।"

"বসুন, চায়ের জল চড়াতে বলছি।"

একটু পরেই ফিরে এল অমা। চাঁদুকে দেখিয়ে বলল—"ইনি তো কলা আর পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছু খেতে চান না। আপনার জন্যে আরও কিছু করব কি? হালুয়া করি?"

"বাড়িতে যদি ডিম থাকে, ডবল ডিমের ওমলেট করুন। আর যদি না থাকে—হালুয়াই সই।"

"ডিম আছে। করে দিচ্ছি ওমলেট।"

অমা খুব পুলকিত হলো অতুলের খাওয়া দেখে। গোটা চারেক মর্তমান কলা, একটা আপেল, চার টুকরো মাখন-মাখানো পাঁউরুটি, দুটো সন্দেশ এবং ডবল ডিমের ওমলেট সহযোগে সে তিন পেয়ালা চা খেল। চাঁদু তার দিকে চেয়ে হেসে বলল—"অমা তোমাকে পেয়ে খুশী হবে। আমার মতো মিতাহারী লোককে পেয়ে ওর তৃপ্তি হয় না। যে ধরনের ব্রুটকে ফীড্ করে ওরা খুশী হয় আমি সে ধরনের ব্রুট নই তো। আমি কম খাই বলে ও নিজেও কম খায় বাধ্য হয়ে। নিজের জন্যে আলাদা কিছু করে না। এজন্য আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকি। তুমি থাকলে অমা বেশী স্কোপ পাবে। তবে—"

অমা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে—"উনি এখানে থাকবেন নাকি।"

"থাকবেন যদি তোমার না আপত্তি থাকে। আমাকে আপিসের কাজে লন্ডন যেতে হবে, সেখান থেকে জার্মানি, দরকার হলে ফ্রান্সও। তিন চার মাস এখানে থাকব না। তুমি একা থাকতে পারবে? অতুল এখানে মেসে থাকে, বিয়ে করেনি, নির্ঝঞ্ঝাট লোক। ও এখানে তোমার কাছে থাকতে পারে যদি তুমি আপত্তি না কর। আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।"

অতুল বলল—"ইউ বি এস-এর কাজ করবারও সুবিধা হবে এখানে থাকলে। এ বাড়িটায় জায়গা আছে। রীতিমত একটা আপিস হয়ে গেছে তো—"

ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে।

চাঁদু উঠে গেল।

"ভিখারীদের নিয়ে অফিস করেছেন?"

"আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত ভিখারীদের নিয়ে একটা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি করতে। মনুষ্যত্বের চরম দুর্দশার ওরাই তো জীবন্ত নিদর্শন। ওরাও এদেশের মানুষ, ওদেরও ভোট আছে, ওদের নাম যদি ভোটার লিস্টে ঢুকিয়ে ওদের একটা পলিটিক্যাল পার্টিতে পরিণত করা যায়, তাহলে ওদের সমস্যা ওরাই সমাধান করে নিতে পারবে। আপনার স্বামী একজন মহৎ

লোক, তিনি নিজে ওদের সাহায্য করেন, কিন্তু তাঁর একার সাহায্যে কতটুকু হওয়া সম্ভব? তাই আমিই ওঁকে বললাম একদিন, আসুন ওদের নিয়ে একটা পার্টি করা যাক। ওরাই তো সর্বহারা—"

"তা ঠিক।"

এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না অমা। রাজনীতির সে কিছু বোঝে না। বোঝবার চেষ্টাও করল না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবলি ভাবছিল, চাঁদু বিলেতে চলে যাচ্ছে আর তার জায়গায় রেখে যাচ্ছে একটি অনিন্দ্যকান্তি বিদ্বান যুবককে? সে একা তার সঙ্গে বাড়িতে থাকবে? চাঁদুর এতে আপত্তি নেই? কি রকম লোক চাঁদু। এই কথাটাই ভাবছিল সে বার বার। সবিস্ময়ে ভাবছিল। চাঁদু ফিরে এসে বলল—"তোমার বউদিদি তোমাকে ফোনে ডাকছেন। ফোনে ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নাকি মাঝে মাঝে।"

"বউদি? না, উনি কখনও তো ফোনে ডাকেননি আমাকে। কি বলছেন?"

"বললেন তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। তুমি যাও, উনি ফোন ধরে আছেন।"

ফোনে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হলো।

"কে, বৌদি? কি খবর? ভালো আছ তো তোমরা? এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে আমাকে।"

রোজই মনে পড়ে ভাই। কিন্তু তোমার দাদার ভয়ে খবর নিতে পারিনি। সকলের অমতে বিয়ে করেছ বলে দাদা তোমার মুখদর্শন করতে চাননি এতদিন, কিন্তু কাল মত বদলাতে হয়েছে। কাল ওঁর বন্ধু উকিল শান্তনুবাবু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা চলবে না, কারণ আইন অনুসারে তুমি বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশের মালিক—"

"কার বিষয়?"

"বাবার বিষয়। বাবার তো কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন'বছর পেরিয়ে গেছে। শান্তনুবাবু বলেছেন আর কয়েক মাস পরে আইনত তোমরা তাঁর বিষয়ের মালিক হতে পার। দশ বছর কোনও খবর পাওয়া না গেলে আইনের চক্ষে তাঁকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হবে। বাবার কোনও উইল নেই। উইল না থাকলে মেয়েরাও বাবার বিষয়ের সমান অংশ পাবে। তাই উনি বলছিলেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তুমি আসবে কি?"

"বাবা মারা গেছেন একথা যে ভাবতে পারি না বউদি। আমি বিশ্বাস করি উনি আবার ফিরে আসবেন।"

"কি জানি ভাই, আমিও সেই বিশ্বাস করি। কিন্তু আইন অনুসারে দশ বছর পরে তোমরাই নাকি বিষয়ের মালিক হবে। তুমি কালই এস। কাল রবিবার। সকালের দিকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব?"

"দিও। আমার ঠিকানা তোমরা জানলে কি করে?"

"তোমার দাদা তোমার সব খবর নিয়েছেন। তোমার স্বামী যে একজন মস্তবড় ধনীর একমাত্র ছেলে এ খবর আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলে কেন।"

সত্যিই এ খবর শুনে অবাক হয়ে গেল অমা। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত।

"হ্যালো—অমা, কেটে দিলে নাকি।"

"না। একটু অবাক হয়ে গেছি। তুমি যে খবরটা গোপন রেখেছি বললে সে খবর তোমার

মুখেই আজ প্রথম শুনলাম। আমি ওঁর সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানি না। কিচ্ছু বলেননি আমাকে। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন উনিও ট্যুশনি করতেন, আমিও করতাম, অতি কষ্টে সংসার চলত আমাদের। কিছুদিন হলো একটা ভালো চাকরি পেয়েছেন। বাবার এক বন্ধুই সে আপিসের ডিরেক্টার। যে বাড়িতে আমরা এখন আছি সেটাও আপিসেরই বাড়ি।"

"সব জানি আমরা"—বউদি বলতে লাগলেন—"কিন্তু তুমি যে তোমার স্বামীর কোনও খবর জান না এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। নিজের পরিচয় তোমার কাছে দেননি চাঁদুবাবু?"

"না। বলেছিলেন আমিই আমার পরিচয়। আমার পরিচয়েই আমাকে যদি তুমি বিয়ে কর তাহলেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমার বংশ কত বড়, আমার টাকা-কড়ি আছে কি না এ সব পরিচয় আমি দেব না। আমার যতটুকু পরিচয় পেয়েছ ততটুকুর উপর নির্ভর করেই হয় আমাকে নাও কিংবা নিও না। একথা শুনে প্রথমে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল লোকটা পাগল নয় তো। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম ও পাগল নয়, ও অসাধারণ লোক। তারপর আমার মনে পড়ল আমার বন্ধু শিউলির কথা। কত রকম খবর নিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে, বংশ পরিচয় খোঁজ করে, ছেলের বিদ্যার বহর আর রোজগার করবার ক্ষমতা মেপে— তার বিয়ে দিয়েছিলেন তার বাবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিউলি সুখী হলো না। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শিউলি চাকরি করছে এখন। রাস্তায় দেখা হলো একদিন। সবই অদৃষ্ট। খোঁজখবর নিয়ে আমরা কতটুকু জানতে পারি বলো। শেষ পর্যন্ত অজানার গলাতেই মালা দিতে হয়—"

খিলখিল করে হেসে উঠল তার বৌদি।

"ওরে বাবা, তুমি যে কবি হয়ে গেছ দেখছি। তোমার অজানাকে এখনও জানতে পারনি?"

"না ভাই। এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছি। নাগাল পাচ্ছি না। চিনতে পারছি না। এইটুকু শুধু জেনেছি লোকটি ভদ্রলোক—"

"আমি আর একটি খবরও দিতে পারি। ওর বাবা একজন ধনকুবের। থাকেন বোম্বেতে। সেখানে বড় ব্যবসা আছে, কলকাতাতেও অনেক বিষয় আছে, দিল্লীতেও আছে নাকি শুনেছি। চাঁদু ওঁর একমাত্র ছেলে। বাবার অমতে বিয়ে করেছে বলে তিনি খুব চটে আছেন। কিন্তু ছেলেকে এখনও ত্যাজ্যপুত্র করেননি শুনেছি আমরা। তোকে দেখলে হয়তো তাঁর রাগ পড়ে যাবে। দিন দশেক পরে তিনি কলকাতায় আসবেন শুনেছি। গ্র্যান্ড হোটেলে উঠবেন। আমার একটা পরামর্শ শুনবি? সেই সময় দেখা কর না তাঁর সঙ্গে।"

"ওরে বাবা, সে আমি পারব না।"

"না পারবার কি আছে এতে, তুমি তাঁর পুত্রবধূ—"

"আমি নিজের মুখে গিয়ে কি করে বলব সে কথা। বলা যায় নাকি।"

"বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

চুপ করে রইল অমা কিছুক্ষণ। তারপর বলল—"তাহলে ওঁকে জিজ্ঞেস করি। ওঁকে না জানিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"বেশ। কাল তাহলে কখন গাড়ি পাঠাব?"

"গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। আমার ওই দিকে একটা ট্যুশনি আছে বিকেলের দিকে। সেখান থেকে যাব আমি। দাদাকে বোলো বিকেলের দিকে থাকেন যেন।"

"আচ্ছা, এসো কিন্তু—"

"মা কেমন আছেন? আমার কথা বলেন একবারও?"

"রোজ। তোমার কাছে যেতে চান। আমরাই যেতে দিইনি। ভয় হয়। জামাই কি রকম লোক তা তো জানা নেই।"

"বাবার কথা কেউ বলে না?"

"মুখ ফুটে কেউ বলে না। খোকন বলে মাঝে মাঝে—"

"বলে?"

"বলে, দাদু আবার ফিরে আসবে। দাদুর ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে।"

"আচ্ছা, আমি যাব কাল।"

অমা ফিরে এসে দেখলে অতুল আর চাঁদু সংযুক্ত ভিক্ষুক সমিতি নিয়েই আলোচনা করছে।

অতুল বলছে—"এর জন্যে খাটতে হবে। সব ভিক্ষুকদের ভোটার করতে হলে তাদের প্রত্যেকের বাসস্থান, নাম এবং পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে। অনেকে হয়তো প্রকৃত পরিচয় দেবে না, কারণ ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেকে ক্রিমিনাল আছে শুনেছি। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সব বড় বড় কাগজগুলোতে আগে আমরা বিজ্ঞাপন দিই। এমনি খবর দিলে অনেক কাগজই তা ছাপবে না। বিজ্ঞাপন দিলে ছাপবে। কলকাতা, পাটনা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কেরল—এই ক'টা জায়গায় প্রথমে এ খবরটা বিজ্ঞাপিত করি। দেখা যাক কি রকম সাড়া পাওয়া যায়—"

"আপত্তি নেই আমার এতে—", চাঁদু বলল, "ফান্ডে কত টাকা আছে? বিজ্ঞাপন দিতে গেলে একটু বিস্তৃত বিজ্ঞাপন দিতে হবে—"

"টাকা বেশি নেই। তবে টাকার জন্যে কখনও কিছু আটকায় না এ বিশ্বাস আমার আছে। আপাতত কলকাতার একটা কাগজে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব। সম্পাদক ছাপতে রাজী আছেন। তারপর একটা বিজ্ঞাপনও দেব। আমি কিছু টাকা যোগাড় করেছি।"

"কিছু আমিও দেব। অমা, দেবে কিছু?"

"আমি? বেশ, আমিও দেব। তবে আমার সামর্থ্য আর কতটুকু?"

চাঁদু হেসে বলল—"রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্যে সাগর বন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবিড়ালীও সাহায্য করেছিল।"

অমা বলল—"আমি সাহায্য করব যতটুকু পারি, তার কারণ তুমি ওই নিয়ে মেতে আছ। কিন্তু ভিখারীদের নিয়ে পলিটিক্যাল পার্টি করে কি যে লাভ হবে তা আমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি না। দেশে পলিটিক্যাল পার্টি তো অনেক হয়েছে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়ছে খালি, সবাই মন্ত্রী হতে চায়—"

"চাইলেই বা। এই তো জীবন। সবারই যদি মন্ত্রী হবার অধিকার থাকে ওদেরই বা থাকবে না কেন।"

কথাগুলো বলে অতুল হাসিমুখে চেয়ে রইল অমার মুখের দিকে। তারপর বলল—"আপনাকেই আমরা আমাদের পার্টির লীডার করব। হয়তো আপনিই একদিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন—"

"সে শখ নেই আমার। আমার মতে একজন ভিখারীরই পার্টির লীডার হওয়া উচিত। আমি ভিখারী নই।"

"চাঁদুদা'র মতে সবাই ভিখারী।"

"আমি নই। আমার বিশ্বাস আপনার চাঁদুদাও নন।"

চাঁদু মুচকি হাসতে লাগল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হলো না। আবার ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। উঠে গেল চাঁদু।

অতুল বলল—"আমি আপনার এখানে থাকব এতে আপনার আপত্তি হবে না তো বউদি?"

"আমি আপত্তি করব কেন। উনি যা সঙ্গত মনে করবেন তাই হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি একা থাকতেও আমার কোনও অসুবিধা হবে না। সারাদিন একাই তো থাকি, থিয়োরিটিক্যালি উনি কলকাতায় থাকেন বটে, কিন্তু আমার কাছে আর কতক্ষণ থাকেন বলুন? বুড়ো চাকর ফকিরা আর ঝি নন্‌তি ওরাই আমার ভরসা।"

"আমি থাকলে আপনার অসুবিধা হবে না তো কিছু।"

"বাড়িটা তো বড়, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না—"

"রোজ রোজ রান্নার ফরমাস করব কিন্তু।"

"করবেন। তবে, আমি রোজ রাঁধতে পারব না। রাঁধতে জানিও না ভালো। ফকিরা ভালো রাঁধে। যা বলবেন রেঁধে দেবে।"

"আপনি রাঁধেন না? কি করেন তাহলে—"

"ঘুমুই। ঘুমুতে খুব ভালো লাগে আমার। গানের ট্যুশনিও করি কয়েকটা।"

"আমি যদি এখানে থাকি তাহলে কিন্তু দয়া করতে হবে।"

"তার মানে?"

"মাঝে মাঝে রেঁধে খাওয়াতে হবে।"

"আমি রাঁধতে জানি না যে।"

"শিখুন। আমি ভালো ভালো রান্নার বই কিনে দেব।"

"উনুনধারে বসে রান্না করতে ভালো লাগে না বলেই আমি রান্না শিখিনি। আমি বাবা মা-র আদুরে মেয়ে ছিলাম তো, তাই রান্নাঘরের ধারে-কাছে ঘেঁষিনি কখনও। দরকারও হয়নি। রান্না শিখে লাভই বা কি হতো। যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি মোটেই খাদ্যরসিক নন। অনেক সময় দেখেছি আলুনী তরকারি খেয়ে চলে গেলেন, বললেন না পর্যন্ত যে, তরকারিতে নুন দেওয়া হয়নি। কার জন্যে রান্না শিখব বলুন।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্বামীই কোনও স্ত্রীলোকের জীবনের সবটা দখল করে বসে থাকেন না। তার জীবনে আরও অনেকে আসবে এবং আসা উচিত। আমাকে কে পেটুক করেছে জানেন? আমার বউদি। এত রকম রান্না তিনি জানতেন—"

"কোথায় থাকেন তিনি।"

"বছরখানেক আগে মারা গেছেন। তাঁকেই খুঁজছি। আশা হয়েছিল হয়তো—"

হুড়মুড় করে এসে পড়ল চাঁদু।

"বেরুতে হবে এক্ষুনি। সিদ্ধেশ্বরবাবু ডাকছেন—"

"চলুন।"

অমা বলল—"ও ঘরে চল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"গোপনীয় কিছু?"

"হ্যাঁ, একটু গোপনীয়।"

পাশের ঘরে গিয়েই অমা বললে—"বউদি বললেন তোমার বাবা নাকি এখানে আসছেন। বউদি আমাকে নিয়ে যেতে চান তাঁর কাছে। যাব?"

"যাবে কিনা সেটা তুমিই ঠিক কর। একটা কথা শুধু মনে রেখ, তোমাকে বিয়ে করেছি বলে তিনি আমার উপর খুশী নন।"

"তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন এ আশঙ্কা আছে কি?"

"না। তিনি অতিশয় ভদ্রলোক। তুমি গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাঁর মতো ভদ্রলোক আমি খুব বেশি দেখিনি।"

"তবে তোমাদের ঝগড়া কেন।"

"মত ও পথ নিয়ে। তিনি পুব দিকে যেতে চান, আমি যেতে চাই পশ্চিমে। আলাপ করে এস আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এটা জেনে রাখ, আমি কিছুতেই নিজের মত বা পথ বদলাব না। আমার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করো না পারতপক্ষে।"

"তোমার মত বা পথ কি তা তো আমাকে বলনি কোনোদিন। কি নিয়ে আলোচনা করব—আমি কিছুই বলব না, শুধু প্রণাম করে আসব তাঁকে।"

"বেশ। আর একটা দরকারি কথা তোমাকে বলবার ছিল। কিন্তু তা এখন বলা যাবে না। চিঠিতে জানাব।"

"কি দরকারি কথা? বাবার সম্বন্ধে?"

"না, আমার সম্বন্ধে। আচ্ছা, চললুম এখন। সিধুবাবু আপিসে বসে আছেন।"

চাঁদু অতুল দু'জনেই চলে গেল।

অমা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মনে হতে লাগল সে যেন একটা অজানা গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই মনে পড়ল তার বাবাকে। চোখে জল ভরে এল।

।। চার ।।

অমা ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেল, মা তার বাবার বড় ছবিটার দিকে চেয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ধূপদানী। ধূপের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। অমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে আসব বলেছিল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মা আর বৌদির জন্যে শাড়ি, আর খোকনের জন্যে কিছু জামার ছিট কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। কাগজের বাক্সগুলো বগলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অমা। বাইরের কপাটটা খোলা ছিল কেন? দাদা বৌদি কি দোতলায়? খোকন কোথা? প্রশ্নগুলো পর পর জাগল তার মনে। তারপর মিলিয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সেও। বাবার ছবির দিকে চেয়ে দেখল। বাবা হাসছেন। মা-ও নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ধূপের ধোঁয়া নিঃশব্দে উঠছে ছবিটার দিকে।

"মা।"

ফিরে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে অতসীবরণী।

"কে অমা।"

অমা গিয়ে প্রণাম করল। কাপড়ের প্যাকেটগুলো রাখল টেবিলের উপর।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছিস দেখছি। শরীর ভালো আছে তো।"

"আছে। দাদা বউদি কোথা?"

"ওরা এতক্ষণ তোর অপেক্ষাতেই বসেছিল। একটু আগে বেরিয়ে গেল। তোর জন্যে হোটেল থেকে খাবার আনতে গেছে। বউমা বললে তুই চীনে হোটেলের খাবার ভালবাসিস, নীলু বললে—তাই তবে নিয়ে আসি চল। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে ওরা। তুই বস। আমি ছানার পায়েস রেখেছি তোর জন্যে। চাঁদু এল না?"

"বউদি তো তাঁকে আসতে বলেননি। বললেও আসতেন কিনা সন্দেহ। কাল বিলেতে চলে যাবেন আপিসের কাজে। বড় ব্যস্ত আছেন।"

অমা একটা চেয়ারে বসেছিল। অতসীবরণী ধূপদানীটা ঠাকুরঘরে রেখে এসে তার পিছনে দাঁড়ালেন। "চাঁদু যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের ফার্মে ম্যানেজার হয়েছেন এখবর সিদ্ধেশ্বরবাবুই দিয়েছিলেন। খুব প্রশংসা করছিলেন তাঁর। অমন ভালো ছেলে জামাই হলো, কিন্তু এমন পোড়া অদৃষ্ট, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ভালো ভাবে হলো না।"

অমা চুপ করে রইল। অতসীবরণী তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললেন—"সত্যি বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। গালের হাড় দুটো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। হজম-টজম হয় তো—"

"হয়। শরীর আমার ভালো আছে। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। দাদা কেন আমাকে ডেকেছে বলো দিকি—"

"উকিলরা বলছে যে উনি যদি আর দু'-তিন-মাসের মধ্যে না ফেরেন তাহলে আইনত বিষয় তোমরা পেতে পার। দশ বছরের মধ্যে কোনও খবর না পাওয়া গেলে আইন ধরে নেবে যে, উনি আর বেঁচে নেই। তখন ওঁর উত্তরাধিকারীরা ওঁর বিষয় পাবে। ওঁর যখন কোনও উইল নেই, তখন বিষয়ের তিন ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে নীলু, এক ভাগ পাবি তুই, আর এক ভাগ পাব আমি। নীলু এদেশে আর থাকতে চায় না। সে আমেরিকায় নাকি বড় চাকরি পেয়েছে, সেখানেই গিয়ে থাকবে। এখানকার বিষয় বিক্রি করে সেখানেই সে একটা বাড়ি কিনবে বলছে। সে আমাকেও সেখানে নিয়ে যেতে চায়। আমি কিন্তু কোথাও যাব না। এই বাড়িতেই থাকব আমরণ। এইখানেই অপেক্ষা করব তোর বাবার জন্যে। আইন যা-ই বলুক, আমার মন বলছে তিনি আবার ফিরে আসবেন। ওরা যেখানে খুশি যাক, আমি এখানেই গোবিন্দ আর বাতাবির মাকে নিয়ে বেশ থাকতে পারব। গাড়িটাও থাকবে, বীরেন্দ্রই ড্রাইভার থাকবে। আমার ভাগে বিষয়ের যতটা অংশ পড়বে তার থেকে আমার এ খরচ চলে যাবে স্বচ্ছন্দে। আমার এক বিধবা দিদিও আমার কাছে এসে থাকতে চান। তাঁকে আসতে লিখেছি। এখন তোকে নিয়েই সমস্যা। নীলু খবর নিয়েছে তোর শ্বশুর নাকি খুব বড়লোক, চাঁদু তাঁর একমাত্র ছেলে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তিনি এখানে নাকি আসবেন। নীলু বলছে তুই যদি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিস তাহলে হয়তো বুড়োর মন গলবে।"

"যদি গলেই তাতে দাদার লাভ কি।"

"দাদা তাহলে তোকে কিছু দাম দিয়ে তোর অংশের বিষয়টি কিনে নেবে। সে বিষয়টিও দাঁও মাফিক বিক্রি করে চলে যাবে আমেরিকা। আমেরিকার এক বন্ধু ওকে নাকি জানিয়েছে, কুড়ি লাখ টাকায় সেখানে নাকি ভালো বাড়ি কিনতে পাওয়া যায়। ও বিষয়ের যে অংশ পাবে তা বেচে কুড়ি লাখ টাকা হবে না। তাই তোর বিষয়টি হাতাতে চাইছে। এইজন্যেই তোকে ডেকেছে। স্বার্থের জন্যে ডেকেছে। ভালবাসার জন্যে নয়। আমি কতবার বলেছি তোকে খবর দিতে। দেয়নি। আমি তোর ঠিকানা জানি, কিন্তু ও রাগারাগি করবে এই ভয়ে তোর কাছে যেতে পারিনি, তোকে চিঠিও লিখতে পারিনি। দিন দশেক আগে ওর আমেরিকার সেই বন্ধুর চিঠি এসেছে, তারপর থেকে সেই উকিল বন্ধুটি আনাগোনা করছে রোজ, ফুসফুস গুজগুজ চলছে ক্রমাগত। তারপর কাল বৌমা বললে আজ তোকে আসতে বলেছে। ঘোর স্বার্থপর ওরা। ঠিক ওর মামার মতো হয়েছে—ঘোর বিষয়ী। ওর জন্যেই তো দেশত্যাগী হয়েছেন উনি—ছেলে নয় শত্রু।"

অতসীবরণী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অমার মনে হলো মা-ও অভিনয় করছেন। এ কথা মনে হওয়াতে নিজেই লজ্জা পেল সে, মনে হলো, ছি, ছি, কি নীচ হয়ে গেছি আমি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হলো—মা কি তাকে লুকিয়েও একখানা চিঠি লিখতে পারতেন না? দাদাকে না জানিয়েও তিনি কি আমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারতেন না। ঘরে গাড়ি ছিল। এদের অমতে বিয়ে করেছে বলে সবাই তাকে পর করে দিয়েছে এইটেই সত্যি কথা। যে অপমান সে এই এক বছর ধরে ভোগ করেছে তারই ক্ষোভ হঠাৎ যেন ধক ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। অতসীবরণী চোখে আঁচল দিয়েছিলেন বলে অমার চোখের এই অগ্নিদৃষ্টি দেখতে পেলেন না। পেলে ভয় পেয়ে যেতেন. রৌরবের যে আগুন তার মনের নেপথ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল, যার খবর সে নিজেও জানত না, সেই আগুন মূর্ত হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে হঠাৎ। বললে—"কে শত্রু, কে মিত্র তা জানি না মা। বিষয়-সম্পত্তি অনেক বলছ? কিন্তু পায়ের নীচে যে মাটি নেই। মাথার উপর আকাশ নেই, হাওয়া নেই, আলো নেই, কিচ্ছু নেই।

এরপরই কেমন বেখাপ্পা সুরে হেসে উঠল সে। বলল আবার—"না না, আছে, কি আছে জানো? ভিকিরি, ভিকিরি, ভিকিরি। আর বিদ্যে, বিদ্যে, বিদ্যে—আর কাজ, কাজ, কাজ—"

অতসীবরণী মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল অমার দিকে। অমাও অবাক হয়ে গেল। এসব কি বলছে সে। তারপর খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সামলে নেবার চেষ্টা করলে, কোথাকার ঝোড়ো হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার মনের আবরু। আগে তো এমন হয়নি কখনও। আগে তো সে চুপ করে থাকত। কোথাও তো কিছু আলগা হয়নি কখনও।

"কি বলছিস তুই আবোল-তাবোল—"

মুচকি হেসে অমা বললে—"একটু থিয়েটার করলুম। সবাই তো থিয়েটার করছে। দেখলুম আমি পারি কিনা।"

"থিয়েটার ? কে করছে থিয়েটার।"

"সবাই। ভাগ্যে থিয়েটার করছে, সত্যি হলে তো আরও ভয়ঙ্কর হতো।"

"তার মানে।"

"থিয়েটারের দুর্যোধন যদি ওই পোশাক আর পরচুলা পরে সত্যি দুর্যোধন হয়ে ঘরে-দোরে ঘুরে বেড়াত তাহলে কি কাণ্ড হতো বলো দেখি। তাই সবাই থিয়েটার করছে। আমিও একটু করে দেখলাম পারি কিনা—পারি না?"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল অমা।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

"ওই ওরা এসেছে—গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথা গেলি, খাবারগুলো নামিয়ে আন।

অতসীবরণী নিজেই বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মাথার চুল সব সাদা। তবু তিনি এখনও রূপসী। অমা বাবার ছবিটার দিকে আবার চাইল। বাবা হাসছেন।

প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর আসল প্রসঙ্গ পাড়লেন নীলুবাবু। বললেন, "যেটা সত্যি সেটাকে মানতেই হবে। বাবা আর ফিরবেন না। বাবার বিষয় আমাদেরই ভাগ করে নিতে হবে। বাবার অ্যাকাউন্টে ব্যাংকেই পনেরো লাখ টাকা আছে। খবর নিয়ে জানলাম, যাবার ঠিক পরেই তিনি ব্যাংক থেকে মাঝে মাঝে টাকা তুলেছেন। সবসুদ্ধ হাজার পঁচিশেক টাকা। কিন্তু গত ন'বছর তিনি কোনও টাকা তোলেননি। ব্যাংক তার কোনও ঠিকানাও যোগাড় করতে পারেনি। ব্যাংকের টাকা ছাড়া আমাদের তিনখানা বাড়ি আছে। সেগুলোর দাম সবসুদ্ধ দশ লাখ টাকা হবে। আমাদের এই বাড়িটার দাম তিন লাখ টাকা, চৌরঙ্গীর কাছে যে বাড়িটা আছে সেটা ছ'লাখ টাকা আর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িটা এক লাখ টাকা। দালালরা মোটামুটি এই রকম আভাস দিয়েছে। কিছু কম কিছু বেশি অবশ্য হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে আমরা সেটা ভাগ করব।"

অমা বলল, "ভাগ না-ই বা করলাম। যেমন আছে থাক না।"

"আমার আপত্তি হতো না, যদি আমি এখানে থাকতাম। কিন্তু আমি এখানে থাকব না। আমি আমেরিকায় চলে যাব।"

"আমেরিকায় যাবে কেন?"

"যাব, কারণ আমি এখানে মিস-ফিট, আমার মতের সঙ্গে এখানকার কারও মত মেলে না। সত্যি কথা বলেছিলাম বলে বাবা রেগে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সবাই মনে করবে আমি একটা ভিলেন। আত্মীয়স্বজন সবার চক্ষেই আমি হেয় হয়ে গেছি। আমি আমেরিকায় একটা চাকরির চেষ্টা করছি। বোধহয় পেয়ে যাব। যদি পাই সেখানেই চলে যাব আমি। সেখানেই থাকব। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলে টাকা চাই। মা বলছেন বাড়ি বেচবেন না, এখানেই থাকবেন তিনি। তোকে ডেকেছি এই জন্যে, তোর অংশটা যদি আমাকে সস্তায় বিক্রি করিস তাহলে আমি আমেরিকায় একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনতে পারি।"

"আমেরিকায় যাবে? সেখানে শুনেছি টাকা ছাড়া এক পা চলা যায় না। টাকার বাটখারায় ওজন করে স্নেহ-ভালবাসাও নাকি বিক্রি হয় সেখানে।"

"এখানেও হয়। এখানে হয় ইতরের মতো, সেখানে হয় ভদ্রভাবে। দু-চারটে নিঃস্বার্থপর ভালো লোক এদেশেও আছে, ওদেশেও আছে। ওদেশে আর একটা জিনিস আছে যা এদেশে নেই। গুণীকে আদর করে ওরা, সে আদর মৌখিক নয়, সে আদরের অর্থমূল্য অনেক। এখানে

গুণীর আদর নেই, পরশ্রীকাতর হিংসুকের দেশ, এখানে গুণীরা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান বিসর্জন না দিলে সম্মানিত হন না। সম্মানের লেবেল খোশামোদের দাম দিয়ে কিনতে হয়। আমার বিশ্বাস ওদের সেটা হয় না।"

"এতদিন তাহলে যাওনি কেন।"

"যাইনি কারণ অর্থাভাব। চাকরির চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছি। এখন একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা হয়েছে। শান্তনু বলছে আইনত বাবার বিষয়ও এইবার আমরা পেতে পারি। তুমি যদি তোমার অংশটা—"

"বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না দাদা, আইনজ্ঞানও আমার নেই, কিন্তু আমি জানি ও বিষয়ে আমার অধিকার নেই, কিছু বিষয় যদি আমার ভাগে পড়ে তাহলে তা যেমন আছে তেমনি থাকবে—"

"সে বিষয়ের আয়ও তুমি নেবে না?"

"না। তা ব্যাংকে জমা হবে।"

"আমি যদি ধার চাই?"

"আমার একটা কথা শুনবে দাদা—"

"কি বল।"

"কোথাও যেও না। যেমন আছ তেমনি থাক। কি হবে ওদেশে গিয়ে। আমাদের খোকন একটা ট্যাঁস-মার্কা আমেরিকান হয়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।"

"দেখ অমা, মানুষ বদলাবেই। বাবার প্রপিতামহ জয়জনার্দন লক্ষ্মীপুরে থাকতেন। তিনি গায়ে জামা দিতেন না, পায়ে জুতো পরতেন না। স্বপাক আহার করতেন, বৃথা মাংস তাঁর বাড়িতে ঢোকেনি কখনও, তাঁর বোন সহমৃতা হয়েছিলেন। তিনি নিজে বিবাহ করেছিলেন তিনটি, বিরাট একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাঁর। টোল ছিল, চাষবাস ছিল, বিরাট খাইয়ে লোক ছিলেন তিনি, প্রত্যহ চার পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতেন—এই লোকের সঙ্গে আমাদের কতটুকু মিল আছে? যে প্রয়োজনের তাড়ায় তাঁরা লক্ষ্মীপুর ছেড়ে প্রথমে ব্যান্ডেল, তারপর বর্ধমান, তারপর কলকাতায় এসেছিলেন, সেই প্রয়োজনের তাড়ায় আমাকে কলকাতা ছেড়ে আমেরিকা যেতে হচ্ছে। খোকন হয়তো বদলে যাবে, কিন্তু উপায় কি।"

অমা চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"তুমি যা বলছ তাই হয়তো হয়, কিন্তু ওটাকে বাধা দেওয়ার মধ্যে যে পৌরুষ, যে আত্মসম্মানবোধ আছে তাকেই আমি মনুষ্যত্ব বলি। আমেরিকা যাওয়াটা তুমি যত বড় প্রয়োজন মনে করছ আমার কাছে ওটা তত বড় মনে হচ্ছে না। তুমি—"

"চুপ কর"—ধমকে উঠলেন নীলু হঠাৎ। তারপরই মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। অমার বিষয়টা সস্তায় হস্তগত করতে হবে, ওকে চটালে তো চলবে না।

"এক হিসেবে তুই যা বলছিস তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তুই আমার দিকটা দেখতে পাচ্ছিস না, আমি এদেশে আর থাকতে পারছি না। তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস—"

"আমি কি করে সাহায্য করব দাদা। বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। আমার ভাগে যে অংশটুকু তোমরা দেবে তাই আমি নেব। কিন্তু আমার কথা শোন দাদা, বিষয় ভাগ কোরো না, যেমন আছে থাক।"

"বিষয় ভাগ হবেই। আইনত যা আমাদের প্রাপ্য তা আমরা নেব না কেন?"

একথা শুনে অমার মনে সেই আগুনটা আবার জ্বলে উঠল—যে আগুনটা ইদানীং প্রায়ই জ্বলে উঠছে তার মনে। মনের অন্ধকারে ছোট ছোট নীল শিখা, আর উত্তাপ.....।

"মানুষের তৈরি আইন তো রোজ রোজ বদলায়। ও তো সুবিধাবাদীদের তৈরি আইন। মানুষের মনের ভিতর যে দেবতা আছেন তাঁর আইন কিন্তু বদলায় না। সেই আইনের উপরই সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সে আইনে হাত দিও না দাদা, দোহাই তোমার, সে আইন অনুসারে বিবাগী বাবার বিষয় আমরা নিতে পারি না—"

নীলুবাবু অমার মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে যেন। কি হলো মেয়েটার? আশ্চর্য।

"আচ্ছা থাক থাক, ওসব কথা পরে হবে।"

অমা সেদিন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ সুস্থ ছিল না। তার কথাবার্তা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তার নিজেরই বার বার মনে হচ্ছিল, কি করছি কি বলছি আমি। অথচ নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মা যখন বললেন, "তোর জন্যে ছানার পায়েস করে রেখেছি, খাবি আয়—"

অমা বলে উঠল—"যে দুধের ছানা তোমরা কাটিয়েছ তা খাওয়া যায় না।"

বলেই তার মনে হলো, এ কি বললাম। হি হি করে হেসে উঠল।

।। পাঁচ ।।

চাঁদু বিলেতে চলে গেছে।

অতুল আছে এ বাড়িতে। চাঁদু না ফেরা পর্যন্ত থাকবে।

অতুল শুধু যে দেখতে ভালো তা নয়, সব দিক দিয়ে ভালো।

সে এসেই বুঝতে পেরেছিল অমা গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না। ঘনিষ্ঠতা করবার একটুও চেষ্টা করেনি সে। তিনতলায় নিজেকে নিয়েই আছে, নিজের কাজকর্ম নিয়ে। ভিখারী সমিতির অনেক কাজ। একটি মেয়ে আসে অতুলকে সাহায্য করতে। সে-ও নাকি ভিখারীর মেয়ে। চাঁদুরই চেষ্টায় সে নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। চাঁদুই ওর নাম দিয়েছে সবলা। মেয়েটির মুখে হাসি নেই। অমা তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। প্রশ্ন করলে কথার উত্তর দেয়, কিন্তু উত্তরটুকু মাত্র দেয়, তার বেশি না। 'হ্যাঁ' 'না' 'জানি না' 'আচ্ছা'—এই ধরনের উত্তর। মেয়েটির চোখমুখে কি যেন একটা চাপা ভাব আছে যা ঠিক স্পর্ধাও নয়, বিনয়ও নয়, রাগ, বিরাগ বা ঔদাসীন্য নয়, কিন্তু যা অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার মুখের ভাবকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—আমি তোমাদের চিনি, তোমরা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, দোহাই তোমাদের।

অতুল একদিন বলেছিল, "মেয়েটি ভারি বুদ্ধিমতী। চাঁদুদা'র ভারি ফেবারিট। চাঁদুদাই চেষ্টা করে ওকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। খুব ভাল রেজাল্ট করে পাস করেছে। চাঁদুদা ওকে

কলেজে পড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বলল—আমি আর পড়ব না। রোজগার করব। আমাদের সমিতিতেই তাই ওকে আপাতত চাকরি দিয়েছি আমরা।"

"ওর বাবা ভিকিরি?"

"ওর মা ভিকিরি। ওর বাপের খবর আমরা জানি না। ওর মা একটি অদ্ভুত চরিত্র, বৌদি। তার নাচ যদি দেখেন মুগ্ধ হয়ে যাবেন। রাস্তায় রাস্তায় নেচে আর গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে। যেখানে নাচ শুরু করে ভিড় জমে যায় সেখানে।"

"বয়স কত?"

কৌতূহল হলো অমার।

"তা জানি না। দেখে মনে হয় সবলার বড় দিদি। নেচে যা রোজগার করে তার থেকে একটি পয়সা খরচ করে না। সব সবলাকে দেয় আর বলে—জমা জমা, একটি পয়সা খরচ করিস না। মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কিনিস। টাকা থাকলে নির্ভয়ে থাকবি, লোকে খাতির করবে, সব্বাইকে কলা দেখিয়ে থাকতে পারবি। এই বলে দু-হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত একটা নাচ নাচে। আর তার সঙ্গে গান গায়—টাকা থাকলে বাঁচবি, কলা দেখিয়ে নাচবি। সবলা তার মায়ের রোজগারের টাকা পাস বুকে জমা করে রাখে, আর নিজেও যা রোজগার করে তা দিয়ে মাকে খাওয়ায়। মদ খাওয়ায়। এই জন্যেই নাকি ও রোজগার করে। আশ্চর্য নয়।"

"ওর নাম সবলা কে দিয়েছে? ওর মা?"

"ওর মা ওর নাম দিয়েছিল সাবু। চাঁদুদা সেটাকে সবলা করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ওই নামের একটা কবিতা আছে—"

অমার মনে পড়ল, ভিখারীদের ইতিহাসে সে সাবু আর তার মায়ের কাহিনী পড়েছিল। হঠাৎ অমার মনের আকাশে বিদ্যুৎ চকমক করে উঠল। হিংসার বিদ্যুৎ। সন্দেহ হলো সবলাকে ভালবাসে নাকি চাঁদু? এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু অদ্ভুত রকম হলো। অতুলকে বলল—"ওবেলা মনে করেছি স্প্যানিশ রাইস করব। আপনি ভালবাসেন তো?"

"খুব, খুব। বৌদি, আপনি যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি—"

"কি কথা।"

"আমার কাছে দুটো রাঁধবার বই আছে। দুটোই খুব ভালো, একটা দিশী রান্নার, আর একটা বিদেশী রান্নার। সে দুটো বই আপনি নেবেন? মাঝে মাঝে নতুন নতুন রান্না এক্সপেরিমেন্ট করুন না।"

"উনুনধারে বসে আমার রাঁধতে ইচ্ছে করে না। আজ হঠাৎ শখ হলো। আপনার সবলাকে যদি নিমন্ত্রণ করি ও কি খাবে?"

"না বউদি, ওসব ঝামেলা না করাই ভালো। মেয়েটিকে ঠিক বুঝি না। হঠাৎ হয়তো 'না' বলে বসবে। কি দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার।"

"ঝঞ্ঝাট আবার কি। আমি নিমন্ত্রণ করব, ও যদি সে নিমন্ত্রণ না নেয়, বুঝব ও অভদ্র। তাহলে ওকে আমার বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না।"

"কিন্তু আমাদের আপিসের কাজকর্ম কি করে হবে।"

"সে আপনারা বুঝবেন, কিন্তু অভদ্র কাউকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দেব না আমি।"

অমার চোখের দৃষ্টিতে ধকধক করে আগুন জ্বলে উঠল।

সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল অতুল।

অমা বলল—"দেখুন আমি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। বাল্যকালটা কি সুখেই কেটেছিল, তারপর থেকে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সবাই নিজের প্রিন্সিপল নিয়ে চলতে চায়, প্রত্যেকের আদর্শ বিদঘুটে, প্রত্যেকেই মনে করছে সেই আদর্শ অনুসারে চললেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে, লোকেও ধন্য ধন্য করবে। স্নেহ-ভালবাসা শালীনতা ভদ্রতা এসবের কেউ দাম দেবে না?"

অতুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। অমার কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন আবোল-তাবোলের মতো শোনাতে লাগল।

ভদ্রমহিলা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এরকম খেপে উঠলেন কেন হঠাৎ।

"বেশ, সবলাকে নিমন্ত্রণ করব আজ। আপনি যে কথাগুলো বললেন তা এক হিসাবে ঠিকই"—তারপর মাথা চুলকে বলল—"কিন্তু দেখুন, মানুষ যখনই সমাজ সৃষ্টি করেছিল তখনই তাকে সমাজ রক্ষার জন্য নানারকম নিয়মও করতে হয়েছিল। সেই নিয়মগুলোই নানারকম আদর্শে রূপান্তরিত হচ্ছে, উদ্দেশ্য, সমাজেরই সুখ বৃদ্ধি করা।"

"কিন্তু সুখ কই? চারদিকেই তো দেখছি সবাই নিজের আদর্শটাকেই আস্ফালন করছে। বাগানের চারদিকে নানা রকম বেড়া খালি, ফুল কই, মানুষ কই, সবাই যে যন্ত্র হয়ে উঠল—"

"মানুষ আছে বই কি বউদি। আমাকে কি আপনার অমানুষ বলে মনে হচ্ছে? আমি তো কোনও আদর্শ আস্ফালন করিনি আপনার কাছে, একটু স্নেহের প্রশ্রয় চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু সাহস করে চাইনি। আপনি বড্ড রাগী।"

"আপনার নিজের কেউ লোক নেই?"

"না। বাবা মা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছেন। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম তাদের গলগ্রহ হয়ে। সেখানে আমার এক মামাতো দাদার স্ত্রী আমার মায়ের মতো ছিলেন। তিনিই আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছিলেন আমার। চুরি পর্যন্ত করেছিলেন আমার জন্যে। ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। আমি দুর্ভাগা লোক বৌদি। ভগবানের একটি দয়া ছিল আমার উপর, পড়াশোনায় বরাবরই ভালো করেছি। তারই জোরে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু স্নেহ পাইনি কোথাও।"

"বিয়ে করেননি?"

"না। সেখানেও ঘা খেয়েছি বৌদি। একজন বড়লোক তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য পছন্দ করেছিলেন আমাকে। তাঁরও অদ্ভুত প্রিন্সিপল ছিল একটা। বললেন, আমি কুষ্ঠি চাই না। আমি তোমাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই যে তুমি সব দিক দিয়ে সুস্থ কি না। আমিই খরচ করে পরীক্ষা করাব তোমাকে। আমার মেয়ে বিলেতে পড়তে গেছে, মাস দুই পরে ফিরবে। তখন তোমাদের দেখাশোনা হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষাগুলো হয়ে যাক। আমার চেহারা দেখেই হোক বা ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট দেখেই হোক, আমাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পছন্দ হবার আর একটা কারণ বোধহয়, আমার বাবা মা আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। আমাকে ঘরজামাই করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। আমার সব রকম পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিলেন আমার শরীর নীরোগ এবং আমি একটি পারফেক্টলি হেল্‌দি অ্যানিম্যাল।"

"আপনি এতে রাজী হলেন।"

"বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু হয়েছিলাম। হয়েছিলাম কেন জানেন? যে নীতি বা প্রিন্সিপলের কথা এখুনি বলছিলেন আপনি তা আমার ছিল না। আমি চাইছিলাম ছোট্ট একটি সংসার গড়তে। এরকম যখন একটা সুযোগ জুটে গেল তখন আত্মসম্মান বা ওইরকম একটা কিছুর ওজুহাতে সরে আসতে ইচ্ছা করল না। রাজী হয়ে গেলুম। বরং আমার এই কথাই মনে হলো, ভদ্রলোক যা বলছেন তা খুবই সঙ্গত।"

"তাহলে মেয়ের স্বাস্থ্যও দেখা উচিত। সে কথা বলেছিলেন মেয়ের বাবাকে?"

অতুল হাসিমুখে চেয়ে রইল অমার মুখের দিকে।

তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—"বলবার সাহস পাইনি বৌদি।"

"সাহস না পাবার কি আছে এতে!"

ফিক করে হেসে অতুল বললে—"সত্যি কথা বলব, ভয় হলো পাছে ফসকে যায়। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন বৌদি, সুবিধাবাদী বলুন, যা-ই বলুন, আমার মতো নিঃসঙ্গ ছন্নছাড়া একটা লোক নীড় বাঁধবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল এইটেই সত্যি কথা—আপনার নিশ্চয় খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার উপর, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারি না।"

অমা যদিও মুখে কিছু বলল না, কিন্তু এসব শুনে অতুলকে যেন ভালো লেগে গেল তার। ঘেন্না তো হলোই না, স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল মনটা।

"বিয়ে হলো না কেন?"

"মেয়ে বিলেত থেকে একটি সুরূপ ধনী পার্শী যুবককে বিয়ে করে ফিরল। আমার স্টেশনে আর গাড়ি দাঁড়াল না।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল অতুল।

অমা সেদিন স্প্যানিশ রাইসের সঙ্গে সাদা আলুর দমও করল যত্ন করে। সবলা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেনি। সে এল, গোমড়া মুখ করে খেল বসে। অমা জিজ্ঞেস করল, আর কি দেব। কিছু তো খাচ্ছ না। সবলা উত্তর দিল—এসব খাওয়া তো খাই না আমরা, তাই ভালো লাগে না এসব খেতে।"

"কি খেতে ভালো লাগে।"

"পান্তা ভাত, তেল, তার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা—এই তো রোজ খাই।"

অমা হেসে বললে, "বেশ, তাই খাওয়াব তোমাকে একদিন।"

সবলা গোমড়া মুখ করেই বসে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

সহসা অমার মানস-জগতে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন।

পুরোনো দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ল, ভেঙে পড়ল সেকালের বড় বড় সব ইমারত। বেরিয়ে পড়ল সামনে ফাঁকা মাঠ খানিকটা। মাঠও ফাটছে। আর সেই ফাটল দিয়ে বেরুতে লাগল আগুনের শিখা। রৌরবের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে, কিন্তু বুঝতে পারেনি সেটা। তার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল। নির্নিমেষে সে চেয়ে দেখতে লাগল, আগুনের শিখার লালের সঙ্গে নীল কি সুন্দরভাবে মিশেছে। নীলের সঙ্গে লালের কি সুন্দর অথচ ভীষণ সমন্বয়। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল ওরা যেন সর্পশিশু। কিলবিল করে ফাটল দিয়ে বের হতে চাইছে। তারপর? বের হয়ে কি করবে ওরা? সভয়ে চেয়ে রইল অমা।

"বউদি, কি হলো আপনার? অমন করে কি দেখছেন? হাত ধোবেন না?"

অমার চমক ভাঙল। দেখল, সবলা উঠে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

অতুল বলল, "কি চমৎকার যে হয়েছিল আপনার স্প্যানিশ রাইস। আর এত চমৎকার ধপধপে সাদা আলুর দম তো আগে কখনও খাইনি। ওয়ান্ডারফুল। আপনি তো রান্নায় একজন বড় আর্টিস্ট দেখছি।"

ভাঙা দেওয়ালগুলো আবার খাড়া হয়ে উঠল। ইমারতগুলোও। ঢাকা পড়ে গেল মাঠ। অন্তর্ধান করল আগুন। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল অমা। উঠে হাত ধুয়ে এল। তার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল অতুলের কাছে। তার নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সে। অতুল যে তাকে আর্টিস্টের সম্মান দিয়েছে এতেই সে ভারি খুশী হয়েছিল মনে মনে। সত্যিই সে আর্টিস্ট, কিন্তু আর্টিস্ট বলে কেউ তাকে সম্মান দেয় না। গান-বাজনাতেও আর্টিস্ট সে, কিন্তু সেখানেও সে সম্মান পায়নি, তার গানের বা বাজনার যে একটা স্বকীয়তা আছে এটা কারও নজরে পড়েনি, তার কদরও কেউ করেনি, সবাই তাকে বাজার দর অনুযায়ী গানের মাস্টার বহাল করেছে। সে আর্টিস্ট বলেই স্পর্শকাতর, তাই তার এত কষ্ট, তাই সে মাঝে মাঝে রৌরবের কাছাকাছি চলে যায়....।

একটু পরেই অতুল শুনতে পেল অমা পিয়ানো বাজাচ্ছে। সুরের একটা ঝড় বইছে যেন। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো সুরের নয়—কান্নার, আর্তনাদের।

।। ছয় ।।

অমার শ্বশুর নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌঁছলেন এবং হোটেলে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে। তিনি এসেছিলেন একটা ব্যবসার কাজে। বিদেশী কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই উদ্দেশ্য। ভদ্রলোক সব দিক দিয়েই অসাধারণ। পশ্চিমেই বেশির ভাগ কাটিয়েছেন বলে তার চেহারার মধ্যে অবাঙালী-সুলভ একটা রুক্ষতা এবং বলিষ্ঠতা আছে। রং কালো, প্রকাণ্ড কান, প্রকাণ্ড নাক, বলিষ্ঠ চোয়াল, জমকালো একজোড়া পাকা গোঁফ মহিষের শিঙের মতো পাকানো, চক্ষু দুটি বড় বড়, প্রশান্ত এবং রক্তাভ। পোশাকে কোনও জাঁকজমক নেই। বাড়িতে সাধারণ একটি ফতুয়া পরে থাকেন। খৈনি খান।

উৎকৃষ্ট তামাকপাতা এবং উৎকৃষ্ট চুন নিয়ে একটি ভৃত্য নিকটেই বসে থাকে। ইঙ্গিত করলেই এক খিলি খৈনি হাতের তেলোয় মলে তৈরি করে দেয়। তিনি নিজে সাবান ব্যবহার করেন না, কিন্তু ওই চাকরটির জন্য ভালো সাবানের ব্যবস্থা আছে। তাকে সকালে উঠে খুব ভালো করে সাবানে হাত ধুতে হয়। প্রতিবার খৈনি মলার পরও ধুতে হয়। পীরু তাঁর বড় পেয়ারের চাকর। সে তাঁকে তেলও মাখায় স্নানের আগে অনেকক্ষণ ধরে। তিনি সর্ষের তেল ছাড়া আর কিছু মাখেন না। তেল মাখিয়ে আবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় পীরুকে। যদিও তাঁর নানা কাজের জন্য কয়েকটি প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে, কিন্তু পীরুই তাঁর আসল প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁর প্রাইভেট ফোন পীরুই ধরে। তিনি নিজে ফোন ধরেন না, কথাবার্তা বলেন না। পীরুর মারফতই সব হয়। অবসর সময়ে তিনি দুটি কাজ করেন। মহাভারত, রামায়ণ বা

ভাগবত পাঠ করেন খুব ভোরে। তারপর লেখেন ঘণ্টাখানেক। তারপর ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল সমাধান করেন। এই জন্যেই তিনি অনেকগুলি কাগজ কেনেন। খবর পড়বার জন্যে নয়। দরকারি খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁর আলাদা একজন লোক আছে। অমার শ্বশুর সত্যিই অদ্ভুত অসাধারণ লোক। তাঁর নামটাও অদ্ভুত—টঙ্কনাথ। এ নাম রেখেছিলেন তাঁর বাবার মনিব মহারাজা নারায়ণ। মহারাজা নারায়ণ বিপুল শক্তিশালী জমিদার ছিলেন ইংরেজদের আমলে। তাঁরই ম্যানেজার ছিলেন টঙ্কনাথের বাবা প্রতাপসিন্ধু। টঙ্কনাথ যখন খুব শিশু—যখন তাঁর নামকরণ হয়নি তখন একদিন মনিবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে প্রতাপসিন্ধু। মহারাজা নাকি শিশুর সামনে একটি ফুল এবং একটি মোহর রেখেছিলেন। শিশু নাকি ফুল না নিয়ে মোহরটিকেই মুঠো করে ধরেছিল। মহারাজা হেসে বললেন, তোমার ছেলের জন্যে দুটো নাম ঠিক করে রেখেছিলাম—পুষ্পনাথ কিংবা টঙ্কনাথ। তোমার ছেলে তো ফুল স্পর্শ করল না, মোহরটাই আঁকড়ে ধরেছে। ওর নাম টঙ্কনাথই থাক। টঙ্কনাথ নামটা পছন্দ হয়নি প্রতাপসিন্ধুর, তিনি মনিবকে ছেলের নামকরণ করে দিতেও অনুরোধ করেননি। কিন্তু তিনি যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করে দিলেন, তখন ওই নামই বহাল রইল। মহারাজা নারায়ণের মতো হিতৈষী মনিবকে অপ্রসন্ন করতে সাহস করলেন না তিনি। সেকালে এইরকম রেওয়াজ ছিল, মানী লোককে হতমান করতে চাইত না কেউ, তাঁদের অসঙ্গত খেয়ালকেও প্রশ্রয় দিত সবাই, বিশেষ করে তাঁর অনুগ্রহলালিত অনুচরবৃন্দ। টঙ্কনাথের বাল্যকালটা মহারাজা নারায়ণের কাছেই কেটেছিল। তিনি যখন মারা যান তখন টঙ্কনাথের বয়স ষোল বছর। তাঁর ছেলে ছিল না, ভাইপো ছিল, তাঁর ভাইপো গৌরবনারায়ণই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজা নারায়ণ টঙ্কনাথকেও বঞ্চিত করেননি। তাঁকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতাপসিন্ধুও তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং টঙ্কনাথ প্রথম জীবনেই কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হতে পেরেছিলেন এবং জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হবার আগে জোতজমি জমিদারি সব বিক্রি করে সংগ্রহ করেছিলেন আরও কয়েক লাখ টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি অনেক রকম ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। অনেক শহরে বাড়িও কিনেছিলেন তিনি। স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে, একমাত্র ছেলের সঙ্গে বনিবনা নেই।

পীরু এসে জানালে—"নীলুবাবু ফোন করছেন।"

"নীলুবাবু কে।"

"আমাদের খোকাবাবুর শালা। তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন বললেন। বৌমাকে নিয়ে আসতে চান আপনার কাছে।"

"ওসব ঝঞ্ঝাট করে কি হবে? এসে তো ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কাঁদবে, আর সে কান্না থামাতে কিছু টাকা গচ্চা দিতে হবে। আমার অমতে যাকে বিয়ে করেছে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মানেই ভিতরে কোনও উদ্দেশ্য আছে।"

পীরু চুপ করে রইল।

"তোমার কি মত? দেখা করব?"

"দেখা করলে ক্ষতি কি। উনি যে খোকাবাবুর স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ, এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। আসুন না—"

"বেশ, তাহলে তাই বলে দাও। সেই আমেরিকান সাহেব আসবে ক'টায়?"

"তিনটে—"

"তাহলে ওদের পাঁচটায় সময় দাও।"

পৌনে পাঁচটার সময় অমাকে নিয়ে নীলু এসে যখন পৌঁছল তখন টঙ্কনাথের বিজনেস্ সেক্রেটারি মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা হলো তার। মিস্টার মল্লিক সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে বসালেন তাদের একটা ঘরে।

"বসুন আমি মিস্টার মৌলিককে একবার খবর দিই যে আপনারা এসে গেছেন।"

পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে কথাবার্তা বলতে লাগলেন তিনি।

অমা যদিও তার দাদা-বৌদি আর মায়ের জেদাজেদিতে এসেছিল, কিন্তু সে কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার বার বার মনে হচ্ছিল বড়লোক শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে কি হবে? যে শ্বশুরের পরিচয় তার স্বামী বিয়ের আগে দেননি, বিয়ের পর যে শ্বশুর নিজে থেকে একবারও তার খোঁজ করেননি, বরং তার সম্বন্ধে যাঁর বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট, সেই শ্বশুরের কাছে সে যাচ্ছে কেন? কৃপা ভিক্ষা করতে? তার তো কৃপা ভিক্ষা করবার কোনও দরকার নেই। তবে সে এসেছে কেন? এসেছে দাদা-বৌদি আর মায়ের আগ্রহাতিশয্যে। ওরা ভাবছে তার শ্বশুর যদি তাকে দেখে বিগলিত হন এবং কিছু সম্পত্তি দেন তাহলে অমা হয়তো তার বাবার সম্পত্তির উপর দাবি ছেড়ে দেবে আর সে সম্পত্তিটা নীলুর কাজে লাগবে। এ সবই অমা জানত, আর এর বিরুদ্ধে তার মন গোড়া থেকেই বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তবু সে এসেছে। এসেছে তার কারণ, সে মা, দাদা আর বৌদির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। এইটেই তার দুর্বলতা। চাঁদুকে বিয়েও করেছিল এই জন্য। চাঁদুর আগ্রহাতিশয্যের বানে তার সামান্য আপত্তি ভেসে গিয়েছিল। চাঁদুর মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করে সে মুগ্ধ হয়েছিল তা ঠিক, কিন্তু চাঁদুর আগ্রহাতিশয্যের জন্যই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল সে, বাড়ির লোকেদের মানা শোনেনি। তার মা বা দাদা খুব প্রবলভাবে মানাও করেনি তাকে। চাঁদুকে দেখে তাদের পছন্দ হয়নি। সে যদি সিনেমা-স্টারের মতো সুরূপ হতো তাহলে হয়তো মা আপত্তি করতেন না। দাদার খুব বেশি আপত্তি ছিল না, বোনের বিয়ে প্রায়-নিখরচায় হয়ে যাচ্ছে এতে মনে মনে আরাম অনুভব করেছিল একটু। নীলু লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু ঘোর স্বার্থপর সে। অমা তার দাদাকে চেনে। বৌদি কিন্তু অত স্বার্থপর নয়। বৌদিকে ভালবাসে অমা। বিশেষ করে বৌদির অনুরোধেই আসতে হয়েছে তাকে। তা নিজেরও একটু কৌতূহল ছিল। চাঁদুর বাবা লোকটা কি রকম এটা জানবারও লোভ ছিল তার মনে মনে। কিন্তু তবু সে অস্বস্তি ভোগ করছিল। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর রৌরবের অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছিল আবার। সর্বদা মনে হচ্ছিল, এ কোথায় কোন পরিবেশে এসে পড়লাম আমি। কেন এলাম...। সবাই আমাকে নিয়ে এত টানাটানি করছে কেন। আমার মন যে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না। আমি তো কৃপা চাই না কারও কাছে। আমি একটু আনন্দ চাই, ভালবাসা চাই, কারও কাছে ভালবাসার দাবিতে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চাই নিজেকে। কিন্তু কোথাও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চাঁদু কতদিন হলো চলে গেছে, এখনও একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি তাকে। চিঠি লিখেছে একটা অতুলকে। ভিখারী সমিতির সম্বন্ধে। বিদেশের ভিখারীদের সঙ্গেও সে নাকি যোগাযোগ করছে। তার সম্বন্ধে একটা কথাও ছিল না সে চিঠিতে। অমার ভয় করছে, মনে

হচ্ছে চাঁদুও কি শেষে হারিয়ে যাবে, চলে যাবে তার নাগালের বাইরে, নিজের আদর্শ আর বিদ্যাবত্তার বিরাট লোকে গিয়ে ভুলে যাবে হয়তো তাকে....এইসব নানা কথা মনে হয় তার আর আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে মনে, বুঝতে পারে না ওটা রৌরব, নরকের আগুন।

নীলুর পাশে নির্বাক হয়ে বসেছিল সে।

এমন সময় মিস্টার মল্লিক এসে প্রবেশ করলেন।

"মিস্টার মৌলিক এখনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু উনি আপনাদের সঙ্গে আলাদা-আলাদা দেখা করতে চান। আগে অমা দেবীকে নিয়ে যেতে বললেন। নীলুবাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। অমা দেবী আসুন—"

অমার প্রথমে একটু ভয় হলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ভালই হয়েছে। দাদা সামনে থাকলে হয়তো সব কথা সে বলতে পারত না। তখনই আবার মনে হলো, সব কথা? কি কথা বলবে সে? বলবার কথা তো একটাও নেই।

"আসুন—"

মল্লিক মশাইকে অনুসরণ করে অমা ভিতরের একটি ঘরে ঢুকল। সে ঘরটি পার হয়ে আর একটি ঘরের পরদা-ঢাকা দরজার সামনে এসে মল্লিক মশাই বললেন, "পরদা ঠেলে ঢুকে যান আপনি। ওখানে আর কেউ নেই।"

মল্লিক মশাই চলে গেলেন।

অমা ক্ষণকাল পরদার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। ঢুকে অবাক হয়ে গেল সে। দেখল, একটি গোঁফওলা বলিষ্ঠ দরোয়ান একটি চৌকির উপর বসে আছে। পাশে একটি ভালো চেয়ার তার পাশে একটি টেবিলে অনেক খাবার। অমার প্রথমে সন্দেহ হলো—ইনিই কি তার শ্বশুর?

টঙ্কনাথ সস্নেহে আহ্বান করলেন—"এস মা এস—"

অমা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"এস, বস। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কেন বলো তো!"

"প্রণাম করতে এসেছি। আর কোনও দরকার নেই। আমার দাদা-বৌদিই খবর দিয়েছিলেন আপনি এখানে এসেছেন, ওঁরা সঙ্গে করে না নিয়ে এলে আমি আসবার সাহস পেতাম না।"

"সাহসের কথা বলছ কেন, তোমার স্বামী কি আমাকে একটা ভয়ঙ্কর জীবরূপে অঙ্কিত করেছেন তোমার কাছে?"

"বিয়ের আগে আপনার কোনও পরিচয়ই আমি পাইনি। আপনার নামও জানতাম না।"

"অজ্ঞাতকুলশীল একটা লোককে বিয়ে করে ফেললে—"

মাথা হেঁট করে রইল অমা। কোনও উত্তর দিল না।

টঙ্কনাথ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর বললেন, "আমার ছেলে তো কুৎসিত দেখতে। তোমার মতো রূপসী মেয়ে কি জন্যে বিয়ে করতে গেল তাকে, তা তো আমার মাথায় ঢুকছে না। গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে? গুণ অবশ্য তার নানারকম আছে। আমি তো গুণ্ডা উপাধি দিয়েছি তাকে।"

তবুও অমা মাথা নীচু করে বসেই রইল, কোনও উত্তর দিল না।

"কথা কইবে না তো এসেছ কেন!"

অমা অপ্রতিভ মুখে চোখ তুলে চাইল, তারপর অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, "আমার তো কিছু বলবার নেই।"

"তাহলে খাও। ওই টেবিলের উপর কিছু খাবার আনিয়ে রেখেছি খাও। চা, কফি, কোকো, ওভালটিন, দুধ—কি খাবে, কি খাবে বলো, গরম আনিয়ে দিচ্ছি, এগুলো আগেই এনেছিল পীরু।"

ঘণ্টা টিপলেন টঙ্কনাথ। পীরু এসে দাঁড়াল।

"ওকে গরম কিছু এনে দাও। চা, কফি—কি আনবে?"

অমা হাসিমুখে চুপ করে রইল একটু, তারপর বলল—"এ সময় আমার খাওয়ার অভ্যাস নেই।"

"তবু কিছু খেতে হবে।"

অমা টেবিল থেকে একটি মিষ্টান্ন তুলে নিল শুধু।

"আপনি বলছেন তাই খাচ্ছি, এ সময় আমি খাই না কোনোদিন।"

টঙ্কনাথ পীরুকে বললেন—"সেটা কোথা রেখেছিস, নিয়ে আয়।"

পীরু আলমারি থেকে একটি হারের বাক্স বার করে টঙ্কনাথের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"দেখ তো হারটা পছন্দ হয় কি না। এর চেয়ে ভালো মণিচাঁদ দিতে পারলে না।"

বাক্সটা খুলতেই চকমক করে উঠল একছড়া দামী হীরের হার।

অমা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল, তারপর বলল—"আমাকে দেখতে বলছেন কেন।"

"তোমার জন্যেই তো কিনেছি। এ দেশের রেওয়াজ বউ-এর মুখ প্রথমে দেখতে হলে কিছু উপহার দিতে হয়। শুধু হাতে বউয়ের মুখ দেখতে নেই।"

অমা নত-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর চোখ তুলে বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি কিছু নেব না।"

"নেবে না, কেন?"

"নিতে ইচ্ছে করছে না। আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো আপনি আমাকে পুত্রবধূরূপে স্বীকার করেননি। আমার একটা খবর পর্যন্ত নেননি আপনি—"

"তাহলে এসেছ কেন আমার কাছে।"

"আমার দাদা-বৌদির অনুরোধে এসেছি, এসেছি আপনাকে প্রণাম করতে। এবার যাই।"

অমা প্রণাম করে চলে যেতে উদ্যত হলো।

"আরে থাম, থাম, থাম। ভারি রাগী লোক দেখছি তো তুমি। বেশ, বেশ হার না নিলে, আলাপ কর একটু। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন। বস। আমার ছেলে আমার মতের বিরুদ্ধে তোমাকে বিয়ে করেছে তা ঠিক, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এটাকে তো অস্বীকার করতে পারি না। বস, তোমার সঙ্গে আলাপ করি একটু।"

অমা আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

"তোমার বাবার নাম কি?"

"শ্রীবিষ্ণুপদ রায়। অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি।"

"ছিলেন বলছ কেন। এখন কি তিনি নেই?"

চুপ করে রইল অমা।

"বেঁচে আছেন তো—"

"ঠিক জানি না। প্রায় দশ বছর আগে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন তিনি। দশ বছর তাঁর কোনও খবর আমরা জানি না।"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন? কেন, হঠাৎ।"

ক্ষণকাল নীরব থেকে অমা বলল—"তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল তাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তিনি।"

"কুষ্ঠ হলেই বা। বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করালেই পারতেন।"

"দাদার মনে ভয় হলো তাঁর ছোঁয়াচ লেগে বাড়ির অপরেরও হতে পারে। বাবা যেই সে কথা শুনলেন, অমনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।"

"তোমার দাদা কি করেন?"

"প্রফেসারি।"

"ভারি দূরদর্শী বুদ্ধিমান লোক দেখছি। তুমি লেখাপড়া কত দূর শিখেছ?"

"পরীক্ষা অনেকগুলো পাস করেছি, কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ শিখিনি। নোটবই মুখস্থ করে এম-এ পর্যন্ত পাস করেছি, কিন্তু তাকে লেখাপড়া শেখা বলে না। আমাকে মূর্খই মনে করুন। যদি অনুমতি দেন এবার তাহলে উঠি—"

"না না, বস। মূর্খরা নিজেদের পণ্ডিত মনে করে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিতান্ত মূর্খ তুমি নও। সমস্ত দিন কি কর বাড়িতে।"

"রান্নাবান্না করি, ঘরের কাজকর্ম করি। আর ট্যুশনি করি সন্ধ্যার দিকে।"

"কিসের ট্যুশনি?"

"গান-বাজনার।"

"তাই নাকি। কি বাজনা বাজাতে জান।"

"গীটার, সেতার, এস্রাজ, হার্মোনিয়ম আর পিয়ানো—"

"ওরে বাবা, তুমি তো মস্ত গুণী দেখছি। ট্যুশনি কর কেন?"

"সবার অমতে বিয়ে করে বাড়ি থেকে যখন চলে আসি তখন ওঁরও ভালো চাকরি ছিল না। দু'জনেই ট্যুশনি করতাম। এখন উনি চাকরি পেয়েছেন, ট্যুশনি না করলেও চলে, কিন্তু আমার ছাত্রীরা আমাকে ছাড়তে চায় না।"

"এখন তোমার 'উনি' কি চাকরি করেন?"

"সিদ্ধেশ্বরবাবুর ফার্মের ম্যানেজার হয়েছেন। এখন এখানে নেই। ইয়োরোপে গেছেন ফার্মের কাজে।"

চুপ করে রইলেন টঙ্কনাথ।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগবান, রক্ষা কর।"

"ও কথা বললেন কেন?"

"ভগবান কারও অনুরোধ রাখেন না, তিনি নিয়মের অধীন, তবু আমাদের দুর্বলতা আমরা তাঁকে অনুরোধ করি। তাই করে ফেললাম। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।"

"কেন?"

"না জেনে তুমি একটা পাগলকে বিয়ে করেছ। অদ্ভুত বুদ্ধিমান, অদ্ভুত একগুঁয়ে, অদ্ভুত খেয়ালী, হিতাহিত জ্ঞান নেই। বাঁয়ে রোককে তো বাঁয়ে রোককে, ডানদিকে ফিরেও তাকাবে না।

"আমার সঙ্গে তো কোনও বিষয়েই মিল হলো না। আমার দেওয়া নামটা পর্যন্ত রাখেনি। আমি ওর চন্দ্রভূষণ নাম রাখিনি, চন্দ্রভূষণ তো অতি সাধারণ নাম। আমি ওর নাম রেখেছিলাম নিয়মনাথ। এটাও ভগবানের নাম, কিন্তু কত অরিজিনাল। কিন্তু ও নাম ছেলের পছন্দ হলো না। তখন আই-এস-সি পাস করেছে, আমাকে এসে বললে—বাবা, আমি নিয়মনাথ নাম রাখব না। চন্দ্রভূষণবাবু বলে একজন প্রফেসার আজ বললেন, পশুরাই নিয়মের দাস, মানুষ নয়, মানুষ নিয়ম ভাঙবে, মানবে না। আমার খুব ভালো লেগেছে তাঁর কথা। আমার নাম নিয়মনাথ বদলে চন্দ্রভূষণ করে দাও। ব্যস, সেই যে গোঁ ধরল, বদলে তবে ছাড়লে। এফিডেবিট করে নাম বদলে ফেললে। তাকে বোঝালাম, মানুষ যে নিয়ম ভাঙবার চেষ্টা করে ওটাও একটা নিয়ম, বাঘের গায়ে ডোরা থাকে গন্ধ থাকে, এটা যেমন নিয়ম ওটাও তেমনি। কেউ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। সবাই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। 'আমি নিয়ম ভাঙব' মানুষের এই পাগলামিটা কোনও কোনও মানুষকে সত্যি সত্যি পাগল করে দেয়। তোমার স্বামীটি তেমনি পাগল। দিনকতক জেদ ধরল—আমি গরীবের ভালো ছেলেদের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াব। তার পর জেদ ধরল—আমি কালো মেয়েদের ভালো ঘরে ভালো বরে বিয়ে দেব। বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেল আমার। শেষকালে আমি রুখে দাঁড়ালাম। বললাম, দেখ বাবা, জীবন মানেই যুদ্ধ। আর সে যুদ্ধের আসল অস্ত্র টাকা। ধর্মজগতে মা কালী মা দুর্গা শক্তি হতে পারেন, কিন্তু জীবনযুদ্ধে টাকাই শক্তি। সে শক্তির অপব্যয় আমি করতে দেব না। বলল—আমি গরীবের জন্য ব্যাংক করব। সে ব্যাংকে গরীব ছাড়া আর কেউ টাকা রাখতে পারবে না। গরীবদের আমরা সব ব্যাংকের চেয়ে বেশি সুদ দেব, টাকা দাও তুমি। আমি রাজী হলাম না। তখন ও এম-এ পাশ করেছে। সেই থেকে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। একদিন সকালে দেখি বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে—আমি আর আপনার টাকা নেব না। নিজের মতে নিজের পথে চলব। পীরু খোঁজ নিয়ে বার করলে যে, একটা মেসে উঠেছে। সেখানে একটা চিঠি লিখলাম—'দেখ বাবা, হঠকারিতা করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পারবে না। সমাজে থাকতে হলে আপস করে চলতে হবে। আমাদের দেশে যাঁরা নিজের মতে নিজের পথে চলতে চেয়েছেন এবং চলতে পেরেছেন, তাঁরা সবাই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। আর একদল লোক পেরেছেন, তাঁরা বীর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এ কথাটা মিথ্যে নয়। মডার্ন বীর কারা জান? ধনীরা। তারাই নিজের মতে নিজের পথে চলবার ক্ষমতা রাখে। তোমার জন্য সেই ধনই সঞ্চয় করছি আমি। কিন্তু তুমি সেটাকে বাজে ব্যাপারে উড়িয়ে দিতে চাইছ। আমি আপত্তি করেছি তোমারই ভালোর জন্যে। নিজের মতে নিজের পথে যদি চলতে চাও, টাকা জমাও।

"তুমি দিনকতক আগে টাকা খরচ করে অনেক কালো মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছ। তোমার জন্যে আমি সদ্বংশের একটি কৃষ্ণাঙ্গী মেয়ে পছন্দ করে রেখেছি। তোমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করা আমার কর্তব্য। তুমি যদি এ মেয়েকে বিয়ে কর আমি খুব সুখী হব। আমার বিশ্বাস তোমারও ভালো লাগবে মেয়েটিকে।'

"পীরু চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। মুখে বলে দিয়েছিল, আমি

নিজে পছন্দ করে বিয়ে করব। বাবাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ কোরো। এখন দেখছি কালো নয়, বেশ ফরসা টুকটুকে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। তা ভালোই করেছে। যদিও আমি তোমাদের বিয়েতে আপত্তি করে তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে দেখে আমার ভালো লাগছে। আর ভালো লাগছে বলেই তোমার জন্যে কষ্টও হচ্ছে। কারণ আমি বুঝেছি আমার ছেলেটা পাগল। এখন নাকি ভিখারীদের নিয়ে মেতেছে। কেউ কারও ভালো করতে পারে না, এটা ওর মাথায় ঢুকছে না। আমাদের দেশেই বিদ্যাসাগর এর প্রমাণ হয়ে আছে। রাজনীতিতে যে সব নেতারা গরীবদের জন্য বক্তৃতায় হাউ হাউ করে কাঁদেন তাঁরা যখন গদিতে চড়েন, তখন দেখা যায় তাঁরা নিজেদের দুঃখই ঘুচিয়েছেন, নিজেদের গাড়ি বাড়ি করেছেন, গরীবরা যেমন ছিল তেমনি আছে। থাকবেই, কারণ ওইটেই নিয়ম। তোমাকেও কষ্ট পেতে হবে, কারণ পাগলের সঙ্গে ঘর করে কেউ সুখী হয় না।"

অমা মাথা নীচু করে টঙ্কনাথের এই লম্বা বক্তৃতা শুনল।

বক্তৃতা শেষ হলে মুখ তুলে মুচকি হাসল একটু।

"হাসছ? তোমার ভয় করছে না?"

"অদৃষ্টে যা আছে তা মেনে নিতেই হবে। আমি এবার উঠি—"

সে আবার প্রণাম করতে গেল।

"থাম, থাম, এত তাড়াতাড়ি কিসের। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। রাগ করবে না তো। তুমি বড্ড ফট করে রেগে যাও দেখছি।"

"কি বলুন—"

"তুমি আমার পরিচয় জান?"

"না। দাদা-বৌদির কাছে শুনেছি আপনি ধনী লোক। আর কিছু জানি না।"

"আমার আর একটা পরিচয় আমি সাহিত্যিক। আমি অনেক বই লিখেছি। কিন্তু একটাও ছাপাইনি। শেয়াল-কুকুরকে জোর করে গোলাপ ফুল শোঁকাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমি সাহিত্যিক বলেই আমার ভদ্রতাবোধ আছে, রসবোধ আছে। তাই আমার বিবেক বলছে, তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। তুমি না জেনে আমার পাগল ছেলেটাকে বিয়ে করেছ। টাকা দিয়ে এর যতটা প্রতিকার করা সম্ভব তা আমি করতে প্রস্তুত আছি। একটা বাড়ি তোমাকে দেব আর নগদ কিছু টাকা—"

"না, আমি কিছু চাই না।"

প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল অমা। তার মনটা শ্মশানের মতো হয়ে গেল হঠাৎ। চারিদিকে চিতা জ্বলছে। দিগন্ত পর্যত যত দূর দেখা যায় কেবল চিতা, চিতা আর চিতা। লক লক করে আগুনের শিখা জ্বলছে চারদিকে।

অমা চলে আসবার পর নীলুকে ডেকে নিয়ে গেল পীরু।

"আপনি বসুন—"

অমা বসে রইল। কিন্তু তার সারা মন তখন আগুনে ভরে গেছে। রাশি রাশি নোট পুড়ছে, টাকা পুড়ছে, আর তার সঙ্গে হাসছে কে যেন। খিল খিল করে হাসছে, কিন্তু কে হাসছে দেখা যাচ্ছে না।

নীলু কতক্ষণ টঙ্কনাথের সঙ্গে কথা কয়েছিল তা অমার খেয়াল ছিল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে রৌরবকে প্রত্যক্ষ করছিল, যে রৌরবে খালি আগুন আর ব্যঙ্গের হাসি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খালি স্বার্থের, খালি টাকার, খালি আদর্শের, খালি মতবাদের—ভালবাসার নয়! এই ক্ষোভই যেন আগুনের শিখা হয়ে জ্বলছে রৌরবে, একেই পরিহাস করে বিধাতার ব্যঙ্গ হাসি শোনা যাচ্ছে নানা সুরে। চাঁদুর বাবা তাকে ভালবাসবে না, গয়না দিয়ে টাকা দিয়ে বাড়ি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবে, দাদা তার সাহায্যে কিছু টাকা লাভ করবে, মা মনে মনে দাদার পক্ষে, কিন্তু ভণ্ডামি করে তাকে গাল দেবেন অমার মন রাখবার জন্য। এদের অমানুষিক ব্যবহারে বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর বিষয়টা ভাগ করে নেবার জন্যে এখন সবাই উৎসুক । চারিদিকে আগুন জ্বলছে, অমা কি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এ রৌরবের উত্তাপ কতক্ষণ সে সহ্য করতে পারবে? কিন্তু অমা জানে, তাকে সহ্য করতেই হবে। চাঁদুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। আবিষ্কার করতে হবে চাঁদ্‌কে । চাঁদুকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বার করতে হবে তাকে। তার অসাধারণত্ব আছে, নূতন ধরনের আদর্শ আছে, কিন্তু তার পিছনে মনুষ্যত্ব আছে কি না, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি, যাদের প্রভায় মনুষ্যজীবন সুন্দর সার্থক আনন্দময়, সেই রত্নগুলি তার অসাধারণত্বের চোখ-ধাঁধানো আবরণের মধ্যে আছে তো? এই প্রশ্নের উত্তর তাকে বার করতে হবে। ভিখারীদের ভালো করা, ভিখারী মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার সবলা নামকরণ করা—এ-সবের মধ্যে অসাধারণত্ব আছে নিশ্চই—কিন্তু। এই 'কিন্তু'কে কেন্দ্র করেই অমার কৌতূহল আবর্তিত হচ্ছে। আশা করে আছে অজানা চাঁদু যখন জানা হবে, তখন নিবে যাবে রৌরবের আগুন। হঠাৎ মনে হলো, চাঁদু তো কোনদিন তার গান বা বাজনা শুনতে চায়নি, তার রান্না খেয়ে প্রশংসা করেনি। তবে কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সে? তার রূপ? একটা ভিখারিণীকে বাঁচাতে গিয়েছিল বলেই কি সে ভালবেসেছিল তাকে? অতুল তার রান্না খেয়ে মুগ্ধ, তার বাজনা শুনে মুগ্ধ, তার শিল্পী সত্তাকে সে সম্মান দিয়েছে, একটা কুকিং রেঞ্জ কিনে এনেছে সেদিন, তাকে খুশী করবার জন্যে সে সদা ব্যস্ত, কিন্তু চাঁদুকে ঘিরে তার মনে যে স্বপ্ন জাগে, অতুলকে ঘিরে সেরকম স্বপ্ন জাগবে এ কল্পনা করতে ভয় পায় সে। তার কেমন যেন ভয় ভয় করে।

এই ভয়কে কেন্দ্র করে নানা রঙের অগ্নিশিখা মূর্ত হয় তার মনে। মনে হয় সব বুঝি পুড়ে যাবে। সে বোধ হয়....আর ভাবতে পারে না।

"চল, এবার বাড়ি চল। চমৎকার লোক তোর শ্বশুর।"

অমা লক্ষ্য করল নীলুর হাতে একটা সুদৃশ্য কার্পেটের ব্যাগ রয়েছে। যখন এসেছিল ব্যাগ তো ছিল না। ব্যাগ কোথা থেকে পেলে? ব্যাগে কি আছে?

"চল। সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি ভদ্রলোকের ব্যবহারে।"

দাদার পিছু পিছু অমা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

বাড়িতে এসে ব্যাগের ভিতর থেকে যে বিড়ালটি বেরুল তা বেশ বড় কাবুলী বিড়াল। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই।

অমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেবল, চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল।

নীলু সোচ্ছ্বাসে বলতে লাগল তার মাকে—"সত্যি মা, আমি এতটা প্রত্যাশা করিনি। কী ভালো যে ভদ্রলোক, আর কী উদার তাঁর মন, কল্পনা করতে পারবে না। অমাকে একটা হীরের নেকলেস দিয়েছেন, একটা বাড়ি দিয়েছেন, আর নিজের ব্যাংকে একটা চিঠি দিয়েছেন যাতে অমার নামে এক লাখ টাকার ফিক্‌স্‌ড্‌ ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয় একটা অবিলম্বে। অমা নাকি এসব নিতে চায়নি। তাই আমাকে বললেন, আমার ছেলেটিও পাগল, আপনার বোনটিও তাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, হাজার হোক ও আমার পুত্রবধূ তো। ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু ব্যবস্থাটা টাকা দিয়ে করাই সম্ভব। আপনি আমার ব্যাংকে কালই এ চিঠিটা নিয়ে যাবেন। আমি অমার নামে একটা ড্র্যাফ্‌ট্‌ দিয়ে দিচ্ছি। আর বৌবাজারে আমার তিনতলা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে, সেইটে ওকে দিয়ে দিচ্ছি। পীরুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে যান। সেখানে একটা দারোয়ান আছে। পীরু গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে কাল। পরে দলিল করে বাড়িটা ওর নামে লিখে দেব। বাড়ির চাবি, ব্যাংকের ড্র্যাফ্‌ট্‌ আর হারটা একটা ব্যাগে করে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সাবধানে নিয়ে যান। অমা, তুই কি বলে শ্বশুরের মুখের উপর বললি, আমি নেব না।"

নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল অমা। তার চারিদিকে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, খিক খিক হাসি রূপান্তরিত হয়েছিল অট্টহাস্যে। তার মনে হলো এই অট্টহাস্যের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর বোধ হয় কেউ শুনতে পাবে না। তাই অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে—"না না, আমি নেব না। কিচ্ছু নেব না, ওসব এখুনি ফেরত পাঠিয়ে দাও—"

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখা হলো অতুলের সঙ্গে।

"উঃ, আপনি কত দেরি করলেন। আমি নিজেই শেষে রোস্টটা চড়িয়ে দিলাম। ভালো মাটন এনেছি আজ। ভাবলাম আপনি নতুন কিছু একটা করবেন। কিন্তু এসে দেখি আপনি বাড়িতে নেই। ওকি, মুখ অত গম্ভীর কেন। ঝগড়া-টগড়া করে এলেন নাকি কারও সঙ্গে।"

অমা কোনও উত্তর দিল না।

কেবল জিজ্ঞেস করল—"ডাক এসেছে?"

"এসেছে। আপনার কোনও চিঠি নেই।"

অমা আশা করেছিল চাঁদুর চিঠি আসবে আর সে চিঠি নিবিয়ে দেবে তার আগুন।

চিঠি আসেনি, আসেনি, আসেনি—'

একটা মশাল যেন হাসতে হাসতে বলতে লাগল তার চোখের সামনে। ঘরে গিয়ে অমা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

।। সাত ।।

যে সমাজ-ব্যবস্থাকে সবাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে সেই সমাজ-ব্যবস্থাই অমার কাছে রৌরব মনে হচ্ছে। অমা কি পাগল হয়ে গেছে? ডাক্তাররা হয়তো তাই বলবেন। কিন্তু আমি

জানি অমা পাগল হয়নি। তার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে খালি। যে জলকে আমরা নির্মল বলে পান করছি সেই জলে সে দেখতে পাচ্ছে পোকা কিলবিল করছে। যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে সে মাইক্রোস্কোপ সে কেমন করে পেল, সেটা কে তার চোখের সামনে ধরল, এইটেই রহস্য। সে রহস্য উদঘাটন করাও সহজ নয়। অনেকে জাতিস্মর হয় শুনেছি, পূর্বজন্মের সবকিছু মনে থাকে তার। কি করে থাকে? কেউ বলতে পারে না। সেই কোন ছেলেবেলায় অমা রৌরবের গল্প শুনেছিল এক পণ্ডিতমশায়ের কাছে। তখন ভাবেনি সেই রৌরবকে সে দেখতে পাবে তার চারদিকে। ভাবেনি এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে সবাই মশাল। স্বার্থের মশাল, রাজনীতির মশাল, ধর্মের মশাল, সুনীতির মশাল, দুর্নীতির মশাল, নানারকম মতবাদের আর আদর্শের মশাল জ্বলছে চতুর্দিকে। মানুষরা মশাল হয়ে গেছে, পুড়ে গেছে তাদের কোমল বৃত্তি। অকারণ পুলকে আর মশগুল হয় না কেউ, সাধারণ ভদ্রতাবোধ লোপ পেয়েছে; ভালো গাইয়েকে, ভালো লেখককে, ভালো চিত্রকরকে প্রাণ খুলে প্রশংসা করে না কেউ আজকাল। সবাই মশাল, দাউ দাউ করে জ্বলছে খালি। জ্বলছে আর জ্বালাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার মশাল নিবে যায় সব। সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতুলকে ভালো লাগছে ক্রমশ। তার মধ্যে স্বার্থের অশোভন প্রকাশ এখনও চোখে পড়েনি তার। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, খাওয়ার জন্যে অতটা হ্যাংলামি ভালো লাগছে না তার। ভালো লাগে না তার 'বৌদি বৌদি' বলে ওরকম হেদিয়ে পড়া ভাবটা। ভালো লাগে না, তবু তার জন্যে প্রায়ই নানারকম রান্না করে দেয় সে, তার অনুরোধে বাজনা বাজায়, গান গায়, তার সঙ্গে সিনেমাতেও গেছে একদিন। অতুলকে ভালো লাগে, ওকে কোনোদিন মশাল বলে মনে হয়নি, তবু—। হ্যাঁ, আশঙ্কা আছে বই কি। সে আর বাপের বাড়ি যায়নি। নীলু এসেছে, তার বৌদি এসেছে, মা এসেছে—কিন্তু তার ওই এক উত্তর—আমি কিছু নেব না, তোমরা ওসব ফিরত দিয়ে এস। কারও অনুগ্রহ আমি চাই না। আমি যা রোজগার করি তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আমার জন্যে তোমরা কেউ মাথা ঘামিও না। বাবার বিষয় আমি বিক্রি করব না। নিজের উপর নির্ভর করেই আমি থাকতে পারব। তোমরা দয়া করে আমাকে বিরক্ত কোরো না।

সকলেই ভেবেছ মাথা খারাপ হয়ে গেছে মেয়েটার। ডাক্তাররাও হয়তো তাই ভাবত। কিন্তু মাথা খারাপ হয়নি। ও নিজের উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে নেই। মনে মনে ও চাঁদুকে আঁকড়ে বসে আছে। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছিল সে। সে রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যায়, সে রাজপুত্র ঘুমন্ত পুরীতে গিয়ে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙিয়ে দেয় রাজকন্যার, সে অসমসাহসী, সে দুর্দম, সে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে। এই রাজপুত্রের মনকে সে মাঝে মাঝে দেখতে পেত ঝড়ের মেঘে উড়ন্ত পাখির ডানায়, ফোটা ফুলের সুরভিত হাসিতে। এই মনকেই সে দেখেছিল চাঁদুর মধ্যে। চাঁদুর বাইরেটা দেখতে ভালো নয়। ছেলেমেয়ের মতো পেলব নয় সে। সে পুরুষ, তার ভিতরটা পৌরুষে ভরা, কল্পনায় রঙিন, নূতন কিছু করবার জন্যে সদা উন্মুখ। চাঁদুর এই মনটা সে দেখেছিল, আর কিছু দেখেনি। আর কেউ তার এ মনটাকে দেখতে পায়নি। তার নিজের বাবাও না। তার নিয়ম-ভাঙার পৌরুষকে তিনি মনে করেছেন গোঁয়ার্তুমি, পাগলামি। নিয়মনাথ

নামটা কি ভালো। অতি বাজে মিনমিনে নাম। তার চেয়ে চন্দ্রভূষণ অনেক অনেক ভালো। চাঁদুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তার আশা, আর প্রতি আবর্তনের সঙ্গে ফুটে উঠেছে স্বপ্ন, নতুন স্বপ্ন। এই স্বপ্নের রূপকথালোকে সে যখন থাকে তখন রৌরব অন্তর্ধান করে তার মন থেকে। ফুল ফোটে, পাখিরা গান গায়, জ্যোৎস্না ওঠে, সেই ছেলেবেলায় রনতি মাসী বলে ওঠেন—আমি তোর জন্যে একটু সর তুলে রাখছি, খেয়ে যা চিনি দিয়ে। রনতি মাসীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল না। প্রতিবেশী ছিলেন। এখন কোথায় আছেন সে জানে না। কিন্তু তবু তিনি দেখা দেন এখনও তাকে মাঝে মাঝে। এই রূপকথালোকে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েন তিনি। এই রূপকথালোকে মায়ের চেহারাও অন্যরকম। ভণ্ডামি নেই। দাদাও এত লোলুপ নন। এই রূপকথালোকে বাবা আসেন। তার জন্যে লজেন্স চকোলেট ফিতে শাড়ি কত কি নিয়ে আসেন। বলেন, তোর জন্যে বড় ওস্তাদ ঠিক করেছি, ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখ। ওসব ঠুনঠুন পেয়ালা গান নিয়ে কতদিন থাকবি? বাবার গম্ভীর মুখে হাসির আভা বিচ্ছুরিত হয়। আসলে কিন্তু তিনি ওই সব থিয়েটারি গান শুনতেই ভালবাসেন। তাকে রাগাবার জন্যে ওই কথা বলেন শুধু। কিন্তু এ রূপকথালোক বেশিক্ষণ থাকে না। যখন চোখে পড়ে টাইট-প্যান্ট পরা একটা ছেলে একটা মেয়েকে ফলো করছে, যখন তাদের পাড়ায় দোকানটা লুট হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ এল না, যখন খবরের কাগজের পাতা ওলটায়, তখনি আবার আত্মপ্রকাশ করে রৌরব, আগুন জ্বলতে থাকে। নানারকম আগুন, নানা রঙের আগুন, হাসিও হয়ে যায় আগুনের ফোয়ারা, চোখের জল হয়ে যায় আগুনের ফুলকি, অসহ্য উত্তাপ চারিদিকে। এরই মধ্যে কিন্তু অমা প্রতীক্ষা করে আছে। প্রতীক্ষা করে আছে চাঁদুর চিঠি একদিন আসবে। ইতিমধ্যে সবলা একদিন অতুলকে বললে—চাঁদুবাবু আমাকে খবর পাঠিয়েছেন লন্ডনে আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছেন তিনি। কিন্তু আপনি তাঁকে জানিয়ে দিন, মায়ের মদ যোগাবার জন্যেই আমি চাকরি করি। আমি চলে গেলে মাকে মদ কিনে দেবে কে? মা যদি মদ না পায় তাহলে আমার চাকরির দরকার কি। লিখে দিন আমি যেতে পারব না।

অমা ভান করল যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু সব শুনেছিল সে।

মৎস্য-শিকারী যেমন ছিপ ফেলে উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকে ফাতনাটার দিকে, তেমনি ভাবে প্রতীক্ষা করছিল অমা মনে মনে। মাঝে মাঝে তার চোখ পড়ছিল যে, যেখানে সে ছিপ ফেলেছে তা পুকুরের মতো ছোট জলাশয় নয়, যদিও তার জলের রং পুকুরের জলের মতোই কালো, কাকচক্ষু। কিন্তু ছোট নয়, সমুদ্রের মতো দিগন্ত-বিস্তৃত তা। তার বিশ্বাস, তার ছিপে তিমিও উঠে আসতে পারে। সবলার কথাগুলো শুনে স্থির হয়ে বসে রইল সে। না, ঈর্ষাকে প্রশ্রয় দেবে না কিছুতে। উঠে গেল। স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান করল শাওয়ার বাথে অনেকক্ষণ, কিন্তু তবু যা ঘটবার ঘটল। কালো জলে দেখা দিল অসংখ্য আগুনের বুদ্বুদ। তারপর সবটা জ্বলতে লাগল, যেন জল নয় পেট্রল। ফাতনা ছিপ সব পুড়ে গেল। কিন্তু এর পরই চিঠি এসে গেল চাঁদুর। তার পরদিন সকালেই। চিঠি নয় যেন বোমা। একটা বোমা নয়, অজস্র বোমা। তারা চুরমার করে দিয়ে গেল অমার জগতকে। আগুনে আগুনে ছেয়ে গেল চারিদিক। ভীরু অমার সব পুড়ে গেল, ছাই হয়ে গেল।

চাঁদু লিখেছে—"শ্রীমতী অমা, তোমাকে চিঠি লিখতে দেরি হয়ে গেল। আমার সব খবর

অতুলের কাছ থেকে নিশ্চয় পেয়েছ তুমি। কিন্তু যে কথাটা তোমাকে মুখে বলতে পারিনি, যে কথাটা লিখে জানাব ভেবেছিলাম, সে কথা যদিও পৃথিবীর সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন কথা নয়, কিন্তু আমাদের দেশে এর যৌক্তিকতাটা ম্লান হয়ে গেছে নানারকম কুসংস্কারের ময়লা পড়ে, সে ময়লা থেকে তোমার মনও মুক্ত নয় (হয়তো মুক্ত, আমি ঠিক জানি না) কিন্তু এই ভেবেই আমি এই যুক্তিযুক্ত কথাটা তোমাকে লিখতে ইতস্তত করেছি এতদিন। আমাদের পুরাণে এ রকম গল্প অনেক আছে, শাস্ত্রকাররা বিধানও দিয়েছেন। তোমরা সবাই যে ছাঁচে 'সতী' থাকতে চাও, পুরাণে কিন্তু যে পঞ্চকন্যাদের প্রত্যহ স্মরণ করতে বলেছেন, তাঁরা সে ছাঁচের সতী নন। তাঁরা সবাই একাধিক পুরুষের সংস্রবে এসেছিলেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা ভালো অর্থাৎ যারা 'সতী', যারা 'পবিত্র' তারা বিবাহিত স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের কথা ভাবাটাও পাপ মনে করে। এটা যে খারাপ তা আমি বলছি না, যারা বলে—আমি আলোচাল ছাড়া অন্য চাল খাব না, খদ্দর ছাড়া আর কিছু পরব না, বিষ্ণু ছাড়া অন্য কোনও দেবতাকে মানব না, দেবেন দত্ত ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক নেতার কথা শুনব না—তাদের এই একমুখী মনের আমি প্রশংসা করি, কারণ এই একমুখিতা বজায় রাখতে হলে যে নিষ্ঠার, যে মনের জোরের দরকার তা দুর্লভ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ আত্মবলিদানেও দেখা গেছে। সতীত্বের ক্ষেত্রে সহমরণকে—স্বেচ্ছায় স্বামী-বিচ্ছেদ-স্বীকারে অনিচ্ছুক শোকাকুলা স্ত্রীর স্বামীর চিতায় আত্ম-বিসর্জনকে আমি অসম্মান করি না। কিন্তু যাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় চড়ানো হতো, তাদের যে ধর্মের নামে প্রকারান্তরে হত্যা করাই হতো তা সবাই জানে। তার প্রতিবাদ যে কোনও সুস্থমনা লোকই করবে। আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে এতদিন ইতস্তত করেছি সেটাও দাম্পত্য-বিষয়ক। আমরা দু'জনে পরস্পরকে পছন্দ করে (কাব্যের ভাষায়, ভালবেসে) বিয়ে করেছি। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এ বিয়ের বিরোধী ছিলেন, তবু যে রোমান্সের আবেগে আমরা দু'জন মিলিত হয়েছিলাম সে রোমান্সের রঙ আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু তার উপর হঠাৎ কর্তব্যের চোখ-ধাঁধানো এমন একটা আলো এসে পড়েছে, যাকে আমার বিবেক উপেক্ষা করতে পারছে না। এটা অবশ্য তুমিও মানবে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই সন্তান লাভ। মানব-সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না তখন কুমারী মেয়েরাই যৌবনোদ্গমের পর একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান লাভ করত। ওইটেই তখন চালু প্রথা ছিল। ছেলে বা মেয়ের পিতৃত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু মানুষ যখন সম্পত্তির অর্থাৎ প্রাইভেট প্রপার্টির মালিক হলো, তখনই সে স্ত্রীকেও তার প্রাইভেট প্রপার্টি করে ফেললে এবং যে সন্তান তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে, সে যে তারই সন্তান এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে চাইল। এরই ফলে বিবাহ-প্রথা এবং বিবাহ-প্রথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 'সতী' থাকার নির্দেশ। ভালো হোক মন্দ হোক, এই প্রথাই এখন সভ্য-সমাজে প্রচলিত। 'বিবাহ'কে এবং সতীত্বকে সম্মান করাই এখন বিধি। আমরা সেই বিধিকে মান্য করেই বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু তার আগে অতুলের গল্পটা তোমাকে বলে নিই। তুমি গল্পটা শুনেছ কি না জানি না। অতুল হয়তো তোমাকেও বলেছে এটা। পাত্র হিসাবে অতুল সত্যিই ভালো। রূপে গুণে সব দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর। একজন ধনী ওকে পাত্র হিসাবে পছন্দ করেছিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য।

মেয়েটি তখন বিলেতে পড়ছিল। ধনী ব্যক্তিটি অতুলের স্বাস্থ্য ভালো করে পরীক্ষা করেছিলেন। এমন কি তার বীর্য পরীক্ষা করিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, সে সন্তানের পিতা হতে সক্ষম। বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। অতুল একদিন দুঃখ করে গল্পটা আমাকে বলেছিল এবং তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার রিপোর্টগুলো দেখিয়েছিল। তার রিপোর্টগুলো দেখে আমার মনে হলো সন্তান উৎপাদন করবার বীজ আমার বীর্যে আছে কি? এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। বিয়ে করবার আগেই দেখা উচিত ছিল। সন্তান না হলে যে দাম্পত্য-জীবন নিরানন্দ নিষ্ফল। বিশেষত মেয়েরা যদি মা হবার সুযোগ না পায় তাহলে তাদের জীবন ব্যর্থ। পরীক্ষা করিয়ে ফেললাম একদিন। এক জায়গায় নয়, তিনটে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়েছি। সব জায়গা থেকেই এক উত্তর—অ্যাজোস্পারমিয়া, অর্থাৎ আমার সন্তান হবে না, আমার সিমেনে স্পারমাটোজোয়া নেই। চিকিৎসা করিয়েছি কিছুদিন, কোনও ফল হয়নি। এখানকার ডাক্তাররাও বিশেষ আশা ভরসা দিচ্ছেন না। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তা আমি ভেবেছি অনেকদিন ধরে। শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা তোমাকে জানাচ্ছি আজ। আমার মন সংস্কারমুক্ত। তুমি যদি সন্তান-লাভার্থে অন্য কোনও পুরুষের সাহায্য নাও আমার তাতে আপত্তি হবে না। তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও কমবে না। তোমার যে সন্তান হবে তাকে নিজের সন্তানের মতোই পালন করতে আমার বিবেক কখনও ইতস্তত করবে না, এটা আমি নিঃসংশয়ে তোমাকে বলতে পারি। তোমাকে সন্তানহীনা করে রাখবার আমার কোনও অধিকার নেই। তোমার কাছেই একটি সুপুরুষ আছে, অতুল। তাকে যদি তুমি কাজে লাগাতে পার আমি খুব খুশী হব। আমাদের দেশের শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান আছে, এ তুমি নিশ্চয়ই জানো। কুন্তীর গল্প নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। কিন্তু তবু তোমার হয়তো নিজস্ব একটা মতামত আছে, আমি জোর করে কিছু তোমার উপরে চাপাতে চাই না। আমি আমার মতটা তোমাকে অকপটে জানালাম। বিবাহ না করে কোনও পরপুরুষের সংস্রবে আসা যদি তুমি 'পাপ' মনে কর তাহলেও তোমাকে আমি দোষ দেব না। কারণ এই সংস্কারকে সম্মান করতেই তুমি শিখেছ, এর মধ্যেই মানুষ হয়েছ তুমি। এটা যে কুসংস্কার তা-ও আমি বলছি না। এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি, তোমার ওই সংস্কারকে সম্মান দেখিয়ে তোমাকে বিয়ে করবার সুযোগ দিতেও আমার দ্বিধা নেই। আইনত, বিবাহ-বিচ্ছেদ অনায়াসেই হতে পারে। তুমি যদি আমার কোনও প্রস্তাবেই রাজী না হও তাহলে আমি যা ঠিক করেছি তা তোমাকে বলছি। আমি কিছুতেই তোমার মাতৃত্বের পথ রোধ করে থাকব না। আমিই বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার আয়োজন করব। জানি না তা সফল হবে কিনা, কিন্তু চেষ্টা আমি করব। ভালো করে জিনিসটা ভেবে আমাকে একটা উত্তর দিও। আমি জীবনে আর বিবাহ করব না এটা ঠিক, কিন্তু তোমার জীবনকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। আশা করি আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি ভালো করে। তুমি জান আমি একটা নীতি ধরে নিজের বিবেক অনুসারে চলতে চাই। নিজের বাবাকে ছেড়েছি এই কারণে। ভালো কথা, আমার বাবার সঙ্গে কি দেখা করেছিলে তুমি? করে থাকলে একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, তিনি তোমাকে টাকা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে টাকাই এ যুগের শক্তির প্রতীক। প্রত্যেকেরই উচিত সে শক্তি সংগ্রহ করা। তাঁর আর একটা বাতিক আছে—নিয়ম। তিনি কতকগুলো নিয়মকে অন্ধভাবে মানেন।

যেমন, তিনি মনে করেন 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা', ও নিয়ম বদলাবে না। বীরের চেহারা বদলাবে হয়তো যুগে যুগে—চেংগিস, তৈমুর, নাদিরশাহ্ হয়তো ক্লাইভ, ক্যাথারিন, লেনিনের রূপে আবির্ভূত হবেন ইতিহাসে, কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করবার মতো বীরত্ব তাঁদের থাকবেই এবং তা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাঁরা বসুন্ধরাকে ভোগ করবেন। বাবা নিজের বিবেক মেনে চলেন, আমিও তাই। বাবার বিবেকের সঙ্গে আমার বিবেকের মিল হয়নি, তাই তাঁকে ছাড়তে হয়েছে। তোমার বিবেকের সঙ্গে আমার বিবেকের মিল যদি না হয় তাহলে তোমাকেও হয়তো ছাড়তে হবে। যে ভালোলাগার নীতিকে মেনে সবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলাম তোমাকে, সেই তোমাকেই আবার হয়তো ছাড়তে হবে আর একটা নীতির ধাক্কায়। আমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু আরও কষ্ট হবে বিবেকের নির্দেশ যদি অবহেলা করি। আমার কথাগুলো ভালো করে ভেবে তারপর উত্তর দিও। ইতি—"

অমার মনে হলো—কাকে বিয়ে করেছিল সে? মানুষকে, না বিবেককে? যে লোক সাবুকে সবলা করেছিল সেই লোক নিমেষে অমাকে অমিতা করে ফেলল। উঠে দাঁড়াল অমা। ঠিক করল এ বাড়িতে আর সে থাকবে না। কিন্তু যাবে কোথায়? ভাবল খানিকক্ষণ। শেষকালে একটি মুখই ভেসে উঠল মনে। মায়ের মুখ। যে মায়ের অবাধ্য হয়েছিল সে, যে মাকে ভণ্ড বলে মনে হয়েছিল তার, সেই মাকেই তার একমাত্র আপনজন বলে মনে হলো এখন। অনেকদিন পরে গিয়ে প্রথমে মায়ের যে মূর্তিটি দেখেছিল সেইটেই মনে পড়ল আবার—বাবার ছবির নীচে দাঁড়িয়ে ধূপকাঠি জ্বালছেন। মনে পড়ল, সে ভালবাসে বলে মা তার জন্যেই নারকেল নাড়ু করতেন, তার বাসন্তী রং শাড়ির জন্যে কত খুঁজে খুঁজে ওই রঙের ফিতে কিনে দিয়েছিলেন, তার জন্যেই আলুকাব্লি করেছিলেন একদিন—নানারকম স্মৃতি ঝাঁক বেঁধে এল তার মনে।

দুটো ট্রাঙ্কে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে সে অতুলের নামে চিঠি লিখে তার ঘরে ফেলে দিয়ে এল সেটা। ছোট চিঠি।

সবিনয় নিবেদন,

অতুলবাবু, আমি মায়ের কাছে চললাম। ওখানেই এখন থাকব। কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি। বাকি জিনিস আমার লোক এসে নিয়ে যাবে। ভাঁড়ারের চাবি আমার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে রইল। চাঁদুবাবুর আপিস থেকে যে টাকা আমার নামে আসে তা আমাকে পাঠাবার দরকার নেই।

ইতি—অমা।

অমা একটা ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। একটা গলির মধ্যে ঢুকে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রচুর ভিড় জমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের মাঝখান থেকে ভেসে আসছিল নাচগানের শব্দ।

ড্রাইভার বলল—"ভিকিরি মাগীটা এখানে আবার নাচগান শুরু করেছে। ও এখন চলবে অনেকক্ষণ। ব্যাক করে অন্য রাস্তা দিয়ে যাই—"

অমার কানে এল গানের একটা কলি—'দেখিয়ে কলা নাচবি যদি টাকা জমা, দেখিয়ে কলা মদ খাবি তো টাকা জমা।' তার সঙ্গে ঝমাঝম নাচ। সবলার মা নয় তো? অমার ইচ্ছা হলো মেয়েটিকে একটু দেখে।

"একটু থামবেন? আমি দেখে আসি একটু।"

ড্রাইভার থামতে রাজী ছিল না তত।

অমার অনুরোধে রাজী হলো শেষটা।

"বেশি দেরি করবেন না। কি দেখবেন, ও একটা পাগলি—"

অমা ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখল উন্মাদিনীর মতো নাচছে একটি যুবতী। সবলার মা? সুন্দরী মেয়েটি। সবলার মা বলে মনে হয় না।

গাছ কোমর বেঁধে শাড়িটাকে আঁটসাঁট করে পরেছে, বুকটা উদগ্র রকমের উঁচু। টাইট করে একটা রঙিন কাপড় বেঁধেছে সেখানে। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। পায়ে নূপুর নয়, পাঁয়জোড়। দু'হাতে বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে উদ্দাম নৃত্য করছে সে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে। আর গাইছে—'দেখিয়ে কলা আগুন যদি জ্বালাতে চাস টাকা জমা। দেখিয়ে কলা আগুন যদি নেবাতে চাস টাকা জমা। ধুমধুমিয়ে মেরে মেয়ে দেখিয়ে কলা আগুন যদি জ্বালাতে চাস টাকা জমা। টাকা জমা, চুমচুমিয়ে আদর করে টাকা জমা, দেখিয়ে কলা মাল খা আর টাকা জমা'।

চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে মেয়েটির। ঠোঁটের দু-কোণে ফেনা। একটি ছোট মেয়ে দর্শকদের কাছে একটা থলি নিয়ে ঘুরছে। অনেক পয়সা পড়ছে তাতে। অমাও একটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে এল। অমার মনে হলো ওরও চারদিকে কি আগুন জ্বলছে? টাকা দিয়ে আগুন নেবাতে চায়? মদ খেয়ে? সবলার মায়ের জন্য কষ্ট হতে লাগল তার। সবলার জন্যও। চারদিকে আগুন জ্বললে যে কি অবস্থা হয় তা তো সে জানে। তার চারদিকে এখনও আগুন জ্বলছে যে। মায়ের কাছে গেলে কি এ আগুন নিববে? ওর মতো কলা দেখিয়ে নাচতে পারলে কি আগুন নেবে? এ আগুন কিন্তু নেবাতেই হবে যেমন করে হোক।

ট্যাক্সি বাড়ির দুয়ারে থামতেই অমা দেখল, তাদের গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িতে বসে আছেন তার বৌদি, আর দাদা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

"এ কি, অমা এসে গেলি। তোর কাছেই যাচ্ছিলাম আমরা। আমাদের ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই তোকে ফোন করতে পারিনি।"

অমা বলল—"চাকরটাকে ডাক তো। আমার বাক্স দুটো নামিয়ে নিক।"

"বাক্স এনেছিস? কেন?"

"এখানেই এখন থাকব কিছুদিন মায়ের কাছে।"

"এখানেই থাকবে? কেন, ওখানে কি হলো।"

অমা কোনও উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে। নীলুর পুরোনো ড্রাইভার বাক্স দুটো নামিয়ে চাকর ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল!

অমা ভিতরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার ছবির নীচে একটা চেয়ার পেতে মা হাতজোড় করে বসে আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমা। কি হলো? বাবার কোনও খবর এসেছে নাকি। নীলু আর তার বউ এসে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল অমা তাদের দিকে।

"চল, উপরে চল।"

অমা কিন্তু গেল না।

মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করল।

"কি হয়েছে মা।"

অতসীবরণীর কান্না আরও বেড়ে গেল।

"কি হয়েছে বলো না।"

চোখের জল মুছে ধরা গলায় অতসীবরণী বললেন—"ওরা আজ দরখাস্ত করবে।"

"কিসের দরখাস্ত?"

"বিষয় দখলের। ওঁর চলে যাওয়ার পর পরশুদিন দশ বছর শেষ হবে। তারপর ধরে নেওয়া হবে উনি আর বেঁচে নেই, ওঁর বিষয়-আশয় সব আমাদের। তার জন্যে দরখাস্ত করবে ওরা আজ। আমাকে আর তোকেও ওই দরখাস্ত সই করতে হবে—আমি সই করতে পারব না।"

"আমিও করব না।"

নীলু বোধহয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

"করবে না তো কি করবে।"

আগুন জ্বলে উঠল অমার চোখে।

"কলা দেখিয়ে নাচব। গান শেখাব, বাজনা শেখাব, আর নাচব। তোমরা যে আগুন জ্বেলেছ চারদিকে সেই আগুনের মাঝখানেই কলা দেখিয়ে নাচব—ক্রমাগত নাচব—নাচতে নাচতে চলে যাব।"

সবলার মা হঠাৎ এসে যেন ভর করল তার উপর।

"পাগল হয়ে গেলি নাকি।"

"পাগল আমি নই। পাগল তোমরা। পাগল নয়, মাতাল—মদ খেয়ে মাতলামি করছ। স্বার্থের মদ, আদর্শের মদ, বিবেকের মদ, টাকার মদ—নানা রকম মদ। যা কিছু ভদ্র, যা কিছু কোমল, যা কিছু স্পর্শকাতর তা তোমাদের দাপাদাপিতে তছনছ হয়ে গেল—মহাকাল তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন, সেগুলো মশাল হয়ে জ্বলছে—সব পুড়ে গেল, সব ছাই হয়ে গেল। কিন্তু তার ভেতরই আমি নাচব।"

অমার মা চিন্তিত হয়ে চাইলেন অমার দিকে।

"কি আবোল-তাবোল বকচিস। চল আমার ঘরে—হঠাৎ কি হলো তোর।"

অমা জড়িয়ে ধরল মাকে। আবদারের সুরে যা বলল তা-ও অপ্রত্যাশিত। "মা, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি কি এখনও তেমনি সন্দেশ কর? ক্ষীরের ছাঁচ? গোকুল পিঠে?"

"কার জন্যে করব বল, ওরা তো কেউ খায় না। কাল করে দেব তোর জন্যে। এখন একটু দুধ খাবি চল, ভাল বিস্কুটও আছে। আয়—"

অতসীবরণী অমাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন।

বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীলু। তারপরই তার উকিল বন্ধুটি পিছনের দরজা দিয়ে এসে হাজির হলেন। বগলে একটি ফাইল, চোখে নীল চশমা।

"এই যে নীলু, তোমরা সব 'রেডি'তো। আমি দরখাস্ত লিখে টাইপ করে নিয়ে এসেছি। সই করে দাও, আমি যথাস্থানে পেশ করে দেব। তোমার বোন এসেছে তো?"

"এসেছে। কিন্তু তার মাথাটা বিগড়েছে মনে হচ্ছে। সে বলছে—আমি সই করব না। মা-ও মত বদলেছেন। আমি একা সই করলে হবে না?"

"তিনজন সই করলেই ভালো হতো। তোমার মা বোন কোথায়?"

"মায়ের ঘরে।"

"চল একটু বুঝিয়ে বলি ওঁদের। এতে তো অন্যায় কিছু নেই। তোমার বাবা যখন ফিরছেন না, আর আইন যখন—"

ঠিক এই সময় সদর দরজার 'ইলেক্‌ট্রিক বেল'টা জোরে বেজে উঠল।

"কে এল আবার এ সময়।"

পরমুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে এল গোবিন্দ।

"দাদাবাবু দাদাবাবু, কর্তাবাবু ফিরে এসেছেন।"

"কোন কর্তাবাবু?"

"আমাদের কর্তাবাবু গো, তোমার বাবা।"

সঙ্গে সঙ্গেই সিংহবদন বিষ্ণুপদ রায় প্রবেশ করলেন।

হঠাৎ চেনা যায় না। নাকটা ফুলে গেছে। ভুরুর চুল নেই। চোখ দুটো লাল। মাথার সামনে টাক।

"বাবা! এ কি, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না।"

নীলু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

"আমার মুখটা হয়তো বদলেছে কিন্তু এ দুটো ঠিক আছে।"

হাতের বুড়ো আঙুল দুটো তুলে ধরল।

"চলে যাওয়ার আগে এ দুটোর ছাপ আমি রেখে গিয়েছিলাম দু'জন গেজেটেড অফিসার সাক্ষী আছে। জমা আছে ছাপ দুটো সাব-রেজিস্ট্রার্স আপিসে। আমি যে বিষ্ণুপদ রায় সেটা প্রমাণ করতে পারব। সিধের কাছে খবর পেলাম তোমরা নাকি আমার বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করবার তোড়জোড় করছ।"

অমা আর অমার মা-ও বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

অমা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

"আমি জানতুম তুমি আসবে বাবা।"

অতসীবরণী স্বামীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।

"পা ছাড়ো, ওঠ।"

অতসীবরণী তবু ওঠেন না।

"একি করছ, ওঠ ওঠ ওঠ।"

বিষ্ণুপদর কণ্ঠস্বরও বাষ্পাকুল হয়ে এল।

অতসীবরণী পা থেকে মুখ তুললেন, কিন্তু পায়ের কাছেই বসে রইলেন নতমস্তকে।

উকিলবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ফস্ করে সেটা ধরিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর নীলুর দিকে চেয়ে বললেন—"আমি চলি এখন, পরে আসব।"

"ইনি কে?" প্রশ্ন করলেন বিষ্ণুপদ নীলুকে।

"আমার বন্ধু।"

নীলু এতক্ষণ প্রণাম করেনি বাবাকে। এইবার এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

"বাবা বস। আমাকে তুমি ভুল বুঝে—"

চেয়ারে বসে তিনি বললেন—"তোমাকে আমি ভুল বুঝিনি। আমি নিজেই অবুঝ, তাই তোমার উচিত কথাকে অনুচিত বলে মনে করেছিলাম। আমি সেকেলে লোক, আমার বুদ্ধিও সেকেলে। ভুগেছিও তার জন্যে। খোকন কোথা?"

"সে স্কুলে গেছে।"

"সে স্কুল থেকে ফেরবার আগেই আমি ফিরে যাব। আমি কলকাতার বাইরে পুকুর-সুদ্ধ একটা বড় বাড়ি কিনেছি প্রায় পাঁচ বিঘে জমির উপর। আমি সেখানেই থাকব। আজ তোমাদের দেখতে এলাম।"

"আমি তোমার কাছে থাকব বাবা"—অমা বলে উঠল।

"আমিও।" বলে উঠল অমার মা-ও।

"বেশ তো। থাকতে পার তো চল। সিধের মুখে শুনলাম অমা একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করেছে। সে কোথায়?"

"সে ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"ও!"

অমা প্রশ্ন করল—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বাবা?"

"নানা জায়গায় ঘুরেছি। শেষকালে নাগপুরে ছিলাম। সেখানে একটা চেম্বার করেছিলাম। বাড়িতে বসেই লিগাল এড্‌ভাইস দিতাম। প্র্যাকটিশ ভালোই জমেছিল। কিন্তু চলে এলাম তবু। মনে হলো আর ক'দিনই বা বাঁচব, এ দেশে মরলে গঙ্গাও পাবো না, ছেলের হাতের আগুনও পাবো না। সেকেলে মানুষের সেকেলে এই সংস্কার দুটোই আমাকে আবার নিয়ে এল এখানে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই বাড়িটা কিনে ফেলেছি দালালের মারফত। দিন সাতেক আগে দলিলপত্র হয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গায় বেশ বড় বাড়ি। সামনের পুকুরটি চমৎকার। টলটল করছে কালো জল। পদ্মফুল ফোটে নাকি। এখন ফুল নেই, পাতা রয়েছে—"

নীলুর বউ একটি পাথরের থালায় নানা রকম খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। তার পিছনেই বাতাবির মা একটি ছোট টেবিল নিয়ে।

"না, না। আমি এখন কিছু খাব না। আজকাল হজম হয় না ভালো। ভাতে-ভাত আর দুধ ছাড়া আর কিছু খাই না। মাছ মাংস ডিম ছেড়ে দিয়েছি"—তারপর হেসে বললেন—"তোমাদের বাসনপত্তরগুলো অপবিত্র করতেও চাই না। আচ্ছা, আমি উঠলাম আজ।"

"আমিও যাব বাবা তোমার সঙ্গে।"

"এখনই?"

"এখনই।"

অমার মনে হলো তার চারিদিকে যে আগুন জ্বলছে, বাবার কাছে গেলেই হয়তো তা নিবে যাবে, মা-ও তো থাকবে সেখানে, হয়তো সেই পুরোনো দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। সেই দিনগুলো, সেই অবর্ণনীয় দিনগুলো।

"মা, তুমি যাবে?"

"আমিও যাব। কিন্তু এখনই যাই কি করে। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে একেবারে যাব। তুই যাবি তো যা, দেখে আয়—"

অমা জিজ্ঞেস করল—"বাবা, তুমি কিসে এসেছ?"

"মোটরে। আর একটা মোটর কিনেছি আমি।"

"আমার ট্রাঙ্ক দুটো নিয়ে যাব।"

"বেশ। বড় গাড়ি, কোনও অসুবিধে হবে না।"

নীলু আর নীলুর বউ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাদের স্বপ্নের প্রাসাদ। বিষ্ণুপদ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তারা নীরবে এসে প্রণাম করল।

নীলু বললে—"বাবা, আমি আমেরিকায় একটা চাকরি পেয়েছি। মাস খানেকের মধ্যেই যাব সেখানে।"

"আমি মরার আগে কোথাও যেও না। আমাকে চিতায় তুলে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যেও।"

"ওখানে কিন্তু অনেক বেশি মাইনে—উন্নতির অনেক স্কোপ—"

গর্জন করে উঠলেন বিষ্ণুপদ—"মাইনের লোভে যদি আমাকে ফেলে চলে যাও, তাহলে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করব তোমাকে। চললুম—"

অমাও বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। দেখল প্রকাণ্ড একটা বুইক গাড়ি কিনেছেন বাবা। চমৎকার গাড়ি। হঠাৎ নজরে পড়ল, ড্রাইভারটারও নাক ফোলা। একটা গালের রং কালচে-লাল, মনে হল কে যেন চড় মেরেছে। সভয়ে চেয়ে রইল অমা তার দিকে।

"ওর গালে কি হয়েছে?"—অমা জিজ্ঞেস করলে বিষ্ণুপদকে।

"আমার যা হয়েছে তাই।"

কলকাতা থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে বাড়ি কিনেছিলেন বিষ্ণুপদ। প্রকাণ্ড পুকুর বাড়ির সামনে। পুকুরের বাঁধানো ঘাট। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বারান্দার সামনে লাল সুরকির রাস্তা। পুকুরের চারদিকে নানা রকম ফুলের বাগান। একধারে 'লন' আছে একটা। 'লনে'র কোণে কৃষ্ণচূড়া গাছ একটি। দ্বিতল বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে তারপর বাড়ির প্রশস্ত মারবেলের বারান্দা। গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, অমা দেখতে পেল বারান্দার উপর যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার নাক নেই। নাকের জায়গায় একটা গর্ত কেবল। হাতের আঙুল নেই। মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে বিষ্ণুপদ বললেন, "বরেন, আমার মেয়ে অমা এসেছে। ছুনি কোথা, শরবৎ কোথা, ওদের খবর দাও।"

ছুনি, শরবৎ দু'জনেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এক নজর দেখে অমা বুঝতে পারলে এরা দু'জনেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

"চল, তুই দোতলায় চল, সেখানেই তুই থাকবি।"

অমা যন্ত্রচালিতবৎ উপরে গেল। উপরের ঘর চমৎকার। মারবেলের মেঝে। বড় বড় জানালা। সবুজাভ দেওয়ালের রং। প্রশস্ত ঘর। তবু অমার মুখে আনন্দের আভাস পর্যন্ত দেখা গেল না।

"ওরা কে বাবা।"

"ওরা আমার আত্মীয়। ওদের আমি ভালবাসি। ছুনি আমার বোনের মতো। ও আমার যে সেবা করেছে তা নিজের বোনও করে না। শরবৎ চাকরের মতো সেবা করে আমার। যখন আমি পেটের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম, যখন কাপড়-চোপড় বিছানা সব পায়খানা-পেচ্ছাপে মাখামাখি হয়ে যেত, তখন ওই শরবৎই সব পরিষ্কার করেছে। অথচ ও বড় বংশের ছেলে, লেখাপড়া জানে, আর কি মিষ্টি স্বভাব, কি বিনয়ী, কি ভদ্র। আর ওই বরেন—যার নাকের জায়গায় গর্ত—ও মস্ত পণ্ডিত একজন। যদিও খোনা হয়ে গেছে, তবু ওর সঙ্গে আলাপ করলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। রাস্তায় পড়ে মরছিল লোকটা। আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি, দিয়ে ধন্য হয়েছি।"

"ওরা কি এখানেই থাকবে বরাবর?"

"নিশ্চয়ই। ওরাই তো আমার আত্মীয়। যতদিন বাঁচব ওদের সঙ্গেই থাকব। উইল করে ওদের টাকাও দিয়ে যাব যাতে ওরা অর্থাভাবে কষ্ট না পায়। ওদের সঙ্গে থাকব বই কি—অন্ প্রিন্সিপল থাকব।"

"আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না?"

"তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ব্যবস্থা তো করেইছি। তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে সম্মান দিতে গিয়েই তো নিজের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। সেই রাস্তাতেই কুড়িয়ে পেয়েছি এদের, সেই দুঃখের দিনে বুঝেছি ওরাই আমার আপন লোক। নতুন একটা বিবেক তৈরি হয়েছে আমার। সে বিবেকের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।"

কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল অমা।

সে ভেবেছিল, বাবার কাছে এসে সে শান্তি পাবে। কিন্তু আগুন তো নিবল না। এখানেও প্রিন্সিপল আর বিবেক। তার বাবাই যেন একটা মশাল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সে মশালের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর বলছে—আমার কাছে থাকতে হলে এইসব অচেনা অনাত্মীয় কুটেদের সঙ্গে বাস করতে হবে। আর একটু দূরেই চাঁদুও জ্বলছে মশালের মতো। বলছে—তুমি অতুলের কাছে শোও, সন্তান লাভ কর, যদি আপত্তি থাকে আমি চলে যাব তোমার কাছ থেকে, কারণ আমি কুসংস্কারমুক্ত বিবেকী লোক। চাঁদুর বাবা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন যেন একটা আগ্নেয়গিরির মতো, তার দিকে টাকা ছুঁড়ছেন, বাড়ি ছুঁড়ছেন আর দাউ দাউ করে জ্বলছেন দম্ভের আগুনে। তার দাদার দু-চোখও জ্বলছে স্বার্থের আগুনে। আগুন, আগুন, চারিদিকে আগুন। এরা প্রত্যেকে যা বলছে তা যুক্তিযুক্ত, সে-সবে নীতি আছে, আদর্শ আছে, কিন্তু আমার কোমল মন, স্নেহ-পিপাসু অন্তর যে ওদের উত্তাপে পুড়ে গেল। কোথাও আশ্রয় পেল না সে। চারিদিকে রৌরব।

অমা কিন্তু বলল না কিছু।

চুপ করে রইল সারাক্ষণ।

রাত্রে ছুনি এসে বলল—"চুপ করে আছ কেন। চল, খাবে চল।"

"আমি কিছু খাব না।"

ভালো খাটে ভালো বিছানায় বিনিদ্র হয়ে জেগে রইল সে।

তার পরদিন আর অমাকে পাওয়া গেল না।

একটা আশ্চর্য ঘটনা কিন্তু ঘটল।

বাড়ির সামনে যে পুকুরটা ছিল, দেখা গেল, সেই পুকুরটা পদ্মফুলে ভরে গেছে। অদ্ভুত পদ্ম। সাদা নয়, গোলাপী নয়, লাল নয়, নীল নয়। প্রত্যেকটি পদ্ম যেন অগ্নিকমল, প্রত্যেকটি পাপড়ি যেন আগুনের শিখা।